

CUR-H05097-2-PO30263

বসুন্ধরা)

পল্লী-অর্থনীতি-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা

১৩৬৪

[১৮৭৯-৮০ শকাব্দ]

2

756.3
.003/5

সম্পাদক

শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচার-অধিকর্তা



পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মদ্রুণে অধীক্ষক শ্রীশুভেন্দ্র মদ্রুখোপাধ্যায়
কর্তৃক মদ্রুদ্রিত এবং পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের
প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত

বার্ষিক দ্বাই টাকা: প্রতি সংখ্যা উনিশ নয়া পয়সা বা তিন আনা

1/1

বসুন্ধরা

১৩৬৪

বার্ষিক সূচি

P 30263

	পৃষ্ঠা
অধিকতর বাদ্যোৎপাদন	২৯৩
অ্যামোনিয়ম সালফেট	২৫৬
অ্যামোনিয়া বায়ুঃ সার-শিল্পে প্রগতি	৪৭৪
আঙুরের চাষ	১৫৯
আতা	১৭
আমগাছ	৯৪
আমাদের পরিকল্পনা	৪৪০
আয়কর ফসল	১৯
আলু-উৎপাদনে প্রথম-পুরস্কারবিজয়ীদের বিবৃতি	১৪০
আলুতে ওষুধ ছিটানোর উপকারিতা	৬৭
আলুর পোকা	২১৫
আলুর রোগ	২০৯
ইক্ষু-উৎপাদনে প্রথম-পুরস্কারবিজয়ীদের বিবৃতি	১৫৫
উদ্ভিজ্জ সার	৫১২
উন্নত প্রণালীতে ধানের চাষ	২৫২
কচুর চাষ	৪৭৭
কলার খাবার	৩৩৯
কালনার আদর্শ গ্রামে	৮০
কালোজাম	১০২
কাঁঠাল	৯৬
কৃষি-উন্নয়নের অভিযানে ১৯৫৬-৫৭ সাল	৩১
ক্রেতাদের সমবায়	৬৪
কৃষ্ণনগর উদ্যানতত্ত্ব গবেষণাকেন্দ্র	৪৪৬
বাদ্যোৎপাদনে গন্ধক	১৬৩
গম-উৎপাদনে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা	৪৫৫
গম-উৎপাদনে প্রথম-পুরস্কারবিজয়ীদের বিবৃতি	১৫০
গ্রাইরিসিডিয়া স্যাকুলেটা	১২৪
চাষী ও বাজার	৭২
চীনে সমবায় কৃষি	২৪৬
চুঁচুড়া কৃষি-গবেষণাকেন্দ্র	৫০৮
ছাদের ওপর সবজিবাগান	২৪৯
ছোট এলাচ	৩৬৫
জমিদারী গ্রহণ পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ	২২৫
জৈব সারের ব্যবহার	২৩৫
ঝাউগাছ	১১৫
টুকিটাকি	৪১, ৮৫, ১৩১, ১৭২,

২২০, ২৫৯, ৩০২, ৩৪৮, ৩৯০, ৪৩৩, ৪৮০, ৫১৬

[দুই]

	পৃষ্ঠা
ডাঙ-হিল বনবিদ্যালয়	২৬৪
ডিম সংরক্ষণের সহজ উপায়	৩৩৫
ডিম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	২৬৯
ডাকাতের চাষ	৫০১
তেঁতুলগাছ	১০৯
ত্রিপুরায় জুমচাষ	২৪৩
‘দিগ্ভিজয়’	৩৭
ধান-উৎপাদনে প্রথম-পুরস্কারবিজয়ীদের বিবৃতি	১৩৫
ধানের গাছ লুটিয়ে পড়া	৫০৬
ধানের তিনটি রোগ	১৮৮
ধানের পোকা	১৭৯
নারকেলগাছ	১০৩
নারকেলগাছের রোগ আর পোকা	১৯১
নারকেলের কথা	৪৮
নিমগাছ	১১৯
পঞ্চচিকিৎসার শ্রাতকোস্তর পুনরনুশীলনপাঠ	৮২
পশ্চিমবঙ্গে কলার চাষ	৪২৩
পশ্চিমবঙ্গে জলবিদ্যুৎ সংগতি	৪৮৭
পশ্চিমবঙ্গে পশু-উন্নয়ন	৩৯৮
পশ্চিমবঙ্গে পালিত পশুপক্ষীর উন্নয়ন	৩৫৩
পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার	৮৩
পশ্চিমবঙ্গের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও তাহার আবশ্যিকতা	৩০৯
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান খাদ্যপরিস্থিতি	৩৭৭
পশ্চিম বাঙলার তাঁতশিল্প	৪৯
পরিশিষ্ট (বনমহোৎসব)	১২৭
পাট-সংকট ও পাটচাষের উন্নয়নকেন্দ্র	৪৯০
পাঠকপাঠিকাদের প্রতি	৪৭০
প্রাক্কলনীয় পশুপক্ষী-প্রদর্শনীতে নদিয়া জেলা	৩৮৭
প্রাক্কলনীয় পশুপক্ষী-প্রদর্শনীতে মেদিনীপুর কেন্দ্রের কৃতিত্ব	৩৮৯
পর্যায়	১০০
পেঁয়াজ	৩৩১
প্রদর্শনী	৩৯
প্রসঙ্গ	১, ৪৫, ৮৯, ১৩৩, ১৭৭, ২২৩, ২৬১, ৩০৫, ৩৪৯, ৩৯৩, ৪৩৭, ৪৮১
ফসল বৃদ্ধিতে সার	২৬১
বটগাছের আত্মকথা	৯
বনমহোৎসব	১২৫
বনমহোৎসবে গাছ লাগানোর হিসাব	১২৯
বনরচনার তাৎপর্য	১৫৭
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ	৩০৭
বন্য প্রতিরোধে উদ্ভিদের সার্থকতা	৪১৯
বর্ষণবৃষ্ণ	১২২
বাগছাড়া সুইসের উদ্যোজন	৩

	পৃষ্ঠা
বাবলাগাছ	১২৩
বালিয়া সমবায় বিবিস্তারক ও বিপণন সমিতি	১৩
বিভিন্ন স্থানে বনসহোৎসব	১৬৯*
বীজ-আলু	২৩৮
বীরভূমের খেঁড়ো	৫০৪
বৃক্ষের মূল্য	২৩০
ভারতে ধান্য-পবেষণা	২৯৮
ভারতের লেবু	৩৭৩, ৪২৯, ৪৪৮, ৪৯৭
ভাল জাতের বীজ-আলু	৩০১
ভূমি, বাদ্য ও পুনর্বাসন	৪০০
মহুয়া	২৯
মাছ কী রকম জল চায়	৩৬১
মিঠা কুমড়ার ফলন বাড়ানোর উন্নত পদ্ধতি	২৮৯
মোটক পদ্ধতি	২৭২
মেহগনি	১১৮
রাসায়নিক সারে আলুর ফলন ভাল হয়	৩৮৫
রেড়ির চাষ	৩৫
লক্ষ্যচাষের জারি গান	৩৬৭
লাল আলু বা মিষ্টি আলুর চাষ	৩৪১
লিঙ্গগাছ	৯৯
লেবুগাছ	১০৭
লোনা আর ক্ষারী মাটির শোধন	৭৬
শস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র	৩৯৫
শালগাছ	১১৩
শিমুল	১২১
শিঙগাছ	১১৬
সজনে বারো মাস	৪০৬
সবজির পোকা	২০১
গয়াবিন	৩৩৭
সমবায় পদ্ধতিতে কৃষির উন্নয়ন	৪৮৩
সমবায়ের মূলনীতি ও সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন অধ্যায়	৪১০, ৪৫৮
সহজে বৃক্ষের বীজ জন্মানো	২৫৮
গাম্ভীর্য কালের বন্যাদমন ব্যবস্থা	৩৪৪
সুন্দরবন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি	২২৭
সুপুত্রিগাছ	১০৫
সেগুনগাছ	১১১
স্বাধীনতা লাভের পরে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি	৪৯৩

পশ্চিমবঙ্গ

মৎস্য-চাষ বিভাগ

মৎস্য-চাষ সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা মর্শের জ্ঞান অথবা মাছের পোনা, কেরোসিন ল, জালের সূতা প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে তা মৎস্য-চাষ আধিকারিক (District Fishery Officer) অথবা সহ-মীনাধিকারিক (Assistant Fishery Officer) এর সহিত যোগাযোগ করুন অথবা পত্র লিখুন। তাঁহারা মনে আপনাদের সাহায্য করিবেন।

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসতির জ্ঞান নিম্নলিখিত দুই স্থানে একজন রোগা পুনর্বাসতি আধিকারিক (Rehabilitation Officer) আছেন। প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের খোঁজ করুন বা পত্র লিখুন।

স্বাক্ষর :—

পুনর্বাসতি আধিকারিক, বধমান।

পুনর্বাসতি আধিকারিক, মহাকরণ (Writers' Buildings), কলিকাতা।

ভারতীয় কৃষিগবেষণা পরিষদের 'ইণ্ডিয়ান ফার্মিং'

পত্রিকা পড়ুন

কৃষকদের মিজম্ব পত্রিকা এটি। ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্য জনসাধারণ এবং সরকার যেসব চেষ্টা করছেন আর যেসব গবেষণা হচ্ছে, তার সবকিছু জানতে পাবেন আপনি এই পত্রিকায়। সহজ ইংরেজীতে রচিত এর চিত্রগ্রাহী রচনাগুলি—ছাপা হয় নানা বর্ণে। 'ম্যান অফ দ্য মাল্শ', 'হিল্টস্ টু দ্য ফার্মার', 'কোশেনস্ উইথ্ অ্যান্সাস', প্রভৃতি নিয়মিত বিভাগ আছে এতে ; তা ছাড়া থাকে পশুপালন, মাছের চাষ, বনসম্পদ, বৃক্ষপালন প্রভৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে চমৎকার রচনা। সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং অন্যান্য উন্নয়নকার্যের মনোজ্ঞ আলোচনা থাকে এতে। 'ইণ্ডিয়ান ফার্মিং' কৃষকের বন্ধু।

মূল্য

প্রতি সংখ্যা—১০

বার্ষিক চাঁদা—৯

ছবিতে ভর্তি আর দৃ' রঙে ছাপা
এজেন্সির শর্তের জন্য আবেদন করুন

এই কুপন ডাকে পাঠিয়ে দিন

Business Manager :

INDIAN FARMING

Indian Council of Agricultural
Research, Queen Victoria Road,
New Delhi.

I am interested in the *Indian Farming*. Kindly enrol me as a member and send the first copy by V. P. P. covering Annual/Half-yearly subscription.

Name :

Address :

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগ

গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি পালন সম্বন্ধে কোন উপদেশ বা পরামর্শ প্রয়োজন হইলে পশুপালন-আধিকারিকের বা সহ-পশুপালন-আধিকারিকের (Live-Stock Officer বা Aast. Live-Stock Officer) নিকট অনুসন্ধান করুন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইহাদের কার্যাল আছে। নিচের তালিকায় দেখুন :

পূর্ব এলাকা

চব্বিশপরগনা— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : অ্যাগারসন
হাউস, আলিপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বারাসাত।

নদিয়া—

পশুপালন-আধিকারিক : : কৃষ্ণনগর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বেথুয়াডহরি।

মুর্শিদাবাদ—

পশুপালন-আধিকারিক : : বহরমপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : বেলডাঙ্গা।

হাওড়া ও হুগলি—

পশুপালন-আধিকারিক : : চুঁচুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক, হুগলি : চুঁচুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক (এইচ), হাওড়া :
পোঃ—উলুবেড়িয়া,
জেলা—হাওড়া।

পশ্চিম এলাকা

বর্ধমান— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : বর্ধমান।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

বাঁকুড়া—

পশুপালন-আধিকারিক : : বাঁকুড়া।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ওন্দাগ্রাম।

বীরভূম—

পশুপালন-আধিকারিক : : বোলপুর।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

মেদিনীপুর—

পশুপালন-আধিকারিক : : ঝাড়গ্রাম।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : কাঁথি।

উত্তর এলাকা

জলপাইগুড়ি— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : জলপাইগুড়ি।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ধুপগুড়ি।

পশ্চিম দিনাজপুর—

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : : রায়গঞ্জ।

মালদহ—

পশুপালন-আধিকারিক : : মালদহ।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

দার্জিলিং— কার্যালয়ের ঠিকানা

পশুপালন-আধিকারিক : : কালিম্পাং।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : ঐ

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : পেদুং।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : শিলিগুড়ি।

কোচবিহার—

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : কোচবিহার।

সহ-পশুপালন-আধিকারিক : মাথাভাঙ্গা।

পশ্চিম বাঙলার চাষীদের বীজ, সার ও কৃষিযন্ত্রাদি সরবরাহের জন্য সরকারী কৃষিভাণ্ডারের তালিকা

পূর্ব এলাকা			নাম	রেলওয়ে স্টেশন	ডাকঘর
নাম	রেলওয়ে স্টেশন	ডাকঘর	জেলা বীরভূম		
জেলা চব্বিশপরগনা			২১। সিউড়ি	সিউড়ি	সিউড়ি।
১। বারাসত	বারাসত	বারাসত।	২২। রামপুরহাট	রামপুরহাট	রামপুরহাট।
২। ডানমণ্ডহারবার	ডানমণ্ডহারবার	ডানমণ্ডহারবার।	জেলা বাঁকুড়া		
৩। বেহালা	মাঝেরআট	বেহালা।	২৩। বাঁকুড়া	বাঁকুড়া	বাঁকুড়া।
৪। বনগাঁ	বনগাঁ	বনগাঁ।	২৪। বিষ্ণুপুর	বিষ্ণুপুর	বিষ্ণুপুর।
৫। বসিরহাট	বসিরহাট	বসিরহাট।	জেলা মেদিনীপুর		
জেলা নদিয়া			২৫। মেদিনীপুর (উত্তর)	মেদিনীপুর	মেদিনীপুর।
৬। কৃষ্ণনগর	কৃষ্ণনগর সিটি	কৃষ্ণনগর।	২৬। বেলুদা (মেদিনীপুর) কণ্টাই রোড	কণ্টাই রোড	কণ্টাই রোড।
৭। রানাবাট	রানাবাট	রানাবাট।	২৭। ঝাড়গ্রাম	ঝাড়গ্রাম	ঝাড়গ্রাম।
জেলা মুর্শিদাবাদ			২৮। ঘাটাল	চন্দ্রকোণা রোড	ঘাটাল।
৮। কালি	খাগড়াবাট	কালি।	২৯। তমলুক	তমলুক (আউট এজেন্সি)	তমলুক।
৯। জঙ্গীপুর	জঙ্গীপুর রোড	রঘুনাথগঞ্জ।	৩০। কাঁথি	কণ্টাই রোড	কাঁথি।
১০। লালবাগ	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ।	উত্তর এলাকা		
১১। বহরমপুর	বহরমপুর কোর্ট	বহরমপুর।	জেলা পশ্চিম দিনাজপুর		
জেলা হাওড়া			৩১। রায়গঞ্জ	রায়গঞ্জ	রায়গঞ্জ।
১২। উলুবেড়িয়া	উলুবেড়িয়া	উলুবেড়িয়া।	৩২। বালুরঘাট	কালিয়াগঞ্জ	বালুরঘাট।
১৩। রায়কৃষ্ণপুর	হাওড়া	হাওড়া।	জেলা মালদহ		
জেলা হুগলি			৩৩। মালদহ	মালদহ কোর্ট	মালদহ।
১৪। শ্রীরামপুর	শ্রীরামপুর	শ্রীরামপুর।	জেলা জলপাইগুড়ি		
১৫। আরামবাগ	চাঁপাডাঙ্গা	আরামবাগ।	৩৪। জলপাইগুড়ি	জলপাইগুড়ি	জলপাইগুড়ি।
১৬। চুঁচুড়া	চুঁচুড়া	চুঁচুড়া।	৩৫। আলিপুর-দুয়ার	আলিপুর-দুয়ার	আলিপুর-দুয়ার।
পশ্চিম এলাকা			জেলা দার্জিলিং		
জেলা বর্ধমান			৩৬। দার্জিলিং	দার্জিলিং	দার্জিলিং।
১৭। বর্ধমান	বর্ধমান	বর্ধমান।	৩৭। কালিম্পাং	শিলিগুড়ি	কালিম্পাং।
১৮। আসানসোল	আসানসোল	আসানসোল।	৩৮। শিলিগুড়ি	শিলিগুড়ি	শিলিগুড়ি।
১৯। কালনা	বাগনাপাড়া	কালনা।	জেলা কোচবিহার		
২০। কাটোয়া	কাটোয়া	কাটোয়া।	৩৯। কোচবিহার	কোচবিহার	কোচবিহার।
			৪০। মাথাভাঙ্গা	কোচবিহার	মাথাভাঙ্গা।

‘বন্ধুন্ধরা’

(১) প্রকাশন স্থান—কলিকাতা।

(২) ক্রিয়াকারী সাময়িক পত্রিকা?—মাসিক পত্রিকা।

(৩) মাদ্রিকের নাম—শ্রীশুভেন্দ্র মদুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মদ্রুগের অধীক্ষক।

জাতি—ভারতীয়।

ঠিকানা—পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মদ্রুগ, ৩৮ গোপালনগর রোড, আলিপুর, কলিকাতা।

(৪) প্রকাশকের নাম—শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথদুর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার অধিকর্তা।

জাতি—ভারতীয়।

ঠিকানা—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগ, রাইটাস বিল্ডিংস, কলিকাতা।

(৫) সম্পাদকের নাম—শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথদুর।

জাতি—ভারতীয়।

ঠিকানা—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগ, রাইটাস বিল্ডিংস, কলিকাতা।

(৬) পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর অথবা মোট
মূলধনের শতকরা এক ভাগের
অতিরিক্ত অংশের অংশী-
দারগণের নাম।

} পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগ।

আমি, শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথদুর, এতদ্বারা জানাইতেছি যে, উল্লিখিত বিবরণসমূহ আমার
সর্বোত্তম জ্ঞান-বিশ্বাসমতে সত্য।

৮-৪-১৯৫৮

(স্বাঃ) প্রকাশস্বরূপ মাথদুর,
প্রকাশক

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-আধিকার

চাষ-আবাদ সংক্রান্ত যে-কোনও পরামর্শ বা উপদেশ অথবা ভাল বীজ, সার ইত্যাদি প্রয়োজন হইলে স্থানীয় মহকুমা কৃষি-আধিকারিকের (সাব-ডিভিশন্যাল এগ্রিকালচার্যাল অফিসার) সহিত সাক্ষাৎ করুন বা তাঁহাকে চিঠি লিখুন : তিনি সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন। নিম্ন-লিখিত স্থানে মহকুমা কৃষি-আধিকারিক আছেন :

পূর্ব এলাকা

চন্দ্রশপরগনা—আলিপুর—অ্যান্ডারসন হাউস, কলিকাতা-২৭। বসিরহাট। ডায়মন্ড-হারবার। বারাকপুর-বারাসত—পোঃ বারাসত। বনগাঁ।

নদিয়া—কৃষ্ণনগর। রানাঘাট।

মুর্শিদাবাদ—বহরমপুর। লালবাগ। জগদীপুর। কান্দী।

হাওড়া—২৫S. পদ্মানতলা রোড, হাওড়া। উলুবেড়িয়া।

হুগলি—চুঁচুড়া। শ্রীরামপুর। আরামবাগ।

পশ্চিম এলাকা

বর্ধমান—বর্ধমান। আসানসোল। কাটোয়া। কালনা।

বাঁকুড়া—বাঁকুড়া। বিষ্ণুপুর।

বীরভূম—সিউড়ি। রামপুরহাট।

মেদিনীপুর—মেদিনীপুর (উত্তর)—কেরানিটোলা। মেদিনীপুর (দক্ষিণ)—কেরানিটোলা ঘাটাল। ঝাড়গ্রাম। কাঁথি। তমলুক।

উত্তর এলাকা

জলপাইগুড়ি—জলপাইগুড়ি। আলিপুরদুয়ার।

মালদহ—মালদহ।

পশ্চিমদিনাজপুর—বালুরঘাট। রায়গঞ্জ।

দার্জিলিং—দার্জিলিং। কালিম্পাং। শিলিগুড়ি। কাসিমিয়াঙ।

কোচবিহার—কোচবিহার। মাথাভাঙ্গা।

বসুন্ধরা : চৈত্র : ১৩৬৪

রেজিঃ নং সি ৩৭১৫

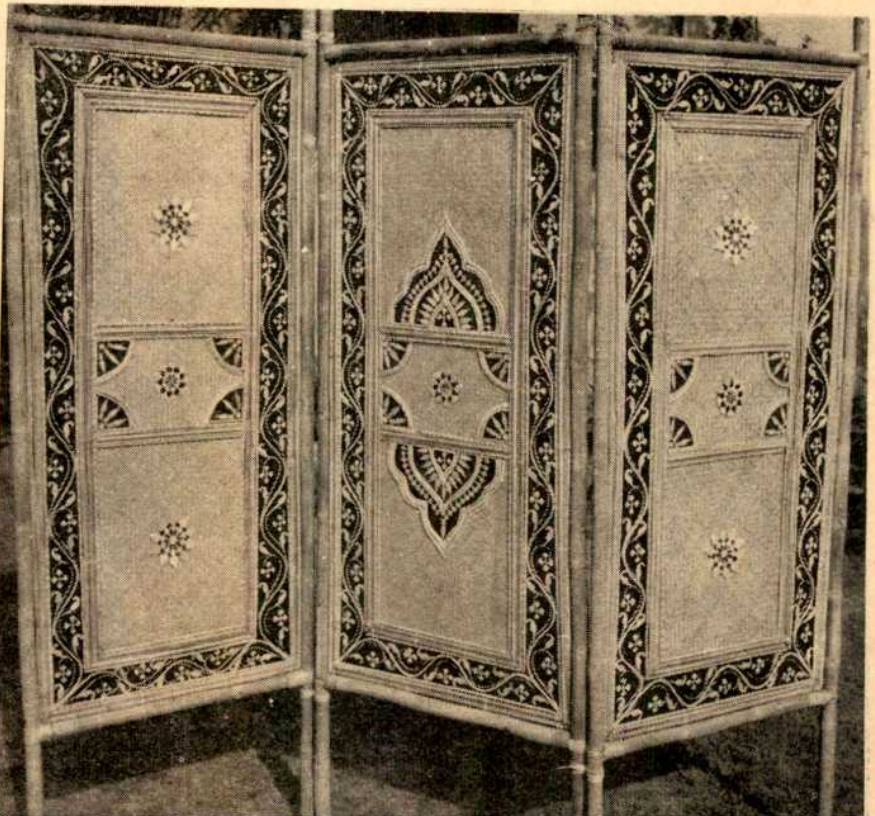
সম্পাদক : শ্রী প্রকাশস্বরূপ মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী
মুদ্রণে অধীক্ষক শ্রীশূভেন্দ্র মৃধোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য তিন আনা
বা ১৯ নয়া পল্লী
বার্ষিক দ্বাই টাকা



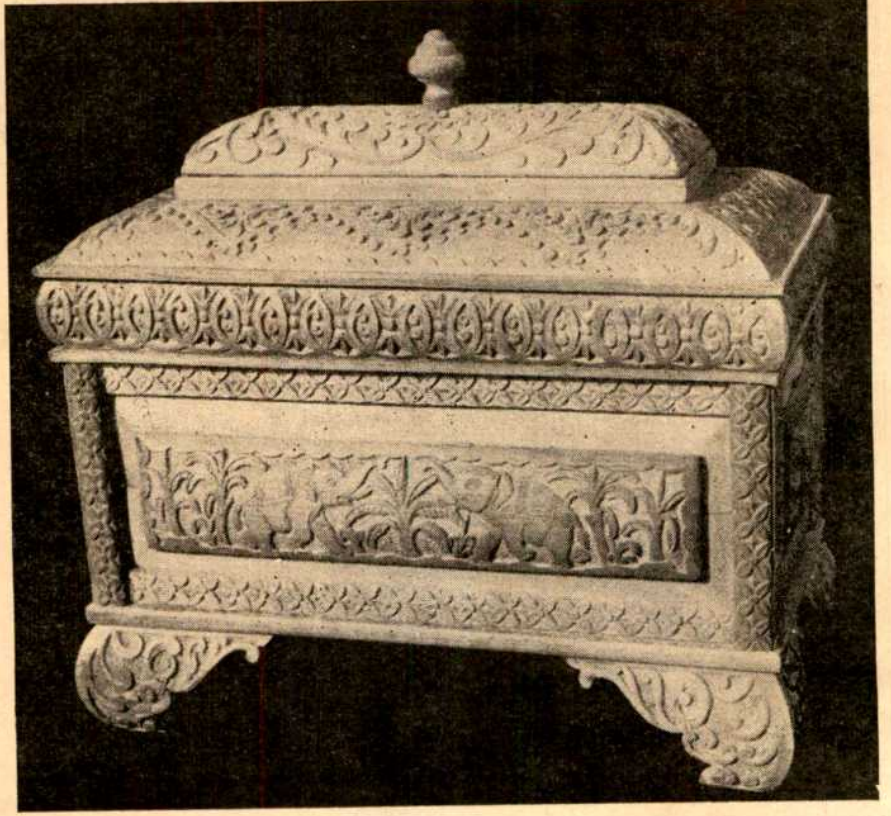
বাঁদিকেঃ বাঁশের কাঠি দিয়ে তৈরি চিকের ছবি। চিক
আমাদের পরিচিত জিনিস; কিন্তু এখানে তার উপর
যে চিত্রবিন্যাস হয়েছে তা লক্ষণীয়

নিচেঃ ভাঁজকরা বেটনী—এও সম্পূর্ণই বাঁশের তৈরি

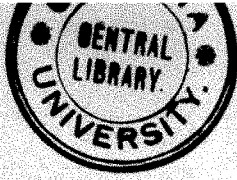


চন্দ্রশপথগনার কামার-
হাটিতে উদয় ভিলায়
যে সমবায় নারী
শিল্পাশ্রম রয়েছে,
সেখানে তৈরি হচ্ছে
এসব জিনিস

হাতির দাঁত নয়—
সেলুলয়েড বা
প্লাস্টিক নয়—চন্দন-
কাঠ বা অন্য কোন
বাহারী কাঠও নয়—
বাঁশ থেকে তৈরি
হয়েছে এসব মনোরম
জিনিস



বাঁশ আমাদের কত কাজে লাগে তা বলে
শেষ করা যায় না—সেই বাঁশ থেকে আবার
এসব হাতের কাজও করা যায় অতি
সুন্দরভাবে



বসুন্ধরা

১০ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৬৪

প্রসঙ্গ

বাঙলা এই ১৩৬৪ সালে 'বসুন্ধরা' দশম বর্ষে পদার্পণ করল। নববর্ষে এ উপলক্ষে আমরা 'বসুন্ধরা'র সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, শ্রুতানুধ্যায়ী এবং দেশের সকল অধিবাসীকে, বিশেষ করে পল্লীবাসী ভাইবোনদের, আন্তরিক শুভকামনা ও অভিনন্দন জানাই।

বিশেষ করে পল্লীবাসীদের উল্লেখ করা এইজন্য যে, পল্লীর সঙ্গেই আমাদের নিবিড় সংযোগ। আমাদের পত্রিকায় পল্লী-অর্থনীতির বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়। আর, পল্লীর মধ্যেই তো রয়েছে দেশ। দেশের উন্নয়নের অর্থ মূল্যবান পল্লীরই উন্নয়ন।

পল্লীর আর্থনীতিক উন্নয়নের প্রধান কথা হচ্ছে কৃষির উন্নয়ন। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। কৃষি বলতে ধান গম ডাল আলু শাকসবজি প্রভৃতি খাদ্যফসলের চাষ করলেই চলবে না, পাট আখ তুলো তৈলবীজ প্রভৃতি অর্থকর ফসলের চাষও করতে হবে। ফলের চাষ, ফুলের চাষ, পশুপালন, পাখির চাষ—এসবও কৃষিকাজের মধ্যে গণ্য। কৃষিতে মানুষের খাদ্যের উৎপাদন যেমন করতে হবে, তেমনি পশুপাখির খাদ্যও জন্মাতে হবে। বৃক্ষরোপণ আর অরণ্যগঠনেরও নিকট-সংযোগ কৃষির সঙ্গে। তরুলতা পল্লীরই বিশেষ সম্পদ। মাছের চাষও কৃষিকার্যের অন্তর্ভুক্ত শ্রদ্ধা ওর মধ্যে 'চাষ' কথাটা আছে বলেই নয়। মাছের চাষে যে জলার দরকার, ক্ষেতি কৃষিকাজেও তার প্রয়োজন একান্ত।

পল্লীর অর্থনীতি মূল্যবান এই কৃষির উপর নির্ভরশীল হলেও, পল্লী-অঞ্চলে কুটিরশিল্পের গুরুত্ব তার চেয়ে কম নয়। আমাদের দেশে যে

ধারায় কৃষিকাজ চলছিল, তাতে কৃষকেরা বছরের মধ্যে বড়জোর পাঁচ মাস চাষ-আবাদে লিপ্ত থাকতেন এবং বাকি সাত মাস থাকতেন বেকার। কিন্তু আমাদের রাজ্যে লোকসংখ্যার অনুপাতে চাষের জমির পরিমাণ কম; কাজেই জমি থেকে বছরে শ্রদ্ধা একটা ফসল তুললেই চলবে না। জমি খালি ফেলে না রেখে, একটা ফসল উঠলেই তাতে আর একটা ফসল লাগিয়ে অবিরাম চাষ চালিয়ে যেতে হবে—এ সত্যটি আজ অনেক কৃষকই বুঝতে পেরেছেন, আর সেই অনুসারে অনেকে কাজও করে চলেছেন। কিন্তু নিবিড় চাষ করে যারা একই জমি থেকে বছরে দুটো-তিনটে ফসল তুলছেন, তাঁদেরও কিছুটা সময় সপরিবার বেকার থাকতে হয়।

চাষ-আবাদের গৃহস্থালীর সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন, এসব পরিবারে নগদ পয়সার খুবই অভাব। খুব বড় কোন চাষী-গৃহস্থের বাড়িতে দিনের মধ্যে কোন অসময়ে কোন অতিথি উপস্থিত হলেও, তাকে নানা রকমের চর্বা-চুষা লেহা-পেয় দিয়ে আপ্যায়ন করতে গৃহস্থের অসুবিধা হয় না; কিন্তু নগদ কয়েক গুণ্ডা পয়সা বের করতে হলে অনেক সময় এঁদের বড়ই মর্শকিলে পড়তে হয়। এই অর্থান্ধারের দরুন অনেক সময় চাষীকে সঞ্চিত বীজশস্য বিক্রি করে ফেলতে হয় এবং চাষের কাজে যথাকালে তিনি বীজ সংগ্রহ করতে পারেন না, সার যোগাড় করতে পারেন না, সেচের ব্যবস্থা করতে পারেন না।

চাষের কাজ করে যে-সময়টা চাষী বেকার হয়ে পড়েন, সেই সময়টাকে কুটিরশিল্পের কাজে লাগালে আর্থিক সমস্যাটার সমাধান হয়ে যেতে পারে।

বিদেশী শাসনের আমলে এদেশের পল্লী, তার কৃষি, তার কুটিরশিল্প অবহেলিত হয়েছিল, তাই আমাদের পল্লীদেশের এই শোচনীয় অবস্থা। আজ কৃষির সঙ্গে দেশের অগণিত প্রকারের কুটিরশিল্পকেও পুনরুজ্জীবিত করে পল্লীদেহে প্রাণের সঞ্চার করতে হবে। পল্লী-অর্থনীতির ক্ষেত্রে কৃষির পরেই অথবা কৃষির মতই অপরিহার্য হচ্ছে কুটিরশিল্প।

এই কথাটি একান্তভাবে উপলব্ধি করেই দেশের জাতীয় সরকার পল্লী-অঞ্চলে কৃষি আর কুটিরশিল্প—দু'এরই উন্নয়নে হস্তক্ষেপ করেছেন একই সঙ্গে। কৃষির দিকে যেমন উন্নত জাতের নীরোগ পুষ্ট বীজ, ভাল সার, সেচের জল প্রভৃতির যোগান দেওয়া, সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষিক্ষণ দেওয়া, ধার হিসাবে রাসায়নিক সার যোগানো ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তেমনি কুটিরশিল্পের উন্নয়নের জন্যও অর্থ-ঋণ, যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন উপাদান প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হচ্ছে। পল্লীবাসীরা এসবের সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদের বৈষয়িক উন্নয়নে তথা পল্লীর উন্নয়নে একাগ্রভাবে রতী হলেই দেশ আবার সোনার দেশ হয়ে উঠবে।

কিছুকাল আগে পর্যন্তও গ্রামাঞ্চলে কোথাও কোথাও এমন চাষী-গৃহস্থ দেখা যেত—যাঁদের মাঠভরা ফসল, গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গোরু, পুকুরভরা মাছ, বাগানভরা ফলফুল নিয়ে ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ সংসার। খাদ্যের দিক দিয়ে তাঁদের নুন আর এদেশে জন্মায় না এমন দ্রু-একটা মসলা

ছাড়া আর কিছু কিনতে হ'ত না। বাড়িতে ঘানি ছিল, তা দিয়ে চাষের সরসোঁতল থেকে তেল নেওয়া হ'ত। বাগানের গাছে কাপাসতুলো জন্মাত, চরকি দিয়ে বীজ ছাড়িয়ে, ধনু দিয়ে ধুনে, সেই তুলোর পাঁজ করে চরকায় তকলিতে সূতো কাটা হ'ত। বাড়িতে ছিল ঠকঠাক তাঁত—তাতে কাপড় বোনা হ'ত। সেই পূর্ণতা ফিরিয়ে আনার সাধনা আবার করতে হবে। কিন্তু একক সংসারে নয়। এখানে-ওখানে শ্রু-এক-একটা বড় বড় ঘরে পূর্ণতার সাধনা চলেছিল বলেই তার সিম্ধিটা স্থায়ী হয় নি। আজকের দিনে এক-একটা গোটা এলাকা জুড়ে সেই পূর্ণতার সাধনা চালাতে হবে, এবং তার মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করতে হবে সমবায়কে। অসাধ্যসাধন করতে পারে এই সমবায়। সকলে মিলে সান্মিলিত প্রচেষ্টায় কাজ করাকেই বলে সমবায়।

এই সমবায়ের নীতিতে সারা দেশকে সংগঠিত করার জন্য প্রতি রাজ্যসরকারের রয়েছে পৃথক সমবায়-বিভাগ। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও রয়েছে। সর্বত্র সমবায়-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সাহায্য করার জন্য এই বিভাগ সদা-উন্মুখ। পৃথিবীর অনেক প্রগতিশীল দেশের দিকে তাকালেই দেখা যায়, সমবায়ের মধ্য দিয়ে সকল ক্ষেত্রেই তাঁরা অসামান্য উন্নতি করেছেন।

আমাদের পল্লীদেশেও কৃষি আর কুটিরশিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এই সমবায়ের পথ ধরে। নববর্ষে আসুন আমরা নতুন সংকল্প নিয়ে সেই অভিযাত্রায় অগ্রসর হই।



বাগজলা সুইসের উদ্বোধন

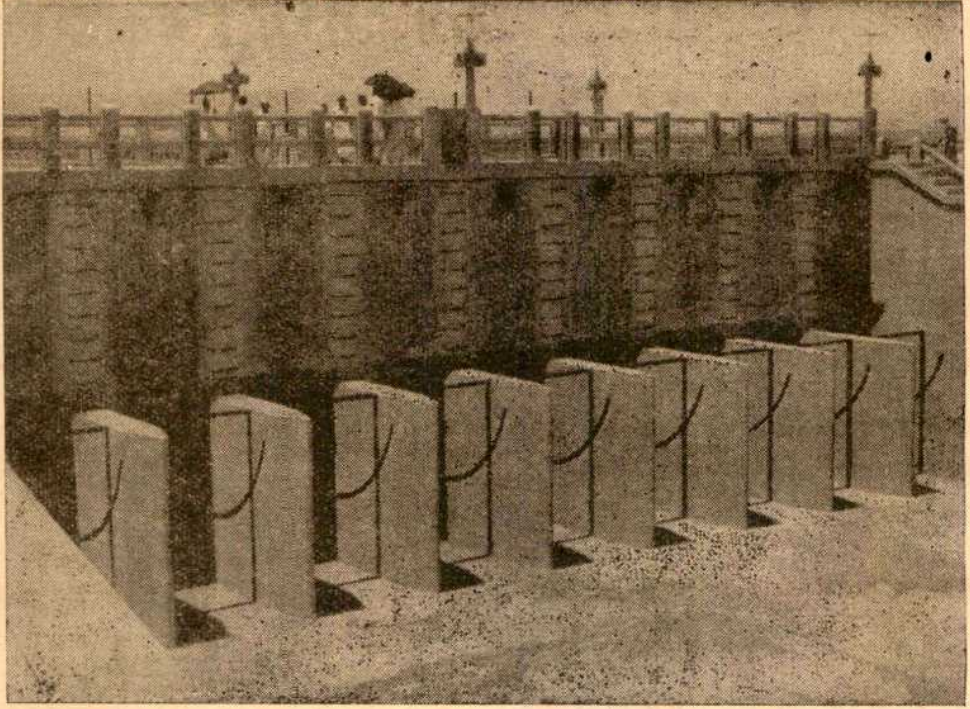
বাগজলা-ঘুনি-যাত্রাগাছি পরিকল্পনার বাগজলা-সুইসটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে ২৪ এপ্রিল। আঠারো মাইল দীর্ঘ প্রধান খাল ও কুলাটি নদীর সংযোগস্থলে, কুলাটিতে এই সুইস-গেট স্থাপিত হয়েছে। এর উদ্বোধন করেন পশ্চিম-বঙ্গের সচ ও জলপথ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীঅজয়-কুমার মধুপাধ্যায়। তিনি সুইসটির দ্বার মূর্ত্ত ক'রে দিলে কুলাটি নদীতে জলনিকাশ শুরু হয়। বাগজলা-সুইসের কাজ সমাপ্ত হওয়ার ফলে বাগজলা-ঘুনি-যাত্রাগাছি পরিকল্পনার শতকরা ৮৫ ভাগ কাজ সমাপ্ত হ'ল।

উদ্বোধন উপলক্ষে, সমবেত জনমণ্ডলীর সমক্ষে ভাষণে সচমন্ত্রী বলেনঃ

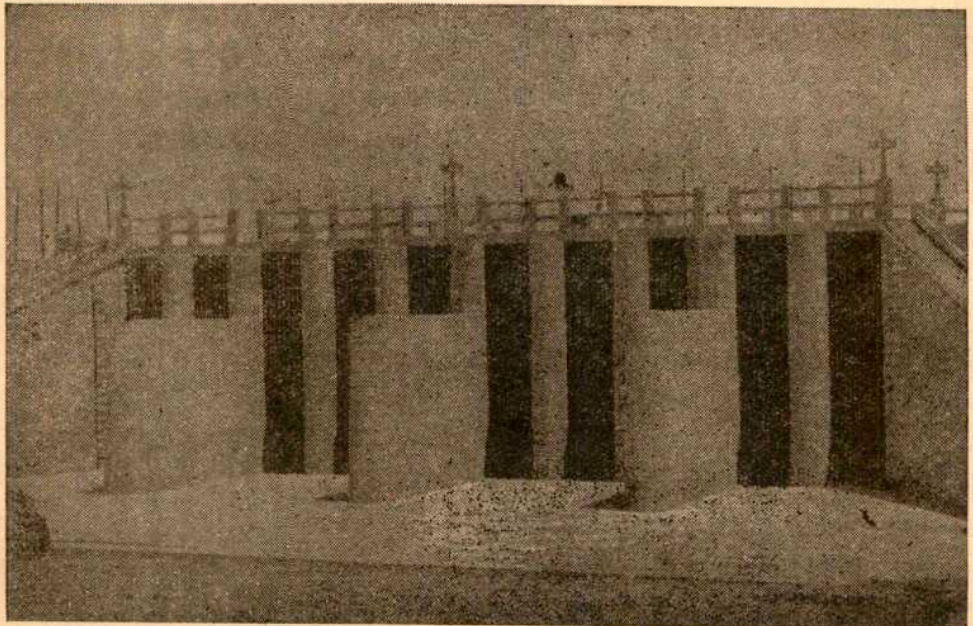
“আমাদের পশ্চিম বাঙলা নদীমাতৃক। হাজার হাজার বছর ধরে পাহাড়পর্বত থেকে নদীপথে ধুয়ে-আসা পলিমাটি দিয়ে নিম্নবর্ণ গড়ে উঠেছে। এক সময় গঙ্গানদী ভাগীরথীর খাতে বয়ে যেত, প্রকৃতির বিপর্যয়ে সে নদী পশ্চিম পথে ঘুরে গিয়েছে। ভাগীরথী, জলঙ্গী, চূর্ণী, মাথাভাঙ্গা, যমুনা, বিদ্যাধরী, ইচ্ছামতী, সরস্বতী প্রভৃতি বহু নদী এই গঙ্গারই শাখা। আবার মধ্যবিহারের পাহাড়গুলি থেকে বেরিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গের ভিতর দিয়ে ভাগীরথী-হুগলীতে পড়েছে ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, দারকেশ্বর, শিলাবতী, কংসাবতী প্রভৃতি নদী। অসংখ্য শিরা-উপশিরায় রক্ত চলাচল করে যেমন মানুষের দেহকে বাঁচিয়ে রাখে, পুষ্ট করে—ঠিক তেমন করেই এই নদীগুলি ও তাদের অসংখ্য শাখাপ্রাশা পশ্চিম বাঙলাকে শস্যশ্যামলা করে রেখেছিল, তাকে শিল্পবাণিজ্যে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। এই নদীগুলির কূলে কূলে গড়ে উঠেছিল সুখী বাঙালীর বহু শহর ও জনপদ। গঙ্গানদী তার গতিপথ পরিবর্তন করায় এবং প্রকৃতির নিয়মে এই নদীগুলির বৃদ্ধি পলিমাটি

জমে ওঠায় এদের অনেকগুলি একেবারে মজে গেছে, অনেকগুলি মরে আসছে। এমনকি ভাগীরথী-হুগলী ও রূপনারায়ণের অবস্থাও গভীর চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ হয়েছে। শরীরের শিরা-উপশিরা অকর্মণ্য হ'লে মানুষের দেহে যেমন রোগ দেখা দেয়, পচন ধরে, সেই রকমই পশ্চিম বাঙলার প্রাণপ্রণালী-স্বরূপ এই নদীগুলি মজে গিয়ে তার চাষবাস নষ্ট করেছে, কতকগুলি খাল বিল ও বন্য জলার সৃষ্টি করে তাকে ম্যালেরিয়ারাক্রান্ত করে তুলেছে। মহানগরী কলিকাতার পাশেই উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণে যমুনা, বিদ্যাধরী, পিয়ালী প্রভৃতি নদীগুলি মজে গিয়ে বিরাট জলবন্থ ও অস্বাস্থ্যকর এলাকার সৃষ্টি করেছে। এইগুলিকে উদ্ধার করে চাষবাসের উপযোগী স্বাস্থ্যকর পল্লী-অঞ্চলে পরিণত করার জন্য সুদক্ষ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা জাতীয় সরকার কতকগুলি পরিকল্পনা রচনা করেছেন। ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সোনারপুর-আরাপাট পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে; তাতে এসিয়ার মধ্যে বৃহত্তম বৈদ্যুতিক পাম্প বসিয়ে ৩৬ বর্গমাইল এলাকার জলনিকাশের ব্যবস্থা হয়েছে। ৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায় আগামী জুন মাসে শেষ হবে ব'লে আশা করা যায়; তাতে ৩৬ বর্গমাইল এলাকার উপকার হবে।

“আজকে যে বাগজলা-ঘুনি-যাত্রাগাছি জলনিকাশ পরিকল্পনার শ্রুত উদ্বোধন উপলক্ষে আপনারা এখানে সমবেত হয়েছেন, তাতে ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১৬ বর্গমাইল এলাকার উপকার হবে, তার মধ্যে ১৭ বর্গমাইল হ'ল শহর-অঞ্চল। হুগলী নদী থেকে কুলাটিগাও পর্যন্ত বিস্তৃত এই এলাকা চব্বিশপরগনা জেলার বরানগর, খড়দহ, দমদম, রাজারহাট, ভাঙ্গাড ও হাড়েয়া থানার মধ্যে অবস্থিত। এই এলাকার কোন কোন অঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র এক ফুট উঁচু, আবার কোন কোন স্থান ২০ ফুট উঁচু।



বাগজলা-ঘুনি-যাত্রাগাছি পরিকল্পনার অন্তর্গত বাগজলা-স্লুইস। ২৪এ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের সচিবমন্ত্রী
শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এর উদ্বোধন করেন।



“বাগজলা পরিকল্পনায় জলনিকাশের জন্য দু’টি পৃথক ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম ব্যবস্থায় হাড়োয়া ও ভাঙ্গড় থানার প্রায় ৩১.৫ বর্গমাইল এলাকার জলনিকাশ হবে। কুলগাছি গ্রামে কুলটি গাঙের ওপর একটি স্লুইস গেট করা হয়েছে, যার ভিতর দিয়ে ৭১৩ ঘনফুট জল প্রতি সেকেন্ডে বেরিয়ে যেতে পারবে। ৬.৮ মাইল মূল খাল ও ৪.৫ মাইল পাশ-খালের সাহায্যে এই এলাকার জল বার করা হবে। এই ব্যবস্থার মধ্যে ৪টি রেগুলেটর, ১১টি ইন্লেট, ৬টি গাড়ি-চলার পোল ও ৩টি পায়ে-চলার পোল তৈরি হয়েছে।

“এই পরিকল্পনার দ্বিতীয় ব্যবস্থায় বাকি ৮৪.৫ বর্গমাইল এলাকার জলনিকাশ করা হবে, তার মধ্যে ১৭ বর্গমাইল হ’ল শহর-অঞ্চল। এর জন্য যে মূল খাল কাটা হয়েছে তার দৈর্ঘ্য হ’ল ১৮ মাইল। পাশখালগুলি ২৬ মাইল লম্বা। এ ছাড়া, পুরাতন কৃষ্ণপদ-ভাঙ্গড় কাটা-খালের ২১ মাইল অংশের সংস্কার হয়েছে এবং একটি ছোট খাল কেটে নতুন মূল খালের সঙ্গে একে যুক্ত করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় ১০টি রেগুলেটর, ৪৭টি, ইন্লেট, ১টি এস্কেপ, ৪টি বড় পোল, ২২টি গাড়ি-চলার পোল ও ৫টি পায়ে-চলার পোল তৈরি হয়েছে। নতুন মূল খালের মধ্যে কুলটি গাঙের ওপর একটি নতুন ১০ ফুটের স্লুইস গেট করা হয়েছে, প্রত্যেক ফুটের চওড়ায় ৫ ফুট ও উচ্চতায় ৮ ফুট করে। এইগুলির ভিতর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ২,০৮০ ঘনফুট জল বেরিয়ে যেতে পারবে। প্রথমে মাটির নিচে ১৬ ইঞ্চি ব্যাসের গড়ে ৬৫ ফুট লম্বা ৬০৯টি কংক্রীটের খুঁটি চালিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার ওপরে কংক্রীটের কাঁড় দিয়ে তারপর ৩০ ইঞ্চি পুরু কংক্রীটের ঢালাই করে সেই ভিতের ওপর এই স্লুইস গেট তৈরি হয়েছে।

“এই পরিকল্পনার রূপায়ণে মোট ১১৬ বর্গ-মাইল উপকৃত এলাকার আবাদী জমির মধ্যে প্রায়

১৬,০০০ একর পূর্ণ উপকার পাবে এবং প্রায় ১৬,৬৪০ একর জমির আংশিক উপকার হবে। এই উপকারের ফলে প্রতি বছর বাড়তি ফসল আশা করা যায়—ধান ৪,৮৬,০০০ মণ, খড় ঐ পরিমাণ এবং রবিশস্য ৬২,০০০ মণ। এইগুলির আনুমানিক বাজারদর ৬৯ লক্ষ টাকা। তা হ’লেই দেখা গেল, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ঋণহিসাবে গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই যে বাগজলা পরিকল্পনাকে আজ রূপ দিলেন, তাতে ৬৯ লক্ষ টাকা মূল্যের শুদ্ধ শস্যসম্পদ প্রতি বছর দেশবাসী পাবেন, যদিও রাজ্যসরকারের এই ঋণ পরিশোধ করতে বহু বছর লেগে যাবে। স্বাস্থ্যোন্নতি, যাতায়াতের সুবিধা প্রভৃতি আরও যেসব উপকার হবে, সেগুলিকে টাকার অঙ্কে ধরা যায় না। এ ছাড়া বহু বাস্তুহারার পুনর্বাসন সম্ভব হবে এই পরিকল্পনায়।”

পশ্চিমবঙ্গের সেচ ও জলপথ বিভাগের মদ্য বাস্তুকার প্রীতমতলাল দাস মিন্দ্রমহোদয়ও সমবেত জনগণকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে বলেনঃ

“দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিম বাঙলায় যেসব জলনিকাশ পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে, ‘বাগজোলা-ঘুনি-যাত্রাগাছি’ তাদের অন্যতম। বহুকাল আগে থেকেই এই পরিকল্পনাটির প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল, কিন্তু প্রাক-স্বাধীনতা যুগে বহু আবেদন-নিবেদন করেও স্থানীয় অধিবাসীরা এ বিষয়ে কৃতকার্য হ’তে পারেন নি। বর্তমান সরকার কার্যভার হাতে নিয়েই জনকল্যাণের জন্য সেচ ও জলনিকাশের যে সুবিপুল কার্যতালিকা গ্রহণ করেন এই পরিকল্পনাটি তার মধ্যে প্রধান একটি।

“খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যেদিন গঙ্গার জলস্রোত ভাগীরথীর কোল পরিত্যাগ করে পূর্ববাহিনী হয়ে পশ্চিম স্রষ্ট করেছিল, সেইদিন থেকে পশ্চিম স্রষ্ট শীর্ণ হ’তে লাগল, আর ভাগীরথী শীর্ণ হ’তে শীর্ণতর হয়ে

ক্রমে গঙ্গার জলধারা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হ'ল। আজ চতুর্থ বর্ষের সামান্য দৃ-চার দিন বাদ দিলে, ভাগীরথীর গর্ভে গঙ্গার জল আর চলে না।

“ভাগীরথীর ক্রমাবনতির সঙ্গে সঙ্গে তার শাখা যমুনা, সরস্বতী, বাগজোলা, বিদ্যাধরী প্রভৃতি শাখাগুলি একের পর এক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সরস্বতীর জলধারা এখন জ্যামিতিক সরলরেখায় পর্যবসিত। যমুনার উত্তাল তরঙ্গমালাও থেমে গিয়েছে। আছে শুধু কচুরিপানায় পূর্ণ স্তম্ভ জলরাশির অন্তরালে ম্যালেরিয়াবাহী মশকের নিত্য কোলাহল।

“পশ্চিম বাঙলার নদীনালাগুলির এই অপমৃত্যুর জন্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই বিশেষভাবে দায়ী সন্দেহ নেই, কিন্তু সেইটাই একমাত্র কারণ নয়। মানুষের অদূরদর্শিতাও এর জন্য কতকাংশে দায়ী। নদীর সংলগ্ন জমিগুলিতে রাতারাতি ফসল ফলাবার লোভে নদীর উভয় তীরে বাঁধ বেঁধে জমিগুলোকে বন্যা ও জোয়ারের জলের সংস্পর্শ থেকে বাঁচাবার রীতি বহুকাল ধরেই চলে আসছে। এর ফলে নদীসংলগ্ন জমিতে পলিবিস্তারের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। পশ্চাতীরে নদীগর্ভে পলি সঞ্চিত হয়ে নদীতল ক্রমেই উঁচু হয়ে যায়। পূর্বে গঙ্গার প্রবল জলস্রোতে নদীর তলাকার পলি ধুয়ে মূছে সমুদ্রে চলে যেত। ফলে নদীর তলা থাকত যথেষ্ট গভীর; সেই গভীর খাতে পার্শ্ববর্তী জমির জলনিকাশ হ'ত। কিন্তু বর্তমানে গঙ্গার জলস্রোত স্লিয়মাণ হওয়ায় নদীর তলদেশ যেমন ভরাট হয়ে যাচ্ছে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে জোয়ার-জলের উচ্চতা বেড়ে উঠছে। কিন্তু নদীসংলগ্ন নিম্ন অঞ্চলগুলো বাঁধের আড়ালে চিরকালের জন্য নিচু থেকে যাচ্ছে। জোয়ারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নদীর বাঁধগুলিও ক্রমেই উচ্চতর হচ্ছে। উচ্চতার এই পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পায়, বন্যার ফলে অথবা জোয়ারের চাপে ঐ বাঁধ ভেঙে গেলে ক্ষতির পরিমাণও হয়ে ওঠে ততই বেশি ভয়াবহ। এই দৃশ্য আপনারা দেখতে পাবেন

সমগ্র সুন্দরবন-অঞ্চলে। সম্মুখে দৃষ্টিপাত করলেই যে সুবিপদল বাঁধটি আপনারা দৃষ্টিগোচর হবে, তা কুলটি নদীর বাঁধ। কিছুকাল আগে বাঁধটি এত উঁচু ছিল না। নদীর তলাও যথেষ্ট গভীর ছিল। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে, নদীতীরের বাঁধটি তত উঁচু ও মজবুত করার প্রয়োজন হচ্ছে। বর্তমানে জোয়ারের জল এবং আপনারা পাশের জমির সমতলের পার্থক্য প্রায় ১০ ফুট। এই অবস্থায় বাঁধ ভেঙে গেলে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয় তা সহজেই অনুমেয়। স্বাভাবিক অবস্থায় নদী প্রবাহিত হ'লে পলি-বিস্তারণে পার্শ্ববর্তী জমির সমতল উঁচু হবার সুযোগ পায়। ফলে ঐসকল জমির জল পার্শ্ববর্তী নদীগর্ভে নিকাশ হ'তে কোন অসুবিধার সৃষ্টি করে না। কিন্তু বাঁধ-বাঁধার অদূরদর্শিতার ফলে নদীর জোয়ার-জলের তুলনায় জমিগুলি রয়ে গেছে অনেক নিচু। অতএব ধান-ক্ষেতের জলনিকাশ এক মহা সমস্যায় পরিণত হয়েছে। একমাত্র ভাঁটার সময় নদীর জল যখন অনেকটা নেমে যায় তখনই জলনিকাশ সম্ভব হয়।

“আজ দশমী তিথির পূর্বাহ্ন। এখনও নদীতে জোয়ার রয়েছে। এই অবস্থায় বাগজোলা স্লুইস উন্মুক্ত করলে খালের জল নদীতে নিকাশ এখনই সম্ভব হবে না। আরও কিছুক্ষণ পরে ভাঁটায় জল যথেষ্ট নেমে গেলে তবেই জলনিকাশ সম্ভব হবে। এই অবস্থার সঙ্গে সংগতি রাখতে গেলে স্লুইসের সাহায্যে জলনিকাশ করা সব সময় সম্ভব হয় না। এই বাগজোলা স্লুইস চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে, কম-বেশি এগারো ঘণ্টা জলনিকাশ করতে সক্ষম। এতে স্লুইসের ব্যয় অত্যধিক বেড়ে যায়। অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টা জলনিকাশ হ'লে যে খরচ পড়ত, বর্তমান অবস্থায় তার চেয়ে ব্যয় হবে অনেক বেশি। এই অবস্থা আপনারা দেখতে পাবেন চব্বিশপরগনার অধিকাংশ অঞ্চলে। কলিকাতা ও নিকটস্থ অঞ্চলের নদীনালাগুলি ধুঁস হয়ে গেছে অত্যন্ত দ্রুত তালে, কারণ মহানগরীর নিকটে বলে এখানে মানুষের

আর্থনীতিক স্বার্থও বেশি। নদীও জলপথে স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ করে জলনিকাশ-সমস্যাকে এখানে অতি জটিল করে তুলেছে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য বর্তমান সরকার বৃহত্তর কলিকাতা প্রায়োগিক সমিতি (Greater Calcutta 'Master Plan' Technical Committee) নিয়োগ করেন। উক্ত কমিটি কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলের জল-নিকাশের জন্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেকগুলি পরিকল্পনা রচনা করেছেন। বর্তমান বাগজোলা-ঘুনি-যাত্রাগাছি পরিকল্পনা তার অন্যতম। এই পরিকল্পনায় ১১৬ বর্গমাইল জমির অতিরিক্ত জলনিকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে সতেরো বর্গমাইল জমি শহর-তলিতে অবস্থিত। দমদম, বরাহনগর, কামারহাটি মিউনিসিপালিটি এবং কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের একাংশ এই সতেরো বর্গমাইলের মধ্যে। গ্রামাঞ্চলের জমির পরিমাণ ৯৯ বর্গমাইল। চম্বিশপরগনা জেলার দমদম, রাজারহাট, ভাঙ্গড় ও হাড়োয়া থানার এলাকায় এইসকল জমি অবস্থিত।

“বিগত শতাব্দীর শেষভাগেও এই অঞ্চলের জল-নিকাশ-সমস্যা ততটা প্রবল হয়ে আত্মপ্রকাশ করে নি। এইসকল জমির জল বিদ্যাধরী নদী দিয়েই নিকাশ হ’ত। কিন্তু ক্রমে বিদ্যাধরী ম’জে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জলনিকাশ-সমস্যা দেখা দিতে লাগল। সমস্যাটি একেবারে অচল অবস্থায় এসে দাঁড়াল তখনই—যখন নৌ-চলাচলের সুবিধার জন্য তখনকার প্রদেশ-সরকার কৃষ্ণপদ-ভাঙ্গড় কাটাখালের পরি-কল্পনায় হাত দেন। উক্ত খালটি বাগজোলা-অঞ্চলের জলনিকাশের পথ রুদ্ধ করে দেয়। ১৯১০ সালে উক্ত খালের কাজ সমাধা হয়। তখন থেকেই বাগজোলা-অঞ্চলে জলনিকাশ-সমস্যার আরম্ভ। কতকটা জোড়াতালি হিসাবে জলনিকাশের জন্য কৃষ্ণপদ খালের পূর্বতীরে ক্ষুদ্রাকৃতি পাঁচটি এবং পশ্চিমতীরে ঠাকুরদাড়ী গ্রামে একটি বৃহৎ রেগুলেটর তৈরি করা হয়। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর দ্বিংশ শতকের প্রারম্ভে বিদ্যাধরী সম্পূর্ণ

নিশ্চিহ্ন হয়। সঙ্গে সঙ্গে জলনিকাশ-ব্যবস্থাও অচল হয়ে যায়।

“বাগজোলা এলাকা সমুদ্রপৃষ্ঠ হ’তে এক ফুট থেকে বিশ ফুট পর্যন্ত উচ্চে অবস্থিত। এই অসম অঞ্চলে জলনিকাশের সুবিধার জন্য সমগ্র এলাকাটিকে দু’ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমাংশের এলাকায় শহরতলির সতেরো বর্গমাইল এবং গ্রামাঞ্চলের ৬৭ বর্গমাইল জমি রয়েছে। ১৮ মাইল দীর্ঘ একটি প্রধান খালের এবং মোট ২৬ মাইল দীর্ঘ আটটি শাখা খালের সাহায্যে এই অংশের জল কুলটি নদীতে নিকাশ হবে। উক্ত প্রধান খাল ও কুলটি নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত বাগজোলা স্লুইসটির উদ্বেখন উপলক্ষে আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। এই স্লুইসটির সবগুলি দ্বার একসঙ্গে উন্মুক্ত করলে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২,৩৮০ ঘনফুট জল নিষ্কাশিত হবে। জোয়ারের জল যাতে জমিতে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য ১০টি স্বয়ংক্রিয় কপাট লাগানো হয়েছে। এই স্লুইসটির বনিয়াদ ৬০৯টি সিমেন্ট কংক্রিট পাইলের উপর অবস্থিত। পাইলগুলির উচ্চতা গড়ে ৬৫ ফুট। স্লুইসটির নির্মাণব্যয় কমবেশি ১৫ লক্ষ টাকা।

“পরিকল্পনার প্রথমাংশের জলনিকাশের জন্য উক্ত প্রধান খাল ছাড়া বর্তমান কৃষ্ণপদ-ভাঙ্গড় কাটা-খালটিকেও কাজে লাগানো হবে। এই উদ্দেশ্যে ড্রেজারের সাহায্যে উক্ত খালটি প্রয়োজনমত গভীর ও প্রকান্ড করা হয়েছে। ভাঙ্গড়খাল ও বাগজোলা স্লুইসের সংযোগের নিমিত্ত একটি আধ মাইল দীর্ঘ খাল কাটা হয়েছে।

“পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশে ৩৩.৫ বর্গমাইল হাড়োয়া ও ভাঙ্গড় থানার এলাকায় অবস্থিত। এই অঞ্চলের জন্য একটি প্রায় ৭ মাইল দীর্ঘ প্রধান খাল এবং মোট প্রায় ৫ মাইল দীর্ঘ ৪টি শাখাখাল কাটা হয়েছে। কুলগাছির নিকটবর্তী একটি স্লুইসের সাহায্যে এই খালের জল কুলটি নদীতে নিকাশ হয়ে

যাবে। এই স্লুইসটির জলবহনের ক্ষমতা প্রতি সেকেন্ডে ৭১৩ ঘনফুট। সমগ্র পরিকল্পনাটিতে ১৪টি রেগুলেটর, ৫৯টি ইনলেট, একটি এস্কেপ, ২৮টি যানবাহন-চলাচলের পুল এবং ৮টি লোক-চলাচলের পুল নির্মিত হয়েছে। এ ছাড়া, বাগজোলা স্লুইস ও কুলগাছি স্লুইস, যার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাও আছে।

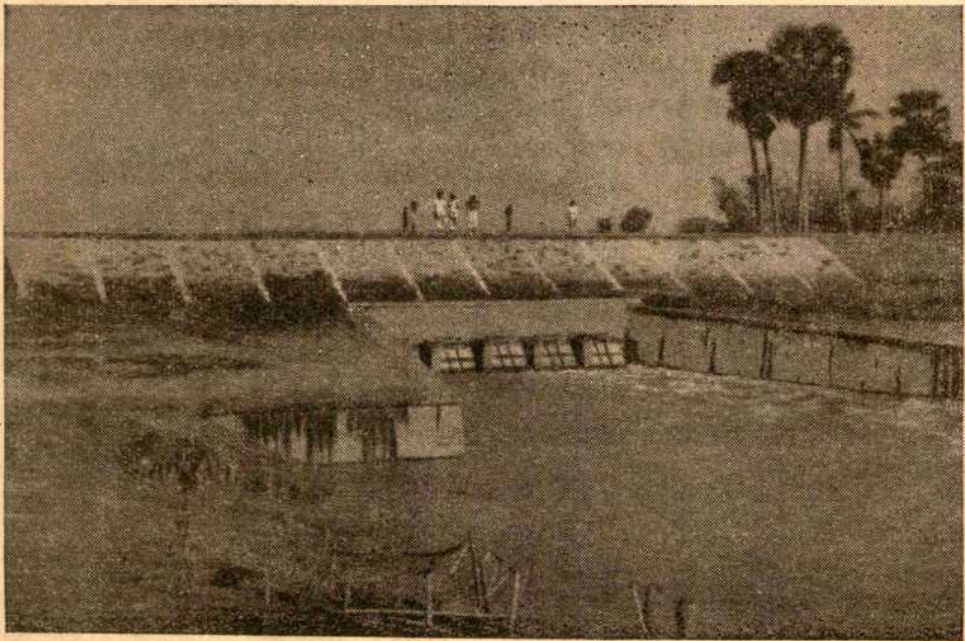
“সমগ্র পরিকল্পনাটির রূপায়ণে ১১৬ বর্গমাইল অববাহিকার জলনিকাশের সুবিধা হবে। ধানচাষের জন্য এতে সম্পূর্ণভাবে উপকৃত হবে ২৫ বর্গমাইল এবং আংশিকভাবে উপকৃত হবে ২৬ বর্গমাইল।

“এই পরিকল্পনার ফলে, আশা করা যায়, আমন ধানের পরিমাণ ৪,৮৬,৪০০ মণ, অনুরূপ খড় এবং ৬১,৯১০ মণ অতিরিক্ত রবি ফসল পাওয়া যাবে। এই অতিরিক্ত ফসলের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬৯ লক্ষ টাকা। সমগ্র পরিকল্পনাটির আনুমানিক ব্যয় ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা।

“এই পরিকল্পনাটি কার্যকরী করার জন্য আমি আমার সহকর্মীদের, বিশেষ করে অধীক্ষক বাস্তুকার শ্রীদুলালগোপাল মদ্যোপাধ্যায়, নির্বাহী বাস্তুকার শ্রীকনকভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকারী বাস্তুকার শ্রীউপেন্দ্রনাথ মন্ডল, শ্রীউপেন্দ্রমোহন বক্সী, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সরকার, এবং অন্যান্য বিভাগীয় সহযোগীদের যে সাহায্য পেয়েছি তার জন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর একজনের আন্তরিক সহায়তা এই উপলক্ষে অবিস্মরণীয়—আমি সেই ভারত-সরকারের কৃষি-বিভাগের অতিরিক্ত কর্মসচিব শ্রীসদার দাতার সংকে সন্তোষের অন্তরে স্মরণ করছি।

“কুশলী স্থাপত্যশিল্পী সিমপ্লেক্স্ কংক্রিট পাইলস্ (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, মেসার্স দেব চাটার্জি অ্যান্ড কোং, পাইওনিয়ার কনস্ট্রাকশন কোম্পানি এবং অন্যান্য যারা আমাদের সাহায্য করছেন তাঁদের সকলকে আমার অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।”

সেচ-জলপথবিভাগের সচিব ডক্টর নবগোপাল দাশও এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।



বাগজোলা-স্লুইসের দ্বারা নিষ্কাশিত জলরাশি এই প্রধান খাল দিয়ে বোঁরয়ে যায়।

বটগাছের আত্মকথা

শ্রীকালিদাস রায়

কবিশেষর

গোরুর গাড়িতে চড়ে চলেছিলাম গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। পথে দীর্ঘঘর ধারে দেখলাম একটা বিরাট বটগাছ। এত বড় বটগাছ আমি জীবনে কখনও দেখি নি। গাছের শাখাপ্রশাখা অনেক বিঘা জমির উপর ছায়াবিস্তার করছে। বেলা তখন বারোটা। গাড়োয়ানকে বললাম, “এখানে গাড়ি রাখ—এবেলায় আর যাব না। বৈকালে গাড়ি ছেড়ে সন্ধ্যার সময় গিয়ে পৌঁছব”।

বটগাছটির পানে তাকিয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বিরাটের একটা অপরূপ রূপ আমাকে মুহূর্তে করে ফেলল। গাছের চারিপাশ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। শেষে ক্লান্ত হয়ে গাড়ির শতরংগটা গাছতলায় পেতে শুয়ে পড়লাম। অল্পক্ষণ পরেই তন্দ্রা এল। তন্দ্রার ঘোরে শুনলাম—বটগাছের কণ্ঠস্বর। বটগাছ বলতে লাগল—

“আমি কে জান? তোমরা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করছ—আমি বিধাতার পঞ্চশতবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি সৃষ্টি। জীবলোকের আগ্রয়ের জন্য আমি পরিকল্পিত।

“আমি কী দেখেছি, আগে তাই বলি। আমি শহরের খবর রাখি না—চারিপাশের গ্রামগুলির খবর বলি। এখন গ্রামগুলির অবস্থা যা দেখছ, বহু আগে এ অবস্থা ছিল না। তখন মাঠের জমিতে বিনা সারেই প্রচুর ফসল হ’ত। লোকসংখ্যা এত বেশি ছিল না। সকল জমি চাষ করার দরকার হ’ত না। নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল জন্মাতে চাষীদের উৎসাহ ছিল না। পতিত জমিতে প্রচুর ঘাস হত। গাইগুলো এমন ‘ছটাকে’ গাই ছিল না, বেশ হুঁটপুষ্ট ছিল। প্রচুর দুধ দিত। প্রত্যেকেই গাই পুষত। দীর্ঘ পুরুষ অনেক ছিল। তার কতকগুলোর এখন চিহ্নও নেই—সেগুলো ভরাট

হয়ে ধানের জমি হয়েছে। যেগুলো এখনও আছে, সেগুলো বেশ গভীর ছিল, চাষে জল টান পড়লে ক্ষেতে সেগুলো জল যোগাত এবং সেগুলোতে প্রচুর মাছ জন্মাত। ঐ যে মজা নদীটা দেখছ, ওটা বেশ গভীর ছিল। সারা বছর নদীটাতে জল থাকত, বর্ষায় ভরে উঠত, কিন্তু বন্যা বড়—একটা হ’ত না।

“ম্যালেরিয়া বা কলেরা বলে কোন রোগ ছিল না। ভেদ-বমি আর কলেরা এক নয়। বাইরের খাদ্য গ্রামে কিছুই আসত না। খাদ্য ভেজাল দেওয়ার প্রথাও ছিল না। খাদ্যের দরুন কোন রোগ হত না। নতুন নতুন কত সুখাদ্যের কথা ইদানীং শুনিনি—মেলায় সময় গ্রামে আসতেও দেখি; গ্রামের লোকেরা তখনকার দিনে এসবের অস্তিত্বও জানত না। উপাদেয় সুখাদ্য বলতে লোকে জানত মালপো, পায়স, পিঠে, এসব। আখের চাষ ছিল সকল গায়েই। প্রচুর গুড় হ’ত। এদেশে প্রচুর গুড় হ’ত বলেই এদেশের নাম গোড়। চিনির চলন ছিল না।

“তীর্থযাত্রা ছাড়া লোকে বিদেশে সহজে যেত না। পেটের দায়ে কাউকে বিদেশে যেতে হ’ত না। লোকে স্বপ্নে সন্তুষ্ট ছিল। সেকালের লোকে ভাত ডাল দুধ মাছ তরকারি পেলেই যথেষ্ট মনে করত। এসমস্তই নিজেদের গ্রামেই জন্মাত।

“সেকালের লোকে জুতো পায়ে দিত না, জামাও গায়ে দিত না। তালপাতার ছাতা ব্যবহার করত। শীতকালে একখানা চাদর ব্যবহার করত। মেয়েরা তাও ব্যবহার করত না। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই খাটত। পুরুষেরা বাড়ির বাইরে, মেয়েরা বাড়ির ভিতরে। একালের তুলনায় তারা বিপ্রাম পেত ঢের বেশি। আয়েস বল, আরাম বল, ভোগ-বিলাস বল—সবই

বিশ্রামেরই অন্তর্গত। পয়সাকড়ি ছিল খুব কম।
ধানচালই টাকাপয়সার কাজ করত।

“সব থেকে বড় কথা—আয়-সাম্যের কথা।
পূজারী ব্রাহ্মণ বা অধ্যাপক চিকিৎসক চাষী কামার
কুমোর নাপিত মৃদি বা মোদক—এদের মধ্যে আয়ের
কোন তফাত ছিল না। সকলেরই বেশভূষা আহার-
বিহার ঘরবাড়ি সব একই রকমের ছিল। ধনী বা
মধ্যবিত্ত কেউ ছিল না, সকলেই দরিদ্র, কিন্তু সদ্ধী,
প্রফুল্ল। কেউ বিশেষ কোন অভাব অনুভব করত
না। তাদের অভাব সম্বন্ধে ধারণাই ছিল স্বতন্ত্র।
যার আর্থিক অবস্থা কোন কারণে ভাল হ’ত, তার
প্রতিপাল্য এত বেড়ে যেত যে, তার চাল বাড়াবার
বা বড়মানষী করার উপায় ছিল না। নিরাশ্রয়
অক্ষম ও নিঃস্ব আত্মীয়দের প্রতিপালন করাই ছিল
ধর্ম। গত একশ’ বছরে গ্রামবাসীদের মধ্যে আয়ের
বৈষম্য ঘটেছে।

“অপরাধের ক্ষেত্র-পরিসর এত সংকীর্ণ ছিল যে,
অপরাধ হ’তই খুব কম। গাঁয়ের মাতস্বররাই
অধিকাংশ অপরাধের বিচার করতেন। লোকে ধর্ম-
ভীরু ছিল, ভগবান মানত, অদৃষ্ট মানত, পরকাল
মানত। পাপ করলে নিবংশ হ’তে হয়, সন্তানের
অকল্যাণ হয়, কুষ্ঠ হয়—এসব সংস্কারের দরুন
লোকে সহজে পাপ করত না। লোকে দারিদ্র্যকে
দুঃখ বলে মনে করত না, সেজন্য প্রফুল্লতার
অভাব ছিল না। তাই বারো মাসে তেরো
কেন, তেরোর চেয়ে ঢের বেশি ব্রত-
পার্বণে উৎসব করত। রামায়ণের গান, বাহা
কথকতা, পাঁচালী, মঙ্গলকাব্যের গান, কীর্তন,
বাউল গান, কবির গান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তাদের
সাহিত্য সংগীত ও ধর্মের পিপাসা মিটত, লোক-
শিক্ষার প্রচার হ’ত। লোকে পাঠশালায় শিক্ষা
পেত। উচ্চশিক্ষা বললে সংস্কৃত বা ফারসী শিক্ষা
বোঝাত।

“বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল
না—এমনকি রাজকীয় শাসনেরও তারা খোঁজখবর
রাখত না। তালিদারকে রাজার প্রাপ্য কর দিয়েই

খালাস। জমি না থাকলে কাউকে রাজস্ব দিতে
হ’ত না। এখন তোমরা বুঝে দেখ—তারা কোন
কোন বিষয়ে সদ্ধী, কোন কোন বিষয়ে দঃখী ছিল।

“এখন আমার অন্য পরিচয় দিই—

“আমার বয়স কত তা আমি জানি না। কে
কোন সালে আমার চারা পুঁতেছিল তা আমি
বলতে পারি না। তোমাদের দেশে কত মানুষই
তো তাদের জন্মতারিখ বা বয়সের কথা বলতে
পারে না। আমি তো একটা গাছ, আমি তা কী
ক’রে বলব? নিজের শৈশবকালের কথাও আমার
মনে নেই।

“বাংলাদেশের ইতিহাসের অনেক ঘটনার আমি
সাক্ষী। শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণের পর উড়িষ্যা
যাওয়ার পথে একবেলা আমার তলায় বিশ্রাম করে-
ছিলেন। তাঁর চরণধূলিতে আমার চারিপাশের
মাটি তীর্থে পরিণত হয়েছিল। কালাপাহাড় যখন
বাঙলার সব দেবমূর্তি ভেঙে বেড়াচ্ছিল, তখন
আমার কোলের সিঁদুরমাখা পাথরগুলিকেও ভেঙে
গেছে। তোড়রমল যখন সারা বাঙলা জরিপ করতে
বেরিয়েছিল, তখন আমার বদ্বীতে তার ঘোড়া
বেঁধে একবেলা আমার ছায়ায় বিশ্রাম করেছিল।
বর্ধমান থেকে দিল্লীর পথে সৈন্যদলে-ঘেরা নূর-
জাহানের শিবিকা নামিয়েছিল বাহকেরা আমারই
ছায়ায়। আমার তলা বগীদের একটা আস্তানা
ছিল; তারা ধনসম্পত্তি লুণ্ঠ ক’রে এনে আমার
তলাতেই জমা করত। আমারই চারিপাশে আলি-
বর্দির ফোঁজের সঙ্গে তাদের একটা যুদ্ধ হয়।
হিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় শত শত নরনারী
আমার পাতা চিবিয়ে ক্ষুধা-নিবৃত্তির চেষ্টা করে-
ছিল, কিন্তু হয়, তাতে তাদের প্রাণ বাঁচে নি—
আমার তলা শত শত মৃতদেহে ভরে উঠেছিল।
আমার চারিপাশ মহাশ্মশানে পরিণত হয়েছিল,
শকুনি-গুধিনী-কুকুর-শিয়ালের মহামহোৎসব আমি
স্বচক্ষে দেখেছি। এইসব থেকে আমার বয়স
অনুমান ক’রে নিতে পার।

“বার্ধক্যের দরুন আমার পাতাগুলো এখন ছোট হয়ে গিয়েছে—কিন্তু আমার শাখাপ্রশাখা চারদিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বড় বড় শাখা থেকে বৃষ্টির নেমে মাটিতে প্রবেশ করেছে—সেগুলো ক্রমে পরিপুষ্ট হয়ে আলাদা আলাদা গুঁড়ির মত শাখার ভার বইবার থামের কাজ করছে।

“সর্বশ্রেণীর জীবকে আশ্রয় দেওয়ার জন্যই বিধাতা আমাকে এতকাল বাঁচিয়ে রেখেছেন। দশখানা গ্রামের হাট বসে সপ্তাহে দু’ দিন আমার তলায়। এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের পরিচয় ঘটে আমারই আশ্রয়ে। বৎসরে দু’ বার এ অঞ্চলের মেলা বসে আমার তলায়—সেই মেলা দশ-পনেরো দিন ধরে চলে। দূর-দূরান্তর থেকে পসারীরা আসে কত জিনিসপত্র নিয়ে। সেই উপলক্ষে কত আমোদ-উৎসব গান-বাজনা পূজা-অর্চনা ক্রয়-বিক্রয় চলতে থাকে আমাকে ঘিরে। আমার চারিপাশ অস্থায়ী ছাউনিতে ভরে যায়। গ্রামের সঙ্গে গঞ্জ-নগরের পরিচয় ঘটে সেই উপলক্ষে। ক’টা দিন কী আনন্দেই কাটে!

“কতবার কাছাকাছি গ্রামের লোকগুলো অগ্নি-কাণ্ডে গৃহহারা হয়েছে—তখন তারা এসে আমার কোলেই আশ্রয় নিয়েছে। বন্যায় কতবার নদীর ধারের গ্রামের বাড়িঘর ভেসে গিয়েছে—লোকে এসে আমার চারিপাশে তালপাতার ছাউনি তৈরি করে আশ্রয় নিয়েছে।

“সামনের পথ দিয়ে যুগ যুগ ধরে যত পথিক গিয়েছে—তারা আমার তলায় বিশ্রাম করেছে। বাদ্যভাণ্ড রায়বেশে ও বরষাটীদের সঙ্গে নিয়ে বিবাহের বরও যাত্রাপথে যেমন আমার কোলে বিশ্রাম করে, মৃতদেহ সৎকারের জন্য যারা গঙ্গার দিকে চলে তারাও তেমনি আমার ছায়ায় মৃতদেহ নামিয়ে বিশ্রাম করে। সন্ন্যাসীরা আমার ছায়ায় ধুনী জেঁদে বাঘছাল পেতে আস্তানা গাড়ে—আর চারিপাশের গ্রামের লোকেরা এসে তাঁদের ঘিরে আপন আপন প্রার্থনা জানায়।

“বেদে আর হাঘরেরা আমার কোলে আচ্ছা নিয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে যায়। তারা উনুন তৈরি করে রান্না করে, আমার শাখা থেকে দোলনা দু’লিয়ে তাদের শিশুদের ঘুম পাড়ায়, তাদের সর্বস্ব আমার কাছে সপে দিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে যায়।

“আমার একদিকে গ্রাম আর তিন দিকে মাঠ। এই মাঠে চাষীরা ফসল ফলায়, রাখালেরা গোরু চরায়। তাদের—কেবল তাদের নয়—তাদের বলদ-মহিষ-গাভীরও বিশ্রামস্থল আমার ছায়াশীতল কোলটি।

“গঞ্জের পথে পসারীরা তাদের পসরা নামিয়ে গামছা পেতে আমার তলায় শুয়ে এক ঘুম ঘুমিয়ে নেয়।

“এসব বর্ণনা দিতে দিতে আমার মনে কবিত্বের উদয় হচ্ছে। একটু কবিতার ভাষায় বলি—

যেন রাজশয্যা পরে মধ্যাহ্ন-প্রান্তর ভরে
কৃষাণ ঘুমায়ে আছে হোথা।
পসারী পসরা ধুয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছে শুয়ে
কোথা গঞ্জ? গৃহ তার কোথা?
রাখাল বাজায় বেগু, চোখ বৃজে তার খেন্দু
তৃপ্তিসুখে করে রোমন্থন।
বিগলিয়া পড়ে স্নেহ ছাগলী শাবক-দেহ
ধীরে ধীরে করিছে লেহন।
মধুর তন্দ্রার সূখে কুকুরটি হোথা ধুকে,
পাশে বোজি নিদ্রায় বিভোর।
মোর ফলে তৃপ্যমাণ বিহগের কলতান
সবার ঘনায় ঘুমঘোর।
শিবিকাবাহীরা সব শূন্য সেই কলরব
একে একে ঘুমে নিমগন,
নববধু মৃদি’ আঁখি সূখে দুখে মাখামাখি
এলোমেলো হেরিছে স্বপন।

“সিঁদুরমাখা নানা আকারের শিলাখণ্ডে আমার মূলদেশ বেষ্টিত। এইগুলি তুচ্ছ শিলা মাত্র নয়। এগুলি গ্রামবাসীদের অকপট অন্তরের ঘনীভূত ভক্তি। এইগুলি এ অঞ্চলের আট-দশখানি গ্রামের

গ্রাম্য দেবতা। এগুলির জন্য দরিদ্র গ্রামবাসীরা মন্দির গড়তে পারে নি—আমারই অঙ্কে অর্থাৎ বিধাতার গড়া এই সবুজ পাতার ছাউনির মন্দিরে তাদের রক্ষা করেছে। এতে এই শিলাদেবতাগুলি শুধু মানুষের নয়, বহুবিধ জীবজন্তু-কীট-পতঙ্গেরও দেবতা হয়ে উঠেছে।

“বহুদিন আগে এক পুণ্যবতী জমিদার-জননী—আমার মূলদেশ ইটপাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন—আজ তা ভেঙে গিয়েছে। বারো মাসে বহু পর্ব-দিনে গ্রামবাসীরা ঢাকঢোল বাজিয়ে আমার মূলে তাদের দেবতাদের পূজা দিতে আসে। গ্রামের কুললক্ষ্মীরা এখানেই মাতৃহৃদয়ের দেবতা ষষ্ঠী-দেবীর পূজা দিয়ে সন্তানের কল্যাণ কামনা করে—আর মনসাপূজার দিনে বহু গ্রামের অধিবাসীরা এখানে মিলিত হয়ে উৎসব করে। গাজনের সময় এখানেই তাদের ধর্মরাজের পূজা দিয়ে মানত করে। আমাকে ঘিরেই গাজনের সন্ন্যাসীরা নৃত্য করে শিবের গীত গায়।

“আমার দেহ বহুজীবেরই আশ্রয়। শিকড়ে, শাখায়, কোটরে, বিবরে, ছালের তলে লক্ষ লক্ষ জীব বাস করছে। এই দেহেই তাদের জন্ম-মৃত্যু। আমার দেহটা ছোট একটা জীবজগৎ। আমার আশ্রয়ে বেঁজ ও সাপ দুই-ই পাশাপাশি বাস করছে। শাখার ছালের তলায় থাকে কীট। কাঠঠোকরা ঠোঁটের ঠোকরে তাকে বার করে ক্ষুধা নিবৃত্তি করছে। আমার ফলের ভিতরও বহু জীব সৃষ্টি পুষ্টি ও বিলয় পাচ্ছে। হাজার হাজার পাখির আশ্রয় আমার দেহ। আমার সর্বাঙ্গে তাদের শত শত কুলায়। আমার সারা দেহে তারা পালক বুলায়। সকাল-সন্ধ্যায় তারা আমাকে গান শোনায়। প্রভাতে তারা দিগ্দিগন্তে উড়ে যায়—সন্ধ্যায় সব ফিরে আসে। তারা আমার পোষা

পাখি। যখন আমার দেহ লাল লাল গোল গোল ফলে ভরে যায়, তখন তারা হাজার হাজার অতিথিকে আমন্ত্রণ করে আনে—তখন চলে অবিশ্রান্ত উৎসব আর কলগান। এরা সব আগন্তুক, ফল ফুরিয়ে গেলে এরা আর আসে না।

“বহুশত বৎসর ধরে এইভাবে মানুষ ও জীব-জন্তুর সংগে আত্মীয়-সম্পর্ক রেখে চলেছি। আমি সেকালের কথা গোড়ায় বলছি—সেকালে বৃক্ষের বড় আদর ছিল। লোকে গৃহপ্রাঙ্গণে, পথের ধারে, পতিত জমিতে, দীর্ঘ-পুকুরের পাড়ে, গ্রামের আশেপাশে গাছ লাগাত। দূর থেকে গ্রামের গাছপালাই দেখা যেত, কোন কুটির বা বাড়িঘর দেখা যেত না। অনেকে বৃক্ষকে পুণ্যবৃক্ষ মনে করে তাদের মূল বা তাদের শাখা ছেদন করত না। তারা বৃক্ষের মধ্যে দেবতাকে দেখত। বৃক্ষকে তারা পরম বন্ধু বলে মনে করত।

“শাস্ত্র বনস্পতির উপাসনার কথাও আছে। বাঙলার সংস্কৃতি আমার মত শতশত বনস্পতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। আমাকে বাঙলার সংস্কৃতির উদ্ভিদরূপ বলে জানবে। বাঙলার সংস্কৃতির মতই আমি বাঙলার মাটি ভেদ করে উঠেছি।”

গাছের কথা শুনতে শুনতে জেগে উঠলাম। দেখি, আমার মুখে এক টুকরো রোদ এসে পড়েছে। মনে হল, বেলা পড়ে এসেছে দেখে, আমাকে জাগিয়ে তোলার জন্য বটগাছই তার পাতার ফাঁক দিয়ে রোদটুকু ফেলেছে আমার মুখের উপর।

তরুদেবতাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে, বারবার প্রণাম করে, পড়ন্ত বেলায় বিদায় নিলাম। আবার গোরুর গাড়িতে চড়ে গন্তব্যস্থানের উদ্দেশে চললাম। সারা পথ ভাবতে ভাবতে চললাম বটগাছের কথাগুলি।

বালিয়া সমবায় বিবিধার্থক ও বিপণন সমিতি

শ্রীতারেশ রায়

চাকদহ স্টেশন থেকে পাকা পিচঢালা রাস্তা চলে গিয়েছে বনগাঁ অবধি। স্টেশন থেকে প্রায় ১১ মাইল দূরে এই রাস্তার ধারেই বালিয়া হাট। এরই আশেপাশে অনেক সমৃদ্ধ মুসলমান চাষীর বাস। দেশবিভাগের পরে এই বালিয়ার উর্বর দোআঁশ জমি বহু বাস্তুহারা কৃষিজীবীকে আকৃষ্ট করেছে। একে কেন্দ্র করেই এর আশেপাশে চাষী ব্যবসায়ী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বহু বাস্তুহারা মানুস নতুন করে বাসা বেঁধেছে।

বালিয়া হাটে নানা জিনিসের বেচাকেনা হয় সপ্তাহে দু'দিন। পাট, খেসারী, কলাই, ধান, গম, ছোলা, মসুর প্রভৃতি নানা জিনিস প্রতি হাটে দালাল আর ফোড়েরা কিনে নিয়ে যায় বড় বড় শহরের চাহিদা মেটাতে। চাষী পায় সামান্য দাম। তাই ভূমিলক্ষ্মীর কৃপা থাকলেও বালিয়ার চাষীরা কৃষিজাত পণ্য বিক্রি করে ন্যায্য দাম বড় পেত না। এই দিকে পশ্চিমবঙ্গ কৃষিবিভাগের কৃষিজ-বিপণন শাখার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ১৯৫৫ সালের গোড়ার দিকে। এই বছরেই কৃষিবিভাগের কর্মচারীদের ও বালিয়া হাটের আশপাশের চাষীদের সমবেত চেষ্টায় প্রথম পত্তন হল “বালিয়া সমবায় বিবিধার্থক ও বিপণন সমিতি”র (বালিয়া কো-অপারেটিভ মালটি-পারপাস অ্যান্ড মার্কেটিং সোসাইটি)।

প্রথমে স্থানীয় ৯৪ জন সদস্য নিয়ে হাটের পাশে একটা ছোট ডাক্তারখানায় অফিস করে সমিতির কাজ শুরু হল। ক্রমে সভ্যসংখ্যা বেড়ে বর্তমানে ২৮২তে দাঁড়িয়েছে। ২,৭৯০ টাকা মূলধন নিয়ে কারবার আরম্ভ হয়; বর্তমান বছরে মূলধন এসে দাঁড়িয়েছে ১১,০০০ টাকায়। সমিতি সরকারের কৃষিজ-বিপণন শাখা থেকে সাহায্য হিসেবে ধার

পেয়েছে ৮,০০০ টাকা আর নিজে দিয়েছে ৫০০ টাকা। এই টাকায় এর মধ্যেই প্রায় ১৩ কাঠা জমি কিনে সমিতির নিজস্ব পাকা অফিসঘর ও মাল-গুদাম তৈরি হয়েছে। গুদামে এককালীন ২,০০০ মণ ভুসী মাল ভালভাবে গুদামজাত করার সুবিধা আছে। অফিসঘর দোতলা করা হচ্ছে। নিচের তলায় অপেক্ষাকৃত দামী পণ্য গুদামজাত করে দোতলায় অফিস সরানো হবে—এটাই সমিতির পরিকল্পনা।

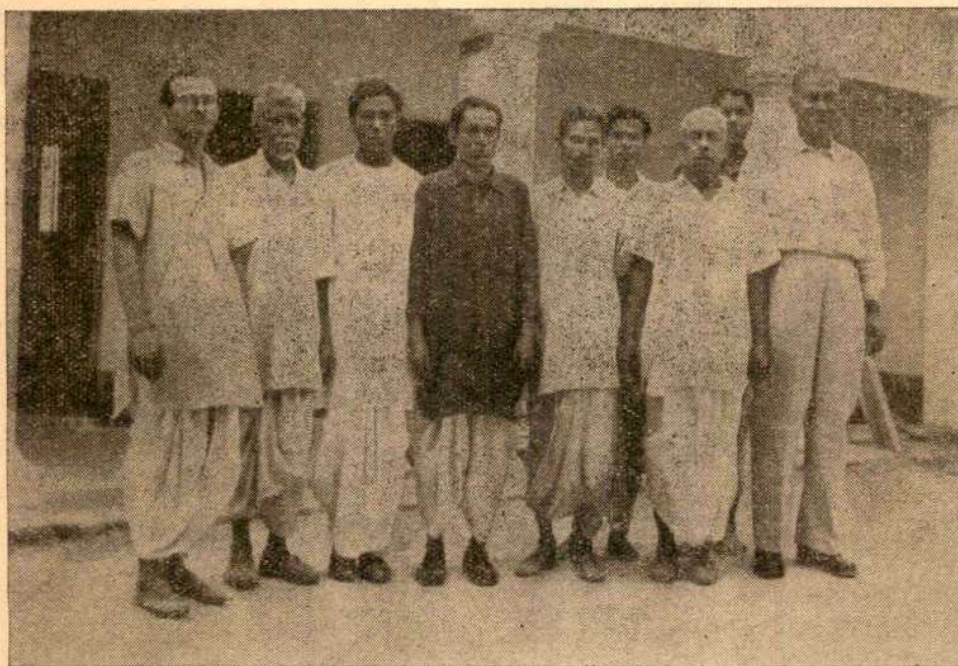
১৯৫৬ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসের প্রথম পর্যন্ত গত ৮ মাসে এই সমিতি ৫৮,৬০৯৫১০-র ব্যবসা করেছে এবং এতে প্রায় ২,১০০ টাকা সমিতির লাভ হয়েছে দেখা যায়। স্থানীয় চাষী শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস এই সমিতির সচিব। তিনি মনে করেন যে, বার্ষিক ৪ মাসে আরও প্রায় ৯০০ টাকা সমিতির লাভ হবে।

আমি যখন এই সমিতি দেখতে যাই, তখন সেখানে যুগ্ম-সচিব ডাঃ শরৎচন্দ্র সরকারের সঙ্গে কথা হল। তিনি নিজেও একজন উদ্ভাস্তু এবং এই সমিতির প্রতি তাঁর অত্যন্ত অনুরাগ। কথায় কথায় সভ্যসংখ্যা আর বাড়ছে না কেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন যে, রোজই বহু চাষী সভ্য হতে আসছে; কিন্তু বাছাই না করে সভ্যসংখ্যা বাড়ানোর দিকে দৃষ্টি রাখলে সমিতির স্থায়ী উন্নতিতে বাধা পড়তে পারে বলে সভ্য নেওয়ার ব্যাপারে ওরা খুব সতর্ক হয়েই এগোচ্ছেন। এঁদের সভাপতি শ্রীকমলকৃষ্ণ সিংহ নিজেও একজন কারবারী ও চাষী।

সমিতির আরও কয়েকজন উৎসাহী সভ্যের সঙ্গে কথাবার্তা হল। পাট, ধান, খেসারী, কলাই, ছোলা,



বালিয়া সমবায় বিবিধার্থক সমিতির কার্যালয় ও গদামঘর



ষাঁদের প্রচেষ্টায় এই সমবায়-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তাঁদের কয়েকজন

মসুর, গম এইসব মালের কেনাবেচাই এঁদের কাজ। উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে সকলেই সমিতির উপকারিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ দেখলাম। তাঁদের ধারণা যে, এই সমিতির মারফত তাঁরা নিজেদের কৃষিজ পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন, টাকাও নগদ পাচ্ছেন, ওজনটাও ঠিক পাচ্ছেন। তা ছাড়া, শেয়ারের লভ্যাংশ পরে পাবেন। নিজেদের সমিতি ব'লে এঁদের খুব উৎসাহ ও ভরসা দেখলাম। বেচাকেনার ব্যাপারে দালাল বা ফোড়ের অযথা উৎপীড়ন নেই ব'লে এঁরা এখন বেশ নিশ্চিন্ত। সমিতির নগদ টাকা কম থাকায় এতদিন রাখি কারবার করবার বিশেষ সন্বিধা হয় নি। চলতি কারবারেই এই লাভ হয়েছে। তাই মূলধনের তুলনায় লাভের পরিমাণ খুব বেশি না হ'লেও সভ্যরা সমিতির ওপর খুব সন্তুষ্ট।

এই সমিতির কাজ সন্তোষজনক হওয়ায় এবং এখানে রাখি ও চলতি ব্যবসায়ের যথেষ্ট সুযোগ থাকায় ম্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী

এই বছরেই সরকার এই সমিতিকে বৃহদায়তন সমবায় কৃষিজ-বিপণন সমিতিতে রূপান্তরিত করছেন। এর ফলে এঁদের ১,১০০ টাকা মূলধনের সমপরিমাণ টাকার শেয়ার সরকার কিনছেন। তা ছাড়া এঁরা ১৫,০০০ টাকা গৃদাম তৈরি বাবত দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ও ৫,০০০ টাকা এককালীন দান বাবত সরকার থেকে পাচ্ছেন। সমিতির জন্য নিযুক্ত কর্মচারীর বেতন বাবত আরও ৫,০০০ টাকা ও বছরের জন্য সরকার থেকে দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সমিতি হ'লে প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক থেকেও এঁরা গৃদামের মজুত মাল জামিন রেখে স্বল্প-মেয়াদী ঋণ পেতে পারবেন। এতে সমিতির আর্থিক সংগতি অনেক বেড়ে যাবে আর কাজেও যথেষ্ট প্রসার ও সন্বিধা হবে।

আশা করা যায় অদূরভবিষ্যতে বালিয়ার এই সমবায় কৃষিজ-বিপণন সমিতিটি ওখানকার চাষীদের একটা প্রধান সহায় হয়ে তাঁদের জীবনমানের উন্নয়নে সাহায্য করবে।



‘বেয়ার’এর পোকা ও রোগ দমনের ঔষধগুলির
দ্বারা আপনাদের ফসল রক্ষা করুন

ফলিডল-ই ৬০৫

মেটাসিস্টক্স

সেরেসান

অ্যাগালল

কুপ্রাভিট (ওবি ২১)

এইগুলি পশ্চিম জার্মানীর লিভারকুসেনের

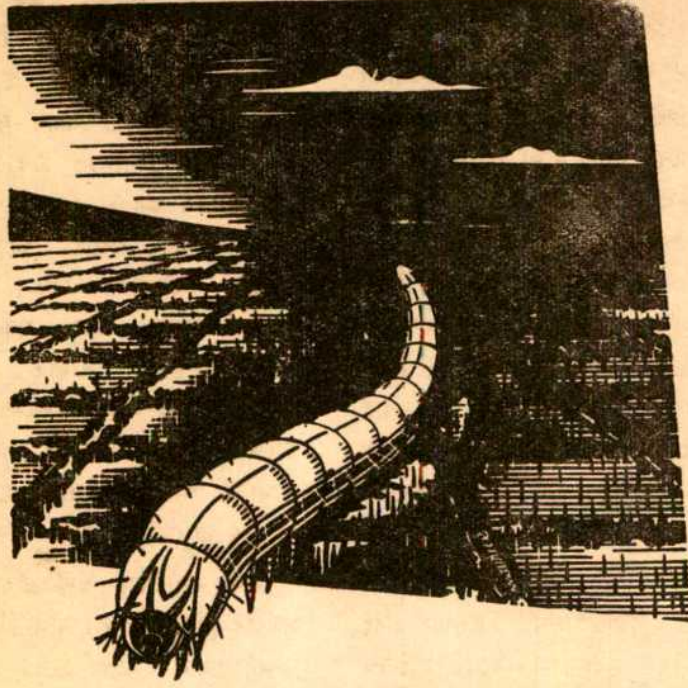
ফারবেনফ্যাবরিকেন বেয়ার

দ্বারা প্রস্তুত আসল ঔষধ।

ভারতে পরিবেশক

চিকা প্রাইভেট লিমিটেড,

৩১, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২



আপনারই জমির খাদ্যে পুষ্ট

কীটপতঙ্গ শত্রু থেকে আপনার ফসল নষ্ট করবে এমন হ'তে দেবেন না। শেল কোম্পানী এনড্রিন নামে একটি নতুন কীটনাশক তৈরী করেছে। শেল এনড্রিন বহু রকমের কীটপতঙ্গ—বিশেষ করে গুঁয়োপোকা ও ফড়িং জাতীয় কীটপতঙ্গের আক্রমণ প্রতিরোধে অব্যর্থ।

এনড্রিন

বহুমুখী কীটনাশক

ধানের মাকরা পোকা, তুলোর গুবরে পোকা, আম ও আমের মূললের পোকা, আখের মাকরা পোকা, রেড়ীর ঘোড়া পোকা প্রভৃতি আরও বহু রকমের পোকা প্রতিরোধেও শেল এনড্রিন ফলপ্রসূ।

তরল কিংবা গুঁড়ো হ'ভাবেই শেল এনড্রিন ব্যবহার করা চলে। শেল এনড্রিনের গুণ দীর্ঘস্থায়ী এবং ব্যবহারের পরেও বহুদিন পর্যন্ত ক্রিয়াশীল। শেল এনড্রিন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে।

শেল এনড্রিন ব্যবহার করা লাভজনক—কারণ তাতে ফলন তো বাড়েই, সঙ্গে সঙ্গে ফসলের পুষ্টিও বাড়ে। ফলে লাভই হয়।

বিস্তৃত বিবরণের মন্ত নিকটবর্তী বার্মা-শেল অফিসে লিখুন।

কৃষির জন্য শেল পেট্রোলিয়াম কেমিক্যাল পরিবেশক

বার্মা-শেল

ASP/ACG 3

আমাদের দেশে বহুদিন থেকেই আতার চাষ হয়ে আসছে। ‘আইন-ই-আকবরী’ নামক গ্রন্থে জানা যায় যে, আমেরিকা-আবিষ্কারের পর থেকেই এ ফল ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে। পরে আরবদেশ থেকে মিশরে এ ফলের প্রসার ঘটে। তারপরে ক্রমশ এ ফল পৃথিবীর উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ দেশ-গুলোতে প্রসারলাভের সুযোগ পায়। জনৈক উদ্যানতত্ত্ববিদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, মিশরে ও মধ্য আফ্রিকায় এ ফলের কারবারী চাষ বিশেষ লাভজনক হয়েছে। প্যালেস্টাইনেও এ ফলের চাষ শুরুর হয়েছে এবং তা বেশ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

অন্যান্য ফলের চাষের তুলনায় এ ফলের চাষে সুবিধা অনেক বেশি। কারণ, তুষারপাত, খুব ঠান্ডা আবহাওয়া ইত্যাদি এ ফলের চাষে কোনই ক্ষতি করতে পারে না। এমনকি তাপমাত্রা নিম্নাঙ্কে থাকলেও এর কোন ক্ষতি হয় না। তবে গাছে ফুল আসার সময় আবহাওয়া শুষ্ক থাকলে ফলনের আধিক্য দেখা যায়। এদেশে বর্ষাকাল আসার আগে পর্যন্ত গাছে কোন ফল ধরে না। তবে উষ্ণ ও শুষ্ক আবহাওয়ায় গাছে ফুল আসে এবং আবহাওয়ার নিম্ন আর্দ্রতার দরুন পরাগ-মিলনের সম্ভাবনা কমে যায় বলে জানা গেছে। সিংহল দেশে সমুদ্র থেকে ৩,০০০ ফুট উঁচুতেও এর চাষ হতে দেখা গেছে।

আতাফলের চাষ যে-কোন মাটিতেই করা চলে, এমনকি এদেশের পাথুরে মাটিতেও এর চাষ ভালই হয়। তবে বেলে মাটিই এ ফলের পক্ষে উপযুক্ত। ভাল জলনিকাশের বন্দোবস্ত থাকলে হালকা মাটিতেও এর চাষ করা চলে। মাটিতে চুনের পরিমাণ শতকরা ৫৫ ভাগ থাকলেও এবং সেচের

জলে ক্লোরাইডের ভাগ থাকলেও এর চাষে কোন ক্ষতি হয় না। এদেশে বীজ থেকেই এর বংশ-বৃদ্ধি হয়ে থাকে; এদেশের কোন কোন জায়গায় কলম থেকে গাছ তৈরি করা হয়ে থাকে। তবে, গুটি-কলমই এর বংশবৃদ্ধির পক্ষে প্রশস্ত। বীজ থেকে গাছ উৎপাদন করার ইচ্ছা থাকলে নীরোগ সতেজ বীজই ব্যবহার করা উচিত। বীজের উপরে শক্ত আবরণ থাকে। এর উপরের অংশ কিছু চেঁচে, বীজ মাটিতে লাগালে তাড়াতাড়ি অঙ্কুরোদ্গম হয়। বীজ থেকে গাছ হ’লে, সেই গাছে যে ফল হবে তা আকারে, গুণে ও স্বাদে ভাল হয়। সাধারণত এ ফল খুব বেশি সংখ্যায় ফলে না ব’লে, বীজের যাতে অপচয় না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। তা ছাড়া এ ফলে শাঁসের তুলনায় বীজের পরিমাণ কম। সাধারণত বীজ ও শাঁসের অনুপাত ১ : ২৭।

আতাগাছের বাড় খুব বেশি নয়। আসল জমিতে ২০ ফুট দূরে দূরে চারা লাগানো হয়— যাতে গাছগুলো ঘন না হয় সেই উদ্দেশ্যে। তবে যেখানকার আবহাওয়া শুষ্ক, সেখানে ঘন করে চারা লাগানো যেতে পারে। অনুর্বর বেলে মাটিতে এর চাষ করলে সার দেওয়ার প্রয়োজন হয়। ফার্মিংগারের গ্রন্থ থেকে জানা যায়, গোবরসার ও পুরানো চুন শীতকালে মাটি নিভেন দেওয়ার সময় ভাল করে গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দিলে এ গাছের ফলন অনেক বেড়ে যায়। শতকরা ৩ ভাগ নাইট্রোজেন, ১০ ভাগ ফসফরিক অ্যাসিড এবং ১০ ভাগ পটাশের মিশ্র সার প্রয়োগ করলে এ গাছের ফল ধরার ক্ষমতা বাড়ে। গোবরসার, পচা-সার প্রভৃতি জৈব সার এ গাছের বৃদ্ধির প্রধান সহায়ক। হালকা বেলে মাটিতে গাছ-প্রতি মোট ১৩২ থেকে ১৭৬ পাউন্ড সারের প্রয়োজন।

এদেশে বিনা সেচেই এর চাষ হয় এবং তাতে এর ফলন ভালই হচ্ছে। এর কারণ, বর্ষাকালে এ গাছে ফল ধরে এবং মাটি শুকিয়ে যাবার আগেই ফল পাকতে আরম্ভ করে। গ্রীষ্মকালে যদি সেচের ব্যবস্থা করা হয় তবে ফলন বেশি হতে দেখা গেছে। তবে ফল যখন গাছে পাকতে শুরুর করে তখন একবার সেচের ব্যবস্থা করা খুবই দরকার। বেলে মাটিতে এর চাষ করলে একটু বেশি জলসেচের প্রয়োজন হয়।

আতাগাছের ডালপালা ছাঁটাই না করলে, গোড়া থেকে শাখ গজিয়ে গাছ ঝোপের আকার ধারণ করে। এদেশে গাছের পুরানো কান্ড কেটে বাদ দেওয়া হয়। তাতে গাছের আকার সুন্দর হয় কিন্তু বাড় কমে যায় ও নতুন নতুন শাখাপ্রশাখা গজায়।

কলমের চারা থেকে যে গাছ হয়, তাও ছাঁটাই করা দরকার। শাখায় কুণ্ডি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাঁটাই দরকার। এর আগে ছাঁটাই করলে গাছ শুকিয়ে মরে যায়।

এ গাছে যথেষ্ট ফুল আসে, কিন্তু সমস্ত ফুল থেকেই ফল হয় না। পরাগমিলনের অসুবিধার দরুনই ফুলের অনুপাতে ফল কম ধরে। এদেশে গ্রীষ্মকাল থেকে শুরুর করে বর্ষাকাল পর্যন্ত গাছে প্রচুর ফুল আসে। তবে বর্ষাকাল আসার আগে

পর্যন্ত কোন ফল হয় না। গাছে ফলন শুরুর হতে ২ থেকে ৪ বছর লাগে। যে গাছের বয়স ৫ বছর কিংবা বেশি হয় তাতে প্রায় ৫০টি আতা ফলে। গাছ যত পুরানো হয়, ফলনও তত বাড়ে। তবে গাছ পুরানো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফলের আকারও ক্রমশ ছোট হয়ে চলে। এলাহাবাদে আট বছরের পুরানো গাছে ৩১ থেকে ২৮টি পর্যন্ত ফল ধরতে দেখা গিয়েছে।

শক্ত অবস্থাতেই ফল পাড়া হয়—যাতে খোসাতে ফাটল না ধরে। ফাটল ধরলে ফলের দামও কমে যায় এবং ব্যবসার দিক থেকে লোকসান হয়ে পড়ে। কাঁচা অবস্থায় ফল পাড়ার পর খড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয় এবং তাতে তাড়াতাড়ি তা খাবার উপযুক্ত হয়। এ ফল খুব সাবধানে রাখা দরকার; তা না হলে ফলে ফাটল ধরে যেতে পারে। এই অসুবিধার দরুনই এ ফল খুব দূরে চালান দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে খুব কাঁচা অবস্থায় পাড়লে, ফল ঠিকমত পাকলেও তার স্বাদ ও গন্ধ অনেক কমে যায়। এদেশে এ ফল কাছাকাছি জায়গায় চালান যায়।

এদেশে আতার গাছে কীটশরুর ও ছত্রাকরোগের আক্রমণ হয় না। তবে সাধারণত জলনিকাশের ভাল বন্দোবস্ত না থাকলে এ গাছে কোন কোন রোগের আক্রমণ হতে দেখা যায়।



আয়কর ফসল

ভারত যখন ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হ'ল, তখন সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিল যেসব প্রয়োজন, তার একটা হচ্ছে—এদেশের কৃষিকে নতুন ক'রে গড়ে তোলা। অবশ্য আগের চেয়ে আরও উন্নত ধরনে কৃষিকাজ করার চেষ্টা দেশের নানা জায়গায় চলছিল, কিন্তু সাধারণভাবে দেশের কৃষকদের জানা ছিল না যে, ভাল বীজ বুনো ভাল সার দিয়ে উন্নত রীতিতে কৃষিকাজ করলে কী উপকার হয়। ফলে খাদ্যের অবস্থা ছিল নিতান্তই শোচনীয়। তার উপর, দেশের লোকসংখ্যা যখন দ্রুত বেড়ে চলল, তখন সে অবস্থা হয়ে উঠল মারাত্মক। একই কারণে এদিকে দেশে তুলো পাট প্রভৃতি কারবারী বা আয়কর ফসলও জন্মাছিল চাহিদার অনুপাতে ঢের কম।

কাজেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যখন রচিত হ'ল, তাতে সবচেয়ে প্রাধান্য দেওয়া হ'ল কৃষির উন্নয়নকে। স্থির হ'ল যে, খাদ্যফসল ছাড়া তুলো পাট আখ এবং বিভিন্ন তৈলবীজও বেশি পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে। এসব আয়কর ফসল যে-পরিমাণ জন্মাছিল, তার উপর নিম্নোক্ত পরিমাণে বেশি উৎপাদন করার লক্ষ্য স্থির হলঃ

ফসল	পরিমাণ (লক্ষের হিসাব)	বৃদ্ধির শতকরা হার
তুলো	.. ১২.৬ গাঁট	৪২
পাট	.. ২০.৯ ,,	৬৩
আখ (গুড়)	.. ৭ টন	১২
তৈলবীজ	.. ৪ ,,	৮

এই লক্ষ্য অনুসারে উৎপাদন বাড়াতে পারলেও আমাদের ঘাটতি মিটবার নয়। দ্বিতীয় ও তার পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলোতে উৎপাদন ক্রমশ যে হারে বাড়িয়ে যেতে হবে, প্রথম পরিকল্পনার এটা হ'ল তার পথে প্রথম পদক্ষেপ।

দেশের সূদতী কাপড়ের শিল্প আর পার্টিশিল্প ক্রমেই প্রসারলাভ করছে। তাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজের এই প্রারম্ভকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দেশের কারখানাগুলোর চাহিদা মেটাতে হ'লে তুলো আর পাট আমাদের আরও ঢের বেশি উৎপাদন করতে হবে। চিনির এবং উদ্ভিজ্জ তেলের উৎপাদনও আমাদের আরও বাড়াতে হবে; কেননা, আমাদের খাদ্যে এ দু'টো জিনিসের অভাব ঘটেছে। প্রথম পরিকল্পনার কাজে কৃষি-উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, বলা চলে। সেই ভিত্তির উপর এখন আমাদের দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নের এবং দেশের সমৃদ্ধির সৌধ গড়ে তুলতে হবে।

তুলো

ভারতে ১৯৫০-৫১ সালে তুলো জন্মেছে ২৯.১ লক্ষ গাঁট (প্রতি গাঁটে ৩৯২ পাউন্ড) এবং তুলো খরচ হয়েছে সে-বছর মোটামুটি হিসাবে ৪০.৭ লক্ষ গাঁট। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ধরা হয়েছিল, ১৯৫৫-৫৬ সালে ৪২ লক্ষ গাঁট তুলো উৎপাদন করা হবে। এ লক্ষ্য আমরা ১৯৫৪-৫৫ সালেই ছাড়িয়ে গিয়েছি; সে বছর তুলো জন্মেছে ৪২ লক্ষ গাঁটের বেশি। কিন্তু ইতোমধ্যে সূদতী শিল্পের প্রসার হওয়ায় তুলোর চাহিদা বেড়ে গিয়ে বছরে দাঁড়িয়েছে ৫৩ লক্ষ গাঁট। অর্থাৎ ১১ লক্ষ গাঁটের ঘাটতি পড়ছে।

দেশের সূদতী শিল্পকে যদি ক্ষতিগ্রস্ত না করে সঠিক চালু রাখতে হয়, তবে তুলোর উৎপাদন এর চেয়েও বাড়াতে হবে। তাই দ্বিতীয় পরিকল্পনার কালে বছরে আরও ১৩ লক্ষ গাঁট তুলো জন্মানোর লক্ষ্য স্থির করার কথা হয়েছে। অর্থাৎ বছরে তুলো জন্মাতে হবে মোট $৪২+১৩=৫৫$ লক্ষ গাঁট।

নতুন লক্ষ্য অনুসারে পরিকল্পনা করার সময় দু'টি প্রধান বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। প্রথম হচ্ছে, এদেশে লম্বা আঁশের তুলো আরও বেশি করে জন্মাবার চেষ্টা করতেই হবে। আমাদের স্দতী শিল্পে এ রকম তুলো দরকার হবে বছরে প্রায় ১০ লক্ষ গাঁট। এখন যে অবস্থা, তাতে লম্বা আঁশের তুলো বাইরে থেকে আমদানি করা দরকার বছরে প্রায় ৭ থেকে ৮ লক্ষ গাঁট। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে এই যে, এখন এদেশে লোকপিছ্রু গড়ে কাপড় লাগে বছরে ১৫ গজ; মনে হয়, জাতীয় আয় বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ পরিমাণটাও বেড়ে যাবে এবং ১৯৬০-৬১ সাল নাগাত জনপিছ্রু কাপড় লাগবে গড়ে বছরে ১৮ থেকে ২০ গজ। মোটামুটি হিসাব ধরে দেখা যায়, প্রায় ২ লক্ষ গাঁট রপ্তানি নিয়ে বছরে আমাদের তুলো দরকার হবে ৬২ লক্ষ গাঁট। এর মধ্যে ৫৫ লক্ষ গাঁট দেশে উৎপন্ন হ'লে, তখনও ৭ লক্ষ গাঁট বাইরে থেকে আমদানি করতে হবে।

আরও ১০ লক্ষ গাঁট তুলো বেশি জন্মাবার জন্য তুলোচাষে আমাদের আরও বেশি জমি লাগাতেই হবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর কাল থেকে দেশের নানা জায়গায় বড় বড় সেচ-পরিকল্পনার কাজ চলছে; তার ফলে তুলোর চাষে আরও বেশি জমি লাগানো সম্ভব হবে। ভাকরা-নাংগাল বাঁধের নির্মাণের ফলে পাঞ্জাবে তুলোচাষের উপযোগী বিরাট এলাকার জমিতে সেচের জন্য খালের জল পাওয়া যাবে। কাকরাপাড়া পরিকল্পনার কাজ থেকে ইতোমধ্যেই সেচের জল পাওয়া যাচ্ছে; তা থেকে গুজরাটে তুলোচাষের অনেকখানি জায়গায় জল পাওয়া যাবে। হায়দরাবাদে তুলোচাষের বিস্তীর্ণ এলাকায় তুঙ্গ-ভদ্রা পরিকল্পনার রূপায়ণের ফলে সেচের জল পাওয়া যাবে। চম্বল পরিকল্পনার রূপায়ণে মধ্য-ভারতে আর রাজস্থানে আরও বেশি তুলো উৎপাদনের স্দবিধা হবে। লম্বা আঁশের মার্কিন তুলো উৎপাদনের বিশিষ্ট অঞ্চল হিসাবে উত্তরপ্রদেশের মথুরা আশ্রা এবং আলিগড় জেলার নাম করা যেতে পারে।

উন্নত পদ্ধতি

বেশি জমি লাগানো ছাড়া আর-এক উপায়েও উৎপাদন বাড়ানো যায়। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে অন্যান্য ফসলের মত তুলোরও একরপিছ্রু ফলন বেড়ে যাবে। তাই স্থির হয়েছে, উন্নত ধরনের বীজ, সার এবং যন্ত্রপাতি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে নতুন ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যাতে চাষ করা হয়, সে-উদ্দেশ্যে কৃষকদের উৎসাহ দান করা হবে। সংকর জাতের বীজ উৎপাদন করে তার পরিমাণ বাড়ানোর এবং চাষীদের উন্নত জাতের বীজ বিতরণ করার পরিকল্পনা হয়েছে। বীজ, সার এবং যন্ত্রপাতি কেনার জন্য চাষীদের টাকা ধার দেওয়া হবে। মাটুংগার কারিগরি গবেষণাগারটিকে আধুনিক ধরনে সাজিয়ে তোলায় এবং তাকে আরও বড় করে তোলায় কথা হচ্ছে। তা ছাড়া, পাঁচটি আঞ্চলিক গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপনেরও প্রস্তাব হয়েছে।

সংকর-প্রজননের রীতিতে নতুন উন্নত জাতের তুলোবীজ তৈরি করার চেষ্টা ভারতে এ পর্যন্ত হয় নি বললেই চলে। তুলোচাষের যেসব এলাকায় কাকরাপাড়া পরিকল্পনা থেকে সেচের জল পাওয়া যাবে, সেখানে সংকর জাতের তুলোবীজ উৎপাদন করা হবে, চাষীদের চাষে লাগানোর জন্য। এসব এলাকায় অনেক অভিজ্ঞ তুলোচাষীর বাস। যথেষ্ট জল পাওয়া যাবে বলে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার কালে এখানকার প্রায় এক লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা যাবে।

উন্নত জাতের বীজ বেশি পরিমাণে উৎপাদন করে চাষীদের দেওয়ার ব্যবস্থাকেও স্বরাস্থিত করতে হবে। বোম্বাইয়ের মত রাজ্যে দেখা গেছে, চাষীরা বীজ পায় সাধারণত চতুর্থ কি পঞ্চম চাষের ফসলের। হায়দরাবাদ কি অন্যান্য অঞ্চলের চাষীরা যেসব বীজ পেয়েছেন, সেগুলো দেখা যায়, অষ্টম কি নবম চাষের ফসল থেকে নেওয়া। যেসব রাজ্যে চাষীদের হাতে বীজ পৌঁছোতে এত দেরি হয়, সেসব রাজ্যের সরকার বীজ-উৎপাদনের জন্য চাষীদের অগ্রিম টাকা

দিতে পারেন। মধ্যভারত, রাজস্থান প্রভৃতি কোন কোন রাজ্যে বেশি পরিমাণে বীজ উৎপাদন ও বিতরণ করার ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত নেই। এসব অব্যবস্থা খুব তাড়াতাড়ি দূর করতে হবে।

আমাদের দেশের তুলোচাষে রাসায়নিক সার এ-পর্যন্ত কমই ব্যবহার করা হয়েছে। তার কারণ, বেশির ভাগ জায়গাতেই তুলোর চাষ হয়ে থাকে 'বারানি' জমিতে—যেখানে জলসেচের সুবিধা নেই। জলসেচের সুবিধা বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক সার ব্যবহারের সুবিধাও হবে। একটু কম-উর্বর জমিতেও রাসায়নিক সার দিয়ে তুলোর চাষ করা চলবে। রাসায়নিক সার, উন্নত ধরনের লাঙল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি কিনবার জন্য চাষীরা যাতে অর্থের অভাবে না পড়েন, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

মাটুগায় অবস্থিত তুলোর কারিগরি গবেষণাগারে যেসব যন্ত্রপাতি রয়েছে তার বেশির ভাগই সেক্কেলে, কাজেই এটিকে আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজিয়ে তোলা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই গবেষণাগারকে নতুনভাবে ও আধুনিক ধরনে গড়ে তুলতে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা লাগবে। নতুন যন্ত্রপাতি বসাবার জন্য নতুন একটি বাড়ি করতে হবে—তাতেও খরচ পড়বে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মোট খরচ পড়বে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা।

তুলো সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বীকৃতিলাভ করেছে। বর্তমানে আমাদের দেশের এক ইঞ্চির বেশি লম্বা আঁশের তুলোর চাহিদার প্রায় সবটাই মেটাতে হয় মিশর, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অথবা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আমদানি করে। দুর্লভ বিদেশী মদ্রায় ভারতের প্রায় ৫০ কোটি টাকা এ বাবতে বেরিয়ে যায়। এদিকে পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, গবেষণাকর্মের যথেষ্ট সুযোগ পেলে এ ধরনের তুলো আমরা দেশেই জন্মাতে পারি। দেশের নানা জায়গায় যে বিভিন্ন রকমের তুলো জন্মায়, সেগুলোর

যাতে উন্নয়ন করা যায়—সে উদ্দেশ্যে পাঁচটি আঞ্চলিক গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করার কথা হয়েছে। এই পাঁচটি কেন্দ্র স্থাপন করতে ১৫ লক্ষ টাকা লাগবে। ভারতের কেন্দ্রীয় তুলো সমিতি ইতোমধ্যেই যেসব কাজ করছেন, এই কেন্দ্রগুলির দ্বারা সেসব কাজের সাহায্য হবে।

আর্থিক ব্যবস্থা

প্রথম পরিকল্পনার কালে তুলোর উন্নয়ন-সংক্রান্ত কাজের জন্য ৭০ লক্ষ টাকা আলাদা করে রাখা হয়। এর মধ্যে বছরে ১২ লক্ষ টাকা হিসাবে পাঁচ বছরের দরুন ৬০ লক্ষ টাকা রাখতে হয় সাহায্য-দানের জন্য। বাকি ১০ লক্ষ টাকা ঋণ হিসাবে দিতে হয়েছে বীজ কেনার জন্য। এই টাকার সুদ নেওয়া হত, এবং যে আর্থিক বছরে টাকা দেওয়া হবে সেই বছরের শেষে শোধ করার শর্তে ঋণ মঞ্জুর করা হত। তুলোর উন্নয়নকর্মের প্রসারণ-সংক্রান্ত কর্মচারীদের বেতন, বীজ-খাতে লোকসান প্রভৃতির দরুনও আর্থিক ব্যবস্থা ছিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর কালেও তুলোর উন্নয়ন-সংক্রান্ত প্রসারণকর্মের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ মঞ্জুর করবেন। কম দরে তুলোবীজ দিতে যে লোকসান যাবে, সেই অর্থের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দেবেন রাজ্য-সরকারগুলি। এসব কাজের জন্য মোট ১১৬.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা হয়েছে; তার মধ্যে কর্মচারীদের বেতন এবং বিবিধ খাতে ধরা হয়েছে ৩৩.৫ লক্ষ টাকা। গবেষণাকাজের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ধরা হয়েছে ৭৩.৫ লক্ষ টাকা; এর মধ্যে রাজ্য-সরকারগুলির প্রদত্ত পরিকল্পনার কাজে ৫৮.৫ লক্ষ টাকা এবং প্রস্তুতি পাঁচটি আঞ্চলিক গবেষণাকেন্দ্রের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে।

পাট

ভারতবর্ষ যখন ১৯৪৭ সালে বিভক্ত হয়ে গেল, তখন পাটচাষের অঞ্চলের অনেকটাই পড়ে গেল পাকিস্তানে। তার ফলে ভারতরাষ্ট্রের পাটশিল্পে

দেখা দিল বিরাট বিপর্যয়। ১৯৫০-৫১ সালে মোট কাঁচা পাট জন্মেছে মাত্র ৩২.৮ লক্ষ গাঁট। প্রথম পরিকল্পনা যখন রচিত হয়, তখন অনুমান করা হয়েছিল যে, তার শেষ বছরে অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ সালে পাটের চাহিদা দাঁড়াবে ৭২ লক্ষ গাঁটের। স্বয়ংপূর্ণতার পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে পরিকল্পনায় লক্ষ্য স্থির হ'ল ৫০.৯ লক্ষ গাঁট উৎপাদনের।

১৯৫১-৫২ সালে পাট জন্মাল ৪৬.৮ লক্ষ গাঁট, এবং সেই অগ্রগতি অনুকূল ব'লেই মনে হ'ল। কিন্তু ১৯৫৩-৫৪ সালে বন্যা হওয়ায় এবং পোকা লাগার দরুন পাটের উৎপাদন খুবই ক'মে গেল। পাটের দর পড়ে যাওয়ায় নিরুৎসাহ হয়ে চাষীরা পাটের চাষ কমিয়ে দেন; তাতে আগের চেয়ে শতকরা ৩৩ ভাগ কম জমিতে পাটের চাষ হয়। এসবের ফলে সে বছর পাট হল মাত্র ৩০.৯ লক্ষ গাঁট। ১৯৫০-৫১ সালে মূল যে পরিমাণ থেকে উৎপাদনবৃদ্ধি শুরু হয়েছিল, এ পরিমাণটা তার চেয়েও কম। অতঃপর বছরে বছরে পাটের উৎপাদন বেড়ে চলল বটে, কিন্তু প্রথম পরিকল্পনায় যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল, তাতে পৌঁছানো গেল না। ১৯৫৫-৫৬ সালে পাট হ'ল মাত্র ৪১.৪ লক্ষ গাঁট।

কাজেই পাটের উৎপাদন বাড়াবার জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিশেষ প্রচেষ্টার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে পাটের চাষে জমি ছিল ১৫.৮ লক্ষ একর। আরও বেশি জমিতে পাটের চাষ লাগাতে হবে। কিন্তু উৎপাদন বাড়াবার জন্য বেশি জোর দিতে হবে নিবিড়-চাষ-পদ্ধতির উপর। এখন প্রতি একরে গড়ে ২.৪৮ গাঁট পাট উৎপন্ন হয়; পরিকল্পনা হয়েছে যে, উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে এর জায়গায় একরপিছ ৩ গাঁট পাট জন্মাতে হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উৎপাদনের পরিমাণ ৫০ লক্ষ গাঁটে তোলার সংকল্প করা হয়েছে।

সব ফসলের চাষেই ফলন বাড়াবার একটা বড় উপায় হচ্ছে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করা।

কিন্তু উন্নত জাতের বীজের দাম বেশি ব'লে চাষীরা তা নিতে না চাইতে পারেন। তা হলে, উন্নত জাতের বীজ যাতে চাষীরা কম দামে পেতে পারেন, সরকারকে হয়তো সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির সরকার এমন ব্যবস্থা করতে পারেন যে, চাষীরা তাঁদের পাট থেকে যে বীজ উৎপাদন করবেন, সরকার তা নিয়ে নেবেন এবং তার পরিবর্তে চাষীদের দেবেন উন্নত জাতের বীজ। প্রয়োজন হলে এর জন্যে রাজ্য-সরকার 'পাটবীজ-আইন' প্রণয়ন করতে পারেন। এটা না করা হলে ব্যাপকভাবে এবং স্থায়ীভাবে উন্নত জাতের বীজের ব্যবহার চালু করা যাবে না। উন্নত জাতের বীজের দাম বেশি তা সত্য; কিন্তু উৎপাদন বাড়াতে হ'লে এ ছাড়া আর কোন উপায়ও তো নেই। কেননা, পাটের চাষ বেশি বাড়াবার মত জমির প্রাচুর্য আমাদের নেই। অন্য কোন ফসলের চাষ না ক'রে তার জায়গায় পাটের চাষ করাও সম্ভব নয়।

পাটের আঁশ ভাল করার সবচেয়ে বড় আর এক-মাত্র উপায় হচ্ছে পাট পচানোর জন্য ভাল ব্যবস্থা করা। পাকিস্তানে, বাস্তবিক, পাট পচানোর ভাল ব্যবস্থা আছে, আর সেইজন্যই ভাল পাটের জন্য পাকিস্তানের উপর আমাদের অনেকখানি নির্ভর করতে হয়।

পাট পচানোর যাতে ভাল ব্যবস্থা করা যায়, তার প্রারম্ভিক কাজ হিসাবে পাট পচাবার নতুন পদ্ধতির কাটাতে বা এরকম পদ্ধতির ঝালাই করাতে পাট-চাষীর যত খরচ পড়ে, তার শতকরা ৫০ টাকা সরকার থেকে দেওয়া হচ্ছে। এ টাকা দেওয়া হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান থেকে। এভাবে সাহায্য করার ব্যবস্থাটা চালু থাকা দরকার; তাই ঠিক হয়েছে যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর কালে পাট পচানোর জন্য ১৬,০৪০টি নতুন পদ্ধতির কাটাতে এবং ৮,০২০টি পুরানো পদ্ধতির ঝালাই করতে অর্থ-সাহায্য দেওয়া হবে।

এ ছাড়া যেসব কাজের ব্যবস্থা করা দরকার, সেগুলোর হচ্ছে: (১) রোগ, পোকা প্রভৃতির আক্রমণ থেকে পাটগাছ রক্ষা করা, (২) উন্নত ধরনের কৃষি-পদ্ধতি প্রদর্শন করা, (৩) পাটের বীজ বোনার কল, চাকা-নিড়ানী, প্রভৃতি আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা, এবং (৪) রাসায়নিক সার কেনার জন্য চাষীদের টাকা ধার দেওয়া। ইতোমধ্যেই বহু বীজ-বোনা কল, চাকা-নিড়ানী প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যের পাটচাষে ব্যবহার করার জন্য সরবরাহ করা হচ্ছে, এবং এসব কেনার টাকা দিচ্ছেন ভারত-সরকার। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কালে প্রতিটি যন্ত্র ৭,২৫০টি করে সরবরাহ করা হবে বলে ধরা হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পাটের উন্নয়নের জন্য প্রথমে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। ১৯৫৩ সালে সরকার পাটের গুণের উন্নয়নের জন্য যে বিশেষজ্ঞ সমিতি নিয়োজিত করেন, তার সুপারিশ অনুসারে কাজ করার জন্য পরে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে ৮০ লক্ষ টাকা করা হয়। পরিকল্পনা-সংক্রান্ত কাজের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন কেন্দ্রীয় সরকার,—শুধু উন্নত জাতের পাট-বীজ কম দামে চাষীদের দেওয়ার দরদুন যে লোকসান গেছে, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য-সরকারগুলি সমান ভাগে বহন করেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে রাজ্যগুলির পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার জন্য ৮৪.২৮ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা হয়েছে। তার উপর যেসব কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন তাঁদের দরদুন এবং বিবিধ খাতে খরচ ধরা হয়েছে ৩০ লক্ষ টাকা। এ ছাড়াও উত্তরপ্রদেশে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাইরে পাটের উন্নয়ন-কাজের জন্য ব্যয় হবে ৫ লক্ষ টাকা। মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ১১৯.২৮ লক্ষ টাকা; এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য-সরকারগুলোর ব্যয়ের ভাগ কী রকম পড়বে নিচে তা বলা হচ্ছে:

(১) কর্মচারী ও বিবিধ: শুধু উত্তরপ্রদেশের ব্যয়ভারটা সেখানকার রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার সমানভাগে বহন করবেন; তা ছাড়া বাকি

সমস্ত রাজ্যের দরদুন সম্পূর্ণ ব্যয়ভারটা বহন করবেন কেন্দ্রীয় সরকার।

(২) বীজবোনা কল, চাকা-নিড়ানী, পচানোর পুকুর এবং কম দামে পাটবীজ দেওয়া: কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য-সরকারগুলি শতকরা ৫০ : ৫০ ভাগ হিসাবে ব্যয়ভার বহন করবেন।

উন্নয়ন-পরিকল্পনার দরদুন এই ব্যয় ছাড়া গবেষণা-কাজ পরিচালনার পরিকল্পনার দরদুন ব্যয় করা হবে ৩৪.০ লক্ষ টাকা। উক্ত কাজের জন্য এই টাকাটা অনুদান হিসাবে ভারতের কেন্দ্রীয় পাট-সমিতির হাতে দেওয়া হবে।

আখ

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৭০ লক্ষ টন আখ বেশি জন্মাবার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল। এতে ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট ৬৩২ লক্ষ টন আখ জন্মাবার কথা। দুই উপায়ে এই উৎপাদন বাড়ানোর কথা হয়: প্রথমত, আখের চাষে ৪২ লক্ষ একরের জায়গায় ৪৫ লক্ষ একর জমি লাগিয়ে এবং দ্বিতীয়ত, একরপিছু উৎপাদন বাড়িয়ে।

১৯৫১-৫২ সালে উৎপাদন বেড়েছিল; কিন্তু ১৯৫২-৫৩ সালে সেই উন্নতি বজায় রাখা যায় নি, এবং তার পরের বছর উৎপাদন আরও কমে গেল। তবে পরিকল্পনার শেষ বছরে আখ উৎপাদন করা গিয়েছিল প্রায় ৫৮০ লক্ষ টন।

উৎপাদন কম হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে, আখের চাষে জমি বেড়ে যাওয়ার পরিবর্তে ১৯৫৪-৫৫ সালে দেখা গেল ৩৯ লক্ষ একর কমে গেছে। আখের চাষে এই কম জমি লাগানোর কারণ হচ্ছে, অন্য ফসলের চাষ করলে আয় বেশি হয়, আবহাওয়ার অবস্থা আখচাষের অনুকূল ছিল না, এবং আখের বীচন বসাবার সময়টাতে গুড়ের বাজারদর ছিল কম।

নিবিড়-চাষের পদ্ধতিতে আখের উন্নয়ন-পরিকল্পনা চালানো করা হয় প্রধান চিনি-উৎপাদনকারী

রাজ্যগদুলিতে ১৯৪৮-৪৯ সালে—পাঁচ বছরের জন্য। পরে এই সময়টা বাড়ানো হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষকাল অবধি। ১৯৫৫-৫৬ সালে উন্নয়নের কাজ চালানো হচ্ছিল প্রায় ৭.৫ লক্ষ একরে, আর ৩০ লক্ষ একরে একেবারে হাতই দেওয়া হয় নি। এর ফলে উন্নয়ন-অঞ্চলে যখন দেখা গেল যে, উৎপাদন শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বেড়ে গেছে, অনুন্নত অঞ্চলে তখন উৎপাদন কমে গিয়ে সামান্য ক্ষতি হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৪ লক্ষ টন গুড় উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এটা হিসাব করা হয়েছে মাথাপিছু দৈনিক চিনি-খরচ ১.৪ আউন্স থেকে ১৯৫৫-৫৬ সালে ১.৭৫ আউন্সে উঠে যাওয়ার আনুমানিক হিসাবের ভিত্তিতে। এর জন্য আখ-উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করতে হয়— ১৯৫৫-৫৬ সালে যেখানে উৎপন্ন হয়েছে ৫৮০ লক্ষ টন, তার জায়গায় ৭৪০ লক্ষ টন।

এই ১৬০ লক্ষ টন বেশি আখ উৎপাদনের জন্য আখচাষে বেশি জমি লাগানোর উপর বিশ্বাস করা যেতে পারে না; কেননা অভিজ্ঞতায় জানা গেছে যে, আখচাষের জমির উপর সাময়িক আবহাওয়ার প্রভাব ক্রিয়াশীল। নিবিড়-পদ্ধতিতে যদি চাষ করা যায়, এবং সেচ, সার আর উন্নত জাতের বীজের দিকে যদি মনোযোগ দেওয়া যায়, তা হলে জমি বেশি না লাগিয়েও এ পরিমাণ আখ বেশি উৎপাদন করা চলে।

এই কথাটা মনে রেখে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত বিষয়গদুলি অবলম্বন করতে হবে:

(ক) পূর্বে পরিকল্পনায় যেসব ব্যবস্থার কথা রয়েছে—

(১) বীচন-বাগান,

(২) সার-প্রয়োগ প্রদর্শন,

(৩) কৃষিপদ্ধতি প্রদর্শন,

(৪) গাছ রক্ষা করা,

(৫) আখ-উৎপাদন প্রতিযোগিতা (রাজ্য-ভিত্তিতে),

(৬) পচা-সার বা 'কম্পোস্ট' তৈয়ারির অভিযান,

(৭) উন্নয়ন-সংক্রান্ত কর্মচারী নিয়োগ,

(৮) শিক্ষণ দিয়ে কারিগরি কর্মী গড়ে তোলা,

(খ) নতুন দফা—

(৯) সেচের ব্যবস্থা,

(১০) কারখানা-এলাকাগুলোতে পাকা রাস্তা তৈরি করা,

(১১) বীজ ও রাসায়নিক সারের পরিবহন-ব্যবস্থা,

(১২) ব্যাপকভাবে সার-প্রয়োগ চালু করা এবং প্রচার।

আর্থিক ব্যবস্থা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আখের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ১.৩ কোটি টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খরচ হয়েছে প্রায় ৭২ লক্ষ টাকা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ খাতে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রকের সরাসরি ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৪.১০ লক্ষ টাকা। এ টাকা খরচ হবে ভারতীয় চিনি-কারিগরি সংস্থা ও ইক্ষুপ্রজনন-সংস্থার পরিকল্পনাগদুলির কাজে। এ ছাড়া, রাজ্য-সরকারগদুলির ইক্ষু-সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়নের পরিকল্পনাগদুলি রূপায়িত করার জন্য প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। উন্নয়ন-সংক্রান্ত ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য-সরকারগদুলি

লক্ষ গাট

৮০
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০

তুলো

পাট

উৎপাদনের
এবং
উন্নয়নের
লক্ষ্য



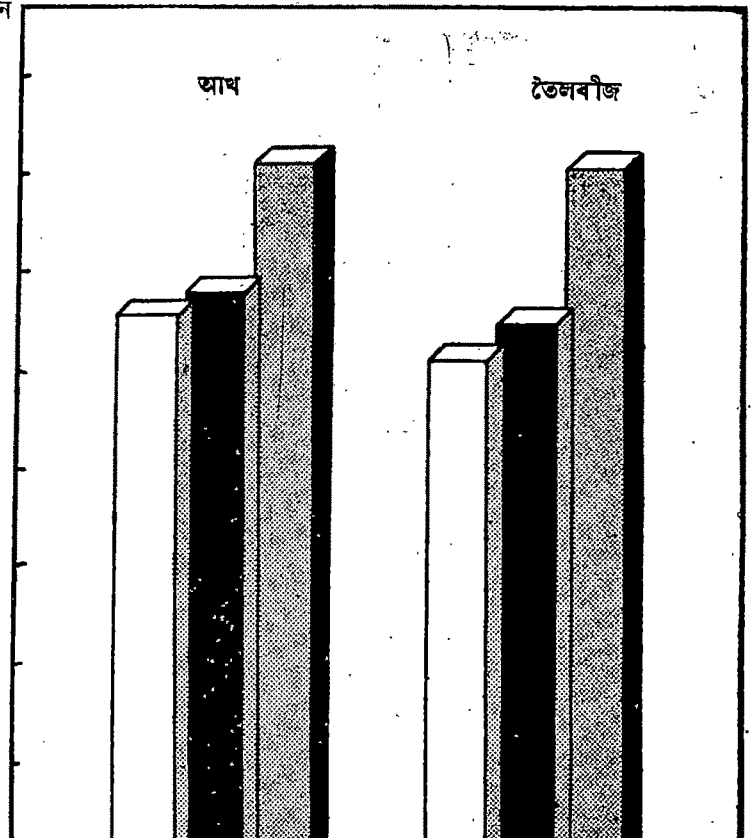
লক্ষ টন

৮০
৭০
৬০
৫০
৪০
৩০
২০
১০

আখ

তৈলবীজ

প্রতি ক্ষেত্রে
তিনটি স্তরের
বাঁদিকেরটিতে
১৯৫০-৫১
সালের, মাঝেরটিতে
১৯৫৫-৫৬
সালের এবং
ডানদিকেরটিতে
১৯৬০-৬১
সালের লক্ষ্য
দেখানো
হয়েছে



যুক্তভাবে বহন করবেন। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য-সরকারগুলিকে সাহায্য করার ব্যবস্থা করবেন এইভাবে :

কাজের দফা	আর্থিক সাহায্য
(১) চিনি-কারখানার এলাকাগুলোতে পাকা রাস্তা তৈরি	মোট খরচের ঠিক ভাগ দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার, ঠিক ভাগ দেবেন রাজ্য-সরকার এবং বাকি ঠিক ভাগ দেবেন চিনি-কারখানাগুলি এবং আখচাষীরা।
(২) ছোট ধরনের সেচ-ব্যবস্থা	খাদ্যোৎপাদন-পরিকল্পনার মতই, যেমন—(ক) রাজ্য-সরকারের পরিচালনায় জনসাধারণের কাজে ধার দেওয়া, (খ) বেসরকারী কাজ, খরচের টাকার শতকরা ২৫ ভাগ দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য-সরকার সমানভাগে।
(৩) উন্নত জাতের বীজ দেওয়া	প্রিমিয়ম ও পরিবহনের খরচ সহ প্রতি বাঙলা মণের দামের উপর আট আনা পর্যন্ত কম। লোকসানিষ্টা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য-সরকার সমানভাগে বহন করবেন।
(৪) ফসফেটী রাসায়নিক সার সরবরাহ	দামের টাকার শতকরা ২৫ ভাগ কম—কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য-সরকার সমানভাগে বহন করবেন লোকসানি খরচ।

কাজের দফা	আর্থিক সাহায্য
(৫) ব্যাপকভাবে সারপ্রয়োগ চালু করা ও প্রচার	বাড়তি কর্মচারীর দরুন যে খরচ হবে, সেটা সম্মত সমস্ত খরচাটাই কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য-সরকার শতকরা ৫০ : ৫০ হারে দেবেন।
(৬) চাষের প্রণালী ও সার-প্রয়োগ প্রদর্শন, গাছ রক্ষা করা প্রভৃতির জন্য ক্ষেত্র-কর্মচারী	ঠিক ভাগ খরচ কেন্দ্রীয় সরকার দেবেন।
(৭) যন্ত্রপাতি ও কীট-দমনের ওষুধ	খাদ্যোৎপাদন-পরিকল্পনার মতই, যেমন—(ক) যন্ত্র-বাবত রাজ্যগুলোকে টাকা ধার দেওয়া, এবং (খ) সাধারণভাবে ছিটানো এবং ছড়ানোর কাজে যে ওষুধ লাগবে, তার দামের শতকরা ৫০ ভাগ দেবেন উপকৃত ব্যক্তিরা এবং ৫০ ভাগ দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য-সরকার সমান ভাগে। আশের উপর কোন পোকের আক্রমণ যদি সংক্রামকভাবে আরম্ভ হয়, তবে তার প্রতিকারে যে খরচ পড়বে তার সবটাই কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য-সরকার শতকরা ৫০ : ৫০ হারে দেবেন।

যে অস্থায়ী শকরা-শুল্ক তহবিল থেকে এ পর্যন্ত উন্নয়ন-পরিকল্পনার খরচ যোগানো হয়েছে, ১৯৫৫-৫৬ সালের শেষে সেই তহবিলে অনুমান ২ কোটি টাকা অব্যয়িত রয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ ব্যয় করবেন, এই ২ কোটি টাকাও তার মধ্যে নেওয়া হতে পারে।

জাতীয় প্রসারণ-কৃত্যক ও সমষ্টি-উন্নয়ন পরি-কল্পনার কাজের মধ্য দিয়ে ইক্ষু-উন্নয়নের কাজ চালানোর বিষয়ও বিবেচনা করা হয়েছে। জাতীয় প্রসারণ-কৃত্যকের কর্মসূচি নানা কাজ নিয়ে; বিরাট কর্মক্ষেত্র জুড়ে তার বহু কাজ। তবে, সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনার অঞ্চলে যেসব উন্নয়ন-কাজ হওয়ার কথা, তার মধ্যে ইক্ষু-উন্নয়নের যেসব কাজের কথা বলা হয়েছে, তার সবই রয়েছে। কাজেই ইক্ষু-উন্নয়নের কাজের ভার সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে নেওয়া যেতে পারে। আখের চাষে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে এমন তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী দিলে, তাঁদের সাহায্যে সমষ্টি-উন্নয়নের কর্মচারীরা এ কাজও চালাতে পারেন। ইক্ষু-উন্নয়নের কাজ যদি ক্রমশ সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া যায়, তা হলে দ্বিগুণ খরচার হাত থেকে বাঁচা যায়।

গুড় আর 'খান্দসরি'র উন্নয়নের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা হচ্ছে।

তৈলবীজ

ভারতে ১৯৫০-৫১ সালে প্রধান পাঁচ রকমের তৈলবীজ উৎপন্ন হয়েছিল মোট ৫১ লক্ষ টন। এর থেকে চাষের বীজ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় অংশটা বাদ দিয়ে যা রইল, তা থেকে তেল পাওয়া গেল প্রায় ১৪.০৭ লক্ষ টন। সে-বছর দেশে ১.১২ লক্ষ টন নারকেল-তেল উৎপন্ন হয়েছে। বাইরে থেকে নারকেল-তেল আমদানি করতে হয়েছে ২৩ হাজার টন। পাঁচ রকমের মিলে তৈলবীজ রপ্তানি হয়েছে এদেশ থেকে ১.৮৩ লক্ষ

টন। এসব যেনে-থুয়ে এদেশের গৃহস্থালীতে ব্যবহারের জন্য উদ্ভিজ্জ তৈল পাওয়া গেছে ১৩.৬২ লক্ষ টন। মাথাপিছু গড়ে আমাদের দেশের লোকের ভাগ্যে যে ০.১ আউন্স ঘি-জোটে, সেটাও যদি হিসাবের মধ্যে ধরা যায়, তা হলে দেখা যায় যে, আমাদের সুষম খাদ্যে যতটা তেল ও স্নেহপদার্থ থাকা দরকার, আমরা পাই তার চেয়ে অনেক কম।

এটা বলা হল ১৯৫০-৫১ সালের কথা। এ অবস্থা দেখে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ঠিক করা হল যে, তৈলবীজের উৎপাদন অন্তত ৫৫ লক্ষ টনে ওঠাতে হবে। এ-সংক্রান্ত কাজটা কিন্তু ভালভাবে আরম্ভ করা গেল না। তা সত্ত্বেও ১৯৫৪-৫৫ সালে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়িয়েও আরও প্রায় ৪ লক্ষ টন বেশি ফলন হল।

দেশের লোকসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলল। তার ফলে প্রথম পরিকল্পনার শেষেও দেখা গেল যে, দেশে উদ্ভিজ্জ তেল যা উৎপন্ন হচ্ছে, আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই কম। তা ছাড়া, শিল্পের প্রয়োজনেও এই তেলের চাহিদা খুব বেশি। তাই কথা হয়েছে যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কালে তৈলবীজের বার্ষিক উৎপাদন ৭০ লক্ষ টনে ওঠাতে হবে। তার মানে, প্রথম পরিকল্পনায় যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল, তার চেয়ে উৎপাদন ১৫ লক্ষ টন বা শতকরা ২৭.৩ ভাগ বাড়াতে হবে। ৭০ লক্ষ টন উৎপাদন করতে হলে কোন্ বীজ কত জন্মাতে হবে বলে স্থির করা হয়েছে, নিচে তা বলা হলঃ

	লক্ষ টন
চিনেবাদাম	৪৭.০০
রাই ও সাদা সরষে	১০.৬০
তিল	৬.৫১
তিসি	৪.২৮
রেড়ি	১.৬১
মোট	৭০.০০

ভারতের কেন্দ্রীয় তৈলবীজ সমিতি এসবের ভাল জাতের বীজ উৎপাদন করে চাষীদের দিচ্ছেন। এসব বীজ বোনার ফলে গাছও হচ্ছে ভাল আর ফলনও পাওয়া যাচ্ছে বেশি। পাজাবে যেখানে সাধারণ চিনেবাদামের চাষ করে ফলন পাওয়া যায় একরপিছ ৪০০ পাউন্ড, সেখানে স্প্যানিশ জাতের চিনেবাদাম লাগিয়ে ফলন পাওয়া যাচ্ছে একরপিছ ১,০৮১ পাউন্ড। সাধারণ তিসি লাগিয়ে যেখানে একরপিছ ফলন পাওয়া যায় ৪০০ পাউন্ড, সেখানে উন্নত জাতের তিসির চাষ করে পাওয়া যাচ্ছে ৭৪০ পাউন্ড। সাধারণ রেডিভীজ থেকে যেখানে একরপিছ ফলন পাওয়া যেত মাত্র ২৯৬ পাউন্ড, সেখানে উন্নত জাতের তিসির চাষ করে পাওয়া যাচ্ছে ৭৪০ পাউন্ড।

এ থেকেই বোঝা যায় যে, আর বেশি জমিতে চাষ না বাড়িয়েও তৈলবীজের উৎপাদন-লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারি। তবে, চাষে ভাল জাতের বীজ বোনাটা হচ্ছে ফলন বাড়ানোর মাত্র একটি উপায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভাল জাতের বীজ উৎপাদনের জন্য গবেষণা করা ও সেই বীজ যথাযথভাবে বিতরণ করা ছাড়াও, তৈলবীজের চাষে সাধারণ সার ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার চালু করতে হবে; তা ছাড়া, নানা রকম রোগ আর পোকাতো এসব গাছের খুব ক্ষতি করে এবং তার ফলে ফসল কম হয়; তাই এসবের দমনেরও ব্যবস্থা করা হবে।

তৈলবীজের উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনাতে চিনেবাদাম আর রেডিকেই প্রাধান্য দেওয়া দরকার। ১৯৫৪-৫৫ সালে চিনেবাদাম জন্মেছিল ৩৮.২৩ লক্ষ প.উন্ড। দেশে ব্যবহার করা এবং বিদেশে রপ্তানি করা—এই দু'দিক দিয়েই চিনেবাদামের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাই স্থির হয়েছে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বার্ষিক ৪৭ লক্ষ টন চিনেবাদাম উৎপাদন করতে হবে।

১৯৫৪-৫৫ সালে রেডিভীজ উৎপন্ন হয়েছিল ১.১২ লক্ষ টন। কতকগুলো শিল্পে এর তেল

ব্যবহৃত হয়, তাই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এর বছর-পিছ উৎপাদন ১.৬১ লক্ষ টনে ওঠাতে হবে, স্থির হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, ভাল বীজ লাগিয়ে চাষ করে চিনেবাদাম আর রেডির ফলন বেশ বাড়ানো যায়। স্প্যানিশ বীজ লাগিয়ে কোন কোন জায়গায় চিনেবাদামের ফলন পাওয়া গেছে সাধারণ জাতের ফলনের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। কাজেই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৭ লক্ষ টন চিনেবাদাম, ১.৬১ লক্ষ টন রেডিভীজ এবং ২১.৩৯ লক্ষ টন অন্যান্য তৈলবীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে পৌঁছানো বিশেষ কষ্টসাধ্য হবে না।

১৯৫২-৫৩ সালে তৈলবীজ রপ্তানি হয়েছে ৩.৮৯ লক্ষ টন। এর মধ্যে চিনেবাদাম ছিল ১.৮৩ লক্ষ টন। মনে হয়, দ্বিতীয় পরিকল্পনার কালে তৈলবীজের রপ্তানির পরিমাণ ৭ লক্ষ টনে উঠে যাবে এবং তার মধ্যে চিনেবাদামই থাকবে ৫ লক্ষ টন। তা হলে দেশে ব্যবহৃত হবার জন্য তৈলবীজ থাকবে ৬৩ লক্ষ টন।

আর্থিক ব্যবস্থা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তৈলবীজ-উন্নয়নের গবেষণার জন্য প্রায় ৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ভারতের কেন্দ্রীয় তৈলবীজ-সমিতিতে ২৪.৫ লক্ষ টাকা অনুরোধ দেওয়া হবে—কেন্দ্রীয় তৈল-কারিগরি গবেষণ-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার জন্য। ভারতের কেন্দ্রীয় তৈলবীজ-সমিতির তহবিল থেকে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে নতুন ও ভাল জাতের তৈলবীজের উদ্ভাবন সম্বন্ধে গবেষণার প্রসারণের জন্য। বাকি যে ২৯.৫ লক্ষ টাকা তৈলবীজ-উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হবে, তার শতকরা ৫০ ভাগ দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাকি ৫০ ভাগ দেবেন রাজ্য-সরকারগুলি।

মহুয়া

দেবীকা সরকার

মৃদু মৃদু দক্ষিণা বাতাস। মৃদু আলোড়ন দিচ্ছে গাছটির ডালে। আর ফুল পড়ছে—যেন ফুলের বৃষ্টি হচ্ছে। কী সুন্দরই না ফুলগুঁলি। ঠিক যেন ছোট ছোট গোলাপজাম, রঙটা ঘিয়ের। রূপে রসে গন্ধে ভরপুর।

গাছের তলায় বসেছে ফুলের মেলা। সে মেলায় যোগ দিয়েছে যুবক-যুবতী, বৃন্দ-বৃন্দা, বালক-বালিকা। ফুল কুড়িয়ে ডালা-কুলোবস্তা ভর্তি করে নিয়ে যাচ্ছে বাড়িতে, আর খেয়েও নিচ্ছে যে যতটা পারে। কী মিষ্টি ফুল!

প্রথম ফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে নাচ আরম্ভ হয় ঐ গাছের তলায়—ফুলকে অভিনন্দিত করতে। কত গল্প-উপন্যাস রচিত হয়েছে এই নাচ নিয়ে। সে কথা যাক। ফুল ঝরে পড়ে। প্রতি বৎসর পড়ে। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি থেকে চৈত্র মাসের শেষ পর্যন্ত অজস্র মহুয়াফুল পড়ে। এই মহুয়ার ফুলের ও তার ফলের ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু জানতে নিশ্চয় আপনাদের কৌতূহল হবে, তাই বলছি।

মহুয়া ফুলটি গাছের তলায় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই সেটি খেয়ে ফেলেন। যেমন রসে ভর্তি, তেমনই মিষ্টি। ভিতরে কয়েকটি রেনু আছে। ওটা বেছে ফেলার আর সবুর নয়। অনেকে বেছেও খান। গাছ থেকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলটির গায়ে থাকে একটা চট্‌চটে আঠা, আঙুলে লেগে যায়।

কাঁচা ফুল খাওয়া হয়। খেতে মিষ্টি। তার গন্ধটা বড়ই মিষ্টি। চাপ দিয়ে রস করে আঙুরের রসের মতও কেউ কেউ খান। বেশি খেলে কিন্তু নেশা হয়। এই রস জ্বাল দিলে বেশ গুড় হয়। মুড়ি কি খৈ সহযোগে এ গুড় সুখাদ্য। কাঁচা ফুল চালের গুড়ো কি ময়দার সঙ্গে পিশে অতি

উৎকৃষ্ট পিঠে তৈরি হয়। ফুলগুঁলি শুকিয়ে গেলে একটু লালচে রঙ ধরে এবং দেখতে হয় ঠিক যেন কিসমিসটি। তেঁতুলের বিচির কাইএর সঙ্গে সিদ্ধ করে একে একটা সুখাদ্যে পরিণত করা হয়। তেঁতুলবিচির ভিতরের সাদা শাঁসের স্বাদ একটু টক; তার সঙ্গে মহুয়া ফুলের মিষ্টি স্বাদ যুক্ত হয়ে জিনিসটাকে বেশ মুখরোচক করে তোলে। এটা শুধু অথবা মুড়ির সঙ্গে খাওয়া চলে।

এই ফুল 'বাখর'-সংযোগে পিচিয়ে এবং চোলাই করে অতি উৎকৃষ্ট মদ্য তৈরি হয়, এই মদ্য এবং এই শুকনো ফুল বহুল পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হয়। চোলাই করার পর যে অবশিষ্টাংশ থাকে, তা খইলের সঙ্গে গোরু-মহিষের খাদ্য এবং জমির সার। গোরু-মহিষের পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে এর বহুল প্রচলন আছে। চাষের দ্ব' ঘণ্টা আগে একটা মহিষকে দ্ব' সের ভিজানো ফুল খড়ের সঙ্গে খেতে দিলে সে সকাল থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত লাঙল টানবে; তাতে তার একটুও কষ্ট কি ক্লান্তি বোধ হবে না। ওটার নেশাতে সে মশগুল হয়ে থাকবে। চাষীদের এটা একটা অপরিহার্য জিনিস। চাষের পূর্বে এটা নিশ্চয়ই সংগ্রহ করে রাখতে হবে। বাজারদর থাকে মণ ৫ টাকা থেকে ১০ টাকা পর্যন্ত।

তারপরে ফলের কথা। ফলগুঁলি কাঁচি আমের মতই দেখতে। একটু কষ আছে। উপরের ছালটা সিদ্ধ করে তার ডালনা ও চচ্‌ড়ি করা হয়। ফল পাকলে ওর বীজ থেকে যে তেল পাওয়া যায় সেটা 'কচড়ার তেল' নামে পরিচিত। ঘানির সাহায্যে ও তেল বের করা যায়, আবার অন্য উপায়েও চাপ দিয়ে তেল বের করে নেওয়া যায়। এ কাজটার কথা একটু পরিষ্কার করেই বলি। দু'টি খুব পুরনু তক্তা এক পাশে সংলগ্ন করা হয়। নিচেরটাতে থাকে

একটি গর্ত-করা, ঐ গর্তের সঙ্গে থাকে একটি নালা কাটা এবং নালার নিচে থাকে একটি পাত্র—যার মধ্যে তেলটা গড়িয়ে পড়বে। ঐ গর্তের মধ্যে অল্পকিছু চূর্ণ করা বীজ দিয়ে, গর্তের পাশটা কিছু খড় কি বস্তা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়, যাতে চাপ পড়লে চূর্ণগুলি সরে যেতে না পারে। এর পর উপরের তক্তাখানা ওর উপর চাপিয়ে দিয়ে, দুইটি তক্তা শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে চাপ দেওয়া হয়—যার ফলে দুটো তক্তা জুড়ে যায় এবং মাঝে কোন ফাঁক থাকে না। চাপ খেয়ে তেল নিক্কাশিত হয়ে ঐ নালা বেয়ে পাত্রে এসে পড়ে। প্রক্রিয়াটা এমন-কিছু কঠিন নয়। সরষের তেল অর নারকেল-তেলও এভাবে নেওয়া যেতে পারে। বীজ-চূর্ণগুলি গরম করে চাপ-যন্ত্রে ফেললে তেলটা শীঘ্র বের হয়।

কচড়ার তেল সরষের তেলের মত সুগন্ধ নয় বটে, তবে কৃষকেরা—বেশির ভাগ সাঁওতালেরা—এ তেল গায়, মাথায়, রান্নায় এবং প্রদীপে পোড়ানোর কাজে ব্যবহার করেন। নিজের বাড়ির গাছের ফল, নিজের করেন তেল ; অপরের মুখাপেক্ষী হবেন কেন সরষের তেলের জন্য। এ তেলের খইলও গোরু-মোষের খাদ্য।

ভারতের প্রায় সর্বত্র মহুয়াগাছ দেখতে পাওয়া যায়। একটু গরম আবহাওয়া এরা পছন্দ করে। অতি নিকৃষ্ট মাটিতে এরা পুষ্টলাভ করতে পারে। রাস্তার পাশে, বাঁধের ধারে, ক্ষেতের আইলে—সব ডাঙা জমিতেই এ গাছ জন্মে। ঘন-পল্লব এবং শাখা-প্রশাখাবহুল এ গাছকে দূর থেকে দেখতে কতকটা আমগাছের মত দেখায়। এ গাছের কাঠ

খুব শক্ত ; লাঙল, দরজার চৌকাঠ, ঘরের পাড়, আড়া প্রভৃতি এ কাঠ দিয়ে করা যায়। জলানি হিসাবে তো ব্যবহার করা যায়ই। তবে এই গাছকে লোকে পবিত্র বলে মনে করে। নিতান্ত বিপন্ন না হলে এ গাছ কেউ কাটে না। না কাটাই উচিত। তার কারণ সুস্পষ্ট। আর্থনৈতিক দিক থেকে এগাছ বিশেষ মূল্যবান। একটি গাছ থেকে বছরে ৪০-৫০ টাকা আয় হয়। এর ফল-ফুল উভয়ই অর্থকরী। একটি বড় গাছ থেকে ৮-১০ মণ শুকনো ফুল পাওয়া যায়। বাজারদর ৫ টাকা মণ হলে ৪০-৫০ টাকা আয় হয়। তারপরে ফলতো আছেই। কোন গৃহস্থের ১০টি মহুয়ার গাছ থাকলে তা থেকে যে ৫০০ টাকা ঘরে আসবে সে বিষয়ে তো সন্দেহ নেই।

মহুয়াগাছ পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অঞ্চলে বিশেষ করে সাঁওতাল অধ্যুষিত স্থানগুলিতেই বেশি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সারা দেশেই এ গাছ লাগানো উচিত। বনমহোৎসবে এ গাছটিকে ভুললে চলবে না। এ গাছ লাগানোর মানে পল্লী-আর্থ-নৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা।

গত যুদ্ধের বাজারে মোথলেটেড স্পিরিটের দাম চড়ে গেলে এই ফুলের ‘অ্যালকোহল’ দিয়ে বার্নিশের কাজ এবং অন্যান্য স্পিরিটের কাজ চালানো হয়েছে। “কচড়ার তেল” অর্থাৎ মহুয়ার তেল সাবান-শিল্পের জন্য বহু পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হয়। মহুয়ার তেলের রূপান্তর ঘটিয়ে দালদাও তৈরি করা হয়। কাজেই শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এর বিশেষ একটা স্থান আছে।

কৃষি-উন্নয়নের অভিযানে ১৯৫৬-৫৭ সাল

দেশের উন্নয়ন এবং পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ১৯৫৬-৫৭ সাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বছরেই দেশোন্নয়নের একটি অধ্যায় শেষ হচ্ছে এবং আরম্ভ হচ্ছে নতুন অধ্যায়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে 'অধিক ফসল ফলাও অভিযান' অনুসারে উন্নত সেচের সুবিধা, অধিক পরিমাণে সার ব্যবহার, উন্নত শ্রেণীর বীজ ব্যবহার ইত্যাদি নিবিড় চাষ-ব্যবস্থা অবলম্বন করায় প্রাকৃতিক অবস্থা (এতে রাজ্যের অনেকখানি অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়) প্রতিকূল থাকা সত্ত্বেও কৃষি-উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে অর্থাৎ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শেষ হবার আগের বছর চাল উৎপন্ন হয় ৪১ লক্ষ ১৬ হাজার টন। ১৯৫১-৫২ সালে উৎপন্ন চালের পরিমাণ ছিল ৩৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টন। অর্থাৎ ১৯৫১-৫২ সালের তুলনায় ১৯৫৫-৫৬ সালের উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ বেশি হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট আবাদী জমিতে সেচের ব্যবস্থাও প্রায় স্বেচ্ছায় বৃদ্ধি পায়।

কৃষি-বিষয়ে এই উন্নতি যে শুধু উপরি-উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যই হয়েছে তা নয়, তার সঙ্গে নিম্নলিখিত কারণগুলিও ছিলঃ (১) কৃষিশিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা, (২) কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য ব্যাপক সম্প্রসারণ কাজ এবং (৩) একদল আত্মবিশ্বাসী ও ওয়াকিফহাল কৃষক। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে এসবের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে।

কৃষিশিক্ষার ক্ষেত্রে আলোচ্য বর্ষে কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তার সম্ভব হয়েছে এবং কৃষকরা সে জ্ঞান কাজে লাগিয়েছেন। অর্থাৎ সে জ্ঞান কৃষকদের মনে স্থায়ী হয়ে গেছে। কৃষি কলেজটিকে এর

স্থায়ী ভবন হরিণঘাটায় স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হরিণঘাটায় কলেজ-ভবন খুব শীঘ্রই নির্মিত হয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। উচ্চ পর্যায়ে কৃষিশিক্ষা দেবার কলেজ ছাড়া বর্তমানে রাজ্যে কৃষিশিক্ষার দু'টি বদিনিয়াদী বিদ্যালয়, ইউনিয়ন কৃষি-সহকারীদের তিনটি শিক্ষাকেন্দ্র এবং চারটি সম্প্রসারণ শিক্ষাকেন্দ্র (কৃষি-কলেজে একটি সম্প্রসারণ শাখা আছে) রয়েছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায়ও হরিণঘাটায় একটি কৃষি-গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা আছে। কল্যাণী কৃষিক্ষেত্রটিকে এই প্রতিষ্ঠানের কৃষিক্ষেত্র হিসাবে কাজে লাগানো হবে। এ ছাড়া অপর কোন-একটি কৃষিক্ষেত্রে গবেষণা উপশাখা খোলারও প্রস্তাব রয়েছে।

সমষ্টি-উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় ব্যাপক সম্প্রসারণ কাজের ব্যবস্থা রয়েছে এবং এর ফলে কৃষি-গবেষণালব্ধ জ্ঞান সহজে কৃষকদের কাছে পৌঁছবে। 'ফার্মাস ফোরাম' নামে কৃষকদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গঠনের সাম্প্রতিক আন্দোলন ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং আশা করা যায়, এর ফলে দেশের কৃষকরা আত্মবিশ্বাসী ও ওয়াকিফহাল হয়ে উঠবেন।

আলোচ্য বর্ষে রাজ্যে অভূতপূর্ব বন্যা হয়েছিল। এই বন্যায় মোট প্রায় ৮ লক্ষ ৫০ হাজার একর ধান-জমির ক্ষতি হয়। এই পরিমাণ রাজ্যের মোট ধান-জমির আট শতাংশ। বন্যায় ধান নষ্ট হয় আনুমানিক ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন।

বন্যাশ্রাবিত অঞ্চলে সরকার আশু সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। সাহায্যের বিস্তৃত বিবরণ খাদ্য দ্রব্য ও সংভরণ বিভাগের কাছ থেকে পাওয়া যেতে

পারে। সাহায্যদানের ব্যাপারে কৃষিবিভাগ বন্যা-প্লাবিত অঞ্চলে বিনামূল্যে পশু-খাদ্য এবং গো-মড়ক রোধের জন্য ঔষধ বিতরণ করেন। পশু-খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ১০৪ টাকা এবং ঔষধের মূল্য ৯ হাজার ৬০০ টাকা। এ ছাড়া বন্যাক্রান্ত কৃষকদের বিনামূল্যে বীজ দেওয়া হয় যাতে তাঁরা শীতকালীন ফসল বুনতে পারেন।

নিবিড় চাষ অভিযানের ফলে চলতি বছরে সব-চেয়ে বেশি রাসায়নিক সার বিক্রি হয়। এ বছর কৃষকরা ৩২ হাজার টন অ্যামোনিয়াম সালফেট, ১৬ হাজার টন মিশ্র সার, ৪ হাজার টন হাড়ের গুঁড়া এবং ৪ হাজার টন সুপার ফসফেট ব্যবহার করেন। কৃষকদের মধ্যে উন্নত বীজ বিতরণ করা হয় ৭৩ হাজার মণ। এসব ছাড়াও, এ বছর চারারক্ষার কাজ বিশেষ জোর দিয়ে করা হয়। সরকারের এইসব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলেই দারুণ বন্যা সত্ত্বেও এ বছর ধান উৎপাদন আগের বছরের মতোই হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

কৃষিবিপণনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হচ্ছে ১৫০টিরও বেশি কৃষিবিপণন সমবায় সমিতি গঠন এবং এগুলির কাজ সন্তোষজনকভাবে চলছে। বর্ধমানে একটি সমবায় ঠান্ডা গুদাম গঠনের ব্যাপারে সরকার ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণ দিয়ে সমবায়ীদের উৎসাহিত করেন। সরকারী তত্ত্বাবধানে গুদামঘর নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এই ধরনের গুদাম ভারতে আর কোথাও নেই।

আগামী বছরের গোড়ার দিকে রাজ্য গুদাম কর্পোরেশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই গুদাম পরিকল্পনা রূপায়িত হলে রাজ্যের প্রাথমিক উৎপাদনকারীদের প্রভূত উপকার হবে, কারণ তার ফলে তাঁরা তাঁদের উৎপন্ন পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে আর বঞ্চিত হবেন না।

পশুপালন

পশুপালনের ক্ষেত্রেও রাজ্য অনেকখানি কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। দেশী গোরুর জাত উন্নয়নের জন্য ভাল জাতের ঘাঁড় এবং বাচ্চা তোলার জন্য হাঁসমুরগি ও ডিম বিতরণ আরও ব্যাপকভাবে করা হয়। কেন্দ্র-গ্রাম পরিকল্পনা অনুসারে পল্লী-অঞ্চলে আরও পাঁচটি কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র ও ৩০টি শাখা কেন্দ্র খোলা হয়।

পশুচিকিৎসা

কৃষি ও পশুপালন-সংক্রান্ত কার্যকলাপের সঙ্গে সঙ্গে পশুচিকিৎসার ব্যবস্থাও বাড়ানো হয়। জেলা ও মহকুমা সদরে পশুচিকিৎসালয় খোলা হয়। দেশে সাধারণভাবে পশুচিকিৎসকের সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও ৪৮টি জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকে পশুচিকিৎসা কর্মী নিযুক্ত করা হয়। পশুচিকিৎসা কর্মীর অভাব মেটানোর জন্য কলিকাতার পশু-চিকিৎসা কলেজে চার বছরের ডিগ্রি কোর্স ছাড়াও দুই বছরের সংক্ষিপ্ত ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সহযোগিতায় বেঙ্গল ভেটেরিনারী কলেজে গো-বসন্তের টিকা তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। কলেজে আধুনিক যন্ত্রপাতি বসিয়ে উক্ত টিকা তৈরি করা হচ্ছে এবং শুধু এই রাজ্যেই নয় উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রতিবেশী রাজ্যেও টিকা সরবরাহ করে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্রচুর পরিমাণে টিকা সরবরাহ করা হয়েছে। গ্রামে এগুলি ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে।

কলিকাতা ও অন্যান্য পৌর এলাকায় কসাইখানার উন্নয়ন এবং গোহত্যা—এই দুই প্রশ্ন বিবেচনার জন্য দুটি কমিটি গঠিত হয়েছে।

বৃহত্তর কলিকাতায় দুগ্ধসরবরাহ

প্রচুর অসুবিধা সত্ত্বেও বৃহত্তর কলিকাতা দুগ্ধ-সরবরাহ পরিকল্পনার কাজ এ বছর ভালভাবেই

এগোয়। দূষক-কলোনির প্রথম ইউনিটটি ইতি-
মধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে এবং শীঘ্রই শিল্পাঙ্গুলের
খাটালগুলি অপসারণের কাজ আরম্ভ হবে।
দূধের কারবার বৃদ্ধি পেয়েছে, এখন দৈনিক ৫২০
মণ দূধের কারবার হচ্ছে। দূধ-বিতরণের ডিপোর
সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে, এখন এই সংখ্যা ১০৯।
কলিকাতার খাটালগুলি অপসারিত হ'লে দূধ-
সরবরাহের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে এবং আশা
করা যায় যে, কয়েক বছরের মধ্যেই আমরা
আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবো। অর্থাৎ
বৃহত্তর কলিকাতা শিল্পাঙ্গুলের ৪০ সহস্রাধিক
দূধবতী গাভী অপসারিত হবে এবং কলিকাতায়
ও আশপাশের সমগ্র শিল্পাঙ্গুলের সম্পূর্ণ দূধের
চাহিদা মেটানো হবে।

কল্যাণীতে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পশুখাদ্য
উৎপাদনের জন্য ৩ হাজার একর জমি সংগ্রহ করা
হয়েছে এবং আশা করা যায়, আগামী আর্থিক

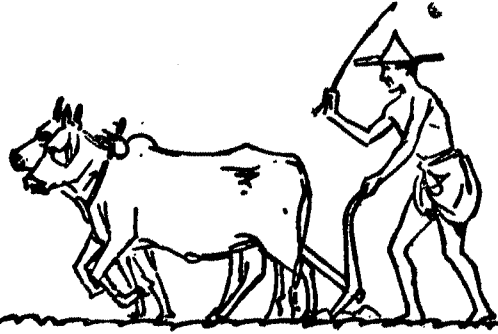
বছরের মাঝামাঝি এই কৃষিক্ষেত্রে (ভারতে পশু-
খাদ্যের বৃহত্তম কৃষিক্ষেত্র) উৎপাদন আরম্ভ হবে।
কলিকাতায় একটি বড় ডেয়ারি স্থাপনের জন্যও
জমি সংগ্রহীত হয়েছে। এই ডেয়ারিতে দৈনিক
৬ হাজার মণ দূধের কারবার হবে বলে আশা
করা যায়। এটি স্থাপন করতে ৭২ লক্ষ টাকা
খরচ হবে।

বন

রাজ্যে বনসংরক্ষণ ও বনোন্নয়নের কাজ যথারীতি
সম্পন্ন হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়
বনসৃষ্টির কর্মসূচির প্রায় পুরো কাজই হয়।
প্রায় ৩১ বর্গমাইল পতিত জমিতে বনসৃষ্টি করা
হয়। এ ছাড়াও প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়
ময়ূরাক্ষী জলাধার পরিকল্পনায় তৈরি ৩০ মাইল
খাল পাড়ে, সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনা অঞ্চলের
১,১০৪ একর পতিত জমিতে এবং সমুদ্র উপকূল
অঞ্চলের ১,৫২২ একর জমিতে বনসৃষ্টি করা
হয়।



লাঙ্গল যার জমি তার....



জমিনির, এমন কি তাঁর পূর্ববর্তী যুগ থেকে আরম্ভ করে কোটাল্য ও টোডরমন্দের যুগে এবং লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমল পর্যন্ত রাজস্ব-আদায়কারীরা চাষীর প্রতি কোনো দায়িত্ব না নিয়েই জমির মালিক হয়ে বসেন। এই বিভিন্ন যুগে ভারতবর্ষে বছবার কু-বর্ষ আইনের বহু পরিবর্তন হয়েছে—কখনও চাষীর দুগ্ধ-দুর্গন্ধা কিছু করেছে, কখনও তা চরমে উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী গ্রহণ আইন চাষীকেই সরাসরি জমির বন্দোবস্ত দিয়ে এই সব দুগ্ধ-দুর্গন্ধার অরসান ঘটাতে চলেছে।

এতকাল ধরে উপদ্রবভোগীরা যে মুনাকা করে এসেছেন এখন সে-টাকা দিয়ে আগের জনগণের কাছেই — গ্রামোন্নয়ন এবং জনকল্যাণমূলক মানা কাজের মধ্য দিয়ে।

ব্যক্তিগতভাবে কেউ-ই ৩৩ একরের বেশি জমি রাখতে পারবেন না—এই আইন করে দেওয়ার কালে এখন চারলক্ষ একর জমি ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গের এই জমিদারী গ্রহণ আইনে সকলের প্রতি ভাব্য কতিপূরণের ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া, হাজার হাজার ভূমিহীন চাষীর কর্মসংস্থান হবে; তাদের জমিও বাড়বে অনেক আর, প্রেরণা বোগায়ে চাষীদের হাতে করে তারা আরও বেশি খাতিশত উপাধনের লভ আরও বেশি পরিগ্রহ করে।

এ আইন সুফলা সুফলা শস্যশ্যামলা

সোনার বাংলা

পড়ে তোলবার জন্যই



ভাষাভাষীদের জাতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত



রেড়ির চাষ

ষেষর ফলের বীজ থেকে তেল পাওয়া যায়, রেড়ি তার মধ্যে একটি। অর্থকর ফসল হিসাবে এর মূল্য কম নয়। গত বছরের চৈত্র-সংখ্যা 'বসুন্ধরায়' প্রকাশিত 'আয়কর ফসল' শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের পাঠক-পাঠিকারা দেখতে পেয়েছেন যে, ভারতের স্থিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তৈলবীজ হিসাবে রেড়ির চাষের উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

তৈলবীজ হিসাবেই রেড়ির কদর সবচেয়ে বেশি বটে, কিন্তু রেড়ির গাছ এমনই একটি গাছ যার সর্বকিছুই আমাদের কাজে লাগে। প্রথমেই ধরা যাক রেড়ির তেলের কথা—ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'ক্যান্টার অয়েল'। উৎকৃষ্ট জ্বালাপ হিসাবে শোধিত 'ক্যান্টার অয়েল' অর্থাৎ রেড়ির তেল আমাদের সকলেরই পরিচিত। কেশচর্চার, কেশচর্চার এবং মাথা ঠান্ডা রাখার উপাদান রূপে সুগন্ধী রেড়ির তেল এখন দেশের সর্বত্রই প্রখ্যতি পেয়েছে। রেড়ির তেল বললে হয় তো মাথায় মাথতে হাত এগোবে না, কিন্তু সুগন্ধী 'ক্যান্টার অয়েল' আজকাল অনেকেরই দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অপরিহার্য জিনিস।

রেড়ির তেলের প্রদীপের আলো অতি স্নিগ্ধ বলে চোখের পক্ষে পরম হিতকর। আজও এ তেলের প্রদীপের ব্যবহার পল্লী-অঞ্চলে দেখা যায়। কিন্তু শহর-অঞ্চলে এর প্রদীপের প্রয়োজন যে কত বেশি, তা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। স্বর্ণ-শিল্পীর সোনা ঝালাই দেওয়ার কাজে একটি মাটির প্রদীপ দরকার হয়—তা অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন। সেটি রেড়ির তেলের প্রদীপ। চামড়া নরম করতে রেড়ির তেল লাগে। ছোট-বড় শিল্প-কারখানাগুলোতে প্রচুর রেড়ির তেল দরকার হয়। বিমানযানের কলকবজা চালান্নাথতে রেড়ির তেলের প্রয়োজন। মোমবাতি

তৈরিতেও এ তেল ব্যবহার করা হয়। এমনি সব নানা কাজে লাগে এই তেল, কাজেই শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এ তেলের চাহিদাও দেশে বেড়ে চলেছে।

রেড়িগাছের পাতা গোরুর প্রিয় সন্ধান্য। এই পাতা খেলে গোরুর দুধের পরিমাণ বেড়ে যায়। আমাদের রেশমশিল্পে এন্ডি অতি পরিচিত জিনিস। এন্ডি-পোকা থেকে এই এন্ডি-রেশম পাওয়া যায়। রেড়ির পাতা খাইয়ে এই পোকা বা এন্ডি-পল্ল পালন করা হয়। রেড়িগাছের শুকনো কাঠ বেশ ভাল জ্বালানি। দেশে জ্বালানিকারের এই ব্যাপক অভাবের দিনে এর উপকারিতার এ দিকটা একেবারেই উপেক্ষণীয় নয়।

চাষের কাজে জৈবসারের প্রয়োজনীয়তা আজ আর কারও অজানা নয় এবং গোবরসার আদর্শ জৈবসার। অথচ জ্বালানির অভাবে আমাদের দেশে গোবর শুকিয়ে পোড়ানো হয়। রেড়ির ব্যাপক চাষ যদি হয় তবে এ গাছের কাঠ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করলে অনেক গোবর বেঁচে যাবে এবং সার হয়ে আমাদের চাষের জমিকে উর্বর করবে।

কিন্তু এই পরোক্ষভাবে ছাড়া প্রত্যক্ষভাবেও রেড়ি আমাদের জমির সার যোগায়। রেড়িবীজ থেকে তেল নিকাশ করে নিলে যে খইল পাওয়া যায়, জমির তা উৎকৃষ্ট সার। তেল দিয়ে রেড়ি যে উপকার করে, খাদ্য-ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর এই অভিযানের কালে খইল দিয়েও তার চেয়ে কম উপকার করে না।

এত দিক দিয়ে উপকারী এই রেড়ির চাষ কিন্তু মোটেই কঠিন বা জটিল কাজ নয়। সাধারণ দোআঁশ মাটিতেই রেড়িগাছ ভাল হয়। এ গাছ জল-জমা সইতে পারে না, তাই এর চাষের জন্য উঁচু জমি দরকার। ব্যাপকভাবে চাষ করতে হ'লে, লাঙল দিয়ে, বেশ কিছু পরিমাণ গোবরসার ও পচাসার

দিয়ে, মই দিয়ে জমি ভালভাবে পাট ক'রে নিতে হয়। রেড়ির ফসলের পক্ষে গোবরসার ও পচাসার বিশেষ উপকারী। এতে গাছ ভাল হয় আর ফলনও বেশি হয়।

সেই পাট-করা জমিতে চার থেকে পাঁচ হাত অন্তর সারি ক'রে তাতে চার-পাঁচ হাত দূরে দূরে ছোট গর্ত ক'রে, প্রতি গর্তে দু'টি বীজ রোপণ ক'রে যেতে হয়। কেউ কেউ দু'টির বোঁশ বীজ রোপণের পক্ষপাতী; কিন্তু তাতে অনর্থক বীজের অপচয় মাত্র হয়।

মাঠের উঁচু বাঁধ, পুকুরের পাড় প্রভৃতির উপরও রেড়িগাছ করা যায় এবং অনেকে ক'রেও থাকেন। এসব জায়গায় সাধারণত এক সারি গাছই তোলা হয়। এ রকম জমিতে লাঙল দেওয়া চলে না; কাজেই কোদাল দিয়ে খুঁড়ে মাটি তৈরি করা হয়। অথবা চার-পাঁচ হাত দূরে দূরে ১×১×১ হাত আন্দাজ মাপের গর্ত খুঁড়ে, সার দিয়ে তার মাটি তৈরি ক'রে, প্রতি গর্তে দু'টি ক'রে বীজ রোপণ করলেই চলে। এক বিঘা জমির জন্য দেড় সের থেকে প্রায় দু'সের বীজ দরকার হয়।

মাটি যদি শুকনো হয় এবং তার দরুন অঙ্কুর আসতে দেরি হয়, তবে প্রত্যেক বীজ-থালিতে একটু ক'রে জল ছিটিয়ে দেওয়া দরকার। চারা একটু বড় হ'লে একবার নিড়েন দিয়ে সমস্ত আগাছা পরিষ্কার ক'রে ফেলতে হবে। সে সময় প্রত্যেক থালিতে একটি পুষ্ট চারা রেখে বাকি চারগুণি তুলে ফেলে দিতে হবে। কোন থালিতে যদি দু'টোই পুষ্ট চারা হয় আর কোন থালিতে দু'টো চারাই অপুষ্ট হয়, তবে এখানকার অপুষ্ট দু'টি চারাই তুলে ফেলে ওখান থেকে একটি পুষ্ট চারা এনে এখানে লাগালেই হ'ল। কোন থালিতে চারা যদি একেবারেই না জন্মায়, তবে সেখানে অপর থালি থেকে ফালতু

একটি পুষ্ট চারা এনে লাগানো যেতে পারে। রেড়ির গাছগুলিকে সব সময় আগাছা-শুষ্ক রাখা দরকার। প্রতি বার নিড়েন দেওয়ার সময় গাছের গোড়ার মাটি ঢিলে ক'রে দিলে গাছের বাড় ভাল হয়।

সাধারণত তিন জাতের রেড়ির চাষ হয়—বড়, মাঝারি, আর ছোট। বড় আর ছোট রেড়ির বীজ রোপণ করা হয় চৈত্রের শেষ ভাগ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ভাগ পর্যন্ত। এর ফল পাকে শ্রাবণের শেষ থেকে আশ্বিনের প্রথম ভাগ পর্যন্ত। মাঝারি রেড়ির বীজ লাগানো হয় আশ্বিন-কার্তিক মাসে এবং এর ফল পাকে চৈত্র মাস নাগাত।

ফল পাকলেই গাছ থেকে তুলে নিতে হয়। সপ্তাহখানেক কাল পাতা বা খড়ের চাপে রাখলে ফলগুলোর খোসা পচে ওঠে; তখন সেগুলোকে কয়েকদিন রোদে দিয়ে ভাল ক'রে শুকিয়ে নিতে হয়। তারপর কাঠের বা বাঁশের হাতমুদ্রার দিয়ে ঘা মারলে খোসা থেকে বীজ আলাদা হয়ে যায়।

বিঘাপিছু জমি থেকে ৫-৬ মণ রেড়িবীজ পাওয়া যায় এবং তা থেকে তেল পাওয়া যায় প্রায় দু' মণ।

ফল তোলা শেষ হয়ে গেলে জমি থেকে গাছ-গুলো উপড়ে নিয়ে এসে, শুকিয়ে জালানি করা যায়।

রাসায়নিক সার প্রয়োগে রেড়িগাছের কতটা উপকার হয়, সে বিষয়ে সঠিক কিছু নিশ্চিত হয়েছি ব'লে জানা যায় না। এ গাছে রোগের উপদ্রব বড় একটা হ'তে দেখা যায় না। কখনও কখনও কোন কোন পোকের আক্রমণ হ'তে দেখা যায়, তবে তাতে ফলনের বিশেষ ক্ষতি হ'তে দেখা যায় নি। রেড়ির পাতা গোরুর প্রিয় ও পুষ্টিকর খাদ্য; কাজেই গাছগুলো একটু বড় হয়ে না ওঠা অবধি গবাদির মূখ থেকে বাঁচানো দরকার।

‘দিগ্বিজয়’

কোন একটা ফসলের চাষ ক’রে, তা থেকে চাষী ঠিক কতটা লাভ করতে পারলেন, সেইটা দিয়েই হয় সেই ফসলের গুণগত এবং পরিমাণগত উন্নতির চরম পরীক্ষা।

গুজরাটে তুলোর উন্নয়ন-কাজে এই পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, উত্তর গুজরাটে ‘কল্যাণ’, মধ্য গুজরাটে ‘বিজয়’ এবং দক্ষিণ গুজরাটে ‘বীজাল্প’ নামে যে তিন রকমের তুলোর চাষ হয়েছে, সেগুলো অনেক উন্নত স্তরের। উন্নত জাতের প্রত্যেক রকম তুলোর পরীক্ষাতেই বিশেষভাবে দেখা হয়েছে যে, একরূপিত্ব জমিতে তার চাষ ক’রে চাষীর কত লাভ হয়েছে এবং আর্থনৈতিক দিক দিয়ে তার মূল্য কী।

কোন ফসলেরই উন্নয়নে চরম সীমা ব’লে কিছু নেই। যতটা উন্নতি হয়েছে, তার উপর আরও উন্নতি করতে হবে—এ লক্ষ্য নিয়েই চলে উন্নয়নের কাজ। গুজরাটের এই তিনটি অঞ্চলেও উন্নয়নের কাজ এগিয়েই চলল। মাত্র কিছুদিন আগে ‘দিগ্বিজয়’ নামে যে তুলো উদ্ভাবিত হয়েছে, মধ্য গুজরাটে নর্মদা আর মহী নদীর মধ্যবর্তী ৯ লক্ষ একরের উপর জমিতে তার চাষ ক’রে দেখা যাচ্ছে যে, এ তুলোর স্থান অনাসব উন্নত জাতের তুলোর উর্ধ্বে।

‘বিজয়’এর চেয়ে ‘দিগ্বিজয়’ তুলো একরূপিত্ব ২০ পাউন্ড বেশি ফলন দেয়। বীজের হারও একই

রকমের। কিন্তু ‘বিজয়’ থেকে যত সরু সূতো করা যায়, ‘দিগ্বিজয়’ তুলো থেকে তার চেয়েও দু’-তিন-নম্বর বেশি সরু সূতো করা চলে। চাষী একরূপিত্ব জমিতে ‘বিজয়’এর চাষ ক’রে যত টাকা লাভ পান, ‘দিগ্বিজয়’এর চাষ ক’রে পান তার চেয়ে ১০-১২ টাকা বেশি। বাজারদর ‘বিজয়’এর ২০৬ টাকা আর ‘দিগ্বিজয়’এর ২৫৩ টাকা।

রোচ্-এ যে তুলো উন্নয়নের কাজ চলছে, তার শুরুরকাল থেকে হিসেব নিয়ে দেখা গেছে যে, একরূপিত্ব জমিতে সাধারণ রোচ্ তুলোর চাষ ক’রে যত টাকা লাভ হয়, ‘বি ডি ৮’ তুলোর চাষ ক’রে তার চেয়ে ১৫ টাকা বেশি পাওয়া যায়, এবং ‘বিজয়’এর চাষ ক’রে তার চেয়েও ২১ টাকা বেশি পাওয়া যায়। দেখতে-না-দেখতে ‘বিজয়’ প্রায় নয় লক্ষ একর জুড়ে মধ্য গুজরাটের সমস্ত তুলো-চাষের জমি অধিকার ক’রে নিজের বিজয়পতাকা উড়িয়ে দেয়। চাষীদের আর ব্যবসায়ীদের চিন্তাজয় ক’রে ফেলে ‘বিজয়’।

সেই ‘বিজয়’এর চেয়েও ভাল তুলো ‘দিগ্বিজয়’। ‘বিজয়’ তুলো আর ‘১০২৭ এ এল এফ’ নামক তুলোর সংকর-মিলনে জন্ম হয়েছে ‘দিগ্বিজয়’ তুলোর। ১৯৫৫-৫৬ সালে এ তুলোর বীজ ছাড়া হয় সাধারণ চাষীদের চাষে বোনার জন্য। সমস্ত অঞ্চলটাতে ‘দিগ্বিজয়’এর চাষ ছড়িয়ে পড়লে চাষীদের লাভ হবে বছরে প্রায় ৯ কোটি টাকা।



হরিণম্বাটের দুধ

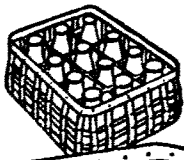
“জীবনে আমি ছিলাম
মি মি মি মি মি মি
এক, মিমায়ে কাছ
হয়, হুই, হুই পরীর
পুই হয়।”
—বর্ষত বাণীত
ম্যা ক ক্যা ডে ম
(পরিবর্তিতা বিনামূল্যে)



প্যাকটাইজ করা গরুর দুধ
প্রতি পাউন্ড ১/০
প্যাকটাইজ করা চৌধুর, দুধ
প্রতি পাউন্ড ১/০
মাখন
প্রতি পাউন্ড ২/০

(২ আউন্স ও ভার বেশি ওজনের প্যাকেটে)
ভরসা মি

প্রতি পাউন্ড ৩/০ (১ পাউন্ডের শীল করা ছোতলে)
কলকাতা, হাওড়া, বরাহনগর ও বনসের ১০০০ দুধের
মোকামে সকাল ৫-৫৫ থেকে ৭-৫৫ এর মধ্যে প্যাকট
বার। কতকগুলি লোকান অব্যবহিকভাবে ৫-৫০
থেকে ৩টা পর্যন্ত খোলা থাকে।



পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

প্রদর্শনী

বারাসতে

৬ই ও ৭ই এপ্রিল [১৯৫৭] বারাসতে একটি পশু ও কৃষি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ৬ই এপ্রিল কৃষিমন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ প্রদর্শনীর ম্বারোম্বাটন করেন এবং ৭ই এপ্রিল কৃষি-উপমন্ত্রী শ্রীআবদুস সৌকুর প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ উপলক্ষে সমবেত জনমন্ডলীর নিকট ভাষণে কৃষিমন্ত্রী কৃষি ও পশুপালনের উন্নততর পন্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে এরূপ প্রদর্শনীর গুরুত্বের উপর জোর দেন। এ সম্পর্কে রাজ্যসরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণের কাজে সরকারের সহিত সহযোগিতা করার জন্য তিনি জনসাধারণের নিকট অনুরোধ জানান।

এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে জনসাধারণ যে বিপুল আগ্রহ দেখিয়েছেন, পুরস্কার-বিতরণকালে শ্রী সৌকুর তার প্রশংসা করেন এবং অতি উচ্চশ্রেণীর কয়েকটি কৃষিজাত দ্রব্য ও পালিত পশু প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত করার জন্য কৃষকদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

বনগাঁয়

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন-মহাধ্যক্ষ শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই সি এস, চব্বিশপরগনা জেলার বনগাঁয় ২৭এ মার্চ [১৯৫৭] একটি মহকুমা প্রদর্শনীর উদ্বেদন করেন। প্রদর্শনীর মূখ্য আকর্ষণ ছিল একটি কর্মরত টেলিভিশন যন্ত্র। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রাজ্যের অগ্রগতি প্রদর্শন করে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের বিভিন্ন বিভাগ স্টল খেলেন। দৈনিক গড়ে প্রায় ৬,০০০ লোক প্রদর্শনী দেখতে আসেন। মহকুমার অধিবাসীরাও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। গোমহিষ-প্রদর্শনী, নাট্যকাভিনয়, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের আয়োজনও করা হয়।

৬ই এপ্রিল পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা ছিল। চব্বিশ-পরগনার জেলাশাসক শ্রী বি আর গুপ্ত পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বিতরণ করেন।

দার্জিলিঙে

দার্জিলিঙের উপ-মহাধ্যক্ষ শ্রী জে সি তালুকদার, আই এ এস, দার্জিলিঙের সোনাডায় পঞ্চম কৃষি শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্বেদন করেন। দার্জিলিঙ সদরের মহকুমা-আধিকারিক শ্রীমতী রমা মজুমদার, আই এ এস, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রদর্শনীতে সরকারী কৃষি, পশুপালন, জনস্বাস্থ্য, শ্রম ও স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগ অংশগ্রহণ করে। ২৯এ থেকে ৩১এ মার্চ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগ প্রদর্শনীতে শিক্ষামূলক তথ্যচিত্র প্রদর্শন করে। সমাপ্তির দিন শ্রীমতী রমা মজুমদার পুরস্কার বিতরণ করেন।

পোখরিয়াবঙ্গে

পোখরিয়াবঙ্গ খাসমহল বস্তিতে ৩১এ মার্চ [১৯৫৭] একটি পশুপক্ষী-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পোখরিয়াবঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী বস্তিসমূহের কৃষকগণ এই প্রদর্শনীতে নিজ নিজ পশুপক্ষী প্রদর্শন করেন। প্রদর্শনীতে চা-বাগানগুলির বহু শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন।

ভরতপুর সমষ্টি-উন্নয়ন ব্লকে

২রা এপ্রিল [১৯৫৭] মর্শিদাবাদের ভরতপুর সমষ্টি-উন্নয়ন ব্লকের উদ্যোগে ভরতপুরে আয়োজিত কৃষি স্বাস্থ্য ও শিল্প প্রদর্শনী শেষ হয়। এদিন কান্দির মহকুমা-আধিকারিক শ্রী কে পি ঘোষ পুরস্কার-বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় স্থানীয় প্রায় এক হাজার অধিবাসী উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে খেলাধুলার আয়োজন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনগণের নিকট ভরতপুরের গ্রামসেবক শ্রীঅতুলকুমার মৌলিকের হস্তপদবন্দ

অবস্থায় সন্তরণ বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল। সভাপতির ভাষণে শ্রী ঘোষ গ্রামাঞ্চলে এরূপ প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি বলেন। তিনি উদ্যোক্তাদের উচ্চ প্রশংসা করেন।

বেলডাঙ্গায়

সম্প্রতি মর্শিদাবাদের জেলাশাসক শ্রী পি সি মজুমদার, আই এ এস, মর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গায় পঞ্চদশ গোমহিষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীতে উন্নত জাতের গাভী, ষাড়, হরিয়ানা গোরুর বাছুর ও উন্নত জাতের হাঁস-মুরগি উপস্থাপিত হয়। গোমহিষ ও হাঁসমুরগির উন্নয়নের জন্য মর্শিদাবাদ জেলার যে কয়টি

নির্বাচিত অঞ্চল আছে, বেলডাঙ্গা তার অন্যতম। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কালে সরকার মর্শিদাবাদ জেলায় গোমহিষাদির উন্নয়নকল্পে ১.৭৬ লক্ষেরও বেশি টাকা ব্যয় করেছেন। ১৯৫৪-৫৫ সালে মজঃফরপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত গোমহিষ-প্রদর্শনীতে হরিয়ানা গোমহিষের জন্য এই জেলই ১ম, ২য় ও ৩য় পদস্কার পেয়েছে।

এ উপলক্ষে সমবেত বিরাট জনতাকে সম্বোধন করে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে জেলাশাসক এই অঞ্চলের গোমহিষের উন্নয়নে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং গোমহিষের উন্নতিকল্পে উন্নত পদ্ধতি অবলম্বনে পরামর্শ দেন।

চাষীর শত্রু ইঁদুর

ইঁদুরের ষয়

‘সাইনোগ্যাস’

ক্ষেত-খামারে, গুদামে এবং ধানের গোলার ধারে
ধারে ইঁদুর মারিবার জন্য ‘সাইনোগ্যাস’
ব্যবহার করুন

এর ব্যবহার
সম্বন্ধে আপ-
নাদের কৃষি-
সহায়কের
পরামর্শ নিন

শ ওয়ালেস অ্যান্ড কোং, লিঃ,
৪নং ব্যাংকশাল স্ট্রীট
কলিকাতা-১

পুরুলিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় রাজ্যসরকারের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে ২০এ এপ্রিল ১৯৫৭ পদুর্লিয়া জেলায় সফর করেন। সফরকারী দল সকালে থুর্লিন ও ঝালদা এবং বিকালে চিচা ও বাঘমুন্ডি পরিভ্রমণ করেন। সর্বত্রই স্থানীয় অধিবাসীরা মুখ্যমন্ত্রীকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

জেলার আর্থনীতিক উন্নয়নের একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী কয়েকটি অঞ্চল পরিদর্শন করেন। থুর্লিনে যেখান থেকে ভবিষ্যতে সুবর্ণরেখা নদীর জলসরবরাহ হবে, তিনি সেই স্থানটি পরিদর্শন করেন। অনুমান করা হয়েছে যে, পদুর্লিয়ার জন্য জলসরবরাহের যন্ত্রটির দরুন প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। থুর্লিনের জন্যও আনুমানিক হিসাব প্রস্তুত হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী সার্কিট হাউসে উক্ত এলাকার কয়েকজন বিশিষ্ট অধিবাসীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের সঙ্গে উন্নয়ন-সম্পর্কিত কয়েকটি স্থানীয় সমস্যা এবং উক্ত জেলায় উৎসাহিত পদুর্লিয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদুর্লিয়া থেকে প্রায় আট মাইল দূরে মানবাজার রোডের পার্শ্বস্থ কয়েকটি পতিত জমি পরিদর্শন করেন।

জেলার আর্থনীতিক ক্ষেত্রে লাক্ষা-উৎপাদনের গুরুত্ব থাকায়, মুখ্যমন্ত্রী লাক্ষা-উৎপাদনের পদ্ধতিও সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন এবং লাক্ষাশিল্পের উৎপাদনের সম্ভাবনা পরীক্ষা করেন।

বন্যপ্রাণী পর্ষদের সভা

১৯এ থেকে ২১এ এপ্রিল ১৯৫৭ পর্যন্ত জলপাই-গুড়ি জেলার নীলপাড়ায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বন্যপ্রাণী পর্ষদের সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের মুখ্যসচিব

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়, আই সি এস-এর সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বন্যপ্রাণী পর্ষদের দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যসরকারের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং রাজ্যের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উন্নয়নের সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সংস্থার প্রতিনিধি সহ পর্ষদের বিশ জন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। পর্ষদ যেসমস্ত সুপারিশ করেন তার মধ্যে তিলপাড়া বাঁধে পক্ষিসংরক্ষণের একটি বনাঞ্চল সৃষ্টি, রাজ্যের স্কুল ও কলেজগুলিতে বন্যপ্রাণীর বিষয়ে আলোচনা-সংঘ ও ছোট ছোট চিড়িয়াখানা স্থাপন এবং উত্তর বঙ্গের বনে চা-বাগানের শ্রমিকদের অবৈধ প্রাণী-হত্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলি উল্লেখযোগ্য। আগামী চার বৎসরের মধ্যে জলদাপাড়া সংরক্ষিত বন্যপ্রাণী-বনাঞ্চলটিকে রাষ্ট্রীয় উদ্যানের পর্যায়ে উন্নীত করার পরিকল্পনাও পর্ষদের হাতে চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। রাজ্যের বন্য পশুপক্ষীর সংরক্ষণ-সম্পর্কিত একটি খসড়া বিল পর্ষদের প্রথম সভায় রচিত হয়; রাজ্য বিধানমণ্ডল কর্তৃক তা এখন 'স্টেটিউট বুক'এ সন্নিবিষ্ট হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

এই উপলক্ষে আয়োজিত একাধিক প্রমোদভ্রমণের সময় সদস্যগণ জলদাপাড়ার সংরক্ষিত অরণ্যে পশু-পক্ষীদের জীবনধারা গভীর আগ্রহের সহিত পর্যবেক্ষণ করেন।

এ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বনবিভাগের পক্ষে স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগ থেকে 'পশ্চিমবঙ্গের বন্যপ্রাণী' নামে একটি চিত্রসমৃদ্ধ পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়।

কালিম্পাঙ কৃষকদের কর্মক্ষেত্র-দিবস

১২ই এপ্রিল ১৯৫৭ কালিম্পাঙ রাষ্ট্রীয় কৃষিক্ষেত্রে কৃষকদের কর্মক্ষেত্র-দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে কৃষিকার্যের উন্নততর প্রণালী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর আয়োজিত আলোচনায় সমগ্র

দার্জিলিং জেলা থেকে আগত বহু প্রগতিশীল কৃষক যোগদান করেন। আলোচনার পরে কৃষকদের সরকারী কৃষিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হস্ত এবং তাঁদের গবেষণা ও নিরীক্ষামূলক কৃষিকার্যে যেসব উন্নতি সাধিত হয়েছে, সেসব দেখানো হয়।

রাজ্য বন্যপ্রাণী পর্বদের কাজ

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কর্তৃক গঠিত রাজ্য বন্যপ্রাণী পর্বদ রাজ্যসরকারকে নিম্নলিখিত বিষয়ে পরামর্শ দেবেন: (ক) সাধারণভাবে রাজ্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের পদ্ধতি এবং বিশেষ করে বন্যপ্রাণীর জন্য সংরক্ষিত অরণ্যসূচির উদ্দেশ্যে স্থান নির্বাচন এবং তার যথাযথ পরিচালন ও রক্ষণ; (খ) রাজ্যের পদুপসম্ভার ও বন্যপ্রাণীদের সম্বন্ধে এবং তাদের রক্ষণ সম্বন্ধে অধিকতর গণচেতনা সৃষ্টির উপায়; এবং (গ) রাজ্যসরকার কর্তৃক পর্বদের নিকট প্রেরিত বন্যপদুপক্ষীর রক্ষণ-সম্পর্কিত অন্য কোন বিষয়।

মুর্শিদাবাদ গম-উৎপাদন প্রতিযোগিতা

১৯৫৫-৫৬ সালের জেলা গম-উৎপাদন প্রতিযোগিতায় মুর্শিদাবাদ জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত নোয়াদা থানা এলাকার সবদারনগরের শ্রীভোলানাথ বাজপাই এবং ডোমকল থানা এলাকার ভাটশালার শ্রীমণীন্দ্রকুমার সান্যাল যথাক্রমে ২০০ টাকার প্রথম পুরস্কার ও ১৫০ টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। শ্রী বাজপাই প্রতি একরে ৫৭ মণ ১৬ সের এবং শ্রী সান্যাল প্রতি একরে ৫৪ মণ ৮ সের গম উৎপাদন করেছেন।

সম্প্রতি বহরমপুর সরকারী কৃষিক্ষেত্রে এক অনুষ্ঠানে পুরস্কারগুলি প্রদত্ত হয়। অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রী এ কে দত্ত, আই এ এস, সভাপতিত্ব করেন। নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের বহু কৃষক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং এই উপলক্ষে উন্নত শ্রেণীর অনেক গবাদি পশু প্রদর্শিত হয়। ঐ একই অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ শাবকসমূহের মালিকদেরও পুরস্কার প্রদান করা হয়।

গম-উৎপাদন প্রতিযোগিতায় ডোমকল, নোয়াদা, হরিহরপাড়া ও রাণীনগর থানার ৩২০ জন কৃষক যোগদান করেন।

মধ্যস্বত্বাধিকারীদের জমির কর সম্পর্কে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ বর্ধিত

বরানগর পৌরসংঘের সভাপতি শ্রীকানাই ঢোল, উক্ত পৌরসংঘের কমিশনার শ্রীইন্দুভূষণ দত্ত এবং লোক-সভার সদস্য শ্রীঅশোক সেন রাজস্বমন্ত্রী ও মুখ্য-মন্ত্রীর নিকট এই বক্তব্য পেশ করেছেন যে, বরানগর-এলাকায় মধ্যস্বত্বাধিকারীদের অধীন জমির জন্য নির্ধারিত কর খুব বেশি।

জমিদারি গ্রহণ আইনের প্রচলিত বিধান অনুসারেই এসব ক্ষেত্রে কর নির্ধারিত হয়েছে। কর-নির্ধারণের বিরুদ্ধে জমিদারি গ্রহণ আইনের ৪৪(১) ধারা অনুসারে এখন আপত্তি দাখিলের সুযোগ রয়েছে। ১৯৫৭ সালের ২২এ এপ্রিল এই আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ। যাঁদের উপর কর ধার্য হয়েছে তাঁরা মনে করেন যে, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অনুদ্রুপ জমির জন্য প্রচলিত গড় করের বিচারে তাঁদের উপর ধার্য কর খুবই বেশি। তাঁরা আরও মনে করেন যে, রাজস্ব-আধিকারিকের নিকট বক্তব্য পেশ করার জন্য উপযুক্ত তথ্যসংগ্রহের পক্ষে যথেষ্ট সময় তাঁদের হাতে নেই। ধার্য কর কম করার স্বপক্ষে যুক্তির জন্য তথ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁদের সুযোগ দানের জন্য সরকার স্থির করেছেন যে, আপত্তি দাখিলের সময়সীমা আরও ৩৫ দিন বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাজস্ব-আধিকারিককে দেওয়া হবে। ফলে, আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ ১৯৫৭ সালের ২২এ এপ্রিলের বদলে ১৯৫৭ সালের ৬ই জুন হবে।

উদ্ভাস্ত পুনর্বাসনে পতিত জমি ব্যবহার

উদ্ভাস্ত-পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের পতিত জমি ব্যবহারের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকার অনুরূপ জমি পাওয়া এবং ঐ জমি উদ্ভাস্ত-পুনর্বাসনের জন্য ব্যবহারযোগ্য করার বিষয় পরীক্ষা করে দেখার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি নিয়োগ করেছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিয়ে কমিটি গঠিত হয়েছে:

সভাপতি—শ্রী এস দত্ত মজুমদার, আই এ এস, সংযুক্ত-সচিব, উদ্ভাস্ত গ্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ ; সদস্যগণ—ডক্টর এইচ কে নন্দী, কৃষি-অধিকর্তা ; শ্রী বি সি মল্লিক, শিল্প-অধিকর্তা ; শ্রী পি সি বসু, জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিংএর মধ্য বাস্তুকার এবং শ্রী কে এন চৌধুরী, বনপাল (দক্ষিণ মণ্ডল)। উদ্ভাস্ত গ্রাণ ও পুনর্বাসন অধিকারের উপ-অধিকর্তা (গ্রহণ) শ্রী এ কে বন্দ্যোপাধ্যায় এই কমিটির সদস্য-সচিব।

কমিটির উপর নিম্নোক্ত কর্তব্যভার ন্যস্ত হয়েছে: বিশেষ করে উদ্ভাস্ত-পুনর্বাসনের উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োজন হ'লে স্থান পরিদর্শন করে পরিমাপ ; জমি অনুসারে ধান, পাট, সাবাই ঘাস প্রভৃতি উৎপাদনের দিক থেকে বিভিন্ন শ্রেণীতে অনুরূপ জমির শ্রেণীবিভাগ ; উন্নয়নের প্রকৃতি এবং সেচ ও অন্যান্য সুবিধা সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া ; উন্নয়নের (পুনরুদ্ধার সহ) এবং অন্যান্য ব্যবস্থার আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব ; এবং কমিটির সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের উদ্ভাস্ত গ্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের নিকট সুপারিশ দাখিল করা। সুপারিশ করার সময় কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে ; কৃষক, কারিগর, কারুশিল্পী প্রভৃতি শ্রেণীর অন্তর্গত যেসব উদ্ভাস্তুর পুনর্বাসন দিতে হ'তে পারে তাঁদের সংখ্যা ; পুনর্বাসন-স্থানের আব-হাওয়া ; সেই স্থানের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা এবং উন্নয়ন-সম্ভাবনা ; স্থানীয় আর্থিক ব্যবস্থা ও

পারিপার্শ্বিকের মধ্যে উদ্ভাস্তগণের সমন্বয়সাধনের সম্ভাবনা এবং সুপারিশের ভিত্তিতে বিস্তৃত বিবরণ সহ খরচের আনুমানিক হিসাব তৈয়ার। বিভিন্ন রকের খরচের বিবরণ যতদূর সম্ভব বিস্তৃতভাবে দিতে হবে এবং সরকারের নিকট তা দাখিল করতে হবে।

মেমারিতে আলুর জন্য হিমাগার

২৮এ মার্চ ১৯৬৭ থেকে বর্ধমান জেলার মেমারিতে বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় উৎপাদন ও বিপণন সমিতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শান্তিরঞ্জন হিমাগারের কাজ আরম্ভ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার উক্ত সমিতিকে ৬,৫০,০০০ টাকা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়েছেন এবং সমিতি প্রায় ৭০,০০০ টাকার অংশীদারী মূলধন সংগ্রহ করেছেন। এই অর্থের দ্বারা হিমাগারটি নির্মিত হয়েছে। এতে প্রায় ২৫,০০০ মণ আলু সংরক্ষণ করা যাবে। এই হিমাগার উক্ত অঞ্চলের দীর্ঘ দিনের একটি অভাব দূর করবে।

শস্যগোলায় জন্য অর্থসাহায্য

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ আদিবাসী সমবায় ধর্মগোলা লিমিটেডের পরিপোষণার্থে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে অর্থসাহায্য দানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের উপজাতি-কল্যাণ দফতর নিবন্ধকের হাতে ৬,০০০ টাকার এক বরাদ্দ অর্পণের মঞ্জুরি দিয়েছেন।

বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় যারা পুরস্কার পেয়েছে

১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গে বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়সমূহ ছিল: সমগ্র রাজ্যের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের অনুমোদিত কলেজসমূহের স্নাতকপূর্ব ছাত্রদের জন্য—“পশ্চিমবঙ্গের বন্য-প্রাণীরা আপনাদের আশ্রয়প্রার্থী—কেন ও কী-ভাবে”; কলিকাতা জেলা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের

অনুমোদিত উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য—“আমার দেখা বন্য পশু-পক্ষী”; এবং জেলার ভিত্তিতে কলিকাতা জেলার অনুমোদিত উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য—“আমার পশুশালা দর্শন”।

এসকল প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার ফল ঘোষিত হয়েছে। “পশ্চিমবঙ্গের বন্যপ্রাণীরা আপনাদের আশ্রয়প্রার্থী—কেন ও কীভাবে”—এই বিষয়ের উপর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রচনা করে আসানসোল কলেজের প্রথম বার্ষিক (কলা) শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমানবেন্দ্রকুমার ঘোষ ১৫০ টাকার প্রথম রাজ্য পুরস্কারটি পেয়েছে। ১০০ টাকার দ্বিতীয় পুরস্কারটি পেয়েছে কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজের তৃতীয় বার্ষিক (কলা) শ্রেণীর ছাত্র শ্রীদীননাথ মন্ডল এবং ৭৫ টাকার তৃতীয় পুরস্কারটি পেয়েছে সিটি কলেজের (মির্জাপুর শাখা) বাণিজ্য বিভাগের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীরঞ্জনকুমার রুদ্র।

জেলা-ভিত্তিক প্রতিযোগিতাগুলিতে কলিকাতা জেলার ছাত্রী ও ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট ৫০ টাকার পুরস্কার দুটি পেয়েছে, যথাক্রমে কলিকাতার সেন্ট

জন্স ডায়োসেনসন স্কুলের দশম শ্রেণীর শ্রীমতী শিপ্রা রায় ও মিত্র ইনস্টিটিউশনের (মির্জাপুর শাখা) নবম শ্রেণীর শ্রীপ্রবীরকুমার চক্রবর্তী। অন্যান্য জেলার পুরস্কার বিজয়ীরা হচ্ছে: চব্বিশপরগনার মহেশতলার সুবিদ আলী ইনস্টিটিউশনের মোল্লা মহম্মদ জামালুদ্দিন (৯ম শ্রেণী); জলপাইগুড়ি গার্লস হাই স্কুলের শ্রীমতী লক্ষ্মী বসু (৯ম শ্রেণী); দার্জিলিংয়ের সেন্ট বরার্টস হাই স্কুলের শ্রীসন্তোষকুমার গদরং (১০ম শ্রেণী); হুগলি গার্লস হাই স্কুলের (শ্রীরামপুর) শ্রীমতী কুমকুম ঘোষ (১০ম শ্রেণী); বর্ধমানের সাদিপুুরের ষ্টকশানজাদী জি এম ইনস্টিটিউশনের শ্রীমদনমোহন চট্টোপাধ্যায় (৯ম শ্রেণী); বীরভূমের সিউড়ির বীরভূম জেলা স্কুলের শ্রীমনোজকুমার রায় চৌধুরী (৯ম শ্রেণী); বাঁকুড়ার মিশন গার্লস হাই স্কুলের শ্রীমতী আরতি সেন (১০ম শ্রেণী); পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ গার্লস হাই স্কুলের (রায়গঞ্জ) শ্রীমতী রেবা দত্ত (৯ম শ্রেণী); মোর্দিনীপুরের তমলুকের হ্যামিলটন হাই স্কুলের শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বসু (৯ম শ্রেণী)।

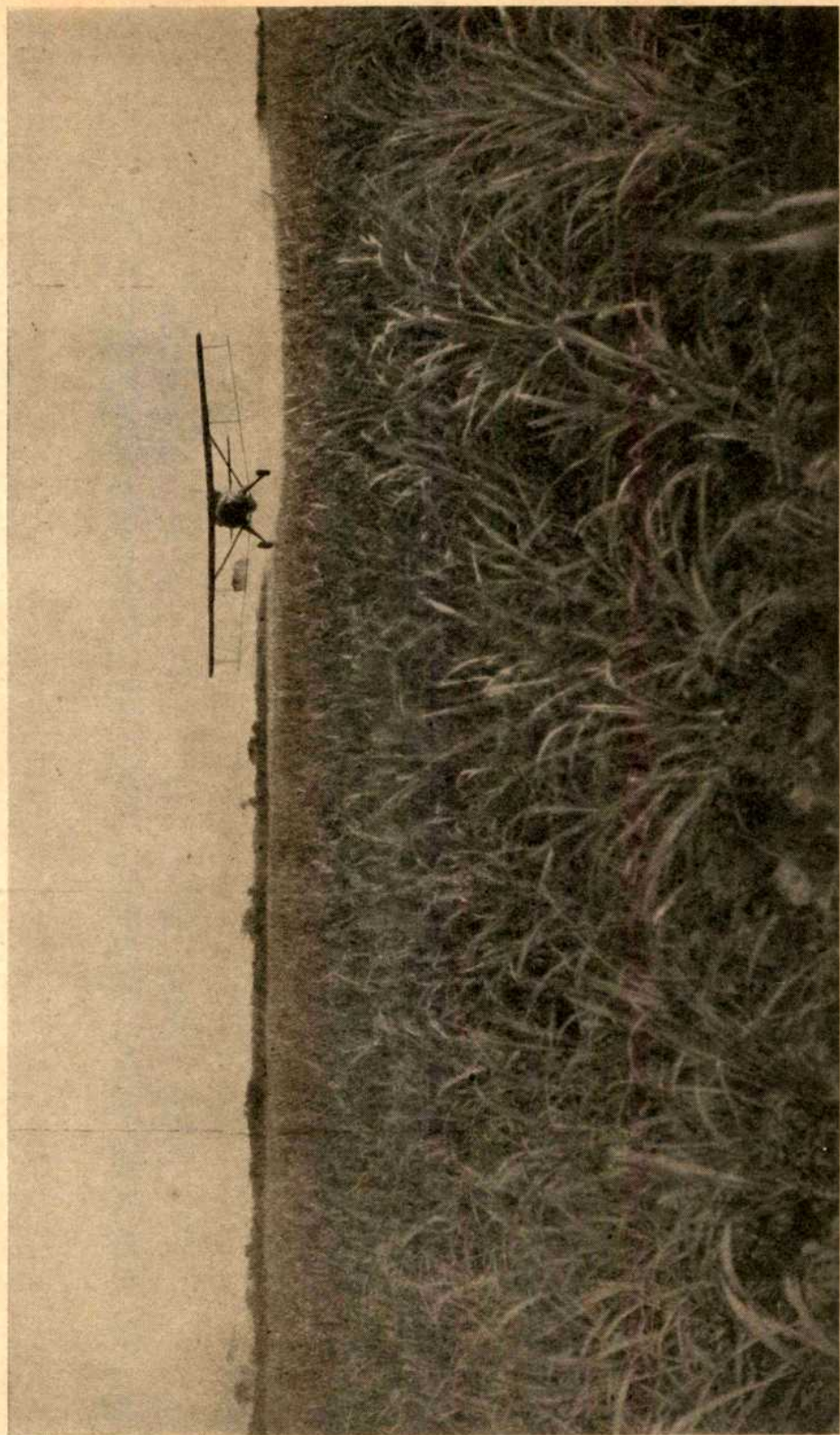


সম্পাদক : শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মিত্র, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মন্ত্রণে অধীক্ষক

শ্রীশ্রীভেন্দু মল্লিকোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

বস্তুকরণ : চিত্র : ১৩৬৪

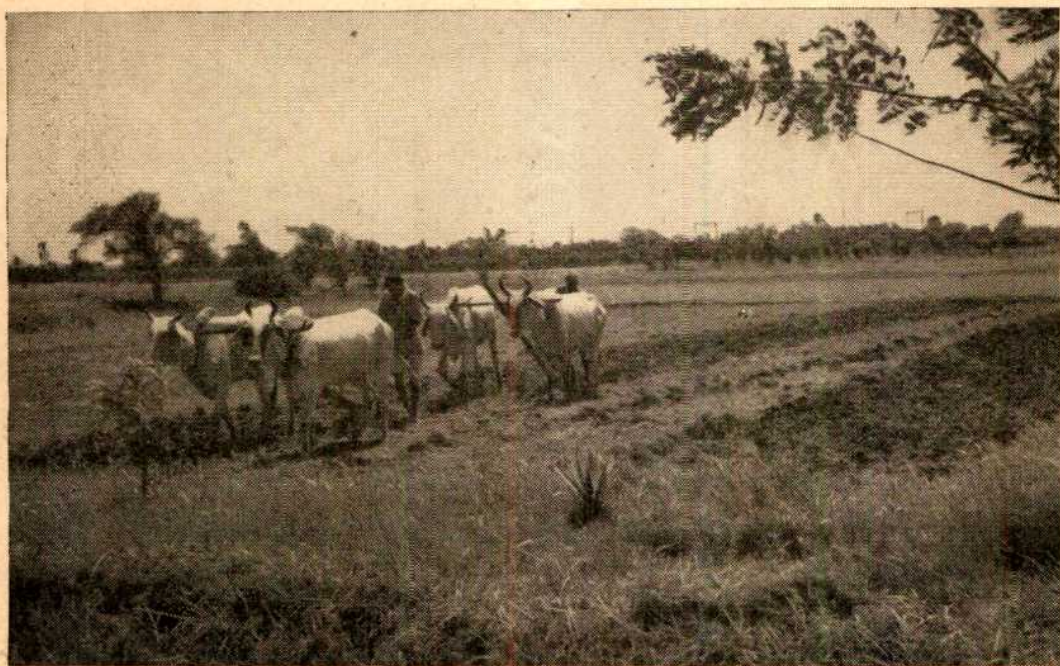


পলাশতে আখের ক্ষেতে বিমান থেকে কটনশাক ওয়ুধ ছিটানো হচ্ছে



হুঁড়ার সরকারী কৃষিক্ষেত্রে সারিতে পাটের
চাষের ক্ষেত্রে হাতে চালানো যন্ত্রের
সাহায্যে নিভেঁন দেওয়া হচ্ছে

নিচে : হুঁড়ার সরকারী কৃষিক্ষেত্রে
আধুনিক উন্নত ধরনের লাঙলের
সাহায্যে জমি চষা হচ্ছে



বমুন্ধরা

১০ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ : ১৩৬৪

প্রসঙ্গ

স্বাধীনতালভের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের উৎপাদনে স্বয়ংপূর্ণ হয়ে ওঠার যে অভিযান চলেছে, তাতে আমরা উৎসাহজনক সাফল্য অর্জন করেছি। আমাদের চাষীভাইরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকাজ করার প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বেশি করে উপলব্ধি করছেন এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে কৃষিকাজ করার জন্য সরকার থেকে উন্নত জাতের রোগমুক্ত বীজ, রাসায়নিক সার প্রভৃতির যোগান দিয়ে তাঁদের সাহায্য করা হচ্ছে। ছোটবড় নানা সেচ-পারিকল্পনার রূপায়ণের ফলে অনেক জায়গায় চাষের ক্ষেত্রে সহজে সেচের জল পাওয়ারও সুব্যবস্থা হয়েছে।

কিন্তু দুই শ' বছরের বিদেশী শাসন এদেশের কৃষিকাজকে বিজ্ঞানের হাত থেকে একান্তভাবেই দৈবের উপর নির্ভরশীল করে গেছে। পৃথিবীর অনেক স্বাধীন দেশ যখন বিজ্ঞানের আশীর্বাদে কৃষির ক্ষেত্রে আবশ্যিক খাদ্যের উৎপাদনের উপরেও দেশের সম্পদ-সমৃদ্ধি সৃষ্টি করে চলেছে, এদেশের কৃষকসাধারণ তখনও জানেই না যে, কৃষিকাজ বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এই কয়েকটি বছর ধরে দেশের কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠার রত আমরা পূর্ণ উদ্যমে পালন করে চলেছি; তার ফলে দৈবের উপর আমাদের কৃষিকাজের নির্ভরতা অনেকখানি কমেছে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ ঘোচে নি। আজও দেশের অনেক জায়গায় বৃষ্টি না হলে চাষ আরম্ভ হয় না,

অতিবৃষ্টিতে অনাবৃষ্টিতে কৃষি নষ্ট হয়, বন্যা হলে শস্যবিনাশ হয় ব্যাপকভাবে।

এ রাজ্যে ১৯৫৩-৫৪ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদনে যে আশাতীত সাধকতা এসেছিল, স্বীকার করতেই হবে যে, তার মূলে মানুষের অক্লান্ত প্রচেষ্টার সঙ্গে ছিল প্রকৃতিরও অনুকূলতা। কিন্তু দৈবের প্রতিকূলতা শুরু হ'ল তার পরের বছর থেকেই। পর পর দু' বছরই হল অনাবৃষ্টি আর বন্যা। তা সত্ত্বেও এ রাজ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রায় আশা-নুরূপই হয়েছে। কিন্তু গত বছর যে অস্বাভাবিক আর ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে গেল, তাতে এ রাজ্যের অনেক কৃষি-অঞ্চলেই একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেছে। কোন কোন এলাকায় গ্রীষ্মকালের শুরু থেকে হেমন্তকালেরও শুরুকাল পর্যন্ত মাসের পর মাস ধরে চলল একটানা বৃষ্টি। সেসব এলাকার লোকে ভাবতেও পারে নি যে, ছোট্ট এই পশ্চিম বাঙলার অনেক জায়গা তখন বৃষ্টির অভাবে খাঁ খাঁ করছে। এর উপর শরৎকালে কতকগুলো জায়গাতে যে ভয়ংকর বন্যা হল, এ রাজ্যের ইতিহাসে তার কথা আতঙ্কের স্মৃতি জাগিয়ে রাখবে। এই বন্যায় কতকগুলো গ্রাম তো নিশ্চিহ্ন হলই, সেইসঙ্গে সেসব জায়গার চাষের মাঠের ফসল একেবারে নষ্ট হয়ে গেল।

আমাদের দেশের দৈবনির্ভর কৃষি যুগে যুগে এ ধরনের বিপর্যয়ের কবলে পড়েছে; বিদেশী শাসক তা নিয়ে মাথা ঘামায় নি। কিন্তু ভারতের জাতীয়

সরকার স্বাধীনতালাভের পর থেকেই এ দুরবস্থা মোচনে রতী হয়েছেন। দেশ জুড়ে এই যেসব সেচের আর জলনিকাশের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ চলছে, এর মূখ্য উদ্দেশ্য হল দৈবের কবল থেকে দেশের কৃষিকে মুক্ত করা।

কৃষিকাজ প্রকৃতির করদগার মূখ্যাপেক্ষী হয় প্রধানত চাষের ক্ষেত্রে সেচের জল পাওয়ার জন্য এবং কোন কারণে চাষের মাঠে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল জমে গেলে তা নিকাশ করে কৃষিকে বাঁচাবার জন্য। বর্ষি যখন হচ্ছে না, তখন যদি আকাশের কৃপা ছাড়াও কোন সূত্রে জল পাওয়া যায়, তা হলে চাষ আরম্ভ করতেও দেরি করার দরকার হয় না, ফসলকে তার প্রয়োজনমত জল যোগাতেও সমস্যা পড়তে হয় না। আকস্মিক বন্যার জলে চাষ যদি ডুবে যায়, তবে সেই জল অবিলম্বে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা হলে আর কৃষি নষ্ট হতে পারে না।

জাতীয় সরকার জলের অসুবিধা দূর করার জন্য যেসব পরিকল্পনা করেছেন, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তার কতকগুলোর রূপায়ণ সম্পূর্ণ হয়েছে; কোন কোন পরিকল্পনার কাজ আংশিক সমাপ্ত হয়েছে—বার্ষিক কাজ এখনও চলছে। তবে যতটা কাজ হয়েছে, তা থেকেই এখনই উপকার পাওয়া যাচ্ছে। নানা জায়গায় সরকারী প্রচেষ্টায় ছোট ছোট অনেক সেচ-পরিকল্পনাও রূপায়িত হয়েছে। যেসব এলাকায় এগুলোর সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে, সেসব জায়গায় চাষীভাইরা তাঁদের চাষে তার পুরোপুরি সুযোগ নিতে পারেন। সেইসঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করার কথাটাও ভুলে চলবে না। ভাল বীজ, ভাল সার, সেচ আর তদারকি—মোটামুটি এই কপি কথা মনে রেখে চাষের কাজ চালালেই ফলন বেশি হতে বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত যেসব জায়গায় সেচের জল পাওয়ার সুবিধা হয়েছে, শুধু সেইসব জায়গাতেই চাষীভাইরা যদি বৈজ্ঞানিক রীতিতে নিবিড়চাষ চালিয়ে যান, তা

হলে এ রাজ্যের খাদ্যশস্যের সমস্যাটা হয়তো মোটামুটি ঘুচে যেতে পারে।

আর সারা রাজ্যের কৃষি-অঞ্চল যেদিন ছোটবড় সেচব্যবস্থায় ছেয়ে যাবে সেদিন, লোকসংখ্যা যতই বেশি হোক না, আমাদের চাহিদা মিটে গিয়েও আরও শস্য উৎপত্তি হবে। কিন্তু সেই সুদিনকে স্বরাস্বিত করতে হলে শুধু সরকারী প্রচেষ্টার দিকে চেয়ে থাকলে চলবে না। কোন দেশেই কোন বিরাট কাজ একা সরকারী প্রচেষ্টায় সুসম্পন্ন হতে পারে না। সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে দেশের জনসাধারণেরও চাই আন্তরিক সহযোগিতা। গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র ছোট আকারের সেচব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে আমাদের গ্রামবাসীরা প্রত্যক্ষভাবে যে সহযোগিতা করতে পারেন, তাতে অচিরকালের মধ্যেই চাষের কাজে জলের অভাবটা সাধারণভাবে মিটে যেতে পারে।

ছোট আকারের একটা সেচব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে তাতে প্রধান প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় অর্থ আর শ্রম। পল্লীবাসী জনসাধারণের পক্ষে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করার সম্ভাবনা কম। অর্থের দিকটা সরকারের উপর দিয়ে, শ্রমের দিকটা যদি তাঁরা নিজেদের হাতে নেন, তা হলেই কাজটা সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ হয়ে যেতে পারে। অর্থনীতির হিসাবে অবশ্য শ্রমটাও অর্থের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়।

এই শ্রম-সহযোগিতার কথাটা নতুন কিছু নয়। এ রাজ্যের কোন কোন জায়গায় ইতোমধ্যেই স্থানীয় জনসাধারণ নিজেদের শ্রমের সঙ্গে সরকারী অর্থের সমন্বয় ঘটিয়ে ছোট সেচ-পরিকল্পনার রূপায়ণকে সার্থক করে তুলেছেন এবং সেই সেচব্যবস্থা এখন তাঁদের চাষের ক্ষেত্রে জলরূপে কল্যাণ বিতরণ করছে। এবং সে কল্যাণ শুধু সেখানকার চাষীদের আর পল্লীবাসীদেরই নয়, সে কল্যাণ সারা রাজ্যের—সমগ্র দেশের। আমাদের গ্রামবাসী ভাইদের আমরা আহ্বান জানাই—সারা রাজ্য জুড়ে তাঁরা নিজেদের শ্রম-সহযোগিতা নিয়ে সরকারের পাশে দাঁড়ান ছোট ছোট সেচব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে।

বঙ্গবন্ধু : জ্যৈষ্ঠ : ১৩৬৪

সুদিন অপেক্ষা করছে আমাদের জলের সেচ-
নিকাশের ছোট-বড় বহু পরিকল্পনার সার্থক
রূপায়ণের মধ্যে। সে সার্থকতা বোদিন আসবে,
সেদিন চাষের মাঠে জল পাওয়ার জন্য আমাদের
চাষীভাইদের আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে হবে

না, অতিবৃষ্টির আর বন্যার জলে সেদিন আমাদের
চাষের মাঠ ডুবে যাবে না। সকলের সর্বাঙ্গীণ
সহযোগিতায় সে সুদিন নির্বলম্ব হোক। সেই
সুদিনকে স্বাগত জানাই।



‘বেয়ার’এর পোকা ও রোগ দমনের ঔষধগুলির
দ্বারা আপনাদের ফসল রক্ষা করুন

ফলিডল-ই ৬০৫

মেটাসিস্টক্স

সেরেসান

অ্যাগালল

কুপ্রাভিট (ওবি ২১)

এইগুলি পশ্চিম জার্মানীর লিভারকুসেনের
ফারবেনফ্যাবরিকেন বেয়ার
দ্বারা প্রস্তুত আসল ঔষধ।

ভারতে পরিবেশক

চিকা প্রাইভেট লিমিটেড,

৩১, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২



নারকেলের কথা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সর্বোদয় সম্মেলনে যোগ দিতে কেরালায় গিয়েছি। কেরালার বায়ুপরিষ্কৃত অর্থ নারকেল। কেরালাকে আমরা নারকেলের রাজ্য বলতে পারি। যত দূর দৃষ্টি যায় দিগন্তবিস্তারী নারকেলের বন। একটু জায়গা পেলেই লোকে নারকেলের গাছ লাগায়। এতে গৃহস্থের প্রচুর আয়।

বাঙলাদেশেও নারকেলের চাষের উপরে জোর দেওয়া উচিত। নারকেলগাছের জীবন ষাট থেকে আশি বৎসর পর্যন্ত। ফল দেওয়ার পালা একবার শুরু হ'লে প্রতি মাসেই গাছে ফল হয়। গাছের প্রতিটি অংশ কাজে লাগে। একটা ভালো নারকেল-বাগান তৈরি করতে পারলে নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে বেশ কিছু আয়ের ব্যবস্থা হ'তে পারে—এতে কোনই সন্দেহ নেই। যে কাজ করলে কমসে-কম পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে মাসিক একটা আয়ের নিশ্চিত ব্যবস্থা করা সম্ভব, সে কাজে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই অগ্রণী হওয়া উচিত।

বছরে একশোটার বেশি নারকেল প্রসব করবার ক্ষমতা রাখে এমন গাছের ফল থেকে গাছ তৈরি করাই প্রশস্ত। গাছ তৈরির জন্য যে নারকেল বাছাই করা উচিত, তা হবে গোলাকার, তার শাঁস হওয়া চাই পুরু, খোলা পাতলা। ধাড়ি গাছের গুণাগুণের উপরে অনেককিছুই নির্ভর করে। মাঝারি বয়সের জোরালো গাছের ফল সংগ্রহ করতে পারলে, সেই ফলের গাছ থেকে ভাল আয়ের আশা করা যেতে পারে। একটা ভাল ধাড়ি গাছে বারো কাঁদি নারকেল দেখা খুবই সম্ভব।

চারি বাছবার সময় হ'লিশয়ার হওয়া চাই। সরু এবং স্বল্প পাতা, গর্দান মোটা নয়, পাতার রঙ ফ্যাকাসে—এমন চারা বর্জন করাই উচিত।

চারি লাগাবার সময় দেখা উচিত—একটা থেকে আর একটার দূরত্ব যাতে ২৫ ফুটের কম না হয়।

চারি-নারকেলের বাড়তির পক্ষে ছাই খুব প্রশস্ত, স্বল্প পরিমাণে অ্যামোনিয়াম সালফেট ও পচা গোবরসার নারকেলগাছের পুষ্টিকর আহাৰ্য।

কিন্তু যে বিষয়টি বলবার জন্য এই প্রবন্ধটি বিশেষ করে লেখা। চারা লাগানোর পর অন্তত প্রথম তিন বৎসর গ্রীষ্মকালে দুটো কাজ করা নিতান্ত দরকার। প্রথর মার্শ্ব-উতাপ থেকে চারাকে রক্ষা করার জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করতেই হবে, আর এক-দিন অন্তর অন্তর চারার গোড়ায় জল ঢালা চাই। এই ব্যাপারটা আমার জানা ছিল না ব'লে আমি ঠকেছি। আর ঠকতে চাই নে। ছায়া আর জল নারকেলচারার প্রাণ।

নারকেলগাছের গোড়ায় কোন আগাছা জমতে দেওয়া একেবারেই উচিত নয়। চারিদিকটা বেশ করে কুপিয়ে দেওয়া উচিত। সারের দিকটা নজরে রাখা খুবই দরকার। প্রতিটি বয়স্ক নারকেলগাছে দেড় সের থেকে দু'সের পর্যন্ত অ্যামোনিয়াম সালফেট দেওয়া যেতে পারে। চারাগাছে খুব কম। গোবরসার আর ছাইএর কথা আগেই বলেছি। বর্ষার আগে লবণের প্রয়োগ প্রশস্ত।

আমি ঠিক চাষী নই, নারকেলের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞও নই। কোন গাছ রোগগ্রস্ত হ'লে কী করা উচিত, সে বিষয়ে কিছু বলতে যাওয়া আমার পক্ষে ঠিক হবে না। নিজের কিছু জমি আছে। গোটা-চল্লিশ গাছ লাগিয়েছি। নিজে সেগুলোর দেখাশুনা করি। অনেককে দেখেছি খুব ঘন করে চারা বসাতে। কিন্তু ২৮ ফুট অন্তর অন্তর গাছ লাগালেই ভাল হয়—২৫ ফুটের কমে তো নয়ই। আর গরমকালে চারাকে রোদ্দুরে রাখা নিবন্ধিত। তার জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। শুধু ছায়া নয়—চারার জন্য গ্রীষ্ম জলের প্রয়োজনও অপরিহার্য।

পশ্চিম বাঙলার তাঁতশিল্প

মানবজাতি সুন্দরের পূজারী। সৌন্দর্যবোধ থেকেই সভ্যতার শূভারম্ভ। মানুষের সৌন্দর্য-বোধ ও সৌন্দর্যপ্রীতি প্রকাশ পায় নানা শিল্প ও কলার বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে।

ভারতের শিল্পসাধনা চ'লে আসছে সুপ্রাচীন যুগ থেকে। কালের যাত্রার কোন্ শূভক্ষণে বয়ন-শিল্পের আবির্ভাব হয়েছিল যদিও সভ্যতার ইতিহাসে তা লিপিবদ্ধ নেই, তথাপি মানব-সভ্যতার আদিম কাল থেকেই ভারতের তাঁতশিল্প বিশ্বের দরবারে সম্মানের স্থান লাভ করেছিল—এটা নিশ্চিত। মিশরের রাজপরিবারের শবাচ্ছাদনে ভারতের মসলিন ব্যবহৃত হ'ত। সম্রাট সলোমনের সমাধিমন্দিরে নানা সামগ্রীর মধ্যে মসলিন ছিল অন্যতম। মোহেনজোদাড়োর ভগ্নস্তুপ খননে যেসব প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে—সুক্ষ্ম বস্ত্র তার অন্যতম।

ঐতিহ্যে সুমহান এই কারুশিল্পের উৎপত্তি এই বাঙলাদেশেই। রাজনীতিক বিবর্তনের ফলে যদিও মসলিনের ইতিহাসখ্যাত প্রাচীন কেন্দ্র ঢাকা আজ ভারতের বিহীন, তবুও সংস্কৃতির সূত্রে সকল বাঙালীর সঙ্গেই মসলিনের ঐতিহ্য অবিচ্ছিন্ন। যেসকল শিল্পীর বন্দনা ও সাধনায় মসলিনের জন্ম, তাহাদের উত্তরসাধক ও বংশধরেরা উভয় বংশেরই অধিবাসী। ঢাকাই মসলিন ও জামদানীর পর এই শিল্পের সাধনায় আর-একটি বিশিষ্ট রূপ দেখা যায় মুর্শিদাবাদের বালুচর বড়িদিার শাড়ির মধ্যে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই কারুশিল্প মুর্শিদাবাদের বালুচরে (বর্তমান জিয়াগঞ্জ) নানা ধারায় নানা রূপে পরিস্ফুট হয়েছিল। শাড়ির জমির উপর বিচিত্র নকশা ও আঁচলার কারুকার্যে বালুচর ছিল অনন্যসাধারণ। বালুচরের বয়নৈপুণ্য বহু আয়াসলব্ধ এবং এই শিল্পসাধনায় শেষ প্রখ্যাত সাধক ছিলেন দুবরাজ তাঁতী।

যন্ত্রশিল্পের আবিষ্কার ও বৈদেশিক শাসনের প্রতিকূলতার ফলে আমাদের দেশীয় তাঁতশিল্পের ক্রমাবনতি ঘটে। ঢাকাই মসলিন এখন রূপকথার পর্যায়ে চ'লে গেছে, কিন্তু বালুচর বড়িদিারের শিল্পধারা এখনও হারিয়ে যায় নি। বিশেষ আশার কথা যে, দুবরাজের সুযোগ্য শিষ্য শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকট কয়েকজন দরদী শিল্পী শিখে নিচ্ছেন অপরূপ কলাকৌশল ও বয়নৈপুণ্য।

তাঁতশিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবসায় থেকে ভারত অতীতে বহুপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করত, সেকথা এখন সকলেই জানেন। ভারতের তাঁতবস্ত্র কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে কলারসিকদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। ২,৩০০ বৎসর পূর্বেও সেকান্দর শাহের ভারত-আক্রমণের সময় ভারতের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের বাণিজ্য রীতিমতই চলত।

সৌন্দর্যসৃষ্টি ছাড়া তাঁতশিল্পের আরও একটি দিক আছে। মানবসমাজে খাদ্যের পরই বস্ত্রের প্রয়োজন সমধিক। পূজা উৎসবাদিতে শৌখিন বস্ত্রের প্রয়োজনের চেয়ে নিত্যব্যবহার্য বিবিধ বস্ত্রের প্রয়োজন নিশ্চয়ই কম নয়। সামাজিক উৎসবাদিতে আমরা রেশমী ও সুতী মনোরম তাঁতবস্ত্র ব্যবহার ক'রে থাকি; নিত্যব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাঁতবস্ত্রের প্রচলন ক্রমেই বাড়ছে। কলে-তৈয়ারি কাপড়ের চেয়ে তাঁতে-বোনা কাপড় মজবুত এবং তাঁতের কাপড়েই নানা রকম নকশার বৈশিষ্ট্য মনের মত ক'রে রূপায়িত করা যায়। যন্ত্রশিল্পে অধিক উৎপাদন হ'তে পারে, কিন্তু কর্মসংস্থান ও রূপসৃষ্টির দিক দিয়ে তাঁতশিল্পের উপযোগিতা সমধিক।

কৃষিপ্রধান ভারতে অবসর-সময়ে কৃষকেরাও তাঁতে নিজেদের ব্যবহার্য কাপড় বুনেন নিতে পারেন। গান্ধীজীর সর্বোদয়-পরিকল্পনার মূল কথাও হচ্ছে, আমাদের অনগ্রসর দেশে খাদ্যবয়ন ও কুটির-শিল্পের প্রসারেই জাতীয় জীবনের মান উন্নয়ন

সম্ভব হ'তে পারে। গ্রামীণ শিল্পের মধ্যে সর্ব-প্রধান তাঁতশিল্প সেই হিসাবে সকলেরই পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন দাবি করতে পারে।

আমাদের সামাজিক ও আর্থনীতিক জীবনে তাঁতশিল্পের অবদান অপরিমেয়। বর্তমানে বিংশ শতাব্দীর অর্ধশতকোত্তীর্ণ কালে যন্ত্রযুগের এই অগ্রগতির দিনে মান্ধাতার আমলের এই শিল্প-রীতির পৃষ্ঠপোষকতা সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ পোষণ করেন। তাঁরা মনে করেন, কলের কাপড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করলেই তো সম্ভব আমাদের প্রয়োজন মিটতে পারে। কিন্তু আমাদের সভ্যতার ও আর্থনীতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যাটিকে একটু তলিয়ে দেখলে উপযোগিতা ও গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি হবে।

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। শতকরা ৭০ জন লোক এখানে কৃষির উপর নির্ভরশীল; আবার কৃষিকর্মেও তাদের বছরে গড়ে মাত্র ৫ মাসের কাজের সংস্থান হ'তে পারে। বাকি সাত মাস তাদের বেকার ব'সে থাকতে হয়। এ ছাড়া ভূমিহীন চাষীরও অভাব নেই। গ্রামীণ সভ্যতাই আমাদের সংস্কৃতির প্রাণ। যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবে আজ তা পর্য্যদস্ত, পল্লীর আর্থিক কাঠামোর উন্নতি না হ'লে জাতীয় জীবনের মান বৃদ্ধিও সম্ভব নয়। সুদীর্ঘতম পরিকল্পনায় সংগঠিত হ'লে কুটিরশিল্প স্বচ্ছন্দে যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও টিংকে থাকতে পারবে এবং জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে গ্রামগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেশের আর্থিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করবে। সুতরাং ঔদাসীন্য পরিহার করে সক্রিয় সমর্থনের দ্বারা আমাদের কর্তব্য এর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ব্যবস্থা করা।

নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যে তাঁতশিল্প টিংকে আছে তার কারণ তার কতকগুলি নিজস্ব সুবিধা রয়েছে। তাঁতী-পরিবারের ছোটবড় স্ত্রী-পুরুষ সকলেই শিল্পকার্যে বিভিন্ন অংশগ্রহণ করে থাকে। বংশানুক্রমে তাঁতীর ছেলে বয়নে

নৈপুণ্য ও চাতুর্যের শিক্ষা পায়। এই শিক্ষায় কোন স্বতন্ত্র ব্যয় নেই, পারিবারিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পারিবারিক কাজের ধারার মধ্যেই তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। অল্প বয়স থেকে তারা পিতামাতার তত্ত্বাবধানে কাজ করতে পারে এবং অল্প আয়াসে কলাকৌশল আয়ত্ত করতে পারে। রুচির বিভিন্নতায় ব্যক্তিগত চাহিদা মেটাতে শৃঙ্খলিত তাঁতশিল্পই পারে। কলের কাপড় একই ছাঁচের হয়, কিন্তু তাঁতের সাহায্যে সহজেই বিভিন্ন রুচির বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যেতে পারে।

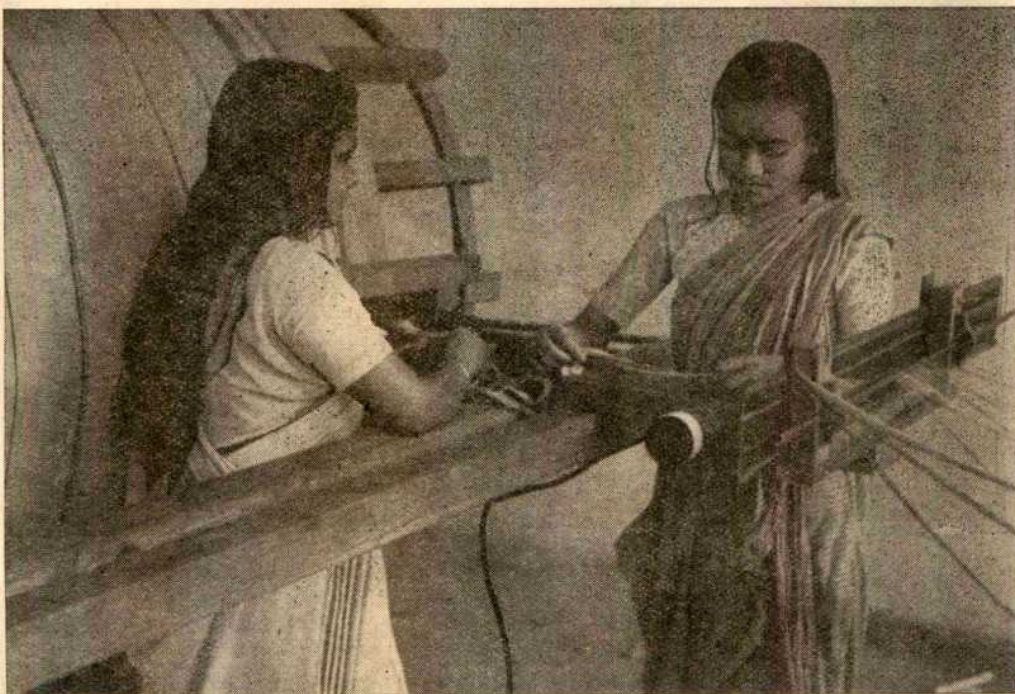
বর্তমানে ভারতে ২৯ লক্ষ তাঁতে নিযুক্ত শিল্পী ও কারিগরের সংখ্যা হবে প্রায় ৮৭ লক্ষ। ভারতের সমস্ত সংগঠিত বৃহৎ শিল্পে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যার চেয়ে এ সংখ্যা অনেক বেশি। আমাদের জনসমষ্টির এক বৃহৎ অংশের কল্যাণের উপর নিশ্চয়ই দেশের কল্যাণ নির্ভর করে। কাজেই তাঁতশিল্পের গুরুত্ব সম্বন্ধে মতভেদ সম্ভব নয়। এই শিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই আমাদের জাতীয় সরকার নিখিল-ভারত তাঁতশিল্প পর্ষদ গঠন করেন। ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে এই পর্ষদ বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে রাজ্যসরকারগুলির মাধ্যমে এই শিল্পের উন্নতিবিধান করে আসছে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে তাঁতের সংখ্যা হবে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার এবং কর্মীর সংখ্যাও প্রায় চার লক্ষ। ১৯৫৬ সালের বস্ত্র-উৎপাদনের পরিমাণ ১৫ কোটি গজের উপর, তার মূল্য ১২ কোটি টাকার কম নয়। ভারতের মোট উৎপন্ন বস্ত্রের ৪ অংশ তাঁতশিল্প থেকে পাওয়া যায়, তার আনুমানিক মূল্য ১১০ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গে বৎসরে প্রায় তিন কোটি পাউন্ড সুতোর প্রয়োজন। তার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ আসে দক্ষিণ ভারত থেকে। অবশ্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কালে পশ্চিমবঙ্গেই প্রায় দু'লক্ষ টাকু বসিয়ে প্রয়োজনীয় সুতোর চাহিদা মেটাবার প্রচেষ্টা হচ্ছে।

বাঙলায় তিন রকমের তাঁত প্রচলিত। মোট ১ লক্ষ ৩০ হাজার তাঁতের মধ্যে ১ লক্ষ ১৫ হাজার হচ্ছে ঠকঠাক তাঁত, ৩ হাজার ৫ শ' অর্ধস্বয়ংক্রিয় ও বাকি হাততাঁত। পাড়ের নকশা তোলার জন্য ডাবি এবং জ্যাকাডেরও বহুল ব্যবহার এখানে হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে শান্তিপুত্র, নবম্বীপ, ফরাসডাঙা, রাজবলহাট, ধনেখালি, বেগমপুর, শ্রীনিকেতন, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, তমলুক, দেবীপুর প্রভৃতি স্থান তাঁতশিল্পের প্রধান কেন্দ্রস্থল। মর্শিদাবাদ,

শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা, চাদর, মশারি, গালচে, শতরঞ্জি, ব্যান্ডেজ ও বিভিন্ন নিত্যব্যবহার্য কাপড় প্রস্তুত হয়ে থাকে। বয়ননৈপুণ্য ও কারুশিল্পের উচ্চাঙ্গতায় শান্তিপুত্রের কাপড় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিছুদিন আগে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে কয়েকজন শিল্পপরিসিক বিশেষজ্ঞ ভারতে তাঁতশিল্পে উৎপন্ন বস্ত্র রপ্তানির বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করতে আসেন। তাঁরা পশ্চিম বাঙলার রেশমী কাপড় ও শান্তিপুত্রের সূতী কাপড়ের নকশা ও বয়ননৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করেন।



কর্মরত তাঁতশিল্পী

মালদহ, বিষ্ণুপুর, পূর্বদুর্গা প্রভৃতি স্থানে তসর ও গরদের বিভিন্ন উচ্চশ্রেণীর বস্ত্র প্রস্তুত হয়ে থাকে। পশম-বয়নশিল্প যদিও পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ প্রসারলাভ করে নি, তথাপি কালিম্পাং, পাটুলিয়া, বাঁকুড়া, শ্রীকণ্ঠবাটী প্রভৃতি স্থানে কিছু পরিমাণ পশমের কাজ হয়। তাঁতে সাধারণত

এই যন্ত্রশিল্প প্রসারের যুগে প্রত্যেক কুটির-শিল্পকেই কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কাঁচামাল সরবরাহ, কারিগরদের ব্যবস্থা এবং উৎপন্ন পণ্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রত্যেক কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রেই বিশেষ সমস্যা। তাঁতশিল্প ভারতের শ্রেষ্ঠ কুটিরশিল্প এবং এই শিল্পের

সমস্যা বিশেষ গুরুতর। উন্নত প্রণালীর ও উন্নত ধরনের কলকবজা ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি না করতে পারলে শিল্পীরা যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক পেতে পারেন না। উৎপন্ন বস্ত্র যাতে লোকের মনোরঞ্জন করতে পারে তার জন্য চাই

জনসাধারণের দৃষ্টি দেশের এই অন্যতম প্রধান শিল্পের প্রতি সর্বতোভাবে সজাগ করা প্রয়োজন। শহরে, পল্লীতে সর্বত্র বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করে ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করাও একান্ত আবশ্যিক।



মহিলা তাঁতশিল্পী সূতো টানা দিচ্ছেন

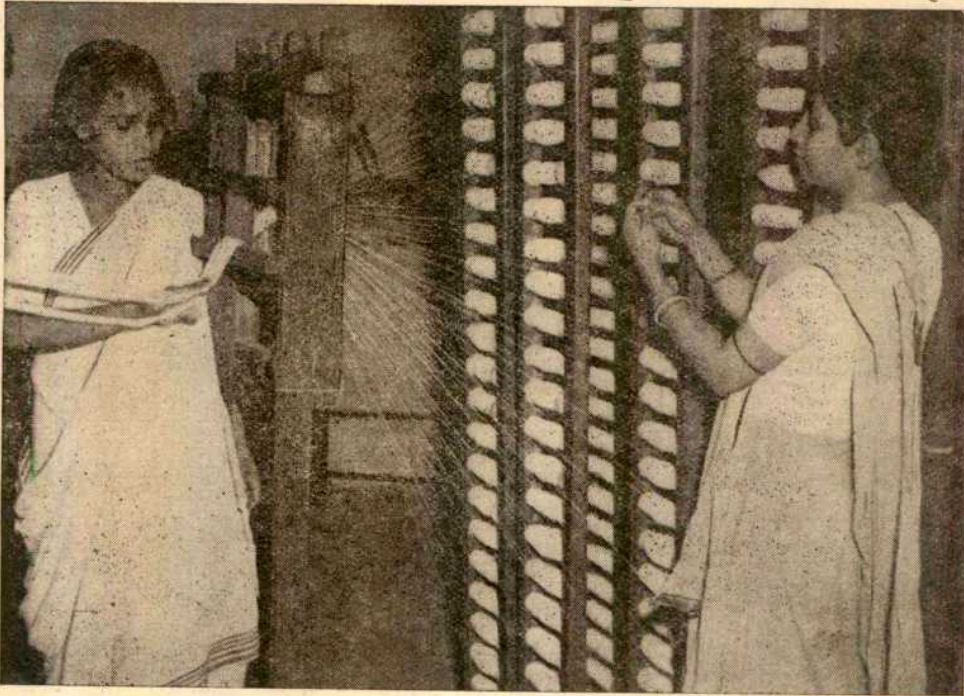
নতুন নতুন ডিজাইন ও পাড়ের অভিনব নকশার উদ্ভাবন, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সূতো ও কাপড়ের রঞ্জন ও রুচিসম্মত বয়ননৈপুণ্য। ডিজাইন ও নকশা উদ্ভাবনের জন্য গবেষণাগার ও স্কুলে সূরুচিসম্পন্ন রঙের সংমিশ্রণের জন্য চাই বিজ্ঞান-সম্মত রঞ্জনশালা। বর্তমান জগতে প্রচার না হ'লে কোন শিল্পই প্রসারলাভ করে না।

সংবাদপত্র, প্রাচীরপত্র, সিনেমা-স্লাইড, ড্রামাম্যাগ আলোকচিত্র, পুস্তিকা, রেডিও ও সাময়িক প্রদর্শনীর মাধ্যমে বহুলপ্রচারের প্রয়োজন।

তাঁতের শিল্পীরা প্রধানত পল্লী-অঞ্চলে বাস করে। প্রত্যেকেই নিজের কুটিরে বস্ত্র উৎপাদন করে। বাঙলার বিভিন্ন গ্রামে লক্ষাধিক পরিবারকে স্বতন্ত্রভাবে সাহায্য করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু সরকারী সাহায্য ছাড়া দারিদ্র্যপীড়িত শিল্পীদের চলা অসম্ভব। তাই চেষ্টা হচ্ছে সমবায়ের মাধ্যমে তাঁদের সংঘবদ্ধ করে সমিতির মারফত সাহায্য করা। সরকারের অনুসৃত এই নীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গের এ রকম সমবায় প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা এখন ৯২৬ এবং এগুটির সভ্যসংখ্যা ৭০

হাজারের উপর পৌঁছে গেছে। এতম্ব্যতীত ১৪টি সভ্যসংস্থা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন এবং একটি প্রাদেশিক সমিতি আছে। ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে ভারত-সরকার তাঁতিশিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য নিখিল-ভারত তাঁতি পর্বদের মাধ্যমে রাজ্য-সরকারগুলিকে সাহায্য করে আসছেন। ১৯৫৪-৫৫ সালে “পশ্চিমবঙ্গ তন্তুবায় সমবায় বিপণন সমিতি” গঠিত হয়। এই সমিতি বিভিন্ন সংঘ-সংস্থা ও প্রাথমিক সমিতির মাধ্যমে সমবায়ী তন্তুশিল্পীদের সেবা-সাহায্য করে আসছে। উৎপাদন, বিক্রয় এবং প্রচার—বিভিন্ন দিকেই এই

কলের কাপড়ের উৎপাদনকে ৫০০ কোটি গজে সীমাবদ্ধ রেখে দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে তাঁতিশিল্পের উৎপাদন দিয়ে মেটাবার প্রচেষ্টার মধ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তাঁতিশিল্পের বিশেষ গুরুত্ব স্বীকৃত হচ্ছে। রাজ্য পুনর্গঠনের পরে পরিকল্পনা কমিশন তাঁতিশিল্পের উন্নতিকল্পে পশ্চিম বাঙলার জন্য প্রায় ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। ১৯৫৬-৫৭ সাল থেকে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত নিখিল-ভারত তাঁতিশিল্প পর্বদ কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে এই অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে এবং হবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক



হুতো টানা দেবার আর একটি দৃশ্য

সমিতি উন্নতিবিধানের বিশেষ চেষ্টা করছে। প্রাদেশিক সমিতি যাতে সক্রিয় সাহায্য করতে পারে সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকার মূলধন ঋণ দিয়ে এবং অন্যান্য সাহায্য দিয়ে একে পরিপূর্ণ করার প্রয়াস করছে।

পরিকল্পনাকালে এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে ভারত-সরকার মূলধন বাবত ঋণ দিয়েছেন বিনাসুদে। কিন্তু বর্তমান বৎসর থেকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কৃষিঋণের অনুরূপ শর্তে তন্তুবায় সমবায় সমিতিতে ঋণ দেওয়ার নীতি গৃহীত

হয়েছে। অবশ্য আর্থিক বৎসরের প্রথমার্ধে অল্প সূদে সরকারী তহবিল থেকেও ঋণ পাওয়া যাবে। নিখিল-ভারত তাঁতশিল্প পর্ষদের অনুরূপ পশ্চিমবঙ্গ হস্তচালিত তন্তুবায় পর্ষদ নামে একটি সংস্থা পশ্চিম বাঙলায় ১৯৪৮ সাল থেকে কাজ করে আসছে। নিম্নে পশ্চিমবঙ্গের তাঁত-শিল্পের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'ল।

১৯৫৬-৫৭ সালে বিভিন্ন পরিকল্পনায় পশ্চিম-বঙ্গে ৩৬ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, ১৯৫৭-৫৮ সালে এর চেয়েও কিছু বেশি টাকা ব্যয় হবে। প্রথমে ১৯৫৬-৫৭ সালের পরিকল্পনার কথা বলা হচ্ছে :

(ক) সমবায়-বহির্ভূত তন্তুবায় শিল্পীরা যাতে সমবায় সমিতিতে যোগদান করতে পারে অথবা নতুন সমবায় সমিতি গঠন করতে পারে সেজন্য এবছর সরকার ৮ হাজার টাকার উপরে শেয়ারের টাকা বাবত ঋণ দিয়েছেন। সূতো কেনা এবং মজুরি বাবত মাথাপিছু ২০০ টাকা হিসাবে ১৫ শত এবং মাথাপিছু ৩০০ টাকা হিসাবে ৫ হাজার তন্তুবায়কে সরকার মোট ১৮ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছেন।

(খ) পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বিপণন সমিতিকে রাজ্যে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য এক লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়। এ ছাড়া এই সমিতির মাধ্যমে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূলধন বিলি করা হয়। বিভিন্ন কুটিরজাত কারুশিল্পে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য রাজ্যসরকার এই সমিতিকে ৯৫ হাজার টাকা ঋণ হিসাবে দিয়েছেন। উৎপাদন এবং বিক্রয় দু'দিকেই এই সমিতি মনোনিবেশ করেছেন।

(গ) আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ব্যবহার ক'রে যাতে শিল্পী ও কারিগরেরা পণ্যের উৎকর্ষ-সাধন করতে পারেন সেজন্য ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার অধিক মূল্যের তাঁত ও সরঞ্জাম সমবায় সমিতির সভ্যদের বিলি করা হয়েছে। এইসমস্ত

সরঞ্জামের মধ্যে আছে দস্তি, স্বয়ংচালিত বস্ত্র-গুটানো সরঞ্জাম, মাননির্ণীত সানা, উন্নত ধরনের 'ব', অর্ধ-স্বয়ংক্রিয় তাঁত ও টানা দেওয়ার জন্য ড্রাম।

(ঘ) সূতার রঙ পাকা ও উজ্জ্বল ক'রে কাপড়ের ডিজাইনকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ১৯৫৪-৫৫ সালে ২০টি বিজ্ঞানসম্মত রঞ্জনশালা খোলা হয়েছে। এই রঞ্জনশালাগুলি এবছরও চালু রাখা হয়েছে।

(ঙ) নতুন ডিজাইনের উদ্ভাবন ও রকে ছাপার জন্য শ্রীরামপুর বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের সংশ্লিষ্ট একটি কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান বৎসরে সেটি হাওড়াতে সেন্ট্রাল ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা-বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখান থেকে আধুনিক রুচিসম্মত ডিজাইন সরবরাহ ক'রে কাপড়ের উৎকর্ষসাধন করা হচ্ছে। এ ছাড়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত একটি গবেষণাশাখা বহুদিন ধরে নানা উদ্ভাবনী শাখায় কাজ করে আসছে। সেখানে সাধারণতই উন্নত ধরনের তাঁত ও সরঞ্জাম প্রস্তুতির বিষয়ে গবেষণা হয়ে থাকে। এই গবেষণাগারটির পরিবর্তনের জন্য ১৯৫৬-৫৭ সালের শেষদিকে ভারত-সরকার কিছু আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করেন। ১৯৫৭-৫৮ সালে এই পরিবর্তনের কাজ আরম্ভ হবে।

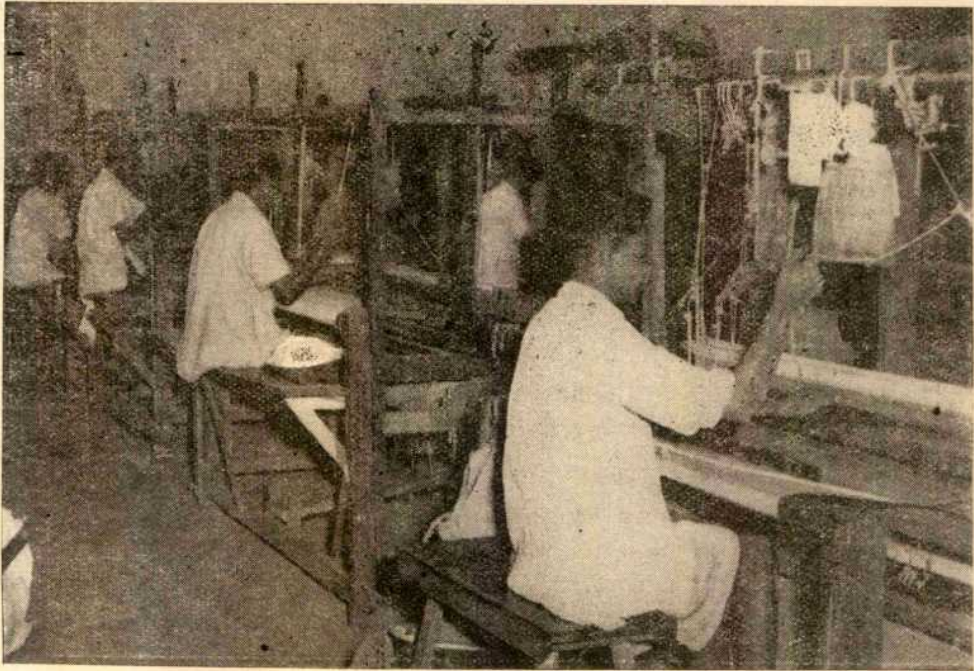
(চ) তাঁত শিল্পজাত পণ্যের সৃষ্টি, বিক্রয়-ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে এ পর্যন্ত সরকার ১৫১টি বিক্রয়কেন্দ্রের জন্য আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করেছেন। বিক্রয়কেন্দ্রগুলি সবই চালু আছে এবং বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্য এইসব বিক্রয়কেন্দ্র ও অনুমোদিত সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিক্রি হয়েছে। বিক্রয়কেন্দ্রগুলিকে যথাসময়ে পণ্য সরবরাহ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বিপণন সমিতিকে তিনটি সরবরাহকেন্দ্র (সেন্ট্রাল ডিপো) স্থাপন করার জন্য সরকার ১৮ হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন। এই কেন্দ্র-গুলি যথোপযুক্ত কাজ ক'রে আসছে।

(ছ) তাঁতবস্ত্রের উৎপাদনে মিলএর কাপড়ের চেয়ে খরচ একটু বেশি পড়ে। এই অসম প্রতিযোগিতার জন্য তন্তুবায়ীদের যে অসুবিধা হয় তা দূর করার উদ্দেশ্যে সরকার তাঁতবস্ত্র বিক্রয়ের উপর এক আনা থেকে ছ' পয়সা পর্যন্ত ছাড় (রিবেট) দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এর ফলে সমবায়ী তন্তুবায়েরা অপেক্ষাকৃত কম দামে কাপড় বিক্রি করতে পারেন এবং ক্রেতারও তাঁতের কাপড়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। এবছর সরকার এই খাতে ৪ লক্ষ ২৬ হাজার টাকার উপর খরচ করেছেন।

(জ) এই প্রাচীনতম কুটিরশিল্প যাতে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে সেজন্য

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বিপণন সমিতিতে এ বৎসরে একটি ভ্রাম্যমাণ বিপণির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। এই সমিতি যাতে উৎকৃষ্ট নমুনা ও নকশা সংগ্রহ করে শিল্পীদের সাহায্য করতে পারে সেজন্য সরকার অর্থ দিয়ে থাকেন।

(ঝ) তন্তুবায় ও তাঁতশিল্পের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সৃজনী প্রতিভার বিকাশকল্পে সরকার প্রতি বৎসর পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করে উৎসাহ দিয়ে আসছেন। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এবং প্রতিটি জেলায় একটি করে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এ বৎসর পুরস্কার হিসাবে মোট সাত হাজার টাকার উপর বিতরণ করা হয়েছে।



একটি তাঁতশিল্পকেন্দ্রে কাজ চলছে

সংবাদপত্র, প্রচারপত্র, প্রাচীরপত্র, চলচ্চিত্র, বিদ্যুৎ-লিখন, প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে শহর ও পল্লী-অঞ্চলে প্রচার করা হচ্ছে। ভ্রাম্যমাণ বিপণি সাহায্যে সুদূর পল্লীঅঞ্চলে বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্র ও রেকর্ড সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রচারকার্য চালানো হচ্ছে। সরকারী ভ্রাম্যমাণ বিপণি ছাড়াও

(ঞ) তাঁতবস্ত্রের বৈশিষ্ট্য রক্ষা ও উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে সরকার অভিজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগ করে একটি ক্ষুদ্র পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই কর্মচারীরা বিভিন্ন সমবায় উৎপাদনকেন্দ্রে বস্ত্রের মান ও বৈশিষ্ট্য রক্ষার বিষয়ে তদারক ও সাহায্য করে থাকেন।

(ট) উল্লিখিত পরিকল্পনাগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সরকার উপযুক্ত সংখ্যায় নিপুণ ও অভিজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগ করেছেন।

১৯৫৭-৫৮ সালে এইসমস্ত পরিকল্পনার সঙ্গে সরকার আরও কয়েকটি নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করার বিষয় বিবেচনা করছেন। এ পরিকল্পনাগুলির মধ্যে আছে, গৃহহীন তন্তুবায়দের জন্য গৃহ নির্মাণ, তন্তুবায়দের জীর্ণ গৃহের সংস্কার, সমবায়ী তন্তুবায়দের জন্য সবল তহবিল স্থাপন, সমবায়ের ভিত্তিতে তাঁত ও সরঞ্জাম তৈরির কারখানা স্থাপন ও উৎপাদনকার্যে রত সমবায় সমিতিগুলিকে সমিতির কার্য পরিচালনার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া। এ ছাড়া সমবায় সমিতিগুলির মাসিক উৎপাদন, বিক্রয়, সুতোর প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে পরিসংখ্যান সংগ্রহের ব্যবস্থাও করা হবে।

যুদ্ধোত্তরকালে নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া হ'লে তাঁতশিল্পের ভয়ানক দুর্দিন এসেছিল। তাই সরকারকে এগিয়ে আসতে হয়েছে তাঁতশিল্পকে সাহায্য করে দেশের ও জাতির এই সম্পদ ও গৌরবকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এই তাঁতশিল্প আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার অন্যতম প্রতীক। কলের উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তাঁতের কাজকে অকপণ সাহায্য দিয়ে সরকার এই শিল্পকে সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। আশার বিষয় যে, তাঁতশিল্প ক্রমেই জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতা, আনুকূল্য ও সক্রিয় সাহায্য লাভ করছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৩ সালে তাঁতের কাপড় উৎপন্ন হয়েছিল মোট ১০ কোটি গজ। উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫৪ সালে ১১ কোটি ২৫ লক্ষ গজ, ১৯৫৫ সালে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ গজ এবং ১৯৫৬ সালে ১৫ কোটি গজের অধিক দাঁড়ায়। ১৯৫৬ সালে অনেক তন্তুবায়ের গৃহ বন্যায় ভেসে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁতশিল্পের এই অগ্রগতি একটুও ব্যাহত হয় নি।

যে ল্যাক্সাশায়ারের বস্ত্রশিল্প আমাদের তাঁতশিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল আজ পশ্চিমের নানা দেশের মধ্যে সেই ল্যাক্সাশায়ারেও আমাদের তাঁতের কাপড় রপ্তানি হচ্ছে। উত্তর আমেরিকা, আমেরিকার যুক্তরাজ্য এবং প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশেও আমাদের তাঁতের কাপড় সমাদর লাভ করেছে। আমরা নিশ্চয় আশা করতে পারি যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণ সম্পূর্ণ হ'লে তাঁতীর কুটিরে অন্নবস্ত্রের সংস্থান হবে।

আমাদের জাতীয় আর্থনীতিক ক্ষেত্রে তাঁতশিল্পের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাই সরকারী আনুকূল্যে ও স্বদেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থনে এই শিল্প যাতে হতগৌরব পুনরুদ্ধার করে জাতীয় জীবনে স্বাভাবিক গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে, সে বিষয়ে আমাদের সচেতন হ'তে হবে। দেশের সম্পদ ও জাতির গৌরব আমাদের তাঁতশিল্প। একে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য জনগণের সহৃদয় সমর্থন একান্ত আবশ্যিক। এ শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লে আমাদের জাতীয় জীবনে অর্থসমতা ফিরে আসবে। আমাদের দরিদ্র তাঁতীর অবস্থার উন্নতি হবে। গ্রামকে কেন্দ্র করে যে নতুন আর্থনীতিক জীবন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হচ্ছে তা সার্থক হবে। নাগরিক ও যান্ত্রিক সভ্যতার অপারিকল্পিত অগ্রগতিতে আমাদের যে পল্লীগুণী শ্রীহীন ও দুর্দশা-কবলিত হয়ে পড়ে ছিল, সেখানে আবার প্রাণধারা উচ্ছল হয়ে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে উৎসব সমারোহে পল্লী-জীবন আবার উঠবে জেগে।

তাঁতের কাপড়ের বিক্রয়কেন্দ্রের তালিকা

মুর্শিদাবাদ—

- ১। জংগীপুর বান্ধব সমবায় খরিদ্দার বিপণনকেন্দ্র।
- ২। মুর্শিদাবাদ নগর সমবায় সমিতি, বহরমপুর।



জামদানি শাড়ি—বাঙলার তাঁতশিল্পের গৌরব

বঙ্গদেবতা : ১০ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা

- ৩। কান্দি সমবায় শিল্পসংঘ, কান্দি।
- ৪। বলরামপুর নানার্থক সমবায় সমিতি।
- ৫। জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি।

নাঙ্গিয়া—

- ৬। রাণাঘাট মহকুমা সমবায় শিল্পসংঘ, শান্তিপুর্।
- ৭। নবদ্বীপ সমবায় ঋণদান ব্যাঙ্ক।
- ৮। শান্তিপুর্ কারিগরপাড়া তন্তুবায় সমবায় সমিতি।
- ৯। শান্তিপুর্ শিল্প সমবায় সমিতি, কৃষ্ণনগর।
- ১০। নবদ্বীপ সমবায় তন্তুবায় ও শিল্প সমিতি।
- ১১। দালালপাড়া তন্তুবায় সমবায় সমিতি।
- ১২। আইনতলা সমবায় তন্তুবায় সমিতি।
- ১৩। রাণাঘাট মহকুমা সমবায় শিল্পসংঘ, হাওড়া।
- ১৪। শান্তিপুর্ কুটিরপাড়া তন্তুবায় সমবায় সমিতি, রাণাঘাট।
- ১৫। শান্তিপুর্ সাহাপাড়া তন্তুবায় সমবায় সমিতি, নবদ্বীপ।
- ১৬। রাণাঘাট মহকুমা সমবায় শিল্পসংঘ, কাঁচরাপাড়া।
- ১৭। শান্তিপুর্ শিল্প সমবায় সমিতি।

বর্ধমান—

- ১৮। বর্ধমান সমবায় শিল্পসংঘ।
- ১৯। বান'পুর্ নানার্থক সমবায় সমিতি, বান'পুর্।
- ২০। আসানসোল রেলকর্মী সমবায় নানার্থক সমিতি।
- ২১। চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিনকর্মী সমবায় সমিতি।
- ২২। কাটোয়া কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়ন সমবায় সমিতি।
- ২৩। কালনা নগর সমবায় ঋণ ব্যাঙ্ক ও নানার্থক সমবায় সমিতি।

- ২৪। বর্ধমান জেলা কেন্দ্রীয় নানার্থক সমবায় সমিতি।
- ২৫। গুদসকরা নানার্থক সমবায় সমিতি, গুদসকরা।
- ২৬। পূর্ব-ভারতীয় রেলকর্মী সমবায় বিপণনকেন্দ্র, অল্ডাল।
- ২৭। বর্ধমান সমবায় শিল্পসংঘ।
- ২৮। বান'পুর্ নানার্থক সমবায় সমিতি।

হাওড়া-হুগলি—

- ২৯। শিবপুর সমবায় ব্যাঙ্ক, হাওড়া।
- ৩০। শ্রীরামপুর সমবায় নানার্থক সমিতি।
- ৩১। হুগলি শ্রমজীবী সমবায় শিল্পসংঘ, চুঁচুড়া।
- ৩২। আরামবাগ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক।
- ৩৩। হুগলি শ্রমজীবী সমবায় শিল্পসংঘ, হাওড়াহাট।
- ৩৪। হুগলি শ্রমজীবী সমবায় শিল্পসংঘ, চন্দননগর।
- ৩৫। শ্রীরামপুর বয়নশিল্প সমবায় সমিতি।
- ৩৬। পাণ্ডুরা সাধারণ নানার্থক সমবায় সমিতি।
- ৩৭। নবগ্রাম সমবায় কলোনি, কোল্লগর।
- ৩৮। লিলুয়া রেলকর্মী বিপণন সমিতি, লিলুয়া।
- ৩৯। ব্যান্ডেল রেলকর্মী সমবায় সমিতি, ব্যান্ডেল।
- ৪০। শ্রীরামপুর বয়নশিল্প সমবায় সমিতি, উত্তরপাড়া।
- ৪১। হুগলি শ্রমজীবী সমবায় শিল্প সংঘ, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ৪২। আকুনি ইচাপাসার ইউনিয়ন তন্তুবায় সমবায় সমিতি, সেওড়াফুলিহাট।

মেদিনীপুর—

- ৪৩। মেদিনীপুর সমবায় শিল্প সংঘ।
- ৪৪। তমলুক সমবায় শিল্প সংঘ।
- ৪৫। কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্ক।

- ৪৬। ঘাটাল জনসমবায় ব্যাঙ্ক।
 ৪৭। অমর্ষি তন্তুবায় পণ্য বিক্রয় সমবায় সমিতি।
 ৪৮। ঝাড়গ্রাম জনসমবায় ব্যাঙ্ক।
 ৪৯। স্দুতাহাটা সমবায় নানার্থক সমিতি, মহিষাদল।
 ৫০। মেদিনীপুর সমবায় শিল্প সংঘ, খজাপুর।
 ৫১। ভজ্জভূম সমবায় কৃষি ও শিল্প সমিতি, শালবনী।
 ৫২। গড়বেতা সমবায় বিপণন সমিতি।
 ৫৩। ডিমারী সমবায় তন্তুবায় সমিতি, রাধামণিহাট।
 ৫৪। মেদিনীপুর সমবায় শিল্প সংঘ, বালিচক।
 ৫৫। বড় কাদরা সমবায় নানার্থক সমিতি, গোয়ালতোড়।
 ৫৬। দাঁতন জনসমবায় ব্যাঙ্ক।
 ৫৭। এগরা বহুমুখী সমবায় সমিতি।
 ৫৮। রামজীবনপুর তন্তুবায় সমবায় সমিতি।
 ৫৯। চেমিয়া সমবায় শ্রমিকোন্নতি সমিতি।
 ৬০। মেদিনীপুর সমবায় শিল্প সমিতি।
 ৬১। মেদিনীপুর সমবায় শিল্প সংঘ, মেদিনীপুর।
 ৬২। আনন্দপুর তন্তুবায় সমবায় সমিতি।

বীরভূম—

- ৬৩। সিউড়ি সমবায় শিল্প সংঘ।
 ৬৪। রামপুরহাট সমবায় শিল্প সংঘ।
 ৬৫। বিশ্বভারতী সমবায় ব্যাঙ্ক।
 ৬৬। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, শান্তিনিকেতন।
 ৬৭। বোলপুর কারু ও শিল্প সমবায়, বোলপুর।
 ৬৮। জগধারী সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি।

বাঁকুড়া—

- ৬৯। বাঁকুড়া জেলা শিল্প সংঘ।
 ৭০। বিষ্ণুপুর সমবায় শিল্প সংঘ।

- ৭১। বিষ্ণুপুর সমবায় শিল্প সংঘ।
 ৭২। রাজগ্রাম তন্তুবায় সমবায় সমিতি।
 ৭৩। সোনামুখী সমবায় বিপণন সমিতি।
 ৭৪। লক্ষ্মীসাগর তন্তুবায় সমবায় সমিতি।
 ৭৫। গোপীনাথপুর তন্তুবায় সমবায় সমিতি।
 ৭৬। কেন্জাকুরা তন্তুবায় সমবায় সমিতি।

মালদহ—

- ৭৭। বঙ্গীয় সমবায় রেশম সংঘ, মালদহ।
 ৭৮। চণ্ডল সমবায় শিল্প ভান্ডার।
 ৭৯। হরিশ্চন্দ্রপুর সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি।
 ৮০। সামসী সমবায় বিপণন সমিতি।

পশ্চিম দিনাজপুর—

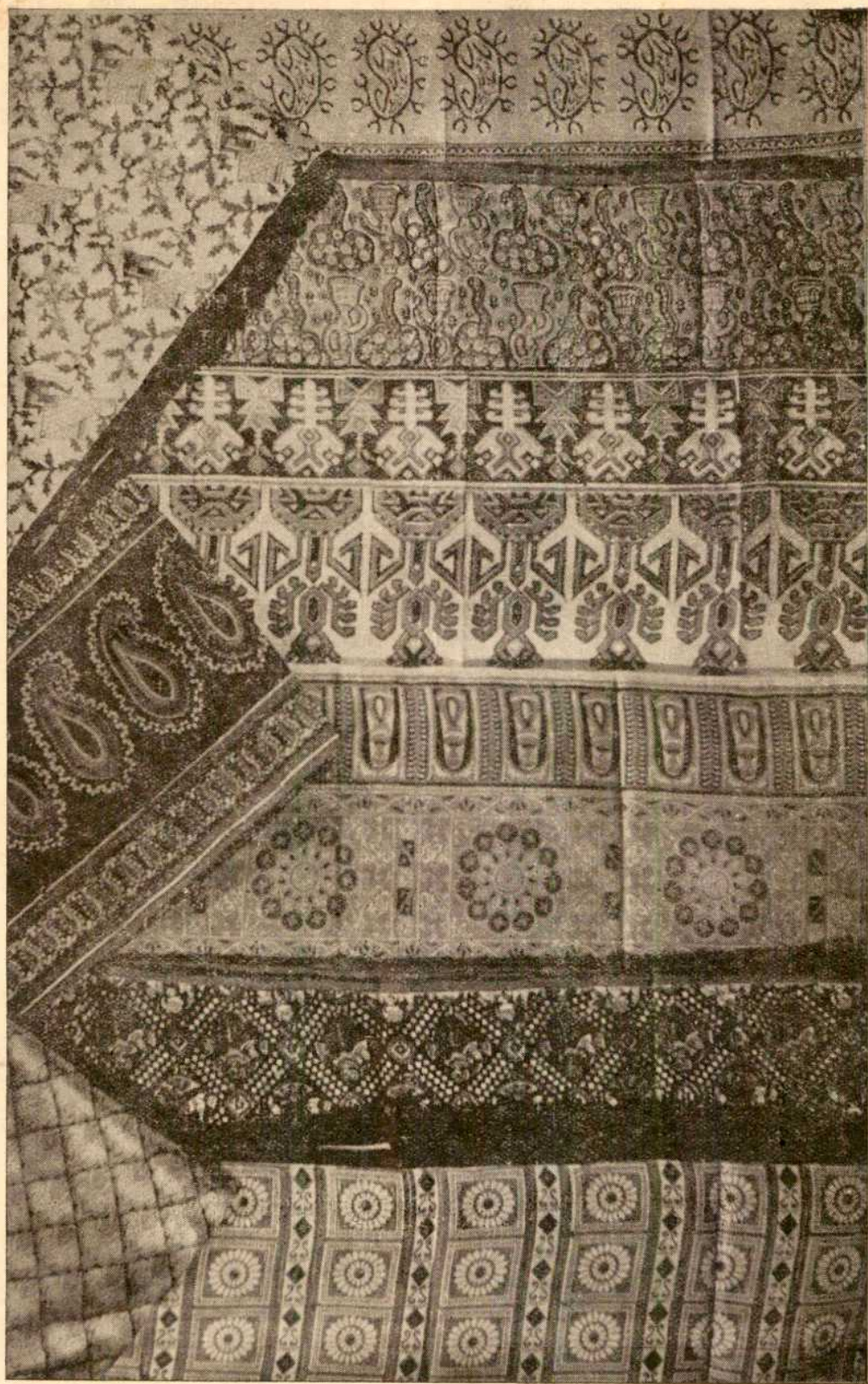
- ৮১। হিলি খরিন্দার সমবায় বিপণন সমিতি।
 ৮২। রায়গঞ্জ সমবায় ব্যাঙ্ক।
 ৮৩। কালিয়াগঞ্জ সমবায় নানার্থক সমিতি।

দার্জিলিং—

- ৮৪। কালিম্পাঙ্গ শিল্প সমবায় সমিতি।
 ৮৫। কালিম্পাঙ্গ শিল্প সমবায় সমিতি।
 ৮৬। জলপাইগুড়ি সমবায় নানার্থক সমিতি।
 ৮৭। কোচবিহার নারী শিল্প সমবায় সমিতি।
 ৮৮। শিলিগুড়ি সমবায় ঋণদান সমিতি।
 ৮৯। ডি এইচ রেলওয়ে সমবায় ঋণদান সমিতি।
 ৯০। মৈতালি থানা সমবায় নানার্থক সমিতি।
 ৯১। ধুলাঝোড়া সমবায় নানার্থক সমিতি।

কলিকাতা ও চব্বিশপরগনা—

- ৯২। বরানগর সমবায় সমিতি।
 ৯৩। টালিগঞ্জ তন্তুবায় সমবায় সমিতি।
 ৯৪। নারী সমবায় শিল্পগৃহ, শ্যামবাজার।
 ৯৫। বসিরহাট সমবায় শিল্পসংঘ।
 ৯৬। বারাসত সমবায় বিপণি।
 ৯৭। গোসাবা সমবায় ভান্ডার।
 ৯৮। মহিষপুর জনসমবায় বিপণন, ডায়মন্ড-হারবার।
 ৯৯। বেলগাছিয়া খরিন্দার সমবায় বিপণন।



ভাৰতৰ ৰেশমী কাপড়ৰ বিভিন্ন নমুনা।

- ১০০। বারগদুম কৃষি ও কৃষি-বিপণন সমবায় সমিতি, হাবড়া।
- ১০১। যাদবপুর মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি, যাদবপুর।
- ১০২। যাদবপুর মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি, বালিগঞ্জ।
- ১০৩। কাঁচরাপাড়া রেলকম্পী সমবায় বিপণন সমিতি।
- ১০৪। বাটানগর কম্পী সমবায় সমিতি, বাটানগর।
- ১০৫। চালক সমবায় বিপণন, বারাকপুর।
- ১০৬। নাকতলা সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি, নাকতলা।
- ১০৭। বসিরহাট সমবায় শিল্প সংঘ, বড়বাজার, কলিকাতা।
- ১০৮। সুভাষম্বীপ উপনিবেশ সমবায় নানার্থক সমিতি, কলিকাতা।
- ১০৯। অশোকনগর সমবায় বয়নশিল্প সমিতি, হাওড়া।
- ১১০। উত্তর কলিকাতা সমবায় বিপণি, কলিকাতা।
- ১১১। ঢাকা তন্তুবায় জনকল্যাণ সমবায় সমিতি, শ্যামবাজার, কলিকাতা।
- ১১২। সুভাষনগর সমবায় নানার্থক সমিতি, বনগ্রাম।
- ১১৩। সতীন সেন শ্রমশিল্প তন্তুবায় সমবায় সমিতি, বারদুইপুর।
- ১১৪। নৈহাটি রেলকম্পী সমবায় বিপণন সমিতি, নৈহাটি।
- ১১৫। বটতলা সমবায় সমিতি, কলিকাতা।
- ১১৬। বোলপুর কারু ও শিল্প সমবায়, কলিকাতা।
- ১১৭-১৩৯। পশ্চিমবঙ্গ তন্তুবায় সমবায় বিপণন সমিতি, কলিকাতা।
- ১৪০। হালতু ইউনিয়ন মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি।

- ১৪১। মহিলা সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি, মধ্যমগ্রাম।
- ১৪২। শরণার্থী সমবায় খরিদ্দার বিপণন, বিজয়গড়।
- ১৪৩। রেলকম্পী সমবায় নানার্থক সমিতি, কলিকাতা।
- ১৪৪। কলিকাতা বিমানবন্দরকম্পী সমবায় বিপণন, দমদম।
- ১৪৫। কলিকাতা বাস্তুহারা সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি, কলিকাতা।
- ১৪৬। বিবেকানন্দ শ্রমশ্রী সমবায় সমিতি, কলিকাতা।
- ১৪৭। রেলকম্পী খরিদ্দার সমবায় বিপণন, দমদম।
- ১৪৮। বালীগঞ্জ খরিদ্দার সমবায় বিপণন, বালীগঞ্জ।
- ১৪৯। নেবুতলা তন্তুবায় সমবায় সমিতি, কলিকাতা।

পদুর্দলিয়া—

- ১৫০। পদুর্দলিয়া জেলা সমবায় শিল্পসংঘ, পদুর্দলিয়া।
- ১৫১। রঘুনাথপুর তন্তুবায় সমবায় সমিতি, পদুর্দলিয়া।

কেন্দ্রীয় বিকল্পকেন্দ্র

- ১। পশ্চিমবঙ্গ তন্তুবায় সমবায় বিপণন সমিতি, ১০ ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ২। পশ্চিমবঙ্গ তন্তুবায় সমবায় বিপণন সমিতি, ২০৮ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।
- ৩। পশ্চিমবঙ্গ তন্তুবায় সমবায় বিপণন সমিতি, ১৫বি ক্যানাল স্ট্রীট, কলিকাতা।

রঞ্জনশালার তালিকা

- ১। মেদিনীপুর সমবায় শিল্প সংঘ।
- ২। তমলুক সমবায় শিল্প সংঘ, মেদিনী-পুর।

বঙ্গদ্রুপ : ১০ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা

- ৩। বসিরহাট সমবায় শিল্প সংঘ, চব্বিশ-পরগনা।
- ৪। বোলপুর কারু ও শিল্প সমবায়, বীরভূম।
- ৫। বিষ্ণুপুর সমবায় শিল্প সংঘ, বাঁকুড়া।
- ৬। রাণাঘাট মহকুমা সমবায় শিল্প সংঘ, শান্তিপুর, নদিয়া।
- ৭। হুগলি শ্রমজীবী সমবায় শিল্প সংঘ, শ্রীরামপুর।
- ৮। নারী সমবায় শিল্পভবন, কামারহাট, চব্বিশপরগনা।
- ৯। টালীগঞ্জ তন্তুবায় সমবায় সমিতি, কলিকাতা-৩৩।
- ১০। নবাবীপ সমবায় তন্তুবায় শিল্প সমিতি, নদিয়া।
- ১১। বর্ধমান সমবায় শিল্প সংঘ।
- ১২। কাটোয়া কেন্দ্রীয় শিল্প উন্নয়ন সমবায় সমিতি, বর্ধমান।
- ১৩। তাঁতীপাড়া তন্তুবায় সমবায় সমিতি, বীরভূম।
- ১৪। বিশ্বভারতী তন্তুবায় সমবায় সমিতি, বীরভূম।
- ১৫। বঙ্গীয় সমবায় রেশম সংঘ, মালদহ।
- ১৬। সোনামুখী সমবায় রেশম শিল্প সংঘ, বাঁকুড়া।
- ১৭। শিল্পবিভাগের উৎপাদনকেন্দ্র, নবাবীপ, নদিয়া।
- ১৮। শিল্পবিভাগের উৎপাদনকেন্দ্র, ফুলিয়া, নদিয়া।
- ১৯। শিল্পবিভাগের উৎপাদনকেন্দ্র, বাঁকুড়া।
- ২০। শিল্পবিভাগের উৎপাদনকেন্দ্র, মৃগ-বেড়িয়া, মেদিনীপুর।

তাঁতশিল্পের উন্নতিকল্পে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় উন্নত ধরনের তাঁত ও সরঞ্জামাদি বিতরণ, ১৯৫৬-৫৭

- ১। স্বয়ংক্রিয় বস্ত্র ও টানা যন্ত্র (টেক-আপ)—
নদিয়া ... ১০০
চব্বিশপরগনা ... ২৬২

মেদিনীপুর	... ৪৯৮
মুর্শিদাবাদ	... ১৩০
মালদহ	... ৫০
পশ্চিম দিনাজপুর	... ৫০
হাওড়া-হুগলি	... ১৩

১,১৫৩

২। দস্তি ও নরোজ—

নদিয়া	... ১৫০
চব্বিশপরগনা	... ১০০
মেদিনীপুর	... ১০০
মুর্শিদাবাদ	... ১০০
মালদহ	... ৭৫
পশ্চিম দিনাজপুর	... ৫০
হাওড়া-হুগলি	... ১৫০
কোচবিহার-দার্জিলিং	... ৭৫
জলপাইগুড়ি	... ৭৫
বীরভূম	... ৫০
বাঁকুড়া	... ৫০

১,০০০

৩। অর্ধ-স্বয়ংক্রিয় তাঁত—

নদিয়া	... ৫০
চব্বিশপরগনা	... ৫০
মেদিনীপুর	... ১০
বর্ধমান	... ২৬
মুর্শিদাবাদ	... ১০
মালদহ	... ১৫
হাওড়া-হুগলি	... ২৫
বাঁকুড়া	... ১৫

২০১

৪। সানা—

	সর	বাঁশ	লোহা
নদিয়া	১,৫০০	—	৩০০
চব্বিশপরগনা	১,০৭৫	৩০০	—
মেদিনীপুর	১,৪৫০	৪০০	—
বর্ধমান	১,০০০	—	—
মুর্শিদাবাদ	৫০০	—	—
মালদহ	৩০০	৩০০	—
পশ্চিম দিনাজপুর	১০০	—	—
কোচবিহার, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি	২০০	—	—
বীরভূম	১৩০	—	—
বাঁকুড়া	১,০০০	—	—
হাওড়া-হুগলি	১,৪০০	—	—
	৮,৬৫৫	১,০০০	৩০০

চাষীর শত্রু ইঁদুর

ইঁদুরের ঘম

‘সাইনোগ্যাস’

ক্ষেত-খামারে, গুদামে এবং ধানের গোলার ধারে
ধারে ইঁদুর মারিবার জন্য ‘সাইনোগ্যাস’
ব্যবহার করুন

এর ব্যবহার
সম্বন্ধে আপ-
নাদের কৃষি-
সহায়কের
পরামর্শ নিন

শ ওয়ালেস অ্যান্ড কোং, লিঃ,
৪নং ব্যাংকশাল স্ট্রীট
কলিকাতা-১

ক্রেতাদের সমবায়

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য

ক্রেতা-সমবায় সমিতি গঠন করে ক্রেতা জনসাধারণকে ন্যায়সঙ্গত মূল্যে খাঁটি পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা অনায়াসেই হ'তে পারে। এই ক্রেতা-সমবায়ের সঠিক রূপ ও কার্যকারিতা একটু বিশদভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। এই ক্রেতা-সমবায় আন্দোলনের বিশেষ রূপ ও কার্যকারিতা তা হ'লেই জাতীয় জীবনে কার্যকর হ'তে পারে।

ক্রেতা-সমবায়ের বিষয়ে কিছু বলতে গেলেই সমবায় আন্দোলনের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রথমেই প্রয়োজন। আধুনিক সমবায় আন্দোলন প্রথম আরম্ভ হ'ল ইংলন্ডের রচভেল শহরে—যেখানে ২৮ জন তাঁতী নিজেদের প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সংগ্রহের জন্য প্রথমে একটি ভান্ডার গঠন করলেন। এই ভান্ডার হ'ল আধুনিক ক্রেতা-সমবায় আন্দোলনের প্রাথমিক ভিত্তি। ক্রেতার সাংঘবন্দ্য হয়ে ন্যায্য দরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সংগ্রহের জন্য যে সমবায় সংগঠন গড়ে তোলেন, তাকেই বলা চলে ক্রেতা-সমবায় বা সমবায় ভান্ডার। ইউরোপের অধিকাংশ দেশে সাধারণ ক্রেতার সমবায় ভান্ডার গড়ে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করেছেন—সকলের লক্ষ্য হচ্ছে আর্থনৈতিক সমস্বার্থের সংরক্ষণের দ্বারা খাঁটি পণ্য সংগ্রহ। কেবলমাত্র ১৯৫৪ সালে ব্রিটিশ সমবায় ভান্ডার আন্দোলনের সঙ্গে সদস্য হিসাবে জড়িত ছিলেন গ্রেট ব্রিটেনের মোট লোকসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ—প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ লোক। ভারতে যেমন কৃষি সমবায় সমিতির আধিক্য, ইউরোপের ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে এইরূপ ক্রেতা-সমবায়ের সংখ্যা ও কার্যকারিতা অধিক।

ক্রেতাদের জন্য সাধারণ দোকান যে সুবিধা দেয় সমবায় ভান্ডারও সেই সুবিধা দিচ্ছে, অর্থাৎ বাজার-দরে জিনিস খরিদদারকে সরবরাহ করছে। ক্রেতা-

সমবায়ের মৌলিক সার্থকতা কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, ক্রেতা-সমবায়ের সার্থকতা হচ্ছে সমিতির সদস্যের উপর মধ্যবর্তী দালালের তথা মধ্যবর্তী মুন্যফার বিলোপসাধন। কথাটা আরও স্পষ্ট করে বলি। সমবায় ভান্ডার সমিতি বাজার থেকে যে জিনিস কেনে, তা গৃহ ও মূল্য যাচাই করে কেনা হয়। বাজারে জিনিস আসে উৎপাদকদের হাত থেকে সরাসরি আড়তদারদের হাতে। মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে তা দোকানদারদের হাতে যায়। ফলে কয়েকটি হাত ঘোরার পর খরিদদারের সামনে যখন জিনিস পৌঁছে, তখন মূল্য অনেক আক্কা হয়ে ওঠে। এই অধিক মূল্যের টাক্স জোগাতে হয় খরিদদারদেরই। তা ছাড়া আছে ভেজাল, চোরাবাজার, খারাপ জিনিসের উৎপাদ। কিন্তু সমবায় ভান্ডার ব্যবসাকার্য পরিচালনার ব্যয়নির্বাহের জন্য সামান্য মাত্র কমিশন বা খরচা রেখে যথাসম্ভব সুলভ মূল্যে সরবরাহ করে ক্রেতাকে খাঁটি জিনিস, ক্রেতা-সমবায়ী সদস্যকে বৎসরের হিসাবনিকাশের পর দেয় শেয়ারের উপর বোনাস—যে ক্রেতা যত পরিমাণ পণ্য 'ক্রয়' করেন, এই বোনাসও সেই হারে বৃদ্ধি পায়।

নিয়ন্ত্রণের যুগ যখন ছিল—তখন নিয়ন্ত্রিত পণ্যসামগ্রী সরবরাহের জন্য অনেক ক্রেতা-সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সেগুলির প্রয়োজন ছিল সাময়িক। ক্রেতাদের স্বার্থ সংরক্ষণে এরূপ ভান্ডার সমিতির সার্থকতা সেদিন ছিল বটে, তাই দেশের লোক নিয়ন্ত্রণের মরসুমে নিজ নিজ পল্লীতে সমিতি গঠন করে নিয়ন্ত্রিত পণ্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করেন। তাঁরা যদি বুঝতেন যে, এরূপ সমিতির বিনিয়ন্ত্রণ যুগেও প্রয়োজন আছে তা হ'লে ঐগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতেন। এ বিষয়ে আলোচনা ও ব্যাপক অনুসন্ধান প্রয়োজন। কারণ, ক্রেতা-

সমবায়ের বিষয়ে সঠিক ধারণার অভাবেই দেশের লোক নিজেদের এই আন্দোলন থেকে দূরে রেখে দেন বললে ভুল হবে। সাধারণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা, সেইসঙ্গে ধারে বিক্রয়ের অসুবিধার জন্যও এই ভাণ্ডার আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। সমবায় সমিতি নিয়ন্ত্রণের যুগে যে সাফল্য লাভ করেছিল—জনসাধারণকে বহুক্ষেত্রে কালোবাজার থেকে রক্ষা করেছিল—একথা অনস্বীকার্য। ক্রেতা-সমবায়ের সার্থকতা ও কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণযুগে বিস্তৃত সাময়িক কারণে হ'লেও আন্দোলনের পেছনে ছিল ক্রেতাদের আর্থনীতিক স্বার্থ। সেদিন আর্থনীতিক স্বার্থ উগ্র হয়ে উঠেছিল। এখন সেই আর্থনীতিক স্বার্থ আরও ব্যাপক আকার ধারণ করতে চলেছে—কিন্তু পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ থাকায় সমিতি গঠনে তৎপরতা নেই। ক্রেতা-সমবায় আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ যুগে যে পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করেছিল সেই প্রয়োজন এখন নেই, সেজন্যই সেই সময়ে স্থাপিত ক্রেতা-সমবায়গুলির কর্মতৎপরতা নেই। কিন্তু অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, ভারতে সমবায় ভাণ্ডার সমিতি বা ক্রেতা-সমবায় আন্দোলন ব্যর্থ হয় নি, কলকারখানা, কারবার, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে এবং সরকারী ও রেলওয়ে কর্মচারীদের মধ্যে সমবায় ভাণ্ডার আন্দোলন সাফল্য লাভ করেছে। জনসাধারণের মধ্যে এই ধরনের সমিতির সঙ্গে যোগাযোগের অভাবের প্রধান কারণ সমবায় সমিতিতে ধারের সুযোগের অভাব। প্রথমেই রচডেলের যে সমবায় ভাণ্ডারের কথা বলেছি সেখানে প্রথম কথা হ'ল নগদ কেনা-কাটা। ধার দেওয়ার ফলে সমবায় ভাণ্ডার বহুক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে—যেখানে সমবায় ভাণ্ডারের সাফল্য সেখানে কেনাকাটা ধারে হয় না ব'লে, ধারে হ'লেও আদায়ের সুব্যবস্থা আছে।

কার্যক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, ধারে কেনাকাটার জন্য ভাণ্ডার জাতীয় সমিতি উন্নতি লাভ করে নি। অবশ্য যুদ্ধের বাজারে অভাবে পড়েই নিয়ন্ত্রিত পণ্য বাধ্য হয়েই সমিতি

থেকে নগদ কিনতে হয়েছে। এখন সেই অবস্থা নেই, পাড়ায় পাড়ায় বহু দোকান খুলে গেছে, কন্ট্রোল উঠে গেছে। ধারের বিষয়ে সমবায় ভাণ্ডার সজাগ থাকলেই ভাণ্ডার বেঁচে থাকতে পারে। ব্যবসায় সম্পর্কে সামাজিক দায়িত্ব বোধ যদি ক্রেতাদের থাকে তা হ'লে সমবায় ভাণ্ডার করে ভেজাল তাঁরা বন্ধ করতে পারেন, মধ্যবর্তী মুনাকার ট্যাক্স থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন—খাঁটি এবং ভাল জিনিস পেতে পারেন। অনিয়ন্ত্রিত আর্থনীতিক পরিস্থিতিতে যুদ্ধের সময়ের সমিতিগুলি আঘাত পেল—ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা এবং ভেজালের সম্পর্কে ক্রেতাদের সচেতনতার অভাব। ক্রেতা-সমবায় আন্দোলনের প্রাণশক্তি হ'ল ক্রেতা—যাঁরা আর্থনীতিক সম-স্বার্থে কেবল নয়—সমাজের নৈতিক মূল্য বোধে সমবায় ভাণ্ডার থেকে যদি কেনাকাটা করেন, তা হ'লে এই ক্রেতা-সমবায় সমিতিগুলি সার্থক হয়ে ওঠে। বাজারে প্রতিযোগিতাকে উৎসাহ যোগাচ্ছে কারা—ক্রেতারাই! সকলেই যদি নিজের নিজের পাড়ায় সমবায় ভাণ্ডার সমিতি গড়ে তুলে পাইকারীভাবে জিনিসপত্র কেনা-কাটা করে তা হ'লে সাধারণ ব্যবসায়ী প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করবে কাকে নিয়ে? বেশি লভ্যাংশ প্রদান অথবা মুনাকার সৃষ্টি নয়—সস্তাদারে খাঁটি জিনিস সরবরাহ করা, ভেজাল বন্ধ করা, প্রতিযোগিতা বন্ধ করা এই হ'ল ভাণ্ডার সমিতির মূল্য উদ্দেশ্য। ক্রেতা জনসাধারণ অনর্থক মুনাকার ট্যাক্স যোগাচ্ছেন সাধারণ ব্যবসায়ীদের, নিজের আর্থনীতিক স্বার্থে, অবস্থার উন্নতির এই সহজ ও সুষ্ঠু প্রক্রিয়া—ক্রেতা-সমবায় গড়ে তোলার পথ অনুসরণ করলে কেবল নিজের নিজের লাভ নয়, সমাজের লাভ, জাতীয় জীবনের আর্থনীতিক অগ্রগতি সম্ভব হয়ে ওঠে। এই সমিতি গড়ে তোলাই তাই আজকের বড় প্রয়োজন। ব্যবহারকারীদের সমবায় আন্দোলন বিগত মহাযুদ্ধকালে বিশেষভাবে প্রসারিত হয়ে পড়ে। নিয়ন্ত্রিত পণ্যসামগ্রী জনসাধারণ যাতে সহজে এবং সস্তাদারে সংগ্রহ করতে পারে সেজন্য ক্রেতাগণ এই ধরনের

ভাণ্ডার অথবা বহু উদ্দেশ্যমূলক সমিতি সর্বত্র গড়ে তোলে। অবশ্য নিয়ন্ত্রণ উঠে যাবার পর এই ধরনের বহু সমিতির অবলম্বিত ঘটেছে সত্য, কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, যুদ্ধকালে সমবায় আন্দোলন একটি বিশেষ কর্মক্ষেত্রে জনসাধারণকে সেবা করেছে। সাময়িক প্রয়োজনে সৃষ্টি হ'লেও এই ধরনের সমিতিগুলি আন্দোলনের কর্মক্ষেত্রে সমবায় প্রথার সার্থকতা প্রতিপাদন করেছে। বহু উদ্দেশ্যমূলক সমিতি অকৃষি সমবায় আন্দোলনে সাধারণকে বিশেষভাবে সেবা করেছে। সাময়িক প্রয়োজনে সৃষ্টি হ'লেও এই ধরনের সমিতিগুলি আন্দোলনের কর্মক্ষেত্রে সমবায় প্রথার সার্থকতা প্রতিপালন করে। নিয়ন্ত্রণ উঠে যাওয়ার পর এই সমিতিগুলি যদি নতুন আদর্শে পরিচালনার ব্যবস্থা হ'ত তা হ'লে ব্যবহারকারীদের সমবায় আন্দোলন আর একটি নতুন পর্বায়ে সমৃদ্ধীর্ণ হ'ত।

নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান ভারতবর্ষে ব্যবহারকারীদের সমবায় আন্দোলনের পরিচয় প্রদান করে:

রাজ্য	ভাণ্ডারের সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	মূলধন	বিক্রয়
বোম্বাই	১,০০০	৩ লক্ষ	৮৯ লক্ষ	১২ কোটি
মাদ্রাজ	৮০০	৪ ,,	৫৬ ,,	১০ ,,
উত্তর প্রদেশ	৪০০	৩ ,,	২৭ ,,	১ ,, ১১লক্ষ
পশ্চিমবঙ্গ	৪০০	৫০ হাজার	৬ ,, ৬ কোটি	৫২ লক্ষ

উপরি-উক্ত হিসাব ১৯৫০-৫৪ সালের বিবরণী থেকে গৃহীত। ইতিমধ্যে সমবায় ভাণ্ডার আন্দোলন বিস্তারের উল্লেখযোগ্য কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। তবে এই বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্যসরকার উদ্যোগী হয়ে সংগঠনের উপর গুরুত্ব দান করছেন। নিখিল ভারত সমবায় ইউনিয়ন ব্যবহারকারীদের সমবায় আন্দোলনের সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছেন।

সমবায় আন্দোলনের প্রাথমিক সূত্রপাত রচডেলে ভাণ্ডার আন্দোলনের প্রবর্তনায়। সমবায় আন্দোলন

জাতীয় পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্বায়ে নব নব সংগঠনের মাধ্যমে রূপায়িত হ'তে চলেছে—যাতে সমাজজীবনের সর্বান্তরে সমবায় আন্দোলন জনসাধারণের পারস্পরিক সহযোগিতায় আর্থনৈতিক নব অভ্যুদয় জাতীয় জীবনে রূপায়িত করতে পারে। এই সময় ব্যবহারকারী এবং উৎপাদনকারীদের মধ্যে পারস্পরিক সম-স্বার্থে সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী ও সুগঠিত করার জন্য সমবায় ভাণ্ডার আন্দোলনের বিস্তারসাধন একান্ত প্রয়োজন। তবেই উৎপাদক ও ব্যবহারকারীদের মধ্যে মুনামফার লোভের জাল ছিন্ন করে, ভেজাল ও জাল পণ্যের অত্যাচার থেকে জনজীবনকে মুক্ত করে 'সুনিয়ন্ত্রিত পণ্যের বাজার দেশে গড়ে উঠতে পারে। উৎপাদন ও উৎপন্ন পণ্য বাজারস্থ করবার আগে যদি বণ্টনের সুব্যবস্থা থাকে, তবেই পণ্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির ফাটকাখেলা বন্ধ হ'তে পারে।

সমাজজীবনে ব্যবসার নৈতিক মান প্রতিষ্ঠার জন্য চাই দেশে সমবায় ভাণ্ডার আন্দোলনের বিস্তৃতি, তবেই ব্যবহারকারীদের মঙ্গলের সঙ্গে উৎপাদনকারীদের আর্থনৈতিক সম-স্বার্থ প্রবণতায় সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে। ভারতবর্ষে স্বাণ-সমবায় আন্দোলন নতুনভাবে সংগঠিত হচ্ছে। এই সময় বিক্রয় সমিতি, বণ্টন সমিতি ও ভাণ্ডার সমিতি সংগঠন আন্দোলনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হ'লে দেশের জনসাধারণের আর্থনৈতিক উন্নতি কেবল নয়, সমবায় আন্দোলনের নৈতিক সার্থকতা জাতীয় জীবনে কার্যকর হ'তে পারে। লোভী ব্যবসায়ীরাই মাল ধ'রে রেখে কৃত্রিম উপায়ে বাজারে মূল্য বৃদ্ধি করলে। যদি উৎপাদনকেন্দ্র থেকে ব্যবহারকারীদের মধ্যে সরাসরি পণ্যসরবরাহের ব্যবস্থা হয় তবেই ন্যায়সঙ্গত মূল্যের বাজার দেশের সর্বত্র স্থিতি লাভ করতে পারে। ভাণ্ডার আন্দোলন দেশে গড়ে না উঠলে এইরূপ স্থিতিশীল বাজার সৃষ্টির আশা কোথায়?

আলুতে ওষুধ ছিটানোর উপকারিতা

মনোমোহন ঘোষ

গতবারের মত এবারেও মেমারী গিয়েছি আলুতে ওষুধ ছিটানোর কাজে। আমার কাজের ক্ষেত্র হচ্ছে ঐ থানার গোটা-নয়ক গ্রামকে কেন্দ্র করে। ঐসব গ্রামের কিছু-সংখ্যক চাষী আলু চাষের জন্য সরকারের কাছ থেকে বীজ, সার প্রভৃতি সাময়িক সাহায্য-সুযোগ নিয়ে থাকেন;—সরকারের লাভ দেশের জন্য ভাল আলুবীজ উৎপন্ন করা, সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাসে চাষীদের উৎসাহ দেওয়া, রাসায়নিক সার ব্যবহার শেখানো, ফসলের রোগ-কীট সম্বন্ধে সজাগ করা এবং রোগ-কীটের প্রতিরোধক ওষুধ ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া।

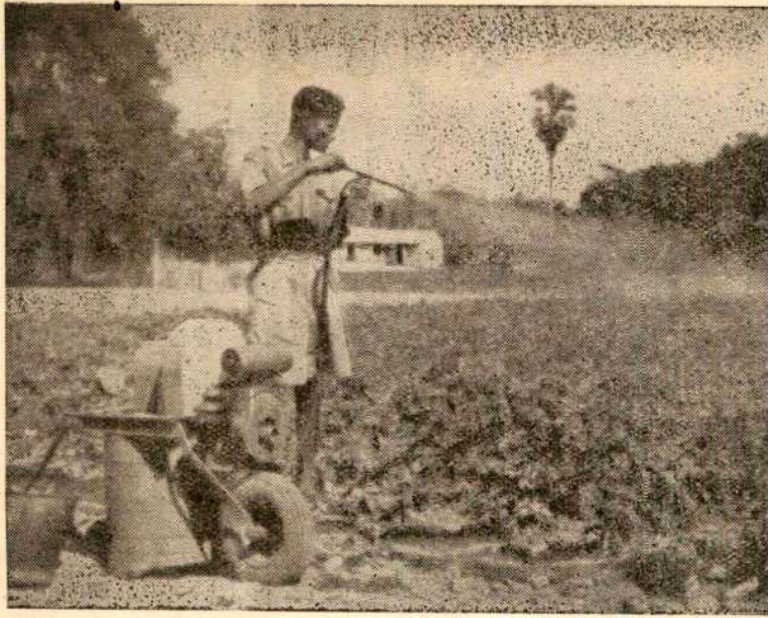
আলুর রোগ-প্রতিরোধক ওষুধ ব্যবহার সম্বন্ধে সরকার প্রথম কয়েক বছর অজস্র টাকা ব্যয় করে চাষীদের জমিতে বিনামূল্যে ওষুধ ছিটিয়ে চাষীদের ওষুধের গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছুটা সজাগ করে নিয়ে, কয়েক বছর থেকে বিনামূল্যে ওষুধ ছিটানো বন্ধ করে আংশিক খরচ চাষীদের কাছ থেকে আদায়ের ব্যবস্থা করেছেন।

ওষুধটার নাম 'পেরেনক্স'। অন্যান্য অনেক আধুনিক ওষুধের গুণাগুণের সঙ্গে দীর্ঘদিন তুলনামূলকভাবে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছে যে, আলুর মড়ক ধসারোগের এটা এক অব্যর্থ ওষুধ। দেড় টাকা পাউন্ড দরে ওষুধটা সর্বত্র স্থানীয় কৃষি-অফিসে পাওয়া যায়। আলুর ফসলে সময়মত অর্থাৎ গাছের বয়স যখন প্রথমবার ভিলি বাঁধার মত হয় তখন চার পাউন্ড ওষুধ একশ' গ্যালন (এক গ্যালন=প্রায় পাঁচ সের) জলে গুলে ফসলের পাতার ওপর-নিচে একবার, আর ঠিক তার পনেরো দিন পরে আর একবার ৪-৫ পাউন্ড ওষুধ ঐ একই পরিমাণ জলে গুলে হস্তচালিত সিঙন-

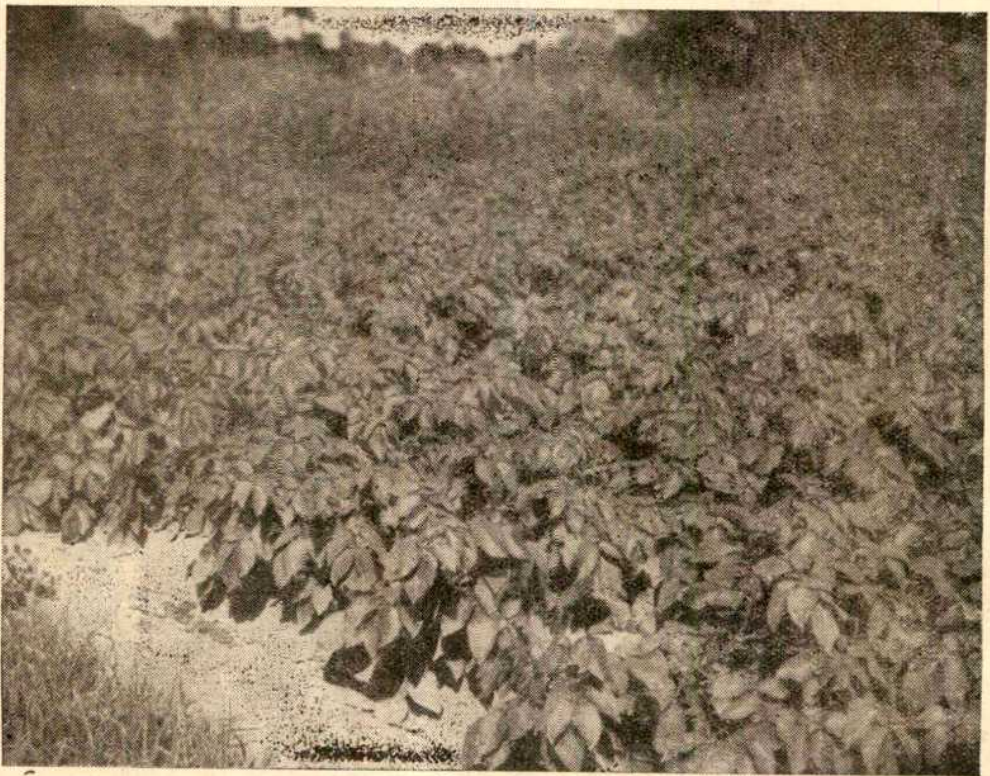
যন্ত্রের (Hand sprayer) সাহায্যে কুয়াশার আকারে ফসলের পাতার ওপর-নিচে বেশ করে ছিটিয়ে দিতে পারলে আলু ফসলকে অকাল-মৃত্যুর হাত থেকে অনেকটা রক্ষা করা যায়। তবে, প্রকৃতি যদি অপ্রসন্না হন তা হ'লে সুফল ততটা নাও হ'তে পারে।

গতবার যখন মেমারী যাই তখন চাষীদের মধ্যে এবারের মত এমন আগ্রহ দেখি নি; এমন তৎপরতা দেখি নি আলুতে ওষুধ ছিটানোর প্রতি। উলটে অনেক ক্ষেত্রেই নানান বাধার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। অনেক কষ্টে, অনেক বুদ্ধির-শুনিয়ে ধৈর্যসহকারে ধীরে-সুস্থে কাজ করতে হয়েছিল। ফলাফল অবশ্য গতবারেও প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল তবে চাষীরা কেন যেন সেটা ঠিক বুঝেও বুঝতে চান নি। তাই ওষুধের গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর তাঁরা হাঁ-না জড়িয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য গতবার প্রকৃতি ছিলেন সুপ্রসন্না।

এবারে কাজ শুরুর হওয়ার পর থেকেই প্রকৃতি বৈরীভাবাপন্ন। কুয়াশা আর মেঘলা আবহাওয়া লেগেই ছিল—যেগুলো আলুর রোগ-বিস্তারের সহায়ক। তাই সরকারের পরিকল্পিত আলুবীজ উৎপাদনকেন্দ্রে কাজ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে তার আশপাশের জমির মালিক সাধারণ চাষীদের আলু-গাছে ওষুধ ছিটানোর উপকারিতার কথা বুদ্ধিরে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তাতে কয়েকজন চাষী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেদের জমিতে ওষুধ ছিটিয়ে-ছেন আর অন্যরা আমাদের কথার উপর বিশেষ গুরুত্ব-আরোপ করেন নি। এইভাবে সাধারণ চাষীদের মধ্যে ওষুধের গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রচার আর বীজ-উৎপাদনের এলাকাস্থিত জমিতে ওষুধ



স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে আলুক্ষেতে
পেরেনকা ছিটানো হচ্ছে



ওষুধ-ছিটানো জমির সুস্থ-সতেজ ফসল

ছিটানোর কাজের তদারক করে চলেছি। দশ দিনের মধ্যেই সমস্ত জমিতে একবার ওষুধ ছিটানো শেষ হওয়ার পরের দিনই গত ১-১-৫৭ তারিখের সন্ধ্যা থেকে শুরু হ'ল একটানা ঝরঝরে বৃষ্টি আর কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। ১১-১-৫৭ তারিখের ভোরে বৃষ্টি থামল। সকালে আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে ঝলমলে রোদ উঠল—সঙ্গে সঙ্গে আমিও বেরিয়ে পড়লাম ফসলের অবস্থা দেখতে গ্রামে গ্রামে। দু'দিন ধরে ঘুরে ঘুরে আমার এলাকাস্থিত সর্বত্রই দেখলাম চাষীদের মধ্যে বেশ একটা উন্মীলনভাব। ঐ সময় আমাকে অনেকেই কৌতূহলবশত ওষুধের গুণাগুণ সম্বন্ধে অনেককিছু অবাকিত প্রশ্ন করেছেন। সাধামত উত্তর দিয়ে দ্বিতীয়বার ওষুধ ছিটানোর ব্যবস্থা করতে লাগলাম আর সাধারণ চাষীদের অকাল-বর্ষণের কুফল সম্বন্ধে বিশেষ করে বুঝিয়ে এই সময় অন্তত একবার ওষুধ ছিটানোর কথা বললাম। আমার কথা এবারেও হয়তো তাঁদের বিশেষ ভাল লাগল না, তাই তাঁরা আমায় এড়িয়ে চলতে লাগলেন। এদিকে বীজ-উৎপাদনকেন্দ্রের চাষীদের অনেকেই সাধারণ চাষীদের মতই আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, এই বৃষ্টিতে ফসলের যে ক্ষতিটা হয়েছে তাতে আর দ্বিতীয়বার ওষুধ ছিটালেও গাছ বেশিদিন বাঁচবে না—তাই ওসব আর দরকার হবে না। যা হোক, তাঁদের এই বিপরীত ধারণা সাধামত পালটে দেওয়ার চেষ্টা করে জমিতে 'জো' হলে গত ১৭-১-৫৭ তারিখে দ্বিতীয়বার কাজ শুরু করলাম।

পাঁচ-সাতদিন বেশ নিৰ্বাঞ্ছাতে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ চারিদিকে গেল-গেল রব উঠল। আজ শোনা যায়, কালিবেলের মাঠ উজাড়—কাল শোনা যায়, হাটবাসকার মাঠে পচা গন্ধ উঠছে,—পরশু খবর পাই বালিডাঙ্গা, ঘোষ আর নিশিরাগড় গ্রামের মাঠে ব্যাপক আকারে রোগের বিস্তার শুরু হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ চাষীদেরও টনক নড়ে উঠেছে—চোখের সামনে বীজ-উৎপাদনকেন্দ্রের

জমির সজীব-সুস্থ ফসল দেখে। তাঁদের ব্যাকুলতার আর শেষ নেই। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা মেমারী কৃষি-অফিসে ভিড়—ওষুধ চাই। কেউ বলছেন, আলুর পোকা লাগার ওষুধ চাই—কেউ বলছেন, আলুর ধসা মারার ওষুধ চাই। তখন আমার অবস্থা তো সংগীন। বীজ-উৎপাদনকেন্দ্রের চাষীদের সকলেরই সমান তাগিদ। প্রত্যেকেই বলছেন, 'আমার গ্রামটাতে আগে কাজ সেরে তারপর অন্যত্র যাবেন'। আর সেইসঙ্গে আলুর ধসারোগ সম্বন্ধে চাষীদের অসংখ্য প্রশ্নের মধ্যে আলুর ধসারোগ পোকাকার উপদ্রবের জন্য হয় কিনা এই তথ্য বাতলাতে বাতলাতে মুখ ব্যথা হয়ে গেল। যাক, তাতে দৃষ্ট নেই। আজ প্রায় সাত বছর এই ফসল-সংরক্ষণ-দলে কাজ করছি।* এর আগে আর কখনও চাষীদের মধ্যে নিজের ফসল বাঁচানোর জন্য এত তাগিদ, এত আগ্রহ, এতখানি তৎপরতা দেখি নি। দেরিতে হলেও যে এ বিষয়ে চাষীরা সজাগ হয়েছেন তাতেই দৃষ্টের মধ্যেও আনন্দ পেলাম।

দেখতে দেখতে সাত-আটদিনের মধ্যে সাধারণ চাষীদের বেশির ভাগ জমির গাছ পচে একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। কারণ, ওষুধের ঠিকমত সম্ভাবহার সম্বন্ধে তাঁরা মোটেই সচেতন ন'ন। এদিকে বীজ-উৎপাদনকেন্দ্রে ওষুধ ছিটানোর কাজ শেষ হওয়ার পর আবার প্রবল ঝড়-বৃষ্টি গত ১০-২-৫৭ তারিখে দুপুরে ও রাত্রে। পরদিনও ফিনফিনে বৃষ্টি আর হাড়-কাঁপানো বাতাস। গত ১২-২-৫৭ তারিখে প্রকৃতির হাসি দেখে আমিও বেরিয়ে পড়লাম ফসলের অবস্থা দেখতে। এবারে কিন্তু ফসলের অবস্থা দেখে মন খুবই খারাপ হয়ে গেল। মনে হল, কেউ যেন ছিড়ির ঘা মেরে গাছ-গুলোকে জখম করেছে। অনেক চাষীকে দেখলাম চিন্তান্বিতভাবে জমির কাছপিঠে ঘোরাফেরা করতে, আর কেউ কেউ দেখলাম, আলুর ভিলি

মেমারী ধানায় আলুতে ওষুধ ছিটানো এবং না ছিটানো জমির ফসলের পার্থক্য-ভালিকা, ১৯৫৬-৫৭

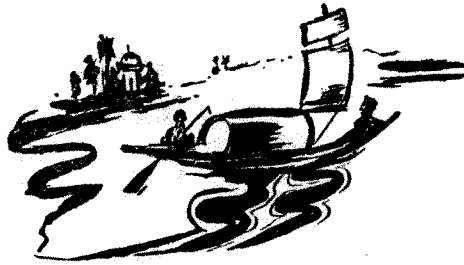
নির্বাচিত জমিতে পূর্ববর্তী ফসলের চাষ				নির্বাচিত জমিতে বর্তমান ফসলের চাষ			
ফসলের নাম	একরপ্রতি সার প্রয়োগ	একরপ্রতি ফসলের গড় ফলন	বপনের তারিখ	একরপ্রতি সার প্রয়োগ	ফসল তোলার তারিখ	একরপ্রতি গড় ফলন	ওষুধ-ছিটানো বা না-ছিটানো
পাট	১০০ মণ গোবরসার, ১০০ পাউণ্ড অ্যানোনিয়াম সালফেট।	৩০	আলু (আর, কে, এম.)	৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৩।	১২০ মণ গোবর সার, ৮ মণ বাদাম খইল। ১১ মণ নিশাসার।	২৭এ মার্চ ১৯৫৬।	ওষুধ ছিটানো হয়নি।
ই	..	..	ই	ই	ই	..	ওষুধ ছিটানো হয়নি।
ই	৯ মণ চুন, ১২০ মণ গোবর সার, ৩ মণ বাদাম খইল।	২৪	ই	২৯এ কান্তিক ১৩৬৩।	১২০ মণ গোবরসার; ৯ মণ বাদাম খইল, ১৮ মণ নিশাসার।	৬ই ফালগুন ১৯৫৬।	ওষুধ ছিটানো হয়নি।
চাষযোগ্য পতিত জমি	..	..	ই	ই	ই	..	ওষুধ ছিটানো হয়নি।
পাট	৯ মণ চুন, ১২০ মণ গোবর সার, ১০০ পাউণ্ড অ্যানোনিয়াম সালফেট, ৩ মণ বাদাম খইল।	২৪	ই	১লা অগ্রহায়ণ ১৩৬৩।	১০০ মণ গোবর সার, ২০০ মণ কচুরীর কপোষ্ট, ১৮ মণ নিশাসার, ৯ মণ বাদাম খইল।	১৩ই ফালগুন ১৯৫৬।	ওষুধ ছিটানো হয়নি।
চাষযোগ্য পতিত জমি	..	..	ই	ই	ই	..	ওষুধ ছিটানো হয়নি।
আউশধান	..	..	ই	৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৩।	১৫০ মণ গোবর সার, ১৮ মণ সরষের খইল, ১১ মণ নিশাসার।	৯ই ফালগুন ১৯৫৬।	ওষুধ ছিটানো হয়নি।
ই	..	..	ই	৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩৬৩।	ই	..	ওষুধ ছিটানো হয়নি।
ই	৬০ মণ গোবর সার	২৪	ই	১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৩।	১০০ মণ গোবর সার, ১২ মণ সরষের খইল, ১২ মণ নিশাসার।	১১ই ফালগুন ১৯৫৬।	ওষুধ ছিটানো হয়নি।
ই	..	..	ই	১৯এ অগ্রহায়ণ ১৩৬৩।	ই	..	ওষুধ ছিটানো হয়নি।

খুঁচিয়ে পচন শূন্য হয়েছে কিনা দেখেছেন এবং ফলন পরীক্ষা করেছেন। আমি কৌতূহলবশত তাঁদের দ্বা-একজনকে ফলন সম্বন্ধে প্রশ্ন করে যা উত্তর পেলাম, তাতে বেশ একটু দো-মনায় পড়ে গেলাম। তাঁদের মতে ওষুধ-ছিটানো এবং না ছিটানো জমির ফসলের ফলনের পার্থক্য কিছুই নেই। সদর দফতর থেকে তখন আমার প্রতি আদেশ হয়েছে এবারের এই দুর্ঘোষণা-বছরে ওষুধ ছিটানো এবং না-ছিটানো জমির ফসলের ফলন সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহের। চাষীদের সঙ্গে সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করে বললাম, ওষুধ না-ছিটানো জমির গাছ তো ওষুধ-ছিটানো জমির গাছের চেয়ে প্রায় বিশ-পঁচিশ দিন আগে পচে নষ্ট হয়ে গিয়েছে—তাতে ফলনের কিছু পার্থক্য হবে না? কিন্তু চাষীরা তাঁদের সিদ্ধান্তে অটল। পরে জমিতে 'জো' হলে সেইসব চাষীর সামনে উভয় রকম জমির ফসল তোলা হল এবং চাষীদের নিজস্ব দাঁড়িপাল্লায় ওজন নেওয়া হল। পূর্বে পৃষ্ঠায় দু'রকম জমির ফলনের পার্থক্যের তালিকা, পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের উদ্ভিদরোগতত্ত্ববিদ মহাশয়ের অনুমতিক্রমে, প্রচারের জন্য দেওয়া হল।

উক্ত তালিকায় দেখা যায়, ওষুধ-ছিটানো আর না-ছিটানো জমির ফসলের একর-প্রতি গড় ফলন যথাক্রমে ১৭২ মণ ও ১২০ মণ—অর্থাৎ ওষুধ-ছিটানো জমির ফসলের একর-প্রতি গড় ফলন

ওষুধ-না-ছিটানো জমির ফসলের একর-প্রতি গড় ফলন অপেক্ষা ৫২ মণ বেশি। এবারের এই দুর্ঘোষণারও মাত্র ২০-২৫ দিন আগেপিছে ফসল বাঁচামরার দরুন ফলনের এতখানি পার্থক্য দেখে চাষীদের মনে খেঁচো খেঁচো হাসির রেখা ফুটে উঠল। তাঁরা আমায় জানালেন তাঁদের অন্তরের মধুর সম্ভাষণ আর আশীর্বাদ। তখন মনে হয়েছে, চাষীদের মধ্যে ফসল-সংরক্ষণ বা যে-কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রথার প্রবর্তন করতে হলে চাই ব্যাপক প্রচার। তা কেবল মৌখিক হলেই চলবে না—মফস্বলের প্রতিটি সিনেমার পর্দায় প্রত্যহ বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা এবং সময়-বিশেষে প্রাচীরপত্র ও হাতকাগজ বিলির ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চাষীদের বুদ্ধিতে দিতে হবে যে, আলুফসলে ওষুধ ছিটালে ফসলকে শুধু ধসারোগের আক্রমণের হাত থেকেই রক্ষা করা যায় না—ফসলের জীবনীশক্তিও বেড়ে যায়; অর্থাৎ ফসল তার বার্ষিক্যকে উপেক্ষা করে বেশ কিছুদিন বেশি বাঁচে, তাই ফলনও বেশি হয়। এই কটা সত্যিকথা সময়ে চাষীর কানে পৌঁছে দিলে চাষীরা উপকৃত হবেন,—তাঁদের ওষুধের গুণাগুণ বোঝাতে আমাদেরও আর এতখানি বেগ পেতে হবে না।

লেখক টালিগঞ্জে অবস্থিত সরকারী কৃষিগবেষণা-মন্দিরের উদ্ভিদরোগতত্ত্ব-পাখার ক্ষেত্র-কর্মচারী।



চাষী ও বাজার

আমাদের জাতীয় অর্থগণের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগই হয় কৃষিজাত জিনিস থেকে। অথচ আমাদের চাষীরা কালে অকালে সব সময়ই তাঁদের কৃষিতে উৎপাদিত জিনিস গ্রামেই অথবা সবচেয়ে কাছে বাজারে বিক্রি করেন। বিক্রির ব্যাপারে যে কিছু ঘোরপ্যাঁচ আছে, তা তাঁরা বোঝেন না।

আজকের দিনে চাষীরা রাসায়নিক সার, ভাল বীজ প্রভৃতি দিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ করছেন, কৃষিকাজে আগের চেয়ে তাঁরা আরও বেশি পরিশ্রম করছেন; কাজেই সে অনুপাতে তাঁরা যাতে বেশি পয়সা পেতে পারেন, তার একটা নিশ্চিত ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন; তাতেই তাঁরা বেশি ফসল ফলাবার উৎসাহ পাবেন সত্যি করে। স্বেচ্ছায় উপায়ে বিক্রির ব্যবস্থা হলেই, ক্রেতারা যে-দামে কৃষিজাত জিনিস কেনেন, তার আরও বেশি অংশ চাষীরা পেতে পারেন।

দেশের আর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমাদের জাতীয় পরিকল্পনায় বাজারের নিয়ামন, কৃষিজ দ্রব্যের শ্রেণীবিন্যাস, সমবায় উৎপাদন, বিপণন ও সংরক্ষণ প্রভৃতি নানা বিষয় স্থান পেয়েছে—যাতে করে ক্রেতারা যে মূল্য দিয়ে জিনিস কেনেন, তার যে অংশটা এখন কৃষকরা পান তার চেয়ে বেশি অংশ পেতে পারেন। বিপণন সংক্রান্ত কর্মসূচিকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে হ'লে, এসব কর্মসূচির উপকারিতা সম্বন্ধে কৃষকদের শিক্ষাদান করা দরকার।

প্রসারণ-কৃত্যক

কৃষি-গবেষণায় যেসকল তথ্য জানা যাচ্ছে, সেসব যেমন কৃষি-প্রসারণ কৃত্যকের মারফত কৃষকদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়, বিপণন-সংক্রান্ত কর্মসূচিগুলির মধ্য দিয়ে এ-সংক্রান্ত সমস্যাগুলির কী করে সমাধান হতে পারে—সেই তথ্যাদিও কৃষকদের

কাছে এবং কৃষিজাত জিনিসের বিপণনে সংশ্লিষ্ট লোকদের কাছে ঠিক তেমনভাবে পৌঁছিয়ে দেওয়া দরকার।

কৃষিজাত কয়েকটি জিনিসের বিক্রির ব্যাপারে বিপণন ও পরিদর্শন অধিকার থেকে যে তদন্ত হয়, তাতে দেখা গেছে, কত রকম অসহায় অবস্থার মধ্যে চাষীদের কাছে উৎপাদিত জিনিস বিক্রি করতে হয় আর কী পরিমাণে তাঁদের ঠকতে হয়। এসব তদন্তের বিবরণীতে চাষীদের অসুবিধাগুলি দূর করার এবং বর্তমান বিপণন-ব্যবস্থার উন্নয়ন করার জন্যও সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু কৃষি-উৎপাদকদের কাছে এসব কথা পৌঁছিয়ে দেওয়ার কোন সম্মিলিত চেষ্টা হয় নি। কাজেই দেশের উন্নয়নকর্মের নতুন সূচিতে বিপণন-বিষয়ক প্রসারণ কাজেরও স্থান পাওয়া দরকার।

বহু সমস্যা

কৃষি-সংক্রান্ত প্রসারণের কাজে যেসব সমস্যা দেখা দেয়, বিপণন-সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সঙ্গে তার বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। যে জমিতে কৃষি-উৎপাদন হচ্ছে তার সমস্যা আর সমাধান সেই জমিতেই সীমাবদ্ধ। সেগুলো হচ্ছে—মাটির ধরন, বীজ বোনার সময়, কতটা সার দিতে হবে, কোন কোন রাসায়নিক সার দেওয়া দরকার, এসব বিষয় নিয়ে। বিপণন-সমস্যার উদ্ভব সাধারণত আর্থনৈতিক অবস্থা থেকে—তার রেশির ভাগই ক্ষেতের বাইরের ব্যাপার। তা হলেও, দু'দিকের সমস্যারই গুরুত্ব সমান। বাজারে কৃষিজাত দ্রব্যের দাম কমে গেলে বৃষ্টিতে হবে চাষে ফলন বেশি হয়েছে।

ক্ষেতে ফসল ফালিয়ে যিনি বিক্রি করেন, সেই কৃষক-বিক্রেতা আর সেই ফসল কিনে নিয়ে যিনি মুনামায় বিক্রি করেন সেই কারবারী—এই দু'জনের মনস্তত্ত্ব আর আর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে বাস্তব পার্থক্য রয়েছে। বাজারের এবং তার কাজ-কারবারের ঘোরপ্যাঁচ চাষী বোঝেন না। মধ্যবর্তী

কারবারী সেসব ভালই জানেন, এবং কৃষকের নিরক্ষরতার আর মাল ধরে রাখতে না পারার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চাষীর মাথায় তিনি হাত বুলোন। এই বণ্টনার হাত থেকে চাষীকে বাঁচাতে হলে, তাঁর মধ্যে ক্ষমতার সঞ্চার করা দরকার যাতে তিনি ন্যায্য দর না পেলে তাঁর জিনিস না ছাড়েন। বিক্রেতা হিসাবে তাঁর অধিকার কতখানি, সে বিষয়ে শিক্ষার সাহায্যে তাঁকে সচেতন করে তুলতে হবে। তাঁর চাষে জন্মানো জিনিস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে খরিদদারের সামনে ধরলে, সেসব জিনিসের শ্রেণীবিন্যাস করলে, নিয়ন্ত্রিত বাজারে সেসব বিক্রি করলে, সমবায় বিপণন ও সংরক্ষণ সমিতিতে যোগ দিলে যে সেসবের বেশি দাম পাওয়া যাবে—এই স্বার্থটি তাঁকে বিশেষ করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

এ কাজের ভার নিতে হবে প্রসারণ-কর্মী—গ্রাম-সেবককে। কৃষিজাত জিনিসের বিক্রির ব্যাপারে চাষীকে উপদেশ দেওয়ার ও পরিচালিত করার কাজে নামবার আগে গ্রামসেবীরা নিজেকেই জেনে নিতে হবে যে, বিপণন ব্যাপারটা কী। স্থানীয় বাজারের ধারাবাহন তাঁকে ভালভাবে জেনে-বুঝে নিতে হবে এবং বিপণনের উন্নয়নের জন্য যে নানা রকম কাজ হচ্ছে, তার বিষয়েও তাঁকে যত বেশি সম্ভব জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

বিপণন বিষয়টা ঠিক কেনা আর বেচার উপরেও আরও কিছু। ক্ষেতে কোন ফসলের চাষ করাটা হচ্ছে সাময়িক কাজ, সারা বছর ধরে সে কাজ চলে না; কিন্তু চাষে যা যা জন্মায় তার অনেক-কিছুই ব্যবহার করতে হয় সারা বছর ধরে। চারিদিকে ছড়ানো টুকরো টুকরো চাষের জমি থেকে যে কিছু কিছু করে উদ্ভূত ফসল পাওয়া যায় সেসব একত্র করতে হবে, ব্যবহারের উপযোগী করে নিতে হবে, গুদামজাত করতে হবে, খুচরো বিক্রেতাদের কাছে চালান দিতে হবে এবং খরিদদাররা যাতে তাদের প্রয়োজনমত পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবে চাষীর ক্ষেত থেকে কোন জিনিস

খরিদদারের হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত যত রকমের কাজ, তার সমস্তই বিপণনের অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণ বাজারের নানা রকমের কাজ নিয়ে নানা ধরনের লোক আছে, যেমন—গ্রাম্য কারবারী, ফোড়ে, দালাল, পাইকার, চালানদার প্রভৃতি। বাজারী কাজে ঝুঁকি আর ঝামেলা অনেক। চাষীরা সাধারণত সরল নিরক্ষর বলে বাজারী লোকেদের কারসাজি বড় একটা ধরতে পারে না। বাজারের এমন সংস্কার হওয়া দরকার যাতে এসব কারসাজির মধ্যে চাষীদের পড়তেও না হয়।

পরিচ্ছন্ন জিনিস

কৃষিজাত দ্রব্যের ধরন জাত আর গুণ অনুসারে বাজারে তার দর কমবেশি হয়। বাজারে যে জিনিসটা তোলা হয়েছে, তা যদি অপরিষ্কার হয়, মিশেল জাতের হয় আর তার সঙ্গে যদি আজো আজো জিনিস মিশে থাকে, তবে তার দর কম হয়। কাজেই চাষীদের এমন জাতের ফসল জন্মাতে হবে আর এমনভাবে তা বাজারে তুলতে হবে যাতে তা খরিদদারের পছন্দ হয় এবং বেশি দামে বিক্রায়।

যে জাতের ফসলের চাষ করা হবে তার বীজ বোনার সময়ই দেখতে হবে যেন তার সঙ্গে আর কোন জাতের বীজ মেশানো না থাকে। কোন কোন ফসলের চাষ আবার অন্য ফসলের সঙ্গে মিশিয়ে করা হয়, যেমন গম আর তৈলবীজ। এ রকম বিশেষ চাষের ফসল পাকলে আলাদা আলাদা কাটতে হয় আর আলাদাভাবে তার মাড়াই করতে হয়। গমের ক্ষেতে যদি যবের বা জইএর গাছ থাকে তবে গম কাটার আগে সেসব গাছ তুলে ফেলতে হবে। গমের সঙ্গে যব বা জই মিশে থাকলে বাজারে তার দর কমে যায়। তুলোর ক্ষেতেও অনেক সময় দেখা যায়, বিশেষ যে জাতটার চাষ করা হচ্ছে, তার সঙ্গে অপর কোন কোন জাতের কিছু গাছ হয়েছে এখানে ওখানে। তুলো তোলা শুরুর হলে, আগে অপর জাতের তুলো তুলে ফেলে তার পরে আসল জাতের তুলো তুলতে হবে এবং বাজারে আলাদা আলাদা

জাতের তুলো আলাদা আলাদাভাবেই বিক্রি করতে হবে। ফলের বেলা দেখা যায়, বাজারে সঠিক পাকা ফলেরই ভাল দাম পাওয়া যায়; কাজেই ফল পাড়বার সময় পাকা পাকা ফল বেছে বেছে পাড়তে হবে।

পরিচ্ছন্ন আর শ্রেণীবিন্ধিত ফসলের ভাল দর পাওয়া যায়। ফসল কাটা হলে, শস্যগুণি ভাল করে শুকিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। শস্য পরিষ্কার করে বাজারে না তুললে, খরিদদারে ঝাড়াই-খরচা বাদ দিয়ে তার দাম দেয়; তা ছাড়া, ঝাড়াই কুটো বাদ দিয়ে শস্যের যে ওজন হবে, তারই উপর দর ঠিক হয়।

আলু, তামাকপাতা, ফল, কোন কোন সবজি প্রভৃতির আকার, পরিপক্বতার বেশিকমি বা রঙ অনুসারে চাষী শ্রেণীবিন্ধিত করে নিতে পারেন।

প্রসারণকর্মীরা চাষীদের বাজারে নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারেন যে, ফসল পরিষ্কার আর শ্রেণীবিন্ধিত করে নিলে কী সুবিধা পাওয়া যায়। চাষীরা স্বচক্ষেই দেখতে পাবেন যে, পরিষ্কার আর শ্রেণীবিন্ধিত জিনিস ভাল দামে বিক্রয়, অপরপক্ষে অপরিষ্কার আর মিশেল জিনিসের দাম হয় কম।

চাষীরা তাঁদের চাষে জন্মানো জিনিস হয় গ্রামে, না হয় কাছের বাজারে বিক্রি করেন। এসব জায়গায় তাঁদের ঠকাবার জন্য নানা রকম জোচ্ছুরী রীতি চালু রয়েছে। এসবের হাত থেকে তাঁদের বাঁচাবার জন্য অম্ব বোম্বাই হায়দরাবাদ মাদ্রাজ মধ্যভারত মধ্যপ্রদেশ মহাশূর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি কতকগুলো রাজ্যে 'বাজার'-আইনের বিধান অনুযায়ী কতকগুলো নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপন করা হয়েছে। মিত্তীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কালে অন্যান্য রাজ্যেও এ ধরনের বাজার বসানো হবে।

নিয়ন্ত্রিত বাজার

নিয়ন্ত্রিত বাজার পরিচালিত হয় বাজার-সমিতির দ্বারা—যার মধ্যে কৃষকের একটা বিশেষ স্থান আছে। কৃষকদের প্রতিনিধি তাঁদের দ্বারা নির্বাচিত হয়

অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়। এরকম সমিতিতে সাধারণত চাষীদের সংখ্যাই বেশি থাকে। কোন কোন সমিতিতে দেখা যায় যে, কৃষক-প্রতিনিধিই সভাপতি।

নিয়ন্ত্রিত বাজারে খোলা নিলাম-ডাকে জিনিস হওয়ার রীতি প্রচলিত। বাজার-খরচা বেঁধে দেওয়া থাকে এবং এসব বাজারে দস্তুরী চলতা ঈশ্বরবৃত্তি প্রভৃতির দরুন পয়সা কাটার নিয়ম নেই। মাল সঠিক ওজন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বাজার-সমিতির লাইসেন্সধারী ওজনদারের উপর মাল ওজন করার ভার আর সঠিক মাপের বাটখারা দিয়েই মাল ওজন করা হয়। যথাযথ মূল্য দিয়ে সঠিক ওজনের জিনিস কেনার শর্তে দালালেরাও এ বাজারে জিনিস কিনতে পারেন এবং এখানকার শর্ত মেনে তাঁরা চাষীদের কাছ থেকেও মাল কিনে নিতে পারেন। যে-কোন কেনাবেচার ব্যাপারে দর ওজন প্রভৃতি লিখে মেমো দেওয়া হয়। এই মেমো বা বিক্রি রসিদের ব্যবস্থা এখানে কড়াভাবে মেনে চলতে হয়। কোন জিনিস বিক্রি হলে খরিদদারকে—তা তিনি দালালই হোন আর কারবারীই হোন—দাম নগদ দিতে হয়।

মালের গুণাগুণ, ওজন ইত্যাদি নিয়ে কোন বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হলে, তার মীমাংসার ব্যবস্থাও রয়েছে। এমনি করে সবদিক দিয়েই চাষীরা এখানে ন্যায্য ব্যবহার পান। তা হলেও, চাষীরা নিজেদের ন্যায্য অধিকার কতখানি তাঁদের কাজে লাগাচ্ছেন, তারই উপর নির্ভর করে সবকিছু। কাজেই নিয়ন্ত্রিত বাজারে কী কী সুবিধা পাওয়া যায় সেসব তাঁদের বলে দিতে হবে এবং নিজেদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে তাঁদের সচেতন করতে হবে। এ দায়িত্ব প্রসারণকর্মীদের উপর।

চলতি বাজারদর সম্বন্ধেও চাষীদের ওয়াকিবহাল রাখা দরকার। নিখিল ভারত বেতারের কেন্দ্রগুলি থেকে প্রতি সন্ধ্যায় পল্লীবর্তার আসরে সেদিনকার স্থানীয় বাজারদর প্রচার করা হয়। সমষ্টির

প্রয়োজনে গ্রামাঞ্চলে যেসব রেডিও রয়েছে চাষীরা সেগুলোর সম্ভাবহার করলে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে প্রতিদিনের বাজারদরও জানতে পারেন।

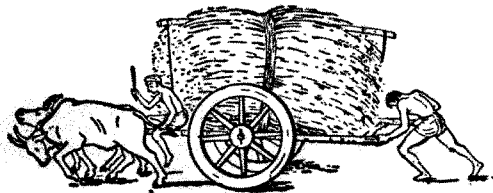
নিয়ন্ত্রিত বাজারে সাধারণের দৃষ্টিগোচর স্থানে একটা বোর্ডে সব জিনিসের প্রতিদিনের স্থানীয় বাজারদর এবং আঞ্চলিক কারবারী বাজারের দর লিখিত হয়। অনেক পত্রিকায় স্থানীয় বাজার-সংক্রান্ত নানা তথ্যও প্রকাশ করা হয়। প্রতিদিনের বাজারদর, বাজারের নানা খবর প্রভৃতি যদি চাষীদের জানা থাকে, তা হলে তাঁদের জিনিসের জন্য যে-দর পাচ্ছেন তার ন্যায্যতা নির্ণয়ে তাঁদের কোন অসুবিধায় পড়তে হয় না, আর জিনিস বিক্রি করে তাঁদের ঠকবারও সম্ভাবনা থাকে না।

আমাদের চাষীরা তাঁদের ছোট ছোট জমিতে চাষ করে যেসব ফসল জন্মান, সেসব ক্ষেত থেকে উঠে আসার পরে তাঁদের হাত থেকে বাইরের বাজারে চালান যায় মধ্যবর্তী কারবারীদের হাত দিয়ে। একাজের জন্য এসব কারবারী শুধু যে পারিশ্রমিক নেন তাই নয়, বেশ মোটা টাকার মুনোফাও তোলে। চাষীরা সমবায় বিপণন সমিতি গঠন করে তার মাধ্যমে যদি এসব কাজ করেন, তা হলে মধ্যবর্তী কারবারীর এই অন্যায় মুনোফা-শিকারের পথ বন্ধ হতে পারে। কৃষিজ দ্রব্যের সংরক্ষণ, শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদিও সমবায় সমিতির দ্বারা হতে পারে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশে ১,৮০০ সমবায় বিপণন-সমিতি গঠন করার কথা হয়েছে।

অন্তত প্রতিটি বড় কারবারী বাজারে একটি সমবায় বিপণন সমিতি খোলা দরকার। প্রতিটি এলাকার চাষীরা সম্মিলিত হয়ে সমবেত প্রচেষ্টায় সমবায় সমিতি গড়ে তুললে কী করে তাঁরা লাভবান হবেন, সে কথাটা তাঁদের ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

চাষীরা সাধারণত ক্ষেত থেকে ফসল উঠে এলেই তা বিক্রি করে ফেলেন। অথচ সে সময় ফসলের বাজারদর থাকে সবচেয়ে কম। চাষে জাত জিনিস সুবাজারে বিক্রি করার জন্য ঘরে বা গদুদামে তুলে রাখার ক্ষমতা বেশির ভাগ চাষীরই নেই। ব্যবসায়ীরা চাষীদের এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মাল অতি কম দামে কিনে, গদুদামে ধরে রেখে, পরে বাজারের জো বৃদ্ধি চড়া দামে ছাড়েন। ক্রেতার সেরা জিনিস অগ্নিমূল্যে কিনে ব্যবহার করেন, অথচ উৎপাদক তাঁর শ্রমের মূল্য পান সামান্যই, মাঝখান থেকে মধ্যবর্তী কারবারীর অতি মুনোফার টাকায় ফেঁপে ওঠেন। চাষীদের এ অসহায় অবস্থা থেকে বাঁচাবার জন্য সরকারী প্রচেষ্টায় নানা স্থানে সংরক্ষণ ভান্ডার স্থাপন করা হচ্ছে বটে; কিন্তু চাষীরা এগিয়ে না এলে এ বিষয়ে সার্থকভাবে কিছু করা সম্ভব নয়। এককভাবে চাষীদের যে ক্ষমতা নেই, সমবেত হলে সেই ক্ষমতা তাঁদের জন্মাবে এবং শুধু সমবায়ের মধ্য দিয়েই সেই ক্ষমতা লাভ করা সম্ভব।



লোনা আর ক্ষারী মাটির শোধন

পাঞ্জাবে দশ লক্ষ একরেরও বেশি জমি লোনা আর ক্ষারী। সারা ভারতে, মোটামুটি হিসাবে, এ ধরনের জমির পরিমাণ ৩০ লক্ষ একর ধরে নিলে বেশি ধরা হবে না। এরকম জমি ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং এক সময়ে যেখানে ভাল ফসল জন্মাত, সে-জমি এখন অফলা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

পাঞ্জাবে লোনা আর ক্ষারী জমিকে বলা হয় 'কাল্লার', 'কাল-রাখি', 'রেহ' এবং 'থর'। ক্লোরাইড, সালফেট অভ ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, কার্বনেট, বাইকার্বনেট অভ সোডিয়াম, পটাশ প্রভৃতি দ্রবণীয় লবণ জমিতে সঞ্চিত হলে বিপদের সূত্রপাত হয়। কোন কোন মাটিতে সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম নাইট্রেট এত বেশি পরিমাণে থাকে যে, গাছের উপর তা বিষক্রিয়া করে।

পাঞ্জাবে এরকম মাটির বেশির ভাগেতেই থাকে ক্লোরাইড এবং সালফেট অভ সোডিয়াম। অনেক জায়গায়, বিশেষ করে কর্নাল জেলায়, কার্বনেট এবং বাইকার্বনেট অভ সোডিয়ামও দেখা যায়।

লবণের সঞ্চয়

মূলত এসব লবণ পাহাড়ী খনিতে জাত হলেও, জমিতে খনিজ লবণ এত বেশি পরিমাণে সঞ্চিত হয় না যার দ্বারা গাছের ক্ষতি হতে পারে। লবণ-সঞ্চয়ের এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হচ্ছে লবণবাহী স্তর এবং জমির জল। সকল জলেই লবণ থাকে। তা থেকে জমিতে লবণ জমে যাওয়া নির্ভর করে মাটির মধ্যকার লবণ এবং কতকগুলি বিশেষ উপাদানের উপর; এসবের সংস্পর্শে এলে জলের লবণ মাটিতে জমা হয়। এ লবণ অতি সহজেই জলে গলে যায় এবং জলের সঙ্গে এসে মাটির মধ্যে চলে যায় অথবা জমির উপরে জমা হয়; তারপর জল যখন বাষ্প হয়ে উড়ে যায় তখন লবণটা মাটির মধ্যে বা উপরে থেকে

যায়। শুকনো আবহাওয়ায়, জলের সেচ বা নিকাশের ভাল ব্যবস্থা না থাকলে, লবণ-সঞ্চয় বেশি হয়।

পাঞ্জাবে যেসব এলাকায় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৩০ ইঞ্চি বা তারও কম হয়, সেসব জায়গার জমিতে লবণ জমা হয়। বৃষ্টিপাত যেখানে ২০ ইঞ্চি বা তারও কম, সেখানে জলনিকাশ করা হয় না বলে অথবা জলনিকাশ ভালভাবে করা হয় না বলে জমিতে লবণ জমে যায়।

অনেক সময় সেচের জলের দরুনও জমি লোনা হয়ে পড়ে। সেচের জলে যদি প্রচুর লবণ থাকে আর সেই জল যদি ঘন ঘন জমিতে দেওয়া হয়, তা হলে লবণ জমে। লোনা জল দিয়ে সেচ দেওয়ার ফলে পাঞ্জাবের ফিরোজপুর, গুরগাঁও, রোটক এবং হিসার জেলার বিরাট এলাকা চাষের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

খালের জল দিয়ে যেসব এলাকায় সেচ দেওয়া হয়, অত্যধিক জল দেওয়ার ফলে অথবা জল ভালভাবে নিকাশ না করার ফলে সেসব এলাকার জমির উপরে অনেকখানি জল দাঁড়িয়ে যায়। জমির উপরে হয়তো পাঁচ-ছ' ফুট জল দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর সেই জল নেমে আসতে লাগল জমির দিকে আর সেই সঙ্গে তার লবণ খিতিয়ে জমির উপর জমে যেতে লাগল। এ দশা হয়েছে পাঞ্জাবের অমৃতসর জেলায়, গুরদাসপুর জেলার বাটোলা আর ডেরা বাবা নানক তসিলে, কর্নাল জেলায় এবং হিসার জেলার কোন কোন অংশে।

মাটিতে প্রতিক্রিয়া

লবণ বেশি পরিমাণে জমে গেলে মাটিতে তার কুফল দেখা দেয়। সাধারণ মাটিতে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ চুনা লবণ থাকে, আর বাকি ২০ ভাগ হচ্ছে পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও সোডিয়াম। সাধারণ মাটি হচ্ছে প্রধানত চুনা মাটি; তার উপর যখন

সোডিয়াম-লবণের ক্রিয়া সঞ্চারিত হয় তখন মাটির মধ্যকার চূনের স্থান দখল করে সোডিয়াম। এইভাবে যে সোডিয়াম-মাটি গড়ে ওঠে, তা হয়ে দাঁড়ায় শক্ত, জলের পক্ষে দুর্ভেদ্য, অত্যধিক ক্ষারযুক্ত। সে মাটির মধ্যে বাতাস ঢুকতে পারে না। জল পেলে সে মাটি এঁটেল কাদা হয়ে যায়। পান্সাব অঞ্চলে এ রকম মাটিকে বলা হয় 'রাকার'। এ মাটি চাষ-আবাদের অযোগ্য।

জলে গোলা মাটিতে লবণের ভাগ বেশি হ'লে, সেই মাটিতে লাগানো গাছ তা থেকে নিজের প্রয়োজনমত জল টেনে নিতে পারে না বলে শুকিয়ে মরে যায়। লবণের ভাগ কিছু কম থাকলে, গাছ হয়তো মরে না, কাজেই ক্ষতিটা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে না; কিন্তু সে গাছের বাড়ি কম হয় আর ফলনও কম হয়।

'কাল্লার' মাটি লোনা হ'তে পারে, ক্ষারী হ'তে পারে, অথবা দু'রকমই হ'তে পারে। জলে দ্রবণীয় লবণ যে-মাটিতে অত্যধিক পরিমাণে থাকে, সেটা লোনা মাটি—সে-মাটি চাষ-আবাদের অযোগ্য। এসব লবণ হচ্ছে সাধারণত কার্বনেট, সালফেট এবং ক্লোরাইড অভ সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম। এ মাটির জমিকে বলা হয় 'কাল্লার', 'খর', 'আসার', অথবা 'রেহ'। এসব জমির উপরে প্রায়ই জমাট বাঁধা সাদা সাদা নুনের আস্তরণ দেখা যায়, অথবা মাটি খুঁড়লে দেখা যায় নুনের সাদা ডোরা দাগ।

চুনা মাটিতে সোডিয়াম লবণের ক্রিয়ার ফলে ক্ষার-মাটির সৃষ্টি হয়। এ মাটি কঠিন এবং জলবায়ুর পক্ষে দুর্ভেদ্য। জল পড়লে এ মাটি আঠা-আঠা হয়ে যায়। এ মাটির জমিকে বলা হয় 'রাকার'। এতে চাষ-আবাদ করা দুঃসাধ্য।

যে-মাটি লোনা আর ক্ষারী দুইই, সে-মাটিতে নুন আর সোডা দুটোই প্রচুর পরিমাণে জমেছে। যতদিন তাতে নুন বেশি থাকে ততদিন সে-জমির চেহারা থাকে লোনা জমির মত। আর দ্রবণীয় লবণের ভাগ কমে গেলে জমির চেহারা দাঁড়ায় ক্ষারী জমির মত।

এসব জমিকে উদ্ধার বা শোধন ক'রে চাষ-আবাদের উপযোগী করতে হ'লে লোনা জমির মাটি থেকে অতিরিক্ত লবণ আর ক্ষারী জমির মাটি থেকে অতিরিক্ত ক্ষার সরিয়ে ফেলে তাকে চুনা মাটিতে পরিণত করতে হবে—এটা অতি সহজবোধ্য কথা।

প্রথমে লোনা মাটির কথা ধরা যাক। এ মাটি শোধন করার উপায় হচ্ছে—(ক) মাটির উপরের লবণ-আস্তর বা ভিতরের লবণ-ডোরা চেঁচে তুলে ফেলা, অথবা (খ) জলে ধুইয়ে লবণ বের ক'রে দেওয়া, বা (গ) লবণকে জলের সঙ্গে চুইয়ে মাটির গভীরদেশে নামিয়ে দেওয়া, কিংবা (ঘ) যথোপযোগী কৃষিব্যবস্থা করা।

চেঁচে ধুইয়ে চুইয়ে ফেলা

লোনা জমির উপরে যে সাদা সাদা নুনের আস্তর জমে থাকে, তা চেঁচে তুলে ফেলা যায়। এ কাজ কোদাল দিয়েই করা চলে। লবণের আস্তরগুলি ছোট ছোট আকারের হ'লে, কোদাল দিয়ে সহজেই তুলে ফেলা যায়। কিন্তু জমি যদি বড় আকারের হয়, তবে এতে পরিশ্রম বা খরচ বেশি পড়ে যাবে। লবণ চেঁচে তুলে ফেলার পরে একরূপে ১৫ টন খামারী সার ফেলে, জমি ভাল ক'রে চ'ষে বীজ বোনার জন্য তৈরি করতে হবে।

এই চেঁচে-তোলা নুন থেকে সোডিয়াম কার্বনেট, পটাশিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি তৈরি করা যায়। সুতরাং এ লবণ সহজে বিক্রি করার সুবিধা করতে পারলে, জমিকে লবণমুক্ত করার খরচ অনেকটা পুষিয়ে আসতে পারে।

প্রচুর পরিমাণে জলসেচ দিয়েও জমির উপর থেকে দ্রবণীয় লবণ দূর করা যেতে পারে। কিছুকাল ধ'রে কয়েকদিন পরে পরেই ভাসা সেচ দিলে লবণ ধুয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। এভাবে লবণ দূর করতে হ'লে এমন ব্যবস্থা থাকা চাই যাতে জমির জল ভাল-ভাবে নিকাশ হয়ে যায়, যাতে প্রচুর পরিমাণ জল দিয়ে জমি ভাসিয়ে দেওয়া যায় আর জল যেন জমিতে গভীর হয়ে দাঁড়াতে না পায়।

যে জমি উদ্ধার করতে হবে, আগে তার চারদিকে শক্ত করে বাঁধ দেওয়া দরকার। জল যেন পাঁচ-ছ' ইঞ্চি গভীর হয়ে জমিতে দাঁড়াতে পারে আর ঘণ্টা-খানেক পরে যেন সেই জল জমি থেকে বের করে দেওয়া যায় এমন ব্যবস্থা করা দরকার। জমিতে জল দাঁড় করিয়ে, সেই জল বেশ করে নাড়াচাড়া করতে হবে। জমির ওপর দিয়ে হেঁটে চলেই জল বেশ নেড়ে দেওয়া যায়। জমা লবণটা এর ফলে জলের সঙ্গে মিশে যাবে এবং সেই জল বের করে দিলে লবণও বেরিয়ে যাবে।

উপরে জ'মে যাওয়া লবণটাকে জলের সঙ্গে চুইয়ে একেবারে দশ ফুট কি তার চেয়েও নিচে চালিয়ে দিয়েও লোনা জমি উদ্ধার করা যায়। জমির নিচেকার জলস্তর যদি বেশ নিচে থাকে অথবা মাঝখানে যদি বালির স্তর থাকে, তা হ'লে চুইয়ে অতটা নিচে নেমে যাওয়া নুন আর সহজে উপরে উঠে আসতে পারে না। এমন ব্যবস্থা করতে হয় যাতে বৃষ্টির জলের সঙ্গে বা সেচের জলের সঙ্গে চুইয়ে লবণ নিচে নেমে যেতে পারে।

উপযুক্ত কৃষি-ব্যবস্থা

কৃষিকাজের যথোপযুক্ত সুব্যবস্থা করেও লোনা জমি উদ্ধার করতে দেখা যায়। জলের সঙ্গে চুইয়ে লবণকে নিচে নার্মিয়ে দিয়ে উপকার পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রেই যেখানে জমির জলস্তরটা থাকে বেশ নিচে। কিন্তু জলস্তর যদি উপরের দিকে—জমির উপরস্তরের কাছাকাছি থাকে, তা হ'লে এ পদ্ধতির প্রয়োগ বিফল হয়। জমির মাটির মধ্যে গাছ যত দূর পর্যন্ত শিকড় চালাতে পারে, সেই শিকড়ী এলাকায় লবণ থাকলে চলবে না। লবণ তার চেয়ে নিচে নেমে যাওয়া চাই-ই।

লবণ নিচে থেকে জমির মাথায় উঠে এসে জমা হয়। যে চাষে ভেলি বাঁধা হয়, তাতে গাছগুলোকে রাখা হয় ভেলির মাঝখানে। জমিতে যদি নুন বেশি থাকে, তবে স্বভাববশে নুন এসে জমা হবে ভেলির মাঝিশরের উপর। এক্ষেত্রে ভেলির দু'পাশে গাছ থাকার ব্যবস্থা করলেই তার মাঝিশরের

উপরটা থাকবে ফাঁকা, আর সেখানেই নুন জমা হবে। জমা নুন সেখান থেকে চেঁচে তুলে ফেলাও যাবে।

কতকগুলো গাছ লবণ সহিতে পারে। লোনা জমিতে সেসব নুন-সওয়া গাছ লাগালে, চাষও খারাপ হয় না আর জমির নুনও ক'মে যায়।

ক্ষারী জমি উদ্ধার

ক্ষারী জমি উদ্ধার করতে হ'লে তার সোডিয়াম-বহুল মাটিকে চুনা-মাটিতে পরিণত করতে হবে। ক্ষার-মাটি শোধন করার একটা উপায় হচ্ছে 'জিপসাম' বা এমনি কোন চুনা-লবণ প্রয়োগ করা। যে জমিতে প্রচুর পরিমাণ ক্যালশিয়াম কার্বনেট আছে, সেখানে ধান আর বরসিমের চাষ লাগিয়ে উপকার পাওয়া যায়।

জিপসাম দামে সস্তা এবং জলে ভালভাবে গ'লে যায়, তাই এ জিনিস ব্যবহার করাই সুবিধাজনক। জিপসাম প্রয়োগ করার আগে লবণ দূর করার জন্য জল দিয়ে জমি ভাসিয়ে দিতে হবে। তারপর গ'লুড়ো আকারে জিপসাম ছাড়িয়ে, জমিতে লাঙল দিয়ে তা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। জিপসাম প্রয়োগ করার পরে মধ্যে মধ্যে জল দিতে হবে এবং জমি চাষে দিতে হবে—যাতে মাটির সঙ্গে জিপসাম ভাল করে মিশে যেতে পারে। চার থেকে ছয় মাস এভাবে জল দিয়ে আর লাঙল দিয়ে যেতে হবে; তার পরে সেই জমিতে চাষ লাগাবার জন্য বীজ বোনা চলবে। বীজ বোনার আগে সেই জমিতে একরপিছ ১৫ টন খামারী সার প্রয়োগ করা দরকার।

ক্ষারী জমিতে কতটা জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে সেটা ঠিক করতে হবে মাটির ধরন বুঝে। মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে এটা ঠিক করা যায়। মন্টগোমেরি কৃষি-কেন্দ্রে খুব বেশি ক্ষারযুক্ত মাটির শোধন করতে একরপিছ জমিতে দুই টন হারে জিপসাম প্রয়োগ করতে হয়েছে।

স্কারী জমিতে পর্যায়ক্রমে ধান আর বরসিম লাগিয়ে তার মাটিতে স্কারমুক্ত করা হয়। ধানের চাষ লাগালে ক্ষেতে প্রচুর জল দেওয়া হয়; তাতে দ্রবণীয় লবণ চুইয়ে নিচে নেমে যাওয়ার সুবিধা হয়। ধানগাছের শিকড়ের দ্বারা যে কার্বন-ডাইঅক্সাইড সরবরাহ হয়, তাতে ক্যালশিয়াম কার্বনেট পরিবর্তিত হয় ক্যালশিয়াম বাইকার্বনেটে। এর ফলে সোডা-মাটি চুনা-মাটিতে পরিণত হওয়ার সহায়তা হয়। ধানের আগে বরসিম লাগালে তাতে সবুজসার হয়। এতে শুধু যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস প্রভৃতি পুষ্টি-উপাদানের যোগান হয় তাই নয়—এতে মাটির স্কারও কমে যায়।

দেখা গেছে যে, স্কারী মাটিতে নাইট্রোজেন আর ফসফরাসের অভাব থাকে। কাজেই স্কারী জমিতে ধানের চাষ করলে, তাতে যদি নাইট্রোজেন আর ফসফরাস প্রয়োগ করা হয়, তবে জিপসাম প্রয়োগ করার দরকার হয় না।

যে জমি স্কারী আর লোনা দুইই, সে জমি উদ্ধার করতে হলে মাটিতে যে অত্যধিক পরিমাণে লবণ আর স্কার আছে, তা দূর করতে হবে। এরকম জমিতে যদি প্রচুর পরিমাণ ক্যালশিয়াম কার্বনেট দেখা যায়, তবে তাতে পর্যায়ক্রমে বরসিম আর ধানের চাষ করা যেতে পারে। আর তা না হলে জিপসাম প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উচ্চ জলস্তর

জমির নিচেকার জলস্তর যদি উঁচুতে থাকে, তবে সেটা একটা সমস্যা। জমির উপর থেকে ছয় ফুটের মধ্যে যদি জলস্তর থাকে, তবে নালা কেটে বা পাম্প করে জল আরও নিচে নামিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। অথবা বিশেষ কৃষিব্যবস্থার দ্বারাও জলস্তর আরও নিচে নামিয়ে দেওয়া যেতে পারে; তাতে নিচে থেকে নুন উপরে উঠে আসাও বন্ধ হয়। জমির উপরে আবর্জনা ফেলে একটা স্তর করে দিয়ে জলের বাষ্পীভবন রোধ করা যেতে পারে। সেচ-নিয়ন্ত্রণ করা দরকার এবং জমিতে পর্যায়ক্রমে এমনসব ফসলের চাষ লাগানো দরকার যেগুলো লবণ সহিতে পারে। যে জমির উপর জল জমে থাকে অথবা যে-জমির নিচে দু'-এক ফুটের মধ্যেই জলস্তর রয়েছে, সেখানে বিশেষ কৃষিব্যবস্থার দ্বারা সুফল পাওয়া যায় না।

কোন জমির মাটি যথাযথভাবে শোধন করতে হলে, আগে দেখতে হবে, সে জমি লোনা কিংবা স্কারী অথবা দুইই। জলস্তর জমির কত নিচে রয়েছে, সেচের জল পাওয়া যায় কিনা, মাটির ধরন কী, এসবও দেখতে হবে। শুধু চোখে দেখলেই চলবে না। সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে, রাজ্যসরকারের কৃষি-রসায়নীর দ্বারা জমির মাটি পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া।*

*১৯৫৬'র অক্টোবর-সংখ্যা 'ইন্ডিয়ান ফার্মিং'এ প্রকাশিত শ্রী এস ডি নিস্বাওয়ানের প্রবন্ধ থেকে



কালনার আদর্শ গ্রাম

রবিবার ১৯এ মে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী মধ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সংগে কালনার আদর্শ গ্রামটি পরিদর্শন করেন। এখানে গত সেপ্টেম্বর মাসের বন্যায় দুর্গত জনসাধারণ নিজের গৃহ নিজে নির্মাণ করার পরিকল্পনা অনুসারে তাঁদের গৃহনির্মাণ করছেন। ৩৮ একর জমি জোড়া বিজয়নগর ইউনিটে ২৪১টি পরিবারের বসতি হবে। সাতটি গৃহের নির্মাণ ইতোমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে এবং ৩৮টি নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণ ইতোমধ্যেই ৩০ লক্ষ ইট তৈরি করেছেন।

কালনা থানা এলাকায় এক কোটি পঁচিশ হাজার ইট তৈরি করা হবে এবং তার প্রায় এক কোটি ইতোমধ্যেই পোড়ানো হয়েছে। ১,৬৫০টি পরিবার এই কাজে রত আছেন এবং সরকার এঁদের কাছে ২,৪৭৪ টন কয়লা সরবরাহ করেছেন। এই অঞ্চলে গত বৎসরের বন্যায় ১৩২টি গ্রাম দুর্গত হয়, ৪,৩৬১টি গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তার ফলে ৩,৫৩৫টি পরিবার গৃহহীন হয়। নয়টি ইউনিয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় কৃষ্ণদেওপুর ও ধাত্রীগ্রামের।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এই পরিকল্পনাধীন এক গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। একটি ঘর ও বারান্দা সমন্বিত এই গৃহের মেঝের আয়তন ১৬০ বর্গফুট। খরচ পড়েছে ৩২৫ টাকা। এই বাড়ি ইটের তৈরি এবং গ্রামবাসীদের নিজহাতে তৈরি। এর মালমশলা সরকার বিনামূল্যে সরবরাহ করেছেন। ইট পোড়ানোর জন্য কয়লা, ছাদের জন্য ঢেউ-টিন, ছাদের কাঠ এবং দরজা-জানালার চোকাঠ-পাল্লা সহ এসব মালমশলার মূল্য ২৪৫ টাকা। কর্মীদের শ্রমের পরিমাণের হিসাব হচ্ছে ৫০টি কাজের দিন এবং এর মধ্যে দৈনিক ১.৫০ টাকা ব্যয়ে ইট তৈরির সময়ও ধরা হয়েছে।

নিজের গৃহ নিজে নির্মাণ করার পরিকল্পনা অনুসারে নদিয়া, মর্শিদাবাদ, চাঁদ্বশপরগনা, হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান ও বীরভূম জেলায় কাজ

চলছে। গ্রামবাসীদের কারিগরী সহায়তার জন্য তিনশ' শিক্ষাদাতা রয়েছেন। মোট ১০.৬ কোটি ইট কাটা হয়েছে এবং তার মধ্যে প্রায় সাত কোটি পোড়ানো হয়েছে। নদিয়াতে ৩.৫ কোটি ইট তৈরি করা হয়েছে এবং তা ৫,৫০০টি গৃহনির্মাণের পক্ষে পর্যাপ্ত। হুগলিতে ২,৯৪০টি গৃহের জন্য ২.৬ কোটি ইট তৈরি হয়েছে। বর্ধমানে ৪,৩১০টি গৃহের জন্য তৈরি হয়েছে ৩.০২ কোটি ইট। মর্শিদাবাদে ১,৩৭০টি গৃহের জন্য হয়েছে ১.৬ কোটি ইট; বীরভূমে ৫৪০টি গৃহের জন্য হয়েছে ৩.৮ কোটি ইট; হাওড়ায় ৩০০ গৃহের জন্য ২.২ কোটি ইট এবং চাঁদ্বশপরগনায় ৯০টি গৃহের জন্য ৭ লক্ষের বেশি ইট তৈরি হয়েছে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণমাচারী বিজয়নগর ইউনিটের সমাজকেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং সমাজঘরটির নামকরণ করা হয় তাঁর নামে। এই ঘরটির আয়তন হবে ৩২ ফুট × ২০ ফুট। অন্যান্য সাধারণ কল্যাণকেন্দ্রগুলির মধ্যে থাকবে একটি বিদ্যালয় ও একটি চিকিৎসালয়। গ্রাম-পঞ্চায়েতের জন্য একটি গৃহেরও সংস্থান করা হবে।

রাজ্যের খাদ্য দ্রাণ ও সংভরণ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ভিত্তিপ্রস্তরটি স্থাপনের জন্য শ্রী কৃষ্ণমাচারীকে আহ্বান করেন। শ্রী সেন বলেন যে, তিনি যখন কিছুদিন আগে বিজয়নগরে এসেছিলেন, তখন প্রায় অশীতিপর এক মুসলমান গ্রামবাসী তাঁর কাছে এসে বলেন যে, এই পরিকল্পনার জন্য তিনি সরকারকে আশীর্বাদ জানাতে চান। শ্রী সেন বলেন যে, গ্রামের কেবল দরিদ্র অধিবাসীরাই ন'ন, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা, এমন কি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও বিপুল উৎসাহে ইট তৈরির কাজে যোগ দিয়েছেন দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দ-লাভ করেন। তিনি বলেন যে, এটা সম্পূর্ণ নতুন এক স্বাবলম্বনের যুগের আগমনবার্তা ঘোষণা করছে।

শ্রী কৃষ্ণমাচারী বলেন: “এখানে এসে নতুন উৎসাহে অনুপ্রেরিত এত লোক দেখতে পেয়ে আমি

অত্যন্ত সুখী হয়েছি। আপনারা অনেক দুঃখভোগ করেছেন; আপনাদের যা-কিছু ছিল সব নষ্ট হয়েছে, কিন্তু আপনারা সাহস হারান নি। এখানে আমি স্বাবলম্বনের আদর্শ দেখতে পেয়েছি। আপনারা দরিদ্র, জীবনের বহু প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে আপনারা বঞ্চিত। চালের দাম বেড়ে গেছে, কিন্তু খাদ্যাবস্থার উন্নতির জন্য রাজ্যসরকার সকল রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। কেবল এ অঞ্চলেই দারিদ্র্য রয়েছে এমন নয়,—ভারতের আরও কোন কোন অঞ্চলেও এ দুরবস্থা রয়েছে। সকল জায়গার দুর্দশা লাঘবের জন্যই আমাদের চেষ্টা করতে হয়। আপনারা একটি পথের নির্দেশ দিয়েছেন। আপনারা নিজেরা নিজেদের বাড়ি তৈরি করেছেন। আমরা স্বীকার করি যে, এটাই যথেষ্ট নয়। আপনাদের জীবনকে সুখী করার জন্য এবং আপনারা যাতে বছরের সব সময় কাজ পান তার জন্য আমাদের আরও বহু কাজ করতে হবে। এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় হয়তো এটা সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু অন্তত পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এটা করতেই হবে। আপনারা কাজ আরম্ভ করেছেন, আপনারা যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন; আপনারা যদি সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হন, তবে সরকার আপনাদের আরও সাহায্য করবেন। কোন কোন লোকে মনে করেন যে, তাঁদের জন্য সরকারেরই সবকিছু করা উচিত। কিন্তু সেটা হতে পারে না। আপনারা যদি সচেত হন, সরকারও আপনাদের সঙ্গে হাত মেলাবেন। গ্রামাঞ্চলের উন্নতিকল্পে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমন্ত্রী ডাক্তার রায়ের এইসব পরিকল্পনায় সাহায্য দিতে আমরা চেষ্টা করব।

“আপনারা আপনাদের কর্তব্য করেছেন। আপনারা আদর্শ স্থাপন করেছেন। গত সেপ্টেম্বরে

যে দুর্দশা আপনাদের গ্রামে নেমে এসেছিল, তার যাতে পুনরাবির্ভাব না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। যে কাজ আপনারা আরম্ভ করেছেন, সহযোগিতার দ্বারা তার আরও উন্নতি সম্ভব।

“আপনারা চালের বেশি দর সম্বন্ধে অভিযোগ করেছেন। আমরা এমন পরিস্থিতি চাই না এবং এর প্রতিকারের জন্য আমরা আগ্রহশীল। কিন্তু অনাবৃষ্টিতে বা বন্যায় শস্যের ক্ষতি হলে এরকম অভাব দেখা দেয়। চাল সংগ্রহ করে আমরা দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলে সরবরাহ করি এবং চালের দাম কমিয়ে আনতে চেষ্টা করি। অন্যান্য পন্থাও গ্রহণ করা যেতে পারে, যেমন নিয়ন্ত্রণ; কিন্তু সেটা কেউই পছন্দ করেন না। আপনাদের অভাব যাতে দূর হয় এবং ন্যায্য মূল্যে যাতে চাল পাওয়া যায় আমরা তার চেষ্টা করব। আমাদের উপর আপনাদের আস্থা রাখতে হবে। শোভাযাত্রা বের করে আপনারা ১৫ টাকা মণ দরে চাল পেতে পারেন না। চাল উৎপাদন করতে সাত মাস সময় লাগে। কিন্তু মাত্র পনেরো মিনিটে একটি শোভাযাত্রা সংগঠিত করা যায়। দাম কমানোর জন্য কিছু করা সম্ভব হলে সরকার তা করবেন।

“আপনারা ধৈর্যশীল। আপনারা এক মহান জাতির অন্তর্ভুক্ত। বহু কষ্ট আপনারা সহ্য করেছেন; আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাকুন। আপনারা এবং আপনাদের সন্তানেরা যাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে পারেন এবং লাভজনক বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকতে পারেন আমরা তাই চাই। ঈশ্বর আপনাদের সহায় হোন।”

রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্ত ঘোষও উপস্থিত ছিলেন।



পশুচিকিৎসায় স্নাতকোত্তর পুনরনুশীলনপাঠ

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও পশুচিকিৎসা বিভাগের মন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ ৬ই মে [১৯৫৭] বঙ্গের ভেটেরিনারি কলেজে পশুর শল্যচিকিৎসা ও শারীরবৃত্ত সংক্রান্ত স্নাতকোত্তর পুনরালোচন পাঠক্রমের উদ্বোধন করেন। ভারতের সকল স্থান থেকে শিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ পশু-শল্যচিকিৎসা ও শারীরবৃত্তে দুইজন বিদেশী বিশেষজ্ঞের অধীনে ছয় সপ্তাহের একটি পুনরালোচন পাঠক্রম অনুসরণ করছেন। এই শিক্ষণ-পাঠক্রমে যোগদানের জন্য এ পর্যন্ত আসাম, অন্ধ্র, হায়দরাবাদ, পাটনা, বোম্বাই, কেরল, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পাজাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু শিক্ষণার্থী আবেদন করেছেন। পশু-শল্যচিকিৎসা ও শারীরবৃত্তে স্নাতকোত্তর শিক্ষার পর্যাণ্ত সুযোগসুবিধার অভাব বহুদিন ধরে অনুভূত হচ্ছে এবং তা দূর করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় কৃষি-গবেষণা পরিষদ ও কারিগরী সহযোগিতা মিশনের সহযোগিতায় এই পুনরালোচন পাঠক্রমের প্রবর্তন করা হয়েছে।

পাঠক্রমের উদ্বোধন করে রাজ্য-কৃষি-পশুপালন-মন্ত্রী বলেন যে, অন্যান্য বিষয়ে অল্পবিস্তর অগ্রসর হলেও শল্যচিকিৎসা ও শারীরবৃত্তে পশুচিকিৎসা বিজ্ঞান কিছুটা পিছিয়ে আছে। তিনি আরও বলেন যে, পশু-শল্যবিদ্যা সম্ভবত আমাদের শিক্ষার দূর্বলতম অংশ।

দেশের বিপুলসংখ্যক গো-মহিষের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রিমহাশয় দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, জাতীয় অর্থনীতিতে পশুপালন এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে। এ বিষয়টি সকলের দৃষ্টি-আকর্ষণ করছে; তার ফলে এই শিল্পের বিভিন্ন দিকে উন্নয়নমূলক কার্যের সূচনা হচ্ছে। একাধিক

উপায়ে দেশের দূরতম প্রান্তে পশুচিকিৎসার সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে কর্মীদের উচ্চতর জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী করার প্রয়োজনের দিকেও যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। এই পশুপালন-শিল্প জীবনের সকল ক্ষেত্রে জনগণের জীবন ও সুখের সহিত সম্পৃক্ত রয়েছে, নিজ নিজ পরিবেশে বহু লোকের লাভ-জনক কর্মসংস্থানের এবং আর্থিক সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করার সম্ভাবনা এর মধ্যে রয়েছে। আশা করা যায় যে, অনতিবিলম্বে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের সভাপতিরূপে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগের সচিব শ্রী সি কে রায় মানুষ, পশু ও অরণ্যের নিবিড় সম্পর্কের উল্লেখ করে, একে 'প্রকৃতির বিপুল সৌন্দর্য ও পূর্ণতার নিদর্শন' বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, পশুজগতের অংশস্বরূপ পালিত পশুর এই নিদর্শনের পূর্ণতায় প্রভূত অবদান রয়েছে।

জাতীয় অর্থনীতিতে বিপুল পরিমাণে পালিত পশুর উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে শ্রী রায় উন্নয়নকর্মসূচির রূপায়ণে শিক্ষিত পশুচিকিৎসকের একান্ত অপ্রতুলতার উল্লেখ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে পালিত পশুর উন্নয়নে আগ্রহী সকলে তুলনামূলক অস্থিসংস্থানবিদ্যা এবং অস্ত্রোপচারে স্নাতকোত্তর পুনরনুশীলন পাঠক্রম প্রবর্তনের গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। তিনি এই বলে উপসংহার করেন যে, বিদেশাগত অধ্যাপকস্বরের প্রগাঢ় জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তা এবং তাঁদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ দ্বারা এই পাঠক্রমগুলিতে অংশগ্রহণের জন্য সমবেত দেশের পশুচিকিৎসা-অধ্যাপকগণ প্রভূত উপকৃত হবেন।

পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার

বাঙলা ১৩৬২ সনের ১লা বৈশাখ এই রাজ্যে জমিদারি প্রথা বা মধ্যস্বত্বাধিকারীর স্বার্থ বিলোপের সূচনা হয়েছিল; পশ্চিমবঙ্গের ভূমি-ব্যবস্থায় এ এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। ঐ একই তারিখ থেকে রায়ত ও উপ-রায়তদের অধিকার রাজ্যে বর্তিত হয়েছে। এইভাবে কৃষিজমির খাজনা আদায়-সংক্রান্ত সকল স্বার্থ রাজ্যের অধিকারে এসেছে এবং চাষী প্রজারাই এখন জমির প্রকৃত মালিক। সকল বনসম্পদও এখন রাজ্যের অধিকারে। মরা আর ভেঙেপড়া ডাল, শুকনো পাতা ইত্যাদি কুড়ানো, গবাদি পশু চরানো প্রভৃতি জনসাধারণের যেসকল অধিকার মধ্যস্বত্বাধিকারী, রায়ত ও উপ-রায়তদের বনসম্পত্তি রাজ্যসরকারের অধিকারে বর্তানোর তারিখে বলবৎ ছিল, সেগুলি আপাতত রেখে দেওয়া হচ্ছে।

খাজনার হার

সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কার আইনের বিধান অনুযায়ী খাজনার হার নির্ধারণ সাপেক্ষে উৎপন্ন দ্রব্য থেকে লাভকারী চাষীদের খাজনার হার ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ থেকে একরপ্তি ৯ টাকা সমহারে নির্ধারিত হবে।

সংশোধনমূলক ভূবাসন

ভূসম্পত্তি গ্রহণ আইনটি বলবৎ করার উদ্দেশ্যে 'রেকর্ড অব রাইটসমূহের তালিকা প্রণয়ন ও সংশোধনের জন্য রাজ্যের সর্বত্র এখন সংশোধন-মূলক ভূবাসনকার্য চলছে।

পরিচালন-ব্যবস্থাপনা

মধ্যস্বত্বাধিকারীদের অধীন অধস্তন আদায়কারী কর্মীদের মধ্য থেকে প্রায় ৮,০০০ তহশিলদার নেওয়া হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বাধিকারীদের অধীন উর্ধ্বতন কর্মীদের মধ্য থেকেও বহু লোককে উপযুক্ত পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

বন্যাপীড়িত অঞ্চলের প্রজা

গত বৎসরের অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পরিণামে সংঘটিত বন্যার কথা বিবেচনায় সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বন্যাপীড়িত অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর তাঁদের দেয় অর্থ প্রদানের জন্য চাপ দেওয়া হবে না। বন্যাপীড়িত অঞ্চলে রাজস্ব বা খাজনা, সেস, কৃষিঞ্চণ, কৃষি-আয়কর প্রভৃতি সরকারী প্রাপ্য আদায়ের জন্য মধ্যস্বত্বাধিকারী, রায়ত ও উপ-রায়তদের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট জারি স্থগিত রাখা হয়েছে। প্রাপ্তন মধ্যস্বত্বাধিকারীদের প্রাপ্য বকেয়া খাজনা এবং সেস, যা আদায়ের অধিকার ভূসম্পত্তি গ্রহণ আইনের ৯নং ধারার বলে সরকারে বর্তিত হয়েছে, তা আদায়ের জন্যও সার্টিফিকেট জারি স্থগিত রাখা হয়েছে।

ক্ষতিপূরণ

মধ্যস্বত্বাধিকারীদের স্বার্থ গ্রহণের দরুন ক্ষতি-পূরণের হার 'স্ল্যাব' প্রথায় ৫০০ টাকা নীট আয়ের ক্ষেত্রে প্রথম ও নিম্নতম 'স্ল্যাব'এর জন্য ২০ গুণ এবং ১ লক্ষ টাকার উপরে উচ্চতম 'স্ল্যাব'এর জন্য দুই গুণের মধ্যে পরিবর্তনশীল হবে। অবশ্য, যে ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বাধিকারীর স্বার্থ কেবলমাত্র দাতব্য ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে কোন প্রকৃত 'ট্রাস্ট' অথবা আইনগত বাধ্যবাধকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সে ক্ষেত্রে দেয় ক্ষতি-পূরণ নির্ধারণ করা হবে ঐ স্বার্থের নীট বার্ষিক আয়ের সমান চিরকালীন সালিয়ানা হিসাবে। সকল ক্ষতিপূরণই অংশত নগদে এবং অংশত বার্ষিক শতকরা ৩ ভাগ সুদযুক্ত এবং বার্ষিক ২০টি সমান কিস্তিতে দেয় অ-হস্তান্তরযোগ্য বন্ডে দেওয়া হবে। নগদ অর্থ মোট অঙ্কের পরিবর্তনীয় শতকরা হারে দেওয়া হবে; এর উচ্চতম পরিমাণ হবে নীট আয়ের প্রথম ২৫০ টাকা সম্পর্কে শতকরা ১০০ টাকা এবং নিম্নতম পরিমাণ হবে ২ লক্ষ টাকার অধিক নীট আয়ের ক্ষেত্রে শতকরা ২২ টাকা। বন্ডসমূহের

পরিবর্তিত মূল্য এক কিস্তিতে প্রদানের ক্ষমতা রাজ্যসরকারের হাতেই রাখা হয়েছে। ক্ষতিপূরণের হার এবং তা প্রদানের ধরন এরূপভাবে স্থির করা হয়েছে, যাতে নিম্ন-আয়সম্পন্ন ব্যক্তিদের সর্বাপেক্ষা কম অসুবিধা হয়।

যাঁর ভূসম্পত্তি ও স্বার্থ রাজ্যে বর্তিত হয়েছে, এখন কোন মধ্যস্বত্বাধিকারী চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে তাঁর আনুমানিক নীট বার্ষিক আয়ের এক-তৃতীয়াংশ হারে মধ্যবর্তীকালীন ক্ষতি-পূরণ বাবত বার্ষিক অর্থ সাধারণভাবে নগদ হিসাবে পাবার অধিকারী। মধ্যস্বত্বাধিকারীদের মধ্যে যাঁরা স্বল্প-আয়সম্পন্ন, এই ব্যবস্থায় তাঁদের যথেষ্ট অসুবিধা হওয়ায় সরকার স্থির করেন যে, যে মধ্যস্বত্বাধিকারীর মোট বার্ষিক আয় অনধিক প্রায় ২৫০ টাকা তিনি প্রায় সম্পূর্ণ বার্ষিক আয় বাৎসরিক পাবেন এবং যাঁর আনুমানিক মোট বার্ষিক আয় ২৫০ টাকার অধিক কিন্তু ৭৪৯ টাকার কম, তিনি বার্ষিক ২৫০ টাকা পাবেন। সরকার আরও স্থির করেন যে, যেসব মধ্যস্বত্বাধিকারী বাঙলা ১৩৬২ সনে কোন অর্থ পান নি, তাঁরা একসঙ্গে বাঙলা ১৩৬২ সন এবং ১৩৬৩ সনের দরুন অর্থ পাবেন। সুতরাং যাঁদের মোট আয় অনধিক ২৫০ টাকা, তাঁরা আয়ের স্বিগুণ, ২৫০ থেকে ৭৪৯ টাকা পর্যন্ত আয়ের মধ্যস্বত্বাধিকারীরা ৫০০ টাকা এবং ৭৫০ টাকা বা তার অধিক আয়ের মধ্যস্বত্বাধিকারীরা মোট আয়ের ৩ অংশ পাবেন। অনুরূপভাবে সম্পূর্ণ ধর্মীয় এবং দাতব্য 'ট্রাস্ট' ও 'এনডোমেন্ট'গুলি বাঙলা ১৩৬২ সনের জন্য কোন অর্থ না পেয়ে থাকলে ঐ সন এবং বাঙলা ১৩৬৩ সনের জন্য একসঙ্গে পাবেন।

১৯৫৭ সালের ১৫ই এপ্রিল সমাপ্তির সময়ে সরকার ২৪,০০০ মধ্যস্বত্বাধিকারীর জন্য ৫২,২১,০০০ টাকা অন্তর্বর্তীকালীন অর্থ মঞ্জুর করেছেন।

কিষণগঞ্জ ও পূর্নালিয়া

১৯৫৬-৫৭ সালে পূর্নালিয়া জেলার কিষণগঞ্জ মহকুমার অংশবিশেষ এবং মানভূম জেলার পূর্নালিয়া মহকুমা বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গে হস্তান্তরিত হয়েছে। কিষণগঞ্জ এলাকার সকল রায়তীস্বত্ব এবং জমিদারি এবং পূর্নালিয়ার কতিপয় রায়তীস্বত্ব ও জমিদারি হস্তান্তরের তারিখের পূর্বে বিহার ভূমিসংস্কার আইন অনুসারে রাষ্ট্রে বর্তিত হয়েছে। হস্তান্তরিত এলাকায় বিহার ভূমিসংস্কার আইন এখনও বলবৎ আছে। কিষণগঞ্জ এলাকায় পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থানুযায়ী রাষ্ট্রে বর্তানো জমিদারির পরিচালনার জন্য ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। কিন্তু পূর্নালিয়ায় বিহার-সরকারের ব্যবস্থাই কার্যকরী রয়েছে।

এ বৎসর ১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি গ্রহণ (সংশোধন) আইন দ্বারা ১৯৫৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি গ্রহণ আইন সংশোধন করে অন্যান্য ব্যবস্থা সমেত নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলিও করা হয়েছেঃ (১) মধ্যস্বত্বাধিকারীর সংজ্ঞার মধ্যে সার্ভিস টেনিওরধারী এবং লীজ ও সাবলীজধারী (খনি ও খনিজের ক্ষেত্রে) অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ; (২) বর্তানোর তারিখ থেকে বারো মাসের পর মধ্যস্বত্বাধিকারীর বকেয়া দেয় রাজ্য-সরকার কর্তৃক আদায়ের জন্য দরখাস্ত গ্রহণ এবং (৩) অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ও উন্মাদগণের জন্য অভিভাবক ও ম্যানেজারের নিকট ক্ষতিপূরণ দান।

টুকিটাকি

কৃষিমন্ত্রীর সংবর্ধনা

চাঁদপুর জেলার রাজারহাট থানার রঘুনাথ-পূর গ্রামে ৫ই মে [১৯৫৭] রবিবার পশ্চিম-বঙ্গের কৃষিমন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এক সভার অনুষ্ঠান হয়। স্থানীয় জনগণ তাঁকে একটি স্বাগতপত্র দেন এবং গ্রাম্য রাস্তা, পানীয় জল সরবরাহ ও গ্রাম্য বিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁদের কতকগুলি প্রয়োজনের বিষয় উল্লেখ করেন।

মন্ত্রিমহাশয় এই বলে তাঁদের আশ্বাস দেন যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপিত হলে এসব প্রস্তাব সরকার বিবেচনা করে দেখবেন। তিনি বলেন যে, ব্রিটিশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কালে সকল দিকেই অগ্রগতি হবে। তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, প্রত্যেক নাগরিক নিজেকে কর্মে নিয়োজিত করে রাষ্ট্রের উন্নয়নে সহযোগিতা করবেন।

রাজগঞ্জে পূর্তমন্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গের পূর্তমন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জে সফরকালে ঐ স্থানের খাদ্যাবস্থা এবং বিলম্বে বর্ষা হওয়ার দরুন পানীয় জল ও কৃষির সমস্যা পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি দেখতে পান যে, স্থানীয় জনগণ খাদ্য ও জলের অনটনে কষ্ট পাচ্ছেন। স্থানীয় আধিকারিকদের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেন। জলপাইগুড়ি পৌরসংস্থের সভাপতি, স্থানীয় পত্রিকাগুলির সম্পাদকগণ এবং জনগণের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাধারণভাবে এক আলোচনাসভায় মিলিত হয়ে তিনি জেলার আর্থিক অবস্থা এবং স্থানীয় উন্নয়নকর্মসূচি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

জাতীয় প্রসারণকৃত্যক ব্রকগুলির উপ-মহাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য আধিকারিকগণ ধূপগুড়িতে এক আলোচনাসভায় মিলিত হয়ে ব্রকগুলিতে উন্নয়নকর্ম সম্বন্ধে শ্রী দাশগুপ্তের সঙ্গে আলোচনা করেন।

জোড়পাকারি হাই স্কুলে তিনি এক জনসভায় ভাষণ দেন। সেখানে তাঁকে জনগণের পক্ষ থেকে স্বাগত জ্ঞাপন করা হয়। জলপাইগুড়ি শহরেও তিনি নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। এখানে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। ১৭ই থেকে ২০ই মে পর্যন্ত তিনি এই জেলায় সফর করেন।

মহানগরে পশুপ্রদর্শনী

সম্প্রতি পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বালুরঘাট থানা এলাকার মহানগরে পালিত পশুর এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীতে স্থানীয় বহু কৃষক তাঁদের পালিত পশু প্রদর্শন করেন। কয়েকজন প্রতিযোগীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মহকুমা-শাসক শ্রী বি কে ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতী ভট্টাচার্য প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। এ উপলক্ষে সমবেত কৃষকদের নিকট এক ভাষণে শ্রী ভট্টাচার্য রাজ্যের পালিত পশুসম্পদের উন্নয়নের উপর জোর দেন। পালিত পশুর প্রজনন ও পালনের উন্নত প্রণালী অবলম্বন করার জন্য তিনি কৃষকদের অনুরোধ জানান। স্থানীয় পশুপালন-আধিকারিকও সভায় ভাষণ দেন।

রানাঘাটে তাঁত সপ্তাহ

নদিয়া জেলার রানাঘাট মহকুমার সর্বত্র অখিল ভারত হস্তচালিত তাঁত সপ্তাহ যথোপযুক্তরূপে উদ্‌যাপিত হয়। রানাঘাটে “সার্বভৌমত্ব কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন লিমিটেড”এর সভাপতি শ্রীদেবপ্রসাদ প্রামাণিকের উদ্যোগে স্থানীয় তাঁতের কাপড়ের এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা প্রচার সংস্থা চলচ্চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। বাণিজ্য, শিল্প ও সমবায় বিভাগের সচিব শ্রীঅশোককুমার মিত্র, আই সি এস, সভাপতিত্ব করেন এবং প্রদর্শিত শ্রেষ্ঠ কাপড়গুলির উৎপাদনকারীদের পুরস্কার ও রাজ্য-সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

নদিয়ার জেলাশাসক শ্রী এম সি মধুপাধ্যায় এবং যুগ্ম শিল্প-অধিকর্তা (হস্তচালিত তাঁত) শ্রী এম বন্দ্যোপাধ্যায়ও সভায় ভাষণ দেন। হাতে চালানো তাঁতের কাপড়ের উন্নতি সম্পর্কে এক আলোচনায় কয়েকজন কারিগরও যোগদান করেন।

পুরুলিয়ার তাঁত সপ্তাহ

এই হইতে ১১ই মে পর্যন্ত পুরুলিয়া জেলার সর্বত্র অখিল ভারত হস্তচালিত তাঁত সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত জন-সভাগুলিতে বয়নকারী, জমিদার, চিকিৎসক, আইনজীবী ও স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যোগদান করেন। জেলার বয়নকারী সমবায় সমিতিগুলির উদ্যোগে ঝালদা, রঘুনাথপুর, জয়পুর, নাডিহা (পুরুলিয়া), কালাপাথার, বাইকাটা, হিজুলী, মানবাজার ও পারায় সভার অনুষ্ঠান হয়।

সমাপ্তিদিবসে, “পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লিমিটেড” এক সভা আহ্বান করেন। বিহার-সরকারের প্রাক্তন পরিষদ-সচিব শ্রীজীমুতবাহন সেন সভাপতিত্ব করেন। অন্যান্যদের মধ্যে পুরুলিয়ার সমবায় সমিতিসমূহের সহ-নিবন্ধক শ্রী বি বি মিত্র, “পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন”এর সভাপতি শ্রীঅশোক চৌধুরী এবং “পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডলড উইভাস্ কংগ্রেস”এর সভাপতি শ্রী সুলেমান আনসারীও সভায় বক্তৃতা করেন।

পুরুলিয়ার সমবায় সমিতিসমূহের পরিদর্শক শ্রী সি আর গোস্বামী রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্র্যমন্ত্রীর নিকট থেকে প্রাপ্ত বাণীগুলি পাঠ করেন।

জেলার হাতে-চালানো তাঁতের কাপড়ের একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয় এবং প্রদর্শিত কাপড়ের অনেকগুলিই বিক্রি হয়। পুরুলিয়ার “কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন”এর এবং “রঘুনাথপুর উইভাস্ সোসাইটি”র ডিপো সমূহেও প্রচুর কাপড় বিক্রি হয়।

রঘুনাথপুরে অনুষ্ঠিত সভায় পুরুলিয়া জেলা-বোর্ডের সহ-সভাপতি শ্রীকিশোরীমোহন আচার্য

সভাপতিত্ব করেন। অন্যদের মধ্যে শ্রীঅশোক চৌধুরী ও শ্রী বি বি মিত্রও বক্তৃতা করেন।

ঝাড়গ্রামে তাঁত সপ্তাহ

১১ই মে ঝাড়গ্রামে বেলিয়াবেড়া “সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক”এর গৃহে অখিল ভারত হস্তচালিত তাঁত সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে “ঝাড়গ্রাম কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিয়ন” স্থানীয় তাঁতের কাপড়ের এক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে “রাধা-নগর কো-অপারেটিভ উইভাস্ সোসাইটি”, কর্ম-কুটির, বিদ্যাসাগর বাণীভবন ও হিন্দুমিশনের তাঁতের কাপড়গুলি দর্শকদের আকৃষ্ট করে। বিভিন্ন বিষয়ে প্রদর্শিত শ্রেষ্ঠ দ্রব্যের জন্য অংশগ্রহণকারীদের নগদ পুরস্কার দেওয়া হয়। ঝাড়গ্রামের মহকুমাশাসক লেঃ ডি সি মধুপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও পুরস্কার-বিতরণ করেন।

বহু আকারের সমবায় কৃষিজ-বিপণন সমিতি স্থাপন

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে বহু আকারের সমবায় বিপণন সমিতি স্থাপনের লক্ষ্য কৃষি-অধিকারের বিপণনশাখা পূর্ণ করেছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এইরূপ ১০০টি সমিতি স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে এরূপ ১৫টি সমিতি স্থাপনের কথা ছিল, এগুলি সবই সংগঠিত হয়েছে। মূলধন, সাহায্য এবং এইসব সমবায় বিপণন সমিতির গদ্যদাম নির্মাণের জন্য ঋণ বাবত আবশ্যিক সরকারী অর্থসাহায্য দেওয়া হয়েছে। এই বিপণন সমিতিগুলির তিনটি বর্ধমানে, দুটি করে বীরভূম, কোচবিহার ও মেদিনীপুরে এবং একটি করে মালদহ, পশ্চিমদিনাজপুর, মর্শিদাবাদ, নদিয়া, চব্বিশপরগনা ও হাওড়া জেলায় স্থাপিত হবে।

সদস্যগণের মূলধন ১০,০০০ টাকা বা তার বেশি হলে এইসব বহু আকারের সমবায় বিপণন সমিতিতে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। সরকার প্রত্যেক সমিতিতে মূলধন বাবত সমপরিমাণ অর্থ,

গদ্যদাম নির্মাণের জন্য সাহায্য বাবত ৫,০০০ টাকা এবং একই উদ্দেশ্যে ঋণ বাবত ১৫,০০০ টাকা দিয়ে থাকেন। এই ১৫টি সমিতির মূলধন বাবত স্থানীয় জনগণ ২ লক্ষের অধিক টাকা সংগ্রহ করেছেন এবং সরকারও মূলধন বাবত সমপরিমাণ অর্থ দিয়েছেন। গদ্যদাম নির্মাণের জন্য সাহায্য বাবত ৭৫,০০০ টাকা এবং একই উদ্দেশ্যে ঋণ বাবত ২.২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

গ্রামোন্নয়নের জন্য প্রমদান

মুর্শিদাবাদ জেলায় গ্রামোন্নয়নের কাজে জনসাধারণের সহযোগিতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি, মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল থানা এলাকার গরাইমারী ও ভগীরথপুর ইউনিয়নের গ্রামবাসীরা কয়েকটি গ্রাম্য রাস্তা মেরামত করেন। গরাইমারী ইউনিয়নের প্রায় ২,০০০ অধিবাসী চার মাইল একটি দীর্ঘ রাস্তা মেরামত করেন। ভগীরথপুর ইউনিয়নের অধিবাসীরা প্রায় ১ মাইল রাস্তা মেরামত করেন এবং প্রায় ১,০০০ লোক এই কাজে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া, স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলাই অনুযায়ী মোট ৪,৭৮৬ টাকা ব্যয়ে এই এলাকায় একটি কালভার্ট নির্মিত হয় এবং এর মধ্যে ২,৪১১ টাকা স্থানীয় অধিবাসীরা প্রমদানের দ্বারা তুলে দেন। ভগীরথপুর ইউনিয়নের বন্দাবনপুর গ্রামে একটি নৈশবিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে প্রমদানের দ্বারা নির্মিত হয়। মুর্শিদাবাদের (সদর) মহকুমা-শাসক ১৯৫৭ সালের ৬ই মে এই বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন।

কলিকাতায় আর-একটি আগমার্ক বিপণি

১৯৩৭ সালে ভারত-সরকার কৃষিজাত দ্রব্য (শ্রেণীবিন্যাস ও বিপণন) আইন পাস করেন এবং তার দ্বারা বিশুদ্ধ দ্রব্যের মান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে এইটাই বিশুদ্ধ দ্রব্যের সরবরাহ সুনিশ্চিত করার প্রথম কার্যকরী প্রচেষ্টা। এই আইনের বলে নির্দিষ্ট মান অনুসারে যেসকল প্যাকার আটা, ঘি, সরষের তেল, মাখন ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে ইচ্ছুক, তাঁরা তাঁদের

উৎপাদিত দ্রব্যের উপর ভারত-সরকারের 'আগমার্ক' লেবেল লাগাতে সরকারীভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত হলেন এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার ঘন ঘন উৎকর্ষ পরীক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এভাবে 'আগমার্ক' শব্দটি উৎকর্ষের নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করে। নিম্নরযোগ্য খুচরো দোকানগুলিকে 'আগমার্ক' জিনিস বিক্রি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং এগুলিকে আগমার্ক-বিপণি নামে অভিহিত করা হচ্ছে। কলিকাতায় এরকম তিনটি এবং জেলাগুলিতে ১৬টি বিপণি আছে।

৬ই মে কলিকাতার বড়তলা অঞ্চলে কৃষিমন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ চতুর্থ আগমার্ক-বিপণির উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষে ভাষণে তিনি ঘি, সরষের তেল, আটা, মাখন প্রভৃতি শ্রেণীবিন্যাসিত দ্রব্যাদির উৎপাদন-বৃদ্ধির এবং বহুসংখ্যক আগমার্ক-বিপণির মারফত ক্রেতাদের মধ্যে সেসব বস্তুনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন। তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, শ্রেণীবিন্যাসিত দ্রব্যসমূহের নির্মাতা ও বিক্রেতারা বাজার থেকে অ-শ্রেণীবিন্যাসিত দ্রব্যাদি নিশ্চিহ্ন করার কাজে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং কালক্রমে কলিকাতা নগরী ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশ এরকম বহুসংখ্যক শ্রেণীবিন্যাসিত দ্রব্যাদির খুচরো দোকানের দ্বারা উপকৃত হবে।

বন্যাপীড়িত অঞ্চলে রাজস্ব আদায় স্থগিত

বন্যাপীড়িত অঞ্চলের প্রজা ও প্রান্তর মধ্যস্বত্বাধিকারীদের কাছ থেকে সরকার কর্তৃক খাজনা ও অন্যান্য প্রাপ্য আদায় সম্পর্কে সাধারণ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

গত বৎসর অস্বাভাবিক বর্ষাভ্রান্তের দরুন সংঘটিত বন্যার কথা বিবেচনায় এই মর্মে আদেশ জারি করা হয়েছে যে, পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্যাপীড়িত অঞ্চলের প্রজাদের উপর যেন তাঁদের দেয় রাজস্ব প্রদানের জন্য চাপ না দেওয়া হয় এবং যে-পরিমাণ রাজস্ব স্বেচ্ছায় প্রদত্ত হবে, আদায়কারী কর্মচারীরা কেবল তাহাই যেন গ্রহণ করেন।

বন্যাপীড়িত অঞ্চলের সকল মধ্যস্বত্বাধিকারী, রায়ত ও উপ-রায়তদের কাছ থেকে রাজস্ব বা খাজনা, সেস, কৃষিক্ষণ, কৃষি-আয়কর প্রভৃতি প্রাপ্য আদায়ের জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট জারি যাতে স্থগিত রাখা হয় তার জন্যও সরকার সকল আধিকারিককে নির্দেশ দিয়েছেন।

আলোচ্য এলাকায় প্রাপ্তন মধ্যস্বত্বাধিকারীদের যেসব বকেয়া খাজনা ও সেস জমিদারি গ্রহণ আইনের ৯নং ধারা অনুসারে সরকারের উপর আদায়ের ভার দেওয়া হয়েছে, সেইসব ক্ষেত্রেও সার্টিফিকেট স্থগিত রাখার জন্য অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে প্রাপ্তন মধ্যস্বত্বাধিকারীদের বকেয়া আদায় বাতিল হওয়া নিরোধের জন্য সার্টিফিকেট দাখিল করা প্রয়োজন হ'তে পারে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট এলাকায় নতুন তথ্য পুরাতন সার্টিফিকেট জারি করার ব্যাপারে আর অগ্রসর না হ'তে সার্টিফিকেট-আধিকারিকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তবে সরকার ক্ষমতা থাকলে প্রজাদের বকেয়া পরিশোধ করতে পরামর্শ দিচ্ছেন। কেননা, বকেয়া জমে গেলে ভবিষ্যতে তা তাঁদের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে পড়বে।

দুর্গতিগ্রাণে ৭৮ লক্ষ টাকার অধিক বরাদ্দ

চলতি আর্থিক বর্ষে ১৯৫৭ সালের ১২ই মে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ-সরকার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় দুর্গতি গ্রাণের জন্য ৭৮ লক্ষ টাকার অধিক মঞ্জুর করেছেন। গৃহনির্মাণ অনুদান, স্বেচ্ছামূলক গ্রাণ, শ্রমবিনিময়ী সাহায্য প্রভৃতি বিভিন্ন খাতে এই অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। এর মধ্যে শ্রমবিনিময়ী সাহায্য বাবত মঞ্জুর-করা অর্থের পরিমাণ ছিল প্রায় ২২ লক্ষ টাকা, গৃহনির্মাণ ঋণ বাবত প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা এবং কৃষিক্ষণ বাবত প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা। আলোচ্য সময়ে নিজের বাড়ি নিজে তৈরি করার

পরিকল্পনা অনুসারে ৭৭,০০০ টাকা মূল্যের মালমশলা বিতরণ করা হয়েছে।

নিজের বাড়ি নিজে তৈরি

২৪এ এপ্রিল মর্শিদাবাদ জেলার ভালুইপাড়ায় নিজের বাড়ি নিজে তৈরি করার পরিকল্পনা অনুসারে ত্রিশটি বাড়ি তৈয়ারি আরম্ভ হয়। ভিত্তিস্থাপন-অনুষ্ঠানে বহু বন্যাপীড়িত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

কান্দির মহকুমা-শাসক শ্রী কে পি ঘোষ এবং মর্শিদাবাদের জেলা উন্নয়ন আধিকারিক এই পরিকল্পনায় যোগদানকারীদের উৎসাহ দেন এবং গ্রামাঞ্চলে গৃহসমস্যার সমাধানে ও গ্রামবাসীদের কর্মসংস্থানে এই পরিকল্পনার উপকারিতা জনগণকে বুঝিয়ে বলেন।

এই উপলক্ষে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে মহকুমাশাসক প্রথম গৃহটির ভিত্তিস্থাপন করলে গ্রাম-পুনর্গঠনের সহ-বাস্তুকার ও সরকারী রাজ-মিস্ত্রীদের তত্ত্বাবধানে পরিকল্পনায় যোগদানকারীরা নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন।

তরুণবিনাশের নিরোধ

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার সম্প্রতি সকল জেলাশাসক ও অন্যান্য আধিকারিকদের এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, একান্ত অপরিহার্য না হ'লে কোন সরকারী জমির গাছপালা যাতে কাটা না হয় সেদিকে যেন তাঁরা লক্ষ্য রাখেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গাছপালা কেটে ফেলা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর উদ্বেগের ফলেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গাছ কেটে তরুশ্রেণীশোভিত একটি সুন্দর রাজপথকে শ্রীহীন ক'রে ফেলার এক ঘটনা সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর গোচরে আনা হয়েছে। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে বিশেষ গুরুত্ব-আরোপণ ক'রে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, জাতির পক্ষে গাছপালা অতি মূল্যবান এবং গাছ কেটে ফেলা খুবই সহজ বটে, কিন্তু তা জন্মতে এক পুরুষ লাগে।

সম্পাদক : শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা।

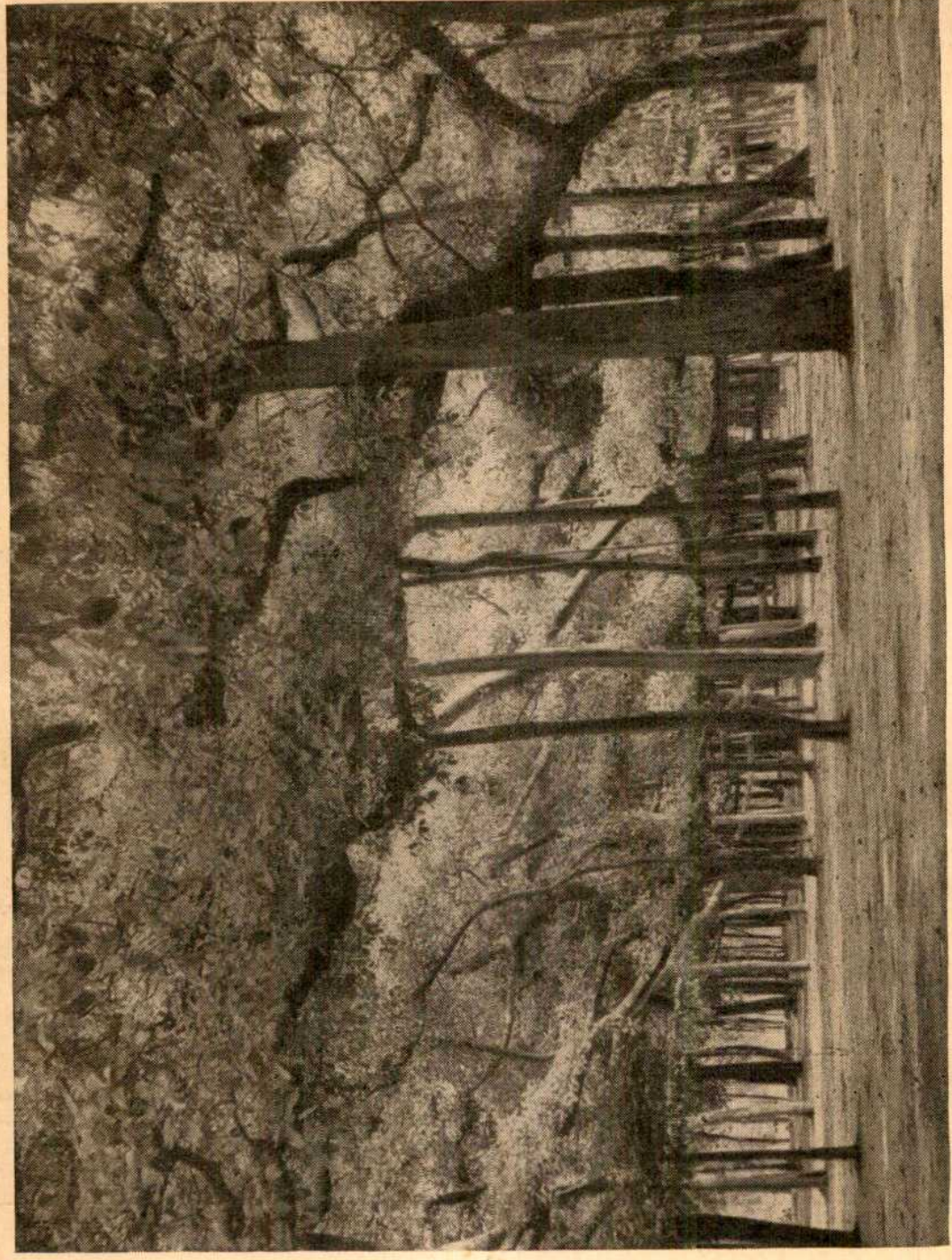
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মন্ত্রণে

অধীকক শ্রীশ্রীশ্রী মনোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত



জামরুল সুপরিচিত ফল। এর গাছ আমাদের পল্লী-অঞ্চলের প্রত্যেক বাড়িতে, প্রতিটি বাগানে থাকা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গায়, সকল রকম মাটিতেই এ গাছ জন্মায়, তবে দোআঁশ মাটিতেই ভাল হয়। চারার চাইতে কলম লাগিয়ে গাছ করাই ভাল। এ গাছ বাড়ে তাড়াতাড়ি। জামরুলগাছে ফলের শোভা ফুলের শোভার মতই মনোরম।

বঙ্গবন্ধু : ১০ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা



শিবপুরে ভারতীয় উদ্ভিদ-উদ্যানের বনশ্রী বাটগাছ

বনুষ্করা

১০ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা
[বনমহোৎসব সংখ্যা]

আষাঢ়, ১৩৬৪

প্রসঙ্গ

গাছের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নির্বিড়। গাছ ফল দিয়ে আমাদের পুষ্টি যোগায়, ফুল দিয়ে আমাদের পরিবেশকে মনোরম করে, কাঠ দিয়ে উপকার করে। গাছ ভূমিকে সরস করে, উর্বর করে, তার ক্ষয়-নিরোধ করে। গাছ বৃষ্টি-আকর্ষণ করে, বাতাসকে শোধন করে। আরও কতভাবে যে গাছ আমাদের উপকার করে, তা বলে যেন শেষ করা যায় না।

অথচ গাছের এসব উপকারিতার কথা বদ্বতে না পেয়ে মানুষ নির্বিচারে নির্মম হাতে গাছ কেটে কেটে বনের উচ্ছেদ করেছে, নিজের জমির কি বাগানের পুরানো গাছ কেটে ফেলে তার পরিবর্তে নতুন গাছ লাগাতে পর্যন্ত তার উদাসীনতার অন্ত নেই। এর ফলে এখন দেশ জুড়ে জেগে উঠেছে রুদ্ধতা, কত জায়গায় খোয়াই ধরে বিরাট এলাকার চাষের জমি বন্ধ্যা হয়ে পড়েছে, কোথাও বা মরু আসছে এগিয়ে, কত পাহাড়ী ঢালু জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ধ্বস নেমে।

এই ভুলের সংশোধনের জন্যই দেশ জুড়ে বন-মহোৎসবের অনুষ্ঠান, এর কৃত্য হচ্ছে বৃক্ষরোপণ, এর ব্রত হচ্ছে গাছকে সযত্নে লালন করে বাঁচিয়ে রাখা আর বাড়িয়ে তোলা। কোন দেশে মোট যত স্থলভূমি আছে, তার অন্তত চার ভাগের এক ভাগ জমিতে গাছ থাকা নিত্যন্ত প্রয়োজন; অথচ আমাদের পশ্চিমবঙ্গে গাছ আছে মাত্র আট ভাগের এক ভাগের কিছ্ বেশি জমিতে। তাড়াতাড়ি গাছ

লাগিয়ে এ রাজ্যের অন্তত এক-চতুর্থাংশ জমি আমাদের ভরিয়ে তুলতেই হবে।

বনমহোৎসবের এবার অষ্টম বর্ষ। এ উৎসব উপলক্ষে বিগত সাত বছরে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দুই কোটির মত গাছ লাগানো হয়েছে। তার মধ্যে শতকরা প্রায় ৫০টি গাছ বেঁচে আছে এবং ফুলে ফলে ছায়ায় সৌন্দর্যে বনমহোৎসবের সাফল্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

বনমহোৎসব-অনুষ্ঠানে অন্যান্য বারের মত আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় ভাল কাঠ, জ্বালানি কাঠ এবং ফলের গাছ লাগানোর উপর অবশ্যই জোর দিতে হবে। সেইসঙ্গেই বিশেষ করে শহর, গ্রাম, রাস্তা, বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতির সৌন্দর্য-সৃষ্টির জন্য বিশেষ রকমের ফুলের গাছ এবং অন্যান্য শোভাকর গাছ লাগাবার দিকেও আমাদের নজর দেওয়া দরকার। আমাদের দেশের অধিকাংশ শহর এবং গ্রাম অত্যন্ত অসুন্দর এবং বৈচিত্র্যহীন। অথচ অল্প যত্নে বড় হয়ে ওঠে এ রকম ফুলগাছের অভাব আমাদের মোটেই নেই। কৃষ্ণাচুড়া, কাগুন, পলাশ, অশোক, স্প্যাথোডিয়া ও শিমুলের গাছ লাল রঙের পদুমসম্ভার, পীত বর্ণের সোনালু বা সৌদাল, রাধাচুড়া, আকাশমণি, মিজিরী ফুল, নানা রঙের ক্যাসিয়া, জারুল, ঘোড়ানিম প্রভৃতি দেশের সৌন্দর্যসৃষ্টির পক্ষে পরম সম্পদ। বন-বিভাগ থেকে এসব গাছের চারা যথেষ্ট সংখ্যায়



কৃষ্ণচূড়া

দেওয়া হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের শহর আর গ্রাম তরুণীমণ্ডিত হবে—এই আমাদের আশা।

বনমহোৎসবের আরম্ভ থেকে প্রতি বছর নানা রকম গাছের ভাল বীজ, চারা, কলম প্রভৃতি ঝুগিয়ে বনস্থাপনে জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য সরকার এবারও প্রস্তুত হয়েছেন—আর-সব বছরেরই মত [পরিশিষ্ট দেখুন]। বৃক্ষরোপণের এই উৎসব যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে সেজন্য সরকার থেকে নানা পর্যায়ে নানা রকম পুরস্কার দেওয়ারও ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু জনসাধারণ বনগঠনে তাঁদের নিজেদের দিকের কতব্যটা স্বেচ্ছাভাবে পালন করলে, তাঁদের এবং সেই সঙ্গে সারা দেশের যে কল্যাণ সাধিত হবে, তার চেয়ে বড় পুরস্কার কম্পনাতীত।

গাছ লাগাবার মোটামুটি নিয়মগুলো সকলের জানা দরকার। সংক্ষেপে সেগুলো এখানে বলা হ'লঃ

চারা লাগাবার জমি তৈরি

প্রায় সব রকম জায়গাতেই চারা লাগানো যেতে পারে। রাস্তার ধরে, জলার পাড়ে, বাড়ির সীমানায়, খোলা জমিতে—সব জায়গাতেই চারা লাগানো চলে। তবে, লাগাবার পরেই যেটা প্রয়োজন, সেটা হ'ল—ছাগল-গোরুর মূখ থেকে চারাগুলোকে বাঁচানো। বেড়া দিয়ে ঘিরে না রাখলে গাছ বাঁচানো শক্ত। বাঁশ, ইট, কাঁটাতার বা বোনা-তার—এসব না পেলে কুলকাঁটা, বাবলাকাঁটা, মাদারকাঁটা, কেয়াগাছ (বালিয়াড়িতে) প্রভৃতি দিয়েও বেড়া দেওয়া যেতে পারে, যখন এবং যেখানে যেমন সুবিধা। জমি যদি লম্বা হয় আর চওড়ায় কম হয়, তা হ'লে তাতে সোজা সারি ধরে বারো ফুট অন্তর গাছ লাগানো যেতে পারে। জায়গা লম্বা-চওড়ায় বেশি থাকলে ৯ ফুট অন্তর লাগানোই ভাল; এক সারি থেকে অপর সারির ব্যবধানও থাকবে ৯ ফুট। চারার জন্য দরকার এক ফুট আন্দাজ গভীর গর্ত, তার ব্যাসও হবে এক ফুট। চারা আকারে বড় হ'লে গর্তও সেই অনুপাতে বড় করতে হবে। মাটি ভাল ক'রে শুকিয়ে ঝরুরো ক'রে তা দিয়ে আবার গর্ত ভরে ফেলতে হবে। যেখানে জমির জোর কম সেখানে সার (যথা গোবর) মেশাতে হবে।

লাগাবার আগে চারার যত্ন

গাছের চারা ৬ ইঞ্চি থেকে ২ ফুট পর্যন্ত লম্বা হ'তে পারে। ওগুলো পাঠানো হবে শিকড় মাটি দিয়ে ঢেকে, ঝুড়িতে ক'রে বা চটে মুড়ে। লক্ষ্য রাখবেন যেন মাটি সব সময় ভিজ থাকে এবং পুঁতবার আগে পর্যন্ত চারাগুলো যেন ছায়ায় থাকে। শুকিয়ে যেতে দেখলে জল দিতে হবে—গাছে এবং শিকড়ের মাটিতে। তারপর মাটিগুলো জলে



ভূবিয়ে ছাড়িয়ে ফেলতে হবে—সময়ে চারা থেকে আলাদা করে। একেবারে সব মাটি পরিষ্কার করার দরকার নেই। শিকড় যেন জখম না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে।

চারা বসানো

মেঘলা দিনে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্তই চারা লাগানো যেতে পারে। সাধারণ দিনে বিকেলের দিকেই লাগানো ভাল—ধরুন, তিনটের পর। মাটি দেবার সময় দেখতে হবে যেন শিকড়গুলো ছাড়িয়ে থাকে এবং মূল শিকড়টি ভাঁজ না হয় আর চারার ঠিক গোড়া পর্যন্ত যেন মাটির নিচে থাকে। তারপর

মাটি দিয়ে গর্তটি শক্ত করে বৃজিয়ে দিতে হবে এবং জল দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। ছোট ঝাঁকড়া-শিকড়ওয়ালা চারা সোজাসুজি পুঁতলেই হবে। যেসব চারা বেশি লম্বা, সেগুলো কেটে পোঁতা চলে। ধারালো ছুরি দিয়ে শিকড়ের উপরে কাণ্ডের ১ ইঞ্চি রেখে এবং শিকড়ের ৯ ইঞ্চি রেখে তেরটা করে কেটে নিয়ে পুঁততে হয়। মূল শিকড় রেখে অন্যান্য শিকড়ও কেটে ফেলা চলতে পারে। এভাবে শিশু, সেগুন, শিমূল, শিরীষ, মেহগনি, জারুল, চাঁপা, টুন, গামারী প্রভৃতি গাছ সুন্দরভাবে লাগানো যায়।

গাছের স্বত্ব

গাছ পদ্ধতে বেশ-কিছুদিন নিয়মিত জল দেওয়া দরকার। পরে যেমন যেমন দরকার তেমন জল দিলেই হবে। তা ছাড়া, দু'-তিন বছর এগুলোকে আগাছা নিড়িয়ে ভালভাবে বেড়ে উঠতে দিতে হবে।

জমি হিসেবে গাছ নির্বাচন

সেগুন, শিশু, শিমূল, মেহগনি, গামারী ও জারুল গাছ দার্জিলিংয়ের উঁচু পাহাড়ী এলাকা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত অঞ্চলেরই উপযোগী। সেগুন ও গামারী গাছের জন্য উঁচু জমি—যেখানে জল দাঁড়ায় না—সবচেয়ে ভাল। শিশু ও গামারী গাছ শুকনো আবহাওয়া ও শুকনো জমি বেশ বরদাস্ত করতে পারে। মেহগনি ও জারুল ভিজ়ে মাটিতে চলতে পারে।

চাঁপাগাছ বেশি দেখা যায় বাঙলার উত্তর অঞ্চলে। এ গাছ দেখতে খুব সুন্দর এবং এতে চমৎকার ফুলও ফোটে। এর কাঠ আসবাব তৈরির পক্ষে চমৎকার। বাড়ির চারপাশে এগুলো লাগানো যেতে পারে।

যে জমিতে জল দাঁড়ায়, হিজল সেখানে বেশ হয়। মিঞ্জরী, শিরীষ, রাধাচূড়া, অর্জুন, বাবলা, খয়ের এবং আকাশমণি গাছ জ্বালানি কাঠের প্রয়োজন মেটাবার জন্য লাগানো যেতে পারে। অর্জুনের ছাল ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। খয়েরগাছের সার থেকে পান সাজার খয়ের তৈরি হয়। যেসব জায়গায় ছায়ার দরকার—যেমন পথের ধারে—সেখানে লাগাবার পক্ষে বর্গবৃক্ষ, মেহগনি, তেঁতুল, নিম, জাম, বট, অশ্বথ প্রভৃতি ভাল। এগুলোর জন্য গভীর এবং আলগা মাটিওয়ালা জমির প্রয়োজন। নদীর ধারে বা পুকুরের পাড়ে জন্মানোর উপযোগী গাছ হচ্ছে শিশু, শিমূল, বাবলা ও খয়ের।

ফল ধরে এমন গাছের মধ্যে রাস্তার ধারে লাগানো যেতে পারে আম, তেঁতুল, কাঁঠাল, কালোজাম ইত্যাদি।

কাজুবাদাম বিশেষ করে শুকনো আবহাওয়ায় জন্মায়, এবং পশ্চিম বাঙলার অনেক জেলাতেই লাগানো চলতে পারে।

যেখানে মাটিতে বালির ভাগ বেশি—যেমন সমুদ্র-তীরে—সেখানে ঝাউগাছ জন্মায়। এ রকম মাটিতে—যদি বাতাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে পারে তা হ'লে—কাজুবাদাম ও আকাশমণি খুব ভাল জন্মাতে পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, কাজুবাদামের গাছ ঝড় সহ্য করতে পারে না।

বাড়ির আশেপাশে, পথের ধারে বা বাগানের শোভা বর্ধনের জন্য কৃষ্ণচূড়া, অশোক, বকুল, ক্যাসিয়া, গ্লিরিসিডা, রডোডেনড্রন, মহুয়া, কাগুন, পলাশ, জ্যাকারান্ডা, জারুল, ঘোড়ানিম, স্প্যাথোডিয়া প্রভৃতি খুবই উপযোগী।

পশ্চিম বাঙলার মাটিতে আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা, আতা, নোনা, সপেটা, বেল, গোলাপজাম, জামরুল, কুল, পেঁপে, পাতিলেবু, কাগজিলেবু, বাতাবিলেবু, নারকেল, সুপারি প্রভৃতি নানা রকমের ফলের গাছ জন্মায়। এখানে এমন কতকগুলো গাছের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'ল।

গাছ লাগানোর পরে

গাছ লাগানোর চেষ্টেও বড় কথা হচ্ছে গাছ বাঁচিয়ে রাখা। গাছ লাগানোর পরে সমস্ত পরিচর্যা তার সংরক্ষণ করতে হবে। গাছের গোড়ায় যাতে চারপাশের চাইতে মাটি উঁচু থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। কারণ, নতুন চারার গোড়ায় জল জমলে তার পক্ষে সেটা খারাপ হয়।

গাছের গোড়ার চারপাশটা যেন আগাছামুক্ত থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। চারাগাছে যেন কোন

গোরু-ছাগল প্রভৃতিতে মুখ না দেয় তারও ব্যবস্থার জন্য চারাটিকে ঘেরাটোপ দিয়ে বা কাঁটাগাছের ডাল দিয়ে ঘিরে দেবেন।

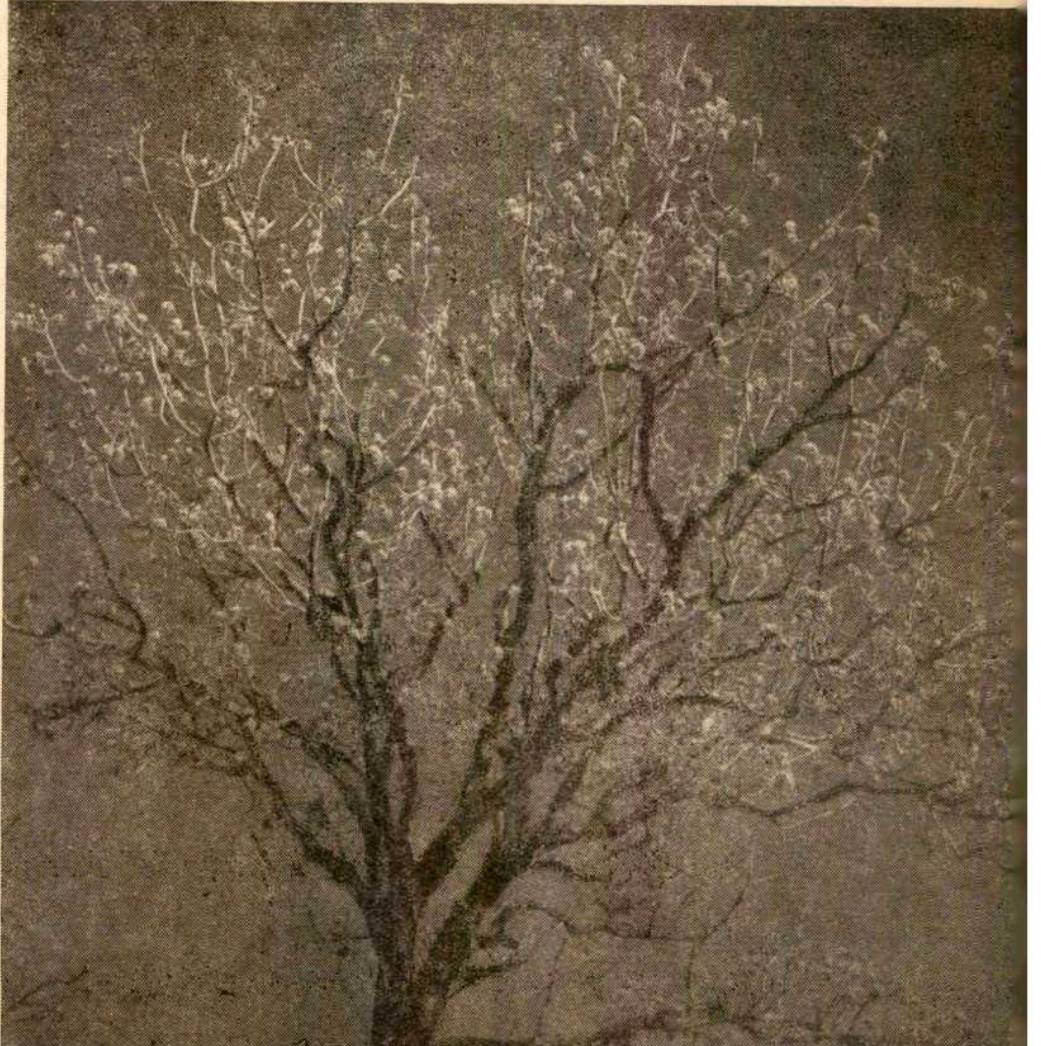
নতুন চারা বসানোর প্রথম কয়েক বছর, চারা মাটিতে ভাল করে না বসা পর্যন্ত, নিয়মিতভাবে প্রয়োজনমত জল দিতে হবে। বর্ষার মূখে চারা বসালে অবশ্য অতিরিক্ত সেচ দেবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যখনই জমিতে রসের অভাব দেখা দেবে, তখনই সেচ দেওয়া দরকার। জল দেবার সময় একেবারেই মাটি যতটা জল বেশ ভালভাবে পুরুপড়ির শূষে নিতে পারে, ততটা জলই দেওয়া দরকার। একবার জল দেবার পর উপরের ২-৩ ইঞ্চি মাটি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আর জল

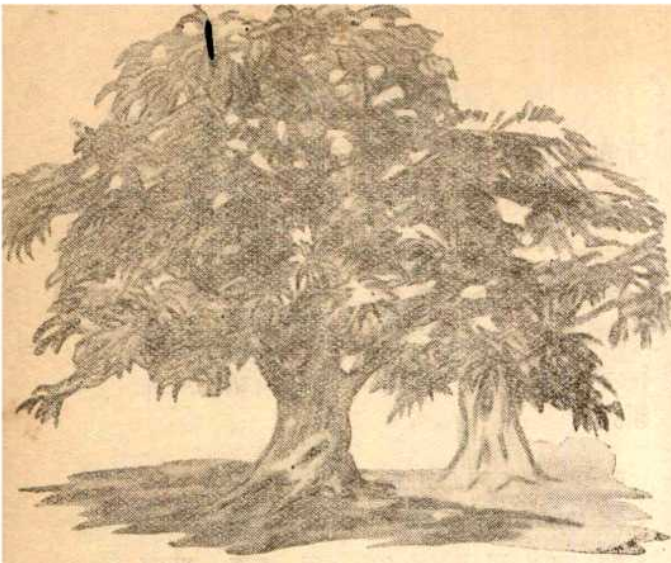
দেওয়া উচিত নয়। মাটি শুকিয়ে উঠলে আবার জল দিতে যেন দেরি না হয়।

দুর্বল, রোগাক্রান্ত গাছে বেশি জল দিলে উপকারের বদলে অপকারই হয়—গাছটা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। একটা সবল গাছে যে-পরিমাণ জল দিতে হয়, এক্ষেত্রে তার থেকে কম জল দেওয়া উচিত।

কলমের জোড়ের নিচে যদি গ্যাজ বা কুণ্ডি হ'তে দেখা যায়, তা হ'লে সেগুলো ছিঁড়ে ফেলতে হবে। এটা না করলে গাছ নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। জোড়ের নিচে থেকে ডাল বেরোলে আপনি যে ধরনের গাছ চাচ্ছেন, তা পাবেন না।

ফুলে ভরা
মহুয়াগাছ





আমগাছ

আম ভারতের নিজস্ব সম্পদ এবং ফলের রাজা। সুপ্রাচীন কাল থেকে আম এদেশের ফলরাজ্যের সিংহাসন অধিকার করে বসে আছে। প্রাচীন-কালের ইতিহাসে, সংস্কৃত সাহিত্যে, বিদেশী পরিব্রাজকদের ভারতভ্রমণের কাহিনীতে আমের প্রাধান্য বর্ণিত আছে।

স্বাদে গন্ধে গুণে শীর্ষস্থানীয় এই ফলের সমাদরও ভারতের ঘরে ঘরে। দেশের বাগানে বাগানে, পথের ধারে, গ্রামবাসীদের বাড়ির আনাচে-কানাচে—সব জায়গায় আমগাছ এই সৌন্দর্য পর্ষন্তও দেখা যেত। কিন্তু ইদানীং কী যে স্বার্থবুদ্ধি মানুষকে পেয়ে বসেছে, তারা মোটা টাকার লোভে পিতৃপিতামহের আমলের পুরানো গাছটি কেটে ফেলতে যত উৎসাহী, তার জায়গায় নতুন একটি আমগাছ লাগাতে তত উদাসীন। ফলে আমের দেশে আমগাছ দিনে দিনে বিরল হয়ে আসছে।

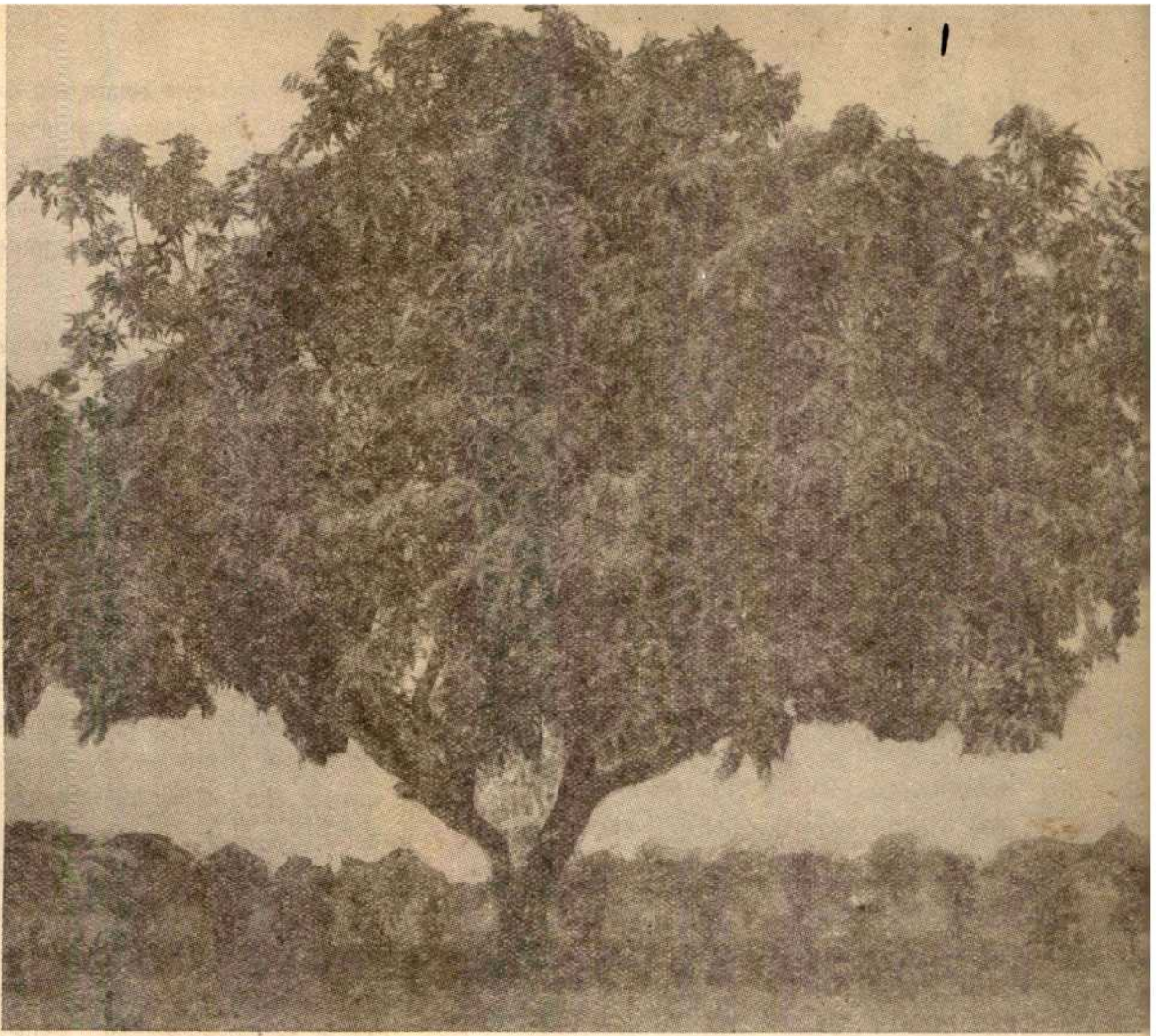
আমগাছ প্রায় সব রকমের মাটি আর জলবায়ু সহ্য করতে পারে। তাই পাজ্রাব থেকে আসাম পর্যন্ত এবং মাদ্রাজের সমুদ্রতীর থেকে রাজপুতানার মরুভূমির সীমা পর্যন্ত আমগাছ হতে দেখা যায়। সমুদ্রসমতল থেকে পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে হিমালয়ের উপত্যকায় পর্যন্ত আমগাছ জন্মায়। তবে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে ভাদ্র-আশ্বিন মাস

পর্যন্ত যেখানে ভাল বৃষ্টি (বছরে ৫০ থেকে ১০০ ইঞ্চি) হয়, সেখানে খুব ভাল হয় আমগাছ আর সেসব গাছে ফলনও ভাল হয়। পশ্চিম বাঙলায় গঙ্গানদীর কাছাকাছি এলাকার গভীর পলি-মাটি এবং যে-কোন জায়গায় দোআঁশ মাটি আম-গাছের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী।

আমগাছ সাধারণত আঁটি থেকে হয়, তা ছাড়া কলম লাগিয়েও করা যায়। ভাল জাতের আমের গুণ সঠিক বজায় রাখতে হলে আমগাছ আঁটি থেকে না করে জোড়কলম করে জন্মানোই উচিত। বাগান করতে হলে ৩০ থেকে ৪০ ফুট অন্তর ৩ ফুট লম্বা, ৩ ফুট চওড়া আর ৩ ফুট গভীর গর্ত করে তাতে আধমণ আন্দাজ গোবরসার, ২ সের হাড়ের গুঁড়ো, কিছু কাঠের ছাই এবং উইএর উৎপাত থাকলে কিছু নিমের খইল মাটির সংগে ভাল করে মিশিয়ে, তা দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে সেই গর্তে কলম রোপণ করতে হবে। গাছ একটু বড় হয়ে না ওঠা পর্যন্ত বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা দরকার। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে মাটি শুকিয়ে গেলে চারাগাছের গোড়ায় জল দিতে হয়।

বসন্তকালে আমগাছে ফুল হয়। শাখার ডগায় পত্রগুচ্ছের কেন্দ্রস্থল থেকে ডাঁটি বেরোয়, তার গায়ে চুড়োর আকারে অজস্র ফুল ফোটে—যাকে বলা হয় আমের মুকুল বা মউল। ফুলের আকার খুবই ছোট—এক ইঞ্চির ছ' ভাগের এক ভাগ হবে। ফুলের রঙ সাদা অথবা সবজেটে হলদে। ফুলের পাপাড়ি হয় পাঁচটি, কোন কোন জাতের ফুলের পাপাড়িতে কমলারঙের সরু সরু রেখা থাকে। আমের মুকুল যখন প্রথম ফোটে তখন তার গন্ধটা মন মাতিয়ে তোলে। মধুর লোভে নানা রকমের মৌপোকা এসে ভিড় জমায়, গুঞ্জন করে।

ফুল ফোটার মাস-তিনেক পরে ফল পাকে। কত রকমের আম যে এদেশে আছে তা গুনে শেষ করা যায় না, সঠিক কেউ বলতেও পারবে না। জলদি, মধ্যম আর নাবি—এই তিন জাতের আম আছে। পশ্চিমবঙ্গে জলদি জাতের মধ্যে গোলাপখাস ও



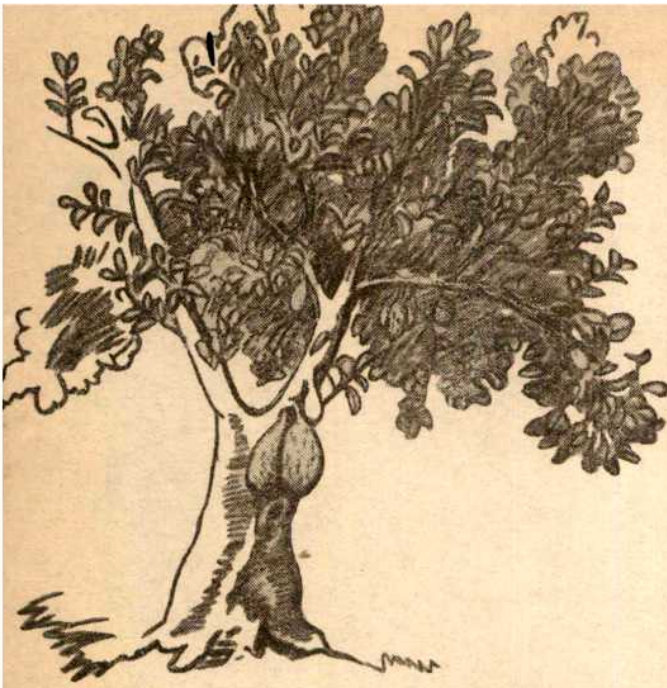
আমগাছ

মুর্শিদাবাদের সফদারপসন্দ, মধ্যম জাতের মধ্যে বোম্বাই, ক্ষীরসাপাত, গোপালভোগ, হিমসাগর, কালাপাহাড়, ল্যাংড়া ইত্যাদি এবং নারি জাতের মধ্যে ফজলি আম বিখ্যাত। বাজারে যখন আম সাধারণত শেষ হয়ে যায়, তখন ফজলি আম পাকে। এ আম আকারে বেশ বড় হয় আর স্বাদে চমৎকার। ফজলি আম পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ করে মালদহ জেলার, নিজস্ব সম্পদ।

আমে এক রকমের পোকা হয়—তারা লাফিয়ে চলে। তারা আমের ফুলের মধ্যে ডিম পাড়ে। ফুল থেকে ফল হতে শুরুর করার সময়ের মধ্যে ডিম

ফুটে বাচ্চা হয় এবং অদৃশ্যভাবে পোকাগুলি আমের ভিতর আস্তানা নেয়। তারা ফলের রস শুষে খায়, তাতে কচি আম ঝরে পড়ে। এক রকম ঘন ধরনের পোকাও হয়। কীটনাশক ওষুধ ছিটিয়ে এগুলোর দমন করা যায়। এ ছাড়া আমে এক রকমের মাছি লাগে, তাদের আক্রমণে আমে কালো দাগ ধরে। বাগান ও গাছ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলে, গাছের গোড়ায় পড়া পাতা, আম, আঁটি প্রভৃতি সরিয়ে ফেললে মাছির উপদ্রব হয় না।

উদ্ভিদবিজ্ঞানে আমের নাম “ম্যাংগিফেরা ইন্ডিকা” [Mangifera Indica]।



কাঁঠাল

পৃথিবীতে যত রকমের সুস্বাদু ফল আছে তার মধ্যে কাঁঠালের আকারই বোধহয় সবচেয়ে বড়। কোন কোন কাঁঠাল ওজনে এক মণ বা তার বেশিও হয়। গাছে এই ফল ধরার ধরন বিচিত্র। ছোট গাছে অবশ্য কাঁঠাল সাধারণত ডালেই হয়, কিন্তু বয়সের গাছের ডাল, কাণ্ড, এমন কি মাটির উপরে ওঠা শিকড় ফুঁড়েও ফল বেরোয়। শিকড় থেকে বা কাণ্ডের একেবারে নিচের দিক থেকে যেসব ফল বেরোয়, সেগুলোর বড় হবার জন্য মাটি খুঁড়ে জায়গা করে দিতে হয়।

কাঁঠালও ভারতেরই ফল। ভারতের সমস্ত গরম এলাকায় কাঁঠালগাছ জন্মায়। সাধারণত আম প্রভৃতি গাছের মত কাঁঠালগাছেরও চাষ করা হয়; তবে বিনা চাষও বনের মধ্যে কাঁঠালগাছ হতে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালের ফলের মধ্যে এদেশে আমের পরেই কাঁঠালের স্থান। আম-কাঁঠাল একই স্তরে উচ্চারিত হয়। এ ফলের সর্বাঙ্গে অজস্র কাঁটা—তা থেকে ভাল কথায় এর নাম কণ্টকীফল আর চলতি কথা ‘কাঁটাল’ বা ‘কাঁঠাল’।

ফল হিসাবে পাকা কাঁঠালের কোয়াগুলোর রস খাওয়া হয়। আবার কাঁচা কাঁঠাল বা এঁচোড় তরকারি হিসাবে অতি উপাদেয় এবং পুষ্টিকর। পাকা কাঁঠালের আঁঠিগুলি বালিতে ভেজে নিলে, খেতে বাদামের মত সুস্বাদু। তরকারি হিসাবেও কাঁঠালের আঁঠি স্বাদু এবং সুপ্রচলিত।

কাঠ হিসাবে মেহগনির মত কাঁঠালকাঠ দিয়েও উচ্চাঙ্গের আসবাব তৈরি হয়। কাঁঠালের সারকাঠের রঙ গাঢ় সোনালী। এ কাঠে অতি পরিপাটি মসৃণ কাজ হয়। কাঠ বেশ শক্ত আর টেকসই; বাজারে এর কদর খুব, তাই দরও চড়া। কাঁঠালগাছের পাতা গোরু-ছাগলের খাদ্য হিসাবে অতি পুষ্টিকর।

সাধারণত কাঁঠালের আঁঠি রোপণ করেই গাছ তোলা হয়। চারাতলায় বীজ লাগিয়ে চারা তৈরি করে সেই চারা নিয়ে আসল জায়গায় লাগালেও ভাল গাছ হয়। কোন বিশেষ ধরনের কাঁঠালের সকল গুণ অক্ষুণ্ন রাখতে হলে, তার গাছে গুটি-কলম করে, সেই কলম লাগিয়ে গাছ তোলাই ভাল। বাগানে ৩০ ফুট অন্তর গাছ লাগানো উচিত। চারা বা কলম লাগাবার পর পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে গাছে ফল হতে শুরু করে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ফল পাকে। গাছ বড়ো হলে স্বভাবতই তার বল কমে আসে, কিন্তু এ সময়ে কাঁঠালগাছের অবাস্তিত ডালপালা ছাটাই করে দিলে গাছ তেজী হ’লে ওঠে।

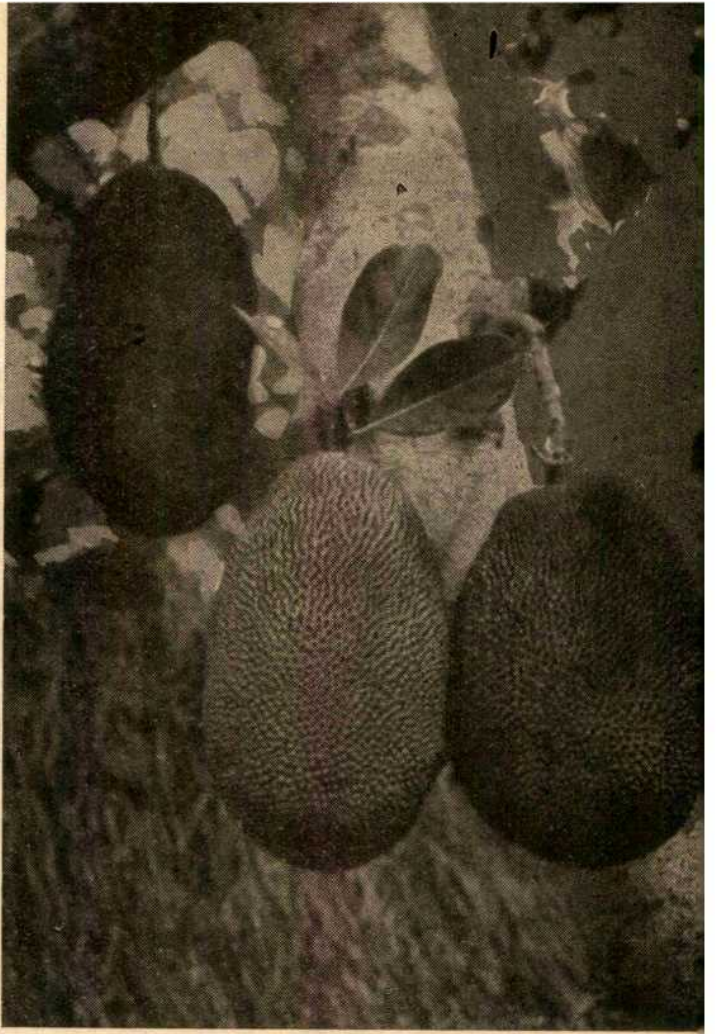
এ গাছ বেশ তাড়াতাড়ি বাড়ে। ছাটাই করে নতুনভাবে তেজী করে করে এর বয়স যত বাড়ানো যায়, কাঠ ততই সার বাঁধে আর মূল্যবান হয়ে ওঠে। কাঁঠালকাঠ চেরাই করার সময় যে করাতী গুঁড়ো পড়ে, তা জলে সিঁধ করে উজ্জ্বল হলদে রঙ তৈরি করা যায় এবং তা দিয়ে কাপড়ে পাকা রঙ করা যায়। ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাপড় এই রঙে ছোপানো হয়।

এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় গাছ তৈরি করলে তাতে নারিক এত প্রচুর কাঁঠাল ফলে যে, সে রকম গাছকে

বলা হয় হাজারি কাঁঠালগাছ। খোলা দোআঁশ জমিতে ৪×৪×৪ হাত গর্ত খুঁড়ে, কিছু চুন, এক মণ গোবরসার ও পুকুরের তলার পাক মিশিয়ে মাটিটাকে তৈরি করে রাখতে হবে গ্রীষ্মকালে—বীজ বসাবার অন্তত মাসখানেক আগে।

বর্ষাকালে বীজ বসাবার কয়েক দিন আগে সেই জায়গাটার মাঝখানে ২×২ হাত চওড়া এবং ৩ হাত গভীর গর্ত করে কিছু পাতাপচা সার ও নারকেল-ছোবড়ার গুঁড়ো মিশিয়ে মাটিটাকে আবার তৈরি করে ঢেকে রাখতে হবে।

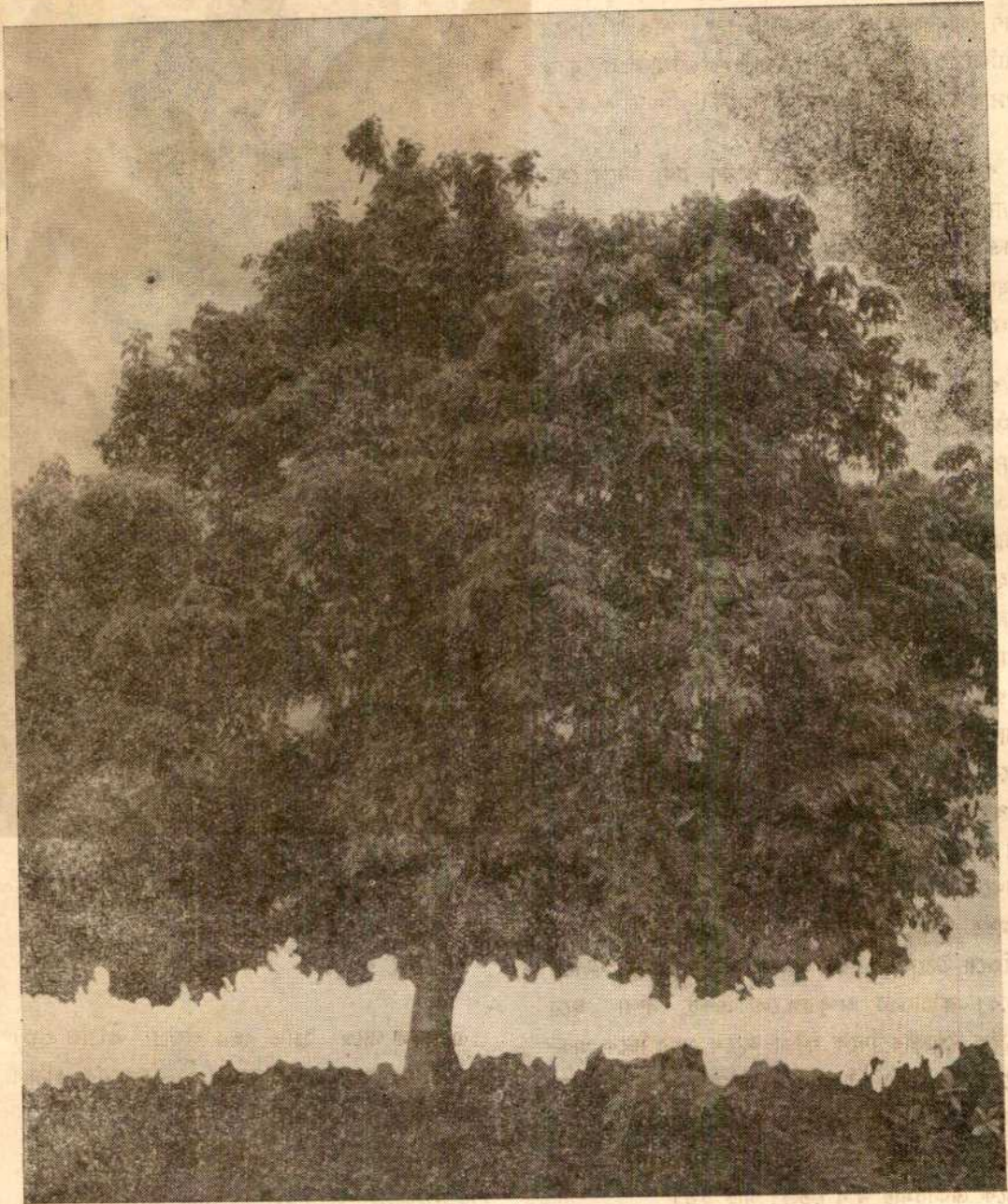
গাছে বীজের জন্য বাছাই-করা কাঁঠালটি পেকে উঠলে তা পেড়ে এনে ঘরে শিকয়ে ঝুলিয়ে তিন-চার দিন রাখলে বেশ নরম হয়ে যাবে। তখন ধারালো ছুরির আগা দিয়ে বোঁটার চার ধার এমনভাবে চিরতে হবে যেন বোঁটা ধরে টান দিলে ভুঁতি সহজে বেরিয়ে আসে অথচ কাঁঠালটির কোন জায়গা ফেটে না যায়। ভিতরকার খালি জায়গা কয়েকটা আম দিয়ে ভরাট করে দিলেই চলে। তারপরে গাছ করার গর্তের উপরের ঢাকা সরিয়ে, মাঝখানটাতে আন্দাজমত আয়তনের গর্ত খুঁড়ে, কাঁঠালটি তার মধ্যে উপরমুখ করে বসিয়ে, খড়চাপা দিয়ে, তার উপর গর্ত-খোঁড়া মাটি দিয়ে চাপা দিতে হবে। বৃষ্টি না হলে সকাল-সন্ধ্যায় জল ছিটিয়ে মাটি ভিজিয়ে রাখতে হবে। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই কাঁঠালের সমস্ত আঁঠি ও আমের আঁঠিগুলো থেকে অঙ্কুর গজিয়ে উঠবে। তখন আমগুলি বের করে ফেলতে হবে। কাঁঠালের অঙ্কুরগুলো একটু লম্বা হয়ে উঠলে, গোড়ার দিকে ফাঁকা অংশে সবক'টিকে এক-সঙ্গে খড় দিয়ে জড়িয়ে দড়ি দিয়ে বেশ করে বেঁধে দিতে হবে। এর ফলে চারাগুলির কচি কাণ্ডগুলি মিলে গিয়ে একটিমাত্র কাণ্ডে পরিণত হয় এবং তা থেকে একটিমাত্র খুব তেজী গাছ হয়।



গাছের গুঁড়িতেও কাঁঠাল ধরে

এ রকম গাছে প্রতি বছর অজস্র কাঁঠাল হয়। গাছের যথাযথ পরিচর্যা করলে হাজারখানেক কাঁঠাল ধরাও নাকি বিচিত্র নয়!

উদ্ভিদবিজ্ঞানে কাঁঠালগাছের নাম “আর্টোকার্পাস ইন্টেগ্রিফোলিয়া” [Artocarpus integrifolia]।



লিচুগাছ

লিচুগাছ

লিচু আমের সমসাময়িক ফল। এর আদিনিবাস চীনদেশ; সেখান থেকেই এই ফল ভারতে এসেছে। কিন্তু এখানকার নিজস্ব ফলের মতই লিচু এদেশের এমন আপন হয়ে উঠেছে যে, আমের সঙ্গেই এর নাম করা হয়, আমগাছের সঙ্গেই বাগানে সমান যত্নে লিচুগাছ লাগানো হয়। কিন্তু ইদানীং গাছ কাটার চেয়ে গাছ লাগানোতে আমাদের উৎসাহ ঢের কম বলে দেশে লিচুগাছের সংখ্যাও কমে আসছে।

ভারতে প্রধানত বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিম-বঙ্গে এর চাষ ভাল হয়। বেলে-দোআঁশ মাটিই লিচুগাছের উপযোগী। তাতে এণ্টেলমাটির ভাগটা বেশি থাকলে ভাল হয়। জমিতে জলনিকাশের ভাল ব্যবস্থা থাকা দরকার।

বীজ থেকেও এর গাছ জন্মানো যায়, কিন্তু কলম থেকে, বিশেষ করে গুটিকলম থেকে গাছ করাই ভাল। সার মিশিয়ে গর্তের মাটি আগেই তৈরি করে রাখা দরকার। বর্ষাকালে কলম লাগাতে হয়। বাগান করতে হ'লে ৩০ ফুট অন্তর কলম লাগালে ভাল হয়। চারা অবস্থায় বেড়া লাগিয়ে গাছ রক্ষা করা দরকার। শুখোর সময়ে মাটিতে রস না থাকলে গাছে জল দিতে হয়।

লিচুগাছ খুব দৃঢ়। ফলের খোসার উপরটা কাঁটাকাঁটামত—দেখতে যেন সুপদুরির আকারের কাঁঠাল। ফল লম্বাটে গোল, বোঁটার দিকটা নিচের দিকের চেয়ে মোটা। সাধারণ লিচুর বোঁটার দিকের প্রায় অর্ধেক অংশ লাল হয়। কোন কোন জাতের লিচুর সবটাই লাল। ফল পাকবার সঙ্গে সঙ্গে লাল রঙটা গাঢ় হয়ে ওঠে। ঘনবিন্যস্ত গাঢ় সবুজ পাতা-গুলোর মধ্যে লালরঙের খোলো খোলো লিচু মনোরম সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে। বসন্তকালে গাছে পাতার স্তবকের মাঝখান থেকে ওঠা ডাঁটির

গায়ে চুড়োর আকারে আমের মুকুলের ধরনের অজস্র ফুল হয়, তবে এর ফুল আমের ফুলের চেয়েও ছোট। গ্রীষ্মকালে এর ফল পাকে। সাধারণত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ দুটো মাসই লিচুর সময়।

দেশী, বোম্বাই, মজঃফরপুরী, এলাচি, চীনে প্রভৃতি নানা ধরনের লিচুর চাষ হয় আমাদের দেশে। কোন কোন জাতের গাছে তাড়াতাড়ি ফল ধরে, আবার কোন কোন জাতের গাছে ফলন হয় দেরিতে। মজঃফরপুরী আর বোম্বাই লিচু বেশ বিখ্যাত। চীনে লিচুর গাছে অন্যান্য জাতের তুলনায় ফলন কম হয়, কিন্তু এ লিচুর স্বাদ খুব মিষ্টি। দেশী লিচুর রঙে লালের ভাগ কম, সবুজের ভাগ বেশি; যতই মিষ্টি হোক—এ লিচুতে একটু টক স্বাদ থাকেই এবং মিষ্টির সঙ্গে এই সামান্য টক রসের সমন্বয় এর স্বাদকে বিশিষ্ট করে তোলে।

লিচুগাছের পাতায় 'মাইট' নামক এক রকম পোকের আক্রমণ হয়। তাতে পাতা বাদামী রঙ ধরে, একটু মোটা হয়ে, কুঁকড়ে যায়। সাদা রঙের এই পোকাগুলি এত ক্ষুদ্র যে খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। পাতার নিচে থেকে এরা তার রস শুষে খায়, তাই পাতা শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত পাতাগুলো ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেললে এবং কীটনাশক ওষুধ ছিটালে এদের দমন হয়।

গাছে লিচু যখন পাকে, তখন বাদুড় আর পাখিতে খুব অনিষ্ট করে। দু'-একটা গাছ হ'লে জাল দিয়ে ঢেকে ফল রক্ষা করা যায়; কিন্তু বেশি গাছ থাকলে জালঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। এ রকম ক্ষেত্রে গাছে ক্যানিস্তারার চুনটনি ঝুলিয়ে দিয়ে পাখি ও বাদুড় তাড়াবার ব্যবস্থা করলে অনেকটা উপকার পাওয়া যায়।



পেয়ারা

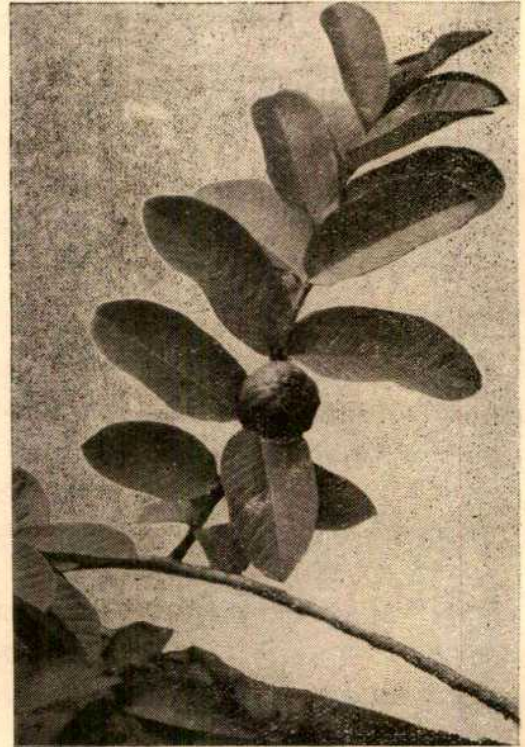
পশ্চিম বাঙলার সাধারণ ফলগুলোর মধ্যে পেয়ারা একটি। কিন্তু সচরাচর এ রাজ্যে যেসব পেয়ারা হয়, সেগুলো উচ্চশ্রেণীর নয়। এখানকার বাজারে ভাল ভাল যেসব পেয়ারা পাওয়া যায়, সেগুলো আসে কাশী আর এলাহাবাদ থেকে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, সযত্নে চাষ করলে এখানেও কাশীর আর এলাহাবাদের পেয়ারা ভালই হয়।

দুঃখের বিষয় এ রাজ্যে পেয়ারার চাষ সযত্নে খুব কম লোকেই করে। অথচ ফল হিসাবে এ একটি উপাদেয় এবং উপকারী ফল। সকলেরই সযত্নে এর চাষ করা উচিত। পেয়ারার আদিভূমি হচ্ছে মধ্য আমেরিকার উষ্ণ অঞ্চল।

পেয়ারাগাছ সহজেই জন্মায় এবং বাড়েও তাড়াতাড়ি। হালকা-দোআঁশ থেকে এঁটেল পর্যন্ত

সকল রকম মাটিতেই পেয়ারাগাছ হয়। যেসব মাটিতে সাধারণত আম কাঁঠাল লিচু লেবু প্রভৃতির গাছ ভাল হয় না, সেসব মাটিতেও পেয়ারাগাছ ভালভাবে জন্মাতে দেখা যায়। গোড়ায় জল জমে এ গাছের বিশেষ ক্ষতি করতে পারে না। শুধো আবহাওয়াতেও এ গাছ খারাপ হয় না।

বীজ থেকে চারা তুলে, সেই চারা আসল জমিতে লাগিয়ে পেয়ারাগাছ করলেই ভাল হয়। অবশ্য আসল জায়গায় বীজ লাগিয়েও গাছ করা চলে। শীতকালে যখন পেয়ারা ভাল ক'রে পাকে, তার বীজ নিয়ে, শুকিয়ে, ছাইএর সঙ্গে মিশিয়ে সযত্নে বোতলে পুরে রেখে দিতে হয়। তার পরে বর্ষাকালে সেই বীজ থেকে গাছ জন্মানো চলে। কোন বিশেষ জাতের পেয়ারার গুণ অক্ষুণ্ণ রেখে নতুন গাছ করতে হ'লে গুটিকলম বা জোড়কলম থেকে গাছ করাই ভাল। বাগান করতে হ'লে চারা বা কলম ১৮ থেকে ২০ ফুট অন্তর লাগানোই ভাল।

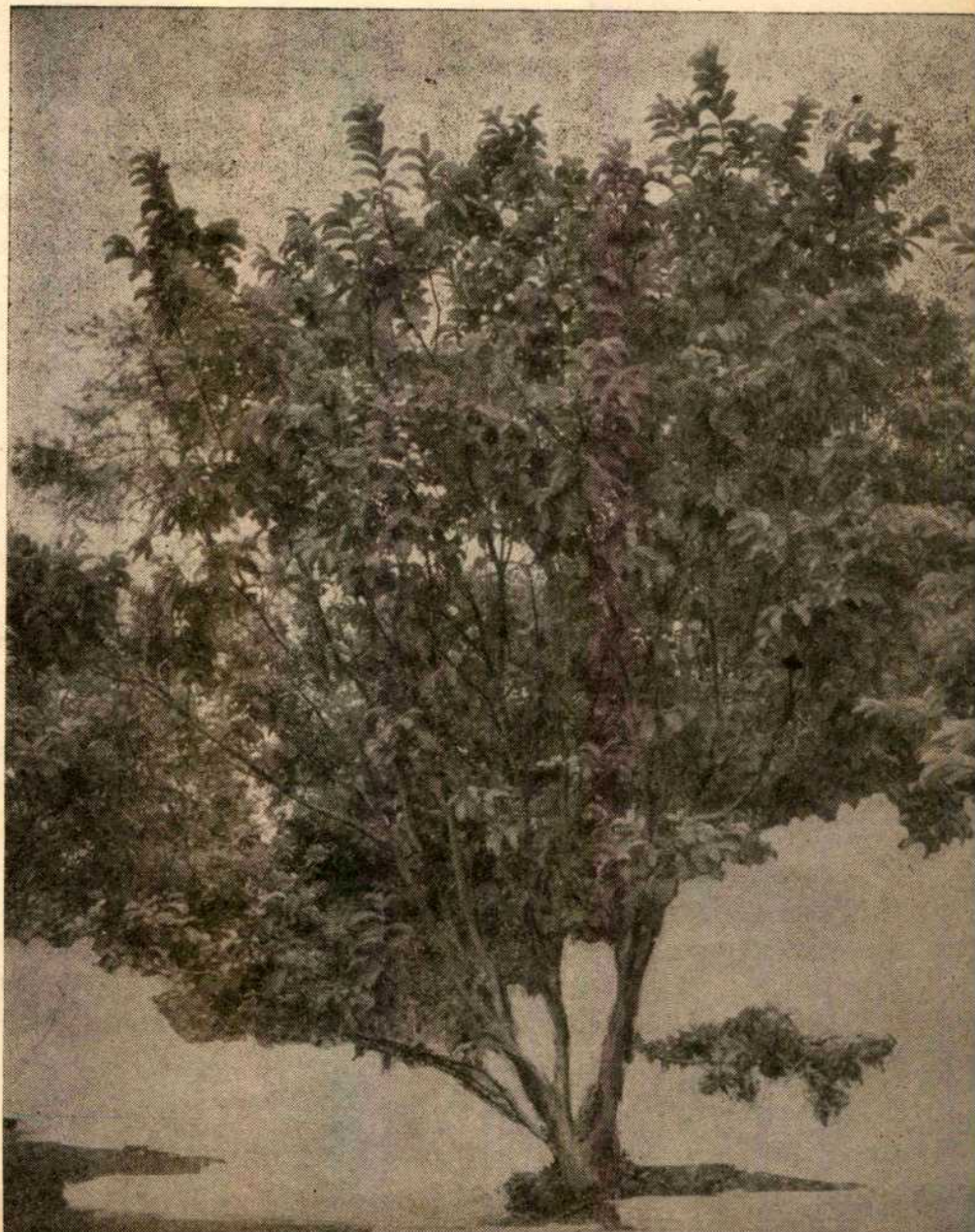


পেয়ারাগাছের বিশেষ কোন পরিচর্যা করার দরকার হয় না। শুধু মাঝে মাঝে শুকনো ডালগড়ালি ছেঁটে দিলে আর গোড়ায় কিছু কিছু সার দিলে ফল আর ফলন ভাল হয়। গাছে ফল ধরার সময়ে তার গোড়ায় জল দেওয়া দরকার, তা না করলে ফলের আকার ছোট হয়ে যায়। ফল পাকার সময় পর্যন্ত গাছের গোড়ার মাটির অবস্থা বদলে নিয়মিতভাবে মাঝে মাঝে জল দিয়ে গেলে আশানুরূপ ভাল ফল পাওয়া যায়।

পেয়ারা শীতকালে পাকে উত্তরভারতে, কাজেই সেখান থেকে ভাল জাতের পেয়ারার বীজ নিয়ে আসতে হ'লে শীতকালেই তা সংগ্রহ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত যেসব পেয়ারা হয়, সেগুলো পাকে বর্ষাকালে।

এ ফলটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ। পেয়ারাগাছ করতে বেশি জমির দরকার হয় না। বাড়ির আনাচে কানাচে অনায়াসেই কয়েকটি পেয়ারাগাছ আমরা করতে পারি। বিশেষ করে ছোটদের মধ্যে হাসি ফোটাতে এ ফলের জুড়ি নেই।

পেয়ারাগাছ



কালোজাম

জলার ধারে কি নদী বা খালের ধারে সচরাচর যেসব গাছ দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে কালোজাম গাছেরই সমারোহ বোধহয় সবচেয়ে বেশি। এ গাছ বড় আকারের আর চিরশ্যামল। এর পাতাগুলো উজ্জ্বল গভীর সবুজ রঙের। গাছ খাড়াভাবে ওঠে, কিন্তু বড় একটা সরল হয় না। অনেক ডালপালা বেরিয়ে এর মাথাটাকে ঝাঁকড়া করে তোলে।

ছ রাতের হিসাবে এর সমাদর আছে, তাই গরমের দেশে রাস্তার ধারে আর গৃহস্থের অঙ্গনের পাশে এ গাছ দেখা যায়। শূকনো এলাকায় কালোজাম-গাছ জন্মাতে চায় না। জলার ধারে বা কাছাকাছি জায়গায়, পাহাড়ের মালভূমিতে এবং এ ধরনের রসালো জমিতে এগাছ ভাল হয়। হিমালয়ের উপত্যকায় স্যাতা মাটিতে চার হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচুতেও কালোজামগাছ জন্মায়। জলার ধারে এ গাছ একেবারে দল বেঁধে জন্মায়।

শুখো এলাকায় কখনও কখনও ফল ধরার সময়ে কালোজামের পাতা ঝরে যেতে দেখা যায়, এ ছাড়া এ গাছ কখনও পত্রহীন হয় না। সাধারণত শীতের শেষ থেকে বসন্তকালের প্রথম দিকে গাছে তামারঙের নতুন পাতা বেরোয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পুরানো পাতা ঝরে যায়। নতুন পাতা গজাবার পরে ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি থেকে বৈশাখ মাসের শেষভাগ পর্যন্ত গাছে খুব ছোট আকারের, জোড়া-টুপি ধরনের সাদা ফুল হয়। ফুলগুলি পাতার নিচে হয় বলে বাইরে থেকে হঠাৎ দেখতে পাওয়া যায় না। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে কালোজাম পাকে। কাঁচা অবস্থায় ফল থাকে সবুজ রঙের আর যখন পাকে তখন বেগুনী আভাষুক্ত কালো রঙ ধরে ওঠে। একেবারে চরম পেকে গেলে ফলের রঙ মিশমিশে উজ্জ্বল কালো হয়ে ওঠে। পাকলে ফলের শাঁসটা নরম হয়ে খাওয়ার উপযোগী হয়।

কালোজামের বীজ সাধারণত তেজী, তাই প্রায় সব বীজ থেকেই অঙ্কুর গজায়। চারা কিন্তু বাড়ে ধীরে ধীরে—বড় হয়ে উঠতে বছর-দুই সময় নেয়। চারা অবস্থায় গাছের উপর ছায়ার ব্যবস্থা করা দরকার। মাটি ভিজে না থাকলে চারা সরাসরি সূর্যের কিরণ সহ্যেতে পারে না। এ গাছ আগাছার সঙ্গে বেশ লড়তে পারে।

কালোজামগাছের চারা তৈরি করার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে—একটা ঝুড়িতে মাটি তৈরি করে তাতে বীজ বসিয়ে দেওয়া। অঙ্কুর বেরোবার পরে ঝুড়িটি খোলা জায়গায় রাখতে হবে। কয়েকটি পাতা মেলে অঙ্কুর যখন চারায় পরিণত হবে, নিচের দিকের পাতাগুলো সবুজ হয়ে উঠবে, তখন ঝুড়িটি নিয়ে ছায়াতে রাখতে হবে। নিয়মিতভাবে তাতে জল দিতে হবে। ঘন বর্ষার সময় চারা তুলে নিয়ে আসল জায়গায় লাগাতে হবে। বৃষ্টি না হলে চারা গাছে নিয়মিত জল দেওয়া দরকার আর কুয়াশা থেকে তাকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কালোজামগাছ বেশ ঝাড়ালো হয়ে ওঠে। আগা কেটে দিলে তার চারদিক থেকে বিস্তর শাখা বেরোয়; তা থেকে পুষ্ট শাখাগুলো রেখে বাকিগুলো কেটে ফেললে ভাল গাছ তৈরি হবে।

কালোজামগাছের কাঠ শক্ত এবং বেশ টেকসই। ঘরের কাঠামো আর কৃষিকাজের নানা জিনিস তৈরি হয় এ কাঠ দিয়ে। জরুরি হিসাবেও এ কাঠ খুব ভাল।

উদ্ভিদবিজ্ঞানে কালোজামের নাম “ইউজেনিয়া জাম্বোলানা” অথবা “সাইজিজিয়াম কুমিনি” [Eugenia jambolana or Syzygium cumini]।

নারকেলগাছ

নারকেলগাছ তার ফল পাতা ডাল কাঠ-সবকিছু দিয়ে আমাদের উপকার করে বলে এর এক নাম 'কম্পবৃক্ষ'। নারকেল কাঁচা বা ডাব থেকে পাকা বা ঝুনো পর্যন্ত সব অবস্থায়ই উপাদেয় এবং পুষ্টিকর। পৃথিবীতে নারকেলই বোধহয় একমাত্র ফল যার মধ্যে খাদ্য আর পানীয় একসঙ্গে রয়েছে। নারকেলের তেল মাথার এবং চুলের পক্ষে পরম হিতকর।

নারকেলের মালা দিয়ে নানা রকম ব্যবহার্য টেকসই জিনিস তৈরি করা যায়। নারকেল-ছোবড়ার আঁশ দিয়ে দড়ি হয় আর গুঁড়োতে ভাল সার হয়। এ গাছের পাতা দিয়ে কুটিরের চাল ছাওয়া হয়, পাতার কাঠি দিয়ে কাঁটা তৈরি হয়, শুকনো পাতা আর বালদো দুই ভাল জ্বালানি। নারকেলগাছ বড়ো হয়ে যখন ফল দেওয়া বন্ধ করে, তখন তার পাকা কাঠ দিয়ে ঘরের যে আড়া কাঠামো প্রভৃতি তৈরি হয় তা পুরোনাক্রমে স্থায়ী হতে দেখা যায়।

দুঃখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত নারকেলের চাষ করতে বড় কাউকে দেখা যায় না। দেশের আর্থিক উন্নয়নে ও পুষ্টিসমস্যার সমাধানে নারকেলের স্থান অতি উচ্চ। সমস্তে, বিধিবদ্ধভাবে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এ রাজ্যেও আমাদের নারকেলের চাষ করতে হবে। প্রতি বছর এ রাজ্যের চাহিদা মেটাবার জন্য বাইরে থেকে কয়েক কোটি টাকার নারকেল, তার ছোবড়ার দড়ি, নারকেলতেল প্রভৃতি আমদানি করতে হয়। একটু চেষ্টা করলেই এ টাকা আমরা এ রাজ্যেই রেখে দিতে পারি। এ রাজ্যের মাটি আর আবহাওয়াও নারকেলচাষের পক্ষে অনুকূল।

যে-কোন রকমের দোআঁশ মাটির উঁচু জমিতেই নারকেলগাছ হয়। তাতে যেন জলনিকাশের ভাল ব্যবস্থা থাকে। বাগান করতে হলে ২৫ ফুট অন্তর সারিতে ২৫ ফুট দূরে দূরে চারা বসানোই ভাল। জায়গা কম থাকলে, অন্তত ২০ ফুটের কম



ব্যবধান যেন না থাকে। পুকুরের, বাড়ির কি বাগানের ধারে শুধু এক সারিতে লাগাবার সময় ১৬ ফুট অন্তর চারা বসালেও চলে। প্রতিটি চারা বসাবার জন্য $3 \times 3 \times 3$ ফুট গর্ত করে, এক ঝড়ি বালি, এক ঝড়ি পাতাপচা সার, কিছু শুকনো গোবরসার ও কিছু ছাই দিয়ে মাটি তৈরি করতে হয়। বর্ষার গোড়ার দিকে সেই গর্তে চারাটি সোজা করে বসিয়ে, ভাল করে মাটি চাপা দিয়ে, গোড়ার মাটি একটু উঁচু করে দিতে হয়—যাতে জল না দাঁড়াতে পারে। শুকনোর সময় মাটি শুকিয়ে গেছে দেখলেই চারার গোড়ায় জল দিতে হবে।

ভাল নারকেলচারা বিশ্বস্ত জায়গা থেকে কিনে নেওয়া যেতে পারে। নিজে তৈরি করতে হলে, উঁচু বাঁজতলায় সার দিয়ে মাটি তৈরি করে, সুস্থ পুষ্ট নীরোগ ভাল জাতের গাছপাকা নারকেল এক

হাত অন্তর বসিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে। প্রায় দু' মাসের মধ্যে চারা বেরোবে। এক বছর পরে চারা তুলে নতুন বীজতলায় বসাতে হবে। সেখানে অবস্থা বুঝে চারা আরও এক থেকে দু' বছর রাখতে হবে। তারপর সেই চারা এনে আসল জায়গায় লাগাতে হবে।

চারা লাগাবার পরে প্রথম দু' বছর ধোঁ, শন বা কোন শব্দটির গাছ করে সবুজসার দেওয়া ভাল। গাছ বড় হ'লে, প্রতি বছর বর্ষার ম'খে গাছ থেকে ছ' ফুট দূরে তার গোড়া ঘিরে ৬ থেকে ৯ ইঞ্চি

গভীর গর্ত করে গোবর, পচাসার, পাতাসার প্রভৃতি দিয়ে তা ভর্তি করে সার দেওয়া ভাল। নিয়মিতভাবে সার দিলে গাছে ফলন বেশি হয়, নারকেলের আকারও বড় হয়।

নারকেলগাছের শোভাও মনোরম। বাড়ি সাজাবার জন্য তালবগীয়া অকেজো গাছ না লাগিয়ে এ গাছ লাগালে সৌন্দর্যবৃদ্ধিও হয়, তার উপকারটাও পরিপূর্ণ মাত্রায় ভোগ করা চলে।

উদ্ভিদবিজ্ঞানে নারকেলগাছের নাম “ককোস্ নুসিফেরা” [Cocos nucifera]।



নারকেলগাছ

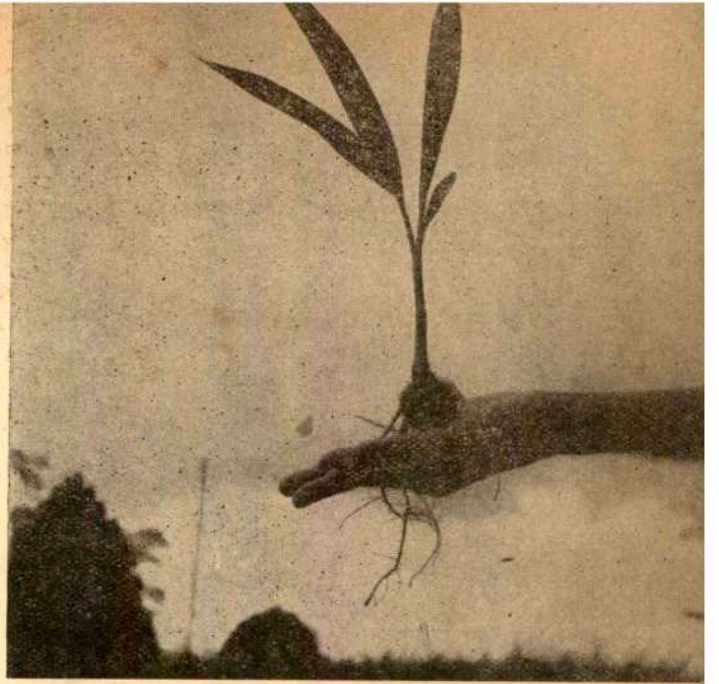
সুপুঁরিগাছ

পানের সঙ্গে খাওয়াতেই সুপুঁরির প্রধান ব্যবহার। পান যিনি খান না, তিনিও দু'টুকরো সুপুঁরি দিয়ে মদুখশুদ্বিধ করেন। তাই সুপুঁরির প্রচলন আমাদের ঘরে ঘরে। বঙ্গবিভাগের ফলে নোয়াখালি, বরিশাল, খুলনা, দ্বিপদুরা প্রভৃতি সুপুঁরি-প্রধান জেলাগুলি পাকিস্তানে পড়ে যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে সুপুঁরির অভাব দেখা দিয়েছে। এ রাজ্যে যে সুপুঁরি জন্মায় তার উপর বছরে প্রায় ১-২৫ কোটি টাকার সুপুঁরি বাইরে থেকে আনতে হয় আমাদের চাহিদা মেটাবার জন্য।

পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশপরগনা, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার প্রভৃতি জেলায় সুপুঁরির চাষ ভাল হয়। বিশেষ করে এসব জেলায় ছাড়াও বাকি সমস্ত জেলাতেই আমাদের সুপুঁরিগাছ লাগানো উচিত। এ গাছে বেশি জায়গা জোড়ে না; বাড়ির ধারে ধারে এ গাছ লাগিয়ে দিলে শোভা বাড়ে এবং সুপুঁরির অভাবও দূর হয়।

সুপুঁরিগাছ প্রায় ৫০-৬০ ফুট লম্বা হয় আর ৫০-৬০ বছর ফলন দেয়। বীজতলায় ৯ ইঞ্চি অন্তর সারিতে এক ইঞ্চি মাটির নিচে বীজ বপন করে, সামান্য আলগা মাটি ও পাতাপচা সার দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। দেড় থেকে দু'মাসের মধ্যে চারা আসে। এ সময়টা বীজতলায় নিয়মিত জল দিতে হয় এবং কড়া রোদ যাতে না লাগে সেজন্য ছায়ার ব্যবস্থা করতে হয়। এক থেকে তিন বছর চারাগুলি বীজতলায় রাখতে হয়।

বাগানে ৮ ফুট x ৮ ফুট অন্তর গর্ত করে, পাতাপচা ও শুকনো গোবরসার দিয়ে মাটি তৈরি করে



কৃষ্ণনগর সরকারী উদ্যানে তৈরি করা নীরোগ পুষ্কট সুপুঁরির চারা

রাখতে হয়। বর্ষাকালের গোড়ার দিকে সেইসব গর্তে চারা লাগাতে হয়। সুপুঁরির চারা প্রথম অবস্থায় রোদ সহ্য করতে পারে না, তাই ছায়ার ব্যবস্থা করা দরকার। অনেকে সুপুঁরির সারির দু'দিকে ফাঁকা জায়গায় সারি করে কলাগাছ বা মাদারগাছ লাগিয়ে দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করেন। মাদারগাছ লাগালে তার পাতা ঝরে মাটিতে পড়ে সুপুঁরিগাছকে সার যোগায়। বাঙলাদেশে সুপুঁরিগাছে সার দিতে দেখা যায় না; কিন্তু সার দিলে সুপুঁরির ফলন ভাল আর বেশি হয়। প্রতি বছর গাছপিছদ এক ঝুড়ি গোবরসার এবং এক ঝুড়ি পচাসার দিলেই চলে। বাগানে ধুণ্ডে, শন বা কোন শূন্যটিবগীয় ফসলের গাছ লাগিয়ে সবুজসারের ব্যবস্থা করলে খুব ভাল হয়।

যেখানে বৃষ্টি কম হয়, সেখানে মাটি শুকিয়ে গেলে বাগানে জলসেচ করার দরকার। বাগানে

জল যাতে দাঁড়িয়ে থাকতে না পারে সেজন্য জল-নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। চারা লাগাবার পরে সাধারণত ৬-৭ বছরের মধ্যে গাছে ফল হ'তে শুরুর করে।

বাগান করার মত জমি যদি নেই, তাঁরা বাড়ির চারিদিক ঘিরে ৭-৮ ফুট অন্তর সুপারিগাছ লাগিয়ে দিতে পারেন। অনেকে বাড়ির শোভা বাড়াবার জন্য তালবগীয় গাছ লাগান; সুপারিও

তালবগীয় গাছ এবং সারিতে এ গাছের দৃশ্য মনোরম। বাড়ির চারদিক ঘিরে লাগিয়ে দেওয়ার পরে গাছগুলি একটু বড় হ'লে, সেগুলোর গায়ে গায়ে কাঁটাতার টেনে বাড়িঘেরা বেটনী তুলে দেওয়া চলে।

উল্লেখ্যদ্রষ্টব্যে সুপারিগাছের নাম “অ্যারেকা ক্যাটেচু” [Areca catechu]।



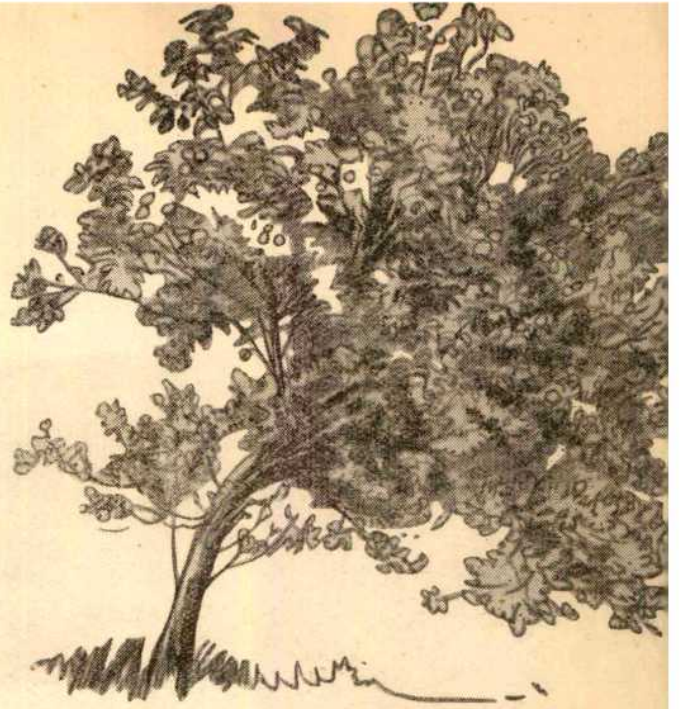
জলপাইগড়িতে একটি সুপারিবাগান

লেবুগাছ

লেবু নানা রকমের, যেমন—কমলালেবু, শরবতী-লেবু, বাতাবিলেবু, পাতিলেবু, সুগন্ধীলেবু প্রভৃতি। এর মধ্যে পাতিলেবু বা কাগজিলেবুর এবং সুগন্ধীলেবুর রস টক হয়; কমলালেবু আর বাতাবিলেবুর রস টোকো মিষ্টি আর মিষ্টি দু'রকমেরই হয়; এবং শরবতীলেবুর রস হয় মিষ্টি।

পশ্চিমবঙ্গে কমলালেবু একমাত্র দার্জিলিং অঞ্চলেই হয়। সমস্তে চাষ করলে অন্য কোন কোন জায়গায়ও হয়, কিন্তু লেবুর স্বাদ দার্জিলিং-লেবুর স্বাদের মত সুমিষ্ট হয় না। শরবতী-লেবু পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ায় ভাল হয় না। এ রাজ্যে পাতিলেবু বা কাগজিলেবু এবং বাতাবিলেবুর চাষই প্রায় সর্বত্র হয়।

পাতিলেবু আর কাগজিলেবু একই জাতের ফল, পার্থক্যের মধ্যে পাতিলেবুর আকার একেবারে গোল এবং খোসা খুবই পাতলা আর কাগজিলেবুর আকার লম্বাটে গোল এবং খোসা একটু মোটা। সুগন্ধীলেবুর আকার বড়, ওজন কমলালেবু বা শরবতীলেবুর ওজনের সমান বা তার চেয়েও বেশি, আকার লম্বা—মাঝখান থেকে দু'দিকে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে, খোসা মোটা এবং রস নানা রকমের সুগন্ধযুক্ত হয়। পাতিলেবু আর কাগজিলেবুর গাছ ঝোপমত, পাতাগুলি যেন দুইভাগে বিভক্ত। সুগন্ধীলেবুর গাছ আরও বড়, পাতাগুলি বিভক্ত নয়, লেবুর সুগন্ধ পাতায়ও থাকে। বাতাবিলেবুর গাছ মাঝারি থেকে বড় পর্যন্ত হয়, ফলের খোসা পুরু, আকার বেশ বড়—গ্রামের ছেলেরা কাঁচা বাতাবিলেবু দিয়ে অনেক সময় ফুটবল খেলে।



ভাল জলনিকাশ হয় এমন যে-কোন মাটিতে লেবুর গাছ ভাল হয়। লেবুগাছ গোড়ায় জল-দাঁড়ানো একেবারেই সহ্যে পারে না। বীজ থেকে চারা তৈরি করে, সেই চারা আসল জায়গায় লাগিয়ে লেবুগাছ করা যায়, কিন্তু গুটিকলম বা চোখকলম লাগিয়ে গাছ করলেই ভাল হয়। পাতি-লেবু বা কাগজিলেবুর গাছ ১০ থেকে ১২ ফুট অন্তর, সুগন্ধীলেবুর গাছ ১৫-১৬ ফুট অন্তর এবং বাতাবিলেবুর গাছ অন্তত ২০ ফুট অন্তর লাগানো উচিত।

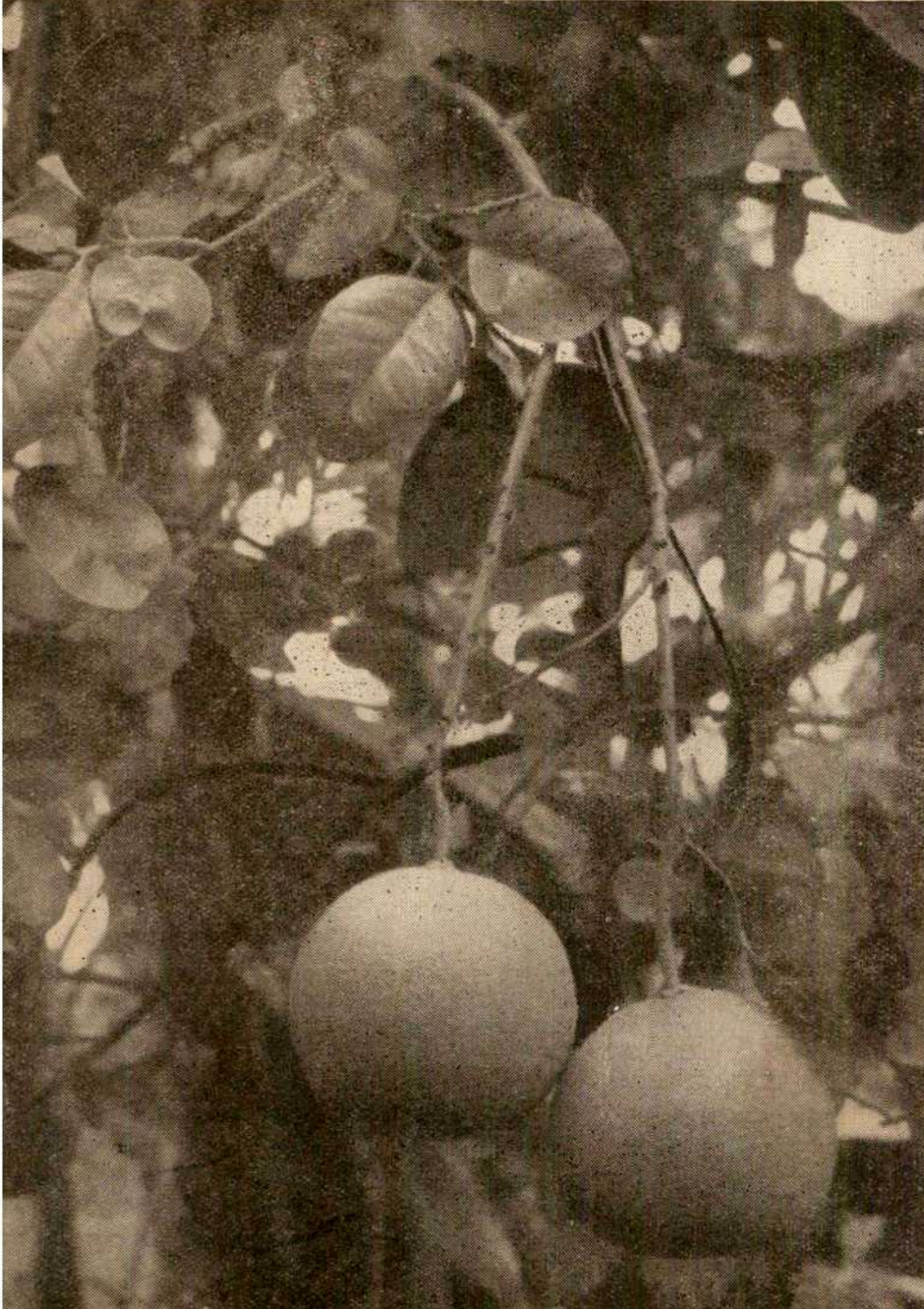
লেবুগাছ প্রতি বছর ছাঁটাই করা দরকার। কলমের গাছের গোড়া থেকে অনেক নতুন নতুন শাখা প্রতি বছরই বেরোয়; এগুলো ছেঁটে দিতে হবে, তা নইলে গাছ ঝোপড়া হয়ে পড়ে এবং কম-জোর হয়ে যায়। কোন ভাল শ্রমিকই গেলে অবিলম্বে তা ছেঁটে সরিয়ে ফেলতে হবে।

শীতকালে আর গ্রীষ্মকালে মাটি যখন শ্রমিকই যায় তখন গাছের গোড়ায় জল দেওয়া দরকার। কাণ্ড থেকে অন্তত এক ফুট দূরে গাছের চারদিক ঘিরে গর্ত করে তাতে জল দিতে হয়। গাছের

মূলদেশে সরাসরি জল লাগলে ক্ষতি হয়।
দরকারমত জল আর সার না দিলে গাছের লেবু
আকারে ছোট হয়, সংখ্যায় কম হয় আর তাতে রসও
হয় কম। জল দেবার জন্য যখন গাছের চারদিক
ঘিরে গর্ত করা হয়, তখন তাতে কিছ্ পাচাপচা

বা শুকনো গোবরসার দিলেই মোটামুটি সার
দেওয়ার কাজ চলে যায়। তবে বিশেষ রকমের
সার দিতে পারলে খুবই ভাল হয়।

উদ্ভিদবিজ্ঞানে সব রকম লেবুই “রুটাসী”র
[Rutaceae] পরিবারভুক্ত।



গাছে বাতাবিলেবু
ঝুলছে

তেঁতুলগাছ

তেঁতুলগাছ বুনো গাছ নয়। ভারতের পশ্চিম অঞ্চলের একেবারে শূন্য জায়গা ছাড়া আর প্রায় সব জায়গাতেই এ গাছ হয়। এর আদিভূমি আর্বিসিনিয়া এবং মধ্য আফ্রিকা। তেঁতুলগাছ সেখান থেকে ভারতে এসেছে বহুকাল আগে—সম্ভবত আরবীদের মারফত।

ছায়াতরু হিসাবে তেঁতুলগাছের তুলনা হয় না। তাই প্রাচীনকাল থেকে এ গাছ সমাদরে রাজপথের ধারে ধারে লাগানো হয়ে আসছে। অনেক কাল আগে অযোধ্যার নবাব ভিজিরের আমলে উত্তর-প্রদেশে অনেক রাজপথের ধারে ধারে শূন্যই তেঁতুলগাছ লাগানো হয়েছিল; আজও তার অনেক পথই রয়েছে—দু' পাশের সারি সারি তেঁতুলগাছের ছায়ায় শীতল গম্ভীর শ্রীমন্ডিত হয়ে।

যেসব গাছ সবচেয়ে বেশিদিন বাঁচে, তার একটি হচ্ছে তেঁতুলগাছ। ফয়জাবাদে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে নবাব সাজাউদ্দৌলা এক রাজপথের পাশে সারি ধরে তেঁতুলগাছ লাগিয়েছিলেন, আজও সেসব গাছ বেশ সজীব। এ গাছ ১০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয় আর ৩০-৪০ ফুট পর্যন্ত ছড়ায়, এর গুঁড়ির বেড় ২৪-২৫ ফুট হ'তেও দেখা যায়।

তেঁতুলগাছ চিরশ্যামল। খুব গরম জায়গায় নতুন পাতা গজাবার আগে মাত্র কয়েকটি দিনের জন্য এ গাছকে পত্রহীন হ'তে দেখা যায়। লম্বাটে গোল ছোট ছোট পাতাগুলি সরু লম্বা ডাঁটির দু'দিকে পাখির পালকের ধরনে লেগে থাকে। পাতা আধ ইঞ্চির বেশি লম্বা হ'তে দেখা যায় না। জৈত্র-বৈশাখ মাসে নতুন পাতা গজায়। সারা গ্রীষ্মকাল ধরে ছোট ছোট অজস্র ফুল হয়, তার হলদে পাপড়িতে লাল রঙের ছিটে ছিটে দাগ থাকে। তেঁতুল হয় শীতকালে আর তা পাকে বসন্তকালে।

একটা তেঁতুলছড়াতে গাঢ় বাদামী রঙের, চকচকে, চ্যাপটা, চোকোমত বীজ হয় তিনটে থেকে দশটা পর্যন্ত। বীজগুলো ঢাকা থাকে বাদামী রঙের



চট্‌চটে টক পদার্থ দিয়ে—তারই নাম তেঁতুল যা সারা ভারতের সর্বত্র খাদ্যে ওষুধে নানাভাবে ব্যবহৃত হয়।

তেঁতুলবীজ থেকে সহজেই অঁকুর গজায়। প্রায় সব বীজ থেকেই গাছ হয়। গাছ জন্মানোর সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছেঃ চৈত্র-বৈশাখ মাসে জমিতে বীজ বুনো দিলে কল গজিয়ে যে চারা হবে, একটা বড়িতে পুরু ক'রে বুরো মাটি নিয়ে সেই চারা তাতে বসাতে হবে; চারা বেশ লম্বা লম্বা শিকড় ছাড়ে—শীতের হাওয়া পড়বার আগেই যাতে শিকড় বেশ ছড়াতে পায় তার জন্য বড়ির বোনা বেশ ফাঁক ফাঁক হওয়া দরকার; শীতে কুয়াশা থেকে চারা বাঁচাতে হবে, গরমে মাটি শুকিয়ে গেলে জল দিতে হবে; তারপর বর্ষা নামলে চারা নিয়ে আসল জমিতে রোপণ করতে হবে।

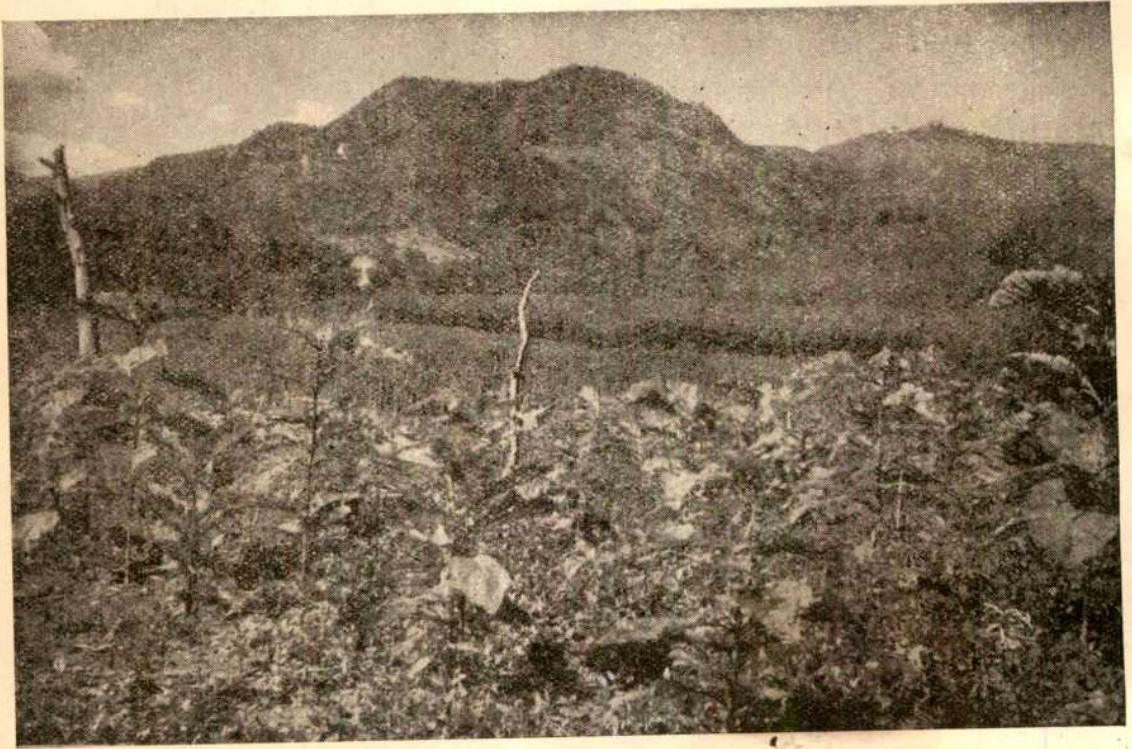
গভীর দোআঁশ মাটিতে তেঁতুলগাছ ভাল হয়। এ গাছের লম্বা শিকড় যাতে যথেষ্ট পথ ক'রে নিতে পারে, মাটিকে তার অনুকূল অবস্থায় রাখা দরকার। এর জীবনীশক্তি এমনই প্রবল যে, একবার মাটির

ভিতর শিকড় চালিয়ে নিতে পারলে আর তাকে রেখে কে? তখন পাথুরে আর পলি মাটিতে তার সমান প্রতাপ।

তেঁতুলকাঠ খুব ঘন আঁশের, বেশ শক্ত আর টেকসই। কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি, তেলের ঘানি, গৃহস্থালির জিনিসপত্র ইত্যাদি এ কাঠে খুব ভাল হয়। বেশি বয়সের তেঁতুলগাছের সারকাঠের রঙ হয় একেবারে কালো; সে-কাঠ খুব শক্ত, সহজে ক্ষয় হয় না, সেই কাঠ দিয়ে যেসব শোখিন জিনিস তৈরি করা হয়, সেগুলো দেখলে মনে হয় যেন মোষের শিঙের তৈরি।

তেঁতুলের চাহিদা তো এদেশের ঘরে ঘরে। রান্নার কাজে নানাভাবে তেঁতুল ব্যবহার করা হয়। তেঁতুল দিয়ে মদ্যরোচক আচার-চাটনি তৈরি হয়। নানা ওষুধে ধারক ও রেচক উপাদান হিসাবে তেঁতুল ব্যবহার করা হয়। পুরানো তেঁতুলের নাকি উপকারিতা অনেক। আমাদের বস্ত্রশিল্পে ইদানীং তেঁতুলবাঁচ থেকে তৈরি মাড়ের উপাদানের ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

উদ্ভিদবিজ্ঞানে তেঁতুলের নাম “ট্যামারিন্ডাস ইন্ডিকা” [Tamarindus Indica]।



পাহাড়ের নিচের দিকে সেগুনবনের সাধারণ দৃশ্য : বামনপোকরিতে নতুন লাগানো গাছগুলো দেখা যাচ্ছে সামনের দিকে

সেগুনগাছ

সেগুনকাঠ তার চমৎকারিছের গুণে পৃথিবীর সকল জায়গায় সমাদৃত। এ কাঠের রঙ সুন্দর, বুনট ঠাসা আর এ কাঠ বেশ শক্ত আর টেকসই। আমাদের দেশে সেগুনগাছের প্রধান এলাকা হচ্ছে মধ্য আর দক্ষিণ ভাগে। সেগুন পশ্চিমবঙ্গের গাছ নয়। তবে, মূল্যবান এর মূল্যবান কাঠের জন্য আগেকার দিনে অনেকেই এ গাছ লাগাতেন, এবং এ গাছ অসাধারণ দৃঢ় বলে অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বেঁচে থাকে।

সেগুন দীর্ঘজীবী বিরাট গাছ, অনুকূল পরিবেশে জন্মালে খুব লম্বা আর সরল হয়, আর প্রতিকূল পরিবেশে এর কাণ্ডের ভিতরটা ফাঁপা হয়ে পড়ে। বর্ষাকালে যখন তাজা সবুজ পাতায় ছেয়ে যায় তখন এ গাছ দেখতে সুন্দর আর ছায়াকর হয়, কিন্তু বছরের বাকি সময়টা একে ঝাঁকড়া মত দেখায়। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, সেগুনগাছ এ রাজ্যের সব জায়গাতেই ভালই জন্মায়; কাজেই, অন্তত সারা পৃথিবীতে এর কাঠের উচ্চ সমাদরের কথাটা মনে রেখেও, সকলেরই এ গাছ লাগানো উচিত।

ভারতে সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে সেগুনকাঠ। জাহাজ-তৈরির পক্ষে এর নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, গাড়ির কামরা, শৌখিন জিনিস প্রভৃতি তৈরিতে, এক কথায়

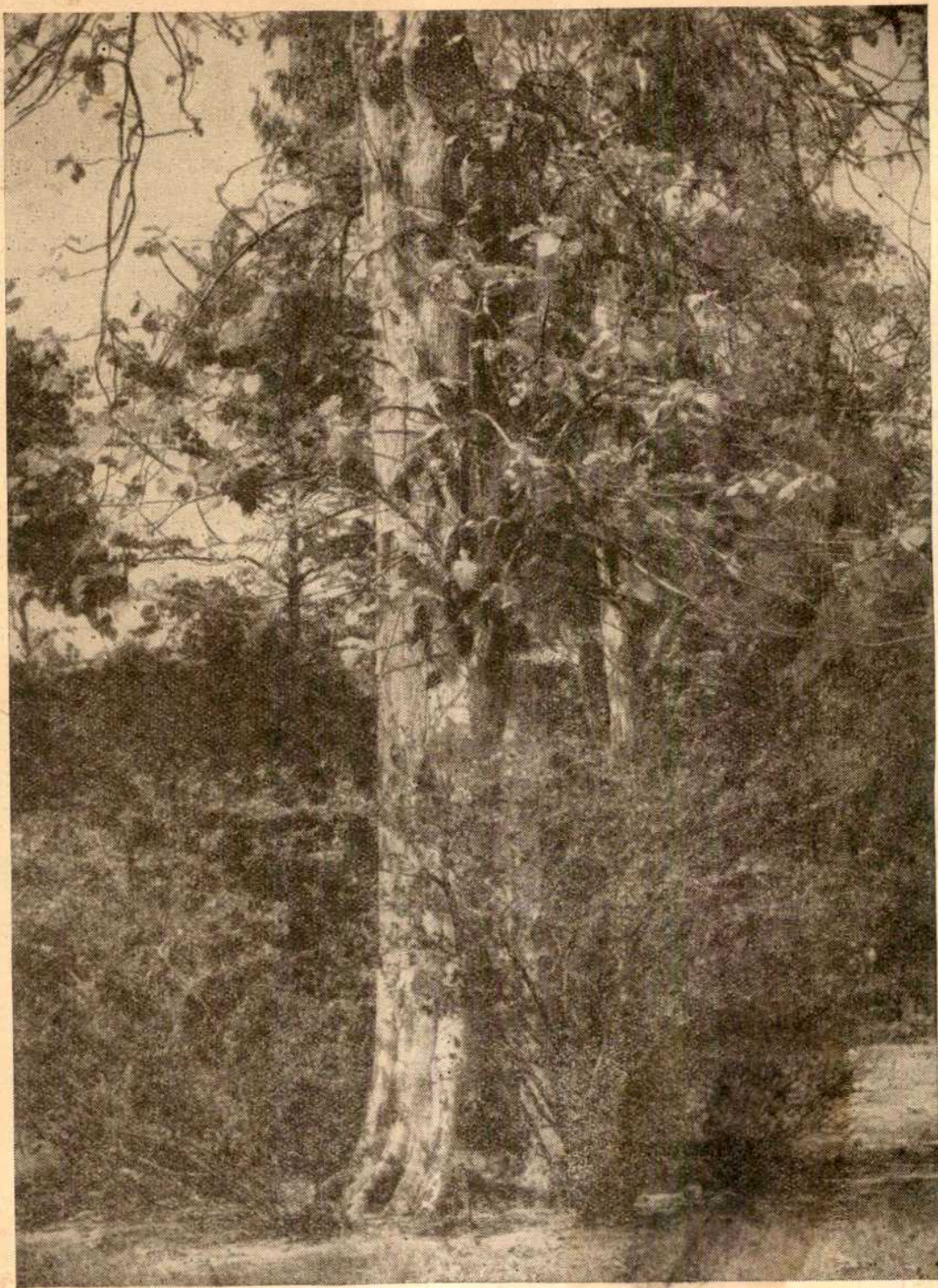
যাবতীয় কাঠের কাজে সেগুনকাঠের ব্যবহার অতি ব্যাপক।

জলানিকাশের ভাল ব্যবস্থা আছে এমন পলি-জমিতে সেগুনগাছ সবচেয়ে ভাল হয়। এ রকম মাটিতে অনুকূল আবহাওয়ায় এ গাছ ১৯২ ফুট পর্যন্ত উঁচু এবং ১৭ ফুট পর্যন্ত মোটা হতে দেখা গেছে। এ-গাছ জন্মানোর সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে প্রথমে বীজতলায় বীজ বসিয়ে চারা তোলা, তারপর সেই চারা এক বছর বয়সের হলে তার আগার দিকটা কেটে গোড়ার দিকটা [৯ থেকে ১২ ইঞ্চি] আসল জমিতে লাগিয়ে দেওয়া।

পশ্চিম বাংলায় হিমালয়ের পাদদেশে বামন-পোকরিতে সেগুনগাছের চাষ করার প্রচেষ্টা চল আসছে ১৮৬৮ সাল থেকে। এই এলাকায় সেগুন-গাছ আশাতিরিক্ত রকম ভাল হয়, তাই হিমালয়ের পাদদেশে ক্রমেই আরও বেশি করে সেগুনগাছ লাগিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নদীয়ার, মুর্শিদাবাদের, মালদহের এবং বর্ধমান জেলার কোন কোন অংশের পলি-অঞ্চলে দেখা যায়, সেগুনগাছ বেশ ভাল হয়।

এই মূল্যবান গাছ জন্মানোর চেষ্টা এ রাজ্যের সকল জায়গায় আমাদের সকলেরই করা উচিত। কোন কোন জায়গায় যদি গাছ তেমন ভাল নাও হয়, তা হলেও যতটা ভাল হয় ততটাই লাভ।

উদ্ভিদবিজ্ঞানে সেগুনগাছের নাম হচ্ছে “টেক্টোনা গ্র্যান্ডিস” [Tectona grandis]।



সেগুনগাছ সরল ধরনের

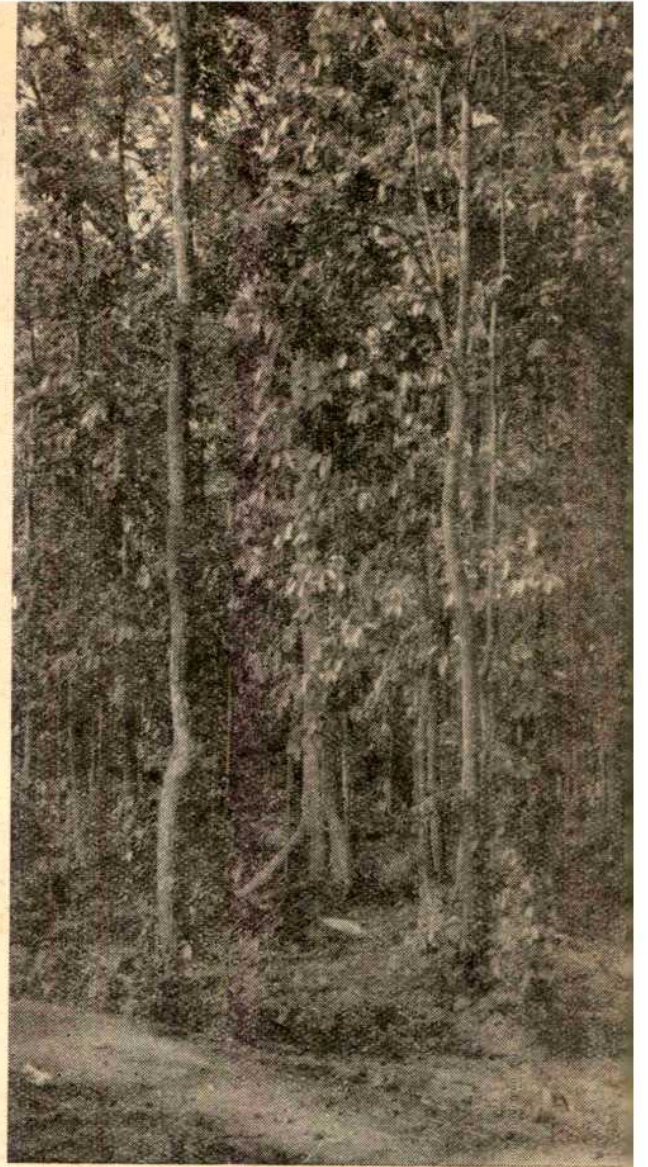
শালগাছ

শালগাছ জমকালো চেহারার, দেখতে বেশ সুন্দর, উঁচু হয় অনেকখানি—কোন কোন গাছ একশ' ফুট পর্যন্তও লম্বা হ'তে দেখা যায়। এর উজ্জ্বল গাঢ় সবুজ রঙের পাতাগুলোও দেখতে বেশ। একথা বললে অতুষ্টি হয় না যে, আমাদের বনরাজ্যে সবচেয়ে দরকারী গাছ হচ্ছে শাল। কোন একটি-মাত্র গাছকে যদি পশ্চিমবঙ্গের অরণ্যের প্রতীক হিসাবে দেখাতে হয়, তবে সে সম্মান দিতে হবে শালগাছকে।

শালগাছের প্রকৃতি হচ্ছে দলবদ্ধভাবে থাকা। আমাদের এখানে পাহাড়ের কাছাকাছি সমতলভূমিতে এবং হিমালয়ের পাদদেশে—বিশেষ ক'রে জলপাই-গুড়ি জেলায় অনেক বনে অবিমিশ্রভাবে শুধুই শালগাছের রাশি দেখতে পাওয়া যায় এবং তার দৃশ্যও বড়ই সুন্দর। অনেক জায়গায় শালগাছ আবার অন্যসব দামী গাছের সঙ্গে মিশেও রয়েছে। দক্ষিণে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান এবং বীরভূম জেলার ঢেউখেলানো কাঁকরমাটির এলাকায় বনগর্দলিতে দেখা যায় প্রায় সবই শালগাছ; তার মধ্যে অন্য নানা রকমের কিছু কিছু গাছ এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে।

আমাদের অরণ্যপ্রতীক এই শালগাছ এমন আশ্চর্য রকমের দৃঢ় যে, এর জন্য কোন বিশেষ ধরনের মাটি বা জলবায়ুর দরকার নেই। তা ছাড়া এ গাছের একটা অসাধারণ গুণ হচ্ছে শাখ ছেড়ে ছড়িয়ে পড়া। এই গুণটি থাকার ফলে, আগুন লাগুক আর পশু চরুক বা ডাল কাটা হোক আর গাছই কেটে ফেলা হোক—সব রকমের উপদ্রব সহ্য ক'রে শালগাছ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে বনরাজ্যে তার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে। শালের এই আধিপত্যের প্রভাবে তার এলাকায় অন্য অনেক গাছের পক্ষেই টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

শালকাঠ সব কাজে লাগে। খুব দৃঢ় আর শক্ত ব'লে রেলপথের পাতানকাঠ বা 'স্লিপার' তৈরিতে



শালের বন

এ কাঠই ব্যবহার করা হয় সবচেয়ে বেশি। ঘরের কাঠামো, খুঁটি প্রভৃতির পক্ষে এ কাঠ বিশেষ উপযোগী। এ গাছের ডালপালা চেলাকাঠ ইত্যাদি জ্বালানি হিসাবে খুব ভাল। শালের পাতাগুলো বেশ বড় বড়; সাধারণ লোকের ভোজ-উৎসবে জল দেওয়ার জন্য যেমন মাটির গেলাস, ভোজ্য-পরিবেশনের জন্য তেমন শালপাতা অপরিহার্য।

এতকাল শালগাছ স্বাভাবিকভাবে আপনা থেকেই শূন্য বনেই জন্মাত; কিন্তু ইদানীং এই গাছ জন্মানোর চেষ্টাও সার্থক হয়েছে। এ রাজ্যের পলিমাটির এলাকায় শালগাছ প্রায় দেখা যায় না। তার কারণ পলিমাটিতে শালগাছ ভাল হয় না, তেমন বড়ও হয় না।

শালের বীজ পাকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে। সেই বীজ লাগিয়ে গাছ তোলাই সবচেয়ে ভাল। চারা বা গোড়া লাগিয়েও এ গাছ করা যায়। শালগাছ প্রায় সব রকম মাটিতেই জন্মায় বটে, তা হ'লেও, জল-নিকাশের ভাল ব্যবস্থা আছে এমন বেলে-দোআঁশ জমিতেই এ গাছ সবচেয়ে ভাল হয়। এ রকম মাটিতে শালগাছ ১২০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হ'তে আর তার বেড় ১২ ফুট কি তার বেশি হ'তেও দেখা গেছে।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে অনেক জায়গায় এই বনস্পতির উল্লেখ পাওয়া যায়। শালবৃক্ষতলে বৃদ্ধদেবের জন্ম হওয়ার মনোরম কাহিনীটির মধ্যেও এই গাছের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় রয়েছে। অথচ আশ্চর্য এই যে, স্বার্থপর মানুষ শালগাছকে ধ্বংস করার নেশায় মেতে উঠেছে। এই বর্ষের অত্যাচারের হাত থেকে এই গাছকে রক্ষা করাই কি উচিত নয় আমাদের?

আমাদের পতিত জমিতে সুবিধামত এ গাছ জন্মাবার চেষ্টা করলে ক্ষতি কী? সব জায়গায় গাছ হয়তো ভাল হবে না, তবু শালগাছের মন্দও ভাল।

উদ্ভিদবিজ্ঞানে শালগাছের নাম “শোরিয়া রোবাস্টা” [Shorea robusta]।



‘বেয়ার’এর পোকা ও রোগ দমনের ঔষধগুলির
দ্বারা আপনাদের ফসল রক্ষা করুন

ফলিডল-ই ৬০৫

মেটাসিস্টক্‌স্

সেরেসান

অ্যাগালল

কুপ্রাভিট (ওবি ২১)

এইগুলি পশ্চিম জার্মানীর লিভারকুসেনের

ফারবেনফ্যাবরিকেন বেয়ার

দ্বারা প্রস্তুত আসল ঔষধ।

ভারতে পরিবেশক

চিক। প্রাইভেট লিমিটেড,

৩১, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২

ঝাউগাছ

ঝাউগাছের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় নেই, তাঁরা প্রথম পরিচয়েই এর একটানা শোঁ শোঁ আওয়াজ শুনে থমকে যাবেন। কোথাও কিছ্ না, বাতাস বইছে স্বাভাবিকভাবে, দাঁড়িয়ে আছে শুধু একটা অদ্ভুত ধরনের গাছ, অথচ অবিরাম উঠছে ওই শোঁ শোঁ শব্দ—যেন ঝড় ব'য়ে আসছে সুন্দর থেকে! অথচ শব্দটা উঠছে ও গাছ থেকেই।

একটা ঝাউগাছ থাকলেই এ অবস্থা, অনেকগুলি থাকলে তো কথাই নেই। কোন গাছ নড়ছে না, দুলছে না, অথচ ঝড় বইছে অবিশ্রাম! ঝাউগাছের এক গুচ্ছ পাতা সমেত একটা শাখাকে দেখায় যেন সরু কাঠির একটা ঝাড়ু। পাতাগুলো প্রায় ঝাঁটার কাঠির মতই লম্বা, কিন্তু তার চেয়ে ঢের সরু। প্রতিটি পাতা কয়েকটা গাঁটে ভাগ করা, উপরের পাবের গোড়াটা যেন নিচের পাবের মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, টানলে খঁসে আসে। এমনি গুচ্ছ গুচ্ছ পাতায় ভর্তি গাছের মাথাটা। ঝাড়ুর মত পাতার গোছাগুলোতে বাতাস বেধে যায়, তাতেই ওই শোঁ শোঁ শব্দ ওঠে। এ গাছ লম্বা, এর কান্ড সরল, ডালপালা শক্ত, ছাল ককর্শ—পূরনো হ'লে ফেটে ফেটে যায় আর টান মারলে লম্বা ফালি হয়ে উঠে আসে। এর সরু লম্বা কাঠির মত পাতা-গুলোর রঙ ধোঁয়াটে সবুজ। পাতা সারা বছর ধরেই ঝরে পড়ছে, তার ফলে গাছের তলায় একটা আস্তর জমে যায়, তাতে গাছের গোড়ার মাটিতে সব সময়ই রস ধরা থাকে আর পাতাগুলো পড়ে গাছকে সার যোগায়।

শুকনো বালিজমিতেও ঝাউগাছ জন্মায় এবং এ-গাছ বাড়েও তাড়াতাড়ি। এর কাঠ কড়া, লম্বালম্বি ফেটে ফেটে যায় তাই জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা ছাড়া আর কোন কাজে বিশেষ লাগে না। তবে

জ্বালানির অভাব আমাদের দেশে খুবই, সেদিক থেকে এ গাছ লাগানো বিশেষ দরকার। ঝাউগাছ দেখতে ভারি সুন্দর, কাজেই বাড়ি বা বাগানের শোভা বাড়াবার জন্য এ গাছ লাগানো যেতে পারে। অবিরাম একটানা হাওয়াই গান শোনানোও এর একটা বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু এর আসল যে বৈশিষ্ট্য, সেটা হচ্ছে হাওয়া রদুখবার ক্ষমতা। যেখানে সমুদ্রের ধারের রাশি রাশি বালি প্রবল বাতাসে উড়ে এসে চাষ-আবাদ সব গ্রাস করে তীরভূমির অনেকখানি এলাকাকে মরুভূমির সামিল করে তুলছে, সেখানে সমুদ্রের ধার ধরে ঘন করে কয়েক সার ঝাউগাছ লাগিয়ে রক্ষাবলয় গড়ে তুললে, তাতে হাওয়ার সঙ্গে বালিও বাধা পায় এবং তার ফলে ধূলিকবল থেকে কৃষিভূমি রক্ষা পায়। সমুদ্রের ধারে তাই অনেক জায়গাতেই—যেমন আমাদের দিঘার সমুদ্রতীরে—এভাবে ঝাউগাছের রক্ষাবলয় গড়ে তোলা হচ্ছে। যেসব জায়গায় মরুভূমি এগিয়ে এসে কৃষিভূমি গ্রাস করছে, সেখানেও ঝাউগাছের রক্ষাবলয় গড়ে তুলে মরুর অগ্রগতি রোধ করা হচ্ছে।

ফাঁকা মাঠের কোলে বাগান করলে, অনেক সময় জোর হাওয়ার উৎপাতে বাগানের গাছ বাঁচানো দায় হয়। এরকম ক্ষেত্রে মাঠের দিকটাতে ঝাউগাছের সার লাগিয়ে বাগানের গাছ রক্ষা করা যায়।

ঝাউএর বীজ নিয়ে চারাতলায় চারা জন্মাতে হয়। সেই চারা বর্ষাকালে আসল জমিতে ৬ থেকে ৯ ফুট দূরে দূরে লাগাতে হয়। প্রথম দুই বছর বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সব সময়ে নিয়মিতভাবে গাছে জল দেওয়া দরকার।

উদ্ভিদবিজ্ঞানে ঝাউগাছের নাম “ক্যাসুয়ারিনা ইকুইসেটিফোলিয়া” [Casuarina equisetifolia]।

শিশুগাছ

সারা উত্তরভারতেই শিশুগাছ সুপরিচিত। এখানে সিন্ধুতীর থেকে আসাম পর্যন্ত সর্বত্রই এ গাছ দেখতে পাওয়া যায়। দেশের কোন কোন জায়গায় একে 'শিসাম'ও বলা হয়।

আমাদের কাব্যে সাহিত্যে এ গাছের যথেষ্ট উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। শিশুতরু নয়নমোহন, শিশুতরু বসন্তের দূত। এর শাখায় শাখায় যখন কিশলয়ের উন্মেষ হয়, তখনই সূচিত হয় ঋতুরাজের আবির্ভাব।

শিশুগাছের কাঠ একদিকে যেমন অতি প্রয়োজনীয়, অন্যদিকে তেমনি জ্বালানি হিসাবেও খুব ভাল। এ কাঠ বেশ শক্ত আর টেকসই। বাড়িঘর, আসবাবপত্র, গাড়ি, গাড়ির চাকা প্রভৃতি তৈরিতে এ কাঠের খুব প্রচলন।

শিশুগাছের প্রকৃতি হচ্ছে নদীর ধারে জন্মানো, তাই পলি-এলাকাতে এ গাছ দেখতে পাওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু এ গাছের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পলি-এলাকা ছাড়া, পাহাড়ের ধারে, নতুন বাঁধের উপর, ঘাসী জমিতে, নালার ধারে—এমনি নানা রকম জমিতেই বেশ ভাল হয়। জলনিকাসের ভাল ব্যবস্থা আছে এমন ফোঁপরা হালকা বেলে ধরনের মাটিই শিশুগাছের বিশেষ পছন্দ। অনুকূল পরিবেশে

ডুয়ার্স অঞ্চলের বনে এ গাছ ১০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা আর ৮ ফুট পর্যন্ত মোটা হয়। কড়া এঁটেল মাটি এ গাছের পক্ষে একেবারেই অনুপযোগী।

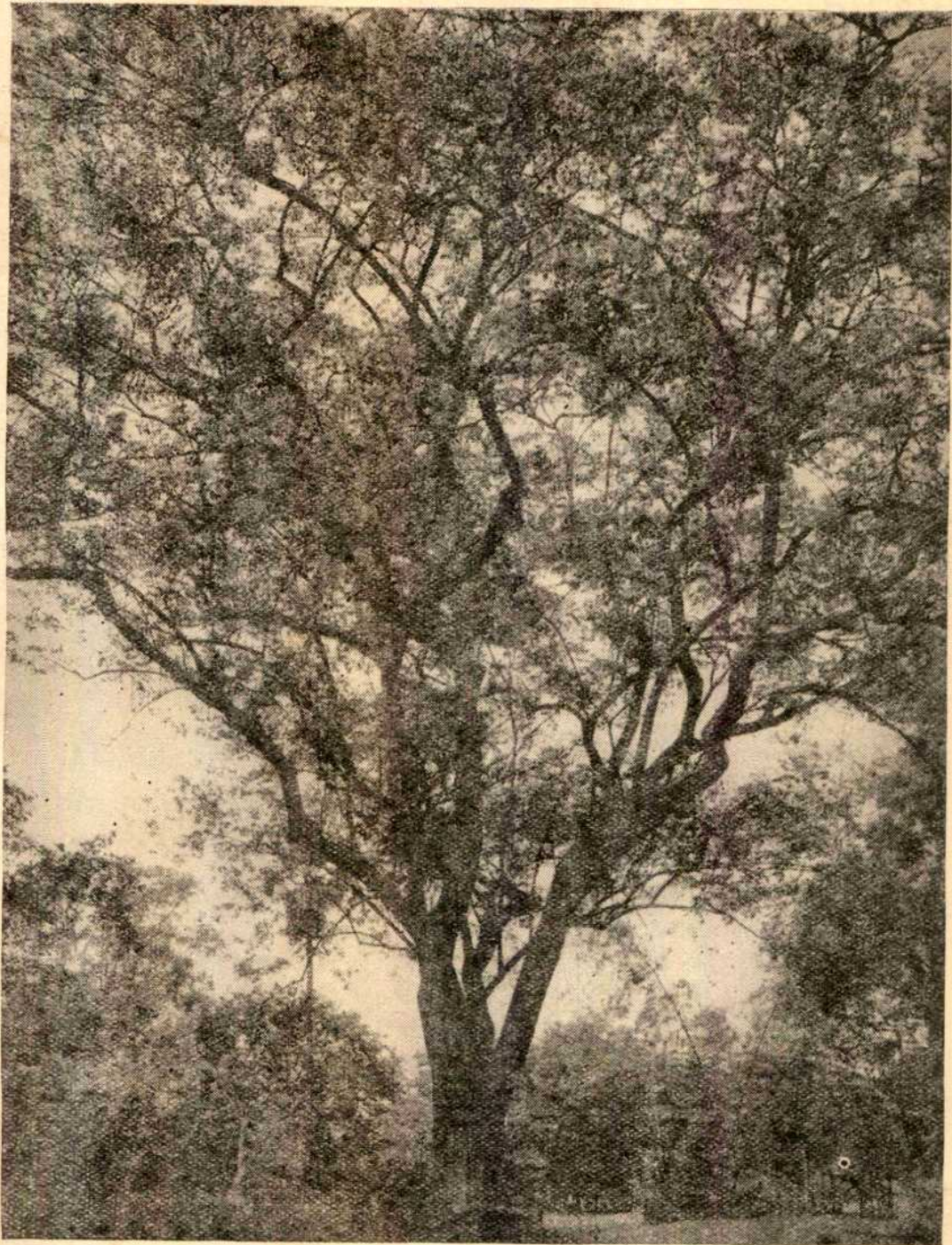
এ রাজ্যে রাস্তার ধারে, বাড়ির হাতার মধ্যে এবং এমনি আরও নানা সাধারণ জায়গায় শিশুগাছ দেখতে পাওয়া যায় এবং দেখলেই গাছটাকে এমন ভাল লেগে যায় যে, মনে হয়, এ গাছ প্রচুর লাগানো উচিত। এ গাছে জায়গা লাগে খুব কম, কাজেই জায়গার সংকীর্ণতার জন্য যাঁরা ভাল কাঠের বড় গাছ লাগাতে পারেন না, তাঁরা এ গাছটা পছন্দ করলে ভাল হয়।

বীজ লাগিয়ে সরাসরি এ গাছ জন্মানো যায়; কিন্তু চারাবাগানে বীজ বসিয়ে চারা তৈরি করে, সেই চারা এনে আসল জমিতে লাগানোই নিরাপদ। চারাগাছের আগাটা কেটে ফেলে গোড়ার দিকটাও [৯ থেকে ১২ ইঞ্চি] লাগানো যেতে পারে।

ভাল কাঠের দিক দিয়ে এবং রূপশোভন গাছ হিসাবে শিশুগাছের মত আর-একটি গাছ বড় দেখা যায় না। এ গাছ সকলেরই সযত্নে লাগানো উচিত।

উদ্ভিদবিজ্ঞানে শিশুগাছের নাম “ডালবার্জিয়া সিসু” [Dalbergia sissoo]।





শিশুগাছ

মেহগনি

মেহগনি গাছের চেহারা বেশ জমকালো। এর শীর্ষদেশ ঘনপত্রে আচ্ছাদিত থাকে। এ গাছ মূলত মধ্য-আমেরিকার, ১৭৯৫ সালে প্রথম ভারতে আসে। তখন পশ্চিম ভারতীয় স্বীপপুঞ্জ থেকে নানা রকমের নতুন নতুন গাছ এনে শিবপুরের উদ্ভিদ-উদ্যানে লাগানো হচ্ছে।

মেহগনি এদেশের গাছ না হ'লেও, পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় অঞ্চলের উর্বর মাটি আর এখানকার ভিজে গরম হাওয়া তার বড়ই পছন্দ হয়েছে। এখানে এ গাছ খুবই ভাল হচ্ছে। ভারতীয় উদ্ভিদ-উদ্যানে খুব সুন্দর কয়েকটি মেহগনি গাছ রয়েছে। এ রাজ্যের নামজাদা কোন কোন সরকারী রাস্তার পাশে এই গাছের কয়েকটি আশ্চর্য-সুন্দর নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। রাস্তার পাশের ছায়ায় বৃক্ষ হিসাবে এর উপযোগিতাও একান্ত। এ গাছ চির-শ্যামল এবং সারা বছর ধরেই গভীর ছায়া বিস্তার করে।

মেহগনি-কাঠ সুপরিচিত। সারা পৃথিবীর বাজারেই এ কাঠের কদর রয়েছে। এ কাঠ দিয়ে নানা রকমের দামী আসবাব তৈরি হয়।

অণুজীবশেষের প্রতি মেহগনিগাছের বিশেষ আসক্তি দেখা যায়। শুকো আবহাওয়ায় আর অনুর্বর মাটিতে এ গাছ জন্মাতে চায় না। এ গাছ করলে, তার দিকে একটু নজর রাখতে হয়, আর চারা অবস্থায় এ গাছের বিশেষ পরিচর্যা দরকার; তাই বনের চেয়ে বাগানে এ গাছ ভাল হয়। মেহগনিগাছ জন্মানোর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পন্থা হচ্ছে চারাবাগানে বীজ বসিয়ে সযত্নে চারা তৈরি করে, সেই চারা এনে আসল জায়গায় রোপণ করা।

বিদেশের এই গাছটি আমাদের পশ্চিম বাঙলার জলবায়ু-মাটিকে ভালবেসে ফেলেছে; তার মর্যাদা দিয়ে—তাকেও ভালবেসে আমরা যদি গৃহে গৃহে গ্রহণ করি, তাতে আমাদের উপকারই হবে।

উদ্ভিদবিজ্ঞানে মেহগনির নাম হচ্ছে “সুইটেনিয়া মেহগনি [Swietenia mehagoni]।



নিমগাছ

নিমগাছ আমাদের দেশে সকলেরই পরিচিত। এ গাছ একান্তভাবে এই দেশেরই গাছ। এ গাছের প্রতিটি অংশই আমাদের কাজে লাগে—উপকারে লাগে।

গরমের সময়ে বসন্তরোগের প্রতিষেধক হিসাবে ঘরে ঘরে নিমপাতা খাওয়া হয় তরকারির সঙ্গে রান্না করে। নিমপাতা দিয়ে কেউ করেন শুকতো, কেউ নিমবেগুন, কেউ বা শুধু নিমপাতাই ভেজে খান ভাতের সঙ্গে। চর্মরোগে নিমপাতা বিশেষ উপকারী; বেটে লাগালে খোসপাঁচড়া সেরে যায়। তিলতেল বা ঘিএর সঙ্গে নিমপাতা সিদ্ধ করে, সেই নিমতেল বা নিমঘি লাগালে দুরারোগ্য পচা পুরানো ঘাও শুকিয়ে যায়। নিমপাতা খেলে (বেটেই হোক আর তরকারির সঙ্গেই হোক) রক্ত পরিস্কার হয়। নিমের দাঁতন যে দাঁতের কত উপকারী, সে-কথা কে না জানেন! নিমগাছের ছাল আর আঠা নানা রকমের ওষুধ তৈরিতে লাগে। নিমের হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী, তাই আমাদের দেশে লোকে বাড়ির দক্ষিণ দিকে নিমগাছ লাগায়।

পরিণত বয়সের নিমগাছের সার-কাঠ বেশ শক্ত আর ভারি। খয়েরি, লালচে বাদামী, হালকা বাদামী প্রভৃতি নানা বর্ণের বিন্যাসে বিচিত্র এই কাঠ। ঘরের কাঠামো থেকে নানা আসবাব পর্যন্ত তৈরি করার পক্ষে এ কাঠ বিশেষ উপযোগী। নিমের স্বাদ তেতো, এ গাছের কাঠও তেতো, তাই কোন পোকা লেগে ক্ষতি করতে পারে না বলে এ কাঠ বেশ টেকসই হয়।

নিমগাছ সোজা লম্বা ধরনের আর বড় আকারের। ডালগুলো থেকে সরু সরু শাখা বেরোয়, সেইসব শাখার মাথায় গুচ্ছাকার সরু সরু ডাঁটার দৃ' দিকে ছড়িয়ে থাকে পাতাগুলি। পাতার আকৃতি ভারি সুন্দর; আধ ইঞ্চি ঠিক তার চেয়ে একটু বেশি চওড়া

আর ইঞ্চি-তিনেক লম্বা, দৃ' ধার দাঁত-দাঁতমত কাটা-কাটা, আগার দিকে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে, প্রতিটি পাতা এক পাশে একটু বেঁকে আছে। প্রত্যেক ডাঁটিতে মোট পাতার সংখ্যা বেজোড়; ডাঁটির গোড়ার খানিক বাদ দিয়ে, একটু দূরে দূরে জোড়া-জোড়া পাতা দৃ' দিকে ছড়িয়ে আছে—সবশেষে ডাঁটির ডগায় সামনের দিকে ছড়িয়ে আছে একটু ছোট একটি পাতা। কচি অবস্থায় পাতার রঙ লালচে বাদামী, তারপরে ফিকে সবুজ এবং পরিণত অবস্থায় গাঢ় সবুজ। ঘনপত্র আচ্ছাদিত চিরশ্যামল এ-গাছ।

বসন্তকাল থেকে গ্রীষ্মকালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত নিমগাছে ফুল হয়। সরু আর লম্বা লম্বা ডাঁটির গায়ে খুব ছোট ছোট অজস্র সাদা ফুল ফোটে। পাতার ডাঁটি যেখানে শাখা থেকে বেরিয়েছে, তারই জোড় থেকে বেরোয় ফুলের ডাঁটি। হলদে রঙের রেশ্মকেশরের গুচ্ছটিকে ঘিরে উপর মুখ হয়ে ছড়িয়ে থাকে পাঁচটি সাদা পাপড়ি। একটি ফুল বড় জোর সিকি ইঞ্চি চওড়া হয়। অজস্র ফুলের শোভায় নিমগাছ এ সময়ে মনোরম হয়ে ওঠে। ফুলের মধুর লোভে তখন মৌপোকাদের ভিড় আর গুঞ্জন লেগে যায়।

হাতের কঁড়ে আঙুলের ডগার পাবের মত মোটা আর লম্বা ফল হয় নিমগাছে। ফলের রঙ সবুজেটে হলদে। নিমফল থেকে পাওয়া যায় নিমতেল—ক্ষতরোগের খুব ভাল ওষুধ। এ তেল কুষ্ঠরোগেও বিশেষ উপকারী।

এত উপকারী, এত পরিচিত নিমগাছ লাগাতেও আমাদের ওদাসীন্দের অন্ত নেই। অথচ কত সহজে জন্মানো যায় এই গাছ। যেখানে নিমগাছ আছে, বর্ষাকালে তার তলায় বা আশেপাশে গেলেই দেখা যাবে অনাদৃত অজস্র চারার ভিড়। সেখান থেকে সুস্থসবল সতেজ চারা বেছে তুলে নিয়ে এসে

লাগিয়ে দিলেই হ'ল। যেখানে গাছ লাগানো হবে, বর্ষা নামার আগেই কিছু পচাসার মিশিয়ে তার গর্তের মাটিটা তৈরি ক'রে রাখলে খুবই ভাল হয়। তা না হ'লেও, নেহাত অনুর্বর মাটিতেও নিমগাছ বাঁচতে-বাড়তে দেখা যায়, তবে তেমন বড় হয় না। চারা লাগাবার পরে যদি বৃষ্টি না হয় তবে প্রথম কিছুদিন একটু জল দিতে হবে। নতুন মাটিতে চারা ব'সে গেলে তারপরে যত্ন করতে পারলে ভাল, না পারলেও এমন কিছু যায়-আসে না। তবে যত্ন করলে গাছ ভাল হবে, প্রকান্ড হবে, তা না করলে তেমন হবে না—এটা সহজ বুদ্ধির কথা।

নিমগাছের কাঠ ছাল পাতা ফুল ফল সবই এমনই তেতো যে, কী-না-খাওয়া ছাগলে পর্যন্ত তাতে মৃৎ

দেয় না, এ গাছে কোন পোকাও লাগে না। কোন রোগে ধরতেও বড় একটা দেখা যায় না। স্বাদ-গুণে এ গাছে বৃষ্টি রোগেরও অরুচি! কাজেই এ গাছ লাগিয়ে বেড়া দেওয়ার দরকার তো নেই-ই, রোগ-পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্যও বিশেষ মাথা ঘামাবার দরকার হয় না। তবে, চারাকালে নিমগাছের গোড়ার আগাছা-দমনের পরিচর্যাটুকু করা চাই। আগাছা তুলে গাছের গোড়ায় জড় ক'রে দিলে, প'চে সার হবে।

উদ্ভিদবিজ্ঞানে নিমগাছের নাম হচ্ছে
“আজাডিরাচ্টা ইন্ডিকা” [Azadirachta Indica]।

চাষীর শত্রু ইঁদুর

ইঁদুরের ঘম

‘সাইনোগ্যাস’

ক্ষেত-খামারে, গুদামে এবং ধানের গোলার ধারে
ধারে ইঁদুর মারিবার জন্য ‘সাইনোগ্যাস’
ব্যবহার করুন

এর ব্যবহার
সম্বন্ধে আপ-
নাদের কৃষি-
সহায়কের
পরামর্শ নিন

শ ওয়ালেস অ্যান্ড কোং, লিঃ,
৪নং ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট
কলিকাতা-১

শিমূল

শীতের শেষে যখন বসন্ত আসে তখন ফুলে আচ্ছন্ন হয়ে যায় শিমূলগাছ। সেই সময় যদি কেউ পল্লী-অঞ্চলে বেড়াতে যান, এ দৃশ্য দেখে তিনি থমকে দাঁড়াবেন। শিমূলগাছে তখন একটিও পাতা নেই, সব ঝরে গেছে—আছে শুধু টকটকে লাল রঙের ফুল আর ফুল; বড় বড় লাল ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে শিমূলগাছের মাথা। নীল আকাশের পটভূমিতে শিমূলগাছের উচ্চশীর্ষে এই রঙরঙের সমারোহ দর্শকের মনকে মগ্ন অভিভূত করে তোলে।

আমাদের দেশের লোকের কাছে এ দৃশ্য অবশ্য অভিনব কিছুর নয়। আমাদের পল্লীবাসীরা বছর-বছরই এ শোভা দেখে আসছে। কেননা, শিমূল এদেশে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত—পাহাড়ের সাড়ে তিন হাজার ফুট উচ্চভূমি থেকে সমতল অঞ্চল পর্যন্ত সব জায়গাতেই জন্মায়। এমন বিশ্বপ্রেমিক গাছ ভারতে আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। খটখটে শুকনো আবহাওয়া আর বন্য ভিজে আবহাওয়া—উভয়ের প্রতিই শিমূলের সমান অনুরাগ।

এ গাছ খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়। শিমূলের কাঠ নরম আর হালকা রঙের। দিয়াশলাইএর কারখানায় এ কাঠের খুব চাহিদা। কমদামী তেপল-কাঠ বা ‘প্লাই-উড’ এবং প্যাকিং বাক্স তৈরি করতেও এ কাঠ ব্যবহার করা হয়। শিমূলকাঠের দাম কম, কিন্তু চাহিদা বেশি বলে আর গাছ খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে কাঠের যোগান দিতে পারে বলে শিমূলের দাম বেশ লাভজনক। বালিশ, গদি প্রভৃতি তৈরিতে

শিমূল তুলোরও খুব চাহিদা এবং এ তুলো বাজারে বেশ দামে বিক্রয়। গবাদির খাদ্য হিসাবে শিমূলের পাতাও উপেক্ষণীয় নয়। শিমূল ফুলের পাপাড়ি বেশ মোটা, অজস্র ফুল গাছতলায় পড়ে গাদা হয়ে পচে। চাষের জমির জন্য এ দিয়ে ভাল পচাসার তৈরি হতে পারে। ওষুধ তৈরিতে শিমূলগাছের শিকড়ের ছাল প্রয়োজনীয় জিনিস। কাজেই এ গাছের সকল অংশই আমাদের কাজে লাগে।

জল-জমা মাটি আর একেবারে রসহীন শুকনো মাটি ছাড়া আর সব রকম মাটিতেই শিমূলগাছ ভাল হয়। এই গাছ করার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে—চারাতলায় বা হাপোরে বীজ বসিয়ে চারা তৈরি করে, সেই চারা আসল জমিতে নিয়ে রোপণ করা। চারার মূল সমেত কাণ্ডের এক বিষয় কি তার একটু বেশি রেখে, বাকি ডগাটা কেটে ফেলে সেই গোড়া লাগিয়েও গাছ করা যায়।

শিমূলগাছ অতি সহজেই জন্মানো যায় এবং গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে এ গাছ জন্মানো উচিত। আমাদের দিয়াশলাই-শিল্প শিমূলকাঠের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং এ কাঠের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। একজন সাধারণ চাষীও তাঁর জমির কোণে এ গাছ লাগিয়ে আর্থিক দিক দিয়ে কিছু স্ৱাহা করতে পারেন।

উদ্ভিদবিজ্ঞানে শিমূলগাছকে বলা হয় “শাল্মলিয়া মালাবারিকাম্” অথবা “বোম্বাক্স মালাবারিকাম্” [Salmaaliala malabaricum or Bombax malabaricum]।

বর্ষণবৃক্ষ

ছায়াতরু হিসাবে বর্ষণবৃক্ষের তুলনা হয় না। এ গাছ আকারে বড় আর খুব ছড়ানে। পাতা দেখতে তেঁতুলপাতার ধরনের কিন্তু আরও বড় এবং আরও লম্বাটে। লম্বা ডাঁটার দু'দিকে তেঁতুলপাতা যেভাবে পাখির পালকের ধরনে সাজানো থাকে, এর পাতার বিন্যাসও সেই রকম। ঘন পাতার স্তবকে গাছের শীর্ষদেশটা আচ্ছন্ন থাকে বলে নিচে ছায়া হয় ভাল। রাস্তার দু' পাশে এ গাছ সারি সারি লাগিয়ে দিলে, ছড়ানে স্বভাবের গুণে পাশাপাশি একটা গাছের সঙ্গে আর-একটা গাছের এবং রাস্তার এধারের গাছের সঙ্গে ওধারের গাছের ডালপালা লেগে যায়। ফলে সারা রাস্তায় একটা নিশ্চিদ্র ছায়া বিরাজ করে আর মনে হয় যেন সারা রাস্তার উপর দিকটাতে ঘনশ্যাম পত্রের একটা চন্দ্রাতপ খাটানো রয়েছে।

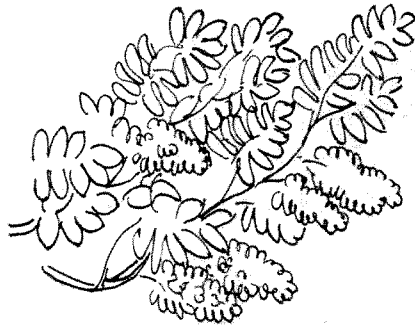
বর্ষণবৃক্ষের আদিভূমি মধ্য-আমেরিকা। এ গাছ বেশ তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং ৮০-৯০ ফুট উঁচু হয়। লম্বা ছড়ানে ডালগুলো বেশ শক্ত হয়। গাছের কান্ড সোজাভাবে খানিকটা উঠতে-না-উঠতেই ডাল ছড়িয়ে পড়ে।

এ গাছে দু'বার ফুল হয়—একবার পৌষ মাসে এবং আর-একবার ফাল্গুন থেকে বৈশাখ মাসের

মধ্যে। বছরের অন্যান্য সময়েও কিছু কিছু ফুল দেখা যায়। একটি কেন্দ্রবিন্দু থেকে গোলাকারে ছড়িয়ে সরু সরু রেশমগুচ্ছের মত ১৫-২০টি ফুল বেরোয়; প্রত্যেক ফুলের গোড়াটা সবুজ আবরণে ঢাকা, তা থেকে নির্গত গুচ্ছের নিচের দিকটা সাদা আর উপর দিকটা গোলাপী। এর এক-একটা পুষ্প-স্তবকে এক-একটা বড় ফুলের মত মনে হয়।

এ গাছের পাতাগুলি দিনের আলোয় দু'দিকে সটান ছড়িয়ে থাকে, কিন্তু রাতের বেলা কিংবা আবহাওয়া খারাপ হলে ডাঁটির উপর লম্বালম্বি শূয়ে পড়ে। এ গাছ থেকে মাঝে মাঝে এক রকমের জলীয় পদার্থ ব'রে পড়ে নিচেকার মাটিকে ভিজিয়ে রাখে; এইজন্যই একে বলা হয় বর্ষণবৃক্ষ। এ গাছের শিকড় মাটির গভীরদেশে যায় না, তাই প্রবল ঝড়ে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। তবে এক-সঙ্গে অনেক গাছ সারিবদ্ধ অবস্থায় থাকলে ঝড়ে বিশেষ ক্ষতি করতে পারে না। এ গাছের কাঠ জ্বালানি হিসাবে খুব ভাল।

উদ্ভিদবিজ্ঞানে বর্ষণগাছকে বলা হয় “পিথে-কলোবিয়াম সামান” [Pithecolobium saman] বা “সামানিয়া সামান” [Samanea saman]



বাবলাগাছ

আমাদের পল্লী-অঞ্চলে অনেক জায়গায় দেখা যায়, দিকজোড়া চাষের মাঠ খাঁ খাঁ করছে, তার মধ্যে কোথাও একটি গাছ নেই। গাছ না থাকার ফলে এসব জমির উপরকার মাটি শুকিয়ে সহজেই বাতাসে উড়ে আর বৃষ্টিতে ধুয়ে বেরিয়ে যায় এবং জমি অনুর্বর হয়ে পড়ে।

এই খোয়াই বন্ধ করার জন্য এবং মাটির নিচেকার জলস্তর যাতে উপরদিকে থাকে তার জন্যও এসব জমির আল ধরে গাছ লাগানো দরকার। কিন্তু যে-কোন গাছ লাগানো চলে না। ঘনপত্র গাছ লাগালে চাষের জমির উপর তার নিবিড় ছায়া পড়বে এবং সেই ছায়াঢাকা জায়গাতে চাষ ভাল হবে না। এমন গাছ লাগানো দরকার যার পাতা ছোট, সংখ্যায়ও অল্প, সুতরাং ছায়া হয় কম।

বাবলা এই রকম একটা গাছ। আকারে এ গাছ বড় হয় না—৪০ ফুটের বেশি উঁচু হ'তে বড়-একটা দেখা যায় না। এর পত্রগুচ্ছ ফাঁকা ফাঁকা। সরু সরু ডাঁটার দু'দিকে তেঁতুলপাতার ধরনের পাতা হয়। ডালের যেখান থেকে পাতার ডাঁটা বেরোয় সেখানে দু'তিনটি শক্ত লম্বা তীক্ষ্ণাগ্র কাঁটা হয়। বর্ষাকালের আর শীতকালের গোড়ার দিকে হলদে রঙের ছোট ছোট গোলাকার ফুল হয়। কোন কোন জায়গায় সারা বছরই কিছু কিছু ফুল হয়। এ গাছের ফল হচ্ছে লম্বা আকারের শনুটি। প্রতিটি শনুটি ৩-৪ ইঞ্চি থেকে ৫-৬ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা

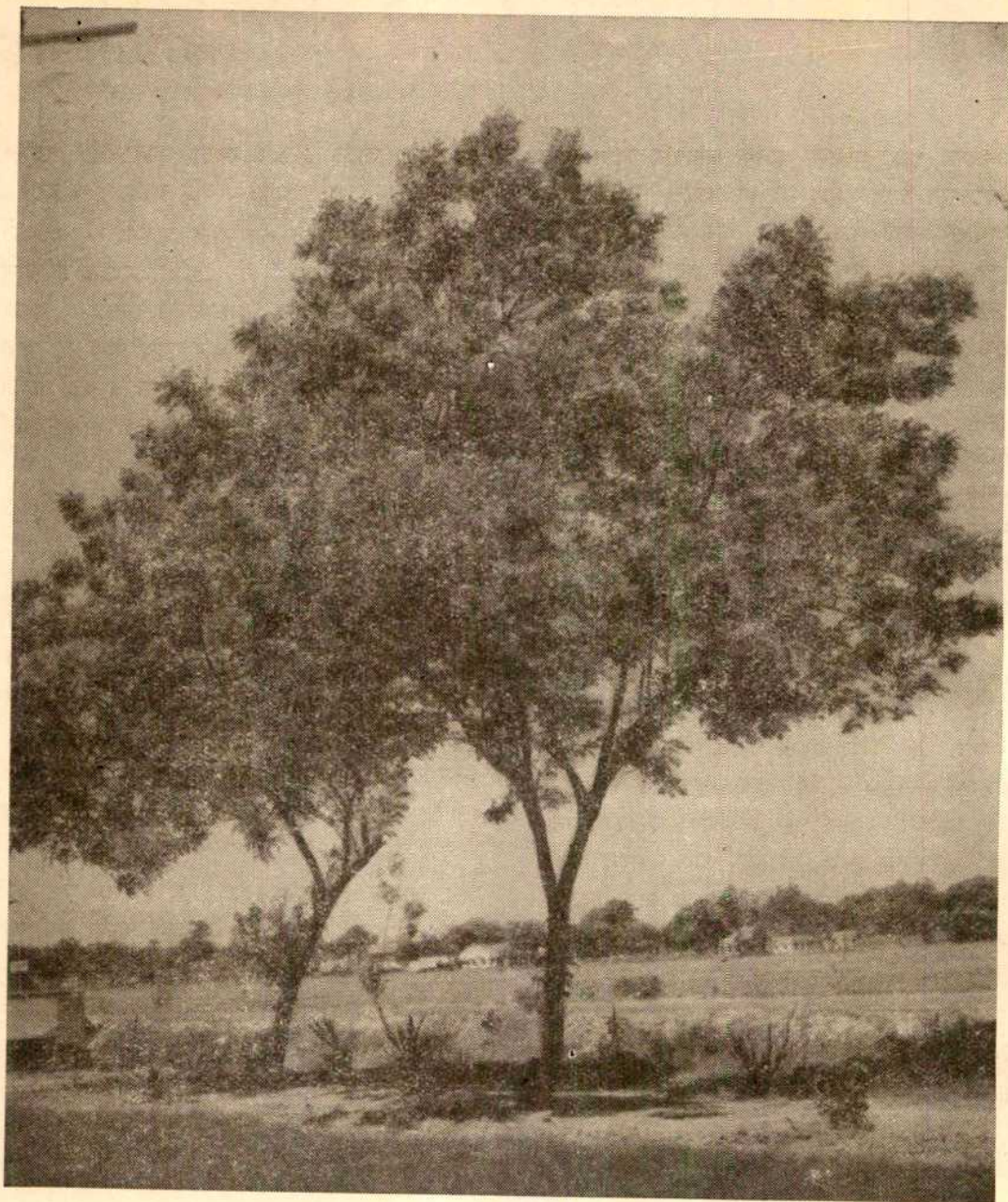
হয় এবং তাতে ৫-৬টি থেকে ৮-১০টি পর্যন্ত গাঁট থাকে। প্রতি গাঁটে একটি করে বীজ হয়।

বাবলার কাঠ খুব শক্ত আর টেকসই। এ কাঠ দিয়ে গাড়ির চাকা, কৃষি-যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ভাল তৈরি হয়। বাবলার ছাল চামড়া-কষানোর কাজে লাগে। এ গাছের আঠা 'গদ'রূপে বাজারে বিক্রি হয়, কাঁটা আলপিনের পরিবর্তে ব্যবহার করা চলে। বাবলার পাতা গবাদির পুষ্টিকর খাদ্য। এ পাতা জমিতে পচতে দিলে ভাল সার হয়।

ক্ষেতের আলের ওপর ২০ ফুট অন্তর মাদা তৈরি করে তাতে বীজ লাগিয়ে গাছ তোলা যায় অথবা অন্যত্র বীজ লাগিয়ে চারা তৈরি করে, সেই চারা এনে মাদায় লাগিয়ে দেওয়া চলে। বর্ষাকালে গাছ করতে হয়। বৃষ্টি না হলে প্রথমদিকে চারায় জল দিতে হয়। চারার শিকড় মাটিতে বসে গেলে আর জল দেওয়ার দরকার হয় না। চারা অবস্থায় তার গোড়ার আগাছা মেরে দিলে ভাল হয়; গাছ একটু বড় হলে আর কোন পরিচর্যা দরকার হয় না।

বাবলাগাছ শুকনো বেলে জমি থেকেও রস আহরণ করে বাঁচে-বাড়ে; কাজেই শুকো এলাকায় লাগাবার পক্ষে এ গাছ বিশেষ উপযোগী। বাবলাগাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং জ্বালানি হিসাবে এর কাঠ খুব ভাল।

উদ্ভিদবিজ্ঞানে বাবলাগাছকে বলা হয় “অ্যাকা-সিয়া অ্যারাবিকা” [Acacia arabica]



গ্লাইরিসিডিয়া স্যাকুলেটাঃ এ গাছের পাতা দিয়ে সবুজসার হয়। এই পাতা আবার গোরুর পুষ্টিকর খাদ্য। ক্ষেতের ধারে আলের উপর অথবা বাঁধের উপর এ গাছ জন্মানো চলে। এর কাঠ দিয়ে ভাল জ্বালানি হয়। চাষের জমির ধারে ধারে এ গাছ লাগিয়ে দিলে চাষীদের যথেষ্ট লাভ হয়। চুঁচুড়ার সরকারী কৃষিক্ষেত্রে এ গাছ লাগানো হয়েছে।

বনমহোৎসব

ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ,

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও পশুপালন মন্ত্রী

জাতীয় উৎসবরূপে গত সাত বছর ধরে আমরা বনমহোৎসব পালন করে চলেছি। বর্ষার প্রারম্ভে এবার আমরা অষ্টম বনমহোৎসবের সূচনা করছি। আজ এই শুভ অনুষ্ঠানের সূচনায় আমার দেশ-বাসীদের আমি দূর চারটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

বন আমাদের জাতীয় সম্পদ। অরণ্যের সঙ্গে কৃষির, বৃক্ষের সঙ্গে মানুষের জীবনের রয়েছে চিরন্তন অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। মানুষ প্রকৃতির কোলেই লালিত এবং তার জীবনধারা প্রাকৃতিক সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাঁধা। পৃথিবীর বৃক্ষে জন্ম নেয় বৃক্ষশিশু। মাটির বৃক্ষ থেকে সে আপন পুষ্টির জন্য আহরণ করে প্রাণিজগতের অব্যবহার্য খাদ্য-রস। নিজের বৃক্ষের জন্য সে অন্য কোন প্রাণীর খাদ্যে ভাগ বসায় না। এই বৃক্ষ নিজের জীবন দিয়ে আমাদের জীবনকে পালন ও পরিপুষ্ট করছে। প্রতিক্ষণে সে দূষিত অংশ গ্রহণ করে বায়ুকে নির্মল করছে, উন্মুক্ত প্রকৃতির উষ্ণতাকে শীতল করছে। সূর্যকিরণকে কাজে লাগিয়ে সে প্রাণিজগতকে যোগাচ্ছে তার অপরিহার্য শর্করা-জাতীয় খাদ্য। অমূল্য সম্পদ মাটিকে সে রক্ষা করছে, ভূমিকে সরস করছে আর পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ প্রভৃতিকে লালন করছে। তৃণগুল্ম-বৃক্ষহীন বন্য ভূমি প্রাণিজগতের বাসের অযোগ্য। প্রকৃতির সামরক্ষায় ও মানুষের জীবনধারণের জন্য মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীও অস্তিত্ব অপরিহার্য। পৃষ্ঠিতে তাই উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণিজগৎ এক বিচিত্র পারস্পরিক সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলেছে। তরুলতা না থাকলে এই সামঞ্জস্য ব্যাহত হয় এবং তার ফলে মানুষের জীবনে দেখা দেয় নানা দুর্ভোগ।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নানাভাবে বৃক্ষসম্পদের ব্যবহার করে চলেছে। বৃক্ষের দ্বারা সে যে শুধু তার দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণ করছে তাই নয়, নানা শিল্পকাজ করে অর্থাগমেরও সংস্থান করছে। ক্রমশ ব্যাপক ব্যবহারের ফলে আজ তাই বনজ সম্পদ আমাদের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। কাঠ, কাগজ, জ্বালানি, ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি নানা প্রয়োজনে আজ বৃক্ষের সমাদর। বনজ সম্পদের নিরঙ্কুশ ব্যবহারের ফলে দেশ ক্রমেই রিক্ত ও রুদ্ধ হয়ে পড়ছে, অন্য দিকে বনজ সম্পদের অভাবে মানুষের জীবনযাত্রায় দেখা দিচ্ছে নানা দুর্গতি।

ঘন-তরুণবোঁট শ্যামল সিন্ধু পল্লী-অঞ্চলও আজ তন্ত নিরাভরণ হয়ে পড়ছে। পূর্বের সে সৌন্দর্য নেই, সে সরসতা নেই, ফলফুলের সে সমারোহ নেই। পল্লীবাসীরা জ্বালানির অভাবে গোবরসার নষ্ট করছে। ফলবান বৃক্ষের অভাবে মানুষের দেহে ঘটছে পুষ্টির অভাব। সরসতার অভাবে জমি অনুর্বর হয়ে পড়ছে, বৃষ্টির অভাবে সময়ে চাষ হচ্ছে না, তৃণের অভাবে গো-সম্পদের অবনতি ঘটছে, ভূমিক্ষয়ের ফলে দেখা দিচ্ছে মাটির কঙ্কাল।

যেখানে কম পক্ষে মোট জমির চার ভাগের এক ভাগে বনসম্পদ থাকা নিতান্ত প্রয়োজন, পশ্চিম বাঙলায় সেখানে বন আছে মোটে তার অর্ধেকের চেয়ে কিছু বেশি জমিতে। এর থেকেই বোঝা যায় অরণ্যসম্পদে আমরা কত দরিদ্র। আমাদের দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনে এই দারিদ্র্য প্রতিফলিত হতে বাধ্য। এর ফলে আমাদের অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদও কমে গিয়েছে এবং আমরা যে প্রাকৃতিক

অসামঞ্জস্যের সম্মুখীন হয়েছি তার নানা প্রতিক্রিয়া আজ আমাদের জীবনকে পঙ্গু করে তুলেছে।

আজ বনমহোৎসবের এই ব্যাপক তাৎপর্য যদি দেশের প্রতিটি লোক উপলব্ধি না করেন, তবে ভবিষ্যতে আমাদের আরও কঠোর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে।

গত সাত বছরে বনমহোৎসব উপলক্ষে আমরা কত গাছ লাগিয়েছি সেটাই বড় কথা নয়। দেশের প্রত্যেকটি লোককে দেখতে হবে যে, যত গাছ লাগানো হয়েছে তার মধ্যে কতগুলোকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি—জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করতে ব্যক্তিগতভাবে আমরা কতটা সাহায্য করেছি।

বৃক্ষরোপণের মূলগত তাৎপর্য বুঝে নিয়ে আমরা যদি এ বছর বনমহোৎসব পালনে রতী হই তবে প্রত্যেক লোককে নিজের জমিতে এবং নিজের এলাকায় সংঘবদ্ধভাবে একটা নির্দিষ্ট কর্ম-সূচি ও লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে। বনমহোৎসবের মাসে সরকারী কৃষিবিভাগ ও বনবিভাগ থেকে বহু চারা আর কলম বিতরণ করা হয়। তা হ'লেও এটা ঠিক যে, দেশের সকল জায়গায় সকলকে প্রয়োজনমত আর পছন্দমত গাছ দেওয়া যায় না। তাই আগে থাকতেই সকলকে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী চারা বা কলম সংগ্রহের জন্য উদ্যোগী হ'তে হবে।

বৃক্ষরোপণের জন্যই আমাদের দেশের রথের মেলায় মেলায় বহু চারা আর কলম বিক্রি হয়। কিন্তু যেমন-তেমন চারা বা কলম কেউ কিনবেন না। পরিচিত বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান বা লোক থেকে চারা বা কলম কিনে লাগাতে হবে। নিজেরা চারা বা কলম তৈরি করে নিলে তো কথাই নেই। এ উৎসবের প্রকৃত অর্থটা ভাল করে বুঝে নিয়ে এর পালনে উৎসাহী হ'লে পরস্পরের সহযোগিতায় খুব ভাল ফল আশা করা যায়। অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে দেখা যায়, সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক আর ছাত্রেরা মিলে প্রতি বছর সুপারিকল্পিতভাবে লক্ষ

লক্ষ গাছ লাগান এবং সমস্ত সেগুন্দির প্রতিপালন করেন। আমাদের দেশেও শিক্ষকমহাশয়দের সহযোগিতায় ছাত্রদের দ্বারা এ কাজ খুব ভালভাবে হ'তে পারে। প্রতিটি ছাত্র তিন-চারটি করে গাছ বাঁচাতে পারলেও দেশে কয়েক লক্ষ গাছ দাঁড়িয়ে যাবে।

নিজের নিজের জমিতে ছাড়াও পুকুরপাড়ে, গ্রামের বারোয়ারি জমিতে, রাস্তার ধারে নানা রকম গাছ লাগানো যেতে পারে। প্রত্যেক গ্রামে এইসব গাছ বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব গ্রামবাসীদেরই নিতে হবে। বাড়ির পরিবেশকে সুন্দর করে তুলতে নানা রকমের বড় জাতের ফলগাছ লাগানো যেতে পারে। বাড়িবাপটা থেকে বাড়িঘর রক্ষা করার জন্য চারদিক ঘিরে ঝাউ বা এমনি ধরনের গাছের সারি লাগিয়ে দিলে বাড়ির দৃশ্যও মনোরম হয়। নিজেদের পুষ্টির প্রয়োজনে ফলের গাছ তো লাগাতেই হবে, তার উপর পল্লীবাসীরা জ্বালানি কাঠের গাছ লাগিয়ে কৃষির প্রয়োজনে গোবরসার বাঁচাবার কথাটাও ভুলবেন না।

নারকেল, আম, জাম, জামরুল, পেয়ারা, সফেদা, কাঁঠাল, লেবু, কামরাঙা, করমচা ইত্যাদির দেশ পশ্চিম বাঙলায় আজ বাইরে থেকে ফল আমদানি করতে হয়। নিজেদের কথা দূরে থাকুক, আমাদের ছেলেমেয়েরাও দূরটো ফল খেতে পায় না। অসুখ-বিসুখে, পুষ্টিপার্বণে ফল জোটে না। বৃক্ষরোপণের সময় এদিকে আমার দেশবাসীরা অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন।

যে উৎসবের মধ্যে জাতির কল্যাণ নিহিত, সেই তো জাতীয় উৎসব। দেশের প্রতিটি অধিবাসী তাঁর সকল শক্তি আর উৎসাহ নিয়োজিত করে বনমহোৎসবের মহারত পালনে দেশকে সমৃদ্ধ করে তুলুন, এই আমার আবেদন।

পহেলা জুলাই কলিকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত
ভাষণ অবলম্বনে

পরিশিষ্ট

এ বছর (১৯৫৭) বৃক্ষরোপণ উপলক্ষে কৃষি-অধিকার কর্তৃক যেসব জায়গা থেকে গাছের চারা বণ্টন করা হবে সেইসব জায়গার ঠিকানা নিচে দেওয়া হ'ল:

পূর্ব অঞ্চল

(১) ফরেস্ট ইউটিলিজেশন অফিস, রাইটার্স বিল্ডিংস-এর একতলায় ২নং গেট।

(২) চু'চুড়া কৃষি ফার্ম, চু'চুড়া।

(৩) হাটিকালচার্যাল স্টেশন, কৃষ্ণনগর।

(৪) সরকারী নারিকেল বাগান, রানীর বাগান, চন্দননগর।

পশ্চিম অঞ্চল

(১) জেলা কৃষি ফার্ম—বর্ধমান ও মেদিনীপুর।

(২) পোলার্ট্রি মাল্টিপলিকেশন সেন্টার, মেদিনী-পুর।

উত্তর অঞ্চল

(১) সরকারী কৃষি ফার্ম, ময়নাগুড়ি।

(২) সরকারী কৃষি ফার্ম, কালিম্পাঙ।

(৩) সরকারী কৃষি ফার্ম, কোচবিহার।

(৪) সরকারী কৃষি ফার্ম, মালদহ।

এ ছাড়া শিবপুর ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান থেকেও চারাগাছ বিতরণ করা হবে। বনবিভাগের তরফ থেকে যে চারাগাছ বিতরণ করা হবে তা পাবার বিভিন্ন ঠিকানা নিচে দেওয়া হ'ল:

দার্জিলিং

দার্জিলিং—কাছারিবাড়ি, দার্জিলিং (উপ-মহা-ধ্যক্ষের করণ); বাচ'হিল উদ্যান; রিমবিক বন-করণ; জোড়া-বাঙলা বন-করণ; তাকদা বন-করণ; সুখিয়া-পোখারী বন-করণ; লোপচু বন-করণ; তিস্তা ব্রিজ বন-করণ; বাতাসি বন-করণ।

কার্সিয়াঙ—মহকুমা-শাসকের করণ, কার্সিয়াঙ; পাংখাবাড়ি বন-করণ; শুকনা বন-করণ; বাগ-ডোগরা বন-করণ; কার্সিয়াঙ বন-করণ; সিভক বন-করণ।

শিলিগুড়ি—মহকুমা-শাসকের করণ, শিলিগুড়ি।

কালিম্পাঙ—বিভাগীয় বন-করণ, কালিম্পাঙ; চুনাভাটি বন-করণ; আলগড়া বন-করণ; সামসিং বন-করণ।

জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি—বিভাগীয় বন-করণ, জলপাইগুড়ি; কাটামবাড়ি বন-করণ; চলসা বন-করণ; লাটাগুড়ি বন-করণ; গয়েরকাটা বন-করণ; বেলাকোবা, সিভক রোড, মাল, ওদলাবাড়ী বনকরণ।

আলিপুরদুয়ার—মাদারীহাট বন-করণ; নীল-পাড়া বন-করণ; চিলাপাতা বন-করণ; রাজাভাত-খাওয়া বন-করণ; দমনপুর বন-করণ; কুমারগ্রাম-দুয়ার বন-করণ; বঙ্গাদুয়ার বন-করণ; জলদা-পাড়া বন-করণ; রায়ডক বন-করণ।

কোচবিহার

কোচবিহার—কোচবিহার বন-করণ।

মেকালিগঞ্জ—মেকালিগঞ্জ বন-করণ।

দীনহাটা—দীনহাটা বন-করণ।

মাথাভাঙ্গা—মাথাভাঙ্গা বন-করণ।

কালিকাতা

ফরেস্ট ইউটিলিজেশন অফিস, রাইটার্স বিল্ডিংস-এর একতলায় ২নং গেট।

হাওড়া

হাওড়া—জেলাশাসকের করণ, হাওড়া।

উলুবাড়িয়া—মহকুমা-শাসকের করণ, উলুবাড়িয়া।

বঙ্গবন্দর : ১০ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

চন্দ্রশপরিগণনা :

আলিপুর—বিভাগীয় বন-করণ, আলিপুর।

বারাসত—মহকুমা-শাসকের করণ, বারাসত।

বসিরহাট—মহকুমা-শাসকের করণ, বসিরহাট।

ডায়মন্ডহারবার—মহকুমা-শাসকের করণ, ডায়মন্ড-হারবার।

বারাকপুর—মহকুমা-শাসকের করণ, বারাকপুর।

নদিয়া

কৃষ্ণনগর—বিভাগীয় বন-করণ, কৃষ্ণনগর ; কৃষি-বীজভান্ডার, কৃষ্ণনগর ; বেথুয়াডহরী বন-করণ ; কৃষি-পরিদর্শকের করণ, শান্তিপুর।

রানাসাট—কৃষি-পরিদর্শকের করণ, রানাসাট ; কৃষি-পরিদর্শকের করণ, চাকদা ; কৃষি-পরিদর্শকের করণ, তেহট ; কৃষি-পরিদর্শকের করণ, দেবগ্রাম ; কৃষি-পরিদর্শকের করণ, নবম্বীপ, চাপরা থানা।

বনগ্রাম—মহকুমা-শাসকের করণ, বনগ্রাম।

মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর—জেলা-শাসকের করণ, বহরমপুর।

লালবাগ—মহকুমা-শাসকের করণ, লালবাগ।

কান্দি—মহকুমা-শাসকের করণ, কান্দি।

জংগীপুর—মহকুমা-শাসকের করণ, জংগীপুর ; মণিগ্রাম বন-করণ।

চুঁচুড়া

চুঁচুড়া—জেলা-শাসকের করণ, চুঁচুড়া।

শ্রীরামপুর—মহকুমা-শাসকের করণ, শ্রীরামপুর।

আরামবাগ—মহকুমা-শাসকের করণ, আরামবাগ ; আরামবাগ বন-করণ ; ভাদুর বন-করণ।

বর্ধমান

বর্ধমান—জেলাশাসকের করণ, বর্ধমান ; বর্ধমান বন-করণ ; দুর্গাপুর, পানাগড়, গুদসকরার বন-করণ।

আসানসোল—আসানসোল ও উখড়া বন-করণ ; কালনা মহকুমা-শাসকের করণ ; কাটোয়া মহকুমা-শাসকের করণ।

বীরভূম

সিউড়ি—জেলাশাসকের করণ, সিউড়ি ; সিউড়ি বন-করণ ; বোলপুর, হেতমপুর ও কচুজোরের বন-করণ ; চন্দ্রপুর, প্যাটেলনগর বন-করণ।

রামপুরহাট—মহকুমা-শাসকের করণ, রামপুরহাট ; রামপুরহাট বন-করণ ; মহকুমা কৃষি-করণ, রামপুরহাট।

বাঁকুড়া

বাঁকুড়া—বন-করণ, বাঁকুড়া ; শালতোড়া, অমর-কানন ও সোনামুখী বন-করণ ; রানীবাঁধ, ছাতনা, শিমলাপাল, পাত্রসায়ের, মেজিয়া বন-করণ।

বিষ্ণুপুর—মহকুমা-শাসকের করণ, বিষ্ণুপুর ; খাতরা বন-করণ ; ওন্দা, চাকদহ নাসারী বন-করণ।

মেদিনীপুর

মেদিনীপুর—জেলাশাসকের করণ, মেদিনীপুর ; গোয়ালটোর ও গড়বেতা বন-করণ।

ঝাড়গ্রাম—মহকুমা-শাসকের করণ, ঝাড়গ্রাম ; বেলপাহাড়ী, জামবনী, নয়াগ্রাম, দাঁতন, বিনপুর, হিজলী ও আমতলি বন-করণ।

ঘাটাল—মহকুমা-শাসকের করণ, ঘাটাল।

তমলুক—মহকুমা-শাসকের করণ, তমলুক।

কাঁথি—মহকুমা-শাসকের করণ, কাঁথি ; দিঘা বন-করণ।

পশ্চিম দিনাজপুর

দিনাজপুর—জেলা-শাসকের করণ, বালুরঘাট ; ডাঙ্গা ও হেমতাবাদ বন-করণ।

মালদহ

মালদহ—বিভাগীয় বন-করণ, মালদহ বন-করণ ; সিংগাবাদ, জামালপুর, রাজদীঘি ও ভালুকা রোড বন-করণ।

বনমহোৎসবে গাছ লাগানোর হিসাব

গাছ লাগানো হয়েছে			গাছ বেঁচেছে			বেঁচেছে শতকরা
ফলের গাছ	অন্যান্য গাছ	মোট	ফলের গাছ	অন্যান্য গাছ	মোট	
১৯৫০-- ৭,২৬,১৯৬	১২,০৮,৫৪০	১৯,৩৪,৭৩৬	৩,০৭,২৮৮	৪,০২,৮৭৫	৭,১০,১৬৩	৩৭
১৯৫১-- ৬,৪৭,৭২৩	১১,০০,৩৮৩	১৭,৪৮,১০৬	২,৭৮,৬৩৬	৪,২৮,৩৩৮	৭,০৬,৯৭৪	৪০
১৯৫২-- ৪,৪০,২৫৬	৩৭,৪১,৮১৮	৪১,৮২,০৭৪	২,৪৮,৯৬৫	২০,২৮,৯৭২	২২,৭৭,৯৩৭	৫৪
১৯৫৩-- ৪,০৩,৭৪৩	১৮,৮৯,৫২০	২২,৯৩,২৬৩	২,৪৩,০৯৩	১৩,৩৪,৫৪৮	১৫,৭৭,৬৪১	৬৯
১৯৫৪-- ৩,৬৭,৫৭৫	১০,৫৩,০৭৩	১৪,২০,৬৪৮	২,৪৫,৫১৯	৫,০৭,৭৯০	৭,৫৩,৩০৯	৫৩
১৯৫৫-- ৩,২৬,৩১০	৩৩,৮০,৭৬০	৩৭,০৭,০৭০	২,১৪,৯৬০	১১,৬৯,৭৬৬	১৩,৮৪,৭২৬	৩৭

বন-অধিকার কর্তৃক বিনামূল্যে চারা দেওয়া হয়েছে			কৃষি-অধিকার কর্তৃক কলম ও চারা বিক্রি হয়েছে		
১৯৫০	..	..	৫,৬৯,৩৪৭	৪,৬০০	
১৯৫১	..	..	৩,৮৭,৮০৩	৭৯,৭১৮	
১৯৫২	..	..	৪,০৯,৫৮২	১৩,৮৫৪	
১৯৫৩	..	..	৩,৩৫,৩৭৯	১,১৫,৭০৫	
১৯৫৪	..	..	৪,৪৮,৬৫২	২৯,০৯৬	
১৯৫৫	..	..	৫,১১,৪৩৪	৫৪,৯৮০	
১৯৫৬	..	..	৫,৪২,৩৫৭	..	

উদ্ভিদ-উদ্যান-অধিকার কর্তৃক বিনামূল্যে চারা দেওয়া হয়েছে--

১৯৫৩	..	..	৩,৩৮২
১৯৫৪	..	..	৮,১৩৯
১৯৫৫	..	..	৪,৫৭৬
১৯৫৬	..	..	৫,৫৬৯

শ্রেষ্ঠ জেলা	শ্রেষ্ঠ গ্রাম	শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান	শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫০ বর্ধমান	দুর্গা, থানা কাঁধি, জেলা মেদিনীপুর।	পানিয়া সারদাবাদ সর্বাধিকারক সমবায় সমিতি।*	বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।†
লাগানো হয়েছে ৩,৮৩,৮৩২	১০,৬৪৯	৬৭,৩৩১	১৮,৪৫৮
বেঁচেছে ১,৪৭,৫২৬	৬,৯৭১	৬১,২৪০	৯,৮১৪

*১৯৫০ সালের ফলাফলের উপর এ প্রতিষ্ঠান সর্বাধিকারক "সদার প্যাটেল শীল্ড" পেয়েছে।

†১৯৫০ সালের ফলাফলের উপর এ বিশ্ববিদ্যালয় সর্বাধিকারক "বুন্সী শীল্ড" পেয়েছে।

বঙ্গবন্ধু : ১০ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

শ্রেষ্ঠ জেলা	শ্রেষ্ঠ গ্রাম	শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান	শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫১ মেদিনীপুর লাগানো হয়েছে ৭,৫৫,৩৪৮ .. বৈচেছে ২,১৪,২৬২ ..	বারিদা, থানা কাঁথি, জেলা মেদিনীপুর। ১৬,৬৫৪ ১৬,২৬৪	'ডক্টর গ্রাহামস্ হোমস্' কালিম্পঙ্ক, দার্জিলিং। ২৪,৩৫৫ ১৮,২৬৪	বিশ্ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ১১,৩৭৬ ৮,৩৯৩
১৯৫২ মেদিনীপুর লাগানো হয়েছে ৩৩,৬৪,০৬৩ .. বৈচেছে ১৮,৫৭,১২০ ..	লাক্ষা, থানা মহিষাদল, জেলা মেদিনীপুর। ৬,৫৮,১৬০ ৪,৪৭,২২০	লাক্ষা পুদর্শনী* প্রতিষ্ঠান, জেলা মেদিনীপুর। ৬,৫৮,১৬০ ৪,৪৭,২২০	বিশ্ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৫,৬৭৮ ৪,৩৪৭
১৯৫৩ মেদিনীপুর লাগানো হয়েছে ১৫,৪৮,৭৭৭ .. বৈচেছে ১১,৪২,৪৭৪ ..	বেথকুণ্ডু, তমলুক, জেলা মেদিনীপুর।† ১,১০,১৬১ ১,০৮,০৫২	পানিসিটি সেনাদল, জেলা মেদিনীপুর। ১,০০,৮৪৯ ৫৬,২৩৪	বিশ্ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৮,৯৭১ ৫,৭৫১
১৯৫৪ নদিয়া লাগানো হয়েছে ৯৯,৭৮৮ .. বৈচেছে ৭৫,৩৯৪ ..	দেবগুাম, নদিয়া ১৭,৫১৮ ১২,৩৪০	পানিসিটি ভূমিসেনাদল, জেলা মেদিনীপুর। ৮,৮৭০ ৫,১২২	বিশ্ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৭,৬৩৮ ৫,৭৭০
১৯৫৫ মেদিনীপুর লাগানো হয়েছে ২৯,৭৫,৬৮৭ .. বৈচেছে ৯,০৩,৩৬২ ..	চৌধা চুলী, মেদিনীপুর। ১,৫৭,৯৭০ ১,৪৬,৮০৬	কামারদা ইঃ বোর্ড। ৫০,৫০০ ৪১,৭৫০	বিশ্ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৪,৩৩৫ ৩,৬২০

*১৯৫২ সালের ফলাফলের উপর এই প্রতিষ্ঠান সর্বভারতীয় 'সর্দার প্যাটেল শীল্ড' পেয়েছে।

†১৯৫৩ সালের ফলাফলের উপর এই গ্রাম সর্বভারতীয় 'জওহর শীল্ড' পেয়েছে।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি

১৯৫০ ..	শ্রীনীলোৎপল গুহ, গ্রাম সর্পাই (পশ্চিম), থানা কাঁথি, জেলা মেদিনীপুর।	লাগিয়েছেন .. বৈচেছে ..	৫,৪২৯ ৩,৪৮৩
১৯৫১ ..	শ্রীসাক্ষর দজি, দেবরিপানি, পোঃ সুরিয়াপোখরী, জেলা দার্জিলিং।	লাগিয়েছেন .. বৈচেছে ..	১৫,০০০ ৯,০০০
১৯৫২ ..	শ্রীমুরলীধর বড়, গ্রাম গোপালপুর, থানা মহিষাদল, জেলা মেদিনীপুর।	লাগিয়েছেন .. বৈচেছে ..	১,৯৫,১৪৪ ১,২০,৫৩৯
১৯৫৩ ..	শ্রীবিজয়ভূষণ বেরা, গ্রাম চিকুরগানিয়া, থানা খেজুরী, জেলা মেদিনীপুর।	লাগিয়েছেন .. বৈচেছে ..	৫৪,৩৫৬ ৪৩,৩৫৬
১৯৫৪ ..	শ্রীনীলমণি হাজরা, থানা মহিষাদল, জেলা মেদিনীপুর	লাগিয়েছেন .. বৈচেছে ..	১৯,৮০০ ১২,৬০০
১৯৫৫ ..	শ্রীরাসবিহারী মাইতি, থানা খেজুরী, জেলা মেদিনীপুর		

পশ্চিমবঙ্গ বনমহোৎসব

একুশে জুন [১৯৫৭] রাজ্য বনমহোৎসব কমিটি রাইটার্স' বিল্ডিং-স্থিত রোটান্ডায় মিলিত হন। রাজ্যের বনমন্ত্রী শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন কৃষিমন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ, রাজ্য বিধান পরিষদের সভাপতি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য বিধানসভার উপ-অধ্যক্ষ শ্রীআশুতোষ মল্লিক, কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীস্মরণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমবায়-উপমন্ত্রী শ্রীচিন্তাঞ্জন রায়, শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য, এম এল এ, শ্রীআনন্দগোপাল মল্লিক, এম এল এ, কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান শ্রীশৈবালকুমার গঙ্গুত, বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতী শ্রীমালিনী এমার্সন, উন্নয়ন-মহাধ্যক্ষ শ্রীহরশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগের সচিব শ্রীচারুকুমার রায়।

কমিটি ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে বনমহোৎসবের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করেন। ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কৃষি, বন ও উন্নীত-উদ্যান অধিকারসমূহ কর্তৃক নানা রকম সাধারণ গাছ, ফল-গাছ ও ফুলগাছের ৬-২৭ লক্ষেরও বেশি চারা আর কলম বিতরণ করা হয়।

১৯৫৫ সালের বনমহোৎসবের ফলাফল দেখে সমিতি বহু পৌরসংঘ ও প্রতিষ্ঠানের জন্য ৫০০ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার অনুমোদন করেন। শিলিগুড়ি পৌরসংঘ শ্রেষ্ঠ পৌরসংঘ-পুরস্কার হিসাবে ৫০০ টাকা পেয়েছে এবং দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পৌরসংঘ-পুরস্কার হিসাবে ৩০০ টাকা পেয়েছে কাশিগাও পৌরসংঘ। জেলাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর সর্বশ্রেষ্ঠ জেলা হিসাবে রাজ্য বনমহোৎসব শিল্ড পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

যত গাছ লাগানো হয়েছে এবং যত গাছ বেঁচেছে, তার সংখ্যা যথাক্রমে ২৯,৭৫,৬৮৭ এবং ৯,০৩,০৬২। রাজ্যের সংমগুলির মধ্যে মেদিনীপুর জেলার কামারদা সংঘ ৫০০ টাকা শ্রেষ্ঠ সংঘ-পুরস্কার হিসাবে লাভ করেছে এবং মেদিনীপুর জেলার হলদুদবাড়ি সংঘ দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সংঘ-পুরস্কার হিসাবে ৩০০ টাকা পুরস্কার পেয়েছে। অন্য যে তিনটি সংঘ ১৫০ টাকা হিসাবে পুরস্কার পেয়েছে, সেগুলি হল দার্জিলিংয়ের আপার মিরিক রক, মেদিনীপুর জেলার জলপাই সংঘ এবং শেওড়া-বাড়িয়ার লক্ষ্মী সংঘ। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ১০০ টাকা পুরস্কার পেয়েছে মেদিনীপুর জেলার কামারদা ইউনিয়ন বোর্ড। মেদিনীপুর জেলার খেজুরী থানা অঞ্চলের অধিবাসী শ্রীরাস-বিহারী মাইতি ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হিসাবে ১০০ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৫ সালের বনমহোৎসবের ফলাফল দেখে এই রাজ্য-পুরস্কার-গুলি ছাড়াও ৫০ টাকা করে জেলা-পুরস্কার, প্রতিটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের জন্য আটটি এবং ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হিসাবে ১০টি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল।

১৯৫৫ সালের বনমহোৎসবের ফলাফল যথাযথ নির্ধারণ করে দেখা গেছে যে, ঐ বৎসর ৩৭,০৭,০৭০টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল; তার মধ্যে ১৩,৮৪,৭২৬টি বা শতকরা ৩৭টি গাছ জীবিত রয়েছে। এত কম গাছ বেঁচে থাকার কারণ হিসাবে জানা গেছে যে, অনাবৃষ্টি এবং বন্যার ফলে রাজ্যের বহু অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এর বেশি গাছ বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি।

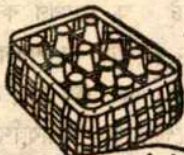
সমিতি কলিকাতায় ১৯৫৭ সালের আনুষ্ঠানিক বৃক্ষরোপণের দিন স্থির করেছেন ৭ই জুলাই।

কার্যকরী

হরিণঘাটার দুধ

শ্রীমত্রে আমি দুটি
কি নিষ শিখেছিঃ
এক, বিশ্বাসে কাজ
হয়, দুই, দুধে শরীর
পুষ্ট হয়।"

—বর্গত বাণীভ
হ্যা ক্ ফ্যা ভেন
(পরীক্ষিতা বিনায়ক)



পান্তরাইজ করা গরুর দুধ
প্রতি পাউণ্ড ৮/০
পান্তরাইজ করা চৌলভ, দুধ
প্রতি পাউণ্ড ১০
মাখন
প্রতি পাউণ্ড ৩
(২ আউন্স ও তার বেশি ওজনের প্যাকেটে)
ভয়সা ছি

প্রতি পাউণ্ড ৩০ (১ পাউণ্ডের মূল করা বোতলে)
কলকাতা, হাওড়া, বরাহনগর ও নমসের ১০০ টি স্থলের
দোকানে সকাল ৮-৯ থেকে ৭-৯ এর মধ্যে পাওয়া
যায়। কতকগুলি দোকান আবার বিক্রেতে ৮-৯
থেকে ৩টা পর্যন্তও খোলা থাকে।



পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

সম্পাদকঃ শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মাধব, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা।
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী
মুদ্রণে অধীক্ষক শ্রীশুভেন্দ্র মল্লিকোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য-চাষ বিভাগ

মৎস্য-চাষ সংক্রান্ত কোন উপদেশ বা পরামর্শের জ্ঞাত অথবা মাছের পোনা, কেরোসিন তৈল, জালের ক্ষত প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে জেলা মৎস্য-চাষ আধিকারিক (District Fishery Officer) অথবা সহ-মীন্যিকারিক (Assistant Fishery Officer) এর সহিত সাক্ষাৎ করুন অথবা পত্র লিখুন। তাঁহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করিবেন।

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসতির জ্ঞাত নিম্নলিখিত দুই স্থানে একজন করিয়া পুনর্বাসতি আধিকারিক (Rehabilitation Officer) আছেন। প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের খোঁজ করুন বা পত্র লিখুন। ঠিকানা:—

- ১। পুনর্বাসতি আধিকারিক, বর্ধমান।
- ২। পুনর্বাসতি আধিকারিক, মহাকরণ (Writers' Buildings), কলিকাতা।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগ

গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি পালন সম্বন্ধে কোন উপদেশ বা পরামর্শের প্রয়োজন হইলে পশুপালন-আধিকারিকের বা সহ-পশুপালন-আধিকারিকের (Live-Stock Officer বা Asst. Live-Stock Officer) নিকট অনুসন্ধান করুন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ইহাদের কার্যালয় আছে। নিচের তালিকায় দেখুন :

পূর্ব এলাকা

চব্বিশপরগনা—	কার্যালয়ের ঠিকানা
পশুপালন-আধিকারিক ::	অ্যাগারসন হাউস, আলিপুর।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক :	বারাসাত
নদিয়া—	
পশুপালন-আধিকারিক ::	কৃষ্ণনগর।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক :	বেথুয়াডহরি।
মুর্শিদাবাদ—	
পশুপালন-আধিকারিক ::	বহরমপুর।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক :	ঐ
সহ-পশুপালন-আধিকারিক :	বেলডাঙ্গা।
হাওড়া ও হুগলি—	
পশুপালন-আধিকারিক ::	চুঁচুড়া।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক, হুগলি :	চুঁচুড়া।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক (এইচ), হাওড়া :	পোঃ—উলুবেড়িয়া, জেলা—হাওড়া।

পশ্চিম এলাকা

বর্ধমান—	কার্যালয়ের ঠিকানা
পশুপালন-আধিকারিক ::	বর্ধমান।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক :	ঐ
বাঁকুড়া—	
পশুপালন-আধিকারিক ::	বাঁকুড়া।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক :	ওলাগ্রাম।
বীরভূম—	
পশুপালন-আধিকারিক ::	বোলপুর।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক :	ঐ
মেদিনীপুর—	
পশুপালন-আধিকারিক ::	ঝাড়গ্রাম।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক :	কাঁথি।

উত্তর এলাকা

জলপাইগুড়ি—	কার্যালয়ের ঠিকানা
পশুপালন-আধিকারিক ::	জলপাইগুড়ি।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক :	ধুপগুড়ি।
পশ্চিম দিনাজপুর—	
সহ-পশুপালন-আধিকারিক ::	রায়গঞ্জ।
মালদহ—	
পশুপালন-আধিকারিক ::	মালদহ।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক :	ঐ

দার্জিলিং—	কার্যালয়ের ঠিকানা
পশুপালন-আধিকারিক ::	কালিম্পাং।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক :	ঐ
সহ-পশুপালন-আধিকারিক :	পেদুং।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক :	শিলিগুড়ি।
কোচবিহার—	
সহ-পশুপালন-আধিকারিক :	কোচবিহার।
সহ-পশুপালন-আধিকারিক :	মাথাভাঙ্গা।

পশ্চিম বাঙ্গলার আবাদে দেশের সব লোকের পেট ভরে ন

ভাল বীজ, সার এবং জল দিয়ে ফসলের ফলন বাড়ান।

ফসলের নাম।	আবাদের পরিমাণ (একর হিসাবে)।	মোট আবাদের শতকরা অংশ।	ফসলের নাম।	আবাদের পরিমাণ (একর হিসাবে)।	মোট আবাদের শতকরা অংশ।
আমন ধান	৮,৯৩০.৯	৬২.৪৪	মুগ	৩৮.০	০.২৭
আউশ ধান	১,৫৬৯.৯	১০.৯৭	মাসকলাই	৩২৪.২	২.২৭
বোরো ধান	৪৪.৪	০.৩১	অড়হর	৪৪.০	০.৩১
ভুট্টা	১১৫.১	০.৮০	সরিষা	১৯০.৯	১.৩৩
গম	১৩৩.১	০.৯৩	ভিল	১১.৪	০.০৮
যব	১২৩.৭	০.৮৬	ইক্ষু	৪৬.৯	০.৩৩
ছোলা	৪৮৬.২	৩.৪০	আলু	১০৩.৮	০.৭৩
খেসারি	৪৩২.১	৩.০২	শাকসবজি	২৫৯.৫	১.৮১
মসুর	৩১৫.৪	২.২০	অন্যান্য শস্য	১,১৩৫.৭	৭.৯৪

১৯৫৩-৫৪ সালে মোট আবাদী জমি ১৪,৩০৮.২

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-অধিকার

কলিকাতার তলানি-সার (সাজ) বিতরণ

তলানি-সার বিতরণ হইতেছে। ইহা কলিকাতার চতুর্দিকে গড়ে ২৫-৩০ মাইল পর্যন্ত মোটর ট্রাক দ্বারা এবং অন্যত্র রেলে সরবরাহ করা হয়। সরবরাহ করার খরচ সহ টনপ্রতি মূল্য ৬ টাকা। বিধাপ্রতি মোটামুটি ১ টন প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

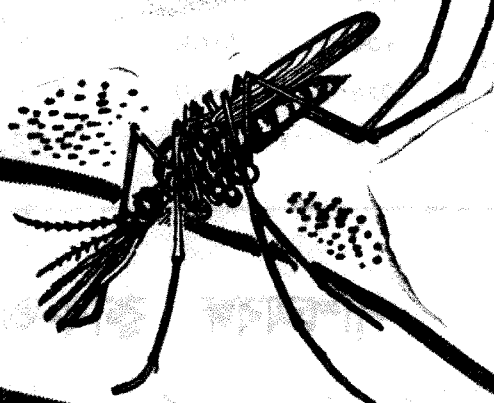
আপনাদের চাহিদা নিকটবর্তী কৃষি-কর্মচারীর নিকট জানান।

জ্ঞপ্তি :—একসঙ্গে চার টনের কম সার সরবরাহ করা হয় না।



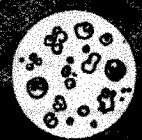
ম্যালেরিয়ায়

অব্যর্থ ও নিরাপদ



অনেক বছরের ব্যবহারের কলে প্রমাণিত হয়েছে যে
ম্যালেরিয়ায় কুইনিনের চেয়ে ভাল ওষুধ আর নেই।
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুইনিন্-ফ্যাক্টরীতে প্রস্তুত
কুইনিন্ খাঁটি এবং শুণে অব্যর্থ।

সরকারী কুইনিন্ বিক্রয় কেন্দ্র, ওক
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস কলিকাতা-১৩,
গ্রামাঞ্চলে ডাকঘর থেকেও কুইনিন্
পাওয়া যায়।



৩-৮

বনমহোৎসবে গাছ লাগানোর হিসাব

গাছ লাগানো হয়েছে			গাছ বেঁচেছে			বেঁচেছে শতকরা	
ফলের গাছ	অন্যান্য গাছ	মোট	ফলের গাছ	অন্যান্য গাছ	মোট		
১৯৫০-- ৭,২৬,১৯৬	..	১২,০৮,৫৪০	১৯,৩৪,৭৩৬	৩,০৭,২৮৮	৮,০২,৮৭৫	৭,১০,১৬৩	৩৭
১৯৫১-- ৬,৪৭,৭২৩	..	১১,০০,৩৮৩	১৭,৪৮,১০৬	২,৭৮,৬৩৬	৮,২৮,৩৩৮	৭,০৬,৯৭৪	৪০
১৯৫২-- ৮,৪০,২৫৬	..	৩৭,৪১,৮১৮	৪১,৮২,০৭৪	২,৪৮,৯৬৫	২০,২৮,৯৭২	২২,৭৭,৯৩৭	৫৪
১৯৫৩-- ৮,০৩,৭৪৩	..	১৮,৮৯,৫২০	২২,৯৩,২৬৩	২,৪৩,০৯৩	১৩,৩৪,৫৪৮	১৫,৭৭,৬৪১	৬৯
১৯৫৪-- ৩,৬৭,৫৭৫	..	১০,৫৩,০৭৩	১৪,২০,৬৪৮	২,৪৫,৫১৯	৫,০৭,৭৯০	৭,৫৩,৩০৯	৫৩
১৯৫৫-- ৩,২৬,৩১০	..	৩৩,৮০,৭৬০	৩৭,০৭,০৭০	২,১৪,৯৬০	১১,৬৯,৭৬৬	১৩,৮৪,৭২৬	৩৭

বন-অধিকার কর্তৃক বিনামূল্যে চারা দেওয়া হয়েছে			কৃষি-অধিকার কর্তৃক কলম ও চারা বিক্রি হয়েছে		
১৯৫০	..	..	৫,৬১,৩৪৭	৮,৬০০	
১৯৫১	..	..	৩,৮৭,৮০৩	৭৯,৭১৮	
১৯৫২	..	..	৪,০৯,৫৮২	১৩,৮৫৪	
১৯৫৩	..	..	৩,৩৫,৩৭৯	১,১৫,৭০৫	
১৯৫৪	..	..	৪,৪৮,৬৫২	২৯,০৯৬	
১৯৫৫	..	..	৫,১১,৪৩৪	৫৪,৯৮০	
১৯৫৬	..	..	৫,৪২,৩৫৭	..	

উত্তি-উদ্যান-অধিকার কর্তৃক বিনামূল্যে চারা দেওয়া হয়েছে--

১৯৫৩	..	..	৩,৩৮২
১৯৫৪	..	..	৮,১৩৯
১৯৫৫	..	..	৪,৫৭৬
১৯৫৬	..	..	৫,৫৬৯

শ্রেষ্ঠ জেলা	শ্রেষ্ঠ গ্রাম	শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান	শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫০ বর্ধমান	দুর্গা, ধান্য কাঁচি, জেলা মেদিনীপুর।	পানিয়া সারদাবাদ সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি।*	বিশুভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।†
লাগানো হয়েছে ৩,৮৩,৮৩২	..	১০,৬৪৯	৬৭,৩৩১
বেঁচেছে ১,৪৭,৫২৬	..	৬,৯৭১	৬১,২৪০
			৯,৮১৪

*১৯৫০ সালের ফলাফলের উপর এ প্রতিষ্ঠান সর্ভভারতীয় "সর্দার প্যাটেল শীল্ড" পেয়েছে।

†১৯৫০ সালের ফলাফলের উপর এ বিশ্ববিদ্যালয় সর্ভভারতীয় "মুনী শীল্ড" পেয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ১০ম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

শ্রেষ্ঠ জেলা	শ্রেষ্ঠ গ্রাম	শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান	শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫১ মেদিনীপুর লাগানো হয়েছে ৭,৫৫,৩৪৮ .. বৈচেছে ২,১৪,২৬২ ..	বারিমা, থানা কাঁথি, জেলা মেদিনীপুর। ১৬,৬৫৪ ১৬,২৬৪	'ডক্টর গাহামুং হোমুং' কালিম্পঙ, দার্জিলিং। ২৪,৩৫৫ ১৮,২৬৪	বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ১১,৩৭৬ ৮,৩৯৩
১৯৫২ মেদিনীপুর লাগানো হয়েছে ৩৩,৬৪,০৬৩ .. বৈচেছে ১৮,৫৭,১২০ ..	লাক্ষা, থানা মহিষাদল, জেলা মেদিনীপুর। ৬,৫৮,১৬০ ৪,৪৭,২২০	লাক্ষা প্রদর্শনী* প্রতিষ্ঠান, জেলা মেদিনীপুর। ৬,৫৮,১৬০ ৪,৪৭,২২০	বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৫,৬৭৮ ৪,৩৪৭
১৯৫৩ মেদিনীপুর লাগানো হয়েছে ১৫,৪৮,৭৭৭ .. বৈচেছে ১১,৪২,৪৭৪ ..	বেথকুণ্ড, তমলুক, জেলা মেদিনীপুর।† ১,১০,১৬১ ১,০৮,০৫২	পানিসিটি সেনাদল, জেলা মেদিনীপুর। ১,০০,৮৪৯ ৫৬,২৩৪	বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৮,৯৭১ ৫,৭৫১
১৯৫৪ নদিয়া লাগানো হয়েছে ৯৯,৭৮৮ .. বৈচেছে ৭৫,৩৯৪ ..	দেবগ্রাম, নদিয়া ১৭,৫১৮ ১২,৩৪০	পানিসিটি ভূমিসেনাদল, জেলা মেদিনীপুর। ৮,৮৭০ ৫,১২২	বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৭,৬৩৮ ৫,৭৭০
১৯৫৫ মেদিনীপুর লাগানো হয়েছে ২৯,৭৫,৬৮৭ .. বৈচেছে ৯,০৩,৩৬২ ..	চৌধা চুলী, মেদিনীপুর। ১,৫৭,৯৭০ ১,৪৬,৮০৬	কামারদা ই: বোর্ড। ৫০,৫০০ ৪১,৭৫০	বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৪,৩৩৫ ৩,৬২০

*১৯৫২ সালের ফলাফলের উপর এই প্রতিষ্ঠান সর্বভারতীয় 'সর্দার প্যাটেল শীল্ড' পেয়েছে।

†১৯৫৩ সালের ফলাফলের উপর এই গ্রাম সর্বভারতীয় 'জওহর শীল্ড' পেয়েছে।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি

১৯৫০ ..	শ্রীনীলোৎপল গুহ, গ্রাম সর্পাই (পশ্চিম), থানা কাঁথি, জেলা মেদিনীপুর।	লাগিয়েছেন বৈচেছে ..	৫,৪২৯ ৩,৪৮৩
১৯৫১ ..	শ্রীসাক্ষার দজি, দেবরিপানি, পো: অখিয়াপোখরী, জেলা দার্জিলিং।	লাগিয়েছেন বৈচেছে ..	১৫,০০০ ৯,০০০
১৯৫২ ..	শ্রীমুরলীধর বড়, গ্রাম গোপালপুর, থানা মহিষাদল, জেলা মেদিনীপুর।	লাগিয়েছেন বৈচেছে ..	১,৯৫,১৪৪ ১,২০,৫৩৯
১৯৫৩ ..	শ্রীবিজয়ভূষণ বেরা, গ্রাম চিকুরগানিয়া, থানা খেজুরী, জেলা মেদিনীপুর।	লাগিয়েছেন বৈচেছে ..	৫৪,৩৫৬ ৪৩,৩৫৬
১৯৫৪ ..	শ্রীনীলমণি হাজরা, থানা মহিষাদল, জেলা মেদিনীপুর ..	লাগিয়েছেন বৈচেছে ..	১৯,৮০০ ১২,৬০০
১৯৫৫ ..	শ্রীরাগবিহারী মাইতি, থানা খেজুরী, জেলা মেদিনীপুর		

পশ্চিমবঙ্গে বনমহোৎসব

একুশে জুন [১৯৫৭] রাজ্য বনমহোৎসব কমিটি রাইটার্স' বিন্ডিংস-স্থিত রোটান্ডায় মিলিত হন। রাজ্যের বনমন্ত্রী শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন কৃষিমন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ, রাজ্য বিধান পরিষদের সভাপতি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য বিধানসভার উপ-অধ্যক্ষ শ্রীআশুতোষ মল্লিক, কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীস্মরণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমবায়-উপমন্ত্রী শ্রীচিন্তা-রঞ্জন রায়, শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য, এম এল এ, শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম এল এ, কলি-মাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান শ্রীশৈবাল-কুমার গুপ্ত, বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতী শ্রীমালিনী এমার্সন, উন্নয়ন-মহাধ্যক্ষ শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগের সচিব শ্রীচারুকুমার রায়।

কমিটি ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে বনমহোৎসবের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করেন। ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কৃষি, বন ও উদ্ভিদ-উদ্যান অধিকারসমূহ কর্তৃক নানা রকম সাধারণ গাছ, ফল-গাছ ও ফুলগাছের ৬-২৭ লক্ষেরও বেশি চারা আর কলম বিতরণ করা হয়।

১৯৫৫ সালের বনমহোৎসবের ফলাফল দেখে সমিতি বহু পৌরসংঘ ও প্রতিষ্ঠানের জন্য ৫০০ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার অনুমোদন করেন। শিলিগুড়ি পৌরসংঘ শ্রেষ্ঠ পৌরসংঘ-পুরস্কার হিসাবে ৫০০ টাকা পেয়েছে এবং দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পৌরসংঘ-পুরস্কার হিসাবে ৩০০ টাকা পেয়েছে কাশীয়াঙ পৌরসংঘ। জেলাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর সর্বশ্রেষ্ঠ জেলা হিসাবে রাজ্য বন-মহোৎসব শিল্ড পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

যত গাছ লাগানো হয়েছে এবং যত গাছ বেঁচেছে, তার সংখ্যা যথাক্রমে ১৯,৭৫,৬৮৭ এবং ৯,০৩,৩৬২। রাজ্যের সংঘগুলির মধ্যে মেদিনী-পুর জেলার কামারদা সংঘ ৫০০ টাকা শ্রেষ্ঠ সংঘ-পুরস্কার হিসাবে লাভ করেছে এবং মেদিনী-পুর জেলার হলদুদবাড়ি সংঘ দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সংঘ-পুরস্কার হিসাবে ৩০০ টাকা পুরস্কার পেয়েছে। অন্য যে তিনটি সংঘ ১৫০ টাকা হিসাবে পুরস্কার পেয়েছে, সেগুলি হল দার্জিলিংয়ের আপার মিরিক রক, মেদিনীপুর জেলার জলপাই সংঘ এবং শেওড়া-বাড়িয়ার লক্ষ্মী সংঘ। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসাবে ১০০ টাকা পুরস্কার পেয়েছে মেদিনীপুর জেলার কামারদা ইউনিয়ন বোর্ড। মেদিনীপুর জেলার খেজুরী থানা অঞ্চলের অধিবাসী শ্রীরাস-বিহারী মাইতি ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হিসাবে ১০০ টাকা পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৫ সালের বনমহোৎসবের ফলাফল দেখে এই রাজ্য-পুরস্কার-গুলি ছাড়াও ৫০ টাকা করে জেলা-পুরস্কার, প্রতিটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের জন্য আর্টট এবং ব্যক্তি-গত শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হিসাবে ১০টি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল।

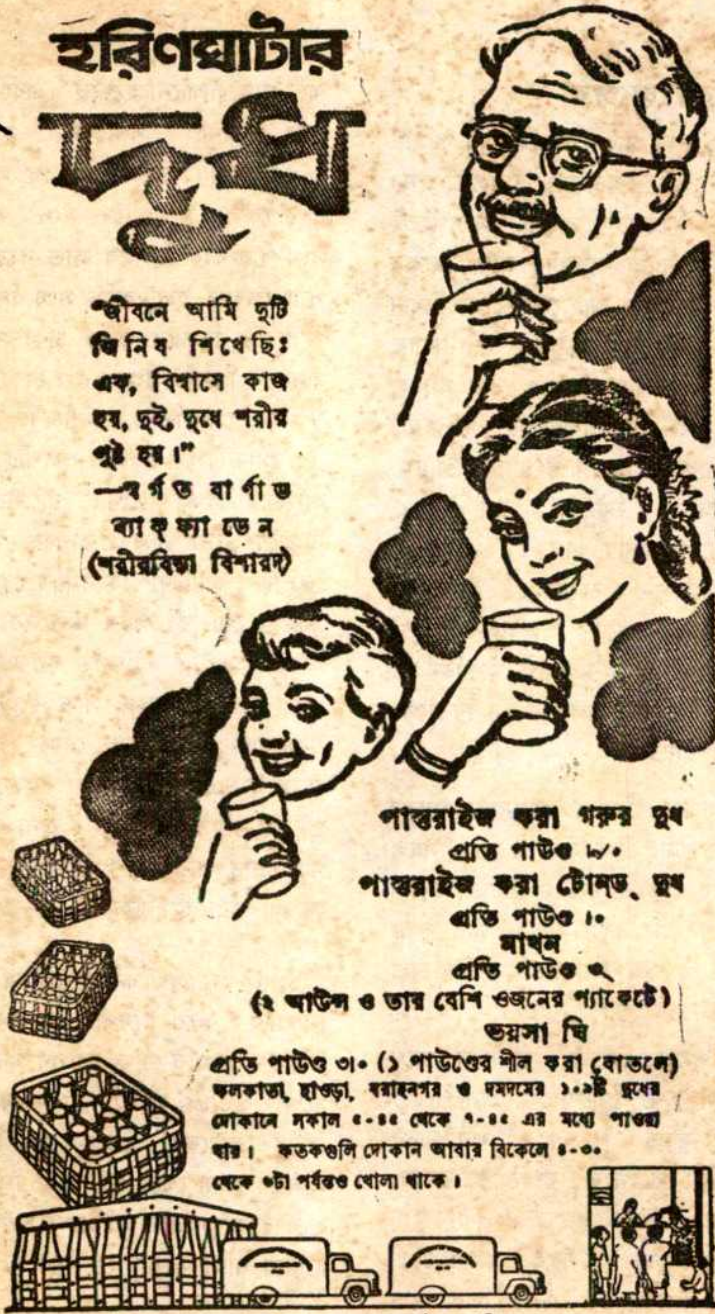
১৯৫৫ সালের বনমহোৎসবের ফলাফল যথাযথ নির্ধারণ করে দেখা গেছে যে, ঐ বৎসর ৩৭,০৭,০৭০টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল; তার মধ্যে ১৩,৮৪,৭২৬টি বা শতকরা ৩৭টি গাছ জীবিত রয়েছে। এত কম গাছ বেঁচে থাকার কারণ হিসাবে জানা গেছে যে, অনাবৃষ্টি এবং বন্যার ফলে রাজ্যের বহু অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এর বেশি গাছ বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি।

সমিতি কলিকাতায় ১৯৫৭ সালের আনুষ্ঠানিক বৃক্ষরোপণের দিন স্থির করেছেন ৭ই জুলাই।

হরিণঘাটার দুধ

জীবনে আমি দুটি
জিনিষ শিখেছি:
এক, বিশ্বাসে কাজ
হয়, দুই, দুধে শরীর
পুষ্ট হয়।"

—বর্গত বাণীভ
ব্যাঙ্কাভেন
(শরীরবিজ্ঞান বিশারদ)



পাস্তরাইজ করা গরুর দুধ
প্রতি পাউণ্ড ৮০

পাস্তরাইজ করা টোমড, দুধ
প্রতি পাউণ্ড ১০

মাখন

প্রতি পাউণ্ড ৭

(২ আউন্স ও তার বেশি ওজনের প্যাকেটে)

ভয়সা ঘি

প্রতি পাউণ্ড ৩০ (১ পাউণ্ডের নীল করা বোতলে)

কলকাতা, ছাণ্ডা, বরাহনগর ও হমদমের ১০২৪ দুধের

দোকানে সকাল ৫-৫৫ থেকে ৭-৫৫ এর মধ্যে পাওয়া

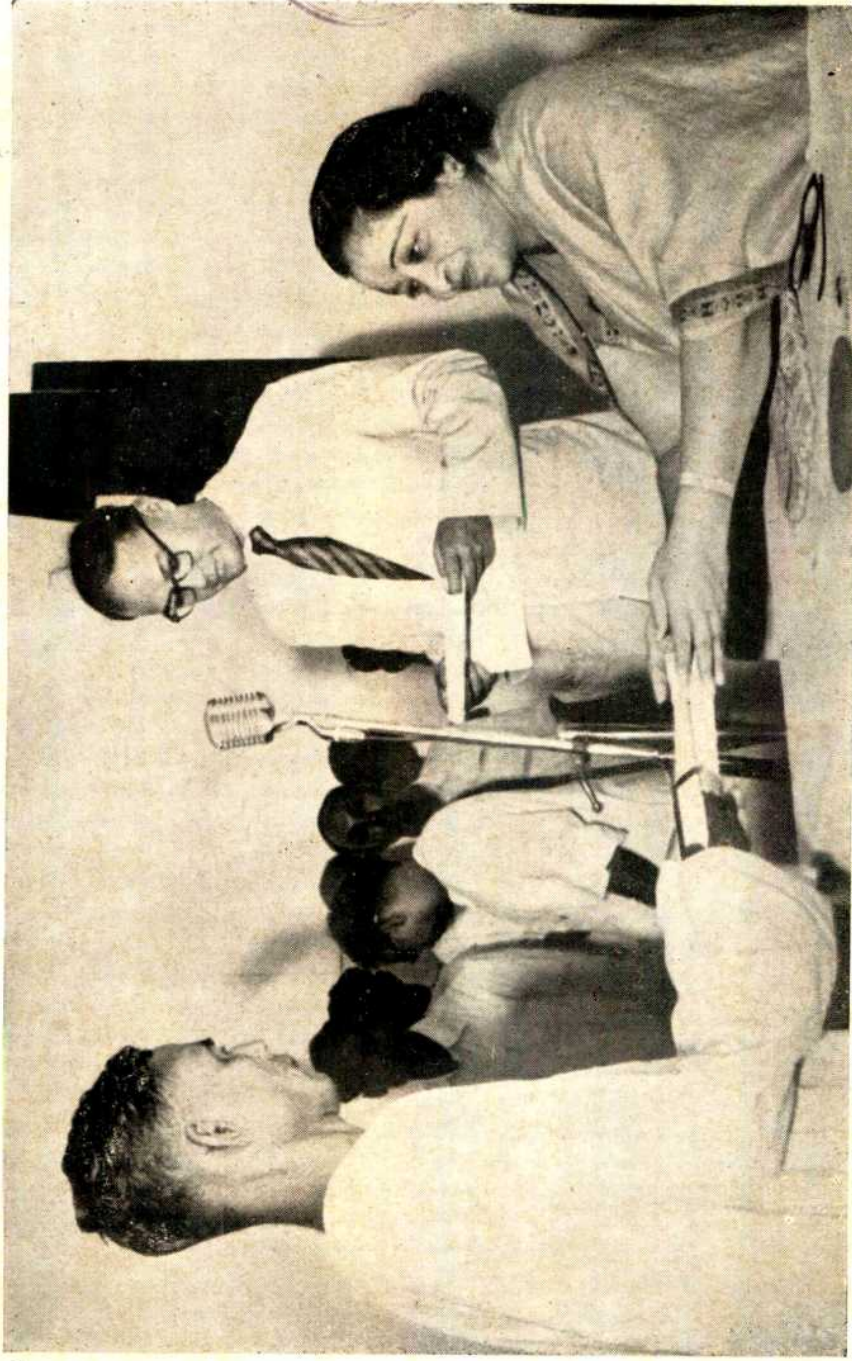
যায়। কতকগুলি দোকান আবার বিকেলে ৫-৫০

থেকে ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

সম্পাদকঃ শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাস্তুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা।
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী
মুদ্রণে অধীক্ষক শ্রীশ্রীভেন্দ্র মদ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

বসুন্ধরা : শ্রাবণ : ১৩৬৪



পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ওরা আগস্ট রাজভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ রাজ্যে ১৯৫৫-৫৬ সালের শাস্য-উৎপাদন-প্রতিযোগিতায় পুরস্কারবিজয়ী কৃষকদের পুরস্কার বিতরণ করেন। এখানে আলু-উৎপাদন শীর্ষস্থান-অধিকারী কৃষককে তাঁর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা



রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজাপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় শস্ত্র-উৎপাদন প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান-অধিকারী
একজন কৃষককে পুরস্কার দিচ্ছেন।

বন্ধুধারা

১০ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩৬৪

প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ৩রা অগাস্ট রাজভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ রাজ্যে ১৯৫৫-৫৬ সালের শস্য-উৎপাদন-প্রতিযোগিতায় পুরস্কারবিজয়ী কৃষকগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন।

এ উপলক্ষে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি সব রকম ফসলের উৎপাদন বাড়াবার জন্য কৃষকদের প্রতি আবেদন জানান। তিনি বলেন যে, দেশকে খাদ্যে স্বয়ংপূর্ণ করার জন্য কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন; কৃষিজাত দ্রব্যই দেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ এবং চাষীরা প্রকৃত সম্পদের স্রষ্টা।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিমন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ বলেন যে, কৃষির ফলন বাড়াবার জন্য সরকার যে নানাভাবে কৃষকদের উৎসাহিত করছেন, শস্য-উৎপাদন-প্রতিযোগিতা তার মধ্যে একটি।

কৃষী চাষীরা তাঁদের চাষের অভিজ্ঞতা সভায় বর্ণনা করেন।

বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন-প্রতিযোগিতায় এদিন যেসব কৃষক পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁদের নামতালিকা এ পত্রিকার অন্যত্র দেওয়া হ'ল।

১৯৫০-৫১ সাল থেকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর বিভিন্ন শস্যের উৎপাদন-প্রতিযোগিতা হয়ে আসছে। প্রথম বছর হয়েছিল শুধু আলু-উৎপাদনের প্রতিযোগিতা। তারপর গম উৎপাদনে ১৯৫১-৫২ সাল থেকে, ধানের উৎপাদনে ১৯৫২-৫৩ সাল থেকে এবং ইক্ষুর উৎপাদনে ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে।

আমাদের দেশে আজ সকল জিনিসেরই উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজন। কৃষির ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াতে হ'লে ভাল বীজ, ভাল সার দিয়ে, সেচ দিয়ে, যথাযথ পরিচর্যা করে, রোগ-কীট প্রভৃতির আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করে, উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ-আবাদ করতে হবে—একথা সর্বত্র প্রচারিত হয়ে গেছে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ করলে ফলন যে কত বেশি বেড়ে যেতে পারে তারই প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে চলেছে বছরের পর বছর এই শস্য-উৎপাদন-প্রতিযোগিতার মাধ্যমে।

চিরাচরিত প্রথার চাষে একরপিছ ধানের ফলন হয় ১৫-১৬ মণ। কেউ যদি একরে ২০-২২ মণ ধান ফলাতে পেরে থাকেন, তা যথেষ্ট—এমন কি প্রচুর বিবেচিত হয়েছে। তারপর যখন জানা গেল যে, বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকাজ করলে ফলন আরও বেশি হয়, তখন আমরা হয়তো ধারণা করেছি যে, একরপিছ ২০-২২ মণের জায়গায় নতুন ধারার চাষে ৩০-৩৫-৪০ কি তার চেয়ে বেশি হ'লে না হয় ৫০ মণ ধান হবে। সেও কি কম কথা? ২০-২২ মণের জায়গায় ৪০-৫০ মণ! বইএ পড়া বা মদুখ থেকে শোনা জ্ঞানের ভিত্তিতে উন্নত প্রথায় চাষ করে কেউ যদি একরপিছ ৪০-৫০ মণ ধান ফলাতে পেরে থাকেন, তিনি ভেবেছেন, তাঁর চরম সার্থকতা লাভ হয়েছে; তিনি ভেবেছেন, উন্নত প্রথার আশীর্বাদে ওর বেশি আর ফলন হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই এমন কথা ভাবা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় যে, তাঁর অবলম্বিত পদ্ধতির আরও কিছুর উন্নতি করার প্রয়োজন আছে।

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

শস্য-উৎপাদন-প্রতিযোগিতার প্রবর্তনের ফলে দেশের কৃষকদের মধ্যে জেগে উঠল চাষে কত বেশি শস্য ফলাইবে যায় তাই নিয়ে প্রতিযোগিতার মনোভাব। তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে কৃষি-পদ্ধতির কতখানি উন্নতি করা যায় তার প্রচেষ্টা। এই প্রতিযোগিতার প্রবর্তনে, এই প্রচেষ্টার ফলে যখন আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একজন চাষীতাই একরপিছদু জমিতে একেবারে ১৬১ মণ ১৯ সের ধান ফলালেন তখন আমাদের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। কিন্তু, “এ নহে কাহিনী—এ নহে স্বপন”, এ একেবারে বাস্তব সত্য। তাই বিস্ময়ে হতবাক চাষীদের হাতে-কোদালে নিষ্ক্রিয় থাকা আর চলে না। তাঁরা বুঝলেন, নিজেদের কৃষি-রীতিকে যতখানি উন্নত তাঁরা করেছেন, তার চেয়ে আরও—আরও উন্নত করতে হবে। কৃষি-উন্নয়নের মধ্য দিয়ে আদর্শের ভিত্তিতে এই অতি-বাস্তব সত্যের প্রতিষ্ঠা করাই শস্য-উৎপাদন-প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এ পর্যন্ত ধান, গম, আলু ও ইক্ষুর উৎপাদনে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার যথাক্রমে ধান-উৎপাদনে ২,৫০০ টাকা, ২,০০০ টাকা ও ১,০০০

টাকা ; গম-উৎপাদনে ১,০০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ২৫০ টাকা ; আলু-উৎপাদনে ২,৫০০ টাকা, ২,০০০ টাকা ও ১,০০০ টাকা এবং ইক্ষু-উৎপাদনে ১,০০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ৩০০ টাকা। অবস্থা-অনুযায়ী এই অর্থের পরিমাণ কোন কোন বছর কিছু বেশি বা কমও হয়ে থাকে। প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয় পুরস্কার ছাড়া কয়েকটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে।

প্রতিযোগিতায় যারা পুরস্কার পেয়েছেন, কী উপায়ে, কোন রীতিতে চাষ করে তাঁরা এত বেশি ফসল ফলিয়ে এই সম্মানের অধিকারী হয়েছেন, সকল চাষীরই তা জানা দরকার—তা হলে তাঁরা নিজেদের রীতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে বুঝতে পারেন, কোথায় তাঁদের গলদ, যতখানি তাঁরা করেছেন তার উপরে আরও কী করা উচিত। তাই বিভিন্ন বছরে উক্ত চারটি ফসলের উৎপাদন-প্রতিযোগিতায় যারা সর্বাধিক উৎপাদন করে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন তাঁদের অবলম্বিত কৃষিপদ্ধতির বিবরণ তাঁদের নিজের কথায় এর পরেই দেওয়া হ'ল। শুধু ১৯৫২-৫৩ সালের ধান-উৎপাদনে প্রথম পুরস্কার-বিজয়ী কৃষকের কৃষিবিবরণ তাঁর কথায় না দিয়ে আমাদের কথায় দেওয়া হয়েছে।

আপনি পশ্চিমবঙ্গ প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত ‘বসুন্ধরা’ এবং যে-কোন পত্রিকার গ্রাহক হ'তে হ'লে, চাঁদার টাকা পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তার নামে ‘রাইটার্স' বাল্ডিংস, কলিকাতা-১' ঠিকানায় নগদ পাঠাতে বা জমা দিতে পারেন, অথবা ক্রস্‌ড্ পোস্টাল অর্ডারেও পাঠাতে পারেন। যে পত্রিকা বা যে যে পত্রিকার গ্রাহক হ'তে চান তার বা সেগুলোর নাম এবং নিজের নাম-ঠিকানা সুস্পষ্ট বড় অক্ষরে লিখে দেবেন। ক্রস্‌ড্ পোস্টাল অর্ডারের সঙ্গে অবশ্যই একটি পত্র দিতে হবে ; যে-পত্রিকার গ্রাহক হ'তে চান তার নাম এবং নিজের নাম-ঠিকানা সেই পত্রে স্পষ্ট বড় বড় অক্ষরে অবশ্যই লিখে দেবেন।

ধান

১৯৫২-৫৩ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে ধান্য-উৎপাদন-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

১৯৫২-৫৩

এ বছর ধানের ফলনে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন বীরভূম জেলার সিউড়ী থানার অন্তর্গত কেন্দুয়া গ্রামের শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়। প্রতিযোগিতার জন্য তিনি যে জমিতে ধানের চাষ করেন, তার পরিমাণ এক একর। এই জমিতে তিনি কৃষিবিভাগের উন্নত জাতের রঘুশাইল আমন ধানের আবাদ করেন। শ্রী মুখোপাধ্যায় সাড়ে সাত কাঠা জমির এক বীজতলায় ১৫ সের বীজের চারা করেন। এই বীজতলায় তিনি বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি একবার চাষ দিয়ে ৮০ মণ (৮ গাড়ি) গোবরসার ও ৩০ সের হাড়ের গুঁড়ো প্রয়োগ করেন। চাষ দিয়ে এগুনো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয় এবং এর পর প্রত্যেকবার বৃষ্টি হবার পরই এই বীজতলার জমিতে চাষ দেওয়া হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে বীজতলায় বীজ বোনা হয়।

যে জমিতে তিনি প্রতিযোগিতার জন্য ধানের চাষ করেন, সেই জমিতে দু' বছর আগে থেকে হাড়ের গুঁড়ো, অ্যামোনিয়াম সালফেট, খইল প্রভৃতি সার দিয়েছেন এবং যথাযোগ্য শস্যপার্শ্বায়ে চাষ করেছেন।

প্রতিযোগিতার আগের বছর মাঘ মাসের প্রথমে চাষ দেওয়া হয়েছিল আগের ফসল উঠে যাবার ১০-১৫ দিন পর। তারপর বৈশাখের প্রথমে ৬০০ মণ (৬০ গাড়ি) পুকুরের পাক এনে এই জমিতে দেওয়া হয়। এর ২ দিন পরে সোজাসুজি ও আড়াআড়িভাবে জমিতে দুইবার চাষ দেওয়া হয়। বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি জমিতে পচা সার (কম্পোস্ট) ৩০০ মণ এবং গোবরসার ৬০ মণ প্রয়োগ করা হয়। এরপর জমিতে সোজাসুজি ও আড়াআড়িভাবে পুনরায় দুইবার চাষ দেওয়া হয়। তাতে এসব সার জমির মাটির সঙ্গে বেশ সমানভাবে মিশে যায়।

এর ঠিক দুই সপ্তাহ পরে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিকে চাষ দিয়ে, ঢেলা ভেঙে জমির মাটি বেশ

সমান করে নিয়ে সবুজসারের জন্য ৩০ সের শনবীজ বুন দেওয়া হয়। শনগাছ তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট লম্বা হলে, আষাঢ়ের প্রথম দিকে সেগুনো চাষে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। তারপর বাঁধ দিয়ে জমিতে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

এর ১০-১৫ দিন পরে জমিতে চাষ দিয়ে কাদা করা হয় ও তার ৩-৪ দিন পর রোয়া লাগানো হয়। ৯ ইঞ্চি অন্তর সারিতে ৯ ইঞ্চি দূরে দূরে প্রতি গর্তে ২-৩টি করে চারা রোপণ করা হয়।

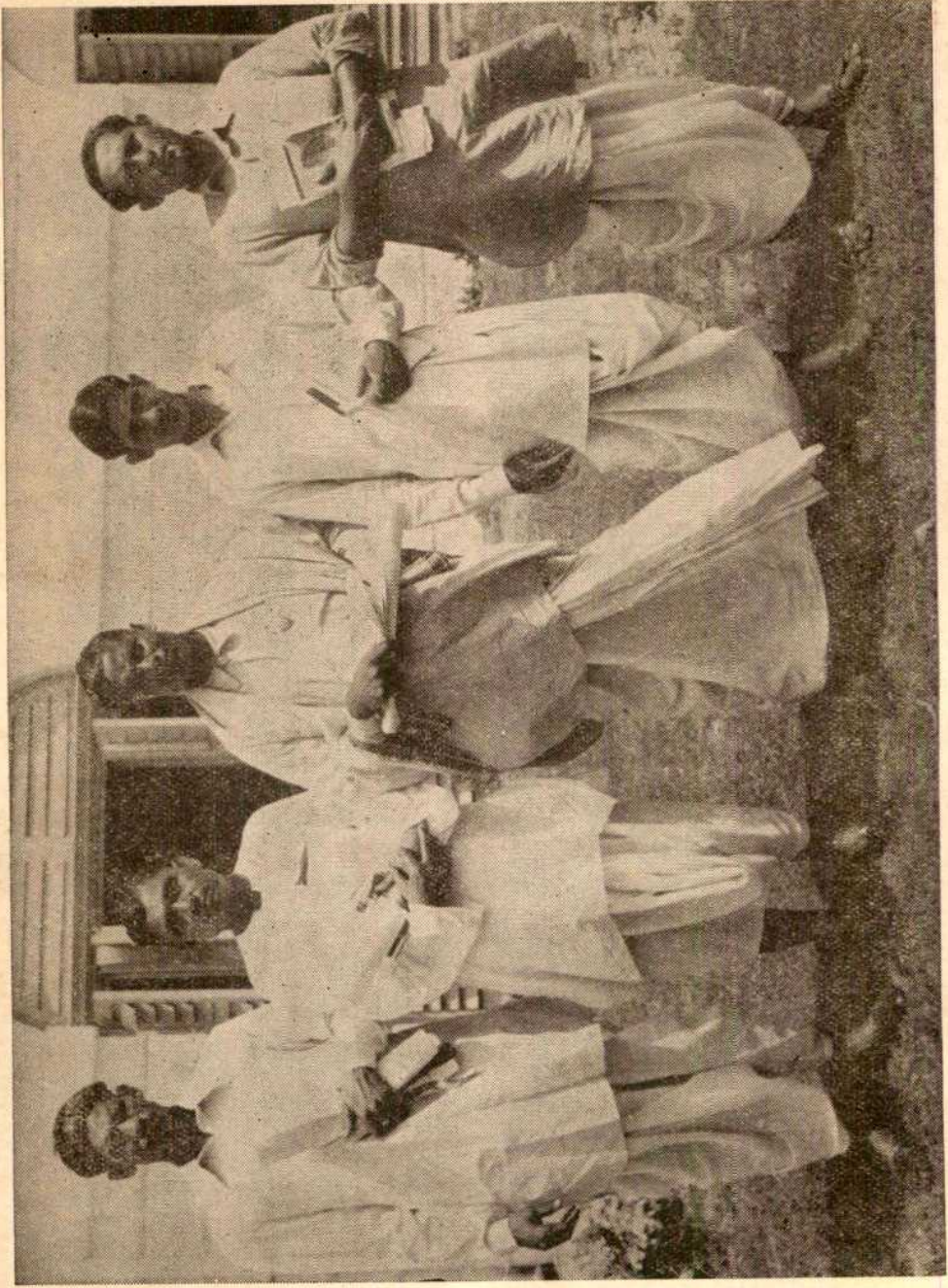
রোয়া লাগানোর দু' সপ্তাহ পর থেকে ফসলের পরিচর্যার কাজ আরম্ভ করা হয়। শ্রাবণের শেষ থেকে ভাদ্রের প্রথম ভাগ পর্যন্ত জমি থেকে জল বের করে দেওয়া হয়। ফলে জমিটা বেশ শুকনো থাকে। এর দু' সপ্তাহ পরে জমিতে আবার জল ধরে রাখা হয় এবং ধানগাছে ফুল আসার সময় পর্যন্ত এইভাবে থাকে। এর পর জমির জল এমনভাবে বের করে দেওয়া হয় যাতে জমিতে রস-টান না পড়ে।

আশ্বিনের শেষের দিকে গাছগুলো যখন বেশ ফল-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে তখন এক উপায় অবলম্বন করা হয়। স্থানীয় ভাষায় একে 'পাই' করা বলে। প্রতি দুই সারির উভয় দিকের ধানগাছের ছড়া আড়াআড়িভাবে একটার ওপর আর একটা শুইয়ে দেওয়া হয়। এতে সর্বাধিক এই যে, ধান যখন পেকে ওঠে তখন বাতাস লেগে গাছগুলো এলোমেলোভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে না।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষে ফসল কাটা হয়। তিন-চার দিন তা জমিতেই পড়ে থাকে। পরে খামারে নিয়ে মাড়াই করা হয়। দেখা যায় যে, একরুপিছ ধানের ফলন হয়েছে ৯০ মণ।

১৯৫৩-৫৪

ধান্য-উৎপাদন-প্রতিযোগিতায় আমি যে দোআঁশ জমি লাগাই তার আয়তন ১.১৭ একর। সৌভাগ্যক্রমে আগের বছর স্দুটুগা নদীর বন্যা হওয়ায় আবাদী জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পলিমটি পড়ে।



১৯৫৪-৫৫ সালের ধান-উৎপাদন-প্রতিযোগিতায় [বাদিক থেকে] শ্রীশটীন্দ্রনাথ মণ্ডল তথ্যম, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ রায় দ্বিতীয় ও শ্রীজয়নকৃষ্ণ মণ্ডল.
তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন ; তা ছাড়া, বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীজাসগর আলি ধী ও শ্রীকানাইলাল কারক

পূর্ববর্তী আবাদের ঠিক পরেই মাঘ মাসে জমিতে তিনবার চাষ ও মই দিয়ে পুনরায় আর-একবার চাষ দিয়ে সবুজসারের জন্য ২৫ সের শনবীজ বপন করি। শনগাছগুলিতে ফুল দেখা দিলে পর বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হ'লে তিনবার চাষ দিয়ে সেগুলিকে ভালভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিই। এদিকে বৈশাখ মাসে ৪ কাঠা উঁচু বীজতলার জমিতে ৪ বার চাষ ও মই দিয়ে ১০ মণ গোবরসার ও ১০ মণ আবজনা-পচা সার ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে আবার একবার চাষ ও মই দিয়ে বাছাই ও শোধন করা মোটা দুধকলম ধানের বীজ ৭-৮ সের বুননে, আরও দুইবার চাষ ও একবার মই দিয়ে বীজতলার মাটি-তৈরি শেষ করি।

বৈশাখ মাসে আবাদের জমিতে ৪২২ মণ কচুরি-পানা-পচা সার, ১০০ মণ গোবরসার ও ৬০ মণ আবজনা-পচা সার দিয়ে পর্যায়ক্রমে ৪ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয় ও জমিতে বৃষ্টির জল ধরে রাখা হয়। কয়েকদিন পরে জমি থেকে জল বের করে দেওয়ার পর ১১-মণ সুপারফসফেট প্রয়োগ করে ৩ বার চাষ দিয়ে ১ মণ অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করে মই দিয়ে জমি তৈরি করা হয়। শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহে বীজতলা থেকে চারাগাছগুলি সাবধানে তুলে নিয়ে কাদা-করা জমিতে দাঁড়ি দিয়ে ১২ ইঞ্চি ব্যবধানে লাইন করে ১০ ইঞ্চি অন্তর প্রতি গতে ২-৩টি চারাগাছ রোপণ করি। ধানগাছের গোছা এতবড় হ'ল যে, এর কম ব্যবধান রাখলে নিড়েন দেওয়া চলত না।

এরপর ফসলের পরিচর্যা কাজ আরম্ভ হয়। চারা রোপণের ৩ সপ্তাহ পরে আধ মণ অ্যামোনিয়াম সালফেট বৃষ্টির সময় প্রয়োগ করি। ভাদ্র মাসে জলাভাব হওয়ায় ক্ষেতের আগাছা হাত দিয়ে বাছাই করে, পাশের পুকুর থেকে ২ বার জলসেচ করা হয়। যতদিন পর্যন্ত গাছে ফুল না ধরে ততদিন জল ধরে রাখি এবং ফুল দেখা দিলে পর সাবধানে জল নিকাশ করা হয়—যাতে গাছগুলির ক্ষতি না হয়। তারপর যখন শস্য জন্মাল, তখন গাছগুলি যাতে বাতাসে এলোমেলোভাবে মাটিতে নুয়ে না পড়ে

সেজন্য ২-৩টি করে ধানগাছের ছড়া একটার উপর আর একটা আড়াআড়িভাবে কাত করে দিই। সেই সময় প্রাকৃতিক অবস্থা ভালই ছিল। ধানগাছগুলিতে কোন রোগ বা পোকাকার আক্রমণ হয় নি। প্রতি ঝাড়ে গড়ে ৬০ থেকে ৮০টি শীষ বের হয়েছিল।

আমাদের মহকুমা-শাসক, মহকুমার বিধানপরিষদের সদস্য, মহকুমার কৃষি আধিকারিক, সহকারী কৃষি-কর্মচারিবৃন্দ ও ইউনিয়ন শস্য-উৎপাদন-প্রতি-যোগিতা-সমিতির সদস্যদের সম্মুখে আমি আমার উক্ত জমির শস্য কাটিয়ে, মাড়াই করিয়ে ওজন দিয়ে দেখি যে, একরপিছ জমিতে ১৬১.৪৮ মণ ধান ফলেছে।

শ্রীবসন্তকুমার রায় বসুন্ধরা,
পাণিগ্রাম,
থানা মাথাভাঙ্গা,
জেলা কোচবিহার।

১১৫৪-৫৫

অনাবৃষ্টির দরুন জলের অভাব হওয়ায়, প্রতি-যোগিতার জন্য নির্বাচিত জমিতে আমি পাম্পিং মেশিনের সাহায্যে জলসেচ করি। ১৮০ মণ গোবর সার এবং ৩ মণ সুপারফসফেট প্রয়োগ করে জমি উপযুক্তভাবে তৈরি করি এবং সবুজসারের জন্য ১৫ সের ধণেবীজ বুননে দিই। বৈশাখের শেষে ধণে বোনার কাজ শেষ করে জ্যৈষ্ঠের শেষে বীজ-তলাতে ১০ সের পরিমাণ মিশ্রসার প্রয়োগ করি। কৃষিবিভাগ থেকে নেওয়া ১২ সের অগ্নিসাল ধান-বীজ লবণজলে বাছাই করে “অ্যাগোসেন জি-এন” এর সাহায্যে শোধন করে নিই এবং বীজতলাতে বুনি। বীজ বোনার ২০-২৫ দিন পরে অ্যামোনিয়াম সালফেট সামান্য পরিমাণে ছাড়িয়ে দি—যাতে চারাগুলি শীঘ্র বেড়ে ওঠে।

আষাঢ়ের প্রথমে রোয়ার জমিতে লাঙল দিয়ে প্রায় আড়াই ফুট লম্বা ধণেগাছগুলিকে ভেঙে দিই এবং শেষের দিকে ৩ মণ মিশ্রসার এবং ৩০ সের অ্যামো-নিয়াম সালফেট প্রয়োগ করে জমিটাকে ভালভাবে কাদা করে নিই। পরে আষাঢ়ের ২৮ তারিখে

বসুন্ধর : ১০ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

জমিতে ধানের চারা রোপণ করি। চারাগুলি তুলবার সময় বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়—যাতে শিকড় ছিঁড়ে না যায়। চারা রোপণ করার পর থেকে জমিটাকে পাঁচবার নিড়িয়ে দেওয়া হয় এবং চারবার পাম্পিং মেশিনের সাহায্যে জমিতে জলসেচ করা হয়। প্রতিবার নিড়েন দেওয়ার সময় কিছু কিছু করে আরও ৩০ সের অর্থাৎ মোট দেড় মণ অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করা হয়। এইভাবে চাষের কাজ শেষ করে ১৯৫৪ সালের ৭ই ডিসেম্বর ইউনিয়ন শস্য-উৎপাদন-প্রতিযোগিতা-সমিতির সভাপতি, ইউনিয়ন কৃষি-সহকারী এবং কৃষিবিভাগীয় কর্ম-চারীর সম্মুখে ফসল কেটে দেখা গেল—একরপিছ জমিতে ফলন হয়েছে ১২২ মণ ১৬ সের।

শচীন্দ্রনাথ মন্ডল,
গ্রাম প্রতাপপুর,
থানা ঘাটাল,
জেলা মেদিনীপুর।

১৯৫৫-৫৬

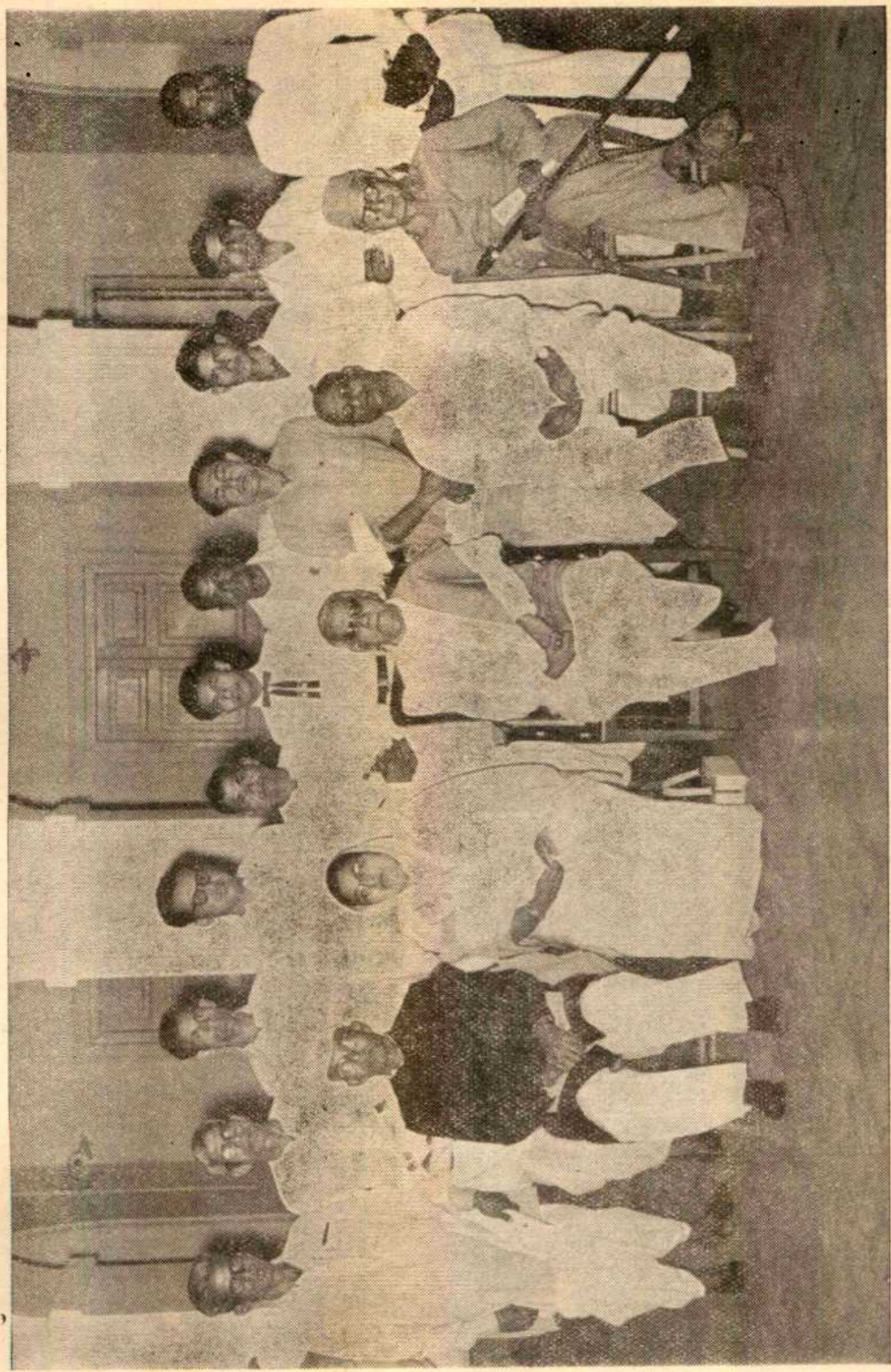
আমার জমি নিচু ও সমতল, তার মাটি এঁটেল। একরপ্রতি জমিতে ১৫০ মণ (১৫ গাড়ি) গোবরসার এবং পচাসার চৈত্র মাসের মাঝামাঝি ছিটিয়ে দিয়ে রাখি। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি বীজতলার জমি চাষ-মই দিয়ে আগাছা-মুক্ত করি এবং তাতে ১০ মণ (১ গাড়ি) গোবরসার প্রয়োগ করি। ১২ সের 'হেতে মাওড়' আমন ধানের বীজ লবণজলে ভিজাই এবং পুষ্ট বীজগুলি জল থেকে তুলে ঠান্ডা জায়গায় বিছিয়ে দিয়ে শুকিয়ে নিই। সেই বীজগুলি "অ্যাগ্রোসেন জি এন"এর সাহায্যে শোধন করে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষদিকে বীজতলায় বুনো দিই। বীজ বোনার ১৬-১৭ দিন পরে দেড় সের অ্যামোনিয়াম সালফেট কিছু গোবরসারের সঙ্গে মিশিয়ে ভালভাবে ধানের চারাগুলির গোড়ায় ছিটিয়ে দিই।

তাতে চারাগুলি সতেজ হয় ও তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে।

আষাঢ় মাসে চার-পাঁচ বার লাঙল-মই দিই। জমির আইলগুলি ভালভাবে বেঁধে দিই এবং জমির আগাছা সবলে বেছে ফেলি। আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহে জমিতে লাঙল-মই দিয়ে কাদা করি। কাদা করবার সময় একরপ্রতি ১ মণ ১০ সের ধানের মিশ্রসার ছিড়িয়ে দিই। পরে বীজতলা থেকে খুব সাবধানে চারাগুলি তুলে নিই। গাছের শিকড় যেন না ছেঁড়ে এবং চোট না খায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখি। আষাঢ় মাসের শেষের দিকে জমিতে ১০ ইঞ্চি দূরে দূরে দু'টি করে চারা একত্রে খুব সাবধানে রোপণ করি।

চারা লাগাবার এক মাস পরে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের শেষের দিকে আরও ১ মণ ১০ সের ধানের মিশ্রসার ছিড়িয়ে দিয়ে জমিতে একবার নিড়েন দিই এবং গাছের গোড়ার মাটি নিড়ানীর সাহায্যে আলগা করে দিই—যাতে গাছের শিকড় সহজেই জমি থেকে খাদ্যসংগ্রহ করতে পারে। এর পর শীষ আসবার আগে আরও দু'বার নিড়েন দিই। এইভাবে চাষের কাজ শেষ করে ১৯৫৫ সালের ৩০এ নভেম্বর ইউনিয়ন শস্য-উৎপাদন-প্রতিযোগিতার সভাপতি, কৃষি-সহকারী এবং বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্মচারীর সম্মুখে ফসল কেটে, মাড়াই করে দেখা গেল যে, একরপ্রতি ফলন হয়েছে ৮৭ মণ ৪ সের। উক্ত ধান্য ৮ টাকা মণ দরে বিক্রি করে আমি ৬৯৬ টাকা ১২ আনা ৯ পাই পেয়েছি। তা থেকে চাষের খরচ ২১০ টাকা ১৫ আনা বাদ গিয়ে আমার নিট লাভ হয়েছে ৪৮৫ টাকা ১৩ আনা ৯ পাই।

মহম্মদ আব্দু তৈয়ব মন্ডল,
গ্রাম পালিতবেগিয়া,
থানা কালীগঞ্জ,
জেলা নদিয়া।



দাঁড়িয়ে আছেন ১৯৫৩-৫৫ সালের ধান, গম ও আখ উৎপাদনের প্রতিযোগিতায় পুরস্কারবিজয়ী কৃষকেরা। ব'সে আছেন [বৈদিক থেকে] কবি-উপমহী শ্রী আৰুস সোহুর,
 ক্রীমতী আহমেদ, রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, কবিমহী ডাক্তার মন্মথকুমার আহমেদ ও লোকসভার সদস্য ডক্টর রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

আলু

১৯৫০-৫১

আমি যে জমিতে আলুর চাষ করেছি তার মাটি বেলে দোআঁশ। ভাদ্র মাসে পাট ফসল উঠে যাবার পর উক্ত জমিতে ৩-৪ বার লাঙল দিয়ে জমি ভালভাবে ভেঙে রাখি। আশ্বিন মাসের প্রথমে উক্ত জমিতে একরপ্রতি ৯০০ মণ পাঁকমাটি এবং ৬০০ মণ পুরাতন দেয়াল-ভাঙা মাটি ছড়িয়ে দিই। ৩-৪ দিন পর জমির রস কিছুটা শুকিয়ে গেলে পরপর ৪-৫ বার লাঙল ও মই দিয়ে জমি পাট করে রাখি। ২-৩ দিন পর উক্ত জমিতে একরপ্রতি ৩০০ মণ গ্রামা পচা-সার এবং ৫০০ মণ গোবরসার ছড়িয়ে দিই ও হাতকোদালি দিয়ে সমস্ত জমি কুপিয়ে রাখি। কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহে একরপ্রতি ২০ মণ বাদাম-খইল ছড়িয়ে পরপর ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে রাখি। ৬-৭ দিন অন্তর আবার একর-প্রতি ২০ মণ খইল ও ৬ মণ সুপারফসফেট ছড়িয়ে দিয়ে, ভালভাবে চাষ ও মই দিই। কার্তিকের মাঝামাঝি উক্ত জমিতে সেচ দেওয়া হয়। একদিন পর জমিতে ৩ বার লাঙল দিয়ে একরপিছ ২০ মণ খইল ছড়িয়ে দিয়ে পরপর ৪ বার লাঙল ও মই দিয়ে বীজ বসানোর জন্য জমি তৈরি করি। কার্তিকের শেষে 'গোহাটী' আলুর গোটা বীজ একরপিছ ৩০ মণ হিসাবে, ২০ ইঞ্চি ব্যবধানে সোজা সারিতে ৯ ইঞ্চি অন্তর বসানো হয়। জমিতে বীজ লাগাবার ৬-৭ দিন অন্তর তিনবার সেচ দিই। বীজ বসানোর ২১ দিন পরে একর-প্রতি ৪ মণ অ্যামোনিয়াম সালফেট ছড়িয়ে, কোদালি দিয়ে জমির মাটি ভালভাবে আলগা করে দিই এবং পরের দিন আলুগাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিয়ে ভেলি তৈরি করি। পরদিন হাতকোদালি দিয়ে ভেলির মাঝে জল চলার নালা করে দিই। ২-৩ দিন অন্তর সেচ দিয়ে ২ মণ অ্যামোনিয়াম সালফেট ছড়িয়ে দিই। নিয়মিতভাবে

আলুগাছ না শুকানো পর্যন্ত ৪-৫ দিন অন্তর সেচ দিই। আলুবীজ বসানোর দেড় মাস পরে এবং আবার তার দেড় মাস পরে—এই দু'বার ভালভাবে সমস্ত জমিতে নিড়েন দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিই।

ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহে শস্য-উৎপাদন-প্রতি-যোগিতা-সমিতির সদস্যদের ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে আলু তোলা হলে দেখা গেল যে, আমি একরপিছ ফলন পেয়েছি ৬২২ মণ। আমার এই আলুচাষের খরচ ও লাভের হিসাব এখানে দিচ্ছিঃ—

	টাকা
৩০ মণ 'গোহাটী' আলুর বীজ ..	১,০৫০
৯০০ ,, পাঁক মাটি ..	৩০
৬০০ ,, দেওয়ালভাঙা মাটি ..	৩০
৩০০ ,, পচা সার ..	১৫০
৩০০ ,, গোবরসার ..	৩০
৬ ,, সুপার ফসফেট ..	৪৮৫০
৬ ,, অ্যামোনিয়াম সালফেট ..	৭২১০
৬০ ,, বাদাম খইল ..	৬০০
লাঙল ২০ বার ..	৩৬০
জমিতে বীজ বসানো, নিড়েন দেওয়া, কচুরি-পানার পচা-সার প্রয়োগ, নালা কাটা, মাটি চাপা দেওয়া, ইত্যাদি বাবত খরচা ..	২২০
সেচ ২৫টি ..	৩২৫
ফসল তোলার খরচ ..	৮০
	৩,০১৩০

চাষের আয়—

একর প্রতি মোট আলুর ফলন—৬২২ মণ,

৬ টাকা মণ দরে ৬২২ মণ আলুর দাম	৩,৭৩২
বাদ খরচা	৩,০১৩।০
নিট লাভ	৭১৮।০

শ্রীগোবর্ধন কোলে,
গ্রাম নালিকুল,
থানা হরিপাল,
জেলা হুগলি।

১১৫১-৫২

আমি যে পদ্ধতিতে আলুচাষ করে এই পুরস্কার পেয়েছি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দিচ্ছি।

জমিতে বর্ষার আগেই চাষ দিয়ে রেখেছিলাম। প্রথম দু'এক পশলা বৃষ্টির জল ক্ষেতের মধ্যে ধরে, তা ক্ষেতেই রেখে দিই। বর্ষার পরে বার বাব চাষ দিয়ে মাটিকে প্রায় ধুলোর মত করে ফেলি। আমাদের গ্রামের বেলে দোআশি জমি আলুচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কয়েকবার চাষ দেওয়ার পর জমির পাথর-ঢেলা সব পরিষ্কার হয়ে যায়। জমিতে মোটমাট ১৬ বার চাষ দিয়েছি।

একরপিছ ভাল করে পচানো ১০৫৬ মণ গোবর-সার দিয়ে জমি তৈরি করেছিলাম, সেইসঙ্গে কিছু খইল আর অ্যামোনিয়ম সালফেটও দেওয়া হয়েছিল।

বীজের জন্য আমার চাষ একটু নাবি হওয়ায় কালকা থেকে 'নৈনিতাল' জাতের বীজ আনাই। সেই বীজ কেটে জমিতে 'জো' হলে ৬ই ডিসেম্বর তারিখে রোপণ করি। একরপ্রতি আমার ২১ মণ করে বীজ লেগেছিল। আলুগুড়ালি ৩^০ ফুট অন্তর সারিতে ১৫ ফুট অন্তর রোপণ করি। রোপণের দু' সপ্তাহ পরেই সমস্ত আলুর অঙ্কুর বেরিয়ে আসে। তখন সেচ দিলে সমস্ত গাছ তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। আলুর চারাগুলি ৪-৫

ইঞ্চি লম্বা হওয়ার পর প্রথম খইল ও অ্যামোনিয়ম সালফেট ব্যবহার করি। সার ব্যবহার করার পরে সেচও চলতে থাকে। আলুগাছগুলি একটু বড় হয়ে উঠলে আর-একবার সার দেওয়া হয়। একর-প্রতি ১০৪ মণ সরষের খইল ও ১১ মণ অ্যামোনিয়ম সালফেট ব্যবহার করি। জমিতে মোটমাট ১৭বার জলসেচ করতে হয়। আপনারা জানেন, বেলে-দোআশি মাটিতে জল বেশিক্ষণ থাকে না। সুতরাং যখনই জলের টান দেখেছি তখনই সেচ দিয়েছি।

আলু ক্ষেতে ঘাসের উপদ্রব হওয়ায় আমাকে দু'বার ঘাস পরিষ্কার করতে হয়েছে ও আলুগাছের গোড়ায় মাটি দিতে হয়েছে। এভাবে আলুগাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে আমি দেখেছি যে, সার ও সেচের পূর্ণ সম্ভাব্যতার করতে হলে আলুগাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

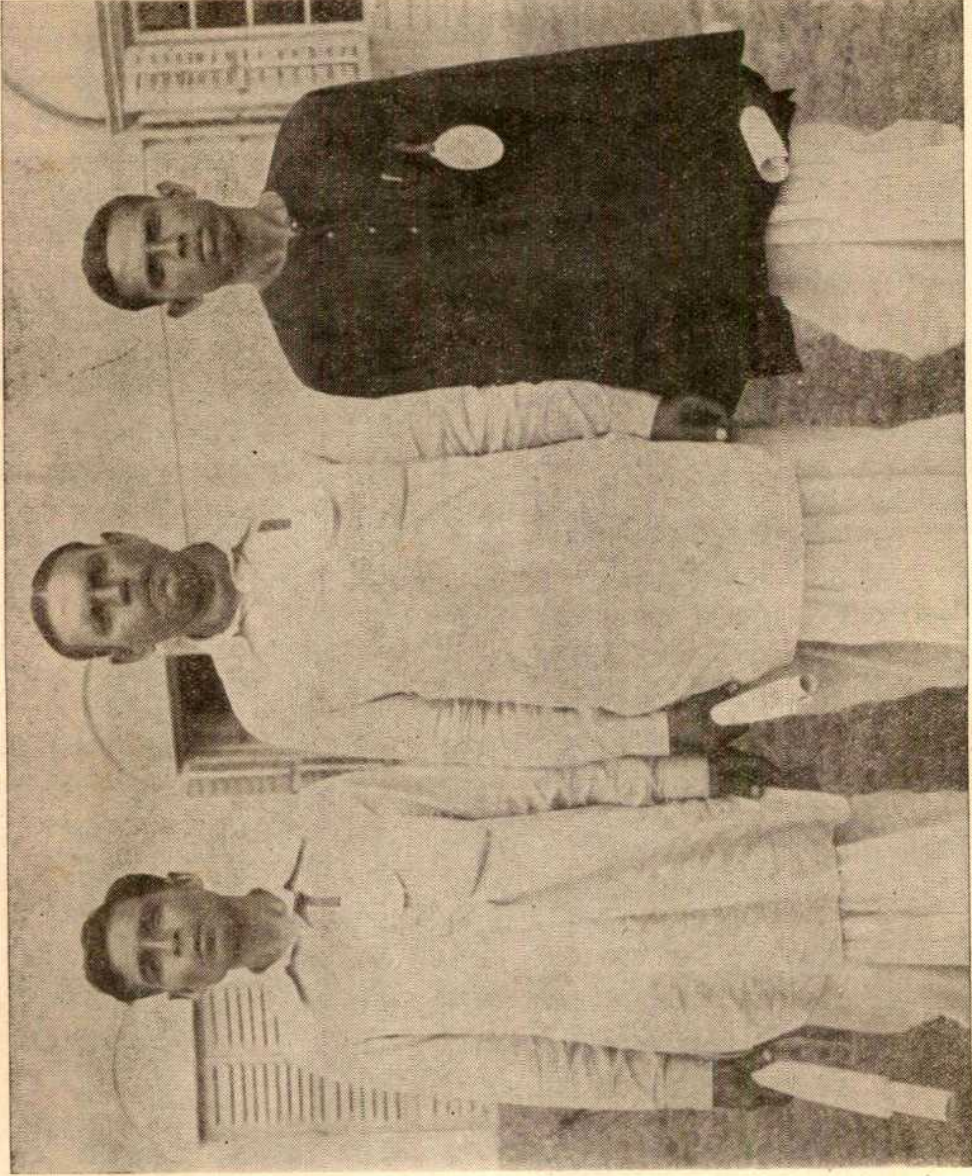
সৌভাগ্যক্রমে আলুগাছে কোন রোগ বা পোকের উপদ্রব হয় নি। আলুর গাছগুলি সতেজ ও পুষ্ট ছিল। আশপাশের গ্রাম থেকে লোকে আমার আলুর ক্ষেত দেখতে আসত।

আলুগাছগুলি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে আমি কৃষিবিভাগের কর্মচারীদের সামনে ফসল তোলার আয়োজন করি। ১৯৫২ সনের ১০ই মার্চ তারিখে নির্ধারিত দিনে আলুর ফসল তোলা হয়। প্রতিটি আলু সদুপরিণত ও সদুপুষ্ট ছিল। আলু উঠানোর পর ওজন করে দেখা গেল যে, একরপ্রতি ৬৬২ মণ ফলন হয়েছে।

শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী,
ভট্টগ্রাম,
থানা গরবেতা,
জেলা মেদিনীপুর।

১১৫২-৫৩

এই প্রতিযোগিতার চাষে আমার জমির পরিমাণ ছিল ৪০ শতক। তার মাটি বেলে দোআশ। এই জমি আগের বছর পতিত অবস্থায় ছিল। প্রথমত



১৯৫২-৫৩ সালের আলু-উৎপাদন-প্রতিযোগিতায় [বাদিক থেকে] ক্রিগিরীন্দ্রনাথ সাহা প্রথম, ক্রীতকর্ডি ঘোষ দ্বিতীয় এবং ক্রীতবলচন্দ্র পাড়ুই তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন

আমি উক্ত জমিতে ট্র্যাক্টরের সাহায্যে গভীরভাবে দু'টি চাষ দিই। তারপর লাঙল দিয়ে আরও ছয়টি চাষ দেওয়া হয় এবং প্রতি চাষের পর দু'বার করে মই দিয়ে ও লোক লাগিয়ে ঢেলা গুঁড়ো করিয়ে মাটি ধুলোর মতো করে ফেলা হয়। এইভাবে ৮টি চাষের পর জল দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিয়ে, জো হ'লে একরপ্রতি গোবরসার ৬০০ মণ, সুপারফসফেট ১২ মণ এবং কাঠের ছাই ৬০ মণ প্রয়োগ করি। তারপর আরও ৪টি চাষ দিয়ে একরপ্রতি ২৪ মণ রেড়ির খইল প্রয়োগ করি। খইল দেওয়ার পর ৪বার চাষ ও মই দেওয়া হয়। তারপর জমিটিকে ৫ হাত করে ফালিতে ভাগ করা হয় ও জল চলার নালা কাটা হয়। জল দিয়ে, 'জো' হ'লে উক্ত ফালিগুলি কোদালি দিয়ে কুপিয়ে মাটি আলগা করে দেওয়া হয়। এবারে জমি বীজ-রোপণের উপযুক্ত হ'লে আমি প্রতি খুঁবিতে ২টি করে অঙ্কুরিত বীজ-আলু রোপণ করি।

একরপ্রতি ৩০ মণ হিসাবে বীজ লাগাই। যাতে জমিতে একটিও খারাপ বীজ রোপিত না হয় সেজন্য রোপণের আগে বীজগুলি ভালভাবে বাছাই করি। কিছু বীজ কেটে দেখি—রোগগ্রস্ত কিনা। এভাবে কাটা, দাগী ও পচা বাবত মোট বীজের শতকরা প্রায় ৭ ভাগ বাদ যায়। বাছাই বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার জন্য হাপর দেওয়া হয়। তারপর বীজ অঙ্কুরিত হ'লে জমিতে রোপণ করা হয়।

বীজ রোপণের সময় ভেলিতে একরপ্রতি ২৪ মণ রেড়ির খইল প্রয়োগ করি। আমি ১৯৫২ সালের ২১এ নবেম্বর তারিখে আমার জমিতে আলুবীজ রোপণ আরম্ভ করি এবং নষ্ট খুঁবিতে বসাবার জন্য কিছু বীজ ঐ জমিতেই হাপর দিয়ে রাখি। ১৯ ইঞ্চি অন্তর সারিতে ১২ ইঞ্চি দূরে দূরে ৪ ইঞ্চি মাটির নিচে বীজ বসানো হয়।

আলুবীজ রোপণের ১৮ দিন পরে প্রয়োজনবোধে জল দিয়ে জমি ঝাপটিয়ে দেওয়া হয়; তখন জমিতে প্রায় সমস্ত গাছ ফুটে গিয়েছিল। ঝাপটানোর দু' দিন পর জমিতে একরপ্রতি সাড়ে ষোল মণ আলুর

মিশ্রসার ছাড়িয়ে বৃদ্ধি কোপানো হয়। যে-যে খুঁবির বীজ অঙ্কুরিত হয় নি, সেখানে হাপর-দেওয়া বীজ মাটি সমেত তুলে লাগানো হয়। এতে আমার জমিতে একটি খুঁবিতেও খারাপ আলুগাছ হয় নি। ছয় দিন পরে জমি জল দিয়ে ঝাপটিয়ে দেওয়া হয় এবং 'জো' হ'লে গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া হয়—অর্থাৎ রোল দেওয়া হয়। রোল দেওয়ার পর প্রথমত দুই দিন উপর-উপর সেচ দেওয়া হয়, পরে ২, ৩, ৪ দিন অন্তর, পরে অবস্থাবিশেষে ৫ দিন অন্তর এবং শেষের দিকে ৬-৭ দিন অন্তর সেচ দেওয়া হয়। আমার সব সময় লক্ষ্য ছিল যাতে সেচের জল বেশি না হয়, কারণ তাতে মাটি এঁটে গিয়ে আলুর বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটায়। আলু তোলার আগে পর্যন্ত মোট ১৬টি সেচ দেওয়া হয়। আমার জমি কানা দামোদর নদীর নিকট থাকায় এবং আমার নিজস্ব পাম্প-ঘন্ট থাকায় নিয়মিত সেচ দেওয়ার কোনরূপ অসুবিধা হয় নি।

আলুগাছের উচ্চতা ৯-১০ ইঞ্চি হ'লে প্রথম বার ডি-ডি-টি এবং পেরেনক্স গোলা জল ছিটানো হয়। এর পর প্রতি ১৫ দিন অন্তর একবার করে ওষুধ ছিটানো হয়। এভাবে সর্বসমেত মোট ৪বার ওষুধ ছিটানো হয়। এর ফলে আলুগাছে রোগের আক্রমণ হয় নি এবং গাছের আয়ুও বেড়ে যায়। গাছ বেশি দিন ক্ষেতে থাকলে আলু বাড়বার সুযোগ পায়।

আমার জমিতে আলুগাছ ১১৯ দিন ছিল। আমি ২০এ মার্চ ১৯৫৩ তারিখে সরকারী কৃষি-কর্মচারি-বৃন্দে, শস্য-উৎপাদন-প্রতিযোগিতা সমিতির সভ্য-গণের এবং আরও বহু চাষীর উপস্থিতিতে আলু তুলি।

আমার জমি থেকে আলু পাওয়া যায় একরপ্রতি ৫৮৯ মণ ২৫ সের ১৩ ছটাক।

আমি প্রতি খুঁবিতে দুইটি করে অঙ্কুরিত বীজ রোপণ করেছিলাম এবং এক খুঁবি থেকে অপর খুঁবির দূরত্ব একটু বেশি রেখেছিলাম। ফলে আলু সংখ্যায় বেশি হয়েছে।

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

আমার চাষের খরচ হয়েছে একরপতি নিম্নরূপঃ

	টাকা
আলুবীজ 'গৌহাটী' (৩০ মণ) ..	৮১০
জমি তৈরি ..	১৪৪
চাষ ১৬বার ও মই দেওয়া ..	৪২
চেলা ভাঙ্গা (২ বার) } ..	২১
মাটিতে জল দেওয়া (২ বার) }	

সার বাবত—

গোবরসার	৬০০ মণ	১৮০
ছাই	৬০ ,,	১০১১০
রেডির খইল	৪৮ ,,	৪৫৬
সুপারফসফেট	১২ ,,	৭২
আলুর মিশ্রসার	১৬১১ ,,	২০২১১০

অন্যান্য খরচ—

বীজ হাপার দেওয়া ও বাছাই করা ..	৩০
বীজ রোপণ ..	৬৩
নালা কাটা ও বুক কোপানো (২ বার) ..	৭৩১১০
রোল দেওয়া (মাটি দেওয়া) ..	৬৩
১৬বার সেচ, ৪বার ঝাপটান দেওয়া এবং পাম্প যন্ত্রের খরচ ..	১৮৭১১০
ডি-ডি-টি ও পেরেনক্স ছিটানো (৪ বার) ..	৪০১১০
আলু তোলা ..	৬৭১১০
	২,৪৬৩

আয়ের হিসাব

আলু প্রতি মণ ৬ টাকা থেকে ৬১০ আনা হিসাবে—	মোট ..	৩,৪১১
	বাদ খরচা ..	২,৪৬৩
	নিট লাভ ..	৯৪৮

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সাহা,

গ্রাম দ্বীপা,

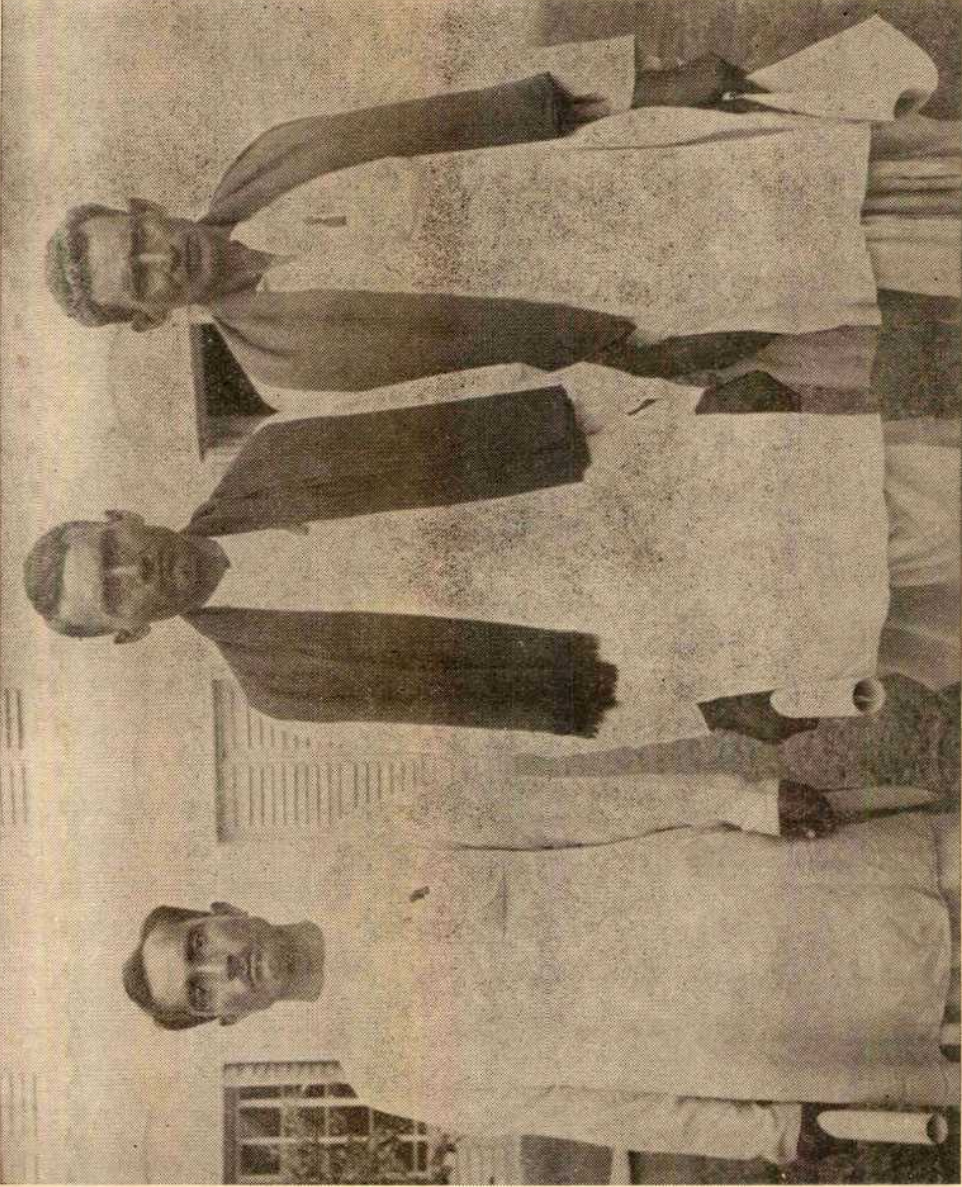
থানা হরীপাল,

জেলা হুগলি।

১১৫০-৫৪

গত বছর আমি আলুচাষের প্রতিযোগিতায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলাম ও তার আগের বছর তৃতীয় স্থান লাভ করেছিলাম। আগের দু'বছরের পুরস্কারে উৎসাহিত হয়ে আমি আরও নিবিষ্টভাবে ও বিশেষ পরিশ্রম সহকারে আলুর ফলন বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করেছি এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমার পরিশ্রম সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

আলুচাষে জমি নির্বাচন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। জমির মাটি ও জমিতে জলসেচের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আলুর জমির মাটি ভাল দোআঁশ হওয়া দরকার। নিকটে সেচের জলের ব্যবস্থা থাকা চাই। আমি প্রথম থেকেই এসব দিকে লক্ষ্য রেখে দেড় বিঘা মাপের একটা জমি এই প্রতিযোগিতার চাষের জন্য নির্বাচন করি। এই জমিতে পূর্ববর্তী ফসল ছিল পাট; তা কাটা হয়ে যাওয়ার পরে ভাদ্রমাস থেকেই আলু লাগানোর আগে পর্যন্ত কিছুদিন অন্তর অন্তর মোট ২৪-২৫ বার চাষ দিয়েছি। জমিতে কোন আগাছা বা জল জমতে দিই নি। জমিতে যখন এই চাষ দেওয়া চলছিল, তখন ৪০০ মণ দেওয়াল-ভাঙা মাটি, ৪৫০ মণ পাঁকমাটি ও ৬০০ মণ গোবরসার প্রথমে চার একর জমিতে ভাল-ভাবে ছড়িয়েছি। ভাদ্রমাসের ভিতরেই এইসব সার জমিতে প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ হয়েছিল। এর পর আশ্বিন মাসে সাড়ে তের মণ বাদাম-খইল ও কার্তিক মাসে সাড়ে সাত মণ মিশ্রসার এবং আরও সাড়ে তের মণ বাদাম-খইল ভালভাবে গুঁড়ো করে জমিতে দিয়েছি ও চার-পাঁচবার চাষ দিয়ে জমিতে মিশিয়ে দিয়েছি; তারপরে “গৌহাটী” জাতের সওয়া পনের সের আলুবীজ না কেটে আস্ত কার্তিক মাসের ২৫ তারিখে জমিতে লাগিয়েছি। পরে ৫-৬ দিন অন্তর মৃদু জলসেচ করেছি। প্রায় এক মাস পরে যখন গাছ প্রায় ৮-৯ ইঞ্চি বড় হয়েছে তখন প্রথম মাটি তুলে দেওয়ার সঙ্গে অ্যামোনিয়াম



১৯৫২-৫৩ সালের গয়-উৎপাদন-প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন : [বাঁদিক থেকে] শ্রী আমানত আলি,
শ্রী ডাঃ মোহাম্মদ সরকার ও শ্রী পকানন গবাই

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

সাল্‌ফেট ৩ মণ প্রয়োগ করি। এর পর তিনবার 'পেরেনক্স' ওষুধ সমস্ত ফসলে ছিটিয়ে দিই। এই ওষুধ প্রয়োগের ফলে কিছুদিনের মধ্যেই ফসলের বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় ও আমার ক্ষেত ধসা ও অন্যান্য রোগ থেকে মুক্ত থাকে। নিয়মিত উপযুক্ত সেচ-ব্যবস্থা আমি ফসল ওঠা পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছি। ফাল্গুন মাসের ২৬ তারিখে আমি ফসল তুলি এবং একরপ্রতি ৬০৬ মণ ৩৬ সের আলু পাই। আমার ফসল তোলার সময় স্থানীয় দুই-তিন শত চাষী, স্থানীয় কৃষিকর্মচারী-বৃন্দ, ফসল-প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী স্থানীয় কৃষকেরা ও গ্রাম্য পঞ্চায়তের সভ্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এই চাষে বিভিন্ন খাতে মিলে একরপ্রতি মোট ৩,১২৫ (তিন হাজার একশ' পঁচিশ) টাকা খরচ হয়েছে এবং আমার ৫১৬ টাকা ৬ আনা ১ পয়সা নিট লাভ হয়েছে।

শ্রীদুর্কিচরণ ঘোষ,
গ্রাম বনমালীপুর,
থানা চণ্ডীতলা,
জেলা হুগলি।

১৯৫৪-৫৫

আমি যে-জমিতে আলুচাষ করি তার মাটি বেলে দোআঁশ। ভাদ্র মাসে পাট কাটা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই পরপর ৪টি চাষ দিয়ে জমি ভেঙে রাখি। আশ্বিনের প্রথমে উক্ত জমিতে একরপ্রতি ৯৯০ মণ পাঁকমাটি এবং ৬০০ মণ পুরাতন দেওয়াল-ভাঙা মাটি ছিটিয়ে দিই। তিন দিন পর জমি কিছুটা শুকোলে পরপর ৫টি লাঙল ও মই দিয়ে জমি তৈরি করি। দুই-এক দিন পরে উক্ত জমিতে একরপ্রতি ১,২০০ মণ গোবরসার ছিটিয়ে দিই এবং হাত-কোদালি দিয়ে সমস্ত জমি ভাল করে কুঁপিয়ে দিই। কার্তিকের প্রথম সপ্তাহে একরপ্রতি ১৮ মণ বাদাম-খইল ছিটিয়ে দিয়ে পরপর ৩টি চাষ ও মই দিই। সাত দিন অন্তর আবার একরপ্রতি ১৮ মণ খইল

দিয়ে তিনবার চাষ ও মই দিই। কার্তিকের তৃতীয় সপ্তাহে উক্ত জমিতে সেচ দিয়ে সমস্ত জমি ভাল-ভাবে ভিজিয়ে দিই। একদিন পর ৩টি লাঙল দিয়ে একরপ্রতি ১৮ মণ খইল এবং ১৮ মণ মিশ্রসার ছিটিয়ে দিয়ে পরপর ৪টি লাঙল ও মই দিয়ে জমি পাট করি। এইভাবে বীজ রোপণের জন্য জমি তৈরি করি।

নবেম্বর (১৯৫৪) মাসের ১৭ তারিখে 'গোঁহাটী' মাঝারি আকারের গোটা বীজ একরপ্রতি ৩০ মণ হিসাবে, ১৭ ইঞ্চি অন্তর সোজা সারিতে ৬ ইঞ্চি দূরে দূরে ৩-৪ ইঞ্চি মাটির নিচে বসানো হয়। জমিতে বীজ বসানোর পর ৪-৫ দিন অন্তর অন্তর তিনবার সেচ দিই। বীজ বসানোর তিন সপ্তাহ পরে একরপ্রতি ৪ মণ অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট ছিটিয়ে দিয়ে জমি ভাল করে কোদালি দিয়ে কুঁপিয়ে দেওয়ার পর সেচ দিই। একদিন পরে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিয়ে সোজা ভেল তৈরি করা হয় এবং পরের দিন হাতকোদালি দিয়ে সেচের জল সমস্ত জমিতে যাতে যেতে পারে এমনভাবে দাঁড়া বা নালা তৈরি করি এবং একদিন অন্তর অন্তর ৩টি সেচ দিই। তিনদিন পরে উক্ত নালাতে একর-পিছ দুই মণ হিসাবে অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট ছিটিয়ে দিয়ে ভাল করে সেচ দিই। এর পর ৫-৬ দিন অন্তর অন্তর সেচ দিয়ে বাই। জমিতে আলু বসানোর দেড় মাস পরে একবার এবং তার দেড় মাস পরে আর-একবার ভাল করে নিড়েন দিয়ে জমির আগাছা পরিষ্কার করে দিই।

ফসলে যাতে কোনপ্রকার পোকা অথবা রোগের আক্রমণ না হয় তার প্রতিবেদক হিসাবে অগ্রহায়ণ ও পৌষের শেষভাগে এবং মাঘ মাসের মাঝামাঝি মোট তিনবার পেরেনক্স ওষুধ ছিটিয়ে দিই।

এই মার্চ (১৯৫৪) তারিখে শস্য-প্রতিযোগিতা-সমিতির সদস্যগণের উপস্থিতিতে আলু তোলা হয় এবং দেখা যায় যে, একরপিছ ৬০৩ মণ ফলন হয়েছে।

এই চাষের একরপিছ খরচ

	টাকা
৯৯ মণ পাকমাটি (জমিতে পৌছানোর খরচ সহ)	৩০
পুরাতন দেওয়াল ভাঙ্গা মাটি (৬০০ মণ)	৩০
গোবরসার (১,২০০ মণ) ...	১২০
বাদাম খইল (৪২ মণ) } ...	৪৮০
সরষের খইল (১২ ,,) }	
মিশ্রসার (১৮ ,,) ...	১৮০
আমোনিয়াম সালফেট (৫৫ মণ) ...	৭০
পেরেনক্স (১০ পাউণ্ড) ...	৬০
লাঙ্গল (২০ বার) ...	৩৭৫
জমি কোপানো ও নিধানো ...	৭০
জমিতে সার আনা ও ছড়ানো ...	২০
সেচ ...	৩০০
বীজ বপনের খরচ ...	৭০
মাটি কোপানো ও নালা করা ...	৪৮
বীজের মূল্য 'গোঁচাটা' (৩০ মণ) ...	১,২৬৮
বীজ বপনের খরচ ...	৭০
	৩,২০০

আয়ের হিসাব—

৭ টাকা মণ দরে ৬০৩ মণ আলুর দাম ...	৪,২২১
বাদ খরচ ...	৩,২০০
নিট আয় ...	১,০২১

শ্রীদুর্গাচরণ ঘোষ,
গ্রাম বনমালীপুর,
থানা চণ্ডীতলা,
জেলা হুগলি।

১৯৫৫-৫৬

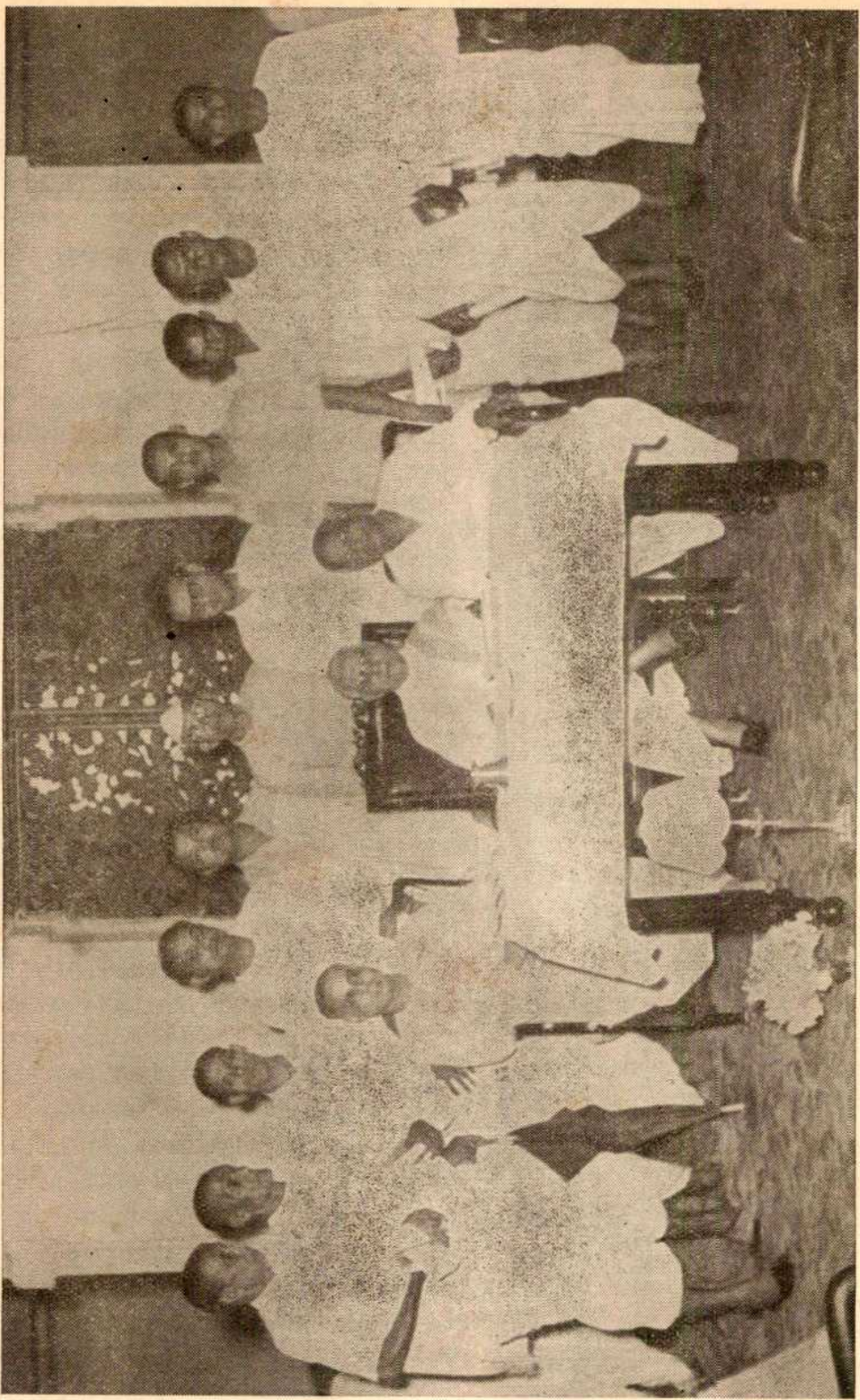
আমি যে জমিতে এই প্রতিযোগিতামূলক আলু-চাষ করছি, তার আয়তন ৪০ শতক, মাটি বেলে দোআঁশ।

আমার এই জমিতে পাটের চাষ ছিল। ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে পাট কাটা হওয়ার পর জমিতে

২টি চাষ দেওয়া হয়। পরে সেই জমির মাটি কোদাল দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়। আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহে সেই জমিতে প্রয়োজনমত পরপর কয়েকবার চাষ ও মই দিয়ে মাটি সমান করা হয়। পরে সেই জমিতে দেওয়াল-ভাঙা মাটি, গোবরসার এবং পচাসার দেওয়া হয়। জমির ডেলাগুঁলি ভেঙে গুঁড়ো করে দেওয়া হয়। সেই মাসের চতুর্থ সপ্তাহে জমিতে বিধাপ্রতি ১০ মণ বাদাম-খইল দিয়ে পরপর ২-৩টি চাষ ও মই দেওয়া হয়। আলু বীজ বসানোর ২-৩ দিন আগে সেই জমিতে বিধা-প্রতি ৬ মণ খইল এবং ২ মণ আলুর মিশ্রসার এবং ১ মণ সুপারফসফেট ছাড়িয়ে, ২-১ দিন অন্তর ৪টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করা হয়।

এই জমিতে আমি পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের দেওয়া 'রংবদুল' আলুর বীজ কেটে বসাই। এই বীজ বিধা-পিছ সাড়ে দশ মণ লেগেছে ৮ বাইশ ইঞ্চি অন্তর সারি এবং ১০ ইঞ্চি দূরে দূরে খুঁবি করা হয়। বসানোর আগে বীজগুঁলি ভালভাবে পরীক্ষা করে নেওয়া হয়।

বীজ বসাবার ৩-৪ দিন পরে জমিতে জল ঝাপটিয়ে দেওয়া হয়। পুনরায় ৩-৪ দিন পরে অল্প পরিমাণে দুইবার জল-ঝাপটানো হয়। এর পরে দাঁড়ার মধ্যকার মাটি কোদাল দিয়ে কুঁপিয়ে আলাগা করে দেওয়া হয়। এর ৩-৪ দিন পরে জমিতে জল দিয়ে মাটি নরম করে দাঁড়ার বুকের মাটি গাছের গোড়ায় তুলে দেওয়া হয়। এর এক-দিন পরে সরু কোদাল দিয়ে দাঁড়ার মধ্যকার মাটি তুলে জলসেচের উপযোগী করে দেওয়া হয়। আরও একদিন পরে অল্প পরিমাণে জল দেওয়া হয়। পরপর ২-৪ দিন অন্তর অন্তর মোট ১৬ বার জলসেচ করা হয়। আলুর গাছ যখন ৯-১০ ইঞ্চি, তখন গাছে ডি-ডি-টি এবং পেরেনক্স জলের সঙ্গে মিশিয়ে পরপর তিনবার ছিটিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ক্ষেতের শতকরা প্রায় ১০টি গাছ কুঁকড়ে যায়। কৃষি-পরিদর্শক মহাশয় আমার জমিতে এসে কোঁকড়ানো গাছগুঁলি দেখে যান। অনেকে মনে



দাঁড়িয়ে আছেন ১৯৫৩-৫৪ সালের শস্য-উৎপাদন-প্রতিযোগিতায় পুরস্কারবিজয়ী কৃষকেরা। ব'সে আছেন [বৈদিক থেকে] সেচ-জলপাধ্যায় শ্রী হজরতুমার মুখোপাধ্যায়, রাজ্যপাল উইল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এবং কৃষি-পশুপালনমন্ত্রী ডাক্তার বক্ষিউদ্দিন আহমেদ। দণ্ডায়মান কৃষকদের মাধ্যমে কৃষি-উপমন্ত্রী শ্রী আবদুস সেকুর

করেন যে, আবহাওয়ার দোষে সেই গাছগুলি কুঁকড়ে গিয়েছিল। সেই গাছগুলি থেকে একটিও আলু পাওয়া যায় নি।

জমিতে ফসল মোট ৯৯ দিন ছিল। আলু তোলার সময় শ্রীরামপুরের মহকুমা-শাসক, কৃষি-পরিদর্শক, ও কৃষিবিভাগের স্থানীয় অন্যান্য কর্মচারীগণ, আমাদের বলরামবাটি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ও সভাগণ, হুগলি জেলা কৃষকসমিতির সচিব এবং বহু গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন। আলু তোলা হয় ফেব্রুয়ারি (১৯৫৬) মাসের ২৭ তারিখে। দেখা যায় যে, আমার চাষে একরপিছুর হিসাবে ৪২৪ মণ আলু হয়েছে।

আমার বিশ্বাস, যদি আমি 'রংবুল' আলু না লাগিয়ে 'গোহাটী' বীজ ব্যবহার করতাম, তা হ'লে ফলন আরও বেশি হ'ত। 'রংবুল' আলুর চাষের এই অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয় যে, আমাদের এখানকার মাটি হয়তো এই আলুচাষের উপযোগী নয়। তবে, অন্য জাতের আলুর চেয়ে এ আকারে অনেক বড়। কতকগুলি গাছ কুঁকড়ে না গেলে নিশ্চয়ই আরও বেশি আলু পাওয়া যেত।

আমার এই চাষের একরপিছুর খরচ

	টাকা
আলুর বীজ (রংবুল) ও জমি তৈরি	৮৩৬।১০
১৫ বার জমিতে চাষ ও মই দেওয়ার খরচ	১৮০

	টাকা
ডেলা ভাঙ্গা ইত্যাদি	৫০
খইল (৬০ মণ) ...	৬০০
মিশ্রসার ও সুপারফসফেট	৯০
গোবরসার, মাটি ইত্যাদি	৫০
বীজ বসানোর খরচ	৬৫
বুক কোপানো ...	২২
গোড়ায় মাটি দেওয়া ও দাঁড়া টানা	৬২
জলসেচের খরচ ...	১৬০
ডি-ডি-টি ও পেরেনক্স ছিটানোর খরচ ...	২৫
আলু রোয়ার খরচ	১২০

মোট ... ২,২৬০।১০

৮ টাকা থেকে ১১ টাকা মণ দরে	
৪২৪ মণ আলুর দাম	৩,২৩০।০০
বাদ খরচ ...	২,২৬০।১০

নিট লাভ ... ৯৭০।১০

শ্রীসুবলচন্দ্র পাড়ুই,
গ্রাম শ্রীরামপুর,
থানা সিঙ্গুর,
জেলা হুগলি।

গম

পশ্চিমবঙ্গে গম-উৎপাদন-প্রতিযোগিতার পুরস্কার
দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে ১৯৫১-৫২ সাল থেকে।

১৯৫১-৫২

আমার নিজস্ব ক্ষেত্রে উৎপাদিত মাঝারি রকমের উন্নত শ্রেণীর 'গঙ্গাজলী' গমের বীজ মাড়াই-ঝাড়াই করে শুকিয়ে যত্নসহকারে নিজ বীজাগারে রেখেছিলাম। যাতে পোকা না লাগে অথবা কোন প্রকারে নষ্ট না হয়, সেজন্য মাঝে মাঝে বীজ রোদে দিয়েছিলাম।

দোআঁশ মাটির জমিতে কিছুদিন গোরু রেখে এবং পরে এক চাষ দিয়ে, পচাসার, খইল ও গোবরসার দিয়ে, তারপর আরও ১৯বার ভালভাবে চাষ দিয়ে সেই জমি তৈরি করেছি। তাতে আমার উৎপাদিত 'গঙ্গাজলী' গমের বীজ বপন করেছি। গাছ সামান্য বড় হ'লে তাতে একটি নিড়েন দিয়েছি। সময়মত বৃষ্টি হওয়াতে ক্ষেতে সেচ দেওয়ার দরকার হয় নি।

যে মাঠে আমার জমি, তাতে সাধারণত অন্যান্য মাঠের চেয়ে ফসল ভাল হয়। স্থানীয় কৃষি-কর্মচারী ও শস্য-উৎপাদন-প্রতিযোগিতা-সমিতির সদস্যগণের উপস্থিতিতে ৬ ফুট ৭ ইঞ্চি মাপে বৃত্তাকারে ফলন কাটিয়ে মাড়াই করিয়ে ওজন দেওয়া হ'ল। পরে বাড়িতে তা শুকিয়ে ৮০ তোলায় সেরের ওজনে দেখা গেল, একরপিছ আমি ৫৬ মণ ১২ সের গম পেয়েছি।

হাজী মক্‌বুল হোসেন,
গ্রাম বাহিরকাফ,
খানা রতুয়া,
জেলা মালদহ।

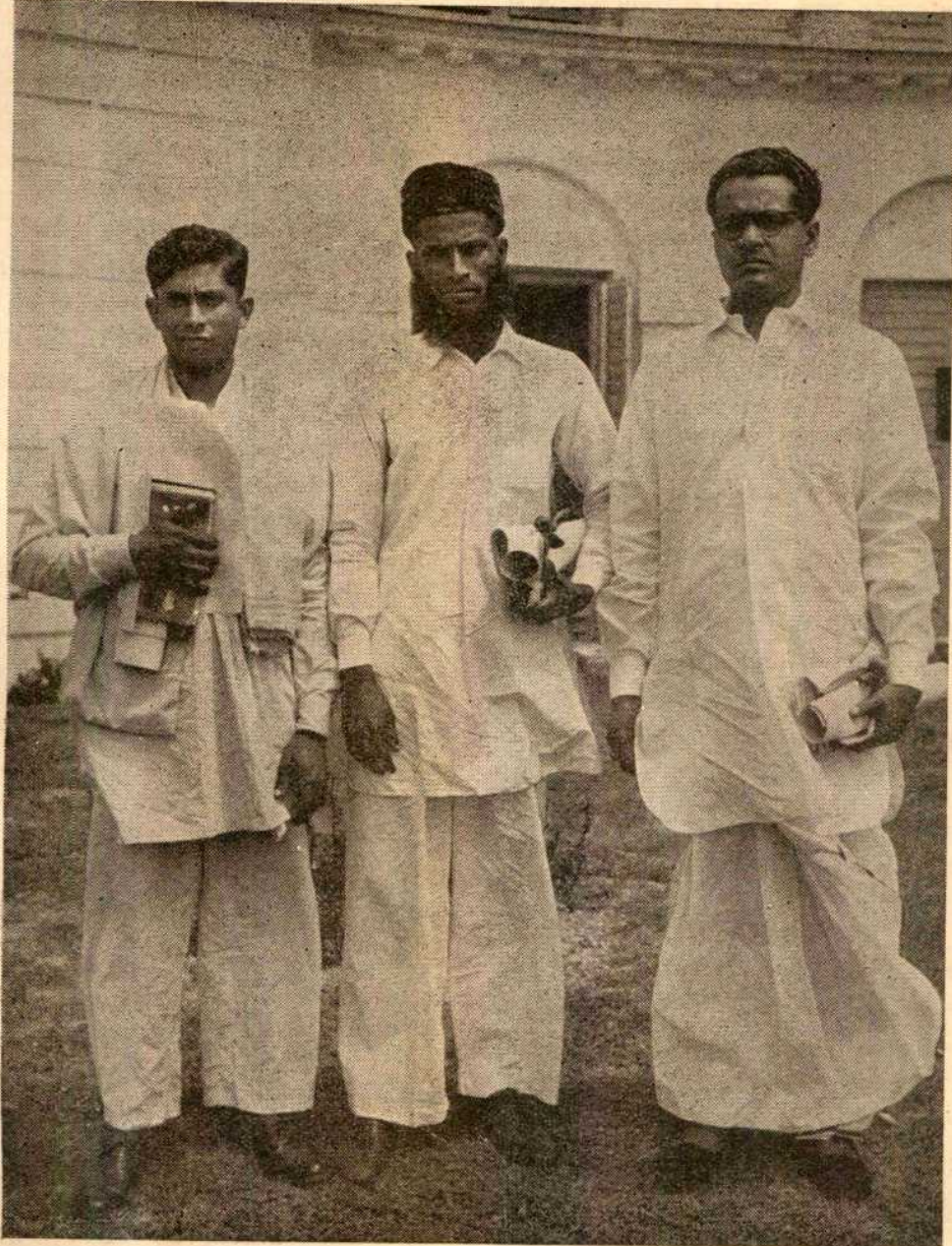
১৯৫২-৫৩

গম আমাদের এলাকার একটি প্রধান শস্য। সাধারণত আমি প্রতি বছর ৪০-৪৫ বিঘা জমিতে গমের চাষ করে থাকি। এর মধ্যে যে জমি বেশি নিচু এবং যার মাটিতে সারা বছর রস থাকে, এমন

এক বিঘা পরিমাণ জমি আমি এই প্রতিযোগিতার জন্য বাছাই করে নিই। ঐ জমির মাটি বেল-দোআঁশ এবং গম উৎপাদনের পক্ষে মনে হয় সবচেয়ে উপযোগী। আমার এলাকার চাষী-ভাইরা আউশ ধান কেটে নেওয়ার পর সেই জমিতে সাধারণত গমের চাষ করে থাকেন। কিন্তু আমি প্রতিযোগিতার জন্য যে এক বিঘা জমি নির্বাচন করি তাতে গম তোলার আগে কোন ফসল লাগাই নি। সারা বছর পতিত রেখে তার পরিচর্যা করেছি।

শ্রাবণ মাসের মাঝ থেকে ঐ জমিতে 'রাখাল বসাই'—অর্থাৎ প্রায় ২০০-২৫০ গোরু সেই জমিতে রাতদিন থাকার ও চরে বেড়াবার জন্য স্থানীয় গোয়ালাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করি। এই 'রাখাল বসানো'র প্রণালী আমাদের এলাকায় কৃষকদের মধ্যে বেশ প্রচলিত। আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত জমিতে 'রাখাল বসানো' থাকে। এর পর জমিতে চাষ দেওয়া শুরু করি। প্রথম ২-৩টা চাষ দিয়ে জমিতে গোবর ইত্যাদি যা 'রাখাল বসানো'র ফলে জমা হয় তা মিশিয়ে দিই। মাটির বিশেষত্বের দিক থেকে আমাদের এলাকাকে সাধারণত 'দিয়াড়া অঞ্চল' বলা হয়, কারণ সেখানকার জমিতে বালির ভাগ একটু বেশি এবং কৃষকদের মনে ধারণা আছে যে, অধিক চাষ কিংবা কোণাকুণি চাষ দিলে মাটির নিচের বালি উপরে আসার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, এই ধারণা অমূলক। বরং চাষ বেশি দিলে এবং কোণাকুণিভাবে দিলে জমিতে আগাছা কম জন্মে এবং ফসল ভাল হয়।

প্রথম চাষ দেওয়ার পরেই জমিতে সার প্রয়োগ করি। পাঁচ গাড়ি গোবরসার (যা এক বছর ধরে উপযুক্ত উপায়ে সংরক্ষিত হয়েছে), ৫ গাড়ি পচাসার ও ৫ মণ সরষের খইল একসঙ্গে জমিতে ছাড়িয়ে দিয়ে, পাঁচবার খুব ভালভাবে চাষ দিয়ে মাটিকে ঝরঝর করে ফেলি। এই সারপ্রয়োগের ২০ দিন পরে জমিতে ২ মণ পরিমাণ মিশ্রসার ছাড়িয়ে দিয়ে আরও পাঁচবার চাষ দিই।



১৯৫৪-৫৫ সালের গম-উৎপাদন-প্রতিযোগিতার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন [বাদিক
থেকে] শ্রীআবুল হক মণ্ডল, শ্রীমোস্তাফা আহমেদ ও শ্রীবিষ্ণুনাথ বাজপেয়ী

কার্ত্তিকের প্রথম দিকে বীজ বপনের দু' দিন আগে জমিতে আরও তিনবার চাষ দিই। এর পর আমার নিজের কাছে উত্তমরূপে সংরক্ষিত ভাল 'গঙ্গাজলী' জাতের বীজ সাড়ে সতের সের জমিতে বুনো দিই।

বীজ বোনার দেড় মাস পরে দু'বার অল্প বন্টি হয়—যার ফলে গাছ বেশ সতেজ হয়ে ওঠে। এ সময়ে অনেক আগাছাও জমিতে দেখা দেয়। জমিকে আগাছা-মুক্ত করার জন্য আমি দু'বার নিড়েন দিই ও মাটি নাড়াচাড়া করে দিই। এসব পরিচর্যা সাধারণত আমাদের এলাকার চাষীরা করেন না।

নিড়েন দেওয়ার পর ফসল বেশ বেড়ে উঠতে থাকে এবং প্রত্যেকটি গাছ ২৮ থেকে ৩০টা পর্যন্ত 'বিয়ান' ছাড়ে। ফসলে কোন কীটের বা রোগের আক্রমণ হয় নি।

২৫এ মার্চ (১৯৫৩) ইউনিয়ন শস্য-উৎপাদন-প্রতিযোগিতা-সমিতির সদস্যগণ এবং কৃষিবিশেষজ্ঞের স্থানীয় কর্মচারীদের সামনে ফলন কাটা হয়। বিঘাপ্রতি ১৫ মণ ২০ সের বা একরে ৪৬ মণ ২০ সের ফসল পাই। এই ফসল উৎপাদনের জন্য আমার বিঘাপ্রতি খরচ পড়ে ৯৪৮ টাকা। বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী ঐ ফসলের দাম ৩১০ টাকা।

মহম্মদ আমানত আলী,
সাং এনায়েতপুর,
থানা কালিয়াকচক,
জেলা মালদহ।

১১৫৩-৫৪

আমি গর্ত করে গোবরসার সংরক্ষণ করি এবং উপরে চালা তুলে দিয়ে রোদবন্টি হাত থেকে সেই সার রক্ষা করি। গোয়ালঘরে প্রত্যহ যে খড়-বিচালি-পাতা থাকে, তার সংযোগে অনেক পরিমাণে চোনাও উক্ত সারে সঞ্চিত হতে থাকে। এই জৈবসার চাষের পক্ষে অধিক উপযোগী ও জমির উর্বরতা বাড়াতে বিশেষ সক্ষম। কারণ এই সার ব্যবহার করে আমি এর সুফলের বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।

প্রতিযোগিতার তালিকাভুক্ত আমার ৩৯ শতক পরিমিত জমিতে আমি বাঙলা ১৩৫৯ সালে

খেসারি বুনোছিলাম। সেই ফসল ঐ সালের ফাল্গুনের শেষের দিকে তোলা হয়। তারপর তিন-বার চাষ দেওয়ার পরে চৈত্রের শেষভাগে সেই জমিতে ৮ গাড়ি গোবরসার মিশিয়ে আবার চাষ দিতে থাকি। ১৩৬০ সালের জ্যৈষ্ঠের মধ্যভাগে পুনরায় উক্ত জমিতে ৭ গাড়ি গোবরসার দিয়ে পাঁচটি চাষ দেওয়ার পর বর্ষার দরুন চাষের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে কোন রকম ভাদুই ফসল পাওয়া যায় নি। আশ্বিনের প্রথম ভাগে উক্ত জমিতে দু'টি চাষ দেওয়ার পরে সরষের খইল আড়াই মণ ও সুপারফস্ফেট এক মণ একসঙ্গে ছড়িয়ে দিয়ে আবার দু'বার ভালভাবে চাষ দিই; পরে কার্ত্তিকের মাঝামাঝিতে বীজ বোনার ১০ দিন আগে অ্যামো-নিয়াম সাল্ফেট ১ মণ ছড়িয়ে দু'বার চাষ দিই ও কার্ত্তিকের শেষভাগে স্বগৃহে রক্ষিত সুস্থ নীরোগ 'গঙ্গাজলী' জাতীয় বীজ বুনো দিই। সময়মত চাষ ও সার দেওয়ার ফলে প্রথম থেকেই চারাগুলি বেশ পুষ্ট, খুব সতেজ হয়ে ওঠে। অল্পদিন পরেই প্রত্যেকটি চারা চমৎকার ঝাড় বেঁধে ওঠে। এতটা ঝাড় বাঁধা যে সম্ভব তা আগে কখনও ভাবিও নি।

উক্ত ফসলে কোন কীটের বা ব্যাধির আক্রমণ হয় নি। গো-মহিষাদি পশুতেও তার ক্ষতি করতে পারে নি। ফসল উঠলে দেখা গেল, বিঘাপ্রতি ১৭ মণ ৩৩ সের ৫ ছটাক ফলন হয়েছে। উন্নত প্রণালীতে সবুজ চাষ করে আমি ১৯৫১-৫২ সালে বিঘাপ্রতি ১৭ মণ এবং ১৯৫২ সালে বিঘাপ্রতি ১৩ মণ গম ফলিয়েছি।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মন্ডল,
সাং আইলপাড়া,
থানা কালিয়াকচক,
জেলা মালদহ।

১১৫৪-৫৫

গম-উৎপাদন প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার-বিজয়ীর বিবৃতি:

প্রতিযোগিতার জন্য আমি ৪ বিঘা দোআঁশ জমিতে গমের চাষ করেছিলাম। আগের বছর রবি

ফসল হিসাবে ছোলার চাষ করি। ছোলা উঠে গেলে খরিফ খন্দে জমি পতিত রাখি ও মাঝে মাঝে চাষ ও মই দিই। জুন মাসে প্রথম বৃষ্টির পর ঐ জমিতে একরপ্রতি ১ মণ সুপারফসফেট দি দিয়ে ধপে লাগাই। আগস্ট মাসের প্রথমে ধপেগাছ মাটিতে মিশিয়ে পচান করা হয়। নবেম্বরের প্রথম ভাগে একরপ্রতি ৩০০ মণ গোবরসার ছিড়িয়ে দিয়ে ৪-৫টি চাষ দিই। পরে একরপ্রতি ৪ মণ মিশ্রসার দিয়ে আরও ৩-৪টি চাষ দিই।

‘অ্যাগ্রোসেন’ ওষুধ বীজে মাখিয়ে একরপ্রতি ৩০ সের ‘গঙ্গাজলী’ গমের বীজ ওরা নবেম্বর ঐ জমিতে বুনি। তিন সপ্তাহ পরে নিড়েন দিয়ে চারা পাতলা ক’রে আগাছা মেয়ে দিই। এই সময় একরপ্রতি ১ মণ হারে অ্যামোনিয়ম সালফেট ছিটিয়ে দিয়ে একটি সেচ দিই। এর পর গাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে। প্রতিটি গাছে গড়ে ১৮ থেকে ২০টি ঝাড় হয়। শীষ বার হবার আগে আর-একবার সেচ দিই। আমার গাছ ৫ ফুট উঁচু হয়েছিল। ২০এ মার্চ কৃষি-পরিদর্শক, ইউনিয়ন কৃষিসহকারী এবং স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের সামনে ২টি ‘কাটিং’ নেওয়া হয়। একরপ্রতি শুকনো গমের উৎপাদন হয় ৫১ মণ ৪ সের।

এই ফসল তুলতে আমার একরপ্রতি ২৪২ টাকা খরচ হয়। ১৫ টাকা মণ দরে আমার গমের মূল্য ৭৬৫ টাকা। কাজেই লাভ হয় একরপ্রতি ৫২৩ টাকা।

আবদুল হক মন্ডল,
গ্রাম কামদপুর,
থানা নওদা,
জেলা মুর্শিদাবাদ।

১৯৫৫-৫৬

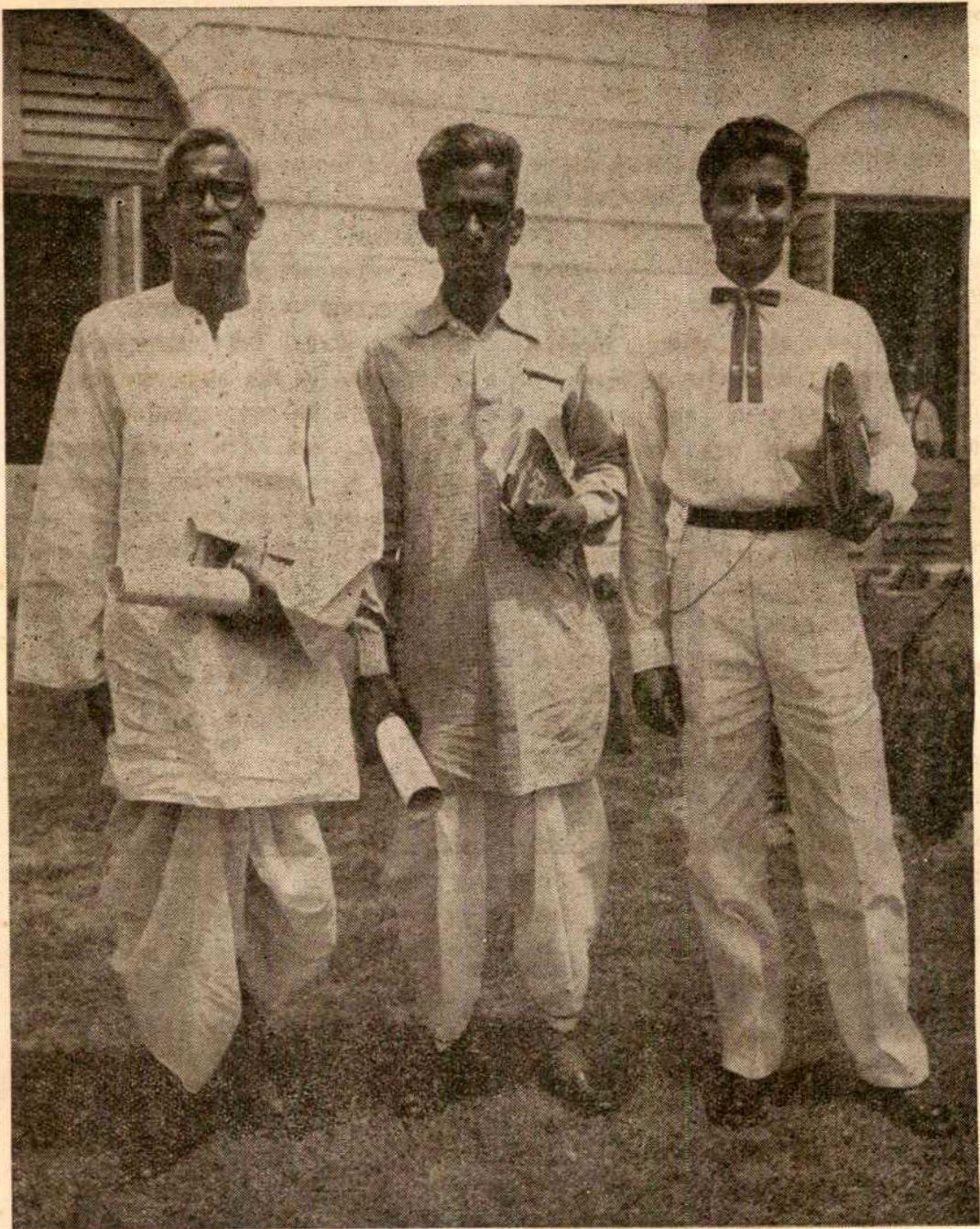
ধান ও পাটের মত গমও আমাদের বহরমপুর অঞ্চলের একটি প্রধান ফসল। আমি গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যসরকারের এই গম-উৎপাদনের প্রতি-

যোগিতায় যোগদান ক’রে আসছি। অন্যান্য বছরের মত এ বছরও আমি একটি দোআঁশ মাটির জমি বেছে নিই এবং জমি খুব ভালভাবে তৈরি করি। এই জমিতে গম-উৎপাদনের আগের বছর গোয়ালাদের গোরুর বাধান বসানো হয়। বর্ষায় মাঝে মাঝে চাষ দিয়ে আগাছা মেয়ে দিই এবং সেই সময় একরপ্রতি আরও ১৮০ মণ গোবরসার ও ৩ মণ সুপারফসফেট দিয়ে চাষ করি। ১৬ই অক্টোবর পুনরায় চাষ দিয়ে ‘গঙ্গাজলী’ বীজ একর-প্রতি ৩০ সের বুনো দিই। চারাগুলি ভালভাবে বের হবার ১৫ দিন পরে একবার ভালভাবে নিড়েন দিয়ে একরপ্রতি ৪৫ সের অ্যামোনিয়ম সালফেট দিই। সেই সময় বৃষ্টি হওয়ায় আর সেচের দরকার হয় নি। বোনার দেড়মাস বাদে যখন চারা-গুলি ঝাড় বাঁধতে থাকে সেই সময় আর-একবার পাতলা ক’রে নিড়িয়ে দিই। গাছে শীষ অসবর কিছুদিন আগে একটি সেচ দিয়ে, একরপিছ পুনরায় ১৫ সের অ্যামোনিয়ম সালফেট দিই।

প্রতি গাছে প্রায় ২৫-৩০টি ক’রে ঝাড় হয় এবং গাছগুলি প্রায় ৫ ফুট উঁচু হয়। পোকাকার আক্রমণ যাতে না হয় সেদিকে আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এ বছর পোকাকার তেমন কোন উপদ্রব হয় নি। গম ভালভাবে পেকে গেলে ১৫ই মার্চ তারিখে স্থানীয় কৃষি-কর্মচারিগণ, প্রতিযোগিতা-সমিতির সদস্যগণ ও বহুলোকের সম্মুখে ফসল কাটা হয়। শীষগুলি প্রায় আধ হাত লম্বা হয়েছিল। একরপ্রতি শুকনো গম পাওয়া গিয়েছে ৫৭ মণ ১৬ সের।

এই ফসলের চাষে একরপ্রতি ৩২১ টাকা খরচ হয়েছে। ১৫ টাকা মণ দরে ৫৭ মণ ১৬ সের গমের মূল্য ৮৬১ টাকা। কাজেই একরপ্রতি আমার ৫৪০ টাকা লাভ হয়েছে।

প্রীভোলনাথ বাজপেয়ী,
গ্রাম সবদরনগর,
থানা নওদা,
জেলা মুর্শিদাবাদ।



১৯৫৪-৫৫ সালের ইক্স-উৎপাদন-প্রতিযোগিতায় [বার্মিংহাম থেকে] শ্রীমৎকাঙ্কুদীন আহমেদ প্রথম ও শ্রীযোজালাল হক
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন ; তা ছাড়া, বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীযুক্তকিরকর চৌধুরী

আখ

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকে ইক্ষু-উৎপাদন-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

যে জমিতে আখের চাষ করেছিলাম, তার সবটোতেই আগের বছর খারিফ খন্দে আমি পাট দিই। সেই জমিতে আমার বিঘাপ্রতি ৮ মণ পাট হয়েছিল। আমার ক্ষেতের মাটি দোআঁশ এবং মাটিতে প্রায় বারো মাসই রস থাকে। পাট কাটার পর কার্তিক মাসে ঐ জমিতে আমি কলাই লাগাই। পৌষ মাসে বৃষ্টি পাবার পর কলাই ভেঙে দিয়ে লাঙল ও মই দিয়ে রাখি। ফাল্গুন মাসের শেষের দিকে জমিতে বিঘাপ্রতি ৩০ গাড়ি পলিমাটি দিই এবং চৈত্র মাসে লাঙল দিয়ে ভাল করে চাষে মই দিয়ে রাখি। বৈশাখ মাসে এক পশলা বৃষ্টির পর বিঘাপ্রতি ৬০ মণ হিসাবে গোবরসার দিয়ে লাঙল ও মই দিই। আবার বৃষ্টি হলে ঐ মাসে বিঘাপ্রতি ১০ সের হিসাবে শনের বীজ লাগাই। আষাঢ় মাসে আল দিয়ে জমিতে বৃষ্টির জল আটকে রেখেছিলাম এবং ঐ সময় শন ভেঙে সবুজসার করি। শনের গাছগুলি দু' হাত থেকে পোনে তিন হাত আন্দাজ উঁচু হয়েছিল। শ্রাবণ মাসে জল টেনে গেলে মাটির জো হয়। এই সময় দু'বার লাঙল ও মই দিয়ে মাটি গুঁড়ো করে রাখি। আশ্বিন মাসের প্রথম দিকে এক পশলা বৃষ্টি হবার পরেই বিঘাপ্রতি ৩ মণ খইলসার গুঁড়া করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিই এবং লাঙল ও মই দিয়ে জমি তৈরি করে রাখি।

রামনগর চিনির কল থেকে আমি কো-৪৫৩ আখের বীজ আনি। আশ্বিনের দ্বিতীয় সপ্তাহে দু'বার লাঙল ও মই দিয়ে মাটি তৈরি করে দেড় ফুট অন্তর ১ ফুট গভীর ও ৯ ইঞ্চি চওড়া জুলাি কাটি। বিঘাপ্রতি ১০ সের হিসাবে অ্যামোনিয়ম সালফেট সমান পরিমাণ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে জুলািতে ছিটিয়ে দিই। ৩-৪টি চোখ সমেত বীজ-আখ ১-১১ ফুট লম্বা করে কেটে প্রতি জুলাির মধ্যে ভাল করে লাগাই। পরে গুঁড়া মাটি দিয়ে ৩-৪ ইঞ্চি পুরু করে বীজ ঢেকে দিই।

কার্তিক মাসের প্রথম দিকে শতকরা ৭৫ ভাগ চারা বের হলে, খুব সাবধানে কোদাল দিয়ে জমি খুঁড়ে দিই। চারা ৯-১০ ইঞ্চি উঁচু হলে একবার জলসেচ দিই এবং পরে মাটির জো হলে আবার চারাগুলি খুঁচিয়ে গোড়ায় অল্প মাটি চাপাই। ফাল্গুন ও চৈত্রে দু'বার সেচ দিই। তা ছাড়া, পৌষের শেষে, বৈশাখ মাসে, জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক মাসে বৃষ্টির জল পাওয়া যায়। প্রত্যেক মাসেই মাটির জো হলে জমি খুঁড়ে দিই। জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টির পর বিঘাপ্রতি ২৫ সের হিসাবে অ্যামোনিয়ম সালফেট দিই। শ্রাবণ মাসে আবার বিঘাপ্রতি ১৯ সের হিসাবে অ্যামোনিয়ম সালফেট আখের গোড়াতে দিয়ে মাটি ধরাই। ভাদ্র মাসে আখের গোড়ায় পাতা পরিষ্কার করে ঝাড় ও মেড়া বেঁধে দিই। আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহে ঝড়ে যাতে আখ না পড়ে যায়, তার জন্য কিছু কিছু পাতা ছাড়িয়ে ৩-৪ ঝাড় একসঙ্গে বেঁধে দিই। কার্তিকের পর আর কোন আবাদের দরকার হয় নি। মাঘের শেষ থেকে ফাল্গুনের মাঝামাঝি আখ কাটি। ফসল কাটার সময় মহকুমা কৃষি-আধিকারিক, কালিয়াগঞ্জ থানার কৃষি-পরিদর্শক, ইউনিয়ন কৃষি-সহকারী, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, ইউনিয়ন বোর্ডের একজন সভ্য, বিদ্যালয়ের দু'জন শিক্ষক ও আমার গ্রামের দু'জন চাষীভাই উপস্থিত ছিলেন। এইভাবে চাষ করে আমি বিঘাপ্রতি ৭৮৬ মণ ২৬ সের ১০ ছটাক আখ পেয়েছি।

এই চাষে বিঘাপিছ আমার মোট ৭০৯১৩০ আনা খরচ হয়েছে। আমার আখ রামনগর চিনির কলে ১১/৫ মণ দরে বিক্রি করে আমি ১,০৪৩১৩০ পেয়েছি। খরচ বাদ দিয়ে বিঘাপ্রতি মোট আমার ৩৩৪১০ লাভ হয়েছে।

নেফাজুদ্দিন আহমদ,
গ্রাম কামারি,
থানা কালীগঞ্জ,
জেলা নদিয়া।

ভবিষ্যতের কল্পনা

কয়েক বৎসর পূর্বে স্বাধীনতা কি শব্দের মত ছিলনা এবং সেই স্বপ্ন কি আজ বাস্তবে পরিণত হয় নাই? কিছুদিন পূর্বে যে পরিকল্পনাগুলি ছিল ইঞ্জিনিয়ারের কল্পনা মাত্র, নীল কাগজে ঝাঁকা ছকবিশেষ, সেগুলিই কি আজ এক-একটি বিরাট জলাধার, সুদৃঢ় বাধ, বিরাট কারখানা এবং বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয় নাই? আমরা যে যুগে বাস করিতেছি তাহা সুবিধা এবং সম্ভাবনার যুগ। সুচিন্তিত পরিকল্পনার সাহায্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কঠিন শ্রম করিবার ইচ্ছাই উপযুক্ত সময়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্ত আমরা সমস্ত অঞ্চলের জনসাধারণের সমৃদ্ধি এবং মঙ্গলের জন্ত অনেক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছি এবং এই সমস্ত পরিকল্পনা আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতেই রচিত হইয়াছে। এই সেইদিন আমরা সাহসের সহিত স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম করিয়াছি, আর আজ আমরা আমাদের কল্পিত ভারতবর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্ত কঠিন পরিশ্রম করিতেছি। ভবিষ্যতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া, আশুন, আমরা একান্তভাবে সাহসের সহিত এবং ধৈর্যসহকারে আমাদের কর্ম সম্পাদন করিয়া যাই।

১৫ই আগষ্ট ১৯৫৭

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

বনরচনার তাৎপর্য

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বনরচনার সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক অতি নিবিড়। একে অন্যের পরিপূরক। ক্ষেতের সম্পদ হোক অথবা বনজ সম্পদই হোক—উভয়বিধ সম্পদের জন্যে মোমাছিরা যথেষ্ট গৌরব দাবি করতে পারে। গাছে গাছে ফুল ফোটাণোর ব্যাপারে যেমন, ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলানোর ব্যাপারেও তেমনি মোমাছির দান একেবারেই অকিঞ্চিৎকর নয়। বন মোমাছিদের বাসা বাঁধবার আগ্রহ।

ফসল বাঁচাতে হ'লে মজবুত বেড়া দরকার, আর মজবুত বেড়ার জন্যে প্রয়োজন মজবুত খুঁটি। বনই আমাদের এই খুঁটি সরবরাহ করতে পারে।

বন পাখিদেরও আগ্রহ। অনেক কীট-পতঙ্গ ফসলের শত্রু। পাখিদের খাদ্য এইসব কীট-পতঙ্গ। 'গ্রীন গ্লোয়ার' বইতে জগন্নিখ্যাত ফরেন্স্টার বেকার সাহেব লিখেছেন:

Insectivorous birds are the friends of both the farmer and forester and are well-known to be important controls of farm and forest insects.

কাঠঠোকরা, কোকিল, প্যাঁচা—এরা ফসলক্ষেতের অকৃত্রিম বন্ধু।

কিন্তু বনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানো। নিকৃষ্ট ধরনের ভূমির উন্নতিসাধনে বন বহুলপরিমাণে সাহায্য করতে পারে। অরণ্যের বৃক্ষরাজ্যের বৃক্ষল, শাখাপ্রশাখা এবং জীর্ণ পত্রগুলি ভূমিকে ঐশ্বর্যশালিনী হতে বহুলপরিমাণে সাহায্য করে—এ তো জানা কথা। ভূমিকে সুজলা রাখার ব্যাপারেও অরণ্যের দান অনেকখানি। এই-জন্যে কোন কৃষক যখন তার গাছগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে তখন তার ফসলক্ষেতেরও বারোটা বাজিয়ে দেয়।

যবস্বীপে বৃষ্টি আনবার জন্যে এক অশ্রুত প্রথা অনুসৃত হয়ে থাকে। দু'জন লোক পরস্পরের পিঠে চাবুক মারে যতক্ষণ না পিঠ দিয়ে রক্ত গড়ায়। বেকার সাহেব বলছেন: বৃষ্টি নামাবার আরও সহজ এবং মানবোচিত অথচ নিশ্চিত উপায় হচ্ছে বৃক্ষ-রোপণ।

A simpler and more human way of assuring precipitation is to plant trees.

বৃষ্টি না হ'লে নদিয়া জেলার মুসলমানেরা রাস্তা দিয়ে গান করতে করতে যায়। সে গানে বৃষ্টির জন্যে আল্লার কাছে মিনতির সুর। হিন্দুরা হরিসংকীর্তন করে। প্রার্থনার নিশ্চয়ই একটা ফল আছে। কিন্তু কুড়ুলের মুখে একদিকে আম-কাঁঠালের বাগানের পর বাগান নিশ্চিহ্ন করে দেব, এবং আর একদিকে বৃষ্টির জন্যে ভগবানের কাছে কাঁদব—এর মধ্যে যুক্তি কোথায়? সেদিন করিমপুর অঞ্চলের এক মাঠের মধ্য দিয়ে আসবার সময় দেখি একটা বিরাট অশ্বখগাছ কুড়ুলের আঘাতে ধ্বলায় অবলুপ্ত। আমি যে গ্রামে বাস করি সেখানে একটা প্রকাণ্ড অশ্বখবৃক্ষ দীর্ঘকাল ধরে গ্রামের শোভা বর্ধন করছিল। তার স্নিগ্ধছায়া কত বৈশাখের তপ্ত মধ্যাহ্নে কত ক্লান্ত নরনারীকে শান্তি দিয়েছে। শরুপক্ষের কত জ্যোৎস্নাগর্ভিত রাত্রে সেখানে দেখেছি ঘুঙুর-পরা ফকিরদের নাচ। ফকিরী গানের আসর বসত ঐ বনস্পতির মূলে। গাছের মালিক ছিল এক দীন হিন্দু। সামান্য টাকার জন্যে গাছটা তিনি বেচে দিলেন। অনেক অনুনয়-বিনয় করলাম গাছটাকে রাখবার জন্যে। কোন ফল হ'ল না।

মার্কিন মনীষী থোরো বলেছিলেন:

Thank God, they cannot cut down the clouds.

দেখে-শুনে মনের মধ্যে ঐ কথাই প্রতিধ্বনি জাগে : ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মানুষ্যের কুড়ুল মেঘলোক পর্যন্ত পৌঁছায় না। তা হ'লে আকাশের মেঘও মানুষ্যের কুঠারমুখে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত!

অরণ্যকে আমরা যখন নির্বিচারে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলি তখন তার অনিবার্য পরিণতি ঘটে ভূমিক্ষয়ে। সুজলা-সুফলা দেশ বন্যা মরুভূমিতে পর্যবসিত হয়। ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত অনেক আছে। এতে সন্দেহ করবার কিছু নেই।

অরণ্যের মতো মানুষ্যের এমন উপকারী বন্ধু আর নেই। বড় বড় মহীরুহ ঝড়ের হাত থেকে উদ্যানের গাছপালাকে রক্ষা করে, অনাবৃষ্টিকে ঠেকায়, ভূমিকে সৌন্দর্যের লীলাভূমি ক'রে তোলে, কাঠের অভাব মেটায়। কাঠের প্রয়োজন সত্যিই অসংখ্য। মানুষ্যের জীবনকে কল্যাণময় করবার জন্যে তার কাঠের দাবি মেটানো অপরিহার্য। কিন্তু একটা অরণ্যের পক্ষে পুষ্টিলাভের জন্যে দরকার সময়। এক পুরুষে এই পুষ্টি সম্ভব নয়। তাই পুষ্টিলাভের পূর্বেই যখন আমরা অতিলোভে অরণ্যকে নিঃশেষ ক'রে ফেলি তখন প্রকৃতির নিয়মকেই আমরা লঙ্ঘন করি। কুমারী বনানীকে কুঠারমুখে আমরা খুশিমতো নিশ্চিহ্ন ক'রে মহানগরী বানাতে পারি, কিন্তু প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেবেই। নিউইয়র্কের আকাশচুম্বী সৌধরাজি গড়তে গিয়ে আমেরিকাকে কম মূল্য দিতে হয় নি! তার একটা অংশ মরুভূমিতে পর্যবসিত হয়েছে, যাকে বলে 'ডাস্ট বাউল অব দি মিডল ওয়েস্ট'। বৃন্দাবনের সমাধিভূমির উপরে পাষাণের মথুরা গড়বার যেখানেই চেষ্টা হয়েছে

সেখানেই একই বিষয় ফল ফলেছে। অতএব সাধু, সাবধান! কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে। দেখে শেখাই বৃদ্ধিমত্তার পরিচায়ক!

আমাদের দেশে বৃক্ষরোপণ একদা পুণ্যকর্ম বলেই পরিগণিত হ'ত। এখনও দেখা যায়, স্নানান্তে নরনারী গৃহে ফেরবার পথে বনস্পতির মূলে সসম্মানে জলসিঞ্জন করছে। যে দেবতা মানুষ্যের ভিতরে সেই দেবতাই তো বাহিরের বনস্পতিতে। সমস্ত জীবনের সঙ্গে এই ঐক্যবোধ প্রাচ্যের সংস্কৃতিকে একটি বিশেষ ঐশ্বর্য দান করেছে। কাণ্ডের লেভে পাগল হয়ে পাশ্চাত্য ধ্যেয়ে চলেছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে হাতিয়ার নিয়ে। ভগবান প্রাচ্যকে রক্ষা করুন পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের হাত থেকে। ওষাধিতে বনস্পতিতে যে দেবতা রয়েছেন, তাঁকে যেন প্রতিদিন শ্রদ্ধা জানাতে ভুলে না যাই! সর্বশেষে 'গ্রীন গ্লোরি'তে বেকার সাহেব যে মন্তব্য করে তাঁর পুস্তকের উপসংহার করেছেন সেই মন্তব্য এখানেও উদ্ধৃত ক'রে এই প্রবন্ধ শেষ করি:

In times past it has been said that it is the duty of a man to be prepared to die for his country; to day it is the duty of every thinking being to live, and to serve not only his own day and generation but also generations unborn by helping to restore and maintain the green glory of the forests of the earth.



আঙুরের চাষ

দেবীকা সরকার

স্বাধীনতালাভের পর ভারত নানা দিক দিয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছে এর খাদ্যশস্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। কিন্তু কেবল খাদ্যশস্য নয়, ফল-উৎপাদনের বিষয়েও আমাদের অবহিত হওয়া চাই। যেমন ধরুন আপেল, আঙুর প্রভৃতি যেসব ফল বহুকাল ধরে আসছে বিদেশ থেকে, সেগুলোর কথা। আমাদের বন্ধমূল ধারণা, ওগুলি আমাদের দেশে জন্মায় না। জন্মায় কিনা, সে-বিষয়ে কয়েকটি সংবাদ পরিবেশন করছি।

একজন পদ্বীস-কর্মচারী বলেছেন যে, ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীনীহারেন্দ্র দত্তমজুমদারের বালীগঞ্জের বাড়িতে কতবারত থাকার সময় তাঁর বাগানে আঙুর ফলতে দেখেছেন। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের স্কুলের ঠিক দক্ষিণ পাশে শ্রীমুকুল সরকারের বাড়িতে আঙুরগাছ আছে এবং আঙুর ধরে। বাঁকুড়া জেলার খাতদার শ্রীভূদেব মাহাত মহাশয়ের উঠানে একটি বড় আঙুরগাছ আছে—যাতে বছরে দু'বারে এক মণ পর্যন্ত আঙুর ধরে। সিন্ধুরী সারের কারখানার কর্মচারীদের অনেকেই বাড়ির বাগানে আঙুরের চাষ হচ্ছে। রাঁচির কাঁকে কৃষিক্ষেত্রে আঙুরের চাষ আছে। কাজেই আঙুর যে আমাদের দেশে জন্মায় না—একথা কি আপনারা মেনে নেবেন?

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর ধাঁচটা কি আমাদের নেই? প্রত্যেক শীতকালে বৃষ্টিও তো আমরা পাই। আঙুর আসত পূর্বে কাবুল থেকে। খোলা অবস্থায় তো আসতই, আর আসত ছোট ছোট গোলাকার কঠোর বাক্সে বন্দী হয়ে। বাক্সটির ভিতরে থাকত তুলো পাতা এবং তার ওপর সাজিয়ে রাখা হ'ত পাকা পাকা আঙুরগুলি, আবার তার ওপরেও দেওয়া হ'ত তুলো। বাছাই বাছাই আঙুর

দেখতে কি সুন্দর! বহুদিন ধরে ভালও থাকত ওগুলি। পাকিস্তানের জন্মের পর থেকে এই আঙুর আসা বন্ধ হয়েই গেছে এদেশে। কেননা, আসতে হ'লে পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে আসতে হয়, অথচ পাক-আফগান সম্বন্ধটা টক আঙুরের চেয়েও টক্কে গেছে। ওদের এ ব্যবসাটা একেবারেই মাটি। এই সৈদিনও একজন কাবুলিওয়ালা বলছিলেন, তাঁদের দেশে তৃষ্ণা পেলে কি কেউ জল খায়? জল ওদেশে মেলেও কম। ঘরের দেওয়ালে থাকে থাকে তক্তার সরদল করা আছে, তাতে থাকে আঙুরের গাদা। এক মূঠো আঙুর নিয়ে গ্লাসের মূখে চাপ দিলে, গ্লাস ভর্তি হয়ে গেল আঙুরের রসে, ওতেই তাঁরা তৃষ্ণা মেটান। বাড়ি বাড়ি আছে আঙুরের চাষ। বিদেশীরা বড় রকমের চাষও ওখানে আরম্ভ করেছে। ওখানে বাজারদর ছিল আগে তিন-চার আনা সের, আর পাকিস্তানের কারসাজিতে এখন দাঁড়িয়েছে দু' পয়সা কি এক আনা সের। তারপরে অন্যান্য ফলও তো আছে। হবে না-ই বা কেন? কাবুলিওয়ালাদের মূখের রক্তিম আভাটা দেখেছেন কি? শুধু ডালভাত খেলে কি স্বাস্থ্যের ঐ ভাবটা আসে? চাল-গম অল্পবিস্তর খেলেও প্রধান আহার সারেন তাঁরা ফল দিয়ে। কত রকমের ফলই না সেখানে ফলে! আর আমরা সেইসব ফল কিনি নেহাতই রোগীর পথ্য হিসাবে, আর হয়তো কোনদিন দেবতার প্রসাদ হিসাবে দু'-এক টুকরো মস্তকে স্পর্শ করাতে পাই।

ভাগাভাগির পূর্বে আঙুরের দাম ছিল এখানে চোন্দ আনা থেকে এক টাকা সের। দেশ-ভাগা-ভাগির পর কলকাতায় আঙুরের দর দাঁড়াল ৪-৫ টাকা সের। এখন যে আঙুর পাওয়া যাচ্ছে বাজারে, ওর প্রায় সব কাশ্মীর ও দক্ষিণ ভারত থেকে আসছে। এগুলি আকারে ছোট, কাবুলি

আঙুরের মত অত মিষ্টিও নয়। নিকৃষ্ট হ'লেও এরা বাজারদরটা নামিয়ে এনেছে আড়াই টাকা সেরে। সরবরাহটাও হচ্ছে নিয়মিত।

ফলের গুণাগুণ সম্বন্ধে আপনারা জানেন যে, এর লবণ এবং এর খাদ্যপ্রাণ আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কত উপকারী। রোগীকে পথ্য হিসাবে এটা দেওয়া হয় লখদুপাক ও বলকারী ব'লে।

কেবল চাল-ডালে স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'লে তো চলবে না। আরও পুষ্টিকর খাদ্য আমাদের চাই। দুধ-ঘি-মাখনের ভারটা সরকার নিয়েছেন। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ নগণ্য হলেও, একদিন গ্রামে গ্রামে যে 'হরিণঘাটা' গড়ে উঠবে সমবায়-পদ্ধতিতে, সেটা মোটেই স্বপ্নের কথা নয়। এর পরে ফলচাষের ভারটা কি আমরা—দেশের জনসাধারণই নিতে পারি না? পল্লী-অঞ্চলে বাড়ি-বাড়িতেই যে আগে ফলের বাগান ছিল, সেই প্রথাটাকে আবার জাগিয়ে তোলা যাক না। আম-কাঁঠাল প্রভৃতি চলতি ফলের সঙ্গে নতুন নতুন ফলেরও চাষ করতে হবে। ফলের মধ্যে আঙুর যে সেরা একটি, এ আপনারা নিশ্চয়ই মানবেন। এই আঙুরের চাষ সম্বন্ধেই কিছু বলা যাক।

আঙুরগাছ লতানে—অনেকটা কাঁটাশূন্য গোলাপ-গাছেরই মত। ডাঁটাটা ঐ রকমই গাঢ় সবুজ বা কালচে ধরনের—একটু মোটা এবং গা-টা একটু এবড়ো-খেবড়ো। পাতাগুলি গোলাপের পাতার চেয়ে অনেক বড়; যেন তিনটি গোলাপের পাতা একসঙ্গে মিশিয়ে হয় একটা আঙুরের পাতা। পাতার পাশটা কাটাকাটা মত। পাতাগুলি অত্যন্ত নরম ও সুগন্ধ। দেখতে যেন পেঁপের পাতা কি ভেরেন্ডার পাতার ছোট সংস্করণ মাত্র। গোলাপ-গাছের মত এর কাটা-ডাল বা 'কাটিং' লাগালে গাছ হয়। লতাটি ১২-১৩ ইঞ্চি টুকরো টুকরো ক'রে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা হয়, যাতে কোন দিকটার ছালই খেঁতলে না যায়। ঐ খণ্ডটি মাটিতে পুঁতে দিলে ওর গোড়া থেকে নতুন শাখ বেরিয়ে আসবে।

মোটামুটি ব্যাপারটা এই। কিন্তু এতে বহু যত্ন ও সতর্ক দৃষ্টি চাই। সে কথা বলছি।

গাছ লাগাবার সময় আষাঢ়-শ্রাবণ মাস অর্থাৎ বর্ষাকাল। ঐ সময় আবহ-ওয়াটা কেমন থাকে তা তো জানেন। বৃষ্টি না হ'লে গাছে যথেষ্ট জল দিতে হবে। ওর গায়ে যাতে কড়া রোদ না লাগে সেজন্য ওপরে দিতে হবে একটা আচ্ছাদন। ডালটা লাগাতে হবে মাটির সঙ্গে ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে অর্থাৎ একটু বাঁকা ক'রে। উপরের ডগাটা ঢেকে দিতে হবে খানিকটা কাঁচা গোবর দিয়ে—যাতে ডগা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে না ওঠে। গোলাপগাছ করতেও ঠিক এমনি গোবর-ঢাকা দিতে হয় কাটা-ডালের ডগায়।

মাটি তৈরি ক'রে রাখতে হবে অন্তত তিন মাস আগে। দোআঁশ মাটি কি কালো ভসকা মাটি এর পক্ষে উপযুক্ত। মাটিটা কুপিয়ে একেবারে ঝরঝর ক'রে ফেলে তার সঙ্গে কিছু গোবরসার বা পচাসার অথবা তলানিসার মিশিয়ে দেওয়া দরকার। এর পরে আট হাত অন্তর খালি ক'রে রাখা। খালিটা অন্তত এক হাত ব্যাসের হওয়া চাই এবং জমি থেকে হবে ছ' ইঞ্চি উঁচু অর্থাৎ এর গোড়ায় যাতে জল জমতে না পারে। গোড়ায় জল জমা এরা সহ্য করতে পারে না।

সব গাছই সার চায়। কিন্তু গাছেরও রুচি আছে, যেমন—পান চায় খইল, ধান চায় গোবর, লাউ চায় ভাতের ফেন,—তেমনি এ গাছের রুচি একটা নতুন ধরনের সারে। সেটার কথা বলছি। পাঁঠার নাড়ি-ভুড়ি, যা পচিয়ে কেউ কেউ মাছ ধরার চার করেন, ওটাকে হাঁড়ির মধ্যে পুরে ওর সঙ্গে এক-চতুর্থাংশ ওজনের কাঁচা গোবরও দিতে হবে। হাঁড়ির মুখটি বন্ধ করে, ওতে যেন জল ঢুকতে না পারে, এমন ক'রে মাটিতে পুঁতে রাখুন, তিন মাস। তারপর উঠিয়ে এনে ঘেঁজিনিসটা পাবেন এটাই আঙুর-গাছের প্রিয় সার। গাছটি খালিতে লাগাবার আগে খালির মধ্যে ৯ ইঞ্চি ব্যাসের এবং ১০ ইঞ্চি গভীর

গর্ত করুন। গর্তটা ঐ সার দিয়ে ভর্তি করুন এবং গাছটি ৬ ইঞ্চি মাটির ভিতর দিয়ে চারিপাশ বেশ ক'রে চেপে দিন। এ ছাড়া, ঝোলা গুড়ে জল মিশিয়ে আরও পাতলা ক'রে মাঝে মাঝে ওর গোড়ায় দিতে হবে। এটাও সার। এ কাজটা একটু সাবধানে করতে হবে, কারণ গুড়ে জল কম হ'লে এবং গাছের গায়ে গুড় লাগলে ডে'য়ো পিপ'পড়ে লেগে গাছটিকে শেষ ক'রে ফেলবে। এরা এ গাছের শত্রুকীট। আর এ গাছের ছালটাও মিষ্টি। পশ্চিম বাঙলায় এ গাছে এ সার দেওয়ার ব্যবস্থা না করলে ফল টক হয়ে যাবে।

যদি কেউ ব্যাপকভাবে চাষ করেন তবে কলকাতার কসাইখানায় এর সারের মূলবস্তুটির বোধহয় অভাব হবে না। আর ভাল জাতের আঙুরের কাটিং অথবা কলম আনাটা এরোপেলনের কল্যাণে আজ আর বিশেষ কঠিন কাজ নয়। দক্ষিণ ভারতেও এর চাষ চলছে। ঠিক লেবু কি জামরুল গাছের যেমন কলম করা হয়, আঙুরগাছের ঠিক তেমনি কলম করা হয়

এবং এগুলি লাগাতে পারলে আপনার কাজের সাফল্যের বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ হ'তে পারেন। কলম বাঁধার সময় কিন্তু বৈশাখ মাস। বাঁধার পর কলমে প্রত্যহ জল দিতে হবে। এ গাছ লাগাবার দু' বৎসর পরে ফল ধরে। কোন স্থানে তিন বৎসরেও হয়। দীর্ঘ দিন এরা বে'চে থাকে এবং ৫০-৬০ বৎসরও ফল দেয়। খরচটা প্রথমে বেশি হ'লেও এদের দীর্ঘ আয়ু সে ক্ষতি পূরণ করতে পারে। এ গাছে ফুল আসে কান্টিকৈ এবং বৈশাখে চাষ শেষ হয়। পুরো গরম পড়ার আগে ও আশ্বিনে মাচার নিচে ঝুলে থাকে থোকা থোকা ফল। কী সুন্দরই না তার দৃশ্য। বাজারের সেরা ফলটিই আঙুর— যাকে বলে দ্রাক্ষা। শুকালে বলে কিসমিস।

এর গাছ জন্মানোর কাজে—বিশেষ ক'রে এর প্রিয় সারটি তৈরি করতে—কিছু ঝামেলা পোহাতে হয় ; কিন্তু তাই ব'লে এর চাষে পিছিয়ে থেকে কথামালার শৈয়ালের মত কি আমাদেরও বলা উচিত হবে যে 'আঙুরফল টক'?



আপনার স্বাস্থ্যের জন্যে একটি পরিকল্পনা

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দরুণ আমাদের দেশের কৃষকেরা নির্ধারিত লক্ষ্যের ওপরেও ৩০ লক্ষ টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছে। এই খাদ্য শস্যই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মূল আহার্য্য এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই, কিন্তু খাদ্য ও স্বাস্থ্য বিশারদেরা বলেন যে, এর ওপরেও, পুষ্টির পক্ষে অপরিহার্য্য কয়েকটি উপাদান আমাদের খাদ্যে দরকার। সুষম খাদ্য যে কোন জাতীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। সুষম খাদ্যে যে পাঁচটি উপাদান আছে স্নেহপদার্থ (ফ্যাটস) এবং ভিটামিন তার মধ্যে দুইটি। অল্প তিনটি হচ্ছে খাদ্যসার (প্রোটিন), শর্করা (কার্বোহাইড্রেটস) এবং খনিজ পদার্থ (মিনারালস)। স্নেহপদার্থ শুধু যে শরীরের শক্তি দেয় তাই নয়, স্নেহপদার্থ অত্যন্ত খাবার হজম করতে শরীরকে সাহায্য করে—এক কথায় শরীরকে গড়ে তুলতে এবং সুস্থ রাখতে স্নেহ পদার্থের জুড়ী নেই। ভিটামিন গড়ে তোলে হাড়, মাংসপেশী, স্নায়ু এবং মস্তিষ্ককোষগুলি। প্রত্যেকটি ভিটামিনে আলাদা আলাদা গুণ আছে—ভিটামিন ‘এ’ দৃষ্টি শক্তিকে প্রবল করে, চোখ এবং ত্বক সুস্থ রাখে; ভিটামিন ‘ডি’ হাড়কে সুদৃঢ় করে তোলে।

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চের পুষ্টি বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির (দি নিউট্রেশন এ্যাডভাইসারি কমিটি)



মতে পূর্ণবয়স্কদের প্রত্যেক দিন কম পক্ষে দু’ আউন্স স্নেহপদার্থ খাওয়া উচিত কিন্তু আমাদের দেশে পূর্ণবয়স্কেরা প্রতিদিন গড়ে মাত্র ১/২ আউন্স স্নেহপদার্থ খেয়ে থাকেন। স্নেহপদার্থের এই চাহিদা মেটানোর জন্যে ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে বনস্পতির উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ১ লক্ষ টন। ডালডা বনস্পতি ভেষজ তেল থেকে তৈরী একটি পুষ্টিকর স্নেহপদার্থ এবং এতে ভিটামিন ‘এ’ এবং ‘ডি’ যোগ করা হয়। প্রতি আউন্স ডালডায় খাঁটি ঘিয়ের সমানই ভিটামিন ‘এ’ থাকে। এই সব কারণেই প্রতি দিন আরও অধিক সংখ্যক খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে সচেতন লোকেরা ডালডা দিয়ে রাঁধা খাবার দাঁবার খাচ্ছেন।

ডালডা তৈরীর সময় হাতে ছোঁয়া হয় না। শুধু তাই নয়, ডালডা আপনি সব সময় শীল করা টিনে খাঁটি ও তাজা পাবেন। খেজুর গাছ মার্কা টিন দেখে নিতে ভুলবেন না—কারণ, শুধুমাত্র এই টিনেই খাঁটি ও পুষ্টিকর ডালডা পাবেন।



খাদ্যোৎপাদনে গন্ধক

হলধর

মানবের জীবনধারণের প্রধান উপাদান খাদ্য। মানুষের খাদ্যের অপরিহার্য অংশ প্রোটিন-জাতীয় দ্রব্যকে প্রকৃতি গন্ধক-সম্মিলিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই প্রোটিন উদ্ভিদ তথা সকল প্রাণীর শরীরেরও একটি অপরিহার্য উপাদান; তাহাতেও গন্ধক বিদ্যমান—কোনও উদ্ভিদে বেশি, কোনও উদ্ভিদে কম, এই প্রভেদ। মানুষ খাদ্য হিসাবে প্রোটিন বাহির হইতে সংগ্রহ করে, আর উদ্ভিদ ইহা প্রস্তুত করে তাহার দেহের ভিতরের রন্ধন-শালায়—ভূমি হইতে ভূমি-রসের সঙ্গে সংগ্রহীত নানাবিধ রাসায়নিক উপকরণের সাহায্যে। এই প্রক্রিয়া প্রতিনিয়তই চলিতেছে। আমিষাশী প্রাণী ইহা সংগ্রহ করে অন্যান্য প্রাণীর মাংস বা মৎস্যের মাধ্যমে, নিরামিষাশী সংগ্রহ করে সবজি এবং দূগ্ধ হইতে। গোদূগ্ধ, যাহাকে অনেক বিজ্ঞানী স্বয়ং-পূর্ণ খাদ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে শতকরা ৩.৫ হইতে ৪.৫ ভাগ গন্ধকাক্ত প্রোটিন এবং ক্যালসিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতি খনিজ পদার্থ থাকে। মহিষের এবং ছাগের দুগ্ধেও এই প্রোটিন যথেষ্ট আছে। নিরামিষভোজী প্রাণী ঐ গন্ধক-যুক্ত প্রোটিন ঘাস-বিচালি প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতেই সংগ্রহ করে। গন্ধকযুক্ত খনিজ সারই প্রকারান্তরে ঘাস-বিচালি প্রভৃতিতে প্রোটিন প্রস্তুতির অন্যতম কাঁচামাল—যদিও সাধারণত উদ্ভিদ ভূমি হইতেই গন্ধক পর্যাপ্ত পরিমাণে পাইয়া থাকে। উদ্ভিদে যে অল্পবিস্তর গন্ধক থাকে তাহা উহার শরীরকোষস্থ জল পরীক্ষা করিলেই পরিষ্কার বদ্বা যায়। বৈজ্ঞানিক Hacherby তাহার Soil Fertility নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, উদ্ভিদ-প্রোটিনে শতকরা প্রায় ০.১৭ হইতে ১.০৯ ভাগ গন্ধক পাওয়া যায়। ঘাস-বিচালি প্রভৃতি সর্বপ্রকার উদ্ভিদ ভূমি হইতে অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের সঙ্গে গন্ধক গ্রহণ করে এবং

উহা পরে প্রোটিন-খাদ্যরূপে প্রাপ্যদেহে প্রবিষ্ট হয়।

অতীতকালে উদ্ভিদের পক্ষে গন্ধকের প্রয়োজনীয়তার উপর কেহ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। যেসকল বিজ্ঞানী এ বিষয়ে কিছু চিন্তা করিয়াছিলেন তাঁহারাও ধরিয়া নিয়াছিলেন যে, জমিতে যথেষ্ট গন্ধক বর্তমান আছে, সুতরাং উহার জন্য উদ্ভিদ হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইদানীং অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি কয়েকটি দেশে উদ্ভিদের রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে যাইয়া কোন কোনও কৃষিবিদ বিশেষরূপে উপলব্ধি করেন যে, জমিতে গন্ধকের অভাব হওয়াতেই কতকগুলি রোগ দেখা দিয়াছে। নাইট্রোজেনের অভাব হইলে উদ্ভিদে যেসকল রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় উক্ত রোগগুলির লক্ষণও প্রায় তদ্রূপ, যথা—উদ্ভিদের সবুজ অঙ্গে, বিশেষত পাতায়, সাদা ছিটপড়া (Chlorosis) এবং পাতা হলদ-বর্ণ হইয়া যাওয়া (Yellowing)। সরিষা (Brassica) এবং সীম জাতীয় (Leguminous) উদ্ভিদে এবং ঘাসে (grass) এই লক্ষণ বেশি বেশি দেখা গিয়াছে। এসকল ক্ষেত্রে নাইট্রেট নাইট্রোজেন (গন্ধকশূন্য নাইট্রোজেন) প্রয়োগে বিশেষ কোনও ফল পাওয়া যায় নাই, অথচ সোজাসুজি গন্ধক (straight sulphur) বা গন্ধক-জনিত সার প্রয়োগে বেশ উপকার দর্শিয়াছে। অন্যদিকে, পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, সীমজাতীয় এবং সরিষাজাতীয় উদ্ভিদের জীবনধারণে বেশি গন্ধকের প্রয়োজন হয়।

১৯৩৪ সনে Imperial Bureau of Soil Science কর্তৃক প্রকাশিত Technical Communication No 31 নামক পুস্তিকায় ভূমির দুর্বলতা এবং তজ্জনিত উদ্ভিদ-রোগ প্রসঙ্গে মৃত্তিকায় বিবিধ খনিজ পদার্থের অভাব সম্বন্ধে

কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতামত আলোচনা করা হয়। তাহাতে দেখা যায় যে, আফ্রিকার নায়াসাল্যান্ডে ব্যাপকভাবে চা-পত্রে এবং তামাক পাতায় 'পীত রোগ', মৃত্তিকায় গন্ধকের স্বল্পপতা-জনিত সন্দেহ করিয়া, প্রতিকারার্থে স্বাভাবিক গন্ধক বা অ্যামোনিয়ম সালফেট, পটাশিয়ম সালফেট প্রভৃতি গন্ধকাক্ত সার প্রয়োগ করায় সুফল পাওয়া গিয়াছিল। মান্দালয় কৃষি-বিদ্যালয়ের সংলগ্ন কৃষিক্ষেত্রে ধানের 'পীত-রোগে' ফেরিক ক্লোরাইড, সোডিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাঙ্গানীজ ক্লোরাইড, অ্যামোনিয়ম নাইট্রেট প্রভৃতির দ্বারা কোনও উপকার না হওয়ায় পরে ফেরাস সালফেট, কপার সালফেট (তুণ্টিয়া), গন্ধকাস্ত (Sulfuric acid) প্রভৃতির প্রয়োগ-দ্বারা ধানের চারায় তার স্বাভাবিক সবুজ রঙ ফিরিয়া আসে বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে। সাম্প্রতিক গবেষণাসমূহ দ্বারা কতিপয় উদ্ভিদ-রোগ যে মৃত্তিকায় গন্ধকের অভাবজনিত সে বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াছে।

গন্ধক অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় যেরূপে সাধারণত জমিতে বিদ্যমান থাকে তাহা অল্পবিস্তর জলে দ্রবণীয় বলিয়া উহার ক্রিয়দংশ বৃষ্টির জলের সঙ্গে নিগলিত হইয়া যায়। সেইজন্য জমিতে গন্ধকের পরিমাণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে থাকে। ভারতের মৃত্তিকা পরীক্ষায় মাত্র শতকরা ০.০২ হইতে ০.০৮ ভাগ গন্ধক পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি কিছুদিন হইতে পৃথিবীতে গন্ধক-উৎপাদনের হ্রাস আশঙ্কায় উহার মূল্যবৃদ্ধিতে এবং নাইট্রোজেনের মাত্রা বৃদ্ধির আশায়, অ্যামোনিয়ম সালফেটের এবং পটাশিয়ম সালফেটের পরিবর্তে অ্যামোনিয়ম নাইট্রেট, ইউরিয়া, পটাশিয়ম ক্লোরাইড ইত্যাদি প্রয়োগের ঝোঁক দেখিয়া কোন কোন বিজ্ঞানী অদূর-ভবিষ্যতে জমিতে গন্ধকের অভাব আশঙ্কা করিয়া উদ্বেগ বোধ করিতেছেন এবং এদিকে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। মাত্রায় বেশি পরিমাণে ফসফরিক অ্যাসিড পাওয়ার জন্য সাধারণ সুপার

ফসফেটের (উহা ক্যালসিয়ম সালফেট মিশ্রিত থাকে) পরিবর্তে ট্রিপল সুপার ফসফেট (Triple Superphosphate) ব্যবহার করিবারও একটা ঝোঁক লক্ষিত হইতেছে; তাহাতেও এই কুফল ঘটিবার আশঙ্কা আছে, যদি উহার সঙ্গে গন্ধকাক্ত নাইট্রোজেন, যথা অ্যামোনিয়ম সালফেট ব্যবহার না করা যায়। বস্তুত, গন্ধকাক্ত সার ব্যবহারের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে আজ অনেক কৃষিবিজ্ঞানীই নিঃসন্দেহ।

এদেশে সার হিসাবে গন্ধকের প্রয়োগ সম্বন্ধে অনেক দিন হইতেই গবেষণা চলিতেছে। লেখকের বিহার কৃষিবিভাগে থাকা কালে ১৯১৯-১৯২১ সালে পাটনার ডেপুটি ডাইরেক্টর মিঃ সেরার্ড চীনা-বাদামের জন্য বিখ্যাত বিহার সরিফ অঞ্চলে (পাটনা জেলা) চীনাবাদামের ফসলে জিপসাম (Calcium Sulphate) এবং স্বাভাবিক গন্ধক পৃথক পৃথকভাবে প্রয়োগ করিয়া ফলাফল পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিনা সারে যে উৎপাদন হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা ঐ উভয় সার-জনিত উৎপাদনই অনেক বেশি হয়, কিন্তু উহাদের দুটির মধ্যে তারতম্য বেশি ছিল না; তবে স্বাভাবিক গন্ধকের তুলনায় জিপসাম অধিকতর সহজপ্রাপ্য ও সুলভ বিধায় জিপসামের ব্যবহার অনুমোদন করা হয়। সেই অবধি চীনাবাদামের জন্য ঐ অঞ্চলে জিপসামের বিক্রি যথেষ্ট হইতেছে। উল্লেখ্য থাকে যে, চীনাবাদাম সীম জাতীয় ফসল। জিপসাম অনেক দেশেই সার হিসাবে এবং উষর জমি সংশোধনের নিমিত্ত অনেক দিন হইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু উদ্ভিদের খাদ্য হিসাবে ইহার গন্ধক-অংশের ক্রিয়া কী এবং কতটা কার্যকরী তাহা নির্দেশ করিবার জন্য যথোপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই।

জিপসামের বহুবধ প্রয়োজনীয়তা বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান এ নহে। আমাদের পূর্বে সার হিসাবে ব্যবহারের জন্য সালফেট অফ অ্যামোনিয়া প্রস্তুত হইত প্রধানত ইম্পাত বা কোক-কয়লা তৈয়ারির কারখানায়, কয়লা হইতে বিনির্গত

অ্যামোনিয়া গ্যাসের সঙ্গে গন্ধকাসলের (Sulfuric acid) প্রতিক্রিয়ার ফলে। পরে বিশ্ববিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী হেবর সাহেবের আবিষ্কার-মত বায়ুমণ্ডলের অফদ্রুত ভাঙার হইতে নাইট্রোজেন নিষ্কাশিত হইয়া জলীয় বাষ্পের সংমিশ্রণে অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রস্তুত হইতে থাকে এবং উহার সহিত গন্ধকাসল যুক্ত হইয়া বর্তমানে সালফেট অফ অ্যামোনিয়া উৎপাদন করিতেছে। পাশ্চাত্য দেশে যেসব জায়গায় গন্ধক দুষ্প্রাপ্য অথচ প্রচুর পরিমাণে জিপসাম পাওয়া যায় সেইসকল জায়গায় হেবর-প্রণালীতে সালফেট অফ অ্যামোনিয়া উৎপাদনের অন্যতম প্রধান কাঁচামাল হইতেছে এই গন্ধকাস্ত জিপসাম।

আমাদের দেশে বর্তমানে যেসকল শিল্পে গন্ধক কোন-না-কোন আকারে ব্যবহৃত হয়, তাহার মধ্যে সালফিউরিক অ্যাসিড শিল্প, খনিজসার শিল্প, শর্করা শিল্প এবং সিমেন্ট শিল্পই প্রধান। বর্তমান প্রবন্ধ-সংশ্লিষ্ট বিষয় খনিজসার শিল্প সম্বন্ধে এখানে একটু আলোচনা করা অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না। খনিজসারের মধ্যে এ দেশে বর্তমানে তৈরি হইতেছে সুপার-ফসফেট এবং সালফেট অফ অ্যামোনিয়া। এ দুইটির আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমাদের দেশে কোনও মতবৈধ তো নাই-ই বরং ইহাদের ব্যবহারের অপ্ৰাচুর্যই অভিজ্ঞ কৃষিবিদগণের নিকট পীড়াদায়ক।

বর্তমানে ভারতবর্ষে ১৬-১৭টি কারখানায় সুপারফসফেট (১৮-২০%) প্রস্তুত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে শুল্ক বিহারের কারখানাটিই সরকারী পরিচালনাধীন, অবশিষ্টগুলির মূলধন এবং পরিচালনা দেশের শিল্পপতিদের হাতে। ১৯৫০-৫১ সালে এ দেশে এই সার প্রস্তুত হইয়াছিল ৫৫,১০০ টন; ১৯৫৫-৫৬ সালে সরকারী পরিকল্পনা ছিল ১,৬৪,০০০ টন প্রস্তুত করার, কিন্তু নানা কারণে উৎপাদন ১,০০,০০০ টনের বেশি হয় নাই। ১৯৬০-৬১ সালের পরিকল্পনায় আছে ৬,০০,০০০ টন প্রস্তুত করার সংকল্প। এই কারখানাসমূহের

সবগুলিতেই বিদেশ হইতে আনীত ফসফেট-প্রস্তুতের উপর গন্ধকাসলের প্রক্রিয়া দ্বারা সুপার ফসফেট প্রস্তুত হয়। ১৮-২০% পর্যায়ের সুপারফসফেট সার আজকাল আর বিদেশ হইতে আমদানি করা যায় না, শুধু শর্করাশিল্পের জন্য ট্রিপল সুপার (৩৯-৪০%) কিছুটা বিদেশ হইতে আসে।

সালফেট অফ অ্যামোনিয়ার কথা আজকাল সকলেই জানেন। খাদ্যোৎপাদনের জন্য এই সারের প্রয়োজন খুবই বেশি। জাপানী প্রথায় ধান-চাষের প্রবর্তনে এদেশে ইহার চাহিদা সম্প্রতি খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলু, আখ প্রভৃতি মূল্যবান ফসলের জন্য ইহার ব্যবহারও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এখানে ইহা সাধারণত 'অ্যামোনিয়া সার' বলিয়া পরিচিত। সিন্ধি কারখানা স্থাপিত হওয়ার পূর্বে এখানে শুধু ইম্পাত এবং কোক-কয়লার কারখানাতে সালফিউরিক অ্যাসিডের সাহায্যে উপজাত দ্রব্য (bye-product) হিসাবে ইহা তৈরি হইত। পরে, ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে সিন্ধি কারখানা স্থাপিত হইলে এদেশে "আবদ্ধ নাইট্রোজেন" (fixed nitrogen) রূপে 'হেবর' প্রণালীতে বায়ুমণ্ডলস্থ নাইট্রোজেন, জলীয় বাষ্প, কোক-কয়লা এবং জিপসামের সাহায্যে সালফেট অফ অ্যামোনিয়া তৈরি হইতে আরম্ভ হয়। ১৯৫০-৫১ সালে এই সার মোট উৎপন্ন হইয়াছিল ৪৬,০০০ টন (সিন্ধি কারখানায়—২৯,১০০ টন), ১৯৫৫ সালে শুধু সিন্ধি কারখানাতেই প্রস্তুত হইয়াছে ৩,৩১,৭২৫ টন; ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট কত উৎপন্ন হইয়াছে এখনও সঠিক জানা যায় নাই, তবে, সরকারী পরিকল্পনায় প্রস্তুতির পরিমাণ ধার্য হইয়াছিল ৪,২৬,০০০ টন। ১৯৬০-৬১ সালের পরিকল্পনায় আছে ১৬,০০,০০০ টন, অর্থাৎ চতুর্গুণেরও বেশি। সিন্ধি কারখানা সম্পূর্ণ ভারত-সরকারের মূলধনে প্রায় ৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এবং তাহাদেরই তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। সম্প্রতি এই কারখানার পরিবর্ধন আরম্ভ হইয়াছে।

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

সালফিউরিক অ্যাসিড বা গন্ধকাসল আধুনিক শিল্পসমূহের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ; বর্তমানকালে গন্ধকাসল প্রস্তুতির অবস্থা দেশের উন্নতির মাপকাঠি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। খনিজসার প্রস্তুতিতে ইহার যথেষ্ট প্রাধান্য থাকায় এখানে ইহার উল্লেখ করা হইল। ১৯০৯ সালে এ দেশে গন্ধকাসলের উৎপাদন ছিল মাত্র ২৫,০০০ টন। উহা বাড়িয়া ১৯৫০ সালে এক লক্ষ টনে দাঁড়ায় ; ১৯৫৫-৫৬ সালে দুই লক্ষ ১৫ হাজার টন প্রস্তুত করা হইবে বলিয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ধার্য করা হয় এবং দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনানুসারে ১৯৬০-৬১ সালে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টন তৈরি করিবার প্রস্তাব আছে।

কৃষি এবং তৎসম্বন্ধীয় শিল্পে গন্ধকের প্রভাব সম্বন্ধে আমরা পর্যালোচনা করিলাম। এখন আমাদের দেশে গন্ধকের পরিস্থিতি এবং অবস্থান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করা যাউক। এদেশে ১৯৪১ সালে এবং ১৯৪৫ হইতে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত কী পরিমাণ গন্ধক খরচ হইয়াছে এবং তাহার জন্য কত টাকা বিদেশে পাঠাইতে হইয়াছে তাহার সরকারী বিবরণ যাহা পাওয়া যায় তাহা এই :

সাল	টন	টাকা (লক্ষ)
১৯৪১ ..	২৯,৪০০ ..	৫৪.০০
১৯৪৫ ..	৯,৯০৭ ..	১৬.৮৮
১৯৪৬ ..	৫২,০০০ ..	১০৫.৭৩
১৯৪৭ ..	২৯,৮০০ ..	৪৪.৩২
১৯৪৮ ..	৫৮,০০০ ..	৬১.৬৫
১৯৪৯ ..	৪১,০০০ ..	৭০.০০
১৯৫০ ..	৫৫,০০০ ..	১১০.০০
১৯৫১ ..	৩৮,৫০০ ..	১২১.৪৮ (মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে)

বলা বাহুল্য, এই গন্ধকের সমস্তটাই বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়, এবং যুদ্ধের সময় গন্ধকের অভাবে দেশের অনেক শিল্পই অকেজো হইয়া পড়ে। যুদ্ধোত্তরকালে ও বিদেশী মদ্রার অভাবে অধিকতর পরিমাণে গন্ধক আনিয়া

সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলির প্রয়োজনানুরূপ উন্নতি-বিধান করা সম্ভব হয় নাই। খুবই দুরূহের বিষয় যে, 'স্বাভাবিক' গন্ধক সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী। বস্তুত অধুনাকালে এ যাবৎ যে কোনও শিল্পের জন্য আমাদের যত গন্ধকই প্রয়োজন হইয়াছে, তাহার সমস্তটাই বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইয়াছে।

পর্যাপ্ত 'স্বাভাবিক' গন্ধকের স্তর এদেশে এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই বটে, কিন্তু অন্য দ্রব্যের সঙ্গে সংযুক্ত আকরিক গন্ধক যে ইতঃস্তত অনেক স্থানেই ছড়িয়া আছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অতীতকালে আমাদের দেশে যে গন্ধকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল তাহা এদেশেই সংগৃহীত হইত—এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই (বহু পুরাতন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে গন্ধকের নানারূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়)। চূর্ণ-মিশ্রিত গন্ধক, জিপসামের (ক্যালসিয়াম সালফেট) কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার বিস্তীর্ণ স্তর ভারতের বহু স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভূতত্ত্ব বিভাগের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, কাম্মীরে, সিমলার নিকট 'তারাদেবীতে', বিহারের রোটাং অঞ্চলে, মহাশূরে, বোম্বাই ও মাদ্রাজের কোথাও কোথাও লৌহ-সংযুক্ত আকরিক গন্ধকের (Iron Pyrites) খনি বিদ্যমান। বিহারে, সিকিমে ও রাজস্থান অঞ্চলে গন্ধক-মিশ্রিত তাম্রখনিও (copper pyrites) পাওয়া গিয়াছে। 'প্ল্যানিং কমিশনের' ধারণা যে, বিহারের ষাটশিলায় তাম্রখনি হইতে তাম্র নিষ্কাশন করিবার সময় যে গন্ধক পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়, তাহার পরিমাণ বৎসরে প্রায় ৪ হাজার হইতে ৬ হাজার টন হইবে। আসাম ও রেওয়া প্রদেশে যে কয়লা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে গন্ধকের ভাগ প্রচুর বলিয়া প্রকাশ। উত্তরপ্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে কিছু কিছু 'স্বাভাবিক' গন্ধকের স্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে কিন্তু এইসকল খনির ব্যাপ্তির বা তাহা হইতে কতখানি গন্ধক উৎপন্ন হইতে পারে অথবা উহার উত্তোলন এবং পরিস্রুতির ব্যবস্থা

করিতে কিরূপ খরচ পড়িবে এ যাবৎ তাহার কোনও হিসাব করা হয় নাই। এতদিন বিদেশী সরকার এ বিষয়ে একপ্রকার নিশ্চেষ্ট ছিলেন বলিলেই চলে। এখন আমাদের নিজেদের সরকার উহাতে উদ্যোগী হইয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও গন্ধক নিষ্কাশনের কোনও কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। তবে গন্ধক নিষ্কাশনের প্রচেষ্টা তাহাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত আছে। এতদ্ভিন্ন, যেখানে সম্ভবপর হইতেছে কোনও কোনও শিল্পে, যথা গন্ধকাস্ত্র প্রস্তুতি, খনিজসার (সালফেট অফ অ্যামোনিয়া) প্রস্তুতি ইত্যাদি তাহাতে গন্ধকের পরিবর্তে জিপসাম ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা হইতেছে যাহাতে

বিদেশ হইতে যথাসম্ভব কম গন্ধক আমদানি করিয়া পারা যায়। সরকারী পরিকল্পনা হিসাবে উক্ত দুইটি শিল্পের জন্য ১৯৫৫-৫৬ সালে জিপসামের চাহিদা হইবে প্রায় ৭ লক্ষ ১০ হাজার টন।

উপরিলিখিত বিবরণসমূহ হইতে দেশের গন্ধক-শিল্পের প্রসার-প্রচেষ্টার গুরুত্ব সকলেই প্রাণধান করিবেন। আশা করি, আমাদের দেশের শিল্প-পতিগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ও উদ্যোগী হইবেন। আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশে কৃষিকর্মে গন্ধকের অত্যাৱশ্যকতা স্মরণ রাখিয়া জনসাধারণেরও এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।



‘বেয়ার’এর পোকা ও রোগ দমনের ঔষধগুলির
দ্বারা আপনাদের ফসল রক্ষা করুন

ফলিডল-ই ৬০৫

মেটাসিস্টক্স

সেরেসান

অ্যাগালল

কুপ্রাভিট (ওবি ২১)

এইগুলি পশ্চিম জার্মানীর লিভারকুসেনের
ফারবেনফ্যাবরিকেন বেয়ার
দ্বারা প্রস্তুত আসল ঔষধ।

ভারতে পরিবেশক

চিকা প্রাইভেট লিমিটেড,

৩১, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২

হরিণঘাটার দুধ

“জীবনে আমি দুটি
জিনিষ লিখেছিঃ
এক, বিশ্বাসে কাজ
হয়, দুই, দুখে পরীর
পুটে হয়।”
—বর্গভ বাণীভ
ম্যাঙ্ক্যাভেন
(পরীরবিজ্ঞা বিশ্বাস)

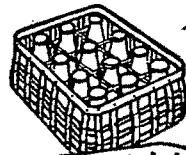


পাক্তরাইজ করা গরুর দুধ
প্রতি পাউণ্ড ১০.
পাক্তরাইজ করা টোকট, দুধ
প্রতি পাউণ্ড ১০.
মাদ্রাস
প্রতি পাউণ্ড ৭.

(২ আউন্স ও তার বেশি ওজনের প্যাকেটে)

তয়সা মি

প্রতি পাউণ্ড ৩০. (১ পাউণ্ডের শীল করা বোতলে)
কলকাতা, হাজড়া, বরাহনগর ও বরনগর ১০০ টি দুধের
দোকানে সকাল ৫-৫৫ থেকে ৭-৫৫ এর মধ্যে পাওয়া
যায়। কতকগুলি দোকান আবার বিক্রেতে ৫-৫০
থেকে ৩টা পর্যন্তও খোলা থাকে।



পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

বিভিন্ন স্থানে বনমহোৎসব

হরিণঘাটা দুগ্ধপল্লীতে

১৪ই জুলাই (১৯৫৭) হরিণঘাটায় বনমহোৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের দুগ্ধ-মহাধ্যক্ষ ডক্টর সন্তোষচন্দ্র রায় এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে, শ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে হরিণঘাটা দুগ্ধ-পল্লীর পরিকল্পনা পূর্ণরূপে পরিগ্রহ করলে প্রতিদিন প্রায় চার থেকে পাঁচ হাজার মণ দুগ্ধ উৎপন্ন হবে। এ বৎসর রাজ্য বন-মহোৎসব উদ্‌যাপনের অঙ্গস্বরূপ ১৪ই জুলাই হরিণঘাটায় আনুষ্ঠানিকভাবে বৃক্ষরোপণ করা হয়। হরিণঘাটার ১নং দুগ্ধ-পল্লীতে আয়োজিত এই সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বহু বালকবালিকা ও নরনারী উপস্থিত ছিলেন। এখানে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও পশুপালন বিভাগের মন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বনবিভাগের মন্ত্রী শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর।

সমাগত সকলকে স্বাগত জানিয়ে দুগ্ধ-মহাধ্যক্ষ হরিণঘাটার মতো স্থানে বনমহোৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং এ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের সম্পূর্ণ দুগ্ধ-পল্লী-পরিকল্পনাটি বৃদ্ধিয়ে দেন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার গো-মহিষ কলিকাতায় আনা হয়। মহাধ্যক্ষ বলেন যে, যতদিন এসব পশু দুগ্ধ দেয় ততদিন কলিকাতার গোয়ালারা এদের দেখাশোনা করেন, কিন্তু দুগ্ধ দেওয়া বন্ধ হয়ে গেলে এদের ত্যাগ করা হয় এবং বহুক্ষেত্রে কসাইদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। তিনি বলেন যে, এটা জাতীয় সম্পদের গুরুতর অপচয়, কেননা, এভাবে কতকগুলি ভাল গোরু-মহিষ বিনষ্ট হয়। এ ছাড়া, কলিকাতার খাটালগুলি একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়। এ অবস্থার পরিবর্তন করবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ভারত-সরকারের সহযোগিতায় হরিণঘাটায় দুগ্ধ-পল্লীর পরিকল্পনা করেছেন। সেখানে তিনি

সংস্থার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে; এবং শ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কালে মোট ১৭টি সংস্থা স্থাপনের কার্য সম্পূর্ণ হবে। দুগ্ধ-মহাধ্যক্ষ বলেন যে, ইতিমধ্যে কলিকাতার খাটালগুলি থেকে এখানকার দুগ্ধ-পল্লীর ১নং সংস্থায় ৯০০টি মহিষ আনা হয়েছে। সরকারের নির্মিত বিনা-ভাড়ার বাস-স্থানে এসব মহিষের মালিক গোয়ালারা বাস করছে। আশা করা যায় যে, সমগ্র পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হলে এই দুগ্ধ-পল্লী থেকেই চার-পাঁচ হাজার মণ দুগ্ধ পাওয়া যাবে। তিনি বলেন যে, বেলগাছিয়াতে ভারতের মধ্যে সর্ববৃহৎ দুগ্ধের কারখানা স্থাপন করা হবে এবং সেখান থেকে কলিকাতার বাজারে পাঠাবার দুগ্ধ বীজগুরুমুক্ত করা হবে।

কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগের সচিব শ্রীচারু-কুমার রায় তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বনমহোৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং দেশের বনসম্পদ ও বন্য-প্রাণী সংরক্ষণের সংকল্পবাক্য পাঠ করেন।

ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ তাঁর বক্তৃতায় এ দেশে বনভূমি পর্যাপ্ত নয় বলে অধিক বৃক্ষ রোপণ করবার উপর জোর দেন, এবং তিনি এ দেশের বন-সম্পদের রক্ষা ও প্রসার করবার জন্য জনসাধারণকে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অনুরোধ করেন।

বহরমপুরে

৭ই জুলাই বহরমপুর গার্লস কলেজে অষ্টম বনমহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ক্ষুদ্রশিল্প ও কুটিরশিল্প বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীসৈয়দ কাজেম আলি মির্জা। মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক শ্রী পি সি মজুমদার উদ্‌বোধনী ভাষণে অধিক বৃক্ষ রোপণ করতে এবং রোপিত বৃক্ষের যত্ন করতে জনগণকে অনুরোধ করেন। তিনি বন ও

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের শপথবাক্যও পাঠ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে মল্লিমহাশয়, উপমল্লিমহাশয় এবং জেলাশাসক কলেজ-প্রাঙ্গণে তিনটি আমের কলম রোপণ করেন।

দার্জিলিঙে

দার্জিলিঙে সর্বত্র স্থানীয় বন-অধিকার কর্তৃক গাছের কলম ও চারা বিতরণের এক কর্মসূচি রূপায়ণের দ্বারা অষ্টম বনমহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই জুলাই দার্জিলিঙের ভিক্টোরিয়া পার্কে এ সংক্রান্ত এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানটি সরকারের জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন দফতরের সহযোগিতায় দার্জিলিঙ বনমহোৎসব কমিটি কর্তৃক আয়োজিত হয়। বিভাগীয় বন-আধিকারিক সহ বিভিন্ন বস্তা জনগণের নিকট বন-মহোৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সাম্প্রতিককালে যেখানে পবর্তগায়েবের অরণ্য-নির্মূল করার ফলে কয়েকটি বিরাট ধ্বস নেমেছিল, সেই দার্জিলিঙ জেলায় বনমহোৎসবের গুরুত্ব বিভাগীয় বন-আধিকারিক ব্যাখ্যা করেন। স্থানীয় অর্থনীতির সহিত বৃক্ষাদির গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উপলব্ধি করার জন্য এবং আরও বৃক্ষ রোপণ করার ও দেশের অরণ্য-সম্পদ রক্ষা করার জন্য তিনি স্থানীয় জনসাধারণের নিকট আবেদন জানান।

বন-অধিকার কর্তৃক বিভিন্ন গাছের প্রায় ২,০০০ চারা এবং কৃষি-অধিকার কর্তৃক ২০০ চেরীগাছের চারা জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হয়।

ঘাটালে

১লা জুলাই ঘাটালে বনমহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ঘাটালের মহকুমা-শাসক শ্রী এ কে দাশগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন। মহকুমা আদালতের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপিত হয়। মহকুমা-শাসক শ্রী এইচ এন দলুই, এম এল এ, স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীসরোজ মদুখোপাধ্যায় এবং পৌরসংঘের কমিশনার শ্রীরাধানাথ ঘোষ এ উপলক্ষে চারটি চারা

রোপণ করেন। স্থানীয় বহু অধিবাসী ও সরকারী কর্মচারী উৎসবে যোগ দেন।

২রা ও ৪ঠা জুলাই যথাক্রমে চন্দ্রকোণা পৌরসংঘ ও রামজীবনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে বনমহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

তমলুক

১লা জুলাই তমলুকে স্থানীয় বহু অধিবাসী ও সরকারী কর্মচারীর উপস্থিতিতে অষ্টম বার্ষিক বনমহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। মহকুমা-শাসক এবং অন্যান্য কয়েক ব্যক্তি কয়েকটি চারা রোপণ করেন। এ উপলক্ষে বন-অধিকারের সরবরাহ-করা গাছের চারা জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হয়।

নদিয়ায়

৬ই জুলাই কৃষ্ণনগর সাঁকট হাউস গৃহে অষ্টম বনমহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। জেলাশাসক শ্রী এম সি মদুখার্জি এবং স্থানীয় বহু অধিবাসী ও সরকারী কর্মচারী তাতে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে বন ও বন্য-প্রাণী-রক্ষার সংকল্প পাঠিত হয়। এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে জেলাশাসক বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব ও বৃক্ষের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের আবশ্যিকতার উপর জোর দেন। জেলাশাসক, জেলাবোর্ডের সভাপতি প্রভৃতি কর্তৃক কয়েকটি চারা রোপিত হয়। বনবিভাগের স্থানীয় দফতর এবং উদ্যানকর্ষণ-গবেষণাকেন্দ্র থেকে আরণ্য ও ফলদায়ক উভয় প্রকার বৃক্ষেরই চারা ও কলম বিতরণের বিশেষ ব্যবস্থা হয়।

উলুবেড়িয়ায়

১লা জুলাই উলুবেড়িয়ায় অষ্টম বনমহোৎসব পালন করা হয়। এ উপলক্ষে উলুবেড়িয়ার মহকুমা-আধিকারিক তাঁর বাংলোর সংলগ্ন উদ্যানে একটি শিশুগাছের চারা রোপণ করেন। স্থানীয় বহু অধিবাসী ও সরকারী কর্মচারী এ উপলক্ষে তথায় উপস্থিত ছিলেন। শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সরকারী কর্মচারী চারাগাছ রোপণ করেন।

বসিরহাটে

১লা জুলাই মহকুমা আদালতের প্রাঙ্গণে বসিরহাটের বনমহোৎসবের উদ্‌ঘাটন করা হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মহকুমা-আধিকারিক। তিনি এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বনমহোৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং জনসাধারণের কাছে আরও অধিক বৃক্ষ রোপণ করতে এবং অকারণে গাছ না কাটতে অনুরোধ জানান। অনুষ্ঠানে সমবেত সকলে দেশের বনসম্পদ রক্ষার সংকল্প গ্রহণ করেন। এ উপলক্ষে জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন গাছের প্রায় ছয়শ' চারা বিতরণ করা হয়। আদালত-প্রাঙ্গণ ছাড়াও পৌরসংঘ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণেও এই উৎসব উপলক্ষে নানা গাছের চারা রোপণ করা হয়।

বর্ধমানে

১লা জুলাই বর্ধমান কালেক্টরেটের প্রাঙ্গণে বনমহোৎসব উদ্‌ঘাটন হয়। অনুষ্ঠানে বর্ধমানের জেলাশাসক ডক্টর এ বি রুদ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বনমহোৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং ভারতের মতো কৃষিনির্ভর দেশের পক্ষে বৃক্ষ রোপণের প্রয়োজনীয়তার কথা বঝিয়ে বলেন। সভায় বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের শপথবাক্য পাঠিত হয় এবং এ উপলক্ষে কয়েকটি গাছের চারা রোপণ করা হয়।

মেদিনীপুরে

৫ই জুলাই মেদিনীপুরে বনমহোৎসব উদ্‌ঘাটন হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অপর জেলাশাসক শ্রী এস কে ঘোষ। স্থানীয় বহু লোক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এ উপলক্ষে বহু চারা রোপণ করা হয়।

হাওড়ায়

১লা জুলাই হাওড়ায় অষ্টম বনমহোৎসব উদ্‌ঘাটন হয়। জেলাশাসক শ্রী বি বি মন্ডল স্থানীয় ডালমিয়া পার্কে কয়েকটি গাছের চারা রোপণ করেন। অন্যান্য বৎসরের মতো এবারও বনবিভাগ থেকে জনগণের মধ্যে চারা বিতরণের

ব্যবস্থা করা হয়েছে। নতুন সমাহার-ভবনের প্রাঙ্গণে এজন্য একটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

হুগলিতে

হুগলি জেলার চুঁচুড়া, পাণ্ডুরা, তানকুনি ও হরিশপালে অষ্টম বনমহোৎসব উদ্‌ঘাটন হয়েছে। প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই হুগলির জেলাশাসক শ্রী এ এম কুশারী সভাপতিত্ব করেন। সকল স্থানেই উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের সংকল্পগ্রহণ। নানা রকম গাছের বহু চারা ও কলম রোপণ করা হয়। কৃষি-অধিকার চুঁচুড়ার জনসাধারণের মধ্যে চারা ও কলম বিতরণের বন্দোবস্ত করেন।

বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়ার জেলাশাসক শ্রী আর ঘোষ জোড়হরী গ্রামে একটি আমের চারা রোপণ করে বাঁকুড়ায় অষ্টম বনমহোৎসবের উদ্‌ঘাটন করেন। নিকটস্থ গ্রামগুলির বহু অধিবাসী অনুষ্ঠানে যোগ দেন। উপস্থিত জনগণের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে শ্রী ঘোষ সংক্ষেপে বনমহোৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং জনগণকে বৃক্ষরোপণ করতে ও যত্নসহকারে বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। স্থানীয় বন-অধিকার থেকে বিনামূল্যে চারা ও কলম বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

মোহনপাড়া সমাজকল্যাণকেন্দ্রে

২৪ই জুলাই প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার শ্রী কে সি বসাক, আই সি এস মহাশয়ের পৌরোহিত্যে মোহনপাড়া সমাজকল্যাণকেন্দ্রের প্রাঙ্গণে বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সমাজকল্যাণ রূপায়ণী সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী উমা রায় গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এতে আনুষ্ঠানিকভাবে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয়। শ্রীবীরেশ্বর রায়, শ্রীমতী সীমা রায়, শ্রীআশিস রায় প্রভৃতির সঙ্গীতে এবং কন্যা শিক্ষালয়ের কয়েকজন ছাত্রী বৃক্ষরোপণনৃত্যে উৎসব মনোরম হয়ে ওঠে।

টুকটাকি

কোটালপুরে পালিত পশুপ্রদর্শনী

সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার কোটালপুর গ্রামে পালিত পশুর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই অঞ্চলটি রাজ্যের অন্যতম পশু-উন্নয়নের অঞ্চলে অবস্থিত। বাঁকুড়া কাঁকর মাটির দেশ হলেও গত দশ বৎসরে এই স্থানের অধিবাসীরা ভাল পশুখাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হয়েছেন, এ ছাড়া আমন ধান তো উৎপাদন করেছেনই। এই কারণেই তিন পদ্রুপ ধরে এখানে হরিয়ানা জাতের গো-মহিষ জন্মাচ্ছে। এই শব্দক অঞ্চলে এখন একটি দ্রুপ-উৎপাদন-কেন্দ্রও গড়ে উঠেছে।

কোটালপুর প্রদর্শনী থেকে নিশ্চিতভাবে বোঝা গেছে যে, জোয়ার, বাজরা, মকাই এবং নোপয়ার ও সুদান ঘাস বাঁকুড়ায় ভালভাবেই উৎপাদন করা যেতে পারে; তবে এজন্য যথেষ্ট উৎসাহের প্রয়োজন।

কৃষিমন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ যথার্থই বলেন যে, ২৪এ মে কোটালপুরে প্রদর্শনীর উন্মোচনে রাজ্যের অন্যান্য অংশের লোকের দৃষ্টি খুলে যাবে এবং তাঁদের সম্মুখে আদর্শ স্থাপিত হবে; কেননা; লোকে বলে থাকে যে, পশুখাদ্য উৎপাদনের উপযোগী জমি নেই। প্রথম শ্রেণীর ৫০০ পশুর একটি প্রদর্শনী করতে সক্ষম হওয়ার জন্য কৃষিমন্ত্রী কোটালপুরের অধিবাসীদের অভিনন্দন জানান।

স্থানীয় হরিয়ানা গো-মহিষ, পাঁঠা-ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি প্রদর্শিত হয় এবং শ্রেষ্ঠ প্রদর্শিত জীবগুলির জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখে মন্ত্রিমহাশয় এই বলে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, বাঁকুড়া জেলায়ও এমন উচ্চ শ্রেণীর পশু পাওয়া যায়।

শিল্প, স্বাস্থ্য, কৃষি, প্রচার প্রভৃতি সরকারী বিভাগ এতে অংশ গ্রহণ করে এবং স্থানীয় কাঁসার দ্রব্য, বিষ্ণুপুরের হস্তচালিত তাঁতের কাপড় এবং রেশমী

কাপড় আদি প্রদর্শিত হয়। প্রথম দিনের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে অন্তত ১০,০০০ লোক উপস্থিত ছিলেন।

রানাঘাট হাঁস-মুরগির উন্নয়নশালা

কৃষি, পশুপালন ও বনবিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীম্বরাজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি নদিয়া জেলার রানাঘাটে অবস্থিত রাজ্য হাঁস-মুরগি উন্নয়নশালা পরিদর্শন করেন। তথাকার অধীক্ষক মন্দি-মহোদয়কে প্রতিষ্ঠানটি দেখান এবং ইনকিউবেটর দ্বারা ডিম ফুটানোর পদ্ধতি এবং হাঁস-মুরগি পালনের প্রণালী তাঁর নিকট ব্যাখ্যা করেন। রানাঘাটের ব্লক-উন্নয়ন-আধিকারিক, কৃষিসম্প্রসারণ-আধিকারিক এবং ডাক্তার বিনয় চট্টোপাধ্যায়, এম এল এ, উপমন্ত্রীর সহিত ছিলেন। তার আগে উপমন্ত্রী মহোদয় রানাঘাট রজবালা বালিকা বিদ্যালয়ে জাতীয় সম্প্রসারণ-উপদেষ্টা সমিতির সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং তথায় রানাঘাট সম্প্রসারণ-পরিচালনা-ব্লকটির পরবর্তী বর্ষের উন্নয়ন-লক্ষ্যের পরিচালনাগুলি আলোচিত হয়। ঐদিন শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর থানাটিও পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রামবাসীদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বর্তমান পরিস্থিতি, বিশেষ করে কৃষিপরিস্থিতির পর্যালোচনা করেন। তিনি নদিয়ার কৃষি-অধীক্ষক এবং মহকুমা কৃষি-আধিকারিককে সঙ্গে করে কৃষ্ণগঞ্জ জাতীয় সম্প্রসারণ-পরিচালনার কার্যালয়ও পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় বিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতির সভায় সভাপতিত্ব করেন।

কাকদ্বীপের সন্নিকটে মৎস্য শিকার উপনগর

গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকার পরিচালনার কর্ম-দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে (পশ্চিমবঙ্গ-সরকার প্রায় ২৭.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কাকদ্বীপের সন্নিকটে

একটি মৎস্য শিকার উপনগর স্থাপন করবেন। স্যান্ডহেড থেকে কলকাতা বন্দরে যাতায়াত করতে মাছ-ধরা জাহাজগুলির এখন প্রতিবারে প্রায় তিন দিন লাগে। এর ফলে আনুপাতিক হারে মাছ ধরার দিনগুলির সংখ্যা কমে যায় এবং প্রায়শ ধৃত মৎস্য-গুলির রক্ষণসংক্রান্ত উৎকর্ষের অবনতি হয়। এসব অসুবিধার নিরসনকল্পে কাকম্বীপের সম্মিলকে হারউড পয়েন্ট নামে একটি স্থান প্রস্তাবিত উপ-নগর স্থাপনের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে; এখানে ট্রলারগুলি অবস্থানের এবং বন্দর-সংক্রান্ত অন্যান্য সুযোগসুবিধা, বেতার-যোগাযোগ, ঠান্ডা গুদাম, বরফ-উৎপাদন প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকবে।

কলকাতা পোর্ট কমিশনার, বাণিজ্য ও নৌবিভাগ, এবং পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের উন্নয়ন, মৎস্যচাষ, সেচ ও পথ-উন্নয়ন বিভাগের ১৭জন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে নিয়ে গঠিত একটি দল নির্বাচিত স্থানটি পরিদর্শন করার পর প্রস্তাবিত পরি-কল্পনাটি চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে।

সরকার ইতিমধ্যে ১০.৩৩ একর জমি গ্রহণ করেছেন এবং ডায়মন্ডহারবার-কাকম্বীপ প্রধান সড়কের সহিত এই স্থানটিকে সংযুক্ত করার জন্য প্রায় ৩.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুই মাইল লম্বা একটি রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। সাগরম্বীপ এবং হুগলি নদীর অপর তীরে অবস্থিত মেদিনীপুর জেলার মধ্যে যাতায়াতকারী শক্তিশালিত ফেরি-নৌকার ঘাটেও এই রাস্তা দিয়ে যেতে পারা যাবে। পঞ্চবার্ষিক পথ-উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ থেকে এই রাস্তার ব্যয় নির্বাহ হবে বলে প্রস্তাব করা হয়েছে।

আনুমানিক ৩.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি উপযুক্ত জেট নির্মাণ, আনুমানিক ১.০২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জাহাজ অবস্থানের বন্দোবস্ত, প্রায় ৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সমুদ্র পর্যন্ত প্রবাহিত বর্তমান খালটির বাঁধ রক্ষণ, প্রায় ১৩.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাড়িঘর, কর্মচারীগণের বাসস্থান, বেতারকেন্দ্র প্রভৃতি নির্মাণ এবং ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঠান্ডা গুদাম ও বরফকল স্থাপন এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

এই পরিকল্পনার রূপায়ণে কয়েকটি বিভাগ সংশ্লিষ্ট থাকায় এই বিভাগগুলি দ্বারা কর্মসূচির দ্রুত রূপায়ণের কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ৩১এ মে (১৯৫৭) একটি সহযোজন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ উপজাতি-কল্যাণ

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র-সেচব্যবস্থা ও কৃষির উন্নতি-সংক্রান্ত উন্নয়ন-পরিকল্পনা সম্পর্কে চলতি আর্থিক বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার বাঁকুড়া জেলায় ঝিকু খাল সেচ-পরিকল্পনা অব্যাহত রাখার ব্যয় হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের সেচ বিভাগের মূল্য বাস্তব-কারের হাতে ৪৯,২০০ টাকা এবং কৃষি-অধিকর্তার হাতে উপজাতি অধিবাসীদের মধ্যে বীজ বিতরণের জন্য ১৫,০০০ টাকা ও জলপাইগুড়ি জেলার উপ-জাতি-অঞ্চলসমূহে পালিত পশুপক্ষীর উন্নয়নকল্পে ৭,৮০০ টাকা অর্পণের জন্য মঞ্জুর করেছেন।

নারীদানা সমবায় শস্যভাণ্ডার

৯ই জুলাই তারিখে (১৯৫৭) সংযুক্ত উন্নয়ন-মহাধক্ষ শ্রী এস বি রায় নারীদানা বিবিসার্থক সমবায় সমিতির নতুন ভবন ও গুদামের দ্বারোদ্ঘাটন করেন; দক্ষিণ গড়িয়া ইউনিয়নের নারী-দানা ও মঙ্গলা গ্রামের প্রায় ২,০০০ গ্রামবাসী, চম্বিশপারগনার জেলাশাসক শ্রী বি আর গুপ্ত ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কয়েকজন আধিকারিক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উন্নয়ন-মহাধক্ষ শ্রীহরময় বন্দ্যোপাধ্যায় পরে ভবনটি পরিদর্শন করেন, শ্রীবিজয় রায় নামে স্থানীয় একজন বিশিষ্ট কৃষিজীবী এবং উন্নয়নবিভাগের কর্মচারীগণ তাঁকে সর্বকিছুর দ্বারিয়ে দেখান।

১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নারীদানা ও মঙ্গলা গ্রামের অধিবাসীদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য অনাড়ম্বরভাবে নারীদানা বিবিসার্থক সমবায় সমিতি স্থাপিত হয়। ঐ বৎসর জুন মাসে রাসায়নিক কৃষিসার বিতরণ এবং ন্যায্যমূল্যে খাদ্য-দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য সমিতিতে মনোনীত করা হয়।

বিপণন শাখার স্থানীয় কর্মচারীগণের প্রস্তাবে ও উৎসাহে সমিতি কৃষিজ-বিপণনের ক্ষেত্রে নিজ কর্ম-ধারা প্রসারিত করে। এই কর্মসূচির রূপায়ণে সহায্য করার জন্য ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে সমাজ-উন্নয়ন ব্লকগুলিতে কৃষিজ-বিপণনের সুযোগ-প্রসারের উদ্দেশ্যে কৃষিবিভাগের বিপণন শাখা থেকে সমিতিতে ৯,০০০ টাকা ঋণ দেওয়া হয়। এই টাকার মধ্যে ২,৫০০ টাকা গুদাম-তৈরিতে এবং ৪,০০০ টাকা একটি ধানভানা যন্ত্র স্থাপনে ব্যয় হয়। বাকি টাকা বিপণনের কার্যকরী মূলধনরূপে কাজে লাগানো হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে ভাষণপ্রসঙ্গে জেলাশাসক স্বল্পকালের মধ্যেই উন্নতি করার জন্য এই সমবায় সমিতিতে ধন্যবাদ জানান। তিনি এর সদস্যগণকে বিদ্যাধরী স্পিনল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, নবম্বীপের 'প্যাক' সমবায় সমিতি প্রভৃতি সার্থক সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির মূলনীতি ও শক্তির সমকক্ষতা লাভ করতে বলেন। সমবায় আন্দোলনের মূলনীতির ব্যাখ্যা করে জেলাশাসক সমবায় সমিতির সদস্যদের 'স্বাবলম্বনই প্রকৃত উপায়' এই কথাটি স্মরণ রাখতে অনুরোধ করেন।

পূর্বাঞ্চল কৃষিজ-বিপণন-অধীক্ষক কৃষিকার্যের উন্নতির ব্যাপারে বিক্রয়ের সুব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলেন এবং কৃষিজাত পণ্যের বিক্রয়সমস্যার ব্যাপারে সমবায় নীতিতে অগ্রসর হবার জন্য জোর দিয়ে বলেন। সমবায় সমিতির উপ-নিয়ামক এই সভায় উপস্থিত থেকে ঘোষণা করেন যে, সরকার এই সমবায় সমিতির সদস্যগণকে বিদ্যাধরী স্পিনল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ও 'প্যাক' সমবায় সমিতি দেখিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে রাজি হবেন। উক্ত সমবায় সমিতির সম্পাদক এবং সভাপতি এই সভায় ভাষণ দেন। উভয়েই সমবায় সমিতির অগ্রগতির কথা বিশদভাবে বলেন।

উপজাতীয় কৃষকগণের জন্য উপরূপ

রাজ্যের উপজাতীয় কৃষকগণের জন্য জীবনযাত্রা নির্বাহের কতকগুলি সহায়ক উপায়ের ব্যবস্থা করার

উদ্দেশ্যে কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের উপজাতিকল্যাণ বিভাগ ৩৯,৫০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন। এই সহায়ক বস্তিগুলি হল ছাগ, মেষ ও শূকর পালন। উপজাতীয় কৃষকদের জমিতে আধা-ক্ষেতি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করার জন্যও সরকার ১৩,০০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কৃষি-অধিকর্তার মাধ্যমে এই কর্মসূচি-গুলি কার্যে পরিণত হবে।

বাদুড়িয়ায় অধিক খাদ্য উৎপাদন সম্মেলন

১৬ই জুন তারিখে (১৯৫৭) চান্দিশপরগনা জেলার বাদুড়িয়ায় বাণীমন্দির ময়দানে কৃষিজীবীদের এক প্রতিনিধি-সম্মেলন হয়। স্থানীয় 'অধিক খাদ্য উৎপাদন সমিতি' ও বাদুড়িয়া কৃষক-সমাজের সহযোগিতায় এই সম্মেলনের আয়োজন হয়। সেখানে অধিক কৃষিসার ব্যবহার করে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাকে কেন্দ্র করে আলোচনা করা হয়। কেমন করে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার অধিক খাদ্য উৎপাদন করবার বিভিন্ন উপায় অবলম্বনের ফলে ১৯৫০ সাল থেকে ক্রমশ অধিক শস্য উৎপন্ন হচ্ছে, তা সম্মেলনের সভাপতি কৃষি-মন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ বুঝিয়ে বলেন। প্রাকৃতিক দুর্বিপাক সত্ত্বেও এ রাজ্যে ১৯৫০ সালের ৩৬ লক্ষ টনের স্থলে ১৯৫৭ সালে ৪২ লক্ষ টন চাল উৎপাদন করা হয়েছে। তথাপি তিনি বলেন, ক্রমশ জনবৃদ্ধির ফলে প্রতি বছর শস্য এবং সবজি অধিক উৎপাদন করা প্রয়োজন। ১৯৬০-৬১ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে পশ্চিমবঙ্গে একই জমিতে শতকরা ২৫ ভাগ বেশি শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে। কেমন করে অধিক কৃষিসারের ব্যবহার, মিশ্রসার, উৎকৃষ্টতর বীজ, সারিতে বপন, জাপানী পদ্ধতিতে ধানচাষ এবং অন্যান্য উন্নত চাষ-প্রণালীর দ্বারা প্রতি একর জমির আয় বৃদ্ধি করতে পারা যায় তা তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন। তিনি কৃষিজীবীদের একই জমিতে দুই প্রকার শস্য

উৎপাদনের উপদেশ দেন—যাতে ঐ শস্যের একটি মানুষের ও অপরটি গবাদির খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কৃষিমন্ত্রী বলেন যে, এর কারণ, পশু-খাদ্য ব্যতীত গোজাতির উন্নতি হতে পারে না।

এই সম্মেলনে কৃষিজীবী ও বিভিন্ন মতাবলম্বী বিভিন্ন লোকের এক বিরাট সমাবেশ হয় এবং তার দ্বারা এই সূচিত হয় যে, এ রাজ্যের জনসাধারণ অধিক খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন।

পোনা ও চারা মাছের উৎপাদন

গ্রামাঞ্জে পোনামাছ ও চারামাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য চর্ষাপরগনা ও হাওড়া ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় পোনা-চাষীদের নিম্নোক্ত শর্তাধীনে প্রতি হাজার পোনাপিছ ২ টাকা হারে বোনাস দেওয়া হবে:

(ক) যে উৎপাদনকারী ন্যূনপক্ষে ২৫ হাজার পোনামাছ ও চারামাছ উৎপাদন করতে পারবেন না, তাঁকে সাধারণত বোনাস দেওয়া হবে না; (খ) জেলা মীনপোষ-আধিকারিকগণ তাঁদের নিজ নিজ এলাকার মধ্যে যে সর্বোচ্চ দর বেঁধে দেবেন, সেই দরের মধ্যেই উৎপাদকদের উৎপাদিত এই পোনা বিক্রয় করতে হবে; এবং (গ) উৎপাদকদের নিজ ব্যয়ে পুকুরে জাল ফেলতে হবে এবং স্থানীয় জেলা মীনপোষ-আধিকারিক বা সহকারী মীনপোষ-আধিকারিক অথবা সহকারী মীনপোষ-উপদর্শককে এবং স্থানীয় অন্তত দু'জন লোককে উৎপাদিত পোনামাছ ও চারামাছ দেখাতে হবে অথবা পোনা কেনার তারিখ, পোনা-বিক্রেতাদের নাম-ঠিকানা, পোনার পরিমাণ এবং পুকুরে ঐগুলিকে ছাড়ার দিন প্রভৃতির উল্লেখ সহ একটি লিখিত বিবৃতি উপরি-উক্ত আধিকারিকদের নিকট দাখিল করতে হবে। বোনাস-লাভে আগ্রহী পোনা-উৎপাদকদের নিজ নিজ নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য অবিলম্বেই বিভিন্ন মহকুমায় অবস্থিত স্থানীয় জেলা মীনপোষ-আধিকারিক বা সহ-মীনপোষ-আধিকারিকদের নিকট আবেদন করতে হবে।

সমবায় বিপণন সমিতি

কলকাতার কোন একটি দৈনিক সংবাদপত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সংবাদে এই মর্মে অভিযোগ করা হয়েছে যে, সমবায় বিপণন ও ঋণ সমিতি স্থাপনের জন্য জাতীয় সমবায় উন্নয়ন এবং পণ্যাগার পর্ষদের তহবিল থেকে পশ্চিমবঙ্গ এখনও তার অংশের অর্থ নেয় নি, অথচ সেক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্য-গুলি তাদের অংশের অর্থ নিয়ে নিয়েছে।

প্রকৃত ঘটনা এই যে, ১৯৫৬-৫৭ সালের আর্থিক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে সমবায় বিপণন ও ঋণ সমিতি স্থাপনের জন্য ১৯৫৬ সালের প্রারম্ভে ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত-সরকারের নিকট দাবি জানানো হয়েছিল। সেই অনুযায়ী জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও পণ্যাগার পর্ষদ পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের হস্তে ৬,৫০,১০০ টাকা অর্পণ করেন। সেই অর্থ ১৯৫৬-৫৭ সালের আর্থিক বৎসরে ঐ বৎসরের লক্ষ্য অনুযায়ী কৃষি-অধিকারের বিপণন শাখা কর্তৃক ১৫টি সমবায় বিপণন সমিতি স্থাপনে যথাযোগ্যভাবে ব্যয় হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এ রকম একশ' বিপণন সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব আছে। সুতরাং সংবাদপত্রে পশ্চিমবঙ্গের কর্তৃব্যকর্মে অবহেলার কথা যা বলা হয়েছে তা সত্য নয়।

বেলগাছিয়ায় প্রস্তাবিত দুগ্ধশালা

সম্প্রতি কলকাতার সংবাদপত্রে হরিণঘাটা দুগ্ধ-পাল্লী-পরিকল্পনা এবং বেলগাছিয়ায় প্রস্তাবিত দুগ্ধশালা সম্পর্কে প্রকাশিত বিবৃতি থেকে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, কলকাতার খাটালগুলি থেকে গো-মহিষ বেলগাছিয়ায় স্থানান্তরণে প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু তা ঠিক নয়। কলকাতার খাটালগুলি থেকে গো-মহিষাদি বেলগাছিয়ায় সরাবার কোন পরিকল্পনা কখনই করা হয় নি। বেলগাছিয়ায় প্রস্তাবিত দুগ্ধশালার জন্য কেবল প্রায় ১২ একর জমি সংগ্রহ করা হয়েছে। সরকার

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

বস্তুত কলকাতা থেকে খাটালের গো-মহিষ হরিণ-ঘাটার দূধ-পঙ্খীতে সরাতে চান; সেখানে পশুখাদ্য, গোচারণভূমি এবং গো-মহিষ রাখার সুব্যবস্থা আছে, গোয়ালাদের থাকার বন্দোবস্তও সেখানে করা হয়েছে। হরিণঘাটা থেকে জীবাণুমুক্ত ও বোতলে ভর্তি করা দূধ সরবরাহের উদ্দেশ্যে বেলগাছিয়ায়

দূধশালায় আনা হবে; সকল গো-মহিষাদি হরিণ-ঘাটায়ই থাকবে, বেলগাছিয়ায় নয়।

তা ছাড়া, এই দূধশালা থেকে দৈনিক ৬,০০০ মণ দূধ সরবরাহ হবে। একটি দৈনিক সংবাদপত্রে ভুলবশত দৈনিক ১২,০০০ মণ দূধ সরবরাহ হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

চাষীর শত্রু ইঁদুর

ইঁদুরের ঘম

‘সাইনোগ্যাস’

ক্ষেত-খামারে, গদামে এবং ধানের গোলার ধারে
ধারে ইঁদুর মারিবার জন্য ‘সাইনোগ্যাস’
ব্যবহার করুন

এর ব্যবহার
সম্বন্ধে আপ-
নাদের কৃষি-
সহায়কের
পরামর্শ নিন

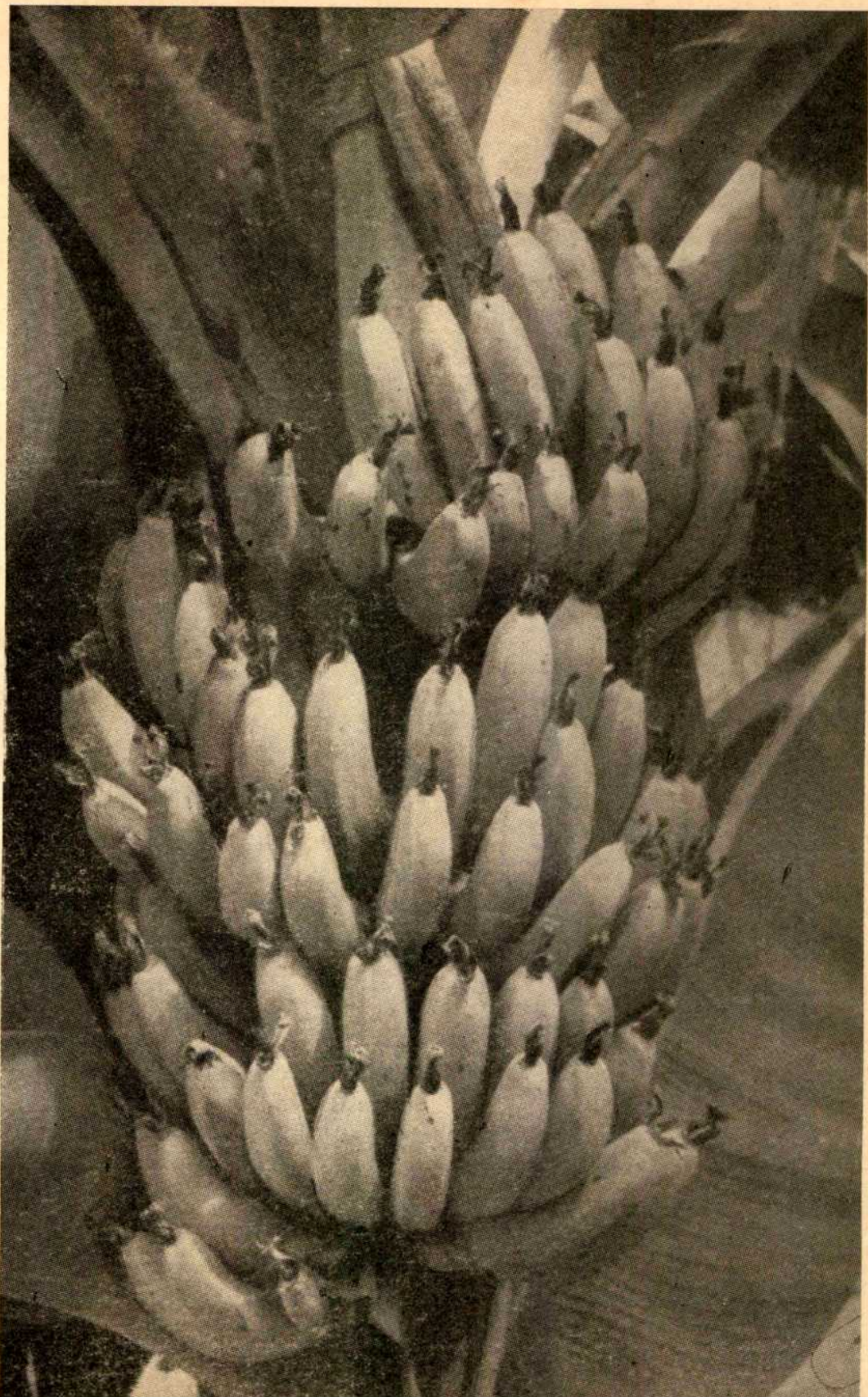
শ ওয়ালেস অ্যান্ড কোং, লিঃ,
৪নং ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট
কলিকাতা-১

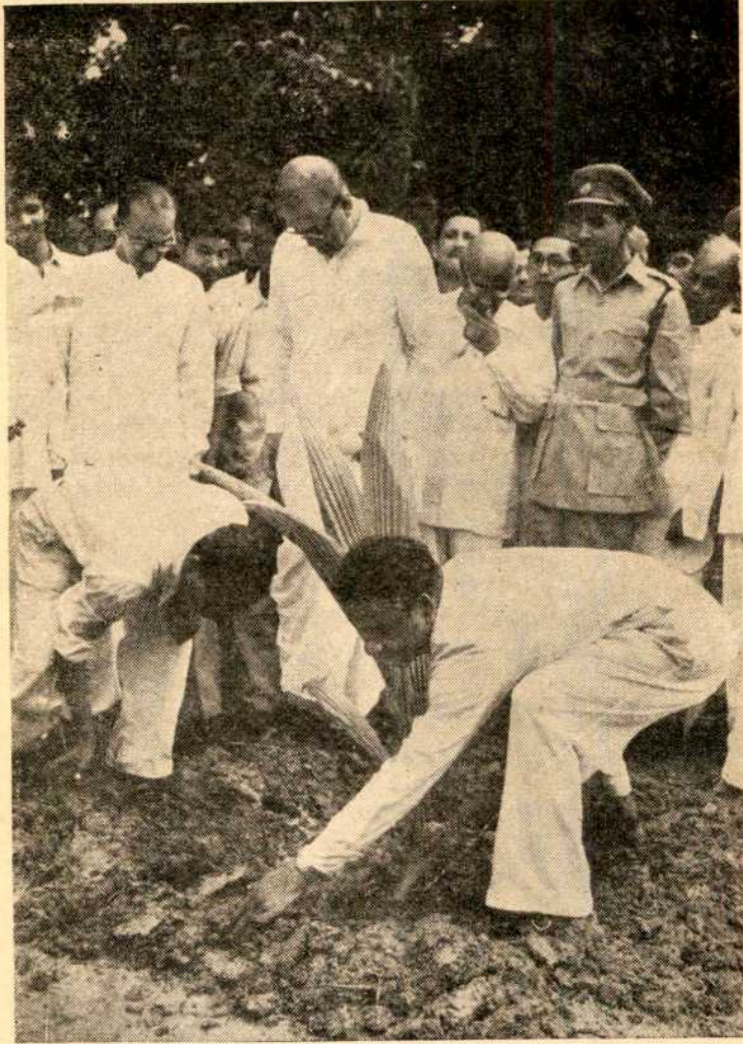
সম্পাদক : শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মূদ্রণে

অধীক্ষক শ্রীশুভেন্দ্র মধোপাধ্যায় কর্তৃক মূদ্রিত

শোভনীয়
শোভনীয়
(চুঁড়া সরকারী
কৃষিক্ষেত্রের
কলাবাগানে)





নিখিল ভারত নারকেলদিবসে চন্দননগরের সরকারী নারকেলবাগানে মুখ্যমন্ত্রী
ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় একটি নারকেলচারা রোপণ করছেন। তাঁর পাশে কৃষিমন্ত্রী
ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ ও কৃষি-উপমন্ত্রী শ্রীশ্বরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা যাচ্ছে
[২২• পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

বহুধরা

১০ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

ভাঙ্গ : ১৩৬৪

প্রসঙ্গ

কোন জিনিসের উৎপাদন এখন যা হচ্ছে তার চেয়ে যদি আরও বেশি পেতে হয়, তা হ'লে সেজন্য দ্রুত রকমের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথমত, উৎপাদন বাড়াতে হবে, দ্বিতীয়ত, উৎপাদন যাতে কমে না যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার উপায় করতে হবে।

আমাদের দেশে আজ সকল রকমের শস্যেরই উৎপাদন অনেক বেশি বাড়িয়ে তুলতে হবে—এ প্রয়োজন সকলেই অনুভব করছে এবং উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টাও চলছে নানা দিক দিয়ে। যথেষ্ট পরিমাণ জৈব আর রাসায়নিক সার দিয়ে জমির উর্বরতা বজায় রাখতে হবে এবং ফসলকে খাদ্যের যোগান দিতে হবে, জমিতে জলসেচ করা চাই, উন্নত জাতের সূক্ষ্ম পুষ্ট বীজ ব্যবহার করা দরকার, ক্ষেতে নিড়েন দিয়ে মাটি ঝড়ুরো রাখতে হবে আর আগাছা দমন করতে হবে, চটা পড়িয়ে মাটিকে কোমল আর সরস রাখতে হবে, তা হ'লে ফসল ভাল হবে, তেজী হবে, ফলন অনেক বেড়ে যাবে—এসব কথা আজ প্রায় সকল চাষীই জানেন।

এখন, কোন চাষী এসব ব্যবস্থায় চাষ ক'রে দেখতে পেলেন যে, তাঁর ক্ষেতে গাছগুলো হয়েছে বেশ তেজী ; তিনি আশা করছেন যে, সেসব গাছে খুব ভাল ফলন হবে, এমন সময় হয়তো দেখা গেল যে, তাঁর অগোচরে গোরু বা মোষ পড়ে ক্ষেতের নধর গাছগুলো খেয়ে উজাড় ক'রে দিয়ে গেছে। চাষীর বুকভরা আশা শূন্যে মিলিয়ে গেল।

এভাবে ফসলের যাতে ক্ষতি হতে না পারে তার জন্য ফসল রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে—ক্ষেতের

চারদিকে এমন ক'রে বেড়া দিতে হবে যাতে গোরু-মোষ-ছাগল প্রভৃতি ঢুকতে না পারে। কিন্তু এসব হ'ল ফসলের স্থূল শত্রু। এসবের আক্রমণ থেকে ফসল বাঁচানোর ব্যবস্থা সহজেই করা চলে।

ফসলের মারাত্মক শত্রু হচ্ছে রোগ আর পোকা। হঠাৎ দেখা গেল, ক্ষেতের কতকগুলো গাছ শুকিয়ে উঠছে অথবা কতকগুলো গাছের গোড়া পচে গেছে কিংবা গাছের পাতা কুঁকড়ে যাচ্ছে বা এমনি নানা-ভাবে গাছের বিকৃতি ঘটছে। এসব হ'ল রোগের লক্ষণ।

ফসলের ক্ষেতে আর ফলফলের বাগানে রঙবেরঙের প্রজাপতি, ফড়িঙ আর নানা রকমের পোকাকার বাহার দেখে আমরা পদূলকিত হয়ে উঠি। এর মধ্যে বেশির ভাগ কীট-পতঙ্গই কিন্তু ফসলের মারাত্মক শত্রু। এদের কেউ গাছের ডালে-ডাঁটায় ছিদ্র করে, কেউ গাছের পাতা খায়, কেউ বা শস্যের শীষ খায়—এমনি নানাভাবে ক্ষতি ক'রে এরা গাছের বল কমিয়ে দেয়, তাতে ফলন কম হয়। কোন কোন পোকাকার আক্রমণে গাছ একেবারে ম'রেও যায়।

এইভাবে রোগ আর পোকাকার আক্রমণে আমাদের দেশে প্রতি বছর শতকরা দশ ভাগের বেশি শস্য নষ্ট হচ্ছে। আমাদের দেশ যদি আজ খাদ্যশস্যে শূদ্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'ত, তা হলেও শতকরা দশ ভাগ শস্য নষ্ট হ'লে দেশের শতকরা দশ জন লোক খেতে পেত না। কিন্তু দেশ এখনও খাদ্যশস্যের উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, এ অবস্থায় এ যে কী

বিরাট ক্ষতি তা একটু ভেবে দেখলেই অনুভব করা যাবে।

কাজেই শস্যের উৎপাদন বেশি পেতে হ'লে শুধু ফলন বাড়ানোর ব্যবস্থা করলেই চলবে না, ফসলকে রোগের আর শত্রুকীটের আক্রমণ থেকে বাঁচানোরও উপায় করতে হবে।

বসুন্ধরায় প্রায়ই আমরা বিভিন্ন ফল-ফসলের রোগ-পোকা ও তাদের দমনের বিষয়ে আলোচনা করে থাকি ; কিন্তু সেসব বিভিন্ন সংখ্যায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকলে যথাসময়ে পাঠক-পাঠিকারা

হয়তো হাতের কাছে পান না। তাই এ সংখ্যায় আমরা প্রধান কয়েকটি ফসলের উপর রোগ-পোকার আক্রমণের ধারাবাহিক ও সেসবের দমন-পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্যাদির সংকলন করেছি। এক সংখ্যার পত্রিকায় সকল ফল-ফসলের সব রকম রোগ-পোকা সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়। প্রধান কয়েকটি ফসলের রোগ-পোকার দমন সম্বন্ধে এখানে যে আলোচনা করা হল, তা যদি পাঠক-পাঠিকারা যথাসময়ে কাজে লাগান, তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।



ধানের পোকা

মারা পৃথিবীতে যত লোকের বাস, তার অর্ধেকেরই প্রধান খাদ্য ভাত। তাই পৃথিবীতে ধানের চাষ হয় ২৪ কোটি একরেরও বেশি জমিতে আর তার ধান থেকে বছরে চাল হয় প্রায় ১৬ কোটি টন। ভারতে মোট যত জমিতে কৃষিকাজ চলে, তার শতকরা ২৪.৭ ভাগে অথবা ৭.৭৩ কোটি একর জমিতে—এবং পৃথিবীর অন্য যে-কোন দেশের তুলনায় ঢের বেশি জমিতে—ধানের চাষ হয়।

এই ধানের ফসলে অনেক রকমের পোকার আক্রমণ চলে এবং এত বেশি পোকার আক্রমণ আর কোন ফসলেই হয় না। এর ফলে প্রতি বছরই অনেক ধান নষ্ট হয়। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ভাত, তাই প্রধান চাষ ধানের। এ রাজ্যে ধান যা জন্মায়, তা দিয়ে আমাদের চাহিদা মেটে না; কাজেই উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা চলছে নানাভাবে। এ অবস্থায় পোকার আক্রমণে প্রচুর ধান নষ্ট হওয়া নিতান্তই মারাত্মক। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে এসব পোকার উপদ্রব যত কমানো যায় ততই মঙ্গল।

আমাদের দেশে ধানের ক্ষেতে এ পর্যন্ত যত রকম পোকার আক্রমণ দেখা গেছে, সংখ্যায় তা পঞ্চাশেরও বেশি হবে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে সাত রকমের পোকা। কোন কোন এলাকায় আরও তিন রকমের পোকা এক এক বছর দেখা দেয় এবং অনেক সময় তারা প্রধান কীটগুলোর মতই ফসলের বিস্তার ক্ষতি করে। এখানে আগে সাতটি প্রধান পোকার কথা বলা হচ্ছে এবং অপর তিন রকমের পোকার সম্বন্ধে যতটা জানতে পারা গেছে তাও বলা হচ্ছে তার পরে।

প্রধান সাতটি পোকা হচ্ছে:

- (১) মাজরা পোকা [*Schaenobius incertellus*, Wlk.]
- (২) লেদা পোকা [*Spodoptera mauritia*, Boisd.]

- (৩) কাটুই পোকা [*Cirphis unipuncta*, Haw]
- (৪) গাঁধি পোকা [*Leptocoris varicornis*, Fabr.]
- (৫) ফড়িঙ [*Hieroglyphus banian*, Fl.]
- (৬) পামরি পোকা [*Hispa arnigera* Ol.]
- (৭) ভেঁপু পোকা [*Pachydiplosis oryzae*]

যে তিনটি পোকা মাঝে মাঝে দেখা দেয় তারা হচ্ছে:

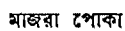
- (১) ছোট ফড়িঙ [*Oxya velox*, Fb.]
- (২) ছোট পামরি [*Leptispa pygmaea*, B.]
- (৩) চোষী বা দেওয়ালী পোকা [*Nephotettix bipunctatus*, Fabr.]

মাজরা পোকা

এ পোকা ধানের পয়লা নম্বরের শত্রু। ধানের ভয়ানক ক্ষতি করে এরা। একা শব্দে এ পোকার আক্রমণে ভারতে প্রতি বছর প্রায় দশ কোটি টাকার ধান নষ্ট হয়।

এ পোকার কীড়া ধানগাছের ডাঁটায় ছিদ্র করে, তার ফলে গাছের মাঝখানের কচি ডগাটি শুকিয়ে সাদা হয়ে যায়। ধানগাছের পরিণত অবস্থায় যদি তার শীষটি সাদা হয়ে যায়, তা হলে বদ্বতে হবে যে, গাছে এ পোকার আক্রমণ হয়েছে। এদের উপদ্রব পুরো দমে চলে মার্চ থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে অথবা নবেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে। নবেম্বরের মাঝামাঝি সময়ের পরে এরা কুন্ডলী পাকিয়ে জড়সড় হয়ে থাকে পরের বছরের প্রায় মার্চ মাস পর্যন্ত। শীত যেখানে কম পড়ে সেখানে মাজরা পোকার কীড়া একটু আগে-আগেই প্রজাপতি হয়ে যায়। মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে ধানক্ষেতের আল বা বাঁধের উপর অথবা কাছাকাছি কোথাও ঘন বুনোঘাসের মধ্যে এর প্রজাপতিদের বংশবিস্তারের আয়োজন চলে। জুন

মাস থেকে তারা ধানগাছের পাতায় একসঙ্গে
জড়িত অবস্থায় সাধারণত ৬০ থেকে ১০০টি



(১) মাজরা পোকায় আক্রান্ত খানগাছ; (১ক) প্রজাপতি
বিশ্রাম করছে; (১খ) ডিমের থোলো; (২) ডাঁটার ভিত্তর
গুঁটি; (৩) ডিমের থোলো আলাদা করে দেখানো হয়েছে;
(৪) শূককীট; (৫) পুতুলি; (৬) পুরুষ প্রজাপতি;
(৭) নারী প্রজাপতি।

পর্যন্ত ডিম পাড়ে। কখনও কখনও কোন কোন প্রজাপতিকে ২০০টি পর্যন্ত ডিমও পাড়তে দেখা যায়। সাধারণত পাতার ডগার দিকে মাঝ-শিরার একপাশে এরা ডিম পাড়ে। প্রজাপতির রঙ হালকা হলদে বা খড়ের রঙের মত। এরা ক্ষেতের ছায়াঢাকা অংশে ডিম পাড়তে পছন্দ করে। সাধারণত রাতের বেলাই ডিম পাড়ে। পাঁচ-ছ' দিনেই ডিম ফুটে ছোট ছোট কীট বেরোয় ; তারা পাতার উপরের আবরণ খায়। একদিন পরেই গাছের ডাঁটায় ছিদ্র করে ভিতরের অংশ খায়। কীড়গুলো বড় হয়ে প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা হয়।

তার পরে ডাঁটার ভিতরেই পাতলা সাদা রেশমী গুঁড়ির ধরনের আবরণ তৈরি করে তার মধ্যে পুত্তলি হয়। পুত্তলি অবস্থায় এক মাস থাকে, তার দিন-দশেক পরে প্রজাপতি (মথ) হয়ে গুঁড়ির আবরণ কেটে বেরিয়ে আসে। ছ'-সাত সপ্তাহের মধ্যে এই পোকের জীবনবৃত্ত পূর্ণ হয়।

দমনের উপায়ঃ মাজরা পোকা দমন করা সহজ নয়। ভয়ানক ক্ষতিকর এই পোকা দমনের এমন কোন উপায় এখনও আবিষ্কার করা যায় নি যা কম খরচে হতে পারে। জাপান প্রভৃতি অনেক ধানের দেশ তাঁদের কীটতত্ত্ববিদদের পাঠাচ্ছেন অন্যসব ধানের দেশে—যদি অপর কোন দেশে এ পোকা সহজে বা কম খরচায় দমন করার কোন উপায় বেরিয়ে থাকে, তা জানবার জন্য। কিন্তু এ পর্যন্ত তেমন কোন উপায়ের সম্ভাবনা কোথাও পাওয়া যায় নি। যা হোক, যেসব উপায়ের কথা এখানে বলা হ'ল সেসব প্রয়োগ করলে মাজরা পোকার উপদ্রব অনেকটা কমে যাবেঃ

(ক) ক্ষেতের ধান কাটা হয়ে যাবার পরে গাছের যে গোড়াগুলো থেকে যায়, লাঙল দিয়ে মাটি আলগা করে সেগুলো তুলে নিয়ে এক জায়গায় জড় করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

(খ) ক্ষেতের আল বা বাঁধের উপর যেন বুনো-ঘাস জন্মাতে না পারে। জমির ধারের ঘাসের বনেই এরা বসন্ত আর গ্রীষ্মকালের স্দুখনীড় রচনা করে, তারপর সেখান থেকে ক্ষেতে নেমে আসে।

(গ) উৎপাত যখন খুব বেশি হয় সেই সময় আলোকফাঁদ পেতে এর প্রজাপতিগুলোকে মেরে ফেলা যায়। আলোকফাঁদ পাতা সম্ভব না হ'লে মাঝে মাঝে ক্ষেতের আশপাশে শুকনো আগাছা জড় করে আগুন জ্বালালে প্রজাপতি তাতে পড়ে মরে।

(ঘ) এ পোকার আক্রমণ দেখা দিলেই আক্রান্ত গাছ তুলে এনে পুড়িয়ে ফেলা উচিত।

(ঙ) ছোট আকারের ক্ষেত্রে প্রতি সপ্তাহে ধান-গাছগুলোর পাতার উপর থেকে ডিমের থোলোগুলি কাড়িয়ে নিয়ে নষ্ট করে ফেলা যায়।

(চ) শতকরা ৪ কি ৫ শক্তির 'বি-এইচ-সি' গুঁড়ো একরপিছ ১২ থেকে ১৫ পাউন্ড ছাড়িয়ে দিলে পোকা নষ্ট হবে। এই রাসায়নিক দ্রব্যটি কোন ক্ষেত্রে কী পরিমাণে ছড়ানো উচিত, সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া ভাল; তবে, একরপিছ ১২ থেকে ১৫ পাউন্ড হচ্ছে সাধারণ মাত্রা। ক্ষেত্রবিশেষে এর চেয়ে বেশি বা কম লাগতে পারে। ধানের ডাঁটার ভিতর এ পোকাকর কীড়া থাকে বলে, কীটনাশক ওষুধ ছাড়িয়ে কীড়া মারা শক্ত।

(ছ) ক্ষেত্রে জল বেশি রাখতে পারলে অনেক সময় এদের আক্রমণ কম হতে দেখা যায়।

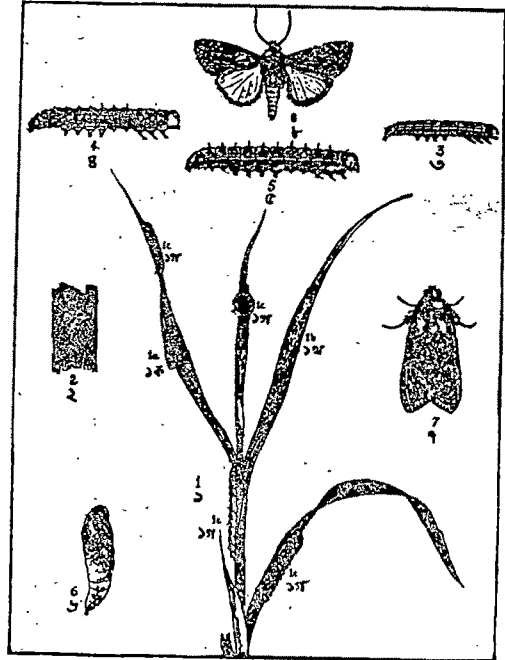
লেদা পোকা

এ পোকাও ধানগাছে ছিদ্র করে। ভারতের সব জায়গাতেই লেদা পোকাকর উপদ্রব দেখা যায়। এদেশের বাইরে ব্রহ্মদেশ, সিংহল, যবন্বীপ, মালয়, ফিলিপাইন ন্বীপপুঞ্জ এবং হাওয়াই ন্বীপপুঞ্জে ধানের ক্ষেত্রে এ পোকাকর আক্রমণ হয় বলে জানা গেছে। এ পোকা বিশেষ করে ধানের চারাগাছের ভয়ানক ক্ষতি করে। এর শূককীটেরা বিরাট দল বেঁধে ধানের বীজতলায় হানা দেয়। এর জন্য অনেক জায়গায় এদের এমন নাম দেওয়া হয় যার অর্থ হচ্ছে 'দলবাঁধা পোকা' অথবা 'বাহিনী পোকা'। এদের উৎপাত যখন খুব বেশি হয়, তখন এরা বীজতলার এমন অবস্থা করে ছাড়ে যে, দেখে মনে হয়, ধানের চারাগুলো সব বৃক্ষি গোরু-ছাগলে গোড়াতে মর্দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে থেয়ে গেছে। ধানের ক্ষেত্রে রোয়া লাগাবার পরেও অনেক সময় এরা কাঁচ গাছ-গুলোকে এমনি নিশ্চিহ্ন করে থেয়ে ফেলে।

আখ, গম, যব, জোয়ার প্রভৃতির উপরও এই পোকাকর আক্রমণ চলে, তবে ধানগাছের উপরই এদের লোভটা বেশি। একটা বিশেষত্ব হচ্ছে, এরা হঠাৎ দেখা দেয় ক্ষেত্রে, কাজেই এদের দমন করার জন্য আগে থেকে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায় না। বুনোঘাসের জংগলে এরা আশ্রয় নেয়, সেই

জংগলকে ধ্বংস করে হঠাৎ এরা অজস্রসংখ্যায় দলবদ্ধ হয়ে ধানক্ষেতে নেমে আসে এবং সর্বনাশা হয়ে ওঠে এদের আক্রমণ। এদের আবির্ভাব-তিরোভাব নিয়ন্ত্রিত হয় আবহাওয়া দিয়ে। যেসব জায়গায় ঠান্ডা আবহাওয়ার পরেই হঠাৎ গরম পড়ে, সেসব জায়গায় এদের আক্রমণ হয় উগ্র।

লেদা পোকাকর প্রজাপতির গায়ের রঙ ধূসর বাদামী। এরা ধানের পাতার নিচের পিঠে থোলো-বাঁধা ডিম পাড়ে। একটা থোলোতে ১০০ থেকে ৪০০ পর্যন্ত ডিম থাকে। ডিমের রঙ ফিকে হলদে, সেগুঁলি মোষে রঙের শব্দেতে ঢাকা থাকে। এসব ডিমের গাদা পাতার নিচের সবুজ আবরণের বিশেষ ক্ষতি করে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে ডিম ফুটে ছোট ছোট কীড়া বেরোয়। এদের শূককীট



লেদা পোকা

- (১) লেদা পোকাকর আক্রান্ত ধানগাছ; (১ক) প্রজাপতি বিশ্রাম করছে; (১খ) ডিম; (১গ) শূককীট পাতা খাচ্ছে; (২) একটি ডিম—অনুবীক্ষণে; (৩—৫) শূককীট—ছোট থেকে বড় পর্যন্ত বিভিন্ন অবস্থায়; (৬) পুত্তলি; (৭) প্রজাপতি; (৮) প্রজাপতি ডানা ছাড়িয়ে আছে।

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

অবস্থা থাকে প্রায় তিন সপ্তাহ। পূর্ণ হুটপুট শূককীট প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা হয়। দিনের বেলা এরা খোঁড়া মাটির তলায় অথবা মাটির ফাটলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আর রাতের বেলা বেরিয়ে এসে কচি গাছের পাতা ডাঁটা সব খেয়ে শেষ করে। পূর্ণদেহ শূককীট মাটির মধ্যে পুত্তলি বাঁধে। পুত্তলির গায়ের রঙ বাদামী। পুত্তলি থেকে দিন-দশেকের মধ্যে এরা প্রজাপতি হয়।

দমনব্যবস্থা: এদের দমনের উপায়গুলো এখানে বলা হয়:

(ক) বীজতলায় লেদা পোকাকর কীড়ার আক্রমণ হ'লে, যদি দেখা যায় যে, কীড়াগুলো কচি বয়সের, তা হ'লে জল দিয়ে বীজতলা ভাসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ভাসা জলের সঙ্গে একরপিছু জমিতে চার পাইট ক'রে কেরোসিন তেল মিশিয়ে দিলে আরও ভাল হয়।

(খ) বীজতলা ঘিরে উঁচু-ধারওয়ালা সরু নালা তৈরি ক'রে দেওয়া যেতে পারে।

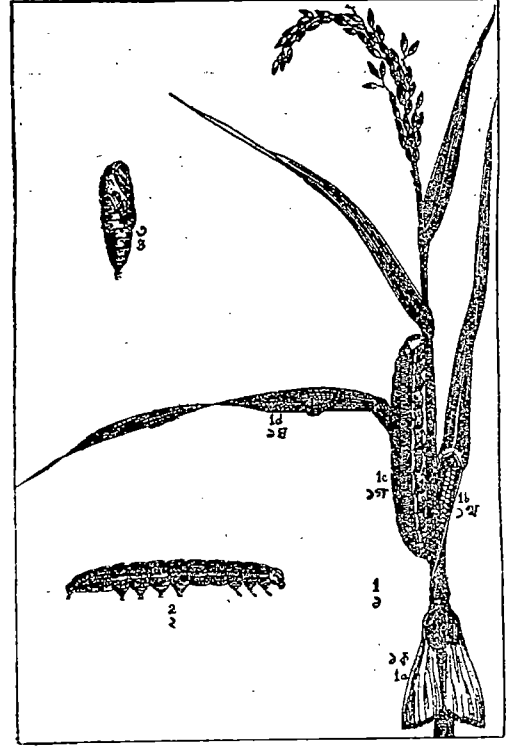
(গ) প্রবল আক্রমণের সময় বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে ৫ শতাংশ শক্তির 'বি-এইচ-সি' গুঁড়ো একরপিছু ১৫ থেকে ২০ পাউন্ড ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

কাটুই পোকা

ধানের প্রধান শত্রুকীটদের মধ্যে কাটুই পোকা একটি। তবে, সৌভাগ্য যে, এদের আক্রমণ হয় মাঝেসাঝে। ভারতের সব ধানী এলাকাতেই এ পোকা দেখা যায়। লেদা পোকাকর মত এ পোকাও দল বেঁধে অগুন্নি হঠাৎ ধানের ক্ষেতে দেখা দেয়; তাই এদেরও পরিচয় 'বাহিনী পোকা'। সাধারণত প্রবল বৃষ্টি হ'লে অথবা আর্শঙ্কিত সময়ের আগেই বন্যা হ'লে, তার পরে এ পোকাকর আবির্ভাব হয়। অক্টোবর-নবেম্বর মাসেই এদের আক্রমণ প্রবল হয়ে দাঁড়ায়। এদের ক্ষতির অভিযানের কাল স্বল্প-স্থায়ী।

কাটুই পোকাকর প্রজাপতির গায়ের রঙ ফিকে বাদামী। এরা দলে দলে সাধারণত পাশাপাশি

দুটো সারিতে ডিম পাড়ে। একটি প্রজাপতি ৫০০ থেকে ৬০০ পর্যন্ত ডিম পাড়ে। ডিম গোলাকার



কাটুই পোকা

(১) কাটুই পোকাকর আক্রান্ত ধানগাছ; (২ক) প্রজাপতি বিশ্রাম করছে; (২খ) ডিমের সারি; (১গ) ও (১ঘ) শূককীটে গাছের ডাঁটা আর পাতা খাচ্ছে; (২) পূর্ণাঙ্গ শূককীট; (৩) পুত্তলি।

এবং সবজিতে সাদা রঙের। শূককীটের রঙ ঘষা-সবুজ। এরা খোঁড়া-মাটির তলায় বা মাটির ফাটলের মধ্যে দিনের বেলা লুকিয়ে থাকে এবং রাতের বেলা বেরিয়ে এসে ফসলের সর্বনাশ করে। পূর্ণ হুটপুট শূককীট প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা হয়। এরা মাটিতে পুত্তলি বাঁধে এবং দেড় থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রজাপতি হয়ে ওঠে।

দমনব্যবস্থা: কাটুই পোকাকর উপদ্রব কমানোর জন্য যেসব ব্যবস্থা করা যেতে পারে, এখানে তা বলা হ'ল:

(ক) যে ক্ষেতে এদের আক্রমণ হয়েছে, তার ধান কাটা হয়ে গেলেই লাঙল দিয়ে মাটি চ'ষে দিতে

হবে। তাতে পুতুলি বা কীট অবস্থায় অনেক পোকা নষ্ট হবে। মাটি চষা হ'লে অনেক পোকা উপরে উঠে আসবে এবং পাখিরা তাদের খেয়ে ফেলবে।

(খ) ক্ষেত ছেয়ে ঘাস ছড়িয়ে রাখলে পোকাগুলো দিনের বেলায় তার মধ্যে আশ্রয় নেবে; তারপর ঘাসগুলো তুলে এনে পোকাগুলিকে মেরে ফেলা যায়।

(গ) ৪ শতাংশ শক্তির 'বি-এইচ-সি' গুঁড়ো একরপিছ ১৫ থেকে ২০ পাউন্ড ছড়িয়ে দিলে ভাল হয়। সন্ধ্যাবেলা ছড়াতে হবে। রাতের বেলা মাটির তলা বা ফাটল থেকে বেরিয়ে এলে পোকা-গুলো এই ওষুধে নষ্ট হবে।

গাঁধি পোকা

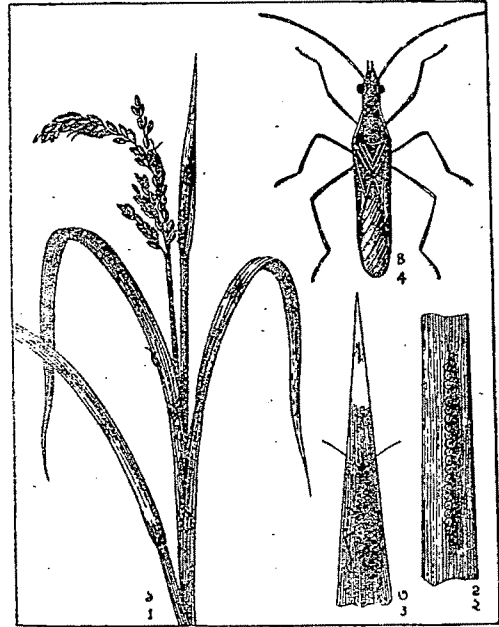
গাঁধি পোকা যে শুধু ধানের ক্ষেতেই আক্রমণ চালায় তা নয়। শাকসবজির উপরও এদের সমান লোভ। গৃহস্থের সবজিবাগান প্রায়ই এদের দেখা যায়। তাই এ পোকা পল্লী-অঞ্চলে সকলেরই পরিচিত।

এক এক সময় এ পোকাকার আক্রমণ এমন ব্যাপক আর ভয়ানক হয়ে দাঁড়ায় যে তাতে বিস্তীর্ণ এলাকার সব জমির সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যায়। কাঁচি ধানের ভিতর দানা গুঁড়ে ওঠার প্রথম অবস্থায় দূধের মত যে কোমল জিনিসটা জন্মে, এ পোকা তা চুষে খেয়ে নেয়, কাজেই ধানের ভিতর দানা হয় না—সমস্ত ধান চিটে হয়ে যায়। তার ফলে সমস্তটা অণ্ডল জুড়ে দেখা দেয় অনটন। বাজরা, ভুট্টা, গম, যব প্রভৃতির ক্ষেতেও এদের দেখা যায়।

গাঁধি পোকা সরু, লম্বা, পাতলা আর তার রঙ হচ্ছে ঘষা সবুজ ধরনের, তাই পাতার নিচের পিঠে যখন বসে থাকে তখন সহজে এরা নজরে পড়ে না। দিনের ঠান্ডা সময়টাতে অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় এরা আক্রমণ চালায় আর গরম সময়টাতে আশ্রয় নেয় ছায়াতে। এদের গায়ে একটা জঘন্য বদ গন্ধ আছে; তাই এদের নাম 'গন্ধী' পোকা—তা থেকে

গাঁধি পোকা। এ পোকা ক্ষেতে লাগলে, এই বদ গন্ধের দরুন দূর থেকেই টের পাওয়া যায়। এদের মূখে ছুঁচালো একটা শোষক অঙ্গ আছে, তার সাহায্যে এরা যে-কোন শস্যেরই ভিতরের কোমল পদার্থ খেয়ে ফেলে; তার ফলে শস্য পরিণতি লাভ করার আগেই শুকিয়ে যায়। এ পোকা ঘাসের মধ্যে থাকলে, এদের গায়ের ওই খারাপ গন্ধের দরুন গোরু-ছাগলে পর্যন্ত তাতে মূখ দেয় না।

এরা পাতার উপর মালার মত সারি দিয়ে ডিম পাড়ে—একবারে ১৫ থেকে ২০টা পর্যন্ত। সময় সময় দু'-তিন সারিতেও সাজানো হয় ডিমগুলো। ডিম লম্বাটে গোল, চ্যাপটা আর একটু চ্যাপ-দেওয়া মত। এরা ডিম পাড়ে রাতের বেলা। ডিমগুলো পাতার গায়ে শক্তভাবে এঁটে থাকে। ছয় থেকে



গাঁধিপোকা

(১) ধানগাছের পাতায় কতগুলো বাচ্চাপোকা বসে আছে; দু'টি বড় পোকা ছড়ার ধানে লেগেছে; (২) ডিমের সারি—মালার মত; (৩) আধাবয়সী বাচ্চা-পোকা; (৪) পূর্ণদেহ গাঁধিপোকা।

আট দিনের মধ্যে ডিম ফুটে খুব ছোট ছোট বাচ্চা বেরোয়। এদের শৈশবকাল দু' সপ্তাহ কি তার

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

চেয়ে কয়েক দিন বেশি এবং জীবনবৃত্ত সম্পূর্ণ হয় চার থেকে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে। উত্তরভারতে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে আর দক্ষিণ ভারতে নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে গাঁধিপোকাকার আক্রমণ প্রবল হয়ে ওঠে। পরিণত বয়সে এরা জড়সড়ভাবে শীতকালটা কাটায়, তার পরে বসন্তকাল এলে, খাবার যদি জোটে তা হ'লে বংশবৃদ্ধিতে রত হয়। সাধারণ আবহাওয়ায় এদের পাঁচ বার পর্যন্ত ডিম পাড়তে দেখা যায়।

দমনব্যবস্থা: এক-একটা গোটা এলাকা জুড়ে এদের দমনের ব্যবস্থা করা দরকার। তার জন্য এ উপায়গুলো প্রয়োগ করা যেতে পারে:

(ক) ক্ষেতের আল এবং তার কাছাকাছি সব জায়গা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার রাখতে হবে।

(খ) আক্রমণ যখন প্রবল হয়, তখন ক্ষেতের ধারে আবজনা পোড়ালে আর ক্ষেতে ধোঁয়া দিলে পোকা দূর হয়ে যাবে।

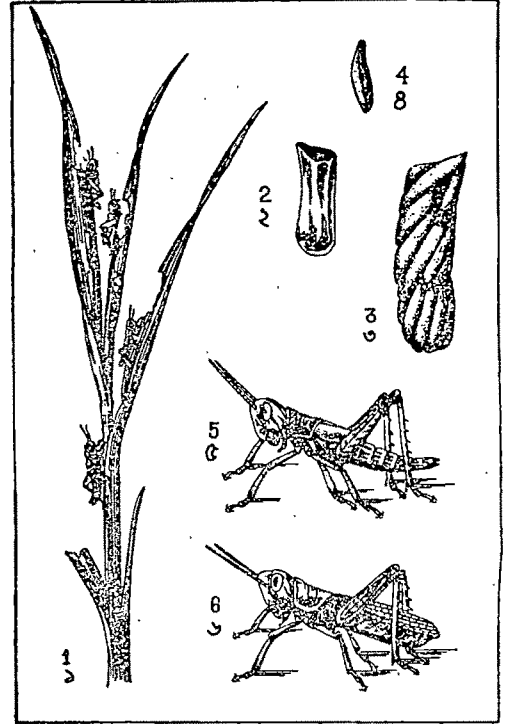
(গ) হালকা একটা লম্বা বাঁশ দৃ'জনে দৃ'মাথায় ধরে আলগোছে ধানগাছের উপর ছুঁইয়ে আড়া-আড়িভাবে টেনে নিয়ে গেলে, বাচ্চা-পোকাগুলো নিচে জলে পড়ে মরে যাবে। বাচ্চাগুলো বড়ই কোমল—সামান্য উপদ্রবও তাদের দেহে সন্নিবিষ্ট না।

(ঘ) বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে শতকরা ৫ শক্তির 'বি-এইচ-সি' গুঁড়ো ক্ষেতে ছড়ানো যেতে পারে। বসন্তকাল যেসব জায়গায় একটু আগেভাগে আসে, সেসব এলাকায় ধানী জমির আশপাশে বুনোঘাসের উপরও এই গুঁড়ো ছড়ালে ভাল হয়।

ফড়িঙ

ভারতের ধানী এলাকার সব জায়গাতেই ফড়িঙ দেখা যায়। এরা জোয়ার, বাজরা, ঘাস প্রভৃতিতেও আক্রমণ চালায় এবং সাধারণত স্যাঁতসেঁতে পতিত জমিতে থাকতে পছন্দ করে। প্রতি বছরই এদের দেখা যায়, তবে কোন কোন বছর এদের আক্রমণ প্রবল হয়ে ওঠে এবং তাতে ফসলের খুব ক্ষতি হয়। বাচ্চা, ধাড়ি সব ফড়িঙই ধানগাছের কচি পাতা খায়, তা ছাড়া গাছে শীষ এলে তার কচি ধানও খায়

এরা। ক্ষেতের আলের ধারে দু'-তিন ইঞ্চি মাটির নিচে এরা ডিম পাড়ে। ডিমগুলো থাকে ছোট একটা থ'লের মত শক্ত আবরণের মধ্যে। এরকম তিন-চারটে থ'লেতে করে এরা দেড়শ' পর্যন্ত ডিম পাড়ে। ডিমগুলো লম্বামত এবং হলদেটে রঙের। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এদের ডিম পাড়ার সময়। বর্ষাকাল পর্যন্ত ডিমগুলো মাটির



ফড়িঙ

(১) বাচ্চা-ফড়িঙেরা ধানগাছের পাতা খাচ্ছে, (২) আবরণের মধ্যে ডিমের খোলো, (৩) ডিমের খোলার উপর থেকে ঢাকা খুলে নেওয়া হয়েছে, (৪) একটি ডিম, (৫) বাচ্চা-ফড়িঙ, (৬) পূর্ণাঙ্গ ফড়িঙ।

নিচে থাকে এবং জুন-জুলাই মাসে বর্ষা শুরু হ'লে ডিম ফোটে। সিকি ইঞ্চি আন্দাজ লম্বা বাচ্চা-ফড়িঙগুলো সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস পর্যন্ত ক্ষেতের আলের ঘাস খেয়েই বড় হয়, তার পরে তারা নেমে আসে ধানক্ষেতে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের আহারের মাত্রাও বেড়ে যায়, কাজেই এরা যত বেশি সংখ্যায় ক্ষেতে নামে, ফসলের ক্ষতি হয় তত বেশি।

পদ্মরূপ-ফড়িঙগুলোর বাচ্চা-বয়স দুই থেকে তিন মাস। স্ত্রী-ফড়িঙগুলোর শৈশব কাটে আড়াই থেকে তিন মাসে; তার পরে আরও সপ্তাহ-দুই বয়স হ'লেই তারা ডিম পাড়তে শুরুর করে। বছরে একবারই ফড়িঙের বংশবৃদ্ধি হয়। মাটির নিচে ডিম পাড়ে ব'লে এবং গাছে গাছে লাফিয়ে পাতা খায় ব'লে, এদের দমন করা খুব শক্ত নয়। এরা লাফিয়ে বা উড়ে ২০ থেকে ৩০ ফুটের বেশি যেতে পারে না ব'লেও এদের দমন করা সহজ হয়।

দমনব্যবস্থা: আবহাওয়ায় তাপের কমিবেশ, বাতাসের আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির দ্বারা এদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রিত হয়। বেশি বৃষ্টি হ'লে অথবা বর্ষাকালে মাঝে মাঝে বৃষ্টি না হ'লে এদের অনিষ্ট হয়। এদের দমনের জন্য এসব ব্যবস্থা করা যেতে পারে:

(ক) ক্ষেতে, বিশেষ করে ক্ষেতের ধারের বাঁধের ঢালুতে বা আলে গভীর করে লাঙল দিলে ফড়িঙের ডিম নষ্ট হয়ে যায়।

(খ) ৮০ থেকে ১০০ পাউন্ড ভূষি, ২ পাউন্ড সোডিয়াম ফ্লাউটসিলিকেট, ২ পাউন্ড গুড় ও দরকার-মত জল একসঙ্গে মিশিয়ে, সেই মিশ্রিত জিনিসটা গাছের পাতাগুলোর উপর ছড়িয়ে দিলে, তা খেয়ে ফড়িঙ ম'রে যায়।

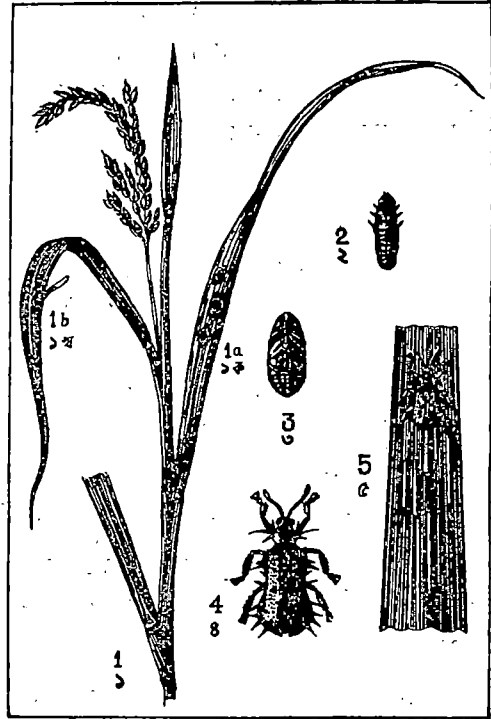
(গ) ৫ শতাংশ শক্তির 'বি-এইচ-সি' গুড়ো একরপিছুর দরকারমত ১০ থেকে ২০ পাউন্ড ছড়িয়ে দিলে ফড়িঙ মারা পড়ে। এরা বাচ্চা অবস্থায় যখন আলের উপরকার ঘাস খেয়ে বাঁচে, সেই সময় এই ওষুধ ছড়ালে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। ধানক্ষেতে এই ওষুধ ছড়াতে হ'লে বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া উচিত।

(ঘ) ধানক্ষেতে বিঘাপ্রতি ৩ থেকে ৫ সের গ্যামেসলিন, নিওসিড, হেলিক্ল্যান বা হেলিক্লডল ছড়িয়ে দিলে ফড়িঙ মরবে। ফড়িঙ বড় আকারের হ'লে, শতকরা ১০ শক্তির ওষুধ ছড়ানোই ভাল।

(ঙ) রাতে ক্ষেতের আশপাশে শুকনো আবর্জনা জড় করে আগুন জ্বালালে ফড়িঙগুলো তাতে পড়ে মরবে।

পামরি পোকা

প্রধানত ভারতের পূর্ব আর দক্ষিণ অঞ্চলে পামরি পোকার উপদ্রব দেখা যায়। এক এক সময় ফসলের ভয়ানক ক্ষতি করে এরা। আসাম, বাঙলা, মাদ্রাজ এবং উড়িষ্যা এ পোকা দেখা যায়। ভারতের অন্যান্য জেলার ধানক্ষেতে এদের কমই দেখা যায়। এ পোকা দেখতে গুবরে পোকার মত, তবে আকারে ছোট। এদের গায়ের রঙ নীলে



পামরি পোকা

(১ক) ধানগাছের পাতায় পামরি পোকার ডিম; (১খ) পাতায় বাচ্চা-পোকা লেগেছে; (২) পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা; (৩) পদ্মলির বৃকের দিকটা; (৪) পূর্ণাঙ্গ পোকা; (৫) বড় পোকা ধানগাছের পাতা কাটছে।

কালো, আর গায়ের উপরটা কাঁটায় ঢাকা। এ পোকার প্রবল আক্রমণে গাছগুলো শুকিয়ে যেতে পারে।

পাতার ডগার দিকে পামরি পোকা আলাদা আলাদা একটি করে ডিম পাড়ে। চার-পাঁচ দিনের

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

মধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। কচি বয়স থেকেই বাচ্চাগুলো পাতার উপরের আর নিচের আবরণের মাঝখানটা লম্বা আঁকাবাঁকা করে কেটে খেয়ে ফেলে। পনেরো দিনের মধ্যেই এদের জীবন-বৃত্ত পূর্ণ হয়। এরা বীজতলায় কচি চারারই ক্ষতি করে বেশি। বাচ্চা-কালে আর খাড়ি-বয়সে সব সময়ই এরা ফসলের অনিষ্ট করে।

দমনব্যবস্থা: সমস্ত মাঠ জুড়ে এসব ব্যবস্থা করলে বিশেষ সফল-পাওয়া যায়:

(ক) ধানের ক্ষেতে নেমে আসার আগে কিছুটা কাল এরা ঘাসের বনে কাটায়, কাজেই ধানক্ষেতের আশপাশে বুনোঘাসের জঙ্গলে শতকরা ৫ শক্তির 'বি-এইচ সি' গুঁড়ো ছড়ানো দরকার।

(খ) যে ধানক্ষেতে এ পোকের আক্রমণ দেখা যায় সেখানে বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে শতকরা ৫ শক্তির 'বি-এইচ-সি' গুঁড়ো একরপিছ ১৫ পাউন্ড ছড়াতে হবে।

(গ) গ্যামেস্ট্রিন, হেক্সাক্ল্যান বা হেক্সিডল গুঁড়ো ধানক্ষেতে বিঘাপ্রতি দেড় সের হারে ছড়িয়ে দিলে পোকা মরে যায়।

(ঘ) এক পোয়া কেরোসিন তেল ২ সের জলের সঙ্গে মিশিয়ে, তাতে একটা লম্বা পাটের দড়ি ভিজিয়ে, সেই দড়ি ধানগাছের উপর ছুঁইয়ে টেনে নিলে পোকা কমে যাবে।

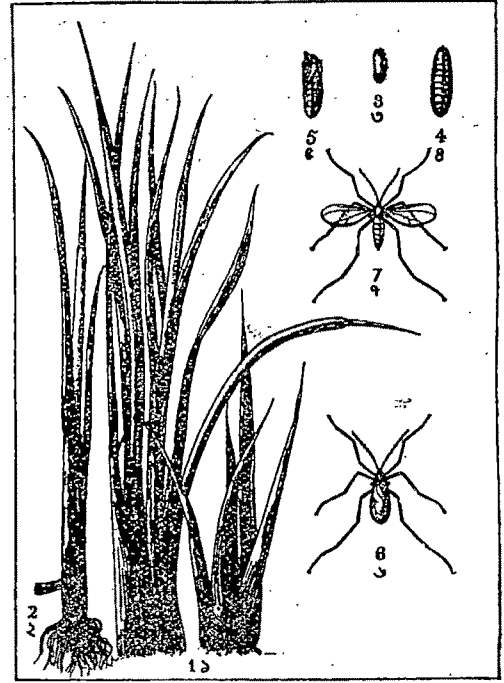
(ঙ) ক্ষেতের পাশের আল অথবা বাঁধ পরিষ্কার রাখতে হবে; সেখানে ঘাস গজালে, সেগুলো উপড়ে এনে গোরু-ছাগলকে খাওয়ানো চলে।

ভেঁপু পোকা

ভেঁপু পোকা মাঁছ জাতীয়। বাঙলা, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং মাদ্রাজে এরা ধানের অত্যন্ত ক্ষতি করে। মশার পায়ের মত লম্বা লম্বা পা আছে এ পোকের। এরা ক্ষীগজীবী।

ধানগাছের মাঝগাছের উপর ভেঁপু পোকা ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে যখন ছোট ছোট বাচ্চা বেরোয়,

সে সময়ে এদের পা থাকে না। সেই অবস্থায়ই বাচ্চাগুলি ধানগাছের গোড়ায় ফুটো করে ভিতরে ঢুকে পড়ে। তখন সেই ফুটোর জায়গাতে রূপোলি রঙের একটা দাগ হয়।



ভেঁপুপোকা

(১) আক্রান্ত করেকটি ধানগাছ, (২) আক্রান্ত গাছের গোড়ার ভেতরে পুত্তলি, (৩) ডিম-বড় করে দেখানো হয়েছে, (৪) শূককীট, (৫) পুত্তলি, (৬) পূর্ণাঙ্গ পোকা বসে আছে, (৭) পূর্ণাঙ্গ পোকা উড়ছে।

দমনব্যবস্থা: ভেঁপু পোকা ধানগাছের ভিতরে ঢুকে সেই গাছ খায়; তখন আর তাদের নাগালে পাওয়া শক্ত। কাজেই এ পোকা যাতে ক্ষেতে আস্তানা গাড়তেই না পারে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। কতকগুলো উপায়ের কথা এখানে বলা হ'ল:

(ক) ক্ষেতের চারদিকের আল অথবা বাঁধ পরিষ্কার রাখতে হবে। ক্ষেতের আশপাশের সব বুনোঘাস তুলে এনে গোরু-ছাগলকে খাওয়ানো চলে।

(খ) আলোকফাঁদ পেতে ধাড়ি পোকাগুলোকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করা যায়।

ছোট ফড়িঙ

এ ফড়িঙও ভারতের প্রায় সব জায়গাতেই দেখা যায়। এদের দিয়ে ফসলের বড় রকমের কোন ক্ষতি হয় না। ক্ষেত থেকে ধানগাছ কেটে নিয়ে যাবার পরে যে গোড়া পড়ে থাকে, এরা সাধারণত তার মধ্যে ডিম পাড়ে। কখনও কখনও ক্ষেতের আলো বা বাঁধের উপরও ডিম পাড়ে এরা। ঋতুভেদে এক থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। সাধারণত এরা ঘাসের পোকা, কিন্তু নাগালের মধ্যে ঘাস না পেলে এরা ধানক্ষেতেই নেমে পড়ে। আগে যে ফড়িঙের কথা বলা হয়েছে, এরাও ফসলের সেই ধরনেরই ক্ষতি করে। সেই ফড়িঙের দমনের জন্য যেসব ব্যবস্থা করা দরকার, ছোট ফড়িঙকে দমন করতেও সেইসবের সাহায্য নিলেই চলে।

ছোট পামরি

এও গুবরে পোকার ধরনের ছোট আকারের আর-এক রকমের পোকা। সময় সময় এরা ফসলের খুবই ক্ষতি করে। পামরি পোকা আর এই ছোট পামরির জীবন-ইতিহাস একই ধরনের। অনেক সময় পামরি পোকার সঙ্গেই এদের দেখা যায়। বাঙলা অঞ্চলে এদের বড় একটা দেখা যায় না, দক্ষিণ-ভারতেই দেখা যায় বেশি। ঠান্ডা আব-

হাওয়ায় আর প্রচুর বৃষ্টিপাতের জায়গায় এরা ফসলের ভয়ানক ক্ষতি করে। পামরি আর ছোট পামরি দু'রকম পোকার দমনব্যবস্থা একই।

চোষী বা দেওয়ালী পোকা

এ পোকার গায়ে ফোঁটা ফোঁটা দাগ আছে। এক এক সময় এরা ধান-ফসলের ভীষণ ক্ষতি করে। তবে, মড়কের আকারে এর আক্রমণ কমই দেখা যায়। এদের বাচ্চা আর ধাড়ি সব পোকাই নতুন কচি পাতার রস চুষে খায়, তার ফলে চারাগাছগুলি ফিকে বাদামী রঙ ধরে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। ধানগাছ বড় হলে যখন তার শীষ বেরোয়, এরা তাতে আক্রমণ চালায়। গরমের সময় ঘাসের উপর এ পোকা প্রচুর দেখা যায়। এই পোকা পাতলা জালি আবরণের মধ্যে ২০-২২টা থেকে প্রায় ৪০টা পর্যন্ত ডিম পাড়ে। ডিমের রঙ ফ্যাকাশে হলদে। ১২ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে এদের জীবনবৃত্ত সম্পূর্ণ হয়।

দমনব্যবস্থাঃ (ক) আলোকফাঁদ পেতে বড় পোকাগুলোকে মেরে ফেলা যায়।

(খ) বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে শতকরা ৫ শক্তির 'বি-এইচ-সি' গুঁড়ো একরপিছুর কমবেশি ১৫ পাউন্ড হারে ছড়ানো যেতে পারে।

(গ) গ্যামেস্ট্রিন, হেক্সিডল অথবা হেক্সিক্ল্যান ধানক্ষেতে বিঘাপ্রতি দেড় সের ছড়ালে এ পোকা মারা পড়ে।



ধানের তিনটি রোগ

নানা রোগেরই আক্রমণ হতে দেখা যায় ধান-ফসলের উপর। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত তিনটি রোগেই ধানের ক্ষতি বেশি হয়ে থাকে। সেগুলি হচ্ছে: (১) চালদাগী [হেলিমিন্থোস্পোরিয়াম], (২) চিটেদাগী [পাইরিকুলেরিয়া] এবং (৩) শিকড়পচা।

নিচে এই রোগগুলির বিবরণ ও প্রতিকারের উপায় দেওয়া হল।

চালদাগী রোগ

ধানের সবচেয়ে খারাপ রোগ বোধহয় এটা। প্রায় সমস্ত ধানী অঞ্চলে প্রায় প্রতি বছরই এ রোগ দেখা দেয়।

এ রোগ হ'লে প্রথমে ধানগাছের পাতার খোলে এবং তারপরে পাতার গায়ে গাঢ় বাদামী রঙের ছোট ছোট লম্বাটে দাগ পড়ে। ক্রমে সেই দাগগুলি একটার সঙ্গে অপরটা জুড়ে গিয়ে বেশ লম্বা হয়ে দাঁড়ায়। গাছের ধানের গায়েও প্রথমে বাদামী রঙের দাগ হয়, পরে তা কালো ধরনের হয়ে দাঁড়ায়। দাগধরা ধানের চালেও বাদামী বা কালো দাগ হয় এবং চাল ভাল ক'রে মাজলেও সেই দাগ ওঠে না। এই রোগে আক্রান্ত ধান যদি বীজের জন্য রাখা হয়, তবে সেই বীজ থেকে যে গাছ জন্মায়, তাতেও এই রোগ হয়। ক্ষেতের মধ্যে আক্রান্ত গাছ থেকে এ রোগ সহজেই সূক্ষ্ম গাছে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রতিকার: রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

বোনার আগে 'অ্যাগ্রোসান জি-এন' নামক রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে বীজধান শোধন ক'রে নিতে হবে। এক মণ বীজধান শোধন করতে এ জিনিস মাত্র দু' ছটাক লাগে। শোধন করা অর্থে, 'অ্যাগ্রোসান জি-এন' ওষুধটা বীজধানের গায়ে বেশ ক'রে মাখিয়ে নিতে হবে। এই ওষুধ-মাখানো

বীজ দু'-তিন মাস পর্যন্ত ঘরে রেখে দিলেও তার কোন ক্ষতি হয় না।

'অ্যাগ্রোসান জি-এন' কিন্তু উগ্র বিষ। এ দিয়ে বীজ শোধন করার সময় এক টুকরো কাপড় দিয়ে নাক-মুখ জড়িয়ে বেঁধে নেওয়া দরকার—যাতে নাকে-মুখে এ গন্ধুড়ো ঢুকতে না পারে। ভিজা হাতে, অথবা হাতে কোন ঘা থাকলে সেই হাত দিয়ে এ ওষুধ নাড়াচাড়া করা উচিত নয়।

বীজ শোধনের সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা এভাবে করা যেতে পারে: একটি টিনের ড্রামের দু'দিকে ঠিক কেন্দ্রস্থলে ফুটো ক'রে একটি ডান্ডা এফোড়-ওফোড় ক'রে এঁটে নিয়ে তার এক দিকে হাতল লাগিয়ে কাঠের দাঁড়ের ওপর বসাতে হয়; সেই ড্রামের মধ্যে ধান এবং ওষুধ পুরে, ড্রামটি বেশ ক'রে ঘোরালেই ধানের গায়ে ওষুধ ভালভাবে লেগে যাবে।

চিটেদাগী রোগ

এও ধান-ফসলের একটি মারাত্মক রোগ। বীজ-তলায় ধানের চারাতে এবং ক্ষেতে রোয়া-লাগানো ধানের চারাতে এ রোগের আক্রমণ বেশি হয়। জোলা আর ঠান্ডা আবহাওয়ায় এ রোগ বেশি ছড়ায়।

এ রোগ হ'লে ধানগাছের ডাঁটায় ও পাতায় বাদামী রঙের দাগ হয় এবং কয়েকদিনের মধ্যেই সেই দাগের মাঝখানটা ছাইরঙ ধ'রে ওঠে। শীঘ্রই পাতা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং ঝুলে পড়ে। গাছের সবচেয়ে উঁচু গাঁটে এ রোগের আক্রমণ হ'লে তার মাথার ধানের শীষটিও ঝুলে পড়ে এবং বিবর্ণ হয়ে যায়। সেই শীষের ধানগুলোর মধ্যে চাল থাকে না—ধানগুলি চিটে হয়ে যায়।

প্রতিকার: এ রোগে আক্রান্ত গাছের ধান বীজের জন্য রাখা চলবে না। কেননা, সেই বীজ থেকে যে গাছ জন্মাবে, সেই গাছেও এ রোগ হবে।

বোনার আগে 'অ্যাগ্রোসান জি-এন' দিয়ে ধানবীজ শোধন ক'রে নিতে হবে।

শিকড়পচা রোগ

এ রোগ তেমন ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালায় না, কিন্তু ধান-ফসল প্রায়ই এ রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

এ রোগ হ'লে প্রথমে পাতার রঙ ফিকে হয়ে যায় এবং ক্রমশ গাছ উপর থেকে নিচের দিকে বিবর্ণ হয়ে শূন্য হয়ে যেতে থাকে।

প্রতিকারঃ যে ক্ষেতে এ রোগ দেখা দেয়, তার ধান কেটে নিয়ে যাবার পরে ধানগাছগুলোর মূল-দেশে এ রোগের জীবানু থেকে যায়। সেই ক্ষেতে নতুন ধান লাগালে তাতে এ রোগের আক্রমণ হবে। কাজেই, যে-ক্ষেতে এ রোগের আক্রমণ হয়েছে, তার ধানগাছ কাটা হয়ে যাবার পরে সেই ক্ষেতে লাঙল দিয়ে সমস্ত ধানগাছের গোড়াগুলি তুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।



‘বেয়ার’এর পোক। ও রোগ দমনের ঔষধগুলির
দ্বারা আপনাদের ফসল রক্ষা করুন

ফলিডল-ই ৬০৫

মেটাসিস্টকুস্

সেরেসান

অ্যাগালল

কুপ্রাভিট (ওবি ২১)

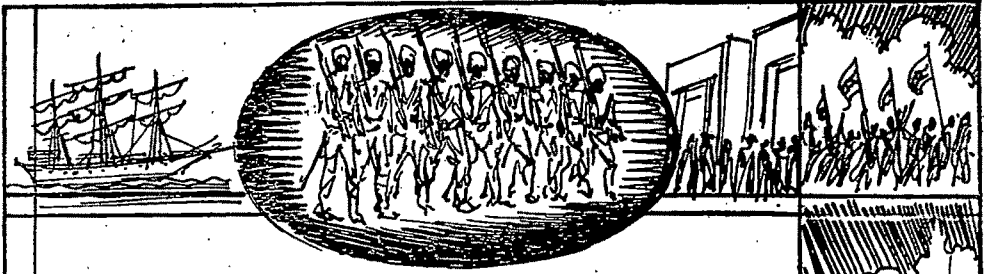
এইগুলি পশ্চিম জার্মানীর লিভারকুসেনের
ফারবেনফ্যাবরিকেন বেয়ার
দ্বারা প্রস্তুত আসল ঔষধ।

ভারতে পরিবেশক

চিকা প্রাইভেট লিমিটেড,

৩১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২





১৮৫৭-১৯৫৭

যে মুহুর্তে আমরা স্বাধীনতা হারাই, ঠিক তখন থেকেই আবার নতুন করে লড়াই
স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম।
এ সংগ্রাম বিভিন্নরূপে নানা পর্যায়ে দেখা দিতে পারে।
সিপাহী বিদ্রোহ এই সংগ্রামের একটি উজ্জল উদাহরণ।
১৮৫৭ সালে এই বিদ্রোহের সূচনা হয়।

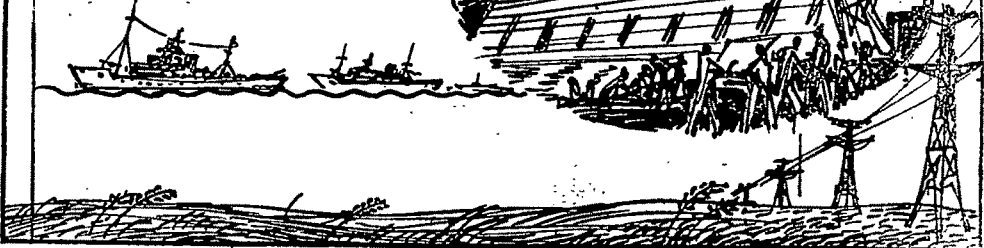
পরবর্তী একশো বছর ধরে যে সকল দেশভক্তবীর, চিন্তানায়ক বণিবী
এবং সমাজ সংস্কারক স্বদেশবাসীর সেবার আত্মনিয়োগ করেছেন,
তাঁদের স্মরণ করবার উপযুক্ত এবং পবিত্র স্মরণ হিসেবে ১৯৫৭ সাল
আমাদের সামনে উপস্থিত।
আমাদের আজকের স্বাধীনতা তাঁদেরই সংগ্রামের ফল।

স্বাধীনতা অর্জনের পর যতাবতই সংগ্রাম অস্তরূপ পরিগ্রহ করে।
তখন অভিযান চলে রোগ, দুঃখ, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে।
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে সমস্ত বীর নায়কের আমরা সন্ধান পাই,
তাঁদের মত নেতা হয়ত আজ অল্পশিখিত।

কিন্তু বর্তমান সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন, সাধারণ মানুষ।
যাঁরা অধিক ঋণ, সকলের বাসস্থান, নতুন যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য
অবিরত সংগ্রাম করে চলেছেন।
এঁদের লক্ষ্য হ'ল আমাদের মত মহান জাতি
যাতে বাস্তবিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে।

তাই আজকের এই দিনে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি
স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই সব নায়কদের প্রতি
এবং সেই সব মানুষের প্রতি যারা নতুনভাবে
দেশ গঠনের জন্য মাঠে মাঠে ; কল-
কারখানায় ; দপ্তরে এবং জীবনের অন্যান্য
ক্ষেত্রে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন।

স্বাঃ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়



নারকেলগাছের রোগ আর পোকা

নানা রকম রোগ হয়ে আর পোকা লেগে নারকেল-গাছের বড়ই ক্ষতি করে। কোন কোন রোগের বা পোকার আক্রমণে সময় সময় নারকেলগাছ ম'রেও যায়। নারকেলের চারা জন্মিয়ে তাকে লাগাবার উপযোগী করতে দু'-তিন বছর কেটে যায়। পশ্চিম বাঙলায় চারা লাগাবার ছ'-সাত থেকে দশ-বারো বছর পরে গাছে ফল ধরতে শুরু করে। একটা গাছ ৫০-৬০ বছর ফল দেয়। এমন একটি গাছ যদি অকালে ম'রে যায়, সে-ক্ষতি অপূরণীয়। রোগে বা পোকায় ধ'রে গাছকে দুর্বল ক'রে ফেললে, তাতে ভাল ফল হয় না, ফলনও কম হয়। সেটাও বিরাট লোকসান।

এখানে নারকেলের কয়েকটি রোগ আর পোকা সম্বন্ধে বলা হ'ল, সেইসঙ্গে তাদের দমনের উপায়ও ব'লে দেওয়া হ'ল। প্রথমে রোগের কথা বলা যাক।

কুঁড়িপচা [Bud rot—*Phytophthora palmivora*]:

এটা নারকেলগাছের এক মারাত্মক রোগ। এ রোগের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে গাছের মাথায় সবচেয়ে কাঁচ পাতাগুলোর মাথা শুকিয়ে যাওয়া। পাতাগুলো প্রথমে ধোঁয়ালে বাদামী রঙ ধ'রে ওঠে, ক্রমে বেঁকে পড়ে আর বাদামী রঙটা গাঢ় হয়ে যায়, অবশেষে পাতাগুলো গোড়ার দিকে ভেঙে পড়ে। কাঁচ পাতার গোড়া প'চে যায় এবং কখনও কখনও তা থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। পচন চার পাশের পাতায় ছড়িয়ে পড়তে পারে—আক্রান্ত পাতাগুলো তাতে হলদে হয়ে যায়।

এ রোগ ভিতরে ছড়িয়ে প'ড়ে মাঝখানের কুঁড়িটিকে নষ্ট ক'রে ফেলে; তখন গাছের বাড় বন্ধ হয়ে যায়। অনেক সময় পুরানো পাতার গোড়াতেও বাদামী রঙের বসামত দাগ ধ'রে ওঠে এবং তা ক্রমশ ভিতরের কুঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে

থাকে। সকল বয়সের গাছই এ রোগে আক্রান্ত হ'তে পারে। বর্ষাকালে বাতাসের বাহনে এবং সম্ভবত পোকামাকড়ের দ্বারাও এ রোগ এক গাছ থেকে অপর গাছে ছড়িয়ে পড়ে।

কুঁড়িপচা রোগ দমনের জন্য এসব ব্যবস্থা করা যেতে পারে:

(ক) রোগের যদি প্রাথমিক অবস্থা হয়, যদি শুধু পাতার বাহিরের আবরণটা আক্রান্ত হয়ে থাকে, তা হ'লে সেই পাতার বালদোটা কেটে ফেলে দিতে হবে। তার পরে গাছের মাথায় ১ শতাংশ শক্তির বোর্দো-মিশ্রণ ছড়িয়ে দিতে হবে।

(খ) রোগ যদি অনেকটা ছড়িয়ে প'ড়ে থাকে এবং গাছের বাঁচার আশা না থাকে, তবে গাছের গোটা মাথাটাই কেটে পুড়িয়ে ফেলা উচিত।

(গ) আশপাশের গাছে যাতে এ রোগ ছড়াতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে সুস্থ গাছগুলোর মাথায় ১ শতাংশ শক্তির বোর্দো-মিশ্রণ ছড়িয়ে দিলে ভাল হয়। অথবা, একটা সিগারেটের টিন ভর্তি তুঁতে, চুন এবং লবণের (১ : ৩ : ৫) মিশ্রণ সুস্থ গাছগুলির প্রতিটির মাথায় ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

মাহালি বা ফলপচা এবং নারকেল-পড়া [Mahali or Fruit rot and Nut fall—*Phytophthora palmivora*]

এ রোগ হয় 'ফাইটফথোরা পামিভোরা' নামক এক রকম ছত্রাক থেকে। একেবারে ঝুনো হয়ে গেলে নারকেল সাধারণত গাছ থেকে ঝ'রে পড়ে; কিন্তু এ রোগ হ'লে তার আগেই, এমনকি কাঁচ অবস্থায়ও নারকেল প'ড়ে যায় গাছ থেকে। বর্ষার পরে এ রোগের প্রকোপ বেশি হয়। এই রোগে আক্রান্ত নারকেলের মূখে বাদামী রঙের পচন ধরে। ছত্রাকের সাদা আঁশের জাল দিয়ে পচনধরা জায়গাটা

ঢাকা পড়ে যায়। এ রোগ হলে নারকেলের ভিতরের শাঁসও একেবারে পচে যায়। মাঝে মাঝে পুষ্পস্তবকের বোঁটা এবং নারকেলের বোঁটাও এ রোগে আক্রান্ত হয়। বাগানে সদুপরিগাছের সঙ্গে যে নারকেলগাছ রয়েছে, সাধারণত সেই গাছেই এ রোগ হতে দেখা যায়।

এ রোগের বিরুদ্ধে এসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে:

(ক) শতকরা ১ শক্তির বোর্দো-মিশ্রণ গাছের নারকেলের কাঁদিতে ছড়িয়ে দিলে এ রোগ হতে পারে না। মিশ্রণটা দু'বার ছড়াতে হবে—বর্ষা আরম্ভ হওয়ার ঠিক আগে জুন মাসে একবার এবং সেপ্টেম্বর মাস নাগাত বর্ষা থেমে যাবার পরে আর-একবার।

(খ) এ রোগের আক্রমণে গাছ থেকে যেসব নারকেল ঝরে পড়ে যায়, সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

গুঁড়ির রস ঝরা [Stem bleeding—*Caratostomella paradoxa*]:

এ রোগ হলে নারকেলগাছের গুঁড়িতে লম্বালম্বি ফাটল ধরে এবং তার ভিতর থেকে লালচে, বাদামী অথবা লোহার মরচের রঙের তরল পদার্থ বেরোয়। এই ফাটলগুলি লম্বায় আধ ইঞ্চি থেকে তিন ইঞ্চি বা তার বেশিও হতে পারে। দুটো বা তার বেশি ফাটল একসঙ্গে জুড়ে গিয়ে একটা অতি-লম্বা ফাটলে পরিণত হতে পারে। ক্ষতস্থান পুরানো হয়ে গেলে তা থেকে রস বেরনো বন্ধ হয়ে যায় এবং সেখানে গাঢ় বাদামী রঙের রস শুকিয়ে কালো হয়ে যায়। যে ফাটল থেকে রস বেরোচ্ছে তার নিচে কাটলে দেখা যায় যে, ভিতরের আঁশ পচে হলদে হয়ে গেছে। পরে আঁশ কালো হয়ে যায়।

গাছের গুঁড়ির যে-কোন জায়গায় এ রোগ হতে পারে, তবে বয়স্ক গাছের গুঁড়িতে সাধারণত নিচের দিকেই আক্রমণ দেখা যায়। সেখানে অনেক

ফাটল দেখা দেয়। গুঁড়ির উপরদিকে অপেক্ষাকৃত নরম অংশে ফাটল দেখা দেয় না। গাছের বয়স এবং পরিবেশ অনুসারে ক্ষতির পরিমাণ কম বা বেশি হয়। কম বয়সের নারকেলগাছ এ রোগে মারাও যেতে পারে, তবে এ রকম দুর্ঘটনা সচরাচর ঘটতে দেখা যায় না।

দমনের উপায়: রোগাক্রান্ত আঁশগুলি ধারালো যন্ত্র দিয়ে কেটে গাছের গুঁড়ি থেকে নিঃশেষে তুলে ফেলতে হবে। তার পরে আলকাতরা অথবা বোর্দো-আঠা দিয়ে প্রলেপ লাগিয়ে কাটা জায়গা ঢেকে দিতে হবে।

গুঁড়ি-পচা ও শিকড়-পচা [Trunk and root rot—*Ganoderma lucidum*]

এ রোগের বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে, পরিণত বয়সের বালদো শুকিয়ে ঝুলে পড়ে এবং ঝরে পড়ে যাবার আগে পর্যন্ত কয়েক মাস ধরে গাছের গুঁড়ি চেপে লম্বালম্বি ঝুলে থাকে। এতে ফুলের গুচ্ছে চাপ পড়ে বলে, গাছে নারকেল হয় না। নতুন যেসব পাতা বেরোয় সেগুলো ক্রমশ ছোট আর হলদে হতে থাকে। অবশেষে গাছের মাথার পাতার কুঁড়ি পচে শুকিয়ে যায়। গাছের গুঁড়ির নিচের দিক থেকে বাদামী রঙের আঠালো রস বেরোয়। এ রোগে গাছ ধীরে ধীরে দু'-তিন বছরে মরে যায়।

কমলা রঙের এক রকম ছত্রাক থেকে এ রোগ হয়। এই ছত্রাক দেখতে ব্যাঙের ছাতার মত এবং এর ডাঁটি বন্ধনীর মত বাঁকা। এ রোগে যে গাছ মারা গেছে তার গোড়াতে ছত্রাকের বীজবাহী অংশ জন্মায়।

দমনের ব্যবস্থা: যে গাছে রোগের আক্রমণ খুব বেশি রকম হয়েছে, সেই গাছ কেটে ফেলা উচিত। ছত্রাক গুঁড়ির গোড়ার দিকে এবং শিকড়ের মধ্যে থাকে; কাজেই মাটি খুঁড়ে গাছের মূল সমেত গুঁড়ি তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রোগ ধরা পড়লেই গাছটি কেটে, মূল সমেত উপড়িয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

সেই গাছের আশপাশে যেসব নারকেলগাছ রয়েছে, সেগুলোর গোড়ার জমিতে মিহি-গুড়ানো গন্ধক দু'-তিন পাউন্ড করে ছড়িয়ে দিলে, এ রোগের আক্রমণ হয় না বলে জানা গেছে।

সৌভাগ্য যে, এ রোগ সচরাচর হতে দেখা যায় না।

পাতা-পচা [Leaf rot]

এ রোগ হলে নারকেলগাছের ফলন খুব কমে যায়। দু'রকমের ছত্রাক থেকে এ রোগ হয়; তার একটার নাম “হেল্মিন্থস্পোরিয়াম হ্যালোডস্” [*Helminthosporium halodes*], দ্বিতীয়টির নাম “কলেকটোট্রিচাম্ প্যানিসেটাম” [*Collectotrichum Pancisetum*] এবং তৃতীয়টি হচ্ছে “গ্লাইওক্লাডিয়াম্ রোসিঅম্” [*Gliocladium roseum*] এর মধ্যে প্রথমটিই সবচেয়ে মারাত্মক।

এ রোগের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে, কয়েকটি কচি পাতার আগার দিক কালো হয়ে বলসে যায়। শূন্যকিয়ে গেলে এগুলো ভেঙে গুঁড়ো হয়ে বাতাসে উড়ে যায় এবং রোগাক্রান্ত পত্রশাখাগুলিকে দেখায় কতকটা পাখির পালকের মত। কচি পাতায় লালচে বাদামী রঙের ক্ষত দেখা দেয়। অবশেষে গাছের মাথা পচে নরম হয়ে যায়। এ রোগ ধীরে ধীরে বাড়ে। এর আক্রমণে গাছ মরে না, কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়ে বলে ফলন খুব কমে যায়। সাধারণত পঁচিশ বছরের কম বয়সের গাছে এ রোগের প্রকোপ বেশি হয়। চারাবাগানে রক্ষিত চারাগুলো সাধারণত এ রোগে আক্রান্ত হয় না। এ রোগের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি হয় বর্ষাকালে। দক্ষিণ ভারতের নারকেলগাছেই এ রোগের আক্রমণ বেশি হতে দেখা যায়।

দমনব্যবস্থাঃ শতকরা ১ শক্তির বোর্দো-মিশ্রণ গাছের মাথায় এবং পাতায় ছড়াতে হবে।

নারকেলবাগানে ভালভাবে নিড়েন দিতে হবে।

যথেষ্ট পরিমাণ পটাশী সার প্রয়োগ করলে নারকেলগাছে এ রোগ প্রতিবেধ করার শক্তি জন্মায়।

পাতা কমা বা পেন্সিল-ডগা [Little leaf or Pencil point]

নারকেলগাছ যেখানে জন্মেছে, সেখানকার মাটি বা আবহাওয়া যদি নারকেলগাছের উপযোগী না হয়, তবে এ রোগ হতে পারে। নারকেলগাছের বয়স যদি একেবারে চরমে পৌঁছে গিয়ে থাকে, তা হলেও হতে পারে এ রোগ।

এ রোগ হলে গাছের গুঁড়ির মাথার দিকের ঘের ধাপে ধাপে সরু হয়ে ওঠে, অবশেষে গুঁড়ি একেবারে কয়েক ইঞ্চি মাত্র সরু হয়ে যায়। পাতা সংখ্যার কমে যায় এবং আকারেও ছোট হয়ে পড়ে। রোগ বেশি হয়ে দাঁড়ালে, গাছের মাথার মধ্যে যে ফুলের গুচ্ছ হয় তা বাড়ে না। গাছ একেবারে মরণদশায় গিয়ে পৌঁছে।

অত্যধিক বয়সের দরুন যদি গাছে এ রোগ হয়, তা হলে তার আর কোন চিকিৎসা নেই। কম-বয়সী গাছের এ রোগ যদি আবহাওয়ার অনুপ-যোগিতার দরুন হয়ে থাকে, তা হলেও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু যদি মাটির দোষে নারকেলগাছের এ রোগ হয়, তবে গাছের গোড়ার চারদিককার মাটি খুঁড়ে সরিয়ে ফেলে, পুকুরের পাক, পাতাপচা সার, গোবরসার, ছাই প্রভৃতি দিয়ে সেই গর্ত ভরাট করে দিলে, গাছ তেজী হয়ে উঠতে পারে।

পাতা দাগী [Leaf blight or Leaf spot—Pestalozzia Palenarum]

এ রোগ হলে পাতার গায়ে ছোট ছোট হলদেটে রঙের দাগ হয়। এই দাগ ক্রমে খুঁসর হয়ে ওঠে এবং মাঝখানে কালো বিন্দুর মত দাগ হয়। এ রোগে গাছের বিশেষ কোন ক্ষতি হতে দেখা যায় না। সাধারণত এ রোগ হলে বোকা যায় যে, কোনদিক দিয়ে গাছের কিছু একটা অসুবিধা হচ্ছে

অর্থাৎ গাছ ঠিক অনুকূল অবস্থায় নেই। গাছের যথাযথ পুষ্টিবৃদ্ধি হ'লে এ রোগ সেরে যায়।

শিকড়ী রোগ [Root disease]

এ রোগের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে গাছের পাতা হলদে হয়ে ওঠে এবং বালদো ফুলে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে ভিতরদিকের পাতাগুলোতেও রোগাটে ময়লা হলদে রঙ দেখা দেয়। পাতাগুলো বাদামী রঙ ধরে ওঠে এবং আগার দিক থেকে শূকোতে শূক করে। পাতাগুলি পরপর তাড়াতাড়ি ঝরে যায়। গাছ যতই দুর্বল হয়ে ওঠে, নতুন-গজানো পাতাগুলির আকার ততই ছোট হ'তে থাকে।

এ রোগের প্রথম দিকের আর একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে কাঁচা অবস্থাতেই সমস্ত নারকেল ঝরে পড়া। পাতা হলদে হয়ে ওঠার আগেও নারকেল ঝরে যেতে পারে, অথবা তার পরেই ঝরে যায়। এ রোগে আক্রান্ত অবস্থায় গাছের ফুলের গুচ্ছে শ্রী-ফুলের সংখ্যা খুব কম হয় আর নতুন যেসব মূচি বেরোয় সেগুলো দুর্বল এবং আকারে ছোট হয়। এতে নারকেলের সংখ্যা কম হয়, আকার ছোট হয়, এবং তার শাঁস পাতলা হয়। কোপরা করতে গেলে সেই শাঁস ভাল শূকায় না এবং নরম থাকে ; তা থেকে নেওয়া তেলও খারাপ হয়।

এ রোগে আক্রান্ত গাছের শিকড় খারাপ হয়ে যায়। শিকড়ের উপরের ছাল বিবর্ণ হয়ে গাঢ় বাদামী রঙ ধরে ওঠে এবং স্তরে স্তরে শূকিয়ে যায়। সম্ভবত তিন রকমের ছত্রাক থেকে এ রোগ হয়, সেগুলো হচ্ছে—“বট্রাইওডিপ্লোডিয়া থিও-ব্রোমি” [*Botryodiplodia theobromae*], “রিজক্টোনিয়া বাটাটিকোলা” [*Rhizoctonia bataticola*] এবং “রিজক্টোনিয়া সোলানি” [*Rhizoctonia solani*]। বিশ্লেষণে এই ছত্রাকগুলো আলাদা-আলাদাভাবে পাওয়া গেছে। শিকড়ের বাদামী রঙ-ধরা ছাল অনুবীক্ষণযন্ত্র দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, ছত্রাকের শাখাপ্রশাখা এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে আছে।

গাছ যখন এই শিকড়ী রোগে আক্রান্ত হয় তখন গাছের নতুন নতুন শিকড় ছাড়ার ক্ষমতা কমে যায়। রোগ বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বছরই শিকড় ক্রমশ কম সংখ্যায় বেরোয়, গাছের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং অবশেষে গাছ মারা যায়। সব রকম জমির আর সকল বয়সের নারকেলগাছেরই শিকড়ী রোগ হ'তে দেখা যায়।

এ রোগ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে এখনও অনুসন্ধান চলছে, সুতরাং রোগ-দমনের উপায় এখনও সঠিক নির্ণয় করা যায় নি। তবে দেখা গেছে, ঠিকমত সার দিলে আর ভালভাবে পরিচর্যা করে গাছকে সুস্থসবল করে তুললে রোগ কমে যায়।

পোকা

এবারে পোকার কথা বলা যাক।

গন্ডারে বা গুবরে পোকা [Rhinoceros beetle—*Oryctes rhinoceros*]

যেসব পোকা নারকেলগাছের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে তার একটি হচ্ছে গন্ডারে পোকা বা গুবরে পোকা। এর আক্রমণ হ'লে গাছের ফলন খুব কমে যায়। এরা গাছের মাথায় আক্রমণ চালায় এবং গাছের নরম জায়গাগুলোতে, বিশেষ করে পাতার বালদো যেখানটাতে গাছের সঙ্গে লেগে থাকে সেখানে ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে পড়ে। আখোলা পাতার কুণ্ডিতে এবং সময় সময় পাতার বালদোর মাঝখানে ফুটো করেও এরা ভিতরে ঢুকে যায়।

ক্ষতির যে চিহ্ন সবার আগে নজরে পড়ে তা হচ্ছে ওইসব ছিদ্রের মুখ। আক্রমণ আরও বেশি হ'লে গাছের তলায় চিবানো ছিবড়ে এবং ডাঁটা পাতা প্রভৃতির টুকরো পড়ে থাকে। কোন নারকেলগাছের মাথা এ পোকার দ্বারা বেশি রকম আক্রান্ত হ'লে সেখান থেকে যেসব নতুন পাতা বেরোয় সেগুলো বিশেষ ধরনে কাটা থাকে এবং এ রকম গাছের মাথায় ফুলের গুচ্ছ দেখতে পাওয়া যায় না। আক্রমণ গুরুতর হ'লে গাছের গুঁড়িটা বেঁকে



নারকেল গাছের প্রধান
শত্রু গণ্ডারে পোকা

নিচে : গণ্ডারে পোকার
দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত
নারকেল গাছ



বিস্ত্রী হয়ে যায়। কমবয়সী গাছ এদের আক্রমণ সহ্য করতে পারে না এবং অনেক সময় মরে যায়। যেগুলো বেঁচে যায়, সেগুলোর মধ্যেও কোন কোন গাছের মাথা চিরকালের মত বিকৃত হয়ে যায়।

গন্ডারে পোকাকার রঙ গাঢ় বাদামী থেকে কালো পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের শরীর খুব মজবুত। শক্ত আবরণে শরীরের উপরটা ঢাকা থাকে। মাথার উপর শিঙের মত একটা অঙ্গ থাকে—যা দেখতে কতকটা গন্ডারের খাঁড়ার ধরনের; এজন্যই এদের গন্ডারে পোকা বলা হয়। স্ত্রী-পোকাকার শিঙ কিছুর ছোট হয় এবং শরীরের পেছনভাগে নিচের দিকে বাদামী রঙের শঙ্খের গোছা থাকে।

সাধারণত পচা গোবরের বা পচা আবর্জনার গাদায় এবং মরা নারকেলগাছের গুঁড়ির মধ্যে এই পোকা বংশবিস্তার করে। স্ত্রী-পোকা বছরের যে-কোন সময়ে ডিম পাড়ে। একটি পোকা তার জীবনকালের মধ্যে ডিম পাড়ে প্রায় দেড়শ। ডিম পাড়া হয় গোবরের গাদায় বা আবর্জনার গাদায় একটা একটা করে। ডিমের রঙ ঘিয়ে-সাদা। দশ থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। শূককীট গাদার পচা জিনিস খেয়ে তার মধ্যেই বাস করে। এরা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। শূককীট-অবস্থায় থাকে এরা তিন মাস থেকে কখনও কখনও ছয় মাস পর্যন্ত। পূর্ণপুষ্ট শূককীট বেশ মোটাসোটা আর দু'-তিন ইঞ্চি লম্বা হয়। কাদামাটির মধ্যেও এদের থাকতে দেখা যায়। গোবরের বা আবর্জনার গাদায় হোক অথবা কাদামাটিতেই হোক, উপর থেকে দু'-তিন ফুট নিচে এরা থাকে। শুখোর সময়ে বা বেশি গরম পড়লে আরও নিচে চলে যায়। গোবর বা আবর্জনার গাদার পাশে মাটির ফাটলের মধ্যে অথবা নারকেলগাছের গুঁড়ির ভিতরে চিবানো ছিবড়ের তৈরি কক্ষ এরা পুত্তলি হয়। পুত্তলির রঙ গাঢ় বাদামী। এ অবস্থায় মাসখানেক থাকার পরে এরা পূর্ণাঙ্গ পোকায় পরিণত হয়। এ পোকা প্রায় ২০০ দিন বাঁচে। বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার

পরে গন্ডারে পোকাকে গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। এরা উড়বার সময় বোঁওঁ করে একটানা আওয়াজ করে।

দমনব্যবস্থা: এ পোকা বিনাশ করার অস্ত্র হচ্ছে বিশেষভাবে তৈরি করা সিকি ইঞ্চি মোটা আর আড়াই ফুট আন্দাজ চওড়া একটা লোহার শলা। এই শলার এক মাথা ছুঁচালো আর বড়িশির মত বাঁকানো, এবং অন্য প্রান্তে ধরবার জন্য বাঁট অথবা ওই শলা বেঁকিয়েই আঁটা-করা। গাছের মাথায় এদের যে গর্তগুলো চোখের আড়ালে থাকে, এই শলার সরু বাঁকানো ডগা দিয়ে সেসব গর্ত খুঁজে পাওয়া যায়। গর্তের মধ্যে শলার বড়িশির মত ডগাটা ঢুকিয়ে দিয়ে পোকা বিঁধে টেনে বের করে মেরে ফেলতে হয়। তার পরে শূন্য গর্ত মাটি দিয়ে ভরাট করে দিতে হয়; তা না করলে সেই গর্তে এর শূককীট ঢুকে পুত্তলি বাঁধতে পারে। তা ছাড়া এসব ফাঁকা গর্তে লাল নারকুলে পোকা আশ্রয় নিতে পারে।

গোবরগাদা, আবর্জনার গাদা, পচা কাদা প্রভৃতি যেসব জায়গায় গন্ডারে পোকা ডিম পাড়ে এবং এদের শূককীট থাকে, তাতে 'বোঁজিন হেঞ্জা-ক্লোরাইড' ছিড়িয়ে দিতে হবে। এই রাসায়নিক পদার্থটি সাধারণত 'অ্যাগ্লোজাইড', 'হেঞ্জিডল', 'হেঞ্জিক্লোন' প্রভৃতি নামে বাজারে বিক্রি হয়।

এসব পচা গাদায় ১ শতাংশ শক্তির বি-এইচ-সি গুঁড়োও ছিড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। ৫ শতাংশ শক্তির বি-এইচ-সি গুঁড়ো বালির সঙ্গে মিশিয়ে নারকেল গাছের মাথায়, যেখানে গন্ডারে পোকাতে ছিদ্র করার সম্ভাবনা আছে সেখানে, ছিড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

লাল নারকুলে পোকা [Red Palm Weevil—*Rhynchophorus Ferrugineous*]

এই লাল পোকা সকল বয়সের নারকেলগাছেই আক্রমণ চালায়, তবে এদের আক্রমণে ৪ থেকে ১৫ বছর বয়সের গাছগুলোরই ক্ষতি হয় বেশি।

গুঁড়ির ভিতরেই এ পোকা ডিম পাড়ে ও তা থেকে বাচ্চা জন্মে। তারা গাছের ভিতরের আঁশ খেয়ে জীবনধারণ করে। গাছের মাথার কাছাকাছি জায়গার আঁশ খেয়ে যে-শুককীটগুলো বেড়ে ওঠে, তাদের দ্বারাই গাছের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়। এ পোকা গাছের ভিতরে একবার ঢুকতে পারলে এমন মারাত্মক ক্ষতি করে যে, সেই গাছটির বেঁচে থাকার আশা থাকে না।

আক্রমণের গোড়ার দিকে আক্রান্ত গাছ খুঁজে বের করা কঠিন। শেষের দিকে যেসব লক্ষণ দেখে তা বোঝা যায়, সেগুলো হচ্ছে—গাছের গুঁড়ির মাঝখানটা শুকিয়ে যায়; যে গর্তগুলো দিয়ে পোকা গাছের ভিতরে ঢোকে সেগুলো দেখা যায়—সেঁসব গর্তের মুখ দিয়ে আঁশ-চিবানো ছিবড়ে বেরিয়ে আসে; আক্রান্ত গাছের গুঁড়িতে কান পাতলে ভিতর থেকে পোকাকার দাঁত দিয়ে আঁশ চিবানোর শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

এ পোকা লাল রঙের, প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা। এর মাথার সামনের দিকে মাঝখানে নিচের দিকে বাঁকানো লম্বা এক শৃঙ্গ আছে। সেই শৃঙ্গ দিয়ে স্ত্রী-পোকা গাছের গুঁড়িতে ছোট ছোট গর্ত করে তার মধ্যে ডিম পাড়ে। অন্য জাতের পোকাকার (যেমন গুবরে পোকাকার) দ্বারা গাছের গায়ে যেসব গর্ত হয়েছে, লালপোকা তার মধ্যে ডিম পাড়তেই বেশি পছন্দ করে। একটি পোকা ৩০০ পর্যন্ত ডিম পাড়ে।

তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে শুককীট বেরিয়ে আসে। নবজাত শুককীটের রঙ সাদামত। পূর্ণ-বয়স্ক কীটগুলোর শরীর মজবুত ও মাংসল, মাথার রঙ বাদামী। গুঁড়ির ভিতরের নরম আঁশের মধ্যে ঢুকে এরা নানা দিকে সুড়ঙ্গ তৈরি করে এবং নরম পদার্থগুলো খায়। এক থেকে তিন মাসের মধ্যে এরা পূর্ণ আকারের শুককীটে পরিণত হয়। তখন এরা ছিবড়ে দিয়ে মোটা ডিমের মত গুঁটি তৈরি করে তার ভিতর পুস্তলি হয়। প্রায় এক মাস পরে পূর্ণ-অবয়ব লাল পোকা বেরিয়ে আসে

এবং প্রায় একশ' দিন বাঁচে। পুরুষ পোকাকার শৃঙ্গের পেছনে শৃঙ্গের গোছা থাকে।

লাল পোকাকার আক্রমণ মারাত্মক হলে নারকেল-গাছের কান্ড শুকিয়ে যায় এবং পরে গাছ মরে যায়। এ পোকাকার দমন করা বেশ কঠিন। এদের স্ত্রী-পোকা নারকেলগাছের ক্ষতের গর্তে ডিম পাড়তে পছন্দ করে; কাজেই এ পোকাকার নিরাপদে বসার মত কোন ক্ষত বা বাসের মত কোন গর্ত যাতে গাছের গায়ে না হতে পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, গুঁড়ারে পোকাকার তৈরি গর্তে লালপোকা ডিম পাড়ে। ধারণাটা সত্য বলেই মনে হয়। তাই গুঁড়ারে পোকা দমন করার পরে, গাছের গায়ে তাদের যেসব গর্ত থাকে সেগুলো ভরাট করে দিতে হবে। গুঁড়ারে পোকাকার তৈরি গর্তগুলো, এবং অন্য কোনরূপে গাছের গায়ে গর্ত হয়ে থাকলে সেগুলো পরিষ্কার করে, আলকাতরা মাখিয়ে, সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করে দিতে পারলেই ভাল হয়। গুবরুর আক্রান্ত গাছ কেটে নষ্ট করে ফেলতে হবে, সেইসঙ্গে তাতে যেসব লাল পোকা আছে সেগুলোকে ধ্বংস করতে হবে—যাতে তারা নতুন করে কোন গাছে আক্রমণ চালাতে না পারে।

কালোমাথা শৃঙ্গোপোকা [Black-headed Caterpillar—*Nephantis serinopa*, Meyr] :

এ পোকা নারকেলের শৃঙ্গোপোকা নামেও পরিচিত। ভারতের বহু অঞ্চলে এ পোকাতে নারকেলগাছের ক্ষতি করতে দেখা যায়। কোন কোন এলাকায় এ পোকা নারকেলগাছে বার বার আক্রমণ চালায়। এদের প্রজাপতি মাঝারি আকারের এবং ধূসর রঙের। এর শৃঙ্গোপোকা নারকেলগাছের পাতার ক্ষতি করে। ভারতের অনেক নারকেলী এলাকায় ইদানীং এ পোকাকার আক্রমণ মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমুদ্রকূলের বা খালবিলের ধারের নারকেলী এলাকায় এদের আক্রমণ হতে দেখা যায়। যে-গাছে আক্রমণ খুব বেশি হয়, দূর থেকে দেখলে

মনে হয় যেন তার পাতাগুলি ঝলসে গেছে। কখনও কখনও নিচের দিকের প্রায় দশ থেকে বিশটা বালদোই আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং মাঝখানের ডাঁটাটি শূন্য সবুজ থাকে; তার দু'দিকের পাতাগুলি সবই শূন্যকিয়ে যায়। এর ফলে গাছের ফলন প্রায়ই খুব কম যায়।

পাতার নিচের দিকে এ পোকাকার প্রজাপতি থোকায় থোকায় প্রায় দু'শ' থেকে তিনশ' ডিম পাড়ে। নতুন অবস্থায় ডিমের রঙ থাকে সাদাটে, কিন্তু বাচ্চা হওয়ার সময় হ'লে ডিমের রঙ হয়ে যায় পার্টিকলে। ডিম থেকে বেরিয়ে এসে শূন্যোপোকাগুলি পাতার সবুজ পদার্থটা কুরে কুরে খায়। রেশমের মত আঁশ দিয়ে পাতা জড়িয়ে এরা চোঙের মত ক'রে ফেলে এবং তার ভিতরে থেকে পাতার সবুজ আবরণটা খেতে থাকে। আক্রান্ত পাতাগুলো শূন্যকিয়ে যায়। অনেক পাতা আক্রান্ত হ'লে গোটা বালদোই শূন্যকিয়ে লালচে রঙ ধ'রে ওঠে। ছত্রিশ থেকে পঞ্চাশ দিনে এরা পূর্ণ শূন্যকীটে পরিণত হয় এবং তার পরে পাতার চোঙের মধ্যে পুত্তলি হয়। দশ-বারো দিন পরে প্রজাপতি বেরিয়ে আসে। সাধারণত গরমের কালেই এদের বংশবৃদ্ধি হয়।

এ পোকাকার দ্বারা আক্রান্ত বালদোগুলি কেটে গাছ থেকে নামিয়ে, পুড়িয়ে ফেললে, সেইসঙ্গে পাতার চোঙের ভিতরকার শূন্যোপোকাগুলোও ধ্বংস হয়।

কয়েক রকমের পোকা এই কালোমাথা শূন্যোপোকাকার প্রবল শত্রু। তার মধ্যে 'পেরথাইলিড' নামক বোলতা [*Perisierola nephantidis*] এবং 'ইউলোপ্লিড' নামক পরজীবী কীট প্রধান। উক্ত বোলতা এই কালোমাথা পোকাকার শূন্যকীট ধ্বংস করে এবং উক্ত পরজীবী কীট এর মুককীট বা পুত্তলি বিনাশ করে। এই বোলতা ও পরজীবী কীট বাড়িতে সহজেই পোষা যায়। নারকেলী এলাকায় এই দু' রকমের পোকা পুুষলে, এদের আক্রমণে কালোমাথা পোকা টিকতে পারে না। কোন কোন জায়গায় এই বোলতা ও পরজীবী পোকা পুুষে এবং তাদের বংশবৃদ্ধি করতে দিয়ে

কালোমাথা পোকাকার দমনে আশাতিরিক্ত উপকার পাওয়া গেছে।

দু'মাস পরে পরে একবার ক'রে ২ শতাংশ শক্তির ডি-ডি-টি আক্রান্ত গাছের পাতায় ছিটিয়ে দিলে এই পোকাকার দমন হ'তে দেখা গেছে। এদের আক্রমণ যাতে না হ'তে পারে সেই উদ্দেশ্যে অনাক্রান্ত গাছের পাতায় মাঝে মাঝে ১ শতাংশ শক্তির ডি-ডি-টি-জল ছিটানো যেতে পারে।

উইপোকা

চারাবাগানের নারকেলচারার এবং নতুন-লাগানো নারকেলচারার ভীষণ ক্ষতি করে উইপোকা। মাটির মধ্যে থেকে এই পোকা গাছের শিকড়ে লাগে এবং অনেক সময় শিকড়ের ভিতর গর্ত ক'রে গাছের কাণ্ডের মধ্যেও ঢুকে পড়ে। যতক্ষণ না চারা-গাছটি শূন্যকিয়ে উঠেছে, ততক্ষণ এদের আক্রমণের সম্ভাবনা পাওয়া যায়; অথচ শূন্যকিয়ে উঠলে সেই চারা বাঁচানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং উইপোকাকার আক্রমণ যাতে না হ'তে পারে, আগেই তার ব্যবস্থা করা উচিত।

বীজ-নারকেল রোপণ করার সময় তার গায়ে কেরোসিন-মিশ্রিত বালিমাটির আবরণ লাগিয়ে নিলে তাতে উইপোকা লাগবে না। চারাবাগানে সংরক্ষণ করার আগে গর্তের মধ্যে কেরোসিন-মিশ্রিত বালি একস্তর দিয়ে তারপরে তার মধ্যে চারা (চারার গোড়ার নারকেল) বসানো যেতে পারে। চারা লাগাবার আগে গর্তের মাটি তৈরি করার সময়, সেই মাটির সঙ্গে ৫ শতাংশ শক্তির বি-এইচ-সি-গুড়ো মিশিয়ে দিলে, সেই গর্তে রোপণ-করা নারকেল-চারায় উই-ধরার সম্ভাবনা থাকবে না। এ ব্যবস্থা না ক'রে যদি চারা লাগানো হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তার চারপাশের মাটি ৬ ইঞ্চি গভীর ক'রে খুঁড়ে, তার মাটির সঙ্গে ৫ শতাংশ শক্তির বি-এইচ-সি গুড়ো মিশিয়ে দিলে উইএর আক্রমণের সম্ভাবনা কমে যাবে।

ইন্দুর

ইন্দুরে নারকেলগাছের খুব ক্ষতি করে। ঘন গাছের বাগানে ইন্দুরে ক্ষতি করে বেশি। এরা সাধারণত গাছের মাথায় বাসা বাঁধে এবং কচি বা অপরিণত নারকেলে ফুটো করে। ফলে এসব নারকেল পরিণতি লাভ করার আগেই ঝরে পড়ে যায়। অনেক সময় ইন্দুরে গাছের নারকেলের বোঁটা কেটে দেয়। অনেক সময় এরা কচি নারকেল-চারাও আক্রমণ করে।

বিষ-মাখানো টোপ নারকেলগাছের মাথায় ছড়িয়ে রাখলে, তা খেয়ে ইন্দুর মরে যায়।

বোর্দো-মিশ্রণ [Bordeaux mixture]

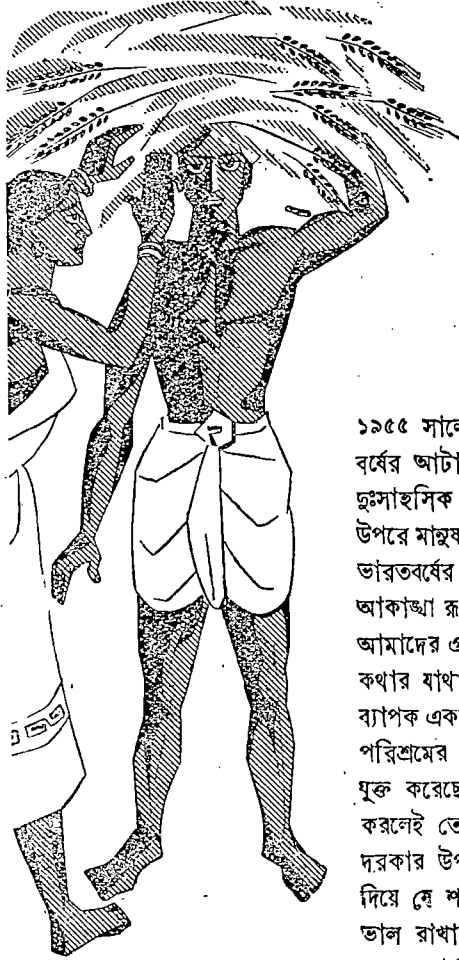
নারকেলগাছের কোন কোন রোগের দমনে 'বোর্দো-মিশ্রণ'ের উল্লেখ করা হয়েছে। এই মিশ্রণ কীভাবে তৈরি করতে হয়, তা এখানে বলা হ'ল।

৫ পাউন্ড তুঁতে, ৫ পাউন্ড চুন এবং ৫০ গ্যালন

জল নিতে হবে। কাঠের, মাটির অথবা তামার পাত্রে ২৫ গ্যালন জলে ৫ পাউন্ড তুঁতে চটের মধ্যে আলগাভাবে পট্টটুলি বেঁধে ডুবিয়ে রেখে গুলিয়ে নিতে হবে। ৫ পাউন্ড চুনের সঙ্গে অল্প পরিমাণ জল মিশিয়ে লেইএর মত ক'রে নিতে হবে। চুন যেন দলা বেঁধে না যায়। বাকি ২৫ পাউন্ড জলের সঙ্গে এই চুন মিশিয়ে নিলে যে দুধের মত তরল পদার্থ দাঁড়াবে, তা ছেক্কে নিয়ে আলাদা পাত্রে রাখতে হবে। এখন তুঁতে-গোলা জলটা আস্তে আস্তে চুন-গোলা জলের মধ্যে ঢেলে, নাড়িয়ে নাড়িয়ে ভাল ক'রে দুটো মেশাতে হবে। তা হ'লেই বোর্দো-মিশ্রণ তৈরি হ'ল।

ধরে রাখলে এই মিশ্রণ খারাপ হয়ে যায় ; কাজেই যতটা দরকার ততটাই তৈরি ক'রে ব্যবহার করতে হবে। যদি নিতান্তই কোন কারণে এই মিশ্রণ পরদিন ব্যবহার করার জন্য রেখে দিতে হয়, তবে তার সঙ্গে ১ পাউন্ড চিনি অথবা গুড় মিশিয়ে রাখতে হবে।





কাজ ও পুষ্টি

১৯৫৫ সালের ২রা অক্টোবর, অর্থাৎ গান্ধী জয়ন্তীর দিনে, ভারত-বর্ষের আটশটি বিভিন্ন প্রদেশে একই সঙ্গে শুরু হয় এক দুঃসাহসিক অভিযান—পল্লী উন্নয়ন সে অভিযানের লক্ষ্য। ‘সবার উপরে মানুষ সত্য’,—এই আদর্শই সে অভিযানকে জোঁগায় প্রেরণা, ভারতবর্ষের পাঁচ লক্ষ গ্রামের প্রায় ছয় কোটি পরিবারের আশা আকাঙ্ক্ষা রূপ পরিগ্রহ করে এই দৃঢ়সঙ্কল্প অভিযানের মধ্যে দিয়ে। আমাদের প্রধান মন্ত্রী বলেছেন “এ যুগটাই কঠোর পরিশ্রমের।” এ কথাই যথার্থ্য বোঝা যাবে যদি আমরা ভেবে দেখি যে, এরকম ব্যাপক একটি পল্লীউন্নয়ন কার্যক্রমে কি পরিমাণ একক এবং সজবদ্ধ পরিশ্রমের প্রয়োজন। যারা এই কার্যক্রমের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছেন তাঁরা বোঝেন কাজ—আরও কাজ। কিন্তু কাজ করলেই তো শুধু চলবেনা, এইসব কঠোর পরিশ্রমী লোকদের দরকার উপযুক্ত, সুপরিপক্কিত পুষ্টিও থাবার। কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যে শক্তি তাঁরা ক্ষয় করেন তা পূরণের ক্ষেত্রে এবং স্বাস্থ্য ভাল রাখার ক্ষেত্রে তাঁদের দরকার খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিনস্) এবং স্নেহ পদার্থ (ফ্যাটস) যুক্ত স্নেহ খাদ্য।

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চের পুষ্টি সম্বন্ধীয় উপদেষ্টা কমিটির মতে পূর্ণবয়স্কদের প্রতিদিন অন্ততঃ দু’ আউন্স (প্রায় এক ছটাক) স্নেহপদার্থ খাওয়া দরকার। স্নেহপদার্থ গম বা চালের তুলনায় আড়াই গুণ বেশি শক্তি দেয় এবং অস্থিবিষ্ময় প্রতিরোধ করারও ক্ষমতা দেয়। ডালডা বনস্পতি তৈরী হয় বিপুল ভেষজ তেল থেকে এবং এটি একটি খাঁটি স্নেহপদার্থ। ডালডায় ভিটামিন ‘এ’ এবং ‘ডি’ থাকে। প্রতি আউন্স ডালডায় ৭০০ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট অর্থাৎ ভাল ঘিয়ের সমপরিমাণ ভিটামিন ‘এ’ যোগ করা হয়। এই ভিটামিনগুলি হাড় ও মাংসপেশী গড়ে তোলে। শুধু তাই নয়, ভিটামিন ‘এ’ চোখ এবং ত্বকে সুস্থ রাখে আর ভিটামিন ‘ডি’ হাড় সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে। ডালডা তৈরীর সময় হাতে ছোঁওয়া হয় না। শীল করা পরিচিত খেজুর গাছ মার্কা টিনে ডালডা সবসময় খাঁটি ও তাজা পাবেন। খাবারে অভিরিক্ত পুষ্টি দেয় বলে পরিশ্রমী লোকদের প্রতিদিনকার খাবার ডালডায় রাখাই ভাল।



HVM. 810-18 BG

সবজির পোকা

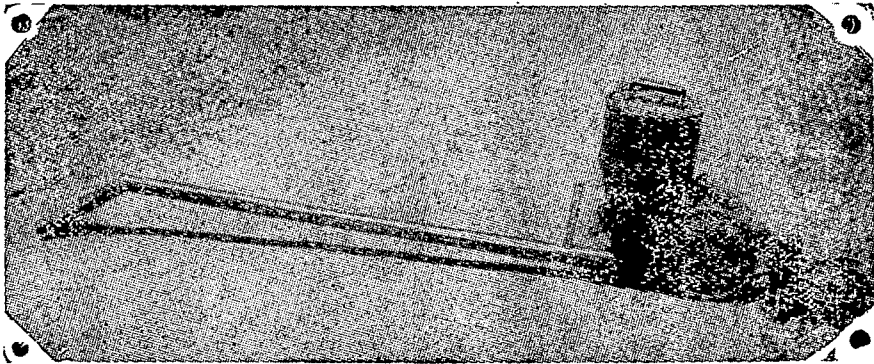
মানুষের জীবনে যেমন নানারকম বাধা-বিপত্তি আসে, ফসলের জীবনেও তেমনি অনেক রকম বিপদ-আপদ দেখা দেয়। এসবের হাত থেকে বাঁচাতে পারলেই ফসল হবে ভাল। আমরা এখানে এইসব বিপদ-আপদের মধ্যে শুধু কীটশত্রুর আক্রমণের কথাই আলোচনা করব।

হিসাব করে দেখা গেছে, প্রতি বছর আমাদের দেশের শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ পর্যন্ত ফসল কীটশত্রুরা নষ্ট করে থাকে। সেই হিসাবে দেখা যায়, প্রতি একরে যদি ১২৫ মণ বেগুন ফলে, তবে তার ১২৥ মণ ফসল পোকায় নষ্ট করে। দামের অঙ্ক কষলে দেখা যাবে যে, যদি প্রতি সের বেগুনের দাম হয় চার আনা, তবে ঐ ১২৥ মণের দাম হবে ১২৫ টাকা। এ অঙ্কটা অনেক সময়ে দ্বিগুণ হওয়াও কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। কাজেই পোকায় আক্রমণ হ'লে “কতটুকু আর থাকে” ব'লে নিশ্চেষ্ট বসে না থাকাই উচিত। দেশে আজ

খাদ্যের এই অনটনের দিনে যতটা ফসল আমরা বাঁচাতে পারি ততটাই আমাদের লাভ। লাভটা আর্থিক দিক দিয়েও বটে।

এখানে যেসব কীটের কথা বলছি তাদের আক্রমণ থেকে ফসল বাঁচাবার জন্য চাষের মালিকেরা এবং চাষীভাইরা বেশ যত্ন নেবেন। প্রতিকারের যে উপায়গুলি বলা হ'ল, সেগুলি মোটেই শক্ত নয়। যদি কারও এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানার দরকার হয় তবে এলাকার কৃষি-কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করবেন বা ২৩০নং নেতাজি স্মৃতি রোড, টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৪০ ঠিকানায় কীটতত্ত্ববিদের কাছে পত্র লিখবেন। যদি কীটতত্ত্ববিদের সাহায্য চান তবে পোকায় মোটামুটি বর্ণনা ও ফসলের কোন অংশ কীভাবে আক্রমণ করছে জানাতে ভুলবেন না।

ওষুধ ছড়াবার একটা যন্ত্রের ছবি এখানে দেওয়া হ'ল। এসব যন্ত্র আপনাদের অঞ্চলের কৃষি-অফিসে দরকারমত পাবেন।



ওষুধ ছড়াবার এক রকম যন্ত্র

আলু

কাটুইপোকা (Cut-Worm)

এরা একরকম প্রজাপতির (মথ্) কীড়া, আলু-গাছের চারা অবস্থায় গাছ কেটে দেয়। কাটা গাছটির কাছে মাটি খুঁড়লে দেখা যায়, মেটে রঙের প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা বেশ মোটাসোটা কীড়াটি বিরক্ত হয়ে কুন্ডলি পাকাচ্ছে। এরা রাত্রে আক্রমণ চালায় আর দিনের বেলা মাটির তলায় আশ্রয় নেয়।

প্রতিকার

(১) দেখা গেছে, কাটুইপোকা সব সময়ই সামনের দিকের গাছ কাটতে কাটতে যায়। পাশের দিকের গাছে তাদের নজর থাকে না। এক্ষেত্রে যদি কাটা-গাছের গোড়া বা তার সামনের ও পিছনের গাছের গোড়ার মাটি উলটানো যায় তবে এই পোকা অনায়াসেই ধরা যায়। এগুলো এক জায়গায় জড় করে তারপর কেরোসিন-মেশানো জলে ডুবিয়ে মারুন।

(২) মাটি ভালভাবে ওলটপালট করে দিলে পোকা বা পুতুলি ওপরে উঠে আসে ও কাক, শালিক প্রভৃতি পাখিরা তাদের খেয়ে নষ্ট করতে পারে।

(৩) 'প্যারিস গ্রীন'এর টোপ অথবা চার খুব উপকারী।

(৪) আক্রান্ত ক্ষেতে একরপিছ ৫০ গ্যালন জলে ১ সের ডি-ডি-টি (৫০ শতাংশ জলে-গোলা গুঁড়ো) ভালভাবে মিশিয়ে, ঝারি পিচকারি বা ছিটানো যন্ত্রের (স্প্রেয়ার) সাহায্যে ছিটিয়ে দিতে হবে।

জাবপোকা (Aphids)

আলুগাছের পাতার তলায় অসংখ্য জাবপোকা গাদাগাদি করে থাকতে দেখা যায়। এদের রঙ সবুজ। কতকগুলোর আবার স্বচ্ছ চারখানা পাখা থাকে।

এরা পাতার রস চুষে খায়, ফলে পাতা হলদেটে হয় ও কুঁকড়ে যায়। আলুর কুটেরোগ এরাই বহন করে।

প্রতিকার

(১) প্রথম দিকে জাবপোকা-লাগা গাছগুলি তুলে ফেলা উচিত। তা হলে আর আক্রমণ বাড়েনা।

(২) তামাকপাতার জল গাছে ছিটিয়ে দিলে খুব উপকার হবে। কী করে তামাকপাতার জল তৈরি করতে হয়, পরিশিষ্টে দেখুন।

সুতালিপোকা (Tuber Moth)

এরা এক রকম প্রজাপতির (মথ্) কীড়া। প্রজাপতিরা আলুর চোখে ডিম পাড়ে। সেই ডিম ফুটে কীড়া বেরিয়ে আলুর ভেতর চলে যায় ও আলুর শাঁস খেতে থাকে। ফলে আলু পচে যায়।

প্রতিকার

(১) গুদামে যখন আলু তোলা হয় তখন দেখে রাখা উচিত আলুতে যেন কোন রকম পোকা না থাকে। এমনকি, অন্য জায়গা থেকে আলুর বীজ আমদানি করার সময়েও বেশ করে আলু দেখে নেবেন।

(২) গ্যামেকসিন আধ সের এবং শুকনো মাটি বা বালি ১৫ সের বেশ ভাল করে মেশান। এখন এরই এক সের আপনার এক মণ আলুর ওপরে পাতলা করে ছিটিয়ে দিন। পোকাকার আক্রমণ থেকে আলু বাঁচবে।

কপি

সুর্নুইপোকা (Diamond back moth)

এরা একরকম প্রজাপতির (মথ্) কীড়া। দেখতে সবুজ ও বেশ ছোট। বাঁধাকপিতে এরা ছেঁদা করে ভেতরে গিয়ে পাতা খেতে থাকে। ফুলকপির ভেতরও এদের দেখা যায়। কীড়া সহজেই বিরক্ত হয় ও দেহটাকে বেশ জোরে জোরে ঢেউ-খেলাতে থাকে।

প্রতিকার

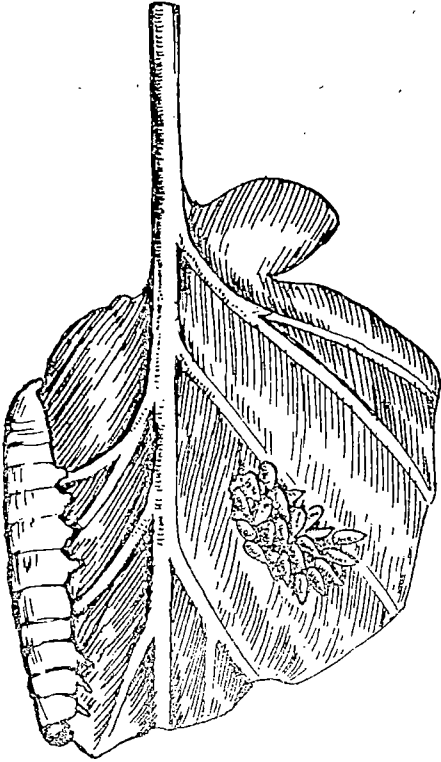
(১) তামাকের জল পিচকারি দিয়ে ছিটিয়ে এদের মেরে ফেলা যায়।

(২) গ্যামেকসিন প্রতি একরে ৩-৪ সের ছড়াতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, কপি জমি থেকে তোলার অন্তত দু' সপ্তাহ আগে যেন আর ওষুধ দেবেন না, কারণ তাতে কপিতে গন্ধ হ'তে পারে।

(৩) পাতার ওপর উনুনের ছাই ছিটিয়ে দিতে পারেন। ছাই-মাখানো পাতা এ পোকাতে খায় না।

সাদা প্রজাপতি (Cabbage butterfly)

এরা সাদা রঙের একরকম প্রজাপতির কীড়া। রঙটা সবুজ ও গা ভেলভেটের মত মসৃণ।



সাদা প্রজাপতির কীড়া

এরা পাতাগুলি খেয়ে কেবল শিরাগুলি বাকি রাখে। দার্জিলিঙে এদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করতে দেখা যায়।

প্রতিকার

(১) কপির ফুল আসার আগে ডি-ডি-টি (৫০ শতাংশ জলে-গোলা গুঁড়ো) ৫০ গ্যালন জলে ১ সের মিশিয়ে পিচকারি বা ছিটানো যন্ত্রের সাহায্যে ছিটিয়ে দিলে উপকার হয়।

(২) ছোট ক্ষেত হ'লে হাতে করে বেছে মেরে ফেলবেন।

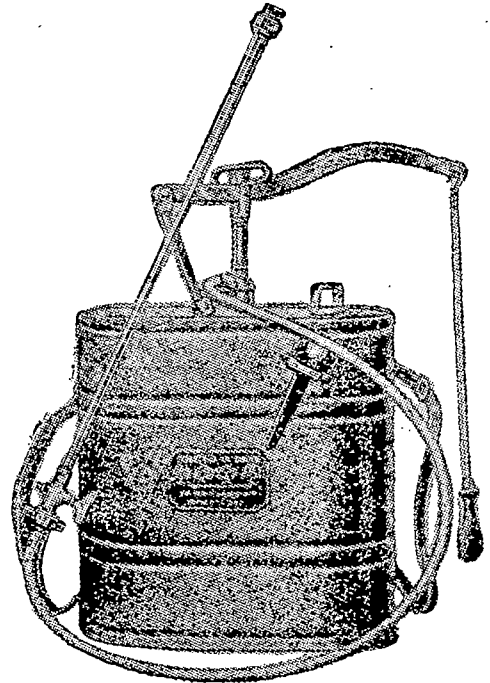
(৩) কপির ফুল এলে 'পাইরিথ্রাম' জলে-গোলা গুঁড়ো যা বাজারে পাওয়া যায় তা কিনে ব্যবহার করবেন।

তামাকের লেদাপোকা (Tobacco Caterpillar)

তামাকের লেদাপোকা কপিতেও লাগে। এরা একরকম প্রজাপতির কীড়া। এরা কপির মধ্যে বড় বড় ছেঁদা করে খায়।

প্রতিকার

সাদা প্রজাপতি দমনের উপায়ে এদেরও দমন করা যায়।



ওষুধ-ছিটাবার এক রকম যন্ত্র

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

জাবপোকা (Aphids)

আলদুর জাবপোকারই মত।

প্রতিকার

আলদুর জাবপোকা যেভাবে দমন করতে হয়, এদেরও সেইভাবে দমন করা যায়।

বেগুন

মাজপোকা (Stem and fruit borer)

এরা একরকম প্রজাপতির (মথ) কীড়া। এই কীড়া গাছের চারা অবস্থায় ডগা ছেঁদা করে ভেতরে যায় ও গাছের নরম অংশ কুরে কুরে খায়। ফলে ডগা শুকিয়ে টলে পড়ে। গাছের মাজ শক্ত হলে ফলগুলোতে আক্রমণ চালায়।

প্রতিকার

(১) মাজপোকার দ্বারা আক্রান্ত গাছগুলি তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

(২) ক্ষেতটি যথাসম্ভব পরিষ্কার রাখা উচিত; তাতে মাজপোকার আক্রমণ অনেক কম হয়।

(৩) পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ডি-ডি-টি (৫০ শতাংশ জলে-গোলা গুঁড়ো) ফল ধরার প্রথম অবস্থায় ৫০ গ্যালন জলে ৪ সের মিশিয়ে গাছে ছিড়িয়ে দিলে খুব উপকার পাওয়া যায়। যে ফলগুলিতে ডি-ডি-টি লাগে সেগুলি অন্তত ২ সপ্তাহ বাদে গাছ থেকে তোলা উচিত।

কাঁটালে বা বাগাপোকা (Laddy bird beetle)

পোকাগুলি দেখতে হলদে বা কমলা রঙের ও তার ওপর কালো কালো ফোঁটা থাকে। এর কীড়ার গায়ে অসংখ্য কাঁটা থাকে। কীড়ার রঙ ফিকে হলদেমত। পোকাগুলি ও কীড়ারা পাতার সবুজ অংশ কুরে কুরে খেয়ে পাতা ঝাঁকরা করে দেয়, ফলে গাছ শুকিয়ে যায়।

প্রতিকার

(১) পাতার ওপর মিহিদানার মত ডিমের গাদা দেখলেই নষ্ট করে ফেলতে হবে।

(২) 'লেড আর্সেনেট' ছিড়িয়ে গাছ ভিজিয়ে দিতে হবে। লেড আর্সেনেট তৈরি করার প্রণালী পরিশিষ্টে দেখুন।

(৩) 'গ্যামেকসিন' বা 'হেঞ্জিডল' যা বাজারে পাওয়া যায়, ওষুধ-ছড়াবার যন্ত্র দিয়ে একরপ্তি তার ৫-৬ সের ছিড়িয়ে দিলে উপকার হয়।

জাবপোকা (Aphids)

এদের ঠিক আলদুর জাবপোকার মত দেখতে। গাছের ডালে ও পাতার নিচে অসংখ্য পোকা গাদা-গাদি করে থাকে।

প্রতিকার

আলদুর জাবপোকার প্রতিকারের উপায় দেখুন।

আঁশপোকা (Mealy bugs)

পাতার তলায় এই পোকার আক্রমণ হলে মনে হয় কে যেন খানিকটা চুন লাগিয়ে দিয়েছে। এরা পাতার রস চুষে খায়, ফলে পাতা শুকিয়ে যায়।



বেগুনের আঁশপোকা

প্রতিকার

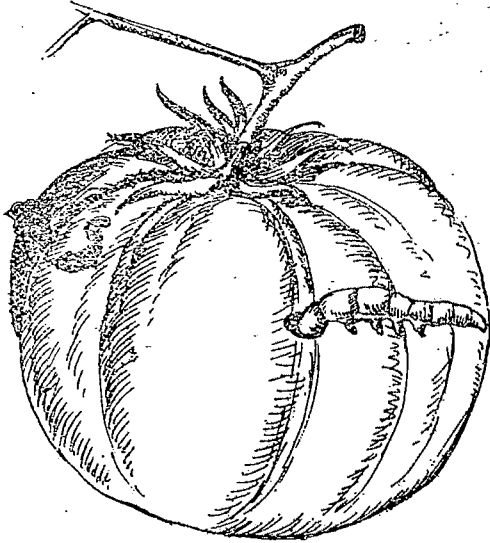
(১) আক্রান্ত পাতাগুলি তুলে নষ্ট করে ফেলেতে হবে।

(২) কেরোসিনের জল গাছের পাতার নিচের দিকে পিচকারির সাহায্যে ছিটিয়ে দিলে উপকার হয়। কীভাবে কেরোসিনের জল তৈরি করতে হয় তা পরিশিষ্টে দেখুন।

বিলাতী বেগুন

লেদাপোকা (Fruit borer)

এরা একরকম প্রজাপতির (মথ) কীড়া, বিলাতী বেগুনের ফল ধরলে তাতে আক্রমণ করে এবং বড় বড় গর্ত করে দেয়। ফলে বাজারে এ রকম ফলের দাম কমে যায়।



বিলাতী বেগুনের লেদাপোকা

প্রতিকার

(১) আক্রমণের প্রথম অবস্থায় বেছে ফেলে উপকার হয়।

(২) আক্রমণ বেশি হলে শতকরা ১০ ভাগ ডি-ডি-টির গুঁড়ো গাছের ওপর ছড়িয়ে দিতে হবে। ডি-ডি-টি ব্যবহার করলে মনে রাখতে হবে যে, গাছে ঐ সময়ে যে ফল থাকবে তা অন্তত ১৫-১৬ দিন বাদ দিয়ে তবে তুলতে হবে।

জাবপোকা (Aphids)

পোকাগুলি দেখতে আলুর জাবপোকারই মত। ক্ষতির লক্ষণও একই রকম।

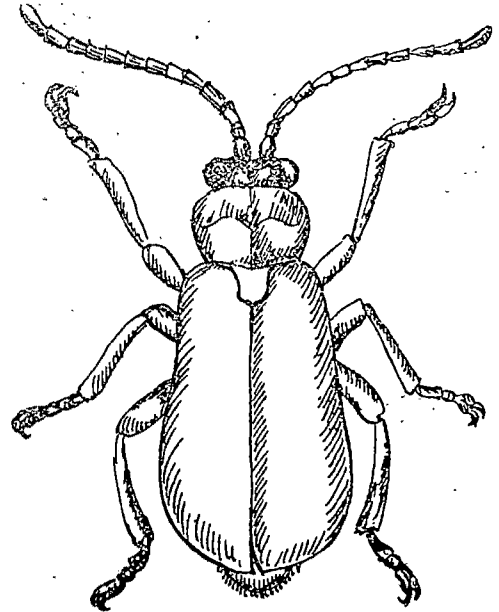
প্রতিকারের উপায় আলুর জাবপোকা দমনের উপায়ের মত।

শিম

জাবপোকা (Aphids)

শিমগাছের এরা হচ্ছে সবচেয়ে বড় শত্রু। এরা আলুর জাবপোকার সগোত্র হলেও এদের রঙ সবুজের বদলে কালো হয়।

এদের প্রতিকারের উপায় আলুর জাবপোকা দমনের উপায়ের মত।



লাউকুমড়ার লালপোকা

মটরশুঁটি

শুঁটির পোকা (Pod borer)

একরকম প্রজাপতির (মথ) কীড়া। ডিম থেকে বেরিয়ে শুঁটির মধ্যে চলে যায়। কীড়ারা তখন এত ছোট ও ছেঁদা এত সরু থাকে যে, ছেঁদা চোখেই পড়ে না। পরে ঐ ছেঁদা বড়জে যায়। কীড়া শুঁটির মধ্যে বীজ খেয়ে ফেলে।

প্রতিকার

- (১) ক্ষেত বেশ পরিষ্কার রাখতে হবে।
- (২) ক্ষেতে মাঝে মাঝে আগুন জ্বালালে এই কীড়ার প্রজাপতি পুড়ে মরে।



শুঁটির পোকা

লাউ-কুমড়া প্রভৃতি

লালপোকা (Red pumpkin beetle)

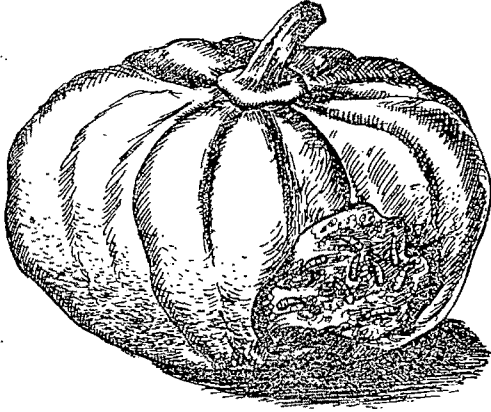
এরা একরকম লাল বা কালো রঙের শক্ত-পাখা-ওয়ালা পোকা। লাউগাছ বা এজাতীয় গাছে এদের খুব দেখা যায়। পোকাগুলি গাছের পাতা খেয়ে নষ্ট করে।

প্রতিকার

- (১) আক্রমণের প্রথম অবস্থায় হাতজাল ব্যবহার করে এদের ধরা যায়।
- (২) আক্রমণ বেশি হলে 'পাইরিথ্রাম' নামক কীটনাশক ওষুধ গাছে ছড়িয়ে দিলে উপকার হয়।

ফলের মাছি

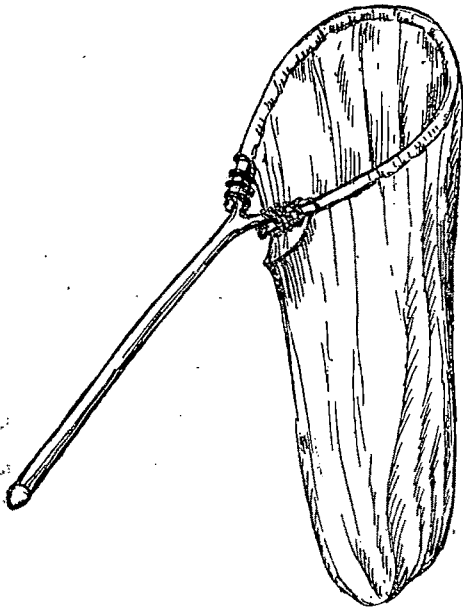
এরা একরকম মাছির কীড়া। ফল ধরলে কীড়া-গুলি ফল ছেঁদা করে ভেতরে চলে যায় ও পচন ধরায়।



ফলের মাছি

প্রতিকার

(১) আক্রান্ত ফলগুলি ছিঁড়ে নিয়ে নষ্ট করে ফেলতে হবে।



হাতজাল

(২) ফলগুলি মিহি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলে মাছি ফলের ওপর ডিম পাড়তে পারে না।

(৩) মাছির বিষ ব্যবহার করলে উপকার হয়। কী করে বিষ তৈরি করতে হয়, তা পরিশিষ্টে বলা হয়েছে।

মুলো

জাবপোকা (Aphids)

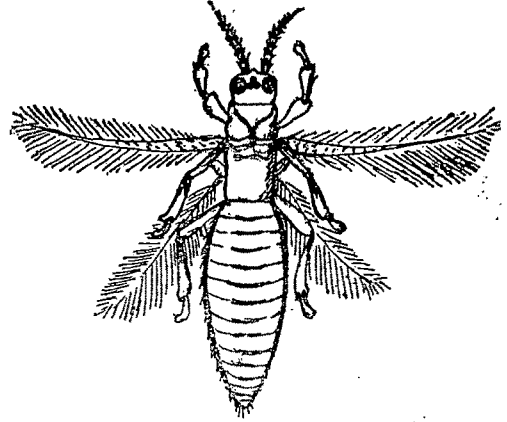
আলুর মত মুলোতেও জাবপোকার আক্রমণ হতে দেখা যায়, ফলে গাছের পাতা হলদে হয়ে কুঁকড়ে যায় ও ফসল দুর্বল হয়ে পড়ে।

আলুর জাবপোকা দমনের প্রক্রিয়ায় এর জাবপোকাকও দমন করা যায়।

পেঁয়াজ

পেঁয়াজের চোষিপোকা (Thrips)

এই পোকাগুলি এত ছোট যে, প্রায় সাধারণ চোখে দেখা যায় না। পাখির পালকের মত এদের



পেঁয়াজের চোষিপোকা

চারখানা ডানা আছে, তার সাহায্যে উড়ে উড়ে এরা একটার পর একটা ক্ষেত আক্রমণ করে। পোকা-গুলি পাতার রস চুষে খায় বলে গাছ ক্রমশ শুকিয়ে মরে যায়। আক্রান্ত ক্ষেত দেখলে মনে হয় যেন জলের অভাবে গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে।

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

প্রতিকার

আক্রান্ত ক্ষেতে ডি-ডি-টি (৫০ শতাংশ জলে-গোলা গুঁড়ো) ৫০ গ্যালন জলে আধ সের মিশিয়ে পেরাজগাছগুলির ওপর পিচকারি বা ছিটানো যন্ত্রের সাহায্যে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পরিশিষ্ট

যে ওষুধগুলি বাড়িতে তৈরি করা যাবে

(১) তামাকের জল

তামাক পাতা—ই সের

জল—৫-৬ সের

‘বার’ সাবান—২ ছটাক

তামাকপাতা জলে দিয়ে আধ ঘণ্টা সিদ্ধ করে নিতে পারেন, কিংবা তামাকপাতা পুরো একটা রাত জলে ভিজিয়ে রাখতে পারেন। এর পর সাবানটুকু এতে গুলে দিন। এই তামাকের জল আরও সাতগুণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে জমিতে ছড়ান। দেখবেন যেন পাতার তলার দিকে ঐ জল লাগে; কারণ, আগেই বলেছি যে, জাবপোকা পাতার নিচের দিকে থাকে।

(২) কেরোসিনের জল

‘বার’ সাবান—৪ ছটাক

কেরোসিন তৈল—১০ সের

জল—৫ সের

৪ ছটাক বার সাবান পাঁচ সের জলে সিদ্ধ করুন—যতক্ষণ পর্যন্ত সাবান জলের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে না যায়। তারপর ঠান্ডা হলে ১০ সের কেরোসিন ঢেলে ভালভাবে মিশিয়ে নিন। জমিতে দেওয়ার আগে এই মিশ্রণের সঙ্গে ১০-১২ গুণ জল মিশিয়ে নিন।

(৩) লেড আর্সনেট

চুন—ই সের

গুড়—২-৩ সের

‘লেড আর্সনেট’—ই সের

জল—৫ই মণ (৫০ গ্যালন)

সবগুলি মিশিয়ে নিন, এর সবটা ওষুধ এক একর জমিতে পিচকারির সাহায্যে ছিটিয়ে দেবেন।

(৪) ‘প্যারিস গ্রীন’ এর টোপ

‘প্যারিস গ্রীন’—ই সের

ধানের কুঁড়ো—১৩-১৪ সের

গুড়—১ই সের

জল—১৩ই সের

প্রথমে ধানের কুঁড়ো ও ‘প্যারিস গ্রীন’ ভাল করে মেশে নিন। তারপর অল্প অল্প করে জল দিতে থাকুন ও গুড় মিশিয়ে নিন। এখন এই ‘চার’ একর-প্রতি পাঁচ সের হারে গাছের গোড়ায় গোড়ায় ছিটিয়ে দিন। মনে রাখবেন, কাটুইপোকা রাত্রি বের হয়, সুতরাং ‘চার’ বিকেলের দিকেই ছড়ানো উচিত।

(৫) মাছির বিষ

ফরমাল ডিহাইড (৪০ শতাংশ)—৩ চামচ

দুধ—১ পাইট

গুড়—১ চামচ

জল—ই পাইট

একটি পাত্রে এ জিনিসগুলি মিশিয়ে তারপর এক টুকরো রুটির ওপর ঢেলে দিতে হবে। এখন ওষুধ-মাখানো কয়েক টুকরো রুটি পাত্রে করে মাঠের কয়েক জায়গায় রেখে দিতে হবে। মাছির এই ওষুধে ধরা পড়ে।

যে ওষুধগুলি কিনতে হবে সেগুলি কোথায় পাওয়া যায়?

(১) গ্যামেকসিন—ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিস, লিমিটেড, ১৮নং স্ট্র্যান্ড রোড, কলিকাতা।

(২) হেক্সিডল—গ্লাডস্টোন লায়াল অ্যান্ড কোং, ৪নং ফেরারলি গেস, কলিকাতা।

(৩) ডি-ডি-টি (৫০ শতাংশ জলে-গোলা গুঁড়ো)—ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিস, ও গ্লাডস্টোন লায়াল অ্যান্ড কোং।

(৪) পাইরিথ্রাম—বম্বে কেমিক্যাল।

আলুর রোগ

নানারকমের রোগে আলু-ফসলের অনিষ্ট হয়। রোগের আক্রমণে ক্ষেতে তো আলুর ফলন কমে যায়ই, তা ছাড়া গুদামেও অনেক আলু নষ্ট হয়। কতকগুলো রোগ হয় ছত্রাক থেকে, কতকগুলো রোগ হয় জীবানু থেকে আর কোন কোন রোগ হয় 'ভাইরাস' থেকে।

আলুর উৎপাদন বাড়তে হ'লে তার রোগ-দমনের ব্যবস্থা করতে হবে। গুদামে যাতে রোগের আক্রমণে আলু নষ্ট না হয়, তারও ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে সংক্ষেপে কতকগুলো রোগের বিবরণ এবং দমনের উপায় বলা হ'ল।

পাতার এবং ডাঁটার রোগ

জলদি ধসা

এক রকম ছত্রাক থেকে এ রোগ হয়। পাশ্চাত্য-অঞ্চলে আলুচাষের খন্ডের গোড়ার দিকেই এ রোগ দেখা দেয়, কিন্তু আমাদের দেশে, বিশেষ ক'রে উত্তরভারতের সমতল অঞ্চলে—যেখানে আলুর ব্যাপক চাষ হয়—এ রোগ সাধারণত শেষদিকেই দেখা যায়। তাই জলদি জাতের আলুর চাষে এ রোগের আক্রমণ বড় একটা দেখা যায় না। বিহারে নবেম্বর মাসের শেষদিকে, অনেক সময় ডিসেম্বরের গোড়ার দিকেও যখন কাটোয়া জাতের আলুর চাষ হয় তখন এর আক্রমণ দেখা যায় খুব বেশি। পাহাড়ী অঞ্চলে এর দরুন বিপুল ক্ষতির সম্ভাবনা। সেই ক্ষতির কবল থেকে ফসল রক্ষা ক'রে ফলন বাড়তে হ'লে এ রোগের দমন করতেই হবে।

এ রোগের আক্রমণে আলুগাছের পাতায় বাদামী রঙের ফোঁটা মত দাগ হয় এবং সেই দাগ বৃত্তাকারে বড় হয়ে ওঠে। একাধিক দাগ এভাবে ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত পাতাটাকেই নষ্ট ক'রে দেয়। এতে গাছের জোর কমে যায়, তার ফলে আলুর ফলনও যায় কমে। সময় সময় গাছের ডাঁটায়ও এ রোগ দেখা দেয়।

দমনব্যবস্থাঃ বোর্দো-মিশ্রণ, পেরেনক্স অথবা ডায়াকেন-ডি-১৪ প্রভৃতি ছত্রাকনাশক ঔষধ সমস্ত গাছের উপর ছড়িয়ে দিলে এ রোগের দমন হ'তে দেখা গেছে।

বিলম্বিত ধসারোগ

আলুর একটা মারাত্মক ক্ষতিকর রোগ এটা। অনুরূপ অবস্থা পেলে, দেখতে-না-দেখতে কয়েক দিনের মধ্যেই এ রোগ বিপুলভাবে আলু-ফসল ধ্বংস করে। এও এক রকম ছত্রাকজনিত রোগ। উত্তরভারতের পাহাড়ী অঞ্চলে এ রোগ খুব দেখা যায়। বিশেষ ক'রে দার্জিলিং এ প্রচণ্ডতা খুব বেশি। সম্প্রতি কয়েক বছর ধ'রে উত্তরভারতের সমতল-অঞ্চলের কোন কোন জায়গায়ও এ রোগ হচ্ছে। ডিসেম্বরের শেষদিকে অথবা জানুয়ারির গোড়ার দিকে এ রোগ দেখা দেয়; বিশেষ ক'রে সে সময় যদি একবার বৃষ্টি হয়ে যায়, তা হ'লেই এ রোগ দেখতে-না-দেখতে ছড়িয়ে পড়ে ফসলের ভয়াবহ ক্ষতি করে।

লক্ষণঃ পাতার গায়ে এখানে-ওখানে জলশোষা-মত দাগ দেখা দেয়, ক্রমে সে জায়গাগুলো বাদামী-কালো রঙ ধরে শুকিয়ে যায়। পাতার আক্রান্ত স্থানের নিচের পিঠে সাদা রোঁয়ারোঁয়ামত ছাতা পড়তেও দেখা যায় কোথাও কোথাও। বৃষ্টির বা ঠান্ডার আবহাওয়ায় রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সারা মাঠে। ডাঁটায় পাতার মত জলশোষা-দাগটা কম দেখা যায়। এর আক্রমণে ডাঁটার গায়ে বেগুনী-কালো রঙের লম্বালম্বি দাগ পড়ে। আক্রমণ বেশি হ'লে গাছ থেকে একটা ছাতকুড়ে গন্ধ ছাড়ে। আক্রান্ত গাছের ধোয়ানি জল মাটির ভিতর গিয়ে আলু-ফসলের দেহেও রোগ সৃষ্টি করে। ক্ষেতে যতদিন থাকে, ততদিন মাটির নিচে ফসলের গায়ে রোগের আক্রমণ হয়তো বেশি নাও হ'তে পারে, কিন্তু গুদামজাত অবস্থায় আলুর মধ্যে রোগ

প্রবল আকারে দেখা দেয়। প্রথমে আলদুর উপরে আক্রান্ত জায়গাগুলি বেগুনী ধরনের বাদামী রঙ ধরে ওঠে তারপর সেটা খোসার নিচে আলদুর ভিতর ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত স্থানগুলি কুঁচকে যায়, এবং রোগে-ধরা আলদুগুলো শূন্যকনো ধরনের হয়ে পড়ে।

দমনব্যবস্থা: বোর্দো-মিশ্রণ, পেরেনক্স বা ডায়াক্সেন-ডি-১৪ ছড়িয়ে বেশ ভাল ফল পেতে দেখা গেছে। পাহাড়ী অঞ্চলে জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে ওষুধ ছড়ানো আরম্ভ করা দরকার। আবহাওয়ার অবস্থা বুঝে মাঝে মাঝেই ওষুধ ছড়িয়ে যেতে হবে। পাতাগুলো ছড়ানো-ওষুধ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ওষুধের সঙ্গে কোন রকমের আঠা মিশিয়ে নিলে বেশ ভাল হয়—বিশেষ করে যেসব জায়গায় বৃষ্টির জলে ওষুধ ধুয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

সমতল-অঞ্চলের আলদুক্ষেতে দ্বিতীয়ার ওষুধ ছড়ালেই যথেষ্ট হবে। ডিসেম্বরের শেষদিকে আবহাওয়ার অবস্থা এ রোগ ছড়ানোর বেশ অনুকূল থাকে, কাজেই সেই সময়েই প্রথমবার ওষুধ ছড়ানো দরকার। জানুয়ারির মাঝামাঝি দ্বিতীয়বার ওষুধ ছিটাতে হবে। তারপর যদি আরো একবার ছড়াবার দরকার হয়, সেটা করতে হবে জানুয়ারির শেষদিকে।

জলের সঙ্গে ছাতার কণা গিয়ে নিচের আলদু-ফসলের মধ্যেও যেন উপরের গাছের রোগ ছড়াতে না পারে সেজন্য গাছের গোড়া মাটি দিয়ে ভাল করে, উঁচু করে ঢেকে দিতে হবে—যাতে আলদুগুলো মাটির উপর বোরিয়ে না পড়ে। ফসল তুলবার আগে মাটির উপর থেকে গাছ সরিয়ে ফেলতে হবে, অথবা, গাছ সম্পূর্ণ শূন্যকনো গেলে তার পরে মাটির নিচে থেকে ফসল তুলতে হবে।

পাতায় ছিটে ও ভাঁটায় ফাটল-ধরা রোগ

‘কার্কসপোরা’ নামক ছাতার এক বিশেষ জাতের থেকে হয় এ রোগ। সমতল-অঞ্চলে, বিশেষ করে

বিহারে, ডিসেম্বরের মাঝামাঝির পরে আলদুক্ষেতে এ রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। পাতার গায়ে বাদামী রঙের ছিটে ছিটে দাগ দেখা দেয় প্রথমে; তারপরে সেই দাগ বড় হয়ে ওঠে আর তার মাঝখানটা সাদাটে ধরনের রঙ ধরে। গোড়ার দিকে শূন্যকনো নিচেকার বড় বড় পৃষ্ঠ পাতাগুলোতেই দাগ ধরে, কিন্তু ক্রমে উপরের কচি পাতায়ও রোগ দেখা দেয়। এর মারাত্মক ক্রিয়া দেখা যায় বিশেষ করে গাছের ভাঁটায়। ভাঁটার গায়ে বাদামী রঙের ছোট ছোট রেখায় ফাটল দেখা দেয়; ক্রমে ফাটলগুলি বড় হয়ে একসঙ্গে জুড়ে যায়, এবং সেখানটাতে গাছটা ভেঙে পড়ে যায়। এমনি করে এ রোগে আক্রান্ত গাছগুলি অকালে মরে যায়।

দমনব্যবস্থা: ডায়াক্সেন, পেরেনক্স বা বোর্দো-মিশ্রণ গাছের বেড়ে ওঠার সময় ছড়িয়ে দিয়ে বেশ ভাল ফল পাওয়া গেছে।

ঢলা রোগ

বীজাণুজাত ঢলা রোগ ও বাদামী পচা রোগ

‘সিউডোম্যানাস সোলানাসিরাম্ ই-এফ-এস’ নামক বীজাণু থেকে এ রোগ হয়। নীলগিরি এবং কুমাউন পাহাড় অঞ্চলে এ রোগ খুব দেখা যায়। পাহাড়ী বিলম্বিত জাতের আলদুর (কাটোয়া) বাহনে এ রোগ অনেক সময় সমতল ভূমিতেও নেমে আসতে দেখা যায়। সমতলভূমিতে শীতকালের আলদু-ফসলেই দেখা যায় এ রোগ। পশ্চিমবঙ্গে এ রোগের আক্রমণ খুব প্রবল আকারেই দেখা যায়। বিহারের পাটনা-সিটি অঞ্চলে কাটোয়া আলদুর চাষে প্রতি বছর শতকরা দুই থেকে পাঁচ ভাগ ফসল এ রোগে নষ্ট হয়। বোম্বাই এবং মহীশূরেও এ রোগ হয় বলে জানা গেছে।

লক্ষণ: এ রোগ হলে প্রথমেই দেখা যায়, গাছের উপরদিককার পাতাগুলো নিজীব হয়ে পড়েছে। দিনের যে সময়ে গরম বেশি পড়ে সে সময়ে পাতাগুলো ঢলে পড়ে; রাতে পাতাগুলো আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু রোগের বৃন্দ্র

সঙ্গে সঙ্গে গাছও দিনে দিনে আরো নিজীব হয়ে পড়তে থাকে, অরশেষে সমস্তটা গাছ শূন্য হয়ে মরে যায়। গাছের কাণ্ড, শিকড় প্রভৃতির ভিতরের আঁশগুলো বাদামী রঙ ধরে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত সেই বাদামী রঙ গাছের বাইরের আবরণেও প্রকাশ পেতে দেখা যায়। আক্রান্ত স্থান কাটলে দেখা যায়, বাদামী-রঙধরা আঁশের পরতের ভিতর থেকে খুব ছোট ছোট সাদা রঙের পোকা বেরিয়ে আসে। সাধারণত, মাটির নিচে গাছের শিকড়ে যখন আলু ফলতে শুরু করে, এ রোগও শুরু হয় তখনই। এই বাদামী পচারোগে আক্রান্ত গাছের ফসল অনেক সময় বেশ সতেজ-সবল হতে দেখা যায়, আবার অনেক সময় মাটির নিচে ফসল রোগাক্রান্ত হলেও উপরে গাছে তার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। আক্রান্ত ফসল তুলে মাটিতে ফেলে রাখলে শূন্য হয়ে যেতে থাকে। গুদামজাত অবস্থায়ও অনেক ফসল নষ্ট হয়ে যায়।

দমনব্যবস্থা: সাধারণত বীজ-আলুর ভিতরই এ রোগের বীজাণু থাকে। অনেক সময় আলু-ক্ষেতের মাটির ভিতরও রোগের বীজাণু থাকে, তারা গাছে রোগের সৃষ্টি করে। অনেক গাছ-গাছড়া-আগাছা প্রভৃতিতেও এ বীজাণু থাকে, সেইসব গাছ থেকে আলুগাছে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এ রোগের আক্রমণ থেকে ফসল বাঁচাবার এক উপায় হচ্ছে আলুবীজ কেটে, পরীক্ষা করে, রোগমুক্ত দেখে তবে খেতে লগানো। জমির আগাছা ভাল-ভাবে পরিষ্কার করে তার পরে আলুর বীজ লাগালেও এ রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। মাটি থেকে জীবাণু-সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা পাহাড়ী ঠান্ডা অঞ্চলেই বেশি; নিচে সমতলভূমিতে এদেশে সূর্যের তাপ পড়ে প্রখর-ভাবে, তাতে মাটির মধ্যে জীবাণু বড় একটা বেঁচে থাকে না। কুমাউন পাহাড়ে ভাওয়ালি আলু-বর্ধন-উপকেন্দ্রে যথাযোগ্যভাবে মণ্ডিকা-শোধনের দ্বারা এ রোগ প্রশমনের উপায়-নির্ধারণ সম্বন্ধে পরীক্ষা চলছে।

আলু কাটার যন্ত্রপাতির বাহনই এ রোগ সব-চেয়ে বেশি ছড়ায়। বীজ-আলু যেখানে কেটে রোয়া হয়, সেখানে হয়তো এ রোগে আক্রান্ত বীজ-আলু কোন যন্ত্র দিয়ে কাটার পর সেই যন্ত্র দিয়েই নীরোগ বীজ-আলু কাটা হ'ল; এতে করে রোগবীজাণু ছড়িয়ে গেল নীরোগ বীজের মধ্যে। পাশ্চাত্য অনেক দেশে বীজ-আলু কটবার আগে 'মার্কিউরিক ক্লোরাইড' এর ১:৫০০ তরল-মিশ্রণে ডুবিয়ে আলু কাটার যন্ত্রকে জীবাণু-শোধিত করে নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় আলু-গবেষণা-প্রতিষ্ঠান পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, 'মার্কিউরিক ক্লোরাইড' মিশ্রণের পরিবর্তে 'ডিনেচার্ড স্পিরিট' দিয়ে কাটার যন্ত্র বিশোধিত করে নিলেও সমান ফল পাওয়া যায়। 'ডিনেচার্ড স্পিরিট' ক্ষতিকারক নয় এবং সহজে পাওয়া যায়, কাজেই এটাই ব্যবহার করা উচিত।

কালো গুটি

'রিজোস্টোনিয়া সোলানি-কুয়েন' নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়। এতে আলুর উপর বাদামী কালো রঙের গুটি গড়ে ওঠে এবং আলুর খোসার সঙ্গে তা এঁটে থাকে। গুটিগুলো আকারে আলুপনের ডগার মত ছোট হতে পারে, আবার তার চেয়ে বড়ও হতে পারে। এ গুটিতে আলুর ফসলের কোন ক্ষতি হয় না, শুধু আলু দেখতে খারাপ হয়; কিন্তু এর দ্বারা আক্রান্ত আলু যদি বীজ হিসাবে রোপণ করা হয়, তা হলে ছত্রাক পরিপুষ্ট হয়ে অঙ্কুর মেরে ফেলে। এর দ্বারা গাছের মূল, কচি ফসল প্রভৃতিও আক্রান্ত হয়। কখনো কখনো এর দ্বারা পুরানো গাছের গোড়ায়, মাটির ঠিক উপরের অংশ ঘিরে ফাটল ধরে, এতে গাছের খাদ্য তার মাটির নিচের অংশে-শিকড়ে বা ফসলে-যেতে বাধা পায়, এর ফলে ফসল ছোট আকারের হয় এবং গাছে 'আকাশে আলু' জন্মে। পাতাগুলো হলদে বা লালচে-হলদে রঙ ধরে মরে যাবার মত হয় এবং কুঁচকে যায়। আক্রান্ত গাছ-গুলোর বেশির ভাগই ঢলে পড়ে। গাছ তুললে

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

দেখা যায় ছোট ছোট আলু মাটির ঠিক নিচেই থোলো থোলোভাবে জড় হয়ে আছে।

দমনব্যবস্থাঃ গুটি-বিহীন পরিষ্কার বীজ-আলু ক্ষেতে রোপণ করতে হবে। অল্পস্বল্প গুটি আছে এমন বীজ-আলু হ'লে, রোগনাশক এমন ওষুধ দিয়ে তাকে শোধন করে নিতে হবে যার দ্বারা বীজের ক্ষতি হবে না অথচ ছাতা নষ্ট হবে। এক ভাগ 'ফরমালিন' ১২০ ভাগ জলের সঙ্গে মিশিয়ে, গুটিদার বীজ-আলু সেই জলে ঘণ্টা-দেড়েক ডুবিয়ে রাখতে হবে; তারপরে বীজ-আলুগুলো তুলে নিয়ে, শুকিয়ে, ক্ষেতে লাগাতে হবে। পশ্চিমে অনেক জায়গায় ১,০০০ ভাগ জলের সঙ্গে ১ ভাগ মারকিউরিক ক্লোরাইড মিশিয়ে তার মধ্যে গুটিদার বীজ-আলু আধ ঘণ্টা থেকে দু' ঘণ্টা পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখা হয়। মারকিউরিক ক্লোরাইড অত্যন্ত বিষাক্ত জিনিস, এটা খুব সাবধানে ব্যবহার করা দরকার। অব্যবহৃত ওষুধজলটা মাটির নিচে পুতে ফেলতে হবে। ওষুধে ডুবানো বীজ-আলুগুলো আলাদা করে রাখতে হবে যেন খাবার আলুর সঙ্গে কোনক্রমেই তা মিশে না যায়।

‘ওজোনিআম’-ঘটিত চলারোগ

‘ওজোনিআম টেঙ্গানাম’ নামক ছত্রাক থেকে জাত এ রোগ ভারতে একেবারেই নতুন। পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত এ রোগ দেখা যায় নি। এতে আক্রান্ত গাছের রঙ ফিকে হয়ে যায় আর বাড় কমে যায়। প্রথমে নিচের পাতাগুলো হলদে হয়ে যায়, ক্রমে গাছের উপরদিকও হলদে রঙ ধরে, অবশেষে গোটা গাছটাই ঢলে পড়ে। কেন্দ্রীয় আলু-গবেষণা-প্রতিষ্ঠানে এ রোগের দমনব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু পরীক্ষা হয়েছে এবং এখনও পরীক্ষা চলছে। এ ছাতা মাটিতে জন্মে। যে গাছে এর আক্রমণ হয়, সেটিকে তুলে নষ্ট করে ফেলতে হবে এবং ১ঃ ১,০০০ ‘মারকিউরিক ক্লোরাইড’ এর জলে

গাছের চারদিকের এবং নিচের মাটি শোধিত করে নিতে হবে।

গুদামের রোগ

কেলে পচা

উত্তরভারতীয় অঞ্চলে গুদামজাত আলুর এ একটা বড় রোগ। এতে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কি তার চেয়ে বেশি আলুও নষ্ট হ'তে দেখা গেছে। ‘মার্কেফোমিনা ফাসেওলি অ্যাশ্বি’ নামক এক রকম ছাতা মাটিতে থাকে। আলু ক্ষেতে থাকার সময়ই এই ছাতার দ্বারা আক্রান্ত হয়, কিন্তু রোগের লক্ষণগুলো ফুটে ওঠে গুদামজাত অবস্থায়। প্রথমে আলুর গায়ে এখানে-ওখানে কালো দাগ হয়, ক্রমে সেই দাগ ছড়িয়ে সমস্তটা আলু ছেয়ে ফেলে। আলুর চোখগুলো নষ্ট হয়ে যায়, পরে গোটা আলুটাই কালো একটা পিণ্ডে পরিণত হয় আর বদ গন্ধ ছাড়ে। সাধারণত কেলে পচা রোগে আক্রান্ত আলুগুলোতে ‘পলিমিক্সা’ নামে এক রকম পোকা দেখা যায়, এরা গুদামের আলু আরো বেশি করে নষ্ট করে। এ অবস্থায় আলু নরম আর পিণ্ডাকার হয়ে যায় এবং আলুর ভেতর থেকে হলদেটে রঙের এক রকম ফেনা বেরোয়।

দমনব্যবস্থাঃ কেন্দ্রীয় আলু-গবেষণা-প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, ক্ষেতের মধ্যে আলুতে এ রোগের বীজ-সংক্রমণ নির্ভর করে বীজ-আলু বপনের সময়ের উপর। ১৯৫০-৫১ সালে এ বিষয়ে যে পরীক্ষা চলে, তাতে দেখা যায়, ফেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগে যে আলু ক্ষেত থেকে তোলা হয়েছে, গুদামে তার শতকরা ১০ ভাগ এ রোগে নষ্ট হয়েছে। আরো দেরিতে তোলা আলু গুদামে আরো বেশি পরিমাণে নষ্ট হয়েছে। এপ্রিল মাসে যে আলু তোলা হয়, সে আলু গুদামে নষ্ট হয়েছে সবচেয়ে বেশি—শতকরা ৬০ ভাগ। এর পরেও যেসব আলু তোলা হয় নি, সেগুলো ক্ষেত

থাকতেই পচতে শুরুর করেছে। এর থেকে দেখা যায়, গরম আবহাওয়ায় এ রোগের আক্রমণের প্রবণতা বেশি। সুতরাং আবহাওয়া ঠান্ডা থাকার কালেই ক্ষেত থেকে আলু তোলার ব্যবস্থা করলে এ রোগের সম্ভাবনা কম থাকে।

গুদামে অন্যান্য রোগ

আগেই বলা হয়েছে যে, কেলে পচা রোগের সঙ্গে সাধারণত ‘পলিমিক্সা’ নামে এক রকমের জীবগুদ থাকে যারা গুদামের আলু আরো তাড়াতাড়ি পচিয়ে ফেলে আর পচা আলুগুলো নরম পিঁড়াকার হয়ে হলদেটে রঙের ফেনা ছাড়ে। এ ছাড়া ‘পাইথিআম আল্টিমাম’ নামক এক রকম রোগবীজও দেরিতে তোলা আলুতে গুদামজাত অবস্থায় রসগলানে রোগ ধরাতে দেখা গেছে। আলুর মধ্যে এ দুটো রোগ দেখা গেলে, রোগধরা নষ্ট আলুগুলো আলাদা করে, বাকি ভাল আলুগুলোকে ১:১২০ ফর্ম্যালিন জলে ডুবিয়ে, তার পর শুকিয়ে, গুদামে রাখতে হবে।

গুদামজাত আলুতে আর এক রকমের রোগ দেখা যায় যাকে বলা যায় শুরুখো পচা। ‘ফুসারিআম কোএরুলিআম’ নামক ছাতার দ্বারা এ রোগ জন্মে। আলুর এক দিকটাতে রোগ দেখা দেয়, সে জায়গাটা টোলখাওয়া মত হয়ে যায়। ক্রমে গোটা আলুটা অথবা তার একটা অংশ শক্ত গুটিগুটিমত হয়ে পড়ে। আক্রান্ত অংশের উপর জায়গায়-জায়গায় সাদা রঙের ছোট ছোট বোতামের মত দাগ জন্মে; সেই দাগ কেটে ফেললে ভিতরটা ফিকে নীল রঙের দেখায়। এসব জায়গায় ছাতার রেণু জন্মে। রুগ্ন আলু থেকে সুস্থ আলুতে এই রেণু সংক্রামিত হয়; কাজেই আলুকে আক্রমণ থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে ১:১২০ ফর্ম্যালিন জল দিয়ে গুদাম এবং সেখানকার আলু রাখার পাত্রগুলো জীবগুদমুক্ত করে নিতে হবে। আলু-গুলোও এ ওষুধজল দিয়ে শোধন করে তার পর সেই জীবগুদমুক্ত গুদামে রাখতে হবে।

জাতনাশা রোগ (ভাইরাস বা কুটেলাগা)

এ বর্গে কয়েক রকমের রোগ আছে যারা আলুর জাত খারাপ করে দেয়। অণুবীক্ষণযন্ত্র দিয়ে ঠিকমত দেখা যায় না এমনসব অতি সূক্ষ্ম জীবগুদ থেকে এসব রোগ হয় আর বংশানুক্রমে আলুর মধ্যে এসব রোগ ছড়িয়ে যায়। বীজ-আলুর মধ্যে এসব জীবগুদ খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র আলুগাছে রোগের লক্ষণ দেখে এসব রোগ ধরা যায়। এ শ্রেণীর অনেক রকম রোগের মধ্যে মাত্র কয়েকটিই আমাদের দেশে দেখা যায়। মোটা-মুটি তাদের ‘নকশা রোগ’ আর ‘পাতামোড়া রোগ’—এ দু’ ভাগে ভাগ করা যায়। এক রকম ‘ভাইরাস’ রোগে পাতার উপর হালকা রঙের বিচিত্র দাগ ফুটে ওঠে, যেমন, ফিকে সবুজ আর গাঢ় সবুজ রঙের দাগ পাশাপাশি জুড়ে থাকে; সেইসঙ্গে এক-একটা পাতার ধারগুলো কুঁকড়ে কুঁকড়ে যায়। আরো দু’ রকমের ‘ভাইরাস’ রোগ আছে, সেগুলো এর সঙ্গে মিশতে পারলে, আরো নানান রকমের লক্ষণ দেখা যায়। এক রকম রোগে পাতার শিরাগুলোর মাঝের অংশ উঁচু হয়ে ওঠে আর পাতার ধারগুলো একেবেঁকে নিচের দিকে মুড়ে যায়। আর-এক রকম ‘ভাইরাস’ রোগে পাতার গায়ে বিচিত্র রঙের ছোপ ধরে আর পাতা খুব কুঁকড়ে যায়। এ রোগে আর-একটা লক্ষণও দেখা যায়: পাতার নিচের দিকে শির ধরে কালো ডোরাকাটামত দাগ ফুটে ওঠে, এ দাগ সমস্ত পাতায় ছড়িয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত পাতাটি মরে গিয়ে ঝুলে পড়ে। পাতামোড়া রোগে গাছ শক্ত হয়ে যায়, তার পাতাগুলো পুরু হয়ে উপরদিকে মুড়ে যায়, গাছগুলো খুব বেঁটে থেকে যায়—বড় হয় না। গাছে এসব রোগ হলে আলুর ফলন খুব কমে যায়।

দমনব্যবস্থা: গাছে ‘ভাইরাস’ বা কুটেপড়া রোগ ধরলে তা সারানো সম্ভব নয়; সুতরাং এসব রোগ যাতে না হতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(১) একেবারে গোড়াতে রোগমুক্ত গাছের আলু বীজের জন্য রাখতে হবে। (২) তার পরে, বীজ-আলু তৈয়ারির জন্য বীজ-আলু এমন ক্ষেতে লাগাতে হবে, যার আশপাশে কাছাকাছির মধ্যে আর কোন আলুক্ষেত নেই। আশেপাশে অন্য আলুক্ষেত থাকলে, সেখান থেকে রোগ বীজ-আলু তৈয়ারির ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। (৩) বীজ-আলু তৈয়ারির জমি এমন জায়গায় করা উচিত যেখানে গাছে কোন পোকা লাগার সম্ভাবনা নেই। পাহাড়ের উঁচু দিকে এ রকম জমি পাওয়া যায়। সমতলভূমিতেও অনেকটা রোগমুক্ত আলু উৎপাদন করা যায়, যদি বীজ-আলু তৈয়ারির ক্ষেত্র নির্বাচন করা যায় এমন জায়গায় যার আশপাশে অনেক দূর পর্যন্ত জমি চাষমুক্ত রয়েছে।

অন্যান্য রোগ

এ শ্রেণীতে পড়ে এমন-সব রোগ যেগুলো প্রতি-কূল আবহাওয়ার দরুন বা অন্য কোন কারণে হয় বলে মনে হয়। 'ভাইরাস', 'ছত্রাক', জীবানু বা কীট থেকে এসব রোগ হয় বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

ভিতরে বাদামী দাগঃ আলুর ভিতরে এখানে-সেখানে বা একই জায়গায় বাদামী রঙের শূকনো ফোঁটা-ফোঁটা দাগ হয়। এ দাগগুলো নিঃপ্রাণ কোষের দ্বারা গঠিত এবং জীবানু বা ছত্রাক থেকে মূক্ত। ভিতরে এ রকম দাগওয়ালা আলু নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলে বিবেচিত হয়। এ রোগ কিসের থেকে হয়, তা ঠিক জানা যায় নি; তবে মনে হয়, মাটির নিচে আলুর কন্দ গঠিত হবার সময় যদি একেবারে কিছুদিন ধরে অনাবৃষ্টি হয় এবং তার পরে বিলম্বে ফসল যদি প্রচুর জল পায়, অথবা মাটিতে যদি সাধারণ কোন কোন উপাদানের অভাব ঘটে, তা হ'লে এ রোগ হ'তে পারে। প্রাথমিক পরীক্ষা থেকে মনে হয়, প্রথম কারণটাই ঠিক।

আঙ্গিক বৈকল্যঃ যেসব ক্ষেতে ঘাস বা আগাছা প্রচুর পরিমাণে থাকে, সেসব ক্ষেতের আলুতে অনেক

কুঁচকে-যাওয়ামত খাঁজ হয়। আগাছার শিকড় প্রভৃতি মাটির নিচে গিয়ে আলুর গঠন এভাবে খারাপ ক'রে দেয়। এতে আলুর বাজারদরই শূন্য ক'মে যায় তা নয়, এসব খাঁজে অনেক সময় রোগ-উৎপাদক ছাতা বাসা বাঁধতে পারে। ক্ষেতের ঘাস-আগাছা সম্পূর্ণ পরিষ্কার ক'রে ফেললে আলুর এরকম বদখত গড়ন হ'তে পারে না।

রোগনাশক ওষুধ

বোর্দো-মিশ্রণঃ এক একরু পরিমাণ জমিতে ছড়াবার জন্য মোটামুটি ১০০ গ্যালন মিশ্রণ দরকার। এটা তৈরি করতে হয় এসব জিনিস দিয়েঃ—'কপার সালফেট' ১০ পাউন্ড, চুন ১০ পাউন্ড ও জল ১০০ গ্যালন।

পেরেনক্সঃ 'ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ'-এর তৈরি বাদামী ধরনের রঙের গুঁড়ো এটা। ক্ষেতে ছড়াবার জন্য মোটামুটি ১০০ গ্যালন ওষুধজল তৈরি করতে ৩ই পাউন্ড 'পেরেনক্স' গুঁড়ো আর ১০০ গ্যালন জল লাগে।

আঠাঃ যেখানে গাছের উপর ওষুধ ছড়ালে তা বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে, সেখানে ওষুধের সঙ্গে একটা নির্দোষ আঠা মিশিয়ে নেবার কথা বলা হয়েছে। এরকম আঠা-মিশ্রিত 'পেরেনক্স'-মিশ্রণ তৈরি করতে হ'লে উক্ত 'পেরেনক্স'-জলের সঙ্গে ২ পাউন্ড রজন আর ১ পাউন্ড 'সোডা-অ্যাশ্' মিশিয়ে নিলেই চলবে। বোর্দো-মিশ্রণ বা অন্য ওষুধের সঙ্গে এ দুটো জিনিস মিশিয়ে নেওয়া চলে।

ডায়াথেন-ডি-১৪ঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 'রম্ অ্যান্ড হাস্' কোম্পানির তৈরি একটা তরল পদার্থ এটা। এ দিয়ে ক্ষেতে ছড়াবার মত মোটামুটি ১০০ গ্যালন ওষুধজল তৈরি করতে ২ কোয়ার্ট ডায়াথেন-ডি-১৪, ১ পাউন্ড জিঙ্ক সালফেট, ২ পাউন্ড চুন এবং ১০০ গ্যালন জল দরকার।*

আলুর পোকা

নানা রকমের পোকাকার আক্রমণে আলু-ফসলের বড়ই ক্ষতি হয় এবং ফলন কমে যায়। পোকাকার উপদ্রব বন্ধ করতে পারলে ফলন তো বেশি হবেই, তা ছাড়া আলুর আকারও ভাল আর বড় হবে।

পোকাগুলোর মধ্যে এক দল আছে যারা আলু বা আলুগাছের পাতা বা ডাঁটার টুকরো কেটে কেটে খায়, আবার আর-এক দল আছে—তারা গাছের পাতার বা আর-কোন অংশের রস চুষে খায়। (Epilachana) পোকা আলুগাছের পত্রগুচ্ছ খায়; এরা যে ক্ষতি করে তা স্পষ্টই দেখা যায়, এবং তা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়—আলুর কী মারাত্মক শত্রু এরা। কাটুইপোকা আলুও খায়, আলুগাছের ডাঁটাও খায়। আলুতে এদের আক্রমণ হলে, ক্ষেত থেকে আলু তোলার আগে তা টের পাওয়া যায় না। জাবপোকা প্রভৃতি রস-শোষক কীট যে ক্ষতি করে অনেক সময়ই তা নজরে পড়ে না, এবং দমনের ব্যবস্থা না করলে এদের ক্ষতি ব্যাপক হয়ে ওঠে।

জাবপোকা প্রভৃতি তাদের পরিণত আর অপরিণত দুই বয়সেই ফসলের ক্ষতি করে, আবার কাটুই-পোকা, কন্দেদ প্রজাপতি এরা শুধু শুককীট অবস্থায়ই ক্ষতি করে। কোন কোন পোকা নিজেরা সরাসরি ফসলের ক্ষতি যত-না করে, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করে রোগ ঘটিয়ে বা রোগ ছড়িয়ে। আলুর রোগে সংশ্লিষ্ট যত রকম পোকা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকারক হচ্ছে ‘অ্যাফিড’ বা জাবপোকা।

জাবপোকা

অন্তত চার রকমের জাবপোকা বা গাছের উকুন আলুগাছের পত্রগুচ্ছ আক্রমণ চালায়। সবুজ পীচ জাবপোকা (Myzus persicae) এবং আলুর জাবপোকা (Macrosiphum solanifolii) সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। আর দু’রকমের জাবপোকা (‘বাক্থন’—Aphid abbreviate

এবং ‘ফক্সগ্লেভ’—Myzus solani কম দেখা যায়।

ক্ষতির ধরন

ধাড়ি পোকা আর তাদের পুত্রপৌত্র—দুয়েতেই পত্রগুচ্ছের রস শোষণ করে। পুত্রপৌত্রও দেখতে প্রায় পরিণত পোকাকারই মত—শুধু আকারে ছোট আর তার ডানা নেই। জাবপোকা অতি জড় প্রকৃতির এবং সাধারণত গাছ পরীক্ষা করার সময়ে নিশ্চল হয়ে থাকে।

গরম আবহাওয়ায় জাবপোকাক বংশ তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। এই পোকা পাতার রস শুষে খায়, ফলে পাতা নিচের দিকে কুঁকড়ে যায় এবং হলদে হয়ে মরে যায়। আক্রমণ খুব বেশি হলে আলুর সমস্ত ফসলই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। খুব গরম আর শুষ্ক আবহাওয়ায় কিন্তু জাবপোকা অনেক কমে যায়।

জাবপোকা বেশির ভাগ ভাইরাস রোগই গাছ থেকে গাছে বয়ে নিয়ে যায়। এ পোকা আলু ফসলে এইভাবে ব্যাপক ক্ষতি ঘটায় বলে আলুচাষীদের ভয়ের কারণ।

প্রকৃতি

আলুর জাবপোকা এক ইঞ্চির প্রায় ছয়ের এক ভাগ লম্বা। এদের রঙ সবুজও হতে পারে, গোলাপী ধরনেরও হতে পারে। পরিণত সবুজ পীচ জাবপোকা আরো অনেক ছোট এবং সব্জেটে বা হলদেটে-সবুজ রঙের। পরিণত ‘বাক্থন’ জাবপোকা এর চেয়েও ছোট; এদের রঙ হয় হলদে থেকে গাঢ় সবুজ পর্যন্ত অথবা একেবারে কালো। পরিণত ‘ফক্সগ্লেভ’ জাবপোকাও সবুজ রঙের, সবুজ পীচ জাবপোকাক চেয়ে বড় আর আলুর জাবপোকাক চেয়ে ছোট।

বেশির ভাগ জাবপোকারই ডানা নেই ; কিন্তু ডানাওয়ালা কিছু জাবপোকা আলুচাষের খন্দে সব সময়েই দেখা যায়। আলুচাষের খন্দে এসব জাবপোকা থেকে বাচ্চা জন্মায়—যার বেশির ভাগই স্ত্রী-জাতের। দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে একটি স্ত্রী-জাবপোকা ৫০ থেকে ১০০টি পর্যন্ত বাচ্চা দিতে পারে। অনুকূল আবহাওয়ায় এক থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে এদের পুত্তলি পূর্ণাঙ্গ পোকায় পরিণত হয়। কাজেই এদের বংশবৃদ্ধি হয় খুব তাড়াতাড়ি।

আলুর জাবপোকা আলুগাছের পাতা আর কচি পত্রাকুর খেয়ে বাঁচে। আর যে তিন রকমের জাবপোকা, তারা গাছের আগার চাইতে মাঝের আর গোড়ার দিকে আক্রমণ চালায় বেশি। আক্রমণ বেশি হ'লে, গাছের পাতা আর ডাঁটা এক রকম চটচটে জিনিস জ'মে চকচকে হয়ে ওঠে—একে বলা হয় মৌ-লাগা। পরে তার উপর দাগ ধরে ধরে গাছটা হয়ে দাঁড়ায় যেন ধোঁয়ার কালি লেগেছে।

দমন

ডি-ডি-টি, প্যারাথিন বা নিকোটিন মিশ্রিত গুঁড়ো বা জল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আলুর জাবপোকা মেরে ফেলা যায়। ডি-ডি-টি আর প্যারাথিনই সবচেয়ে উপকারী। প্যারাথিন বিশেষ সাবধানে প্রয়োগ করতে হবে, কেননা এটা চূড়ান্ত বিপজ্জনক বিষ। ডি-ডি-টি দিয়ে আলুর অন্যান্য প্রায় সব রকম পোকাও দমন করা যায়। আর্দ্র আবহাওয়ায় প্রায়ই ছত্রাক-দমনের ওষুধের সঙ্গে এসব কীট-বিনাশী ওষুধও ক্ষেতে প্রয়োগ করা হয়, তাতে আলুর জাবপোকা আর রোগ—দু'এরই দমন হয়। 'হাইড্রেট অব লাইম' মিশ্রিত ছত্রাকবিনাশী ওষুধের সঙ্গে মেশালে ডি-ডি-টি আর প্যারাথিন তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় ; কাজেই এই ওষুধগুলি চুনের সঙ্গে মেশালে, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতে প্রয়োগ করতে হবে, ফেলে রাখা চলবে না। 'কপার অক্সাইড' অথবা 'ট্রাইবেসিক কপার সালফেট' ধরনের

কোন 'নিউট্রাল কপার কম্পাউন্ড' কিংবা কোন জৈব ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা উচিত। 'নিকোটিন সালফেট' কিন্তু 'হাইড্রেট অব লাইম' সংযুক্ত কোন মিশ্রণের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করা উচিত।

কীটবিনাশী ছিটাবার ওষুধ তৈরি করা

গুঁড়ো ওষুধের চাইতে ছিটাবার তরল ওষুধে ভাল কাজ হয়। ১২৫ গ্যালন জলের সঙ্গে কিংবা ছত্রাকবিনাশী তরল ছিটাবার ওষুধের সঙ্গে নিম্নোক্ত পরিমাণ কীটনাশক মিশিয়ে এক একর জমির ক্ষেতে প্রয়োগ করলে তাতে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।

ডি-ডি-টি : ২৫ শতাংশ দ্রবণীয় গাঢ় ডি-ডি-টির ২৫ গাঁইট অথবা ৫০ শতাংশ জলে-মিশ্রণযোগ্য ডি-ডি-টি-গুঁড়োর ৩৪ পাউন্ড। ছত্রাকবিনাশী হিসাবে যদি বোরদো-মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়, তা হ'লে জলে-মিশ্রণযোগ্য ডি-ডি-টি-গুঁড়ো ৫ পাউন্ড ব্যবহার করতে হবে।

প্যারাথিন : ২৫ শতাংশ দ্রবণীয় গাঢ় ওষুধের ১০ আউন্স অথবা ১৫ শতাংশ জলে-মিশ্রণযোগ্য গুঁড়োর ১ পাউন্ড কিংবা ২৫ শতাংশ জলে-মিশ্রণযোগ্য গুঁড়োর ১০ আউন্স।

নিকোটিন সালফেট (৪০ শতাংশ নিকোটিন) : ১৫ পাউন্ড। আলুগাছের পাতাগুলোর, বিশেষ করে নিচের পাতাগুলোর নিচের পিঠে ওষুধ ছড়াতে হবে, তার কারণ সে-রকম জায়গায় বহু জাবপোকা থাকে।

গুঁড়ো-ওষুধ ছড়ানো

শুকনো এলাকায় যেখানে বৃষ্টি কম হয় এবং বৃষ্টির জলে গাছ থেকে গুঁড়ো ধুয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই, সেখানে গুঁড়ো-ওষুধ ছড়ানোই লোকে পছন্দ করে। গুঁড়ো ছড়াবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, তা যেন পোকার গায়ে লাগে এবং তার আগে যেন পোকা উড়ে যেতে না পারে। একরপিছ ৩৫ পাউন্ড গুঁড়ো ছড়ালে ভাল ফল হয়। গুঁড়োর

সঙ্গে 'নিউট্রাল কপার' ছত্রাকনাশক যোগ করা যেতে পারে।

ডি-ডি-টি : ৩ শতাংশ ডি-ডি-টির সঙ্গে কোন একটা আর্ছাকা তেলের ২ শতাংশ যোগ করতে হবে।

নিকোটিন সালফেট (৪০ শতাংশ নিকোটিন) : 'হাইড্রেট অব লাইম'এ ৩ শতাংশ নিকোটিন থাকা চাই।

আলু-কন্দের প্রজাপতি

এ পোকের বৈজ্ঞানিক নাম *Phthorimea gnorimoschema operculella*। এরা আলুগাছের পত্রগুচ্ছে আর ক্ষেতে যেসব আলু মাটি থেকে তোলার আগে মাটির বাইরে বেরিয়ে পড়ে, সেসব আলুতে আক্রমণ চালায়। গুদামের আলুতেও এদের আক্রমণ চলে। বিশেষ করে গুদামে-থাকা অবস্থায় আলুতে এই পোকের আক্রমণে যে ক্ষতি হয় তাতে আলুর বাজারদর অত্যন্ত কমে যায়। হিসেব করে দেখা গেছে, গুদামে আলুর যত ক্ষতি হয়, তার শতকরা ২৫ ভাগই হয় এই পোকের দরুন।

পরিণত প্রজাপতি (মথ) গায়ের রঙ ধূসর এবং তার ডানাতে গাঢ় বাদামী বা কালো রঙের দাগ থাকে। এদের দেখতে পাওয়া যায় খুব কম, কেননা দিনের বেলা এরা লুকিয়ে থাকে আর রাতের বেলা সক্রিয় হয়।

স্ত্রী-প্রজাপতি সাধারণত আলুপাতার নিচের পিঠে অথবা মাটির বাইরে বেরিয়ে-পড়া আলুর চোখে ডিম পাড়ে। আলু তুলে, রাতের বেলা ক্ষেতে ফেলে রাখলে, তাতেও এরা ডিম পাড়তে পারে। গরমের সময় এদের জীবনচক্র মাত্র দু'সপ্তাহেই পূর্ণ হয়ে যেতে পারে। গরম গুদামে এদের জীবনচক্র সারা শীতকাল ধরেও আর্বাতিত হতে পারে। ক্ষেতে এরা শূককীট অথবা পুণ্ডলি অবস্থায় শীত কাটায়।

পূর্ণপুষ্ট শূককীট প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা হয়, তার মাথার রঙ হয় বাদামী আর গায়ের রঙ

গোলাপীমত সাদা, পিঠ ঘিরে দু'দিকে নেমে যায় লালচে রঙের চওড়া একটা বৃত্ত।

আলুগাছের পত্রগুচ্ছে রেশমের মত একটা জিনিসের বুনট দিয়ে দু'তিনটি পাতার ডগা জুড়ে নিয়ে, সেই নিরাপদ জায়গায় থেকে এরা ওই পাতা খায়। এরা গাছের ডাঁটা আর কান্ডের ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গ কাটতেও পারে। আলুর কন্দেও এরা সুড়ঙ্গ কাটে।

দমন

(১) এদের আক্রমণ রোধ করার একটা উপায় হচ্ছে অনাক্রান্ত বীজ বপন করা। গাছের গোড়ায় ঠিক ঠিক ভাবে মাটি তুলে দিতে হবে যাতে আলু না বেরিয়ে পড়। মাটির বাইরে আলু বেরিয়ে পড়লে পোকাতে তার উপর ডিম পাড়ে।

(২) মাটি থেকে তুলে আলু যেন রাতের বেলা ক্ষেতে ফেলে রাখা না হয় বা সেই আলুর স্তূপ আলুগাছ দিয়ে ঢেকে রাখা না হয়। যথাযোগ্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে আলু খোলা জায়গাতেই হোক আর গুদামেই হোক, স্তূপাকার করার মানেই হচ্ছে কন্দের পোকের বংশবৃদ্ধির নিশ্চিত সুযোগ করে দেওয়া।

(৩) ১০০ গ্যালন জলে ৫০ শতাংশ জলে-মিশ্রণযোগ্য ডি-ডি-টি-গুড়োর ২ পাউন্ড মিশিয়ে তা একবার কি দু'বার ছিটিয়ে দিলে আলুগাছের পত্রগুচ্ছে কন্দকীটের আক্রমণ বন্ধ হয়। কন্দের উপর পোকের আক্রমণ হলে ১ শতাংশ ডি-ডি-টি-গুড়ো ছড়ালে তা দমন হয়।

কাটুইপোকা

অনেক রকমের প্রজাপতির শূককীট আলুগাছের কান্ড একেবারে মাটির সামনে কেটে ফেলে—তা থেকেই এসব পোকের নাম হয়েছে 'কাটুইপোকা'। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কালো কাটুইপোকা (*Agrotis ypsilon*)।

বেশির ভাগ কাটুইপোকায় স্বভাব হচ্ছে, গাছের যতটা অংশ তারা কেটে নিয়েছে তার সামান্যই খায় এবং অকারণে অবিরত গাছের পর গাছ কেটে চলে। এইভাবে, কয়েকটি মাত্র পোকা রাতারাতি বহু গাছ নষ্ট করে ফেলতে পারে। কাটুইপোকা সময় সময় আলুর কন্দও খায়।

কাটুইপোকা ধূসর রঙের প্রজাপতিতে পরিণত হয়। তারা রাতের বেলা উড়ে উড়ে ফুলের মধু খায় এবং ঘাসের বা আগাছার ডাঁটায় কিংবা মাটিতে শতে শতে ডিম পেড়ে রাখে।

এদের শূককীটের অর্থাৎ কাটুইপোকায় স্বভাব হচ্ছে, উতাজ হ'লে এরা শরীর হালকাভাবে ঢেউ-খেলায়। দিনের বেলায় সদ্য-কাটা গাছের কাছাকাছি জায়গায় এদের সন্ধান মিলতে পারে। সকালবেলা অথবা রাতের বেলা হচ্ছে এদের খাওয়ার সময়।

দমন

(১) উপদ্রুত ক্ষেত্রে ১৫ দিন পরে পরে এক শতাংশ ডি-ডি-টি-মিশ্রণ ছিটিয়ে কাটুইপোকা দমন করা যায়। উপদ্রুত জায়গায় যেন ডি-ডি-টি-জল শূষে যায়। একরপিছ ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ ডি-ডি-টি-গুডো ৩০ পাউন্ড হিসাবে ছিটিয়েও ফল পাওয়া গেছে।

(২) বিষাক্ত খাদ্য ছিটিয়ে রাখলেও ফল পাওয়া যায়। ২৫ পাউন্ড শূকনো গমের ভূসির সঙ্গে ১ পাউন্ড 'সোডিয়াম ফ্লুওসিলিকেট' অথবা 'প্যারিস গ্রীন' মিশিয়ে জল দিয়ে একটু নরম করে নিয়ে বিষাক্ত খাদ্য তৈরি করা যায়। এ পোকায় উপদ্রব যেখানে দেখা যায়, সেখানে এই বিষাক্ত খাদ্য টুকরো টুকরো ছিটিয়ে রাখতে হয় পাতলা আর সমানভাবে। একরপিছ ১৫ থেকে ২০ পাউন্ড হারে ছিটিয়ে রাখতে হয়। সন্ধ্যার কিছ্র আগে ছিটিয়ে রাখাই ভাল। দরকার বুঝে মাঝে মাঝেই বিষাক্ত খাদ্য ছিটিয়ে রাখা যেতে পারে।

(৩) সম্ভবক্ষেত্রে জমিতে ভাল করে সেচ দেওয়া যেতে পারে; এতে দেখা গেছে, কাটুইপোকা মারা পড়ে।

গর্তের কিংকিপোকা

যে কিংকিপোকা (*Gryllotalpa africana*) মাটিতে গর্ত করে বাস করে, তারা সময় সময় গাছের শিকড়, কাণ্ড আর কন্দ খায়। এই পোকায় পা খাটো, শক্ত। এদের শাবলের মত গঠনের পা মাটি খুঁড়ে গর্ত তৈরি করার উপযোগী। এই কিংকিপোকা প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা। এদের গায়ের রঙ মখমলী-বাদামী।

দমন

এদের দমন করার সবচেয়ে বাস্তব পদ্ধতি হচ্ছে বিষাক্ত খাদ্যের টুকরো ছিটিয়ে রাখা। ১০ পাউন্ড শূকনো ভূসির সঙ্গে ১ পাউন্ড 'সোডিয়াম ফ্লুওসিলিকেট' বা 'প্যারিস গ্রীন' মিশিয়ে, একটু জল দিয়ে নরম করে নিয়ে, টুকরো টুকরো করে ছিটিয়ে দিতে হবে উপদ্রুত জায়গায়। কিংকিপোকা রাতের বেলা গর্তের উপরে উঠে আসে আহারের সন্ধানে; কাজেই বিষাক্ত খাদ্যের টুকরো সন্ধ্যাবেলা ছিটিয়ে রাখা ভাল।

শিকড়ের কুঁচপোকা

একই জমিতে ঘন ঘন আলুর চাষ করলে, কোন-বারে যখন দেখা যায় যে, আলুর ভাল হয় নি তখন বলা হয়, 'আলুর রোগ ধরেছে'। এই 'রোগ-ধরা'র কারণ হচ্ছে কুঁচপোকা (*Heterodera cootchiensis*)! অসংখ্য ডিমে ভর্তি থলির আকারে মাটিতে এই পোকায় সংক্রমণ হয়। হালকা মাটিতেই এদের আক্রমণ বেশি হয়। সাধারণত পাহাড়ী এলাকাতেই কুঁচপোকায় উপদ্রব হয়; সমতল অঞ্চলের আলুক্ষেত্রে এ পোকা কমই দেখা যায়।

সংক্রমিত মাটিতে যখন আলুর চাষ লাগানো হয়, তখন শিকড়ের রসক্ষরণের ফলে ডিমগুলো

ফুটে যায় এবং খালি থেকে কুঁচের শুককীট বা বাচ্চা বেরিয়ে আসে। মাটির মধ্যে এরা শিকড়ের সম্ভান করে এবং আলুগাছের শিকড় পেয়ে তার তন্তু আক্রমণ করে রস শুষে খায়। এতে অনেক কচি শিকড় মরে যায়, ফলে গাছের শিকড় আঁশের মত হয়ে পড়ে।

আক্রান্ত গাছের কান্ড প্রায়ই দুর্বল ও সরু হয়ে পড়ে, গাছের বাড় বন্ধ হয়ে যায় এবং তার রঙ হয়ে দাঁড়ায় ক্ষেতের আর-সব সাধারণ গাছের রঙের চেয়ে ফিকে। আক্রান্ত গাছের পাতাগুলি সাধারণ গাছের পাতার চেয়ে আকারে ছোট হয়, শব্দটোমত হয়ে পড়ে এবং অপরিণত অবস্থায় বন্ধ পড়ে। নিচের দিকের পাতাগুলি আগে শুকিয়ে যায় এবং ক্রমে গোটা গাছটাই শুকিয়ে মরে যায়।

দমন

(১) ক্ষেতের মাটিতে কুঁচের ডিম হ'লে তা ধ্বংস করার কোন বাস্তব পদ্ধতি আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি ; কাজেই, পরিষ্কার জমিতে এর সংক্রমণ রোধ করার জন্য যাবতীয় সম্ভব তাই করতে হবে। সবচেয়ে বিপজ্জনক হচ্ছে এ পোকাকার দ্বারা অধ্যুষিত মাটি বীজ-আলুতে লেগে থাকা।

(২) একই ক্ষেতে ঘন ঘন আলুচাষ করা উচিত নয়।

(৩) শুদ্ধমাত্র নির্দেশিত। আলুবীজই বপন করতে হবে। ক্ষেতে রোপণ করার আগে আলু-বীজ ধুয়ে নেওয়া উচিত।

(৪) বেশি মাত্রায় আক্রমণ যে-ক্ষেতে হয়েছে, সেখানে আলু, বাঁধাকপি প্রভৃতি ছাড়া অপর ফসল লাগিয়ে শস্যপর্বায় করা উচিত।

চিমড়ে পোকা

অনেক রকম ছোট ছোট পাতাথেকো পোকা আলুগাছের পত্রগুচ্ছের অত্যন্ত ক্ষতি করে। সাধারণত Epilechna নামক পোকাই আলু-ক্ষেতে বেশি উৎপাত করে।

ধাড়ি চিমড়েপোকা খেয়ে খেয়ে গাছের পাতায় ছোট ছোট ফুটো করে ফেলে, ফলে পাতা ফোঁপরা হয়ে যায়। বেশি-খাওয়া পাতাগুলি শুকিয়ে মরে যায় এবং আলুর কন্দের বাড় কমে যায়। চিমড়ে-পোকা 'রোগা-আলু', 'বাদামী-পচা' প্রভৃতি আলুর রোগ ছড়ায়।

এই পোকাকার শুককীট আলুগাছের মাটির নিচেকার অংশে আক্রমণ চালায়। এদের খাওয়ার ফলে প্রায়ই আলুগাছে নানারকম রোগের সংক্রমণ হয়।

দমন

৫ শতাংশ ডি-ডি-টি-গুঁড়ো ছড়িয়ে চিমড়েপোকা দমন করা যায়। এদের আক্রমণের সঙ্গে যদি ধসা-রোগ দেখা দেয় তা হ'লে এই গুঁড়োর সঙ্গে একটা 'নিউট্রাল কপার' ছত্রাকনাশক মেশানো যেতে পারে।

৩০ শতাংশ জলে-মিশ্রণযোগ্য ডি-ডি-টি-গুঁড়োর ৩ পাউন্ড জলের সঙ্গে মিশিয়ে ছিটানো যেতে পারে।

গুঁড়ো-ডি-ডি-টি গাছের আকার বৃদ্ধি একরূপিছ ২০ থেকে ৩৫ পাউন্ড পর্যন্ত ছিটানো যেতে পারে। তরল ডি-ডি-টি-মিশ্রণ একরূপিছ ১০০ থেকে ১২৫ গ্যালন পর্যন্ত ছিটানো যেতে পারে। ৮ থেকে ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার ডি-ডি-টি প্রয়োগ করলেই এ পোকা সম্পূর্ণ দমন করা যায়।

টুকিটাকি

চন্দননগরে নারকেল-দিবস

চন্দননগরে রাজ্যসরকারের নারকেলবাগানে এই অগাস্ট পশ্চিমবঙ্গের অখিল ভারত নারকেল-দিবস উদ্‌যাপিত হয়। মৃদুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় একজন কৃষকের কাছে একাটি নারকেলচারা বিক্রি করে অনুষ্ঠানের উদ্‌ঘোষন করেন। এর পরে সরকারী নারকেলবাগানে উৎপাদিত প্রায় ৬০ হাজার চারা বিক্রি ও বিতরণ করা হয়।

এ উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় মৃদুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে, যেখানে খাদ্য-সমস্যা আর বেকারসমস্যা সমান সংকটজনক, নারকেলচাষের গুরুত্ব খুবই বেশি। তিনি কৃষি-বিশেষজ্ঞদের অভিমত উদ্ধৃত করে দেখান যে, এক একর জমিতে নারকেলের চাষ করলে, তা থেকে বছরে ১,০০০ টাকা আয় হয়, আর এক একর জমিতে ধানের চাষ করলে, তা থেকে বছরে আয় হয় ৩০০ টাকা; সুতরাং কিছু ধানী জমিকে নারকেলবাগানে পরিণত করলে সুবিবেচনারই পরিচয় দেওয়া হবে। তিনি বলেন যে, ধানচাষের চেয়ে নারকেলচাষে মোটের উপর আয় বেশি তো হয়ই, তা ছাড়া নারকেলচাষের উপর নির্ভরশীল কতকগুলো শিল্প আছে যেগুলো বহু মধ্যবিত্ত ও বেসরকারী ক্ষুদ্রশিল্পের মালিকদের কাছে কর্ম-সংস্থানের নতুন পথ খুলে দেবে। নারকেলচাষীরা যাতে যথার্থ ভাল চারা সহজে পেতে পারেন, তার জন্য মৃদুখ্যমন্ত্রী প্রস্তাব করেন যে, সরকারী বাগান-গুলোতে নারকেলচারার উৎপাদন বাড়ানো হোক।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষিমন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ। নারকেলদিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি নারকেলচাষে আত্মনিয়োগ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের চাষীদের কাছে আবেদন জানান। তিনি বলেন যে, এতে শুধু নারকেলচাষীদেরই নয়—সমগ্র রাজ্যেরই কল্যাণ হবে।

নারকেল-ছোবড়ার গদি ও দড়ি, নারকেলতেল প্রভৃতি নারকেল থেকে জাত প্রায় ৬ কোটি টাকার বিভিন্ন আমদানি-দ্রব্যের উপর কীভাবে পশ্চিম-বঙ্গকে নির্ভর করতে হয়, কৃষি-অধিকর্তা ডক্টর হীরেন্দ্রকুমার নন্দী তাঁর ভাষণে তা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, বেশি ধানের চাষ যেসব জায়গায় আর্থনীতিক দিক দিয়ে অবাঞ্ছনীয়, সেসব জায়গায় যদি নারকেলবাগান করা যায় এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে নারকেলের সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করা যায়, তা হলে এ আমদানি সহজেই এড়ানো যায়। পশ্চিমবঙ্গে যে এখনও খাদ্য-উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং সেইজন্য ধানী জমিকে নারকেলবাগানে পরিণত করা বাঞ্ছনীয় নয়—সেই তথ্যের উল্লেখ করে কৃষি-অধিকর্তা বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ জমিতে যত ফসল উৎপাদিত হয়, জাপানে তার চেয়ে অনেক কম জমিতে অনেক বেশি ফসল জন্মানো হয়। তিনি বলেন, বিরাট এলাকা জুড়ে বিস্তৃতভাবে খাদ্য-শস্যের চাষ করে আমাদের খাদ্যসমস্যার সমাধান করা যাবে না, উন্নত কৃষিপ্রণালীতে নিবিড় চাষ করে কম জমিতে বেশি খাদ্যশস্যের উৎপাদন করতে হবে।

রাজ্যের কৃষকদের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ কৃষকসমাজের আহ্বায়ক শ্রীরাসবিহারী চৌধুরী নারকেলচাষের উন্নয়নকর্মসূচির সাফল্যের জন্য সরকারের সঙ্গে সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। কৃষি, পশুপালন ও বন বিভাগের সচিব শ্রীচারুকুমার রায় মৃদুখ্যমন্ত্রী ও সমাগত অন্যান্য অতিথিগণকে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে নারকেলের মালা ও ছোবড়া থেকে তৈরি নানা শিল্পদ্রব্যের এক প্রদর্শনীর আয়োজন হয়।

উন্মাস্তু-হস্তশিল্পের দ্রুত উন্নতি

১৯৫০-সালের অগাস্ট মাসে তৎকালীন উন্মাস্তু-পুনর্বাসন-মন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায়ের উদ্যোগে উন্মাস্তু তন্তুবায় ও কারিগরদের এবং উন্মাস্তুদের আর্থিক পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে যে উন্মাস্তু-হস্ত-শিল্প সংস্থা স্থাপন করা হয়, তা গত তিন বৎসর ধরে দ্রুত অগ্রগতির পথে চলেছে। প্রথম দিকে ১৯৫০-৫৪ সালে উন্মাস্তু-হস্তশিল্পে যে টাকা খাটানো হয়েছিল, তার পরিমাণ ছিল ১০,০০০, এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৭,২৫,০০০। খাদ্য, দ্রাণ, সরবরাহ এবং উন্মাস্তু-পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ৮ই জুলাই (১৯৫৭) সকালে উন্মাস্তু-হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে এসে এ তথ্য জেনে সন্তুষ্ট হন। এর পরিচালক-সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী সীতা চৌধুরী এবং ঐ সংস্থার অন্যান্য কর্মী ও সদস্যগণ মন্ত্রি-মহাশয়কে অভ্যর্থনা জানান। এই পরিদর্শনকালে অন্যান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লোক-সভার সদস্য শ্রীমতী রেণুকা রায়, উন্মাস্তু-পুনর্বাসন বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উন্মাস্তু-পুনর্বাসন-মহাধ্যক্ষ শ্রী এ ডি খাঁ, আই সি এস।

উন্মাস্তুদের উৎপাদিত দ্রব্যের বিপণনসংস্থার বিভিন্ন বিভাগ মন্ত্রিমহাশয়কে দেখানো হয়, এবং গত তিন বৎসরে এই সংস্থার যে উন্নতি হয়েছে, তাঁকে তা বিশদভাবে জানানো হয়।

উন্মাস্তু-হস্তশিল্প শুদ্ধ উৎপাদন-পরিমাণের দিক দিয়ে নয়—অন্যান্য দিকেও উন্নতিলাভ করেছে। এই সংস্থার সাহায্যে ১৯৫০-৫৪ সালে যেসকল তন্তুবায় কর্মলাভ করেছিলেন, তাঁদের মোট সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০, সেস্থলে ১৯৫৬-৫৭ সালের সংখ্যা হচ্ছে ৫,০০০। দর্জি-বিভাগে উন্মাস্তু-হস্ত-শিল্পের মাধ্যমে ১৯৫০-৫৪ সালে যেসকল উন্মাস্তু কর্মলাভ করেছেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল ৪৫০, সেস্থলে ১৯৫৬-৫৭ সালে ঐ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২,৫০০। ১৯৫৬-৫৭ সালে এই সংস্থা বিভিন্ন

শ্রেণীর তন্তুবায় ও দর্জির মাহিনা বাবত ২২,৩২,০০০ টাকা দিয়েছে। এই সংস্থার সাফল্য লক্ষ্য করলে মনে হয় অধিকতর সংস্থান এর হাতে থাকলে, তাও সম্পূর্ণভাবে উৎপাদন-পরিচালনায় নিয়োগ করার ক্ষমতা এর আছে।

সরকারের কাছ থেকে প্রথম দিকে যে ঋণ নিয়ে উন্মাস্তু-হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছিল, তা গোধ করা হয়ে গেছে, অধিকন্তু ১৯৫৭ সালের ৩১এ মার্চ যে বৎসর শেষ হয়েছে, সেই বৎসরে ১,০৫,০০০ টাকা লাভ হয়েছে।

বিভিন্ন উপায়ে যাতে এই সংস্থার কর্ম অধিকতর বিস্তৃত হয় সে সম্পর্কে শ্রী সেন পরিচালক-সমিতির সদস্যদের সহিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, বিক্রয়যোগ্য উৎকৃষ্ট শাড়ি, ধুতি এবং অন্যান্য তাঁতবস্ত্রের কথা বিবেচনা করে দেখলে উন্মাস্তু-হস্তশিল্প সংস্থার উচিত অধিকসংখ্যক বৃহৎ বিপণনকেন্দ্র এর শাখা স্থাপন করা। উত্তর-পাড়া, কৃষ্ণনগর, শিলিগুড়ি প্রভৃতি যেসব জায়গায় উন্মাস্তু-সমাবেশ রয়েছে, সেইসব অঞ্চলেও এর শাখা স্থাপন করার কথাও আলোচনা করা হয়।

মহিষরেখায় অধিক খাদ্য উৎপাদন সম্মেলন

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া থানা এলাকার মহিষরেখা ডাকবাংলোয় সম্প্রতি অধিক খাদ্য উৎপাদন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বহু কৃষক ও গ্রামবাসী এই সম্মেলনে যোগদান করেন। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিমন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। অধিক খাদ্য উৎপাদন আন্দোলনকে সফল করে তোলার উদ্দেশ্যে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য মন্ত্রি-মহোদয় তাঁর ভাষণে জনসাধারণের নিকট আবেদন জানান। তিনি কৃষিকার্ষে উন্নত প্রণালী প্রবর্তনের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করে বলেন যে, কেবল এর দ্বারাই দেশের খাদ্যসমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন, এম এল এ, প্রধান-অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীঅমল গগো-পাধ্যায়, এম এল এ এবং শ্রীবিভূতি ঘোষও সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

কোম্বাগর কুটিরশিল্প

পশ্চিমবঙ্গের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার ২৬এ মে হুগলি জেলার কোম্বাগরে কলিকাতার বহু প্রখ্যাতনামা শিল্পপতি ও কতিপয় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী সহ বহু লোকের উপস্থিতিতে ৫০টি হস্তচালিত তাঁত সমন্বিত “কোম্বাগর কুটিরশিল্প” নামক একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। শ্রীফুলচাঁদ ভগত এই প্রতিষ্ঠানের মালিক। উদ্বোধন-ভাষণে মন্ত্রিমহাশয় বড় বড় শিল্পপতি ও উদ্যমশীল ক্ষুদ্রশিল্পের উদ্যোগীদের অনুরূপ যুক্ত প্রচেষ্টার সম্ভাবনা সম্পর্কে এবং পশ্চিমবঙ্গে হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত দ্রব্যাদির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের জনসংখ্যার একক-প্রতি হস্তচালিত তাঁতের গড় সংখ্যার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে আরও এক লক্ষ হস্তচালিত তাঁত থাকতে পারে এবং অন্য কয়েকটি রাজ্যের সঙ্গে তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে আরও অল্পত দুই লক্ষ হস্তচালিত তাঁত পেতে পারে। সুতরাং শ্রী মজুমদার এই আশা প্রকাশ করেন যে, বিশেষ করে এই শিল্পে কর্মসংস্থানের বৃহৎ সম্ভাবনা আছে বলে এই শিল্পে অনুরূপ আরও সমবায়মূলক প্রচেষ্টা দেখা যাবে।

রাজ্য পরিসংখ্যান সংস্থার অধিকর্তা এবং পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পরিসংখ্যান-উপদেষ্টা শ্রী এন চক্রবর্তী কোম্বাগর কুটিরশিল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানে জিনিসপত্র তৈয়ারির যে কৌশল অবলম্বিত হবে তা বর্ণনা করেন। এই কৌশলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, একটি কাপড়ের কলের সহযোগিতায় এখানে কাজ চলবে। কাপড়ের কলটি প্রারম্ভিক কাজ-গুলির ভার নেবে। নতুন প্রতিষ্ঠানে বসনের কাজ হবে এবং উৎপাদিত কাপড়গুলি উক্ত কাপড়কলে চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে।

কৃষি-আয়ের হিসাব দাখিল

১৯৪৪ সালের বঙ্গীয় কৃষি-আয়কর আইনের বিধান অনুযায়ী পূর্ব পূর্ব বৎসরের মত এবারেও ১৯৫৭-৫৮ করনির্ধারণ-বর্ষ সংক্রান্ত কৃষি-আয়ের হিসাব দাখিল করার জন্য আহ্বান জানিয়ে এক সাধারণ বিজ্ঞপ্তি ১৯৫৭ সালের ২২এ এপ্রিল কলিকাতার কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছিল। সরকারের এমন বিশ্বাস করার কারণ ঘটেছে যে, ১৯৫৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূসম্পত্তি-গ্রহণ আইনের বিধান অনুযায়ী মধ্যস্বত্বাধিকারী এবং অন্যান্য কয়েক প্রকার জমির মালিকদের সম্পত্তি দখল সত্ত্বেও তাঁদের এরূপ আয়ের হিসাব দাখিল করতে হবে কিনা সে বিষয়ে কিছু সন্দেহ রয়েছে। সুতরাং জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, রাষ্ট্র কর্তৃক কয়েক প্রকার ভূস্বামীর সম্পত্তি দখল সত্ত্বেও কোন কোন লোককে ১৯৫৭-৫৮ করনির্ধারণ-বর্ষের জন্য কৃষি-আয়কর দিতেই হবে। অতএব, আয়ের হিসাব দাখিল করতে হবে, কি হবে না—এ বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকলে তিনি যেন পরামর্শের জন্য এবং তাঁর কোন অসুবিধা থাকলে তা জানাবার জন্য নিজ এলাকার কৃষি-আয়কর-আধিকারিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

শস্য-উৎপাদন-প্রতিযোগিতা

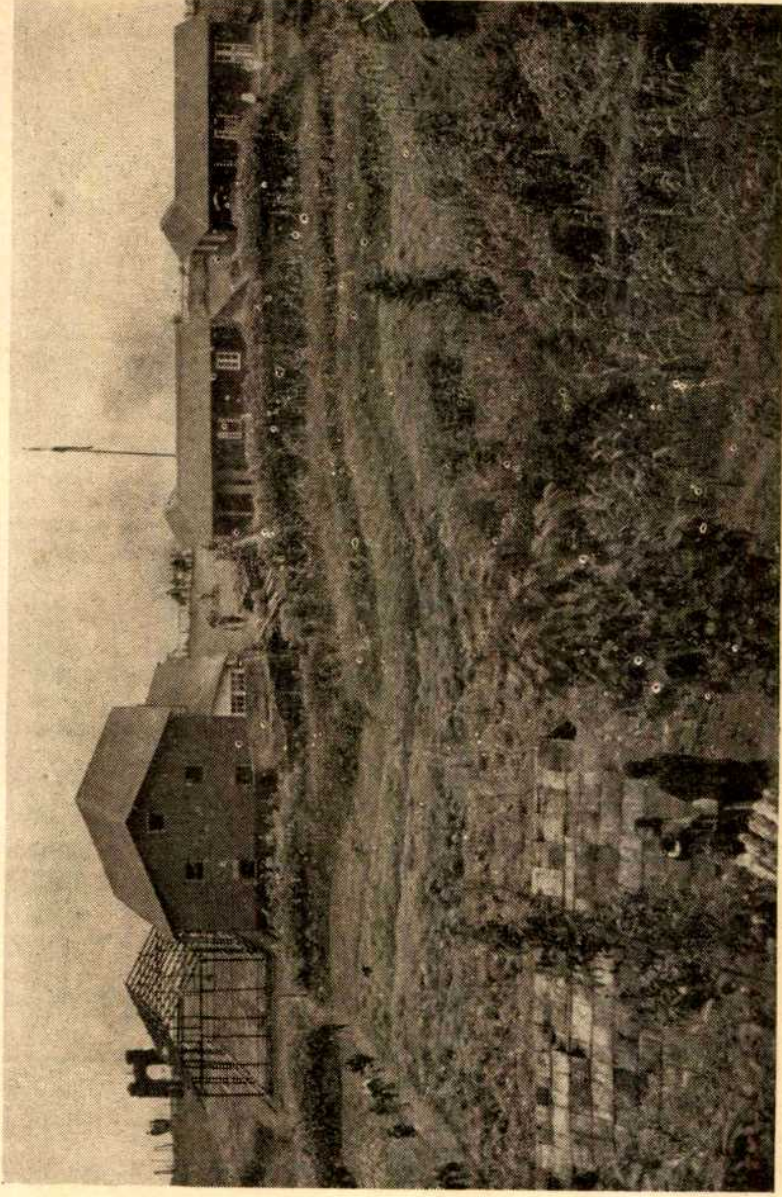
আগের বছরগুলোর মত ১৯৫৭ সালেও পশ্চিম-বঙ্গে ধান, আলু ও গমের উৎপাদন-প্রতিযোগিতার আয়োজন হচ্ছে। ইউনিয়ন, জেলা ও রাজ্য পর্যায়ে সরকার থেকে পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রতিযোগীদের ৩০ টাকার প্রথম পুরস্কার এবং ২০ টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া হবে। জেলা পর্যায়ে ২০০ টাকার প্রথম পুরস্কার এবং ১৫০ টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া হবে। রাজ্য পর্যায়ে দেওয়া হবে প্রথম পুরস্কার ১,০০০ টাকার, দ্বিতীয় পুরস্কার ৭৫০ টাকার এবং ৩য় পুরস্কার ৫০০ টাকার। প্রত্যেক প্রতিযোগিতার জন্য প্রত্যেক প্রতিযোগীকে এক টাকা প্রবেশদক্ষিণা দিতে হবে।

সম্পাদক : শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মাস্কর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী

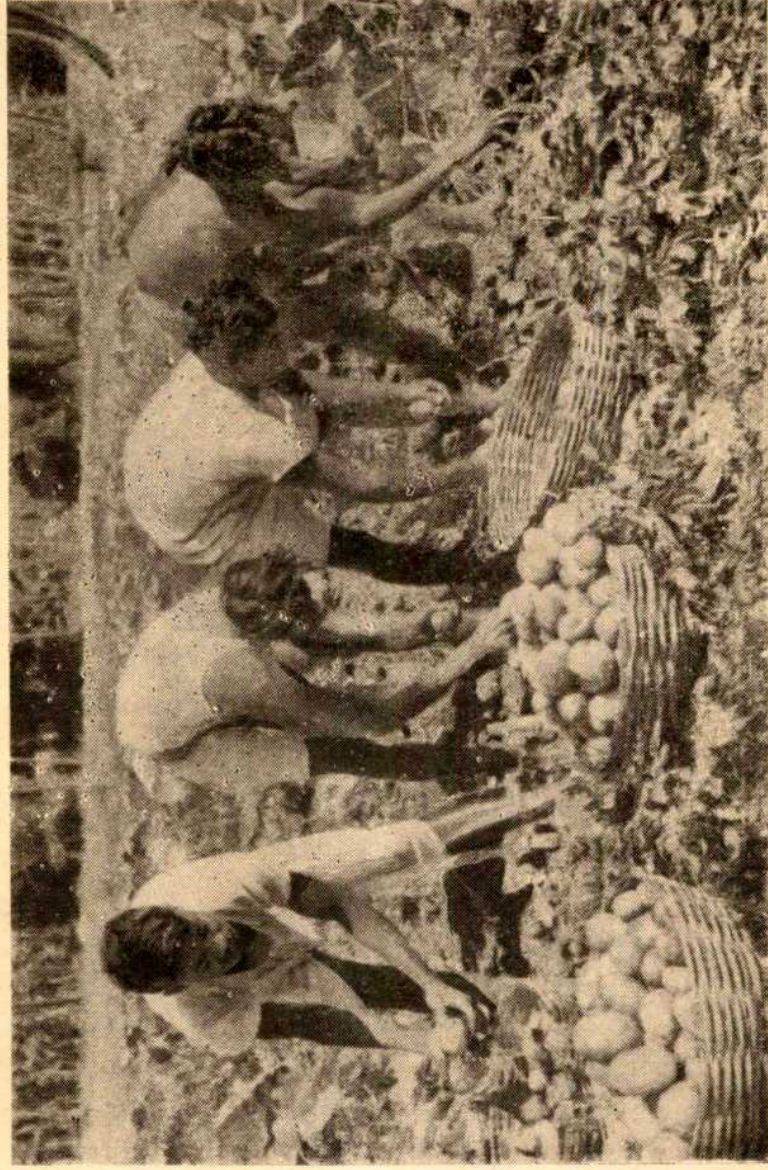
মুদ্রণে অধ্যক্ষ শ্রীশুভেন্দ্র মুনোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

বসুন্ধরা : জাম্বিন : ১৩৬৪



দাজিলিংয়ের রংবুলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বীজ-আলু উৎপাদনকেন্দ্রের একাংশ

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা



হুগলি জেলার একজন চাষীর আলুক্ষেতে সরকারী বাঁজ-আলু রোপণ করে তা থেকে যে আলু পাওয়া গেছে, তা আকারে যেমন বড়, গুণেও তেমনি শ্রেষ্ঠ। সরকারী ঠাণ্ডাঘরে রক্ষিত বাঁজ-আলু লাগিয়ে সর্বদাই এরকম ফলন পাওয়া যাচ্ছে। [২০৮ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]

বন্ধুরা

১০ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন, ১৩৬৪

প্রসঙ্গ

যেসব খাদ্য না হ'লে বাঙালীর আহার অচল, তার মধ্যে প্রধান একটি হচ্ছে মাছ। সর্বপ্রধান খাদ্য 'ভাত'এর সঙ্গে এজন্যই 'মাছ' শব্দটি জুড়ে গেছে। এক কথায় বলা হয়, 'মাছ-ভাত' বাঙালীর খাদ্য। প্রত্যেক জায়গারই অধিবাসীদের আহাৰ্য নিৰ্ভর করে সেখানকার পরিবেশের উপর। এ রাজ্যের মাটিতে ধান জন্মায় বেশি, তাই এখানকার লোকের প্রধান খাদ্য ভাত। বাংলাদেশ জলবহুল, তাই এখানে মাছ জন্মায় বেশি, কাজেই এখানকার অধিবাসীদের প্রধান আনুষঙ্গিক খাদ্য মাছ।

দেশবিভাগ হওয়ার আগে পূর্ববঙ্গ ছিল বাঙালীর মৎস্যভাণ্ডার। পূর্ববঙ্গে জলভূমি বেশি, মাছও জন্মায় বেশি। কিন্তু দেশবিভাগের পরে পূর্ববঙ্গ যখন আলাদা হয়ে গেল, তখন থেকে পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিয়েছে মাছের অভাব। অথচ মাছের মত স্বাদু, পুষ্টিকর এবং প্রিয় খাদ্য বাঙালীর আর একটিও নেই।

মাছের অভাবের সমস্যা মেটাবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে নানা দিক দিয়ে যেসব চেষ্টা করা হচ্ছে, 'বসুন্ধরা'য় মাঝে মাঝে তার আলোচনা হয়েছে। কিন্তু জনসাধারণের সক্রিয়তা ছাড়া কখনও সরকারী প্রচেষ্টা সফল হতে পারে না। পশ্চিম বাংলায় পুকুর দিঘি খাল বিল নদী নালা বিস্তার রয়েছে এবং এসবই হচ্ছে মাছ জন্মাবার জায়গা। অথচ একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এ রাজ্যের বেশির ভাগ জলভূমিতেই মাছের চাষ হয় না। মৎস্যপ্রধান রাজ্যের মৎস্যপ্রিয় অধিবাসীদের পক্ষে এর চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার আর কী হ'তে পারে!

মালিকের অল্পে অনেক পুকুর-দিঘি হেজেমজে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এগুলিকে পরিষ্কার করে মাছের চাষ করলে, এই প্রিয় খাদ্যের অভাব ঘুচবার সঙ্গে সঙ্গে কিছু অর্থের সংস্থানও হয়। মালিক যেখানে অর্থভাবে পুষ্কারিণীর সংস্কার করতে পারছেন না, সেখানে সে উদ্দেশ্যে সরকার থেকে অর্থসাহায্য করার ব্যবস্থা রয়েছে।

নিজস্ব পুকুর-দিঘি প্রভৃতিতে যাঁরা মাছের চাষ করেন, তাঁদেরও বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে বড় একটা দেখা যায় না। বর্ষাকালে যারা চারাপোনা বিক্রি করতে আসে, তাদের কাছ থেকে কিছু পোনা কিনে পুকুরে ছাড়া হয়। হয়তো সেই পুকুরে বোয়াল-গজালের আস্তানা রয়েছে। কিছুকাল পরেই দেখা যায়, কচি পোনাগুলোকে সেই রাস্কুসে মাছেরা খেয়ে উজাড় করেছে। কোন মালিক হয়তো আশেপাশে প্রচুর মাছ পাবার আশায় তাঁর পুকুরে এত চারাপোনা ছাড়লেন যে, তত মাছের পক্ষে সেই সীমাবদ্ধ জলে বেঁচে থাকা অসম্ভব। আবার অনেকের ধারণা, পুকুরের তলায় প্রচুর পাঁক জমলে, তা থেকেই মাছের খাদ্যের সংস্থান হয়; কিন্তু এটা ভুল ধারণা। পুকুরের তলা-ভর্তি পাঁক থেকে অনেক সময় বিসক্রিয়া হয়ে সব মাছ মরে যায়। এসব নানা দিক বিবেচনা করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাছের চাষ করতে হবে।

ভাল আর বেশি ফসল জন্মাতে হ'লে যেমন জমিতে ভাল জাতের সুপুষ্ট বীজ বোনা দরকার, মাছের চাষেও তেমনি সুফল পেতে হলে, ভাল জাতের সুস্থ পুষ্ট চারাপোনা পুকুরে ছাড়া দরকার।

সাধারণ চারাপোনা-বিক্রেতাদের কাছে ভাল পোনা পাওয়ার আশা করা যায় না, কেননা তারা যেনতেন উপায়ে পোনা জন্মায়, তার জাতের দিকে বা পুষ্টির দিকে কোন লক্ষ্য তাদের থাকে না। সরকার থেকে তাই ভাল জাতের সুস্থ পুষ্ট চারাপোনা জন্মাবার ব্যবস্থা হয়েছে; মাছের চাষে উৎসাহী ব্যক্তিরা যোগাযোগ করলেই সেই পোনা পেতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের মীনপোষ অধিকার এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তার শাখা কার্যালয়গুলি মাছের চাষের ব্যাপারে নানা দিক দিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত রয়েছে, উৎসাহী ব্যক্তিরা এগিয়ে এলেই তার সুযোগ নিতে পারেন।

এ গেল ব্যক্তিগত বা ছোটখাট মাছচাষের কথা। এ রাজ্যের নানা জায়গায় বিল ঝিল প্রভৃতি নানা ধরনের বিস্তীর্ণ জলা অযথা পড়ে আছে। এসব জলায় যথাযথ বৈজ্ঞানিক রীতিতে মাছের চাষ করলে, এ রাজ্যের মাছের অভাব অনেক কমে যেতে পারে। কিন্তু একা কোন লোকের চেষ্টায় এ রকম জলায় মাছের চাষ হওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য চাই সংঘবদ্ধ শক্তি। তার জন্য সমবায় নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের পত্রিকায় “বিদ্যাধরী স্পিল সমবায় মৎস্যজীবী সমিতি”র উল্লেখ অনেক বারই হয়েছে। বিস্তীর্ণ জলাকে অবলম্বন করে সমবায়ের মাধ্যমে মাছের চাষে এবং ব্যবসায়ে যে কতখানি উন্নতি করা যায়, এই প্রতিষ্ঠান তার আদর্শস্থল। সম্প্রতি গঠিত হয়েছে “সুন্দরবন মৎস্যজীবী কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি”। ১৮ই ভাদ্র কলিকাতার আউটরাম ঘাটে মৃণ্মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এর উদ্বোধন করেছেন। এর বিবরণ এ সংখ্যার অন্যত্র দেওয়া হল। তা থেকে বোঝা যাবে, এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাবহুল।

যেখানেই সম্ভব, সেখানেই আজ মাছের চাষের জন্য, মাছ ধরার জন্য, মাছের বিপণনের জন্য সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে হবে। সমবায় বহু দেশকে, বহু জাতিকে উন্নতির শীর্ষস্থান দিয়েছে, আমাদেরও সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য সকল ক্ষেত্রে সমবায়ের আশ্রয় নিতে হবে। ব্যক্তিগত আর সমবেত প্রচেষ্টায় যৌদীন ছোট-বড় সমস্ত জলা মাছের চাষে ছেয়ে যাবে, মাছের উৎপাদনে এ রাজ্য সৌদীন স্বয়ংপূর্ণ হয়ে উঠবে।



জমিদারী গ্রহণ পরিকল্পনার

বাস্তব রূপায়ণ

জীবিমলচক্র সিংহ

পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী

পশ্চিম বাঙলা শিল্পে যথেষ্ট অগ্রসর হ'লেও এখনও বস্তুত তা কৃষিপ্রধান এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। গত সেন্সাসে দেখা গেছে, পশ্চিম বাঙলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৭.২১ কৃষিজীবী, ৬.৭১ শিল্পাশ্রয়ী এবং ৩৬.০৮ অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করে আছে। কাজেই কৃষিই যে সর্বপ্রধান জীবিকা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেন্সাস রিপোর্ট বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, যদি হিসাবের মধ্য থেকে কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলগুলি বাদ দিয়ে দেওয়া যায় তা হ'লে আমাদের রাজ্যের বাকি অংশটি উড়িষ্যার চেয়েও গ্রামাশ্রয়ী এবং গ্রামীণ বৃত্তির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কৃষির সম্বন্ধে পশ্চিম বাঙলার চিন্তা করার যথেষ্ট কারণ আছে। তার উপর পশ্চিম বাঙলায় জনসংখ্যার চাপ যে রকম দ্রুতগতিতে বাড়ছে তাতে দেখা যাচ্ছে, এতকাল পর্যন্ত যেসমস্ত লোক কৃষিব্যতিরিক্ত জীবিকার উপরই প্রধানত নির্ভর করত এখন আর তাদের সে অবস্থা থাকছে না—তাদেরও কৃষির উপর নির্ভরতা ক্রমবর্ধমান। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের, বিশেষত কুটির-শিল্পের দ্রুত প্রসার যেমন অবশ্যপ্রয়োজনীয়, তেমনই কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি এবং গ্রামাঞ্চলের আয়বৃদ্ধি বোধহয় তার চেয়েও অপরিহার্য।

এই রকম উন্নতির কথা ভাবতে গেলে দু'টি কথা ভাবতে হয়। প্রথমত এর জন্য কৃষির কৌশলের উন্নতি দরকার। ভাল সেচব্যবস্থা, ভাল জলনিকাশ-ব্যবস্থা, উন্নত ধরনের বীজ, সার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তার অন্তর্গত। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এদিকে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু সেইসঙ্গে আরও একটা দিক আছে। সম্ভবত সেই দিকটা বৃহত্তর। ভাল সারও দিলাম, বীজও দিলাম, কিন্তু তার ব্যবহার চাষীরা কেন করতে যাবে যদি তাদের

মাথার ঘাম পায়ে ফেলার উপযুক্ত পুরস্কার তারা না পায়? কী উৎসাহ হবে তাদের, যদি তাদের উৎপন্ন ফসলের বা আয়ের সিংহভাগ চলে যায় জমিদার, মহাজন বা অপরের হাতে? কী উৎসাহ থাকবে বর্গাচাষীর যদি সে সর্বদাই শঙ্কিত থাকে যে, আজ যে-জমি সে চাষ করছে কাল হয়তো সেই জমি থেকে সে বিতাড়িত হবে এবং তখন আর তার কোনও ভবিষ্যৎই থাকবে না?

তা হ'লেই কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, শুধু উন্নততর চাষের ব্যবস্থা করলেই হবে না—সেইসঙ্গে ভূমি-ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার সেইজন্য এদিকে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী দখল আইন ১৯৫৪ সালে ও ভূমিসংস্কার আইন ১৯৫৬ সালে পাস হয়। প্রথম আইনটি হচ্ছে প্রধানত জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব উচ্ছেদ করে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্যে। এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তখন পুরোপুরি ভূমিসংস্কার-ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হবে।

জমিদারী দখল আইন অনেক দিন চালু করা হয়েছে এবং তার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। তার মূল কথা হচ্ছে:

- (১) রাষ্ট্র ও প্রজার মধ্যে কোনও মধ্যস্বত্ব থাকবে না—সবই উচ্ছেদ করা হবে।
- (২) যাঁরা উচ্ছেদ হবেন তাঁরা কিছু জমি নিজেদের প্রয়োজনে বা চাষের জন্য রাখতে পারবেন। সেই জমির পরিমাণ, চাষের ক্ষেত্রে, হ'ল উর্ধ্বপক্ষে ২৫ একর। এ ছাড়া বাস্তু-জমি ও অকৃষি জমিও কিছু রাখবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

(৩) প্রত্যেক জমিতেই খাজনা ধার্য হবে।

ভূমিসংস্কার-আইনে যে নতুন খাজনার ব্যবস্থা করা হয়েছে তা চালু না হওয়া পর্যন্ত এইসব জমির উপর বর্তমান হারে খাজনা ধার্য হবে।

(৪) মধ্যস্বত্ব-বিলোপের ফলে যেসব চাষী এখন সরকারের সাক্ষাৎ প্রজা হলেন, তাঁরা যে-হারে যে-খাজনায় ভূমি দখল করাছিলেন তাঁদের সেইভাবেই থাকতে দেওয়া হবে। কিন্তু যাঁরা শস্যে খাজনা দিতেন, তাঁদের আগে একরপিছর প্রায় ৪০ টাকা খাজনা দিতে হ'ত। তাঁদের একরপাতি মাত্র ৯ টাকা দিতে হবে।

(৫) সরকারের হাতে যেসমস্ত জমি এসেছে সেইসব জমির বর্ণাদারদের এখন থেকে একর-পাতি মাত্র ১০ টাকা দিতে হচ্ছে। অবশ্য এটা সাময়িক ব্যবস্থা।

ভূমিসংস্কার-আইন প্রচলিত হ'লে সেই আইনে নির্দিষ্ট রীতি অনুসারে এই জমির বন্দোবস্ত ও খাজনা ধার্য হবে।

জমিদারী-দখল আইনের দ্বারা মধ্যস্বত্ব-বিলোপের ফলে যাতে বিশেষ করে অল্প আয়ের মধ্যস্বত্বাধিকারিগণ বিপন্ন না হয়ে পড়েন তার জন্য পূর্ণ ক্ষতি-পূরণ দেওয়ার আগেই সাময়িক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতি বৎসরই বাৎসরিক নীট আয়ের এক-তৃতীয়াংশ, দরখাস্ত করলে, দেওয়া হয়। এ ছাড়া দেবসেবার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তিগুলির বাৎসরিক নীট আয়ের সমস্তই সাময়িক ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়া হচ্ছে। তা ছাড়া বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে বিপন্ন মধ্যস্বত্বাধিকারী দরখাস্ত করলে সাময়িক ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অনেকাংশে বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু এসবের চেয়েও গুরুতর প্রশ্ন হ'ল ভবিষ্যৎ ভূমিব্যবস্থা। ভূমিসংস্কার-আইনের ৪৯ ধারায় বলা হয়েছেঃ

(১) ভবিষ্যতে ভূমিরাজস্বের হার নতুন বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ধারিত হবে। তার মূল

কথাটা হ'ল, পূর্বে খাজনা বা রাজস্ব ছিল জমির উপর। অর্থাৎ এক এক খণ্ড জমির উপর খাজনা ধার্য ছিল। এখন খাজনা, সত্য কথা বলতে, জমির উপর না ব'সে বসবে ব্যক্তির উপর। যে-ব্যক্তির আয় কম, তাঁর খাজনাও কম হবে, যে-ব্যক্তির বেশি আয়, তাঁর খাজনাও বেশি হবে। আইনের ২৯ ধারায় এই বিধি লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রথমে একটি রাজস্বহার নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ জমির উৎপাদন, উৎপাদনের দাম ইত্যাদি নানা বিষয় বিবেচনা করে এই রাজস্ব-হার স্থিরীকৃত হবে। কিন্তু সকলকে এই পুরো হারে রাজস্ব দিতে হবে না। আইনের ২৯ ধারায় বলা হয়েছে, ধানচাষের জমিতে হ'লে, যাঁরা প্রথম দুই একরের মালিক তাঁদের রাজস্ব-হারের মাত্র শতকরা ১০ ভাগ দিতে হবে। যাঁরা আরও তিন একরের মালিক, তাঁরা রাজস্বহারের শতকরা ১৫ ভাগ দেবেন। যাঁরা আরও ৫ একরের মালিক তাঁরা মাত্র ২০ ভাগ দেবেন। আরও পাঁচ একর যাঁদের আছে তাঁরা দেবেন ২৫ ভাগ। বাকি জমির জন্য দিতে হবে শতকরা ৩০ ভাগ। অর্থাৎ যাঁরা ১৫ একরেরও বেশি জমির মালিক, কেবল তাঁদেরই পুরো হারে রাজস্ব দিতে হবে। যেসব জমি ধানের জমি নয়, তার অনুরূপ, সামান্য একটু পৃথক ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যে বাস্তুজমি এক বিষের বেশি নয় তার উপর কোনও রাজস্ব ধার্য হবে না। সে জমি হবে নিষ্কর। তা ছাড়া আর একটি বড় কথা হ'ল, জমির খণ্ডীকরণ বন্ধ করে একত্রিত করা। বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো জমি এক করে সেগুলাকে সমবায়ের মাধ্যমে এনে নতুন চাষ ও নতুন ব্যবস্থার আয়োজনও এই আইনে করা হয়েছে। সে অনুসারে কাজও আরম্ভ হয়েছে। আশা করা যায়, এইসব ব্যবস্থার ফলে বাঙলার কৃষিজীবন এবং পল্লীসমাজের উন্নতি হবে।

সুন্দরবন মৎস্যজীবী

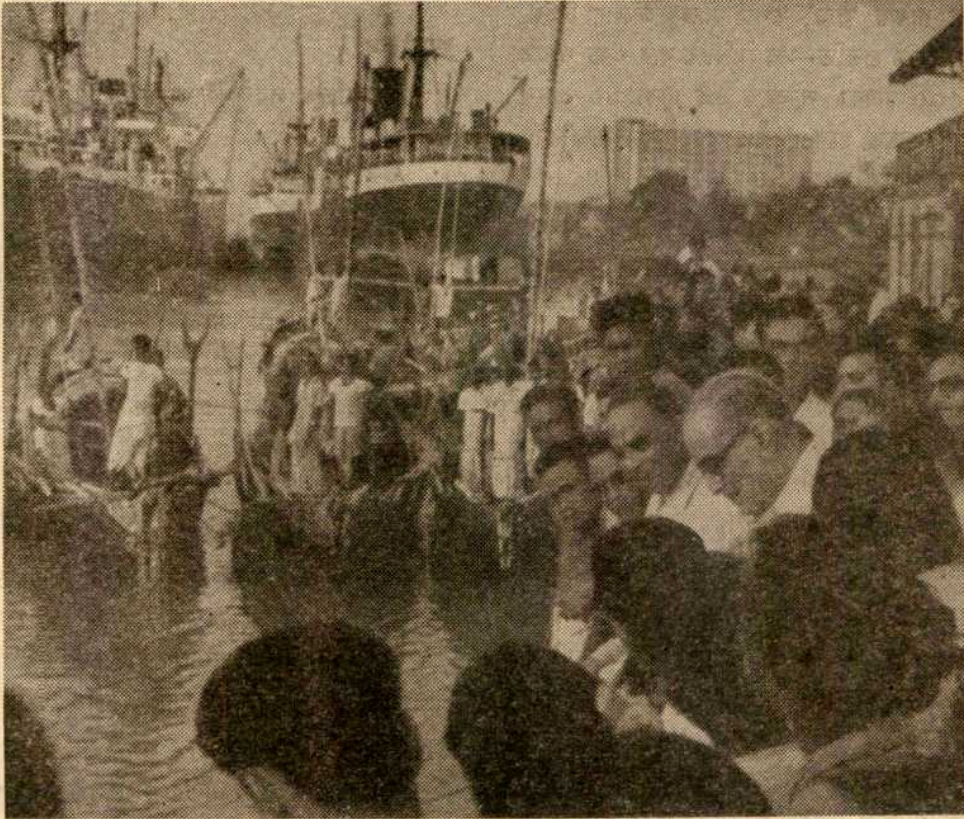
সমবায় সমিতি

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যমন্ডী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ১৮ই ভাদ্র (৪ঠা সেপ্টেম্বর) কলিকাতার আউটরাম ঘাটের জেটীতে সুন্দরবন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে সমিতির ১৮টি জেলে নৌকা ও একটি মোটর-চালিত নৌকাকে সুন্দরবন অঞ্চলে মৎস্যশিকার অভিযানে পাঠানো হয়। রাজ্যসরকারের খাদ্যমন্ডী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

মৎস্যজীবীদের কর্মসংস্থান এবং তদুদ্দেশ্যে সুন্দরবন অঞ্চল থেকে সুবর্ণরেখার মৃদু (দীঘা) পর্যন্ত বিস্তৃত জলাশয়ে মাছ-ধরার ব্যবস্থা ও তাঁদের ধরা-মাছ বাজারে উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের জন্য সমবায়ের মাধ্যমে প্রচেষ্টা।

পরিকল্পনা

তিন শত পঞ্চাশ জন মৎস্যজীবী সদস্য নিয়ে গঠিত ১০টি প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি



ডাক্তার রায় সুন্দরবন অঞ্চলে নৌকা-পাঠিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন

সুন্দরবন মৎস্যজীবী সমবায় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হ'লঃ

সংগঠিত হবে একটি কেন্দ্রীয় সমিতির অধীনে। প্রাথমিক সমিতিগুলির পরিচালকেরা সকলেই

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

মৎস্যজীবী। এর প্রত্যেক সমিতির সভাপতি একজন বেসরকারী লোক। একজন সরকারী তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী পদাধিকারবলে এর কর্মসিচিব।

কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য রাজ্যসরকার, মৎস্যচাষে উৎসাহী অনধিক ২০ জন লোক এবং প্রাথমিক সমিতিগত। মৎস্যচাষ-অধিকর্তা পদাধিকারবলে এর পরিচালক সমিতির সভাপতি এবং মৎস্যচাষ-অধীক্ষক পদাধিকারবলে কর্মসিচিব।

প্রত্যেক প্রাথমিক সমিতিকে কেন্দ্রীয় সমিতি নিম্নলিখিত জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করবেন:

(ক) আনুষ্ঠানিক দ্রব্যাদি সমেত ২টি নৌকা, তাতে থাকবে রান্নার কিছুর সরঞ্জাম, পানীয় জল রাখার 'ড্রাম', 'পেট্রোম্যাক্স' আলো, টাইম-পিস ঘড়ি প্রভৃতি—সব মিলিয়ে যার খরচ পড়বে ৫,৫০০ টাকা। সুদমুক্ত এই টাকা ১০ বছরে শোধ করতে হবে; তাতে প্রত্যেক মৎস্যজীবীর উপর পড়বে বছরে ১৬ টাকা।

(খ) ৩-৩২ লক্ষ বর্গফুটের মত আয়তনের জাল যার দাম পড়বে প্রায় ৫,১০০ টাকা। সুদমুক্ত এই টাকা ৩ বছরে শোধ করতে হবে; তাতে প্রত্যেক মৎস্যজীবীর উপর পড়বে বছরে প্রায় ৪৯ টাকা।

(গ) পরিপোষণ ঋণ ২,৬২৫ টাকা। এ টাকা এক বছরের মধ্যে শোধ করতে হবে; তাতে প্রত্যেক মৎস্যজীবীর উপর পড়বে বছরে ৭৫ টাকা।

(ঘ) ধরা-মাছ সংরক্ষণের জন্য বরফের বাস্ক, সেই মাছ কাছাকাছি বাজারে তোলার জন্য শক্তিচালিত নৌকা আর গাড়ির ব্যবস্থা করা এবং সমুদ্রতীরে সুবিধামত নৌকা ভিড়ানোর জায়গায় গুদাম এবং কার্যালয় রেখে ভাল দরে মাছ বিক্রির ব্যবস্থা করবে কেন্দ্রীয় সমিতি।

এসবের জন্য প্রাথমিক সমিতিগত কেন্দ্রীয় সমিতিকে ধরা-মাছের মোটামুটি প্রতি মণপিছ ১০ টাকা হারে দেবেন।

সরকারী সাহায্য

সরকার থেকে কেন্দ্রীয় সমিতি সাহায্য পেয়েছেন:

(ক) কেন্দ্রীয় সমিতির ১২,৫০০ টাকার মূলধনী অংশ ক্রয়।

(খ) সুদমুক্ত ১.৭৫ লক্ষ টাকা ঋণ—যা ১০ বছরে শোধ করতে হবে।

(গ) সমিতির কাছ থেকে কোন খরচা না নিয়ে সরকারী কর্মচারীরা প্রাথমিক সমিতিগুলির ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কাজ করবেন; একজন মৎস্যচাষ-অধীক্ষক, একজন সমবায়-পরিদর্শক এবং একজন সমবায় হিসাব-পরিদর্শক এসব সমিতির কাজে সাহায্য করবেন।

কর্মোদ্যম

এই সমিতিগুলির কাজ শুরুর হয়েছে গত এপ্রিল থেকে।

১৯৫৭ সালের ৩১এ অগাস্ট পর্যন্ত যেসব কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে:

(ক) দশটি প্রাথমিক সমিতি ৩৫০ জন মৎস্যজীবী নিয়ে সংগঠিত হয়েছে; মূলধনী অংশ উঠেছে ৩,৫০০ টাকা।

(খ) কেন্দ্রীয় সমিতি গঠিত হয়েছে; মূলধনী অংশ উঠেছে ১৭,৫০০ টাকা।

(গ) প্রাথমিক সমিতির সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে—১৮টি নৌকা—প্রায় ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে ও দশ অশ্বশক্তির একটি মোটর-চালিত নৌকা তৈরি হয়েছে—যার খরচ পড়েছে প্রায় ১০,০০০ টাকা। আরও ২টি নৌকা এবং ১টি শক্তিচালিত নৌকা শীঘ্রই তৈরি হবে বলে আশা করা যায়।

(ঘ) প্রাথমিক সমিতির সংশ্লিষ্ট স্থায়ী-পদার্থ দিয়ে প্রায় ১৮,০০০ টাকা ব্যয়ে ১১-৬৫ লক্ষ বর্গফুট জাল তৈরি হয়েছে। এতে প্রাথমিক সমিতির সংশ্লিষ্ট কর্মীরা পারিশ্রমিক বাবত ৪ মাসে প্রায় ৮,১০০ টাকা আয় করেছেন।

শীঘ্রই আরও ২১.৬০ লক্ষ বর্গফুট জাল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

(ঙ) পরিপোষণ ঋণ খাতে ১৪,০০০ টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছে।

(চ) আঠারটির মধ্যে ৮টি নৌকা পরীক্ষার্থী পাঠানো হয়েছিল; মৎস্যজীবীরা তাঁদের নিজেদের জাল দিয়ে (সমিতির জাল দিয়ে নয়) পরীক্ষাধীন থাকাকালীন ২২ দিনের মধ্যেই প্রায় ৮০ মণ ইলিশমাছ ধরেছেন বলে জানা গেছে। এই মাছ তাঁরা নিজেরাই বিক্রি করেছেন, তাই পরীক্ষাকালে তাঁরা পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নি।

কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি

ডক্টর কে সি সাহা, পশ্চিমবঙ্গের মীনপোষ অধিকর্তা—সভাপতি।

শ্রী বি এন দাস, পশ্চিমবঙ্গের মীনপোষ অধীক্ষক—কর্মসচিব।

সদস্যগণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

দশটি প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি।

শ্রীনেপাল ভড়।

শ্রী এন জি মিত্র।

শ্রী পি সি মিত্র, ওয়েস্ট বেঙ্গল হেল্থ রিসার্চ সোসাইটি লিঃ (দীঘা)।

শ্রী পি সি দাস, হাওড়া মৎস্যব্যবসা-সমিতি।

শ্রী এ বি মৃধাজি, বিদ্যাধরী স্পিল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি।

শ্রী জে সি বিশ্বাস, মাছের খুচরা বিক্রেতা সমিতি।

শ্রী এ রায়, ভেড়ী স্বত্বাধিকারী।

শ্রী এন হালদার, কাকম্বীপ।

শ্রী এ হাসান এবং শ্রী জে হালদার, ডায়মন্ড-হারবার।

প্রাথমিক সমিতির সভাপতিগণ

১। শ্রীগণেশচন্দ্র হাজরা, ১নং কাকম্বীপ মৎস্য সমবায় সমিতি।

২। শ্রীমাখনলাল বিশ্বাস, ২নং কাকম্বীপ মৎস্য সমবায় সমিতি।

৩। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৩নং কাকম্বীপ মৎস্য সমবায় সমিতি।

৪। শ্রীসুধীরকুমার বিশ্বাস, ৪নং কাকম্বীপ মৎস্য সমবায় সমিতি।

৫। শ্রীবগলাপ্রসন্ন গুহ, ৫নং কাকম্বীপ মৎস্য সমবায় সমিতি।

৬। শ্রীবগলাপ্রসন্ন গুহ, ৬নং কাকম্বীপ মৎস্য সমবায় সমিতি।

৭। শ্রীবগলাপ্রসন্ন গুহ, ৭নং কাকম্বীপ মৎস্য সমবায় সমিতি।

৮। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভড়, ডায়মন্ডহারবার মৎস্য সমবায় সমিতি।

৯। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়দাস, ২নং ডায়মন্ডহারবার মৎস্য সমবায় সমিতি।

১০। শ্রীকালচাঁদ দাস, ৩নং ডায়মন্ডহারবার মৎস্য সমবায় সমিতি।

সুন্দরবন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির উদ্বেোধন উপলক্ষে ডাক্তার রায় বলেন যে, আড়তদাররা ধীবরদের দাদন দেয় এবং বিনিময়ে তাদের সমস্ত মাছ নিয়ে যায়। তার ফলে একদিকে মৎস্যজীবীরা দাম কম পায়, আর একদিকে বিক্রির সময় মাছের দাম বেড়ে যায়। ধীবরদের সমবায় সমিতির মধ্যে সংঘ-বন্ধ করা হ'লে তবেই তাদের এই অবস্থা থেকে রক্ষা করা যাবে।

ডাক্তার রায় আশা করেন যে, এই সমিতি গঠনের অন্তর্নিহিত প্রেরণা ছাড়িয়ে পড়বে এবং সমস্ত মৎস্যজীবীই সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে আসবেন।

সভাপতির অভিভাষণে শ্রী সেন বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে সমুদ্র ও পুকুর থেকে মাছের সরবরাহ বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ আছে বলে তিনি মনে করেন।

বৃক্ষের মূল্য

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

একদিন মানুষ, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা সবই ছিল বনে। মানুষ ক্রমে বর্বরতার স্তর থেকে উন্নত হয়ে নদী-তীর ঘেঁষে কিংবা বৃক্ষবিরল ফাঁকা জায়গায় কিংবা বনের কতক অংশ বৃক্ষহীন করে বসতি নির্মাণ করল। যেসকল জীবজন্তুকে সে কাজে লাগাতে পারল, কেবল তাদের সঙ্গে নিয়ে এসে পালন করতে লাগল। যেসব গাছপালার ফল ফুল কাঠ ইত্যাদি মানুষের জীবনযাত্রার সহায়ক হ'ল কেবল সেসব গাছপালাকে তারা লালন করতে লাগল। বনের বাকি সব গাছপালা বনেই থেকে গেল। তবে তখন পর্যন্ত বনভূমি লোকালয় থেকে বেশি দূরে ছিল না। তখনও বৃক্ষলতার প্রয়োজনে মানুষ বনে যাতায়াত করত।

সভ্যতার কর্মবিকাশের সঙ্গে উদ্যান রচিত হ'ল— তাতে সুস্বাদু ফল ও সুর্ভি বর্ণোজ্জ্বল ফুলের গাছগুলিই ঠাই পেল। ভৈষজ্যগুণের জন্য কতকগুলি বনৌষধি লোকালয়ে এবং ছায়া সৃষ্টির জন্য কতকগুলি পল্লবঘন বিশালকায় বৃক্ষ পথের দুই ধারে আশ্রয় পেল।

আর যেসব গাছ বায়ুজল-পশুপক্ষীদের বাহিত বীজে পড়ো জায়গায় জন্মাত, তাদের বিনা প্রয়োজনে ছেদন করা হ'ত না।

সভ্যতার আরো উন্নতি হ'ল। বাগানের সংখ্যা বাড়ল বটে, তবে উদ্যানপাল্য বৃক্ষ ছাড়া অন্যান্য বৃক্ষের উচ্ছেদ চলতে লাগল ক্রমাগত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বহু গ্রাম নগরের সৃষ্টি হ'তে থাকল, তাতে বহু বৃক্ষের ধ্বংস সাধন চলতে থাকল, নগরগুলি একেবারে নিরস্ত পাদপ হয়ে পড়ল, যানবাহনের উন্নতি হওয়ায় বনকে বহু দূরে রেখেও তার দান গ্রহণ করার সুবিধা হ'ল। রেল লাইন বিস্তারের ফলে বহু বৃক্ষের উচ্ছেদ সাধন হ'ল,

শস্যক্ষেত্রের পরিমাণ ও পরিসর বাড়ানোর জন্য বহু বৃক্ষচ্ছেদনের প্রয়োজন হ'ল, জ্বালানী কাঠের জন্যও অনেক অঞ্চল বৃক্ষশূন্য হ'ল, অথচ জ্বালানী কাঠের বৃক্ষসংখ্যা বাড়ানোর কোন উদ্যম হ'ল না। কয়লার আবিষ্কারে জ্বালানী কাঠের বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তাও কমে গেল। গৃহনির্মাণের কাঠ ও আসবাবপত্র তৈরির কাঠের জন্য নির্মমভাবে বন-বৃক্ষের ছেদন চলতে লাগল। নতুন বনভূমির সৃষ্টির প্রয়োজন কেউ অনুভব করে নি। লোকালয়ে বন্যবৃক্ষের কোন স্থান থাকল না।

আমি বিশেষ করে আমাদের পশ্চিম বাঙলার কথা বলছি। বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে বৃক্ষের মূল্য মর্যাদা আজ বেড়ে গেছে। বৃক্ষের দান যে কত বিচিত্র প্রকারের তা আমরা আজ উপলব্ধি করতে পেরেছি। আজ সরকারের পক্ষ থেকে নতুন বনভূমির সৃষ্টি, বন্যবৃক্ষ রক্ষণ ও লোকালয়ে বৃক্ষসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ চেষ্টা হচ্ছে। সকল প্রকার বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা আজ স্বীকৃত হচ্ছে।

এ দেশে যে অঞ্চলের মাটি নীরস সে অঞ্চলে বৃক্ষ ক্রমে নিম্ন হ'য়ে আসছে কিন্তু বৃক্ষপালন আয়াসসাধ্য বলে নতুন বৃক্ষ রোপণের চেষ্টাই হয় নি। ক্রমে সে অঞ্চল ছায়াহীন, শ্রীহীন ও শুষ্কতর হয়ে পড়েছে। আমি বাল্যকালে আমার গ্রামে যে শ্যামগ্রী ও ছায়াচ্ছন্নতা দেখেছিলাম এখন তার সিকির সিকিও নেই।

ভাগীরথীর পূর্ব দিকের অঞ্চলে ও উত্তর বঙ্গে আপনা থেকেই বহু বৃক্ষ জন্মে। পশ্চিম দিকের অঞ্চলে ভাগীরথীতীর এবং অন্যান্য নদীতীর ছাড়া আপনা থেকে খুব অল্পই গাছ জন্মে। এ অঞ্চলে বৃক্ষপালন বিশেষ আয়াসসাধ্য—তবে কিছু আয়াস স্বীকার করলে যে এ অঞ্চলে বৃক্ষসংখ্যা ও শ্যামগ্রী

বাড়াতে পারা যায় তার প্রমাণ বোলপুরে শান্তি-
নিকেতন। সেখানে চেষ্টা করে একটা অনূর্বর
রক্ষা ডাঙাকে ছায়াছন্ন আশ্রমে পরিণত করা হয়েছে।

ফলদান ছাড়া বৃক্ষের যে আরও অনেক কাজ আছে
—তা আমাদের অঞ্চলের লোকে বোঝে না। বৃক্ষের
সহিত মৃত্তিকার সরসতা রক্ষা, স্বাস্থ্যশ্রী সম্পাদন,
ভূমিক্ষয় নিবারণ, উষ্মতার অভিযান রোধ, রৌদ্রতাপ
নিবারণ, অতি শীতল বায়ুপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি,
বায়ু বিশোধন, লোকালয়ের শোভা বর্ধন ইত্যাদির
যে সম্পর্ক আছে তা আমাদের অঞ্চলের লোকে
বোঝে না। রাঢ় অঞ্চলের রক্ষতা ও শুদ্ধতার প্রধান
কারণ বৃক্ষবিরলতা।

শুধু এসকল কারণেই এ অঞ্চলে বৃক্ষসংখ্যা
বৃদ্ধির প্রয়োজন নয়। যে কারণটি উপলব্ধি করা
সকলের পক্ষে সোজা, সেই কারণটির দিকে প্রথমত
মনোযোগ আকর্ষণ করা যেতে পারে।

এ অঞ্চলে রন্ধনের জন্য ঘুঁটের ব্যবহার হয় খুব
বেশি। কয়লার মূল্য দিন দিন বাড়ছে, ঘুঁটে ও
কয়লার বদলে জ্বালানী কাঠ ব্যবহারের প্রয়োজন
দিন দিন খুব বেশি হয়ে পড়ছে। এক ছটাক
গোবরও এ অঞ্চলে জ্বালানীরূপে ব্যবহার করা
উচিত নয়।

এ অঞ্চলের জমি অনূর্বর। সেজন্য জমিতে জৈব
সারের প্রয়োজন খুব বেশি। গ্রামের সমস্ত গোবরই
জমিতে পাঠানো উচিত। গোবর বাঁচাতে হলে
জ্বালানী কাঠের বৃক্ষসংখ্যা যত বাড়বে ততই মঙ্গল।

ফলপ্রসূ বৃক্ষ এ অঞ্চলে সহজে জন্মে না, কিন্তু
নিম, বাবলা, সেওড়া, জিউলি, পিঠালি, শিশু,
তেঁতুল, শিমুল, ঘোড়ানিম ইত্যাদি জ্বালানী কাঠের
গাছ প্রচুর জন্মাতে পারে। এইসব গাছ খুবই কষ্ট-
সহিষ্ণু। এক সময়ে এ অঞ্চলে বট ও অশ্বথ বৃক্ষের
খুব আদর ছিল। পুণ্যকামনায় হিন্দু বিধবারা
অশ্বথবৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করত। প্রতিষ্ঠা-করা বৃক্ষের
কেউ শাখাচ্ছেদনও করত না। অশ্বথ ও বটগাছ
প্রান্তরে ছায়াদানের জন্য কৃষকরাই রোপণ করত।

লোকালয়ের বট-অশ্বথ বৃক্ষকে গ্রাম্য দেবতার
আশ্রয় বলে গণ্য করা হত। এই দুই গাছের মূল-
দেশে সিন্ধুররাজিত প্রস্তরে ধর্মরাজ, বৃদ্ধোশিব,
ষষ্ঠী ইত্যাদি দেবদেবীর পূজা হত। মূলদেশ ইট
পাথরে বাঁধিয়ে দেওয়া হত। এই বাঁধানো আটনে
পুরাণ পাঠ চলত, গ্রাম্যসভা বসত, পরিশ্রান্ত শ্রমিক
ও পথিকদের বিশ্রামের কাজ চলত—এগুলি নিরা-
শ্রয়ের আশ্রয় ছিল।

এখন গ্রামে নব সভ্যতার অভিযান হওয়ায় বট-
অশ্বথের মর্যাদা কমে আসছে—নতুন কোন বট-
অশ্বথ বৃক্ষ পুণ্যতরুর মর্যাদা লাভ করছে না।

রাঢ়-অঞ্চলে দুইটি গ্রামের মধ্যে খুব বড় বড় মাঠ
—এই বিশাল মাঠের মধ্যে দুই একটি বট-অশ্বথ
ছাড়া কোন গাছ নেই—এইসব মাঠে আলপথ ছাড়া
কোন পথ নেই। তবে মাঝে মাঝে অত্যন্ত অগভীর
হলেও সেচের পুকুর আছে। প্রত্যেক পুকুরের
ধারে ৩-৪টি করে বট-অশ্বথ বৃক্ষ রোপণ করা
উচিত। রাখাল কৃষক ও তাদের গাই-বলদের
বিশ্রামের জন্য কাছাকাছি ছায়ার আশ্রয়ের যে কতটা
প্রয়োজন তা নগরবাসীরা বুঝবে না। আলপথের
পথিকদেরও বিশ্রামচ্ছায়ার প্রয়োজন। মাত্র দুই-এক
বৎসর গোরু-ছাগলের মৃৎ থেকে বাঁচাতে পারলে
পুকুরধারে রোপিত বৃক্ষের আর কোন পরিচর্যার
প্রয়োজন হবে না।

রাঢ়-অঞ্চলে ইদানীং অনেক খাল কাটা হয়েছে।
এইগুলির দুই ধার তোলা মাটির পাড় বৃক্ষপালনের
পক্ষে বিশেষ অনুকূল। খালগুলির দুই পাড়ের
মাটি সারা বছরই সরস থাকে। দুই পাড়ে বৃক্ষ
রোপণ করলে তারা জলাভাবে মরবে না, গ্রাম্য বালক-
বালিকা ও গোরু-ছাগলের আক্রমণ থেকে রক্ষা
করতে পারলে রোপিত বৃক্ষশ্রেণী লোকালয় ও
প্রান্তর ভূমিকে শ্যামগ্রীসুন্দর ও ছায়াছন্ন করবে,
যদি ফলফল কারো জন্মে—তা হবে উপরি পাওনা।

এ অঞ্চলে বহু নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে—আশা
করা যায়, সেই রাস্তাগুলি তরুশ্রেণীর স্বারা

ছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। নীলকর সাহেবরা বনগ্রামে (বনগায়) যে ছায়াচ্ছন্ন পথটি নির্মাণ করে গেছেন—সেই পথই আদর্শ রাজপথ। আমরা আশা করি, সারা বাঙলা দেশে এরূপ পথই রচিত হবে।

এ অঞ্চলে গ্রামের ভিতরে অনেক পুকুর আছে—ঐ পুকুরগুলির পক্ষেচ্ছার করে পাড়গুলির মেরামত করলে বহু ফলপ্রসূ বৃক্ষ সহজে জন্মাতে পারে। যে সব ফলের বৃক্ষ এ অঞ্চলে জন্মে না ঐ মাটিতে সেসব ফলের বৃক্ষ বেঁচে যেতে পারে।

এ অঞ্চলের বাড়ির আঙিনাগুলি বেশ বড় বড়, কতকটা স্থান ধানের মরায় ও শস্যাদির ঝাড়াই-মাড়াই-ছাঁটাই-শুকাই এর জন্য রেখে বাকি অংশে ফলবৃক্ষ রোপণ করলে সেগুলিকে সহজে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়্যাসে বাঁচানো যায়। এ বিষয়ে গৃহস্থদের ঔদাস্য আছে—তাদের উৎসাহিত করা দরকার। আঙিনায় গৃহস্থরা আনাজ তরকারি লাগায়—তাতে কিছু কিছু লাভ হয়, কিন্তু বাড়ি অপরিচ্ছন্ন হয়। ঘরের চালও সস্তর নষ্ট হয়ে যায়। ফলফুলের বৃক্ষ লাগালে বাড়ি ছায়াচ্ছন্ন হয় এবং বাড়ির শোভা বাড়ে। মনে রাখতে হবে, বাগানের ফল চুরি যায়, আঙিনার ফলই ভোগে লাগে।

এ অঞ্চলে বিনা আয়্যাসে বট, অশ্বথ, বেল, কুল, আমড়া, বকুল, পলাশ, শিমূল, শিরীষ, শিশু, তেঁতুল, জাম, আতা, পিয়ারা, কাঠমল্লিকা, শিউলি, খেজুর, তাল, বাঁশ, নিম, জিউলি, পিঠালী, চীনা করবী, করবী, বক, শেওড়া, আউচ, বাবলা ইত্যাদি গাছ জন্মে। এই বৃক্ষগুলির কোনটিকে উপেক্ষা করা যায় না। সকল বৃক্ষেরই কিছু-না-কিছু দিবার আছে। বীরভূম মেদিনীপুর অঞ্চলে, শাল, পিয়াশাল, মহুয়া, জারদুল, সৈগুন, হরীতকী, আমলকি ইত্যাদি অনেক বনবৃক্ষও লোকালয়ে জন্মে।

গৃহনির্মাণ ও মেরামতের জন্য প্রত্যেক গৃহস্থের বাঁশের প্রয়োজন। এই বাঁশ আজকাল টাকায় একখানি কিংবা দুখানি করে দূরবর্তী গ্রাম থেকে

আনাতে হয়—তবু গ্রামবাসীদের বাঁশ লাগাবার উৎসাহ দেখা যায় না। বাঁশ লাগানো সম্বন্ধে আবার অনেকের কুসংস্কার বা বংশগত বাধা আছে।

আশ্চর্যের বিষয় ফুলের মাধুর্য বা সৌন্দর্য কেউ উপলব্ধি করে না। সেজন্য বাড়ির আঙিনাতেও খুব কম লোকই ফুল গাছ লাগায়। কেবল ঠাকুর বাড়ির আঙিনাতেই ফুলগাছ দেখা যায়। ফুলের একমাত্র প্রয়োজন অনুভব করা হয় ঠাকুর পূজার জন্য, কিন্তু মানুষের অন্তরে যে ঠাকুরটি বিরাজ করছেন, তাঁর পূজার জন্যও যে ফুলের প্রয়োজন—আমাদের গ্রামবাসীরা তা আজো এখনো বুঝে না।

আমাদের রাঢ়-অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, আমাদের মাটিতে নারিকেল, সুপারি, লেবু, লিচু, মিষ্ট আম, গোলাপ জাম, নোনা, আতা, কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের গাছ জন্মে না। যত্ন করলে এবং সার, লবণ, পাঁক মাটি, গোবর, জৈব সার, রাসায়নিক সার ইত্যাদির দ্বারা পরিচর্যা করলে যে এসব বৃক্ষ জন্মাতে পারে,—তার দৃষ্টান্ত সমষ্টি-উন্নয়ন সেবকদের দেখাতে হবে। আমি রাঢ়-অঞ্চলে কোন কোন স্থানে উৎসাহী গৃহস্থের বাড়ির পাশে এসব বৃক্ষ দেখেছি। এক প্রকৃতির মাটির একস্থলে যদি এগুলি জন্মে তবে অন্যান্য স্থলে জন্মাবার বাধা আছে বলে মনে হয় না।

৫০ বৎসর আগে কংগ্রেসের জননেতা বহরমপুরের বিখ্যাত উকিল বৈকুণ্ঠনাথ সেন কাটোয়া মহকুমায় নিজের গ্রামের নিকটে বাথানতলা নামক স্থানে একটি আদর্শ উদ্যান রচনা করেন। তাতে তিনি দেখিয়েছিলেন ভারতের প্রায় সকলপ্রকার ফলপুষ্প-প্রসূবৃক্ষ রাড়ের মাটিতে যত্ন করলে জন্মাতে পারে। আজো সে বাগান আছে—তবে যত্নের অভাবে বহু গাছ মরে গিয়েছে, নতুন গাছ লাগানো হয় নি—অনেক গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। এ বাগানটি বহু ব্যয়সাপেক্ষ প্রতিষ্ঠান ছিল। লোকে এমনি উদ্যান রচনা করুক—তাঁর এ অভিপ্রায় ছিল না। তিনি শুধু দেখিয়েছিলেন—কোন বৃক্ষবিশেষকে কি করে

লালন বর্ধন করা যায়। যার যতটুকু সাধ্য সে ততটুকু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। স্থানীয় লোকেরা বাবুদের বাতিক, খেয়াল ও শখের বাগান বলে দেখতে যেত, কিন্তু তা হ'তে কোন শিক্ষা লাভ করে নি।

এখন দিনকাল বদলে গেছে, লোকে শিক্ষাদীক্ষায় কতকটা উন্নত হয়েছে। লোকে গাছের মূল্যও বুঝতে শিখেছে। এখন এই ধরনের কোন দৃষ্টান্ত চোখের উপর পেলো নিজেরাও ইচ্ছামত ও সাধ্যমত গাছপালা লাগাবার উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করতে পারে।

কোন মাটিতে কোন বৃক্ষ সহজে পরিবর্ধিত হয়, কোন মাটিতে কিরূপ সার বা খাদ্য দিলে বৃক্ষবিশেষকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, বৃক্ষবিশেষের পালনের নিয়ম কি, পদ্ধতির অভাব হ'লে বা বৃক্ষ ব্যাধিগ্রস্ত হ'লে কি প্রতিবিধান—এসব তথ্য সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করলে বৃক্ষের রোপণ-পালনে লোকে উৎসাহিত হ'তে পারে।

সমষ্টি-উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পেলো দেশে বৃক্ষসম্পদের আদর বাড়বে, এবং দেশের তরুণবিরল অংশ ছায়াশীতল শ্যামগ্রী-মণ্ডিত ও ফলেফুলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে আশা করা যায়।



আপনার স্বাস্থ্যের জন্যে একটি পরিকল্পনা

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দরুন আমাদের দেশের কৃষকেরা নিরীকৃত লক্ষ্যের ওপরেও ৩০ লক্ষ টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছে। এই খাদ্য শস্যই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মূল আহাৰ্য্য এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই, কিন্তু খাদ্য ও স্বাস্থ্য বিশারদেরা বলেন যে, এর ওপরেও, পুষ্টির পক্ষে অপরিহার্য্য কয়েকটি উপাদান আমাদের খাদ্যে দরকার। সুস্থ খাদ্য যে কোন জাতীয় স্বাস্থ্য পরিকল্পনার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। সুস্থ খাদ্যে যে পাঁচটি উপাদান আছে স্নেহপদার্থ (ফ্যাটস) এবং ভিটামিন তার মধ্যে দুইটি। অল্প তিনটি হচ্ছে খাদ্যসার (প্রোটিন), শর্করা (কার্বোহাইড্রেটস্) এবং খনিজ পদার্থ (মিনারালস্)। স্নেহপদার্থ শুধু যে শরীরের শক্তি দেয় তাই নয়, স্নেহপদার্থ অল্পাধিক খাবার হজম করতে শরীরকে সাহায্য করে—এক কথায় শরীরকে গড়ে তুলতে এবং সুস্থ রাখতে স্নেহ পদার্থের জুড়ী নেই। ভিটামিন গড়ে তোলে হাড়, মাংসপেশী, স্নায়ু এবং মস্তিষ্ককোষগুলি। প্রত্যেকটি ভিটামিনে আলাদা আলাদা গুণ আছে—ভিটামিন 'এ' দৃষ্টি শক্তিকে প্রথর করে, চোখ এবং ত্বক সুস্থ রাখে; ভিটামিন 'ডি' হাড়কে সুদৃঢ় করে তোলে।

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চের পুষ্টি বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির (দি নিউট্রিশন এ্যাডভাইসারি কমিটি)



মতে পূর্ণবয়স্কদের প্রত্যেক দিন কম পক্ষে দু' আউন্স স্নেহপদার্থ খাওয়া উচিত কিন্তু আমাদের দেশে পূর্ণবয়স্কেরা প্রতিদিন গড়ে মাত্র ১/২ আউন্স স্নেহপদার্থ খেয়ে থাকেন। স্নেহপদার্থের এই চাহিদা মেটানোর জন্যে ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে বনস্পত্তির উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ১ লক্ষ টন। ডালডা বনস্পত্তি ভেবজ তেল থেকে তৈরী একটি পুষ্টিকর স্নেহপদার্থ এবং এতে ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি' যোগ করা হয়। প্রতি আউন্স ডালডার খাটি ঘিয়ের সমানই ভিটামিন 'এ' থাকে। এই সব কারণেই প্রতি দিন আরও অধিক সংখ্যক খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে সচেতন লোকেরা ডালডা দিয়ে রাঁধা খাবার দাবার খাচ্ছেন।

ডালডা তৈরীর সময় হাতে ছোঁয়া হয় না। শুধু তাই নয়, ডালডা আপনি সব সময় শীল করা টিনে খাটি ও তাজা পাবেন। খেজুর গাছ মার্কা টিন দেখে নিতে ভুলবেন না—কারণ, শুধুমাত্র এই টিনেই খাটি ও পুষ্টিকর ডালডা পাবেন।



HVM. 301-18 BG

জৈব সারের ব্যবহার

অরুণ মুখোপাধ্যায়

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যেমন জল ও উপযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন, গাছপালাকে ভালভাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্যও তেমনি দরকার যথেষ্ট জল আর উপযুক্ত সারের। গাছ থেকে ভাল এবং বেশি ফলন পেতে হ'লে তাকে সুস্থ রাখতে হবে, পুষ্ট আর তেজী ক'রে তুলতে হবে। তার জন্য দরকার তাদের পুষ্টিদায়ক উপযুক্ত খাদ্য যোগানো। প্রাণীদের দিয়ে বেশি কাজ করানোর তাগিদে যেমন উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে তাদের শরীরকে বেশি শক্তিশালী করার চেষ্টা করি, গাছপালার বেলাতেও তাই করতে হবে। ভাল আর বেশি ফলন দেবে এমন গাছ জন্মাতে হ'লে প্রথমেই প্রয়োজন ভাল বীজ, যথাপরিমাণ জল এবং সেই সঙ্গে ফসলের খাদ্য হিসাবে জমিতে উপযুক্ত সার দেওয়া।

আমাদের দেশে এখনও অনাবাদি বহু জমি পতিত পড়ে আছে। বিশাল ভারতে চাষের উপযোগী যত জমি আছে তার আয়তন নিঃসন্দেহে বর্তমানের বহু উন্নত রাষ্ট্রের চাষোপযোগী জমির আয়তনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে, কিন্তু ফসল উৎপাদনের হার নিয়ে তুলনামূলক বিচার করলেই ভারত এখনও অনেক নিচে স্থান পাবে। কেননা জমির প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও তার উপযুক্ত ব্যবহার করা এখনও সর্বত্র হয়ে ওঠে নি। এর সবচেয়ে বড় একটি কারণ হ'ল জমির উৎকর্ষের অভাব। বছরের পর বছর ধরে বিনা সারে একই জমিতে চাষ হয়ে হয়ে তার উৎপাদনক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে নিঃশেষ হয়ে এসেছে। কয়েক জায়গায় কৃষকদের জমি পরীক্ষা ক'রে দেখা গিয়েছে, এ ধরনের অসাধনতার ফলে জমির মৌলিক উপাদানগুলি [natural elements] পর্যন্ত নষ্ট হ'তে চলেছে।

সাতচল্লিশ সালের পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্যসরকার বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে

একরকম সমবেতভাবেই এ বিষয়ে প্রচুর ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রয়াসী হয়েছে। প্রথম পাঁচসালার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বিতীয় পাঁচসালার পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত 'সমষ্টি-উন্নয়ন'এর কাজের দ্বারা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্য দিয়ে সরকার সরাসরি বহু অনদূর্বর জমির উর্বরতা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছেন। এই ব্যাপক প্রচেষ্টায় জাতিগত সাফল্য নিঃসন্দেহে কৃষির উন্নতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তবে এই সঙ্গে কৃষকদের দায়িত্বও বেশ বেড়ে যাবার কথা।

এখন মোটামুটি সাধারণভাবে আলোচনা করা যাক জমির উর্বরতার বিষয়ে। ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিমাণে সারের প্রয়োগ। ধান গম ইত্যাদির গাছের পুষ্টিকারিতার জন্য সাধারণত প্রয়োজন কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থের—যেমন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, কিছু পরিমাণ লোহা-জাতীয় ও খানিকটা চুন-জাতীয় পদার্থের। বলা বাহুল্য, অনাবাদি অথচ আবাদ-যোগ্য সব জমিতেই এই উপাদানগুলি থাকে। গাছপালা মাটি থেকে এসব নিয়েই নিজেদের পুষ্ট করে এবং মাটির সঞ্চিত ভান্ডার শূন্য করতে থাকে। এর ফলেই জমির উর্বরশক্তি কমে আসে। এই কারণেই সারের প্রয়োজন। এই সার মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে গাছের খাদ্যের যোগান দেয়।

চাষের জন্য সাধারণত দু'রকমের সার প্রয়োগ করা হয়—(১) রাসায়নিক সার, (২) জৈব সার।

রাশিয়া, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উন্নততর রাষ্ট্রে বর্তমানে রাসায়নিক সারের প্রয়োগ একরকম সর্বজনীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারী বা বেসরকারী প্রচেষ্টায় বিরাট বিরাট ক্ষেত্র যেমন যন্ত্রের সাহায্যে কর্ষিত হচ্ছে, তেমনি জমির উর্বরতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নানারকমের রাসায়নিক সার প্রয়োগ ক'রে

সুফলও পাওয়া যাচ্ছে আশানুরূপ। কিন্তু আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান এবং এদেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৪ জন এখনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও এখানে এই ক'বছর আগে পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে অবৈজ্ঞানিক প্রথা চাষ-আবাদ হয়ে এসেছে। খুবই আনন্দের কথা, বর্তমানে অনেক কৃষক এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে চাষ-আবাদের নতুন পদ্ধতির আশ্রয় নিতে শুরু করেছেন। তবে এটা সত্যি যে, এখনও সব বিষয়ে তাঁরা রপ্ত হ'তে পারেন নি। এই বিষয়গুলির অন্যতম হ'ল সারের প্রয়োগ। বিভিন্ন উপায়ে সরকার থেকে কৃষকদের রাসায়নিক সারের উপযোগিতা বোঝাবার চেষ্টা হচ্ছে বটে, কিন্তু এখনও এই সার সরকারী সাহায্য ছাড়া কৃষকদের যথেষ্টভাবে ব্যবহার করার সুযোগ আসে নি।

এই কারণেই জৈব সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশের কৃষকদের কাছে অপরিসীম। কেননা এই সার তৈরির খরচ নগণ্য, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে বিনা খরচেই সার তৈরি ক'রে জমিতে প্রয়োগ করা যায়।

ভারতীয় কৃষক যে জৈব সারের বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ, তা বললে ভুল বলা হবে। কেননা, প্রাচীন পদ্ধতিতে অবধি এই ধরনের জমির উর্বরতাবর্ধকের বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে প্রাচীন কালের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, বর্তমানে চাষ বা সার প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কেননা, যুগ পালটে গিয়েছে। আগের জনসংখ্যার সঙ্গে বর্তমানের জনসংখ্যার তুলনা করলেই এর পার্থক্য প্রকট হয়ে উঠবে। মাত্র ৪০-৫০ বছর আগে দেশে যে-পরিমাণ শস্যের প্রয়োজন ছিল, আজ তার চতুর্গুণের বেশি প্রয়োজন; অথচ ভৌগোলিক দিক দিয়ে জমির পরিমাণ কমে গিয়েছে। এই কারণেই বর্তমানে প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মতভাবে চাষ করা। এই কারণেই জৈব সারের ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের দেশের কৃষকদের যথেষ্ট সচেতন হওয়ার সময় এসেছে।

আমাদের দেশে জৈব সার উৎপাদনের উপযোগী প্রচুর উপাদান ছাড়িয়ে রয়েছে। সাধারণত জৈব সারের প্রধান উপাদান হ'ল, গোবর, মোষ বা অন্যান্য পশুর মল, গোশালার নানারকম আবর্জনা, মানুষের মল, শহরের আবর্জনা, নানারকমের আগাছা, জলজ উদ্ভিদ প্রভৃতি। এসবের মধ্যে সবচেয়ে ভাল হচ্ছে গোবর। আমাদের দেশে গোরুর সংখ্যা সারা পৃথিবীর গোরুর সংখ্যার পাঁচভাগের একভাগ। অতএব গোবর এবং গোশালার আবর্জনা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ সার উৎপাদিত হ'তে পারে। অথচ, দুর্যতের বিষয়, এদেশে বেশির ভাগ গোবরেরই অপচয় হয়। জাপানে মাত্র ছেচল্লিশ লক্ষ গোরুমোষের গোবর থেকে বছরে প্রায় ৭২৮ লক্ষ টন সার তৈরি করা হয়। আর ভারতে ১৭ কোটি ৭৪ লক্ষ গোরুর ও কয়েক লক্ষ মোষের গোবর থেকে সার হয় বছরে মাত্র ১,৬০০ লক্ষ টন। পশ্চিম বাঙলার আলাদা পরি-সংখ্যান পাওয়া না গেলেও এটা সত্যি যে, এ রাজ্যের কৃষকেরা সারের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন নন।

শহরের আবর্জনাও পচে উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হ'তে পারে। এর প্রয়োগও অতি সহজ; কেননা, এই আবর্জনা জলের সঙ্গে মেশানো অবস্থাতেই নদমা বা নালা দিয়ে বেরিয়ে আসে। অথচ ভাবলেও অবাক হ'তে হয় যে, বিশেষ ক'রে পশ্চিম বাঙলার গাঙ্গেয় শহরগুলির শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশি নালার গতি গ্রামাঞ্চলে বা চাষের উপযোগী জমির দিকে না নিয়ে গঙ্গার জলের দিকে নামিয়ে আনা হয়েছে। প্রতিদিনের অপচিত লক্ষ লক্ষ টন জল-মিশ্রিত এই আবর্জনা কত জমির উর্বরতা বাড়িয়ে দিতে পারে তা বাস্তবিকই ভাববার বিষয়। বিজ্ঞানী ডাঃ গিলবার্ট কাউলার তিরিশ-বত্রিশ বছর আগে এই ধরনের আবর্জনা থেকে গ্যাস তৈরি করার পর বাকিটা সার হিসাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা ক'রে গিয়েছেন। আনন্দের কথা, বর্তমানে কলিকাতার আবর্জনাকে এইভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা চলছে। আমাদের সকল শহরেরই আবর্জনা

থেকে গ্যাস তৈরির ব্যবস্থা করা হয় তো সম্ভব নয়, কিন্তু সার হিসাবে তার ব্যবহার অনায়াসেই চলতে পারে।

সার তৈরির সাধারণ পদ্ধতি হ'ল, জমিতে একটা গর্ত করে তাতে গোবর বা গোশালার ও অন্যান্য আবর্জনা কিংবা আগাছা ফেলে জল দিয়ে রেখে দেওয়া। তার উপর একটা ঢাকার ব্যবস্থা করতে হয়। যেন বৃষ্টির জল না পড়ে, কিছুদিন পর ওগুদিল সম্পূর্ণ প'চে গেলে, গর্ত থেকে তুলে নিয়ে এসে জমিতে ছড়িয়ে ছড়িয়ে প্রয়োগ করে, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। কেউ কেউ সরাসরি কাঁচা গোবর বা জল বা পাতা জমিতে ছড়িয়ে দেয়। ওতে ফল হয় অনেক দেরিতে, কেননা ওগুদো মাটির সঙ্গে মিশতে সময় লাগে অনেক বেশি। আসলে ওগুদোর পচন শূন্য হ'লে যখন নাইট্রোজেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাস নিঃসৃত হ'তে থাকে তখনই মাটির সঙ্গে ঠিক মিশ্রণ ঘটে। গোবর কিছু জল-মিশ্রিত থাকলে তার নাইট্রোজেন নষ্ট হ'তে পারে না। আবার সারের দোকানে একরকম জীবাণু পাওয়া যায়, যা গোবরে ছড়িয়ে দিলে পচন খুব তাড়াতাড়ি হয় ও সার উৎকৃষ্ট হয়। কোন কোন দেশে এইসব পদার্থের সঙ্গে অ্যামোনিয়াম সালফেট, চুন ও ফসফেট মিশিয়ে

একসঙ্গে সার তৈরি করা হয়। দেখা গেছে, সারের উৎকর্ষ তাতে বেড়ে যায়।

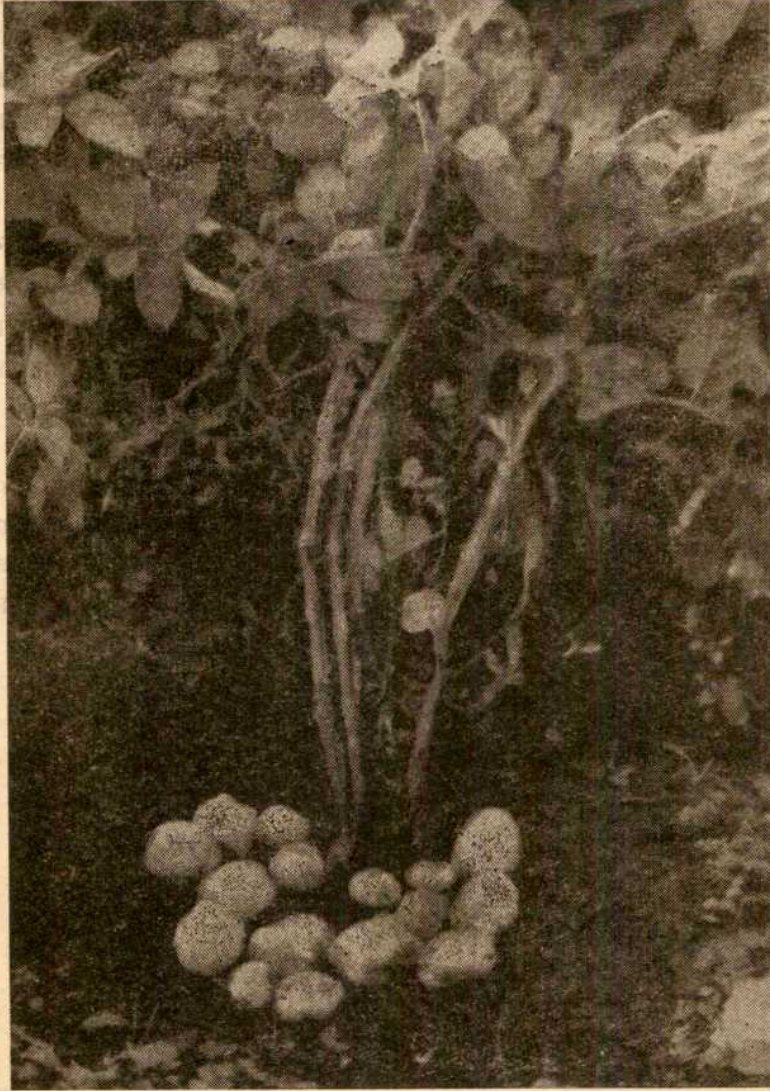
পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে যে, জমিতে কিছু পরিমাণ জৈব উপাদান না থাকলে তাকে চাষের উপযোগী করতে দেরি হয়, কেননা তাতে জমির স্বাভাবিক গঠন-প্রকৃতি পালটে যায়। সার মাটির সঙ্গে মিশে একরকম জীবাণুর সৃষ্টি করে। এই জীবাণুই মাটিতে গাছের অপরিহার্য নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে এবং ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতি ধাতব পদার্থকে গাছের পক্ষে সহজ-গ্রহণযোগ্য করতে সাহায্য করে। যে মাটিতে বালির পরিমাণ বেশি, সেখানে আঁশ যুগিয়ে মাটিকে উর্বর করে জৈব সার। আবার যেসব জমিতে ক্ষারের প্রাধান্য, সেসব জমির পক্ষে প্রয়োজনীয় পদার্থ এই জৈব উপাদান থেকেই মেলে। এইসব কারণেই নানারকম রাসায়নিক সারের কথা চিন্তা করার আগে জৈব সারের ব্যবহার সব জায়গায় চালু করা বিশেষ প্রয়োজন। কেননা এর ফলে চাষের জমি যে কেবল উর্বরতার ক্ষয় থেকে বাঁচে তাই নয়—ফসলের উৎপাদন-হারও যথেষ্ট বেড়ে যায়। জৈব সার একদিকে যেমন জমিতে রস ধরে রাখে এবং জমির উর্বরতাকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করে, অন্যদিকে তেমনি সার তৈরি করতে খরচও পড়ে খুবই কম।



বীজ-আলু

বোঁশি ফল পেতে হ'লে ভাল বীজ ব্যবহার করা উচিত। সব ফসলের মত আলুর চাষের বেলায়ও এ কথাটি বিশেষ ক'রে খাটে। কারণ, দেখা গিয়েছে যে, একই জাতের অথচ বিভিন্ন জায়গায় ও প্রথায় উৎপন্ন বীজ-আলুর ফলনে অনেক তারতম্য হয়েছে।

নীরোগ বীজের গাছে ফলন সব সময়েই বেশি হয়েছে। আলু সহজেই রোগগ্রস্ত হয়, উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় আলু সংরক্ষণ করা কঠিন, তাই ভাল ফলন পেতে হ'লে নির্দেশিত (সার্টিফায়েড) নীরোগ বীজ ব্যবহার করা উচিত। নীরোগ বীজ-আলু



সরকারী বীজ-আলু থেকে উৎপন্ন আলু

ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে চাষের অন্যান্য বিধান-
গুলি যেমন ভালভাবে জমি তৈরি করা, উপযুক্ত
পরিমাণে সুষম সার ব্যবহার করা, জলসেচের উপযুক্ত
ব্যবস্থা করা, রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে
ফসল রক্ষা করা, সময়মত ফসলের যত্ন নেওয়া
ইত্যাদি—ভালভাবে পালন করতে হবে। তা হ'লে
নীরোগ বীজ-আলু ব্যবহার করে বেশি ফলন পাবেন
এবং বেশি লাভবান হ'তে পারবেন।

সারা ভারতে প্রায় উনিশ লক্ষ বিঘা জমিতে আলু-
চাষ হয়ে থাকে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে হয় তিন লক্ষ
বিঘার কিছ্র বেশি জমিতে। আলুচাষের জমির
পরিমাণও ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। বর্তমানে
পশ্চিমবঙ্গে বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ মণ বীজ-আলুর
প্রয়োজন হয়। প্রতি বৎসর পাজ্রাব, আসাম, বিহার
ও রেঙ্গুন থেকে প্রচুর পরিমাণ বীজ-আলু পশ্চিম-
বঙ্গে আমদানি হয়। নেপাল ও সিকিমের আলু
দার্জিলিঙ হয়ে আসে। বিভিন্ন জায়গা থেকে
কী পরিমাণ বীজ-আলু পশ্চিম বাঙলার সমতল-
ভূমিতে আসে তা নিচের তালিকায় দেখানো হ'ল:

(হাক্কায় মণ হিসাবে)

সন	দার্জিলিঙ	আসাম	বিহার	সিমলা	বেঙ্গল	অষ্ট্রাঙ্গ	মোট
১৯৪৮	৩৭'৫	১৮০	৯	৮৪	৭১	০'৪	৩৮১'৯
১৯৪৯	৩৩'৯	১২৮	২৭	১৮০	০	৪	৬৭৫'৯
১৯৫০	৩২	১৬	৩১	১৭৩	২৪	৬	২৮২
১৯৫১	৭১	৩৮	১৯	১৯৩	১০৬	১৫	৪৪২
১৯৫২	৫৬	৫৬	১৮	১৬৫	৪৫	৫	৩৪৫
১৯৫৩	৩০	৪২	৩৪	১২২	৮৫	৪	৩৮৭

এই তালিকা থেকে বোঝা যায়, আমাদের যে ১০
লক্ষ মণ বীজ-আলু দরকার হয়, তার বাকিটা
চাষীরা নিজেদের ফলন থেকে রাখেন। কিন্তু
চাষীরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বীজ-আলু উৎপাদন ও
সংরক্ষণ করেন না বলে এই আলু সহজেই রোগগ্রস্ত
হয় এবং এই অনির্দেশিত রোগগ্রস্ত আলু বীজ-
রূপে ব্যবহার করলে উৎপাদনও ক্রমশ কমে যায়।

বাজারে যে বীজ-আলু পাওয়া যায়, তাও নির্দেশিত
করা নয় এবং তা প্রায়ই রোগগ্রস্ত হয়ে থাকে। তাই

নীরোগ বীজ-আলু উৎপাদনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ-
সরকার থেকে দার্জিলিঙের পার্বত্য অঞ্চলে রংবুল
নামক গ্রামে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭,০০০ ফুট
উচ্চে ৪৫০ বিঘা জমি নিয়ে একটি কৃষিক্ষেত্র স্থাপন
করা হয়েছে। সেখানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে
কয়েক বৎসর ধরে বীজ-আলু ভাইরাস কুটে রোগ
থেকে মুক্ত হচ্ছে এবং হ্রাক-রোগও যত্নসহকারে দমন
করা হচ্ছে। এই রোগমুক্ত বীজ-আলু
দার্জিলিঙ থেকে এনে সমতলভূমিতে
সরকারী কৃষিক্ষেত্রে ও তালিকাভুক্ত চাষীদের
(রেজিস্টার্ড গ্রোআর্স) জমিতে বিশেষজ্ঞদের
তত্ত্বাবধানে পুনরায় বীজ-আলু উৎপাদনের জন্য
ব্যবহৃত হয়। এইভাবে উৎপাদিত আলু থেকে
প্রায় ২০,০০০ মণ আলু সরকার সাধারণ চাষীদের
কাছে বিক্রি করবার জন্য প্রতি বৎসর ঠান্ডাঘরে
(কোল্ড স্টোরেজ) সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এ
বৎসরও ২০,০০০ মণ বীজ-আলু সংরক্ষিত আছে।
বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে চাষীদের দ্বারা এই আলু
উৎপাদিত হয় এবং কেবল পরীক্ষিত নির্দেশিত ও
রোগমুক্ত আলুই সংরক্ষণ করা হয়।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে আলুচাষীদের
বীজ-আলুর জন্য নিজেদের সংরক্ষিত অথবা বাইরের
থেকে আমদানি করা বীজ-আলুর উপর নির্ভর
করতে হয়। এই বীজ-আলু উৎপাদনের সময় কোন
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না এবং
যেভাবে চাষীরা প্রাচীন প্রণালীতে সংরক্ষণ করেন,
তাতে এখানকার উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় সেই বীজ
সহজেই রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তার উৎপাদিকা-
শক্তি অনেক কমে যায়। কারণ সমতলভূমির এই
উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া সকল রকম জীবাণু ও
কীটাদির আক্রমণের পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

এই বীজ-আলু ভালভাবে সংরক্ষিত করতে
পারলে অনেক অপচয় বন্ধ হ'ত এবং আলু রোগমুক্ত
অবস্থায় রাখতে পারলে উৎপাদনও অনেক বেড়ে
যেত। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঠান্ডাঘরে

কৃষ্ণিম ঠাণ্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়া সৃষ্টি করে তাতে বীজ-আলু সংরক্ষণ করা হয়। এতে কোন জীবাণু ও কীটনাশক জন্মাতে পারে না এবং বীজ-আলুর জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। ঠাণ্ডাঘরের ভিতরে উপযুক্ত আর্দ্রতা থাকার দরুন বীজ-আলু শুকিয়ে যায় না।

পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, ঠাণ্ডাঘরের উষ্ণতা ৩৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট ও আর্দ্রতা ৮০-৮৫ ভাগ রাখতে পারলে আলু অনেক কাল অবিকৃত থাকে। ঠাণ্ডাঘরে আলু তাকের উপর বিছিয়ে রাখা হয়। তাকের তলায় ও পাশে বায়ু-চলাচলের জন্য মাঝে মাঝে ফাঁক রাখতে হয়। তাকের উচ্চতা ১৮ ইঞ্চি

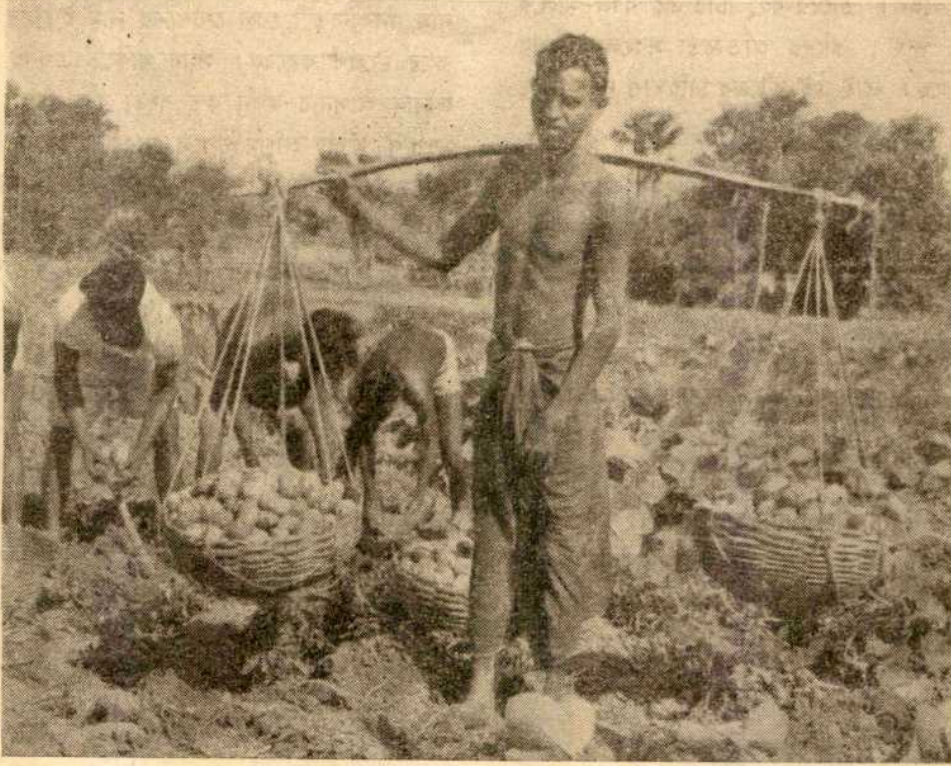


হরিপালে শ্রীবলাই দাসের ক্ষেতে সরকারী বীজ-আলু থেকে
আলুর ফলন হয়েছে দেখবার মত

এবং সংরক্ষিত আলুর উচ্চতা ১২ ইঞ্চির বেশি হয় না। বাইরের অত্যধিক তাপ থেকে হঠাৎ ঠান্ডাঘরের ৩৬ ডিগ্রী ফারেনহাইটে রাখলে আলুর জীবনীশক্তি ক্ষুণ্ণ হতে পারে। তাই প্রথমে আলু ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা ৬০ ডিগ্রী ফারেনহাইটে রেখে পরে ৩৬ ডিগ্রী ফারেনহাইটে সংরক্ষণ করা হয়। এতে বীজ-আলুর অঙ্কুরোদ্গমের শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে

সময়ের মধ্যেই অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং গাছ খুব জোরালো হয় আর তাতে ফলনও বেড়ে যায়।

কিন্তু বীজ-আলু শুদ্ধ ভালভাবে সংরক্ষণ করতে পারলেই যে ফলন বৃদ্ধি পাবে তা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। বীজ নীরোগ হওয়া দরকার। বাজারে যে বীজ আমদানি করা হয় তা নীরোগ কিনা সেটা না দেখেই আনা হয় তাই ফলনও আশানুরূপ হয় না। এই



ফসল ভাঙে ভাঙে চাষীরা ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন

অথচ ঠান্ডাঘরের ভিতরে অঙ্কুর বের হয় না। সাধারণত বীজ-আলু পরবর্তী ফসলের জন্য অন্তত আট মাস কাল রাখতে হয়। সাধারণভাবে রাখলে উষ্ণ আবহাওয়ায় ঐ সময়ের মধ্যে বীজ-আলুর অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বীজ-আলু শুকিয়ে যায় বলে এই বীজ-আলু থেকে ভাল গাছ হয় না এবং ফলনও কম হয়। ঠান্ডাঘরের আলু বাইরে নিয়ে এলে তাপ-মাত্রার তারতম্যে অল্প

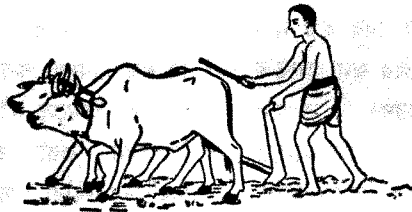
অসুবিধা দূর করবার জন্য সরকার থেকে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথমত দার্জিলিংয়ের পার্বত্য অঞ্চলে নীরোগ বীজ সরকারী তত্ত্বাবধানে উৎপাদন করা হয়। সেই বীজ তালিকাভুক্ত চাষীদের দ্বারা সমতলভূমিতে বর্ধিত করা হয়। চাষের সময় প্রতিটি গাছ রোগমুক্ত রাখবার ব্যবস্থা করা হয় এবং রোগ ও কীট দমনের জন্য ঔষধাদি ব্যবহার করা হয়। সবশেষে, চাষীদের কাছ থেকে

যে আলু সংগ্রহ করা হয় তা পরীক্ষা করে নিদর্শিত করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু পরীক্ষিত, নিদর্শিত ও নীরোগ বীজ-আলুই ঠান্ডাঘরে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। তাই এই বীজ-আলুর ফলনও যথেষ্ট বেশি হয়।

গত কয়েক বৎসর ধরে অনেকেই সরকারী ঠান্ডাঘরে রক্ষিত বীজ-আলু ব্যবহার করে খুব ভাল ফল পেয়েছেন। তাঁদের বহু চিঠি এই বীজ-আলুর প্রশংসায় পূর্ণ। তাঁদের অভিজ্ঞতা সকলের সংশয় দূর করেছে। তাই এই বীজের চাহিদাও দ্রুত বেড়ে চলেছে।

সরকারী ঠান্ডাঘরে এখন চার রকমের আলু রাখা হয়। 'দার্জিলিং লাল', 'রংবুল ৯' 'রয়েল কিডনি' (রেঙ্গুন জাতীয়) এবং 'আপটু ডেট' (নৈনিতাল জাতীয়)। বীজ একই আকারের রাখা হয়—১ ইঞ্চি থেকে ২ ইঞ্চি ব্যাসের। এক বস্তায় দেড়মণ আলু থাকে। তাই বস্তা বা দেড় মণের হিসাবে অর্ডার লওয়া হয়। কোন চাষীর এক বস্তা দরকার না হলে, কয়েকজন মিলে এক বস্তা নিতে পারেন। যতদূর সম্ভব চাষীদের চাহিদা অনুযায়ী বীজ-আলু সরবরাহ করা হয়; তবে কোন রকমের আলু মজুত না থাকলে পরবর্তী সমগ্ৰসম্পন্ন ও উপযোগী আলু পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সরকার থেকে যে দর বেঁধে দেওয়া হয় তা পশ্চিম বাঙলার যে-কোন স্থানের রেলভাডাসমেত। সরকার থেকে লোক দিয়ে ক্রেতার নিকটস্থ রেল স্টেশন পর্যন্ত আলু 'পার্সেল-বুক' করে রসিদ তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রাস্তায় কোন কারণে আলু নষ্ট হ'লে বা কমে গেলে সে দায়িত্ব সরকারের নয়। সুতরাং অর্ডার দেওয়ার সময় আপনার গ্রামের নাম, ডাকঘরের নাম, তার-অফিসের নাম, নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম ইত্যাদি স্পষ্ট করে উল্লেখ করবেন। সময় থাকতে এখনই লিখে জানান আপনার কখন কত বস্তা বীজ-আলু চাই। সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পেলে, সরকার থেকে সেই অনুসারে আপনাকে বীজ পাঠানো হবে। সরকারী অফিস থেকে খবর পেলে তবে টাকা পাঠাবেন। আগেই টাকা পাঠাবেন না। নিজেরাও কলিকাতায় রাইটার্স' বিল্ডিংস-এ কৃষি বিভাগের আলু-প্রাধিকারিকের দফতরে এসে টাকা জমা দিয়ে এবং নমুনা দেখে বীজ-আলু নিয়ে যেতে পারেন। যাঁরা বীজ-আলু কিনতে ইচ্ছুক, তাঁরা তাঁদের নিকটবর্তী কৃষি-কর্মচারীকে ব্যবস্থা করতে বলতে পারেন, কিংবা নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন বা পত্র লিখুনঃ শ্রীসুধীরচন্দ্র নাগ বিশ্বাস, আলু-প্রাধিকারিক, স্পেশাল অফিসার, পট্যাটো, পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগ, রাইটার্স' বিল্ডিংস, কলিকাতা-১।



ত্রিপুরায় জুমচাষ

আচম্ভীচরণ রায়

কৃষি-সহকারী, ত্রিপুরা

অসমাদেৰ দেশ কৃষিপ্রধান ; তাহাৰ অৰ্থ কিন্তু ইহা নহে যে, এই দেশেৰ সকল অঞ্চলই কৃষিপ্রধান। কোন কোন অঞ্চল আবার বিশেষ বিশেষ সম্পদে সমৃদ্ধ ও সেইজন্য সুখ্যাত। ত্রিপুরা রাজ্য তাহাৰ বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। কৃষিকৰ্মেৰ জন্যও পাৰ্বত্য বনভূমি ব্যবহৃত হয়। ত্রিপুরা রাজ্যেৰ ভূভাগ লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে, ইহাতে সমতল ভূমি অপেক্ষা পাৰ্বত্য ভূমিই পৰিমাণে বেশি। সমান্তরাল পাঁচটি পৰ্বতমালায় ঘেৰা সুন্দৰী ত্রিপুরা। এই মেঘ-চুম্বিত গিৰিমালাৰ সান্দ্রপ্ৰদেশেৰ আদিম অধিবাসী-দিগকে এখনও পৰ্বত খুঁড়িয়া শস্য উৎপাদন কৰিতে হয়। ত্রিপুরায় কিভাবে জংগলাকীৰ্ণ পাহাড় বা টিলা আবাদ হইতেছে এই প্ৰবন্ধে তাহাৰই একটা আভাস দেওয়া হইতেছে।

ত্রিপুরাৰ আদিম অধিবাসীদেৰ অধিকাংশই ত্রিপুরী (চলতি কথায় 'টিপুৰা' বলা হয়), চাকমা ও মগ সম্প্ৰদায়েৰ। বহুদিন পৰ্যন্ত সভ্য দুনিয়া হইতে তাহাৰা বিচ্ছিন্ন ছিল। প্ৰকৃতিৰ কোলে লালিতপালিত সরল আদিবাসীৰা আজও জুমচাষেৰ উপৰ সৰ্বতোভাবে নিৰ্ভৰশীল। তাহাৰা যেমন সরল তেমন কঠোৰপৰিশ্ৰমী। জুমকে কেন্দ্ৰ কৰিয়া তাহাৰা নৃত্যগীতে মাতিয়া উঠে। তাই জুমচাষেৰ বিভিন্ন স্তৰে ঘৰে ঘৰে নৃত্যোৎসব চলিতে থাকে। এই নাচগানেৰ ভিতৰ দিয়া তাহাৰা আনন্দ ও কৰ্মপ্ৰেৰণা লাভ কৰে।

পাহাড় বা উচ্চ টিলাতে যে ধান উৎপন্ন হয়, তাহাই ত্রিপুরায় জুম ধান নামে বিশেষ পৰিচিত। এই জুম চাষেৰ জন্য প্ৰথমত একাটি উচ্চ টিলা (অনুচ্চ ছোট পাহাড়) নিৰ্বাচন কৰা হয়। টিলাতে বাহাতে

বৃষ্টিৰ জল জমিতে না পাৰে তৎপ্ৰতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। মাঘেৰ ম্ৰিত্যু সপ্তাহ হইতে ফাল্গুনেৰ ম্ৰিত্যু সপ্তাহ পৰ্যন্ত নিৰ্বাচিত টিলাগুলিৰ গাছ-গাছড়া কাটা হয়। তাৰপৰি চৈত্র মাসেৰ প্ৰথমভাগে কৰ্তিত শূস্ক লতাপাতা ও গাছপালায় আগুন দেওয়া হয়। এই আগুনেৰ কী ভীষণ শব্দ, তাহা প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ভিন্ন আৰ কেহ উপলব্ধি কৰিতে পাৰিবে না। এইভাবে টিলাৰ সমস্ত গাছগাছড়া পোড়ানোৰ পৰি জুমচাষীদিগকে বৃষ্টিৰ অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়। টিলাৰ গাছপালা-পোড়ানো ছাইএৰ কিছুটা বৃষ্টিৰ জলে ধুইয়া লইয়া যায়। বাকি যাহা থাকে, তাহা কুড়াইয়া লইয়া জুমক্ষেত পৰিস্কাৰ কৰিতে হয়।

চৈত্ৰ মাসেৰ শেষভাগে জুমচাষী-পৰিবাৰেৰ স্ত্ৰী-পুৰুষ নিৰ্বিশেষে সকল সমৰ্থ ব্যক্তিই ট্যাক্সল হাতে জুমচাষে লাগিয়া যান। ট্যাক্সল দেখিতে অনেকটা দাএৰ মত, তবে সম্মুখেৰ অংশটুকু দেখিতে অনেকটা কুড়ালেৰ মত। ইহাৰ দৈৰ্ঘ্য বাঁট সহ ১৪ হইতে ২০ ইঞ্চি পৰ্যন্ত হয় এবং সম্মুখভাগেৰ প্ৰস্থ প্ৰায় ২ ইঞ্চিৰ মত থাকে। সাৰিবন্ধভাবে একটু দূৰে দূৰে বীজবপনেৰ জন্য এই ট্যাক্সল দিয়া মাটিতে গৰ্ত কৰা হয়। ইহাৰ এক কোপে ২ হইতে ২২ ইঞ্চি পৰ্যন্ত গভীৰ গৰ্ত হয়। এই গৰ্তেৰ প্ৰতিটিৰ মধ্যে ৩-৪টি কৰিয়া পুৰুষবীজ নিক্ষেপ কৰা হয়। ট্যাক্সল মাটি হইতে তুলিয়া আনিবাৰ সময় চাৰিপাশেৰ চৰ্ণ মাটি বীজগুলিকে স্বাভাবিকভাবে ঢাকিয়া ফেলে। এইভাবে ৬ হইতে ৮ ইঞ্চি দূৰে দূৰে সাৰি কৰিয়া বীজ বপন কৰা হয়, সুতৰাং জুমচাষে বীজবপন অনেকটা জাপানী পদ্ধতিতে কৰা হয়। সাধাৰণত টিলাৰ নিম্নভাগেই

প্রথম সারি করা হয়, তারপর সারিগুলি সমান্তরাল-ভাবে ক্রমশ উপরের দিকে উঠিতে থাকে।

বীজ বহনের জন্য জুমচাষীরা একপ্রকার ছোট ছোট ঝড়ি ব্যবহার করিয়া থাকেন। এক-একটা ঝড়িতে একসের পরিমিত বীজ ধরে। কেহ কেহ ঝড়ি ঝুলাইয়া কোমরে বাঁধিয়া রাখেন, কেহ কেহ আবার মাথায় বা কাঁধে ঝুলাইয়া রাখেন। জুম-প্রথায় বপনে খুব কম বীজ লাগে। এক কানি (৯৬ হাত×৮০ হাত) ক্ষেতে মাত্র ৮-১০ সের বীজের প্রয়োজন হয়। দুইজন লোক একদিনে এক কানি জমি বপন করিতে পারে।

জুমচাষের বিশেষত্ব এই যে, এক ক্ষেতে এক সময়ে বিভিন্ন রকমের শস্য উৎপাদন করা হয়। তবে তাহার মধ্যে ধানই প্রধান। 'কাউন' নামে একপ্রকার ক্ষুদ্রাকারের ধান লাগানো হয়। এই কাউনের চাউল পায়সের জন্য বিশেষ উপযোগী। ইহা ছাড়াও সাদা তিল, কার্পাস, ছাঁচি কুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, বেগুন, বিজ্জা, চিনড়া, প্রভৃতি নানাবিধ তরকারীর বীজ ধানগাছের ফাঁকে ফাঁকে পুতিয়া রাখা হয়। ইহাদের ফসলও ভাল হয়।

বীজ বপনের প্রায় ১৫ দিন পর ধানগাছের আগাছা একবার পরিষ্কার করা হয়। এইভাবে প্রায় ১৫-২০ দিন পর পর আগাছা-দমনের কাজ চলিতে থাকে। ক্রমে সারিবদ্ধ ধানগাছগুলি বাড়িয়া মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি করে এবং একসময়কার অনাবৃত ও মৃদুভিত টিলা এক খন্ড সবুজ গালিচার মত দেখায়।

জুমচাষে ধানের জন্য পৃথক সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। বৎসরের পর বৎসর ঘোপ-জঙ্গলের লতাপাতা পড়িয়া মাটির সহিত মিশিয়া থাকে এবং মাটিকে উর্বর করে। ইহাতে ধানের ফলন খুব বেশি হয়। ফলে সুউচ্চ টিলাতেও কানিপ্রতি প্রায় ২০ মণ হইতে ২২ মণ পর্যন্ত ধান ফলে।

এইভাবে জুমচাষীদের অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং ঘরে ঘরে আনন্দোৎসব চলিতে থাকে। জুমচাষীদের অটুট স্বাস্থ্যসম্পদই তাহাদের কর্ম-জীবনকে আনন্দময় করিয়া তোলে। তাই তাহাদের ধান-মাড়াইও একটি বিশেষ আনন্দোৎসব ও কাব্যময়। ধান-মাড়াইবার জন্য বাঁশের উঁচু মাচা তৈয়ার করা হয়। মাচার গায়ে যে ছোট ছোট ফাঁক থাকে তাহা ধান মাটিতে পড়ার পক্ষে যথেষ্ট। আনন্দমুখর কৃষাণীরা ধানের আঁটি লইয়া দলে দলে মাচার উপর উঠেন এবং ধানগাছগুলি মাচার উপর ছড়াইয়া রাখেন। কৃষকেরা নিচে থাকিয়া ঢোলক, সারেঙ্গী, প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া গান করিতে থাকেন। তখন কৃষাণীরা ধানের উপরে তালে তালে নৃত্য করিতে থাকেন। কল্যাণীদের পদস্পর্শে ধন্য ধান ক্রমে ক্রমে বৃন্তুচ্যুত হইতে থাকে এবং মণ্ডের ফাঁক দিয়া মাটিতে পড়িতে থাকে।

জুমচাষ কিন্তু আর্থনৈতিক ও পল্লীজীবন গঠনের পরিপন্থী। জুম-প্রথায় একটি টিলা একবার চাষ করিলে তাহা বন্যা হইয়া যাওয়ায়, টিলাটি ৩-৪ বৎসরের জন্য পতিত রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে কোন টিলারই স্থায়ীভাবে উন্নতি-সাধন হয় না এবং চাষীরাও নির্দিষ্ট একস্থানে বসতি করেন না। জুমক্ষেতের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বাড়িঘরও স্থানান্তরিত হয়। তাই এই যাবাবর-শ্রেণীর পরিবারগুলিতে বহু কারণে দারিদ্র্য চিরকালের মত বাসা বাঁধে। একবার চাষ-আবাদের পর একটি টিলা ৩-৪ বৎসরের জন্য বন্যা হইলে অন্যত্র চাষ-আবাদের জন্য ঘর ছাড়ার অস্থিরতায় যে-কোন মূল্যে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তাহাদিগকে ঐ ফসল বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়; আর এরই সুযোগ গ্রহণ করে ব্যবসায়ীর দল, বীজধান ক্রয়ের জন্য অর্থের অভাববশত চাষীরা এই ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে অধিক সুদে কর্জ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। পরে সুদ সহ এই কর্জ মিটাইতে গিয়া তাহাদের এই জমিজমা মহাজনের হস্তগত হইয়া

পড়ে। ফলে বংশপরম্পরায় এই ঋণের জের টানিয়া তাঁহারা একমুষ্টি অন্ন পেটে দিতে পারেন না। অধিকন্তু তাঁহাদের এই ভ্রাম্যমাণ জীবন দেশের মাটির প্রতি মমত্ববোধ ও পল্লীসংগঠনের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। সর্বোপরি জন্মচাষে একমাত্র মানুষই শ্রমের উৎস। সাধারণ চাষ-আবাদে পশুশক্তি মনুষ্য-শক্তিকে সাহায্য করে।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হ্রিপদুরা রাজ্যে খাদ্যশস্যের চাহিদাও বাড়িতেছে। এই নতুন পরিস্থিতিতে শুধু জন্মচাষের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। কারণ ট্যাক্সল দিয়া অতি

সামান্য জমিই চাষ করিতে পারা যায়। পূর্বে জন্ম-চাষীদের দৈনন্দিন জীবনে চাহিদাও সীমাবদ্ধ ছিল। এখন দূরনিয়ার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসের তালিকা ও পরিমাণ বাড়িতেছে। তাই অধিক পরিমাণে অর্থকরী ফসলের চাষ-আবাদ করারও প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

আশা করি, জন্মচাষী ও হ্রিপদুরার কৃষিবিভাগের সমবেত প্রচেষ্টায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে জন্মচাষ-নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা অনুযায়ী এই সমস্যার একটা সমাধান মিলিবে এবং অচিরেই হ্রিপদুরায় উন্নততর কৃষিব্যবস্থা ও পল্লীজীবন গঠিত হইবে।



‘বেয়ার’এর পোকা ও রোগ দমনের ঔষধগুলির
দ্বারা আপনাদের ফসল রক্ষা করুন

ফলিডল-ই ৬০৫

মেটাসিস্টক্স

সেরেসান

অ্যাগালল

কুপ্রাভিট (ওবি ২১)

এইগুলি পশ্চিম জার্মানীর লিভারকুসেনের
ফারবেনফ্যাবরিকেন বেয়ার
দ্বারা প্রস্তুত আসল ঔষধ।

ভারতে পরিবেশক

চিকা প্রাইভেট লিমিটেড,

৩১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২



চীনে সমবায় কৃষি

১৯৫৬ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে ভারত থেকে একটি পরিদর্শনকারী প্রতিনিধি দল চীন-দেশে কৃষি সমবায় সমিতির কাজ দেখতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তাঁরা একটি বিবরণী পেশ করেছেন। এই দলের বেশির ভাগ সভ্যের মতে চীনদেশে কৃষি সমবায় সমিতিগুলি সার্থকভাবে কাজ করছে, এবং আর্থনৈতিক ও সামাজিক এই দুই দিক থেকে বিচার করলে, ভারতেও সমবায়-ভিত্তিক চাষ-বাসের প্রচলন হওয়া উচিত।

পরিদর্শনকারী দলের নায়ক, শ্রী আর কে পাতিলের মতে “সমবায় ব্যবস্থা নতুন কাজের ক্ষেত্র খুলে দেবে ও আমাদের দেশে জীবনযাত্রার মানদণ্ড উন্নীত করতে সাহায্য করবে।”

আগামী চার বছরে ৫০টি গ্রাম নিয়ে একটি কৃষি-সমবায় সমিতি, এই হারে, দেশে ১০,০০০টি কৃষি-সমবায় সমিতি গঠন করার জন্য দলটি সুপারিশ করেছেন। এর পর, এই আন্দোলনের কাজে অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী সমবায়-ভিত্তিক চাষ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করার কথা বলা হয়েছে।

আমাদের দেশে ভূমি সংস্কারের প্রয়োজন। সেইজন্য কতকগুলি নীতি মেনে নিতে হবে। দলের সভ্যদের মতে, আমাদের দেশে ভাড়া-করা লোক দিয়ে চাষ করার যে প্রথা আছে, তা বন্ধ করা দরকার। একটি পরিবার সেইটুকু জমি পারে যা সেই পরিবারের লোকেরা চাষ করতে পারে। বাকি জমি সেইসব ভূমিহীন চাষী ও অল্প জমির মালিক চাষীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে—যারা নিজেদের চাষের জমির সঙ্গে সমবায়ের ভিত্তিতে এইসব বাড়তি জমির চাষ করতে রাজী হবে।

আমাদের দেশে পল্লী-উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমষ্টি-উন্নয়ন-পরিকল্পনার গুরুত্ব বিবেচনা করে, বিশেষত

দু'বছরের উপর কাজ হচ্ছে এমন-সব জাতীয়-সম্প্রসারণ-রকে এবং অন্যান্য সমষ্টি-উন্নয়ন-এলাকায় কৃষি সমবায় সমিতি গঠন করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

এই দলের সদস্যেরা আরও বলেছেন যে, এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য কারও উপর যেন বলপ্রয়োগ করা না হয়। চাষীরা তাঁদের ইচ্ছামত সমবায় সমিতিতে যোগ দিতে পারবেন বা সেই সমিতি ত্যাগ করতে পারবেন।

চীনদেশে এই ব্যবস্থা চালু করার জন্য কোথাও বলপ্রয়োগ করা হয় নি, এই ধারণাই তাঁদের হয়েছে বলে তাঁরা জানান।

চীনদেশের কৃষি-সমবায় সমিতির কাজের বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁরা বলেন যে, ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসের মধ্যেই সেখানে গ্রাম্য পরিবারগুলির শতকরা ৯২ জন লোককে নিয়ে দশ লক্ষ সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। এখন সমিতিগুলির কাজে একাগ্রতার সঞ্চার করার ও নানাভাবে কাজের উন্নতি করার চেষ্টা চলেছে। শতকরা ৩০টি পরিবার প্রাথমিক সমবায় সমিতির সভ্য ও বাকি শতকরা ৬২টি পরিবার প্রগতিশীল সমিতির সভ্য।

প্রাথমিক সমিতির সভ্যদের জমির স্বত্ব ছাড়তে হয় নি। তাঁরা মালিকানা ও শ্রমের উপর আয়ের ভাগ পান। দ্বিতীয় শ্রেণীর সমিতিগুলির সভ্যদের কোন মালিকানা স্বত্ব নেই। তাঁরা তাঁদের শ্রমের উপর আয়ের ভাগ পেয়ে থাকেন। পরিদর্শনকারী দল ১৯টি সমিতির কাজ পরীক্ষা করেন। তার মধ্যে ১৮টি সমিতি বেশি শস্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে সরকার ও রাজনৈতিক দলের পূর্ণ সহায়তা। ব্যক্তিগত ও দলগত চেষ্টাকেও নানাভাবে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। কার্য-সমালোচনার দু'টি মাপকাঠি আছে। একটির নাম ‘norm’ ও অপরটির নাম ‘long contract’ (লম্বা চুক্তি)।

সাধারণ শ্রমিক সাধারণত কতটা কাজ করতে পারে তার হিসাবেই 'norm' ঠিক হয়। 'লম্বা চুক্তি' অনুসারে একদল লোকের সঙ্গে এই চুক্তি করা হয় যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তারা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের শস্য উৎপাদন করবে। এই চুক্তির উপর তারা যে শস্য উৎপাদন করবে তার শতকরা ৮০ ভাগ তারা নিজেরা নেবে।

ভারতীয় দলটি এসব সমবায় সমিতির নেতাদের কাজ দেখে মদুন্দ্ব হয়েছেন। অল্পবয়স্ক যুবক বা যুবতী নেতারা বদ্বিয়ে সদ্ধিয়ে নানাভাবে লোকদের কাজে উৎসাহ দেন। এর জন্য বল-প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। নেতাদের বয়স সাধারণত ২০ থেকে ৩০এর মধ্যে। প্রায় প্রত্যেক সমিতির সভাপতি বা উপসভাপতি স্ত্রীলোক।

এখানে চীনের চাষবাসের অবস্থার সঙ্গে ভারতের চাষবাসের অবস্থার তুলনা করলে এবং কীভাবে ধাপে ধাপে চীনদেশে সমবায়-আন্দোলন চালু করা হয়েছে তার বিচার করলে উপরের বিবরণীর সঠিক মূল্যটা যাচাই করা যাবে।

ভারতবর্ষের তুলনায় চীনদেশের আয়তন শতকরা ২০০ ভাগের উপর ও তার জনসংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগের বেশি। কিন্তু সেখানে চাষের জমির আয়তন ভারতবর্ষের তুলনায় কম—চীনে চাষের জমি ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ একর, ভারতে ৩০ কোটি ২ লক্ষ একর। তবে, চীনে সেচব্যবস্থা আমাদের দেশের চেয়ে আরও ব্যাপক। সেখানে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা হয় আর এখানে ৫ কোটি ২০ লক্ষ একর জমির জন্য সেচের ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া, চীনে অনেক জমিতে বছরে দু'বার কি তিনবার চাষ করা হয়, ভারতে এমন জমি খুব কম।

যুদ্ধের সময় আভ্যন্তরিক গোলযোগের দরুন চীনে কৃষিকাজের খুব ক্ষতি হয়। কিন্তু গত কয়েক বছরে সেখানে আবার চাষের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে দেখা যায়। ১৯৪৯ সালে চাষের জমির

পরিমাণ ছিল ২৪ কোটি ৫০ লক্ষ একর, ১৯৫৫ সালে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ একরে। ১৯৪৯ সালে ৫ কোটি ১০ লক্ষ একর জমির জন্য সেচের ব্যবস্থা ছিল, ১৯৫৫ সালে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ একরে সেই ব্যবস্থা প্রসারিত হয়েছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৪৯ সালে হয়েছে ১০ কোটি ৮০ লক্ষ মেট্রিক টন, তা থেকে বেড়ে ১৯৫৫ সালে ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে। ১৯৪৯ সালে ধান হয়েছিল ৪ কোটি ৮০ লক্ষ মেট্রিক টন (৩ কোটি ২০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল)। ১৯৫৫ সালে ৭ কোটি ৮০ লক্ষ মেট্রিক টন ধান (৫ কোটি ২০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল) জন্মেছে। ১৯৪৯ সালে গম হয়েছে ১ কোটি ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন, ১৯৫৫ সালে হয়েছে ২ কোটি ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন। ১৯৪৯ সালে তুলার উৎপাদন ছিল ৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন, ১৯৫৫ সালে হয়েছে ১ কোটি ৫২ লক্ষ মেট্রিক টন।

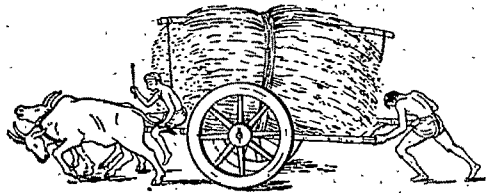
প্রতি একরে ফলনের পরিমাণও অনেক বেড়ে গেছে। ১৯৪৯ সালে এক একর জমিতে ১,৬৬৫ পাউন্ড ধান জন্মাত আর ১৯৫৫ সালে প্রতি একরে ২,৩৫৫ পাউন্ড জন্মেছে। ভারতের তুলনায় এই ফলনের পরিমাণ অনেক বেশি। আমাদের দেশে ১৯৫৪-৫৫ সালে প্রতি একরে ১,১০০ পাউন্ড ধান জন্মেছে (৭৩০ পাউন্ড চাল)। কিন্তু চীনদেশে যুদ্ধের আগে একরপিছ ৩,২১০ পাউন্ড ধান (২,১৪০ পাউন্ড চাল) জন্মাত; সে-তুলনায় এখানকার ফলনের পরিমাণ অনেক কম। এখানে ব'লে রাখা দরকার যে, চীনদেশে ধানের উৎপাদন আমাদের দেশের তুলনায় সব সময়েই অনেক বেশি হয়। কারণ, সেখানে মোটা ও আঠালাগা ধান জন্মানো হয়, আর আমাদের দেশের চাষাীরা প্রচুর পরিমাণ সরু ধান (মিহি চাল) জন্মায়। মোটা ধানের উৎপাদন সাধারণত বেশি। চীনে প্রতি একরে ৭৫৫ পাউন্ড গম হয়; ১৯৪৯ সালে হ'ত ৫৬৫ পাউন্ড। যুদ্ধের আগে সেখানে প্রতি একরে ৮৭৪ পাউন্ড গম জন্মাত এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে

আমাদের দেশে প্রতি একরে ৭১৩ পাউন্ড গম জন্মানো হয়েছে।

চীনদেশে প্রধানত সমবায়-আন্দোলনের ভিত্তিতে কৃষি-উন্নয়নের চেষ্টা হচ্ছে। তিনটি বিভিন্ন ধরনের সমবায়-প্রচেষ্টার মধ্যে কৃষকদের সমবেত করা হয়েছেঃ (১) কৃষিক্ষণ সমবায় সমিতি, (২) সরবরাহ ও বিক্রয় সমবায় সমিতি, (৩) সমবায় কৃষি। কৃষিক্ষণ সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৯৫০ সালে ছিল ১০৩টি, ১৯৫৪ সালে হয়েছে ১,২৪,০০০। কিন্তু সরবরাহ ও বিক্রয় সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৯৫০ সালের ৩৯,৪৩৬ থেকে ১৯৫৫ সালে ৩০,৪৭৫-এ নেমে গেছে। এর কারণ, কাজের সুবিধার জন্য অনেক ছোট ছোট সমিতিকে নিয়ে এক-একটি সমিতি গড়া হয়েছে। সমবায় কৃষির সমিতির সংখ্যা ১৯৫০ সালে ছিল মাত্র ১৯টি, ১৯৫৪ সালে হয়েছিল ১,১৪,০০০ ও ১৯৫৫ সালে হয়েছে ৬,৩৪,০০০। ১৯৫৬ সালের মে মাসে এর সংখ্যা ১০ লক্ষের উপর হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

চীনবাসীরা প্রথমে সরবরাহ ও বিক্রয় সমবায় সমিতি গড়ার কাজে হাত দেয়। পরে, তারা কৃষিক্ষণ সমবায় সমিতি গঠন করে। কিছুকালের মধ্যেই এমন ব্যবস্থা করা হয় যাতে কৃষকরা কৃষিক্ষণ সমবায় সমিতি অথবা কৃষি ব্যাংক ছাড়া অন্য কোন সূত্র থেকে ঋণ পেতে না পারে। সেই সঙ্গে এ ব্যবস্থাও করা হয় যাতে তারা তাদের উৎপন্ন শস্য

সরবরাহ ও বিক্রয় সমবায় সমিতি ছাড়া অন্য কোথাও বিক্রি না করতে পারে এবং যাতে এই সমিতির কাছ থেকেই তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে বাধ্য হয়। এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টি ও দেশের সরকার সমবায় কৃষি সমিতি গঠনের জন্য জোর প্রচার চালান। এই অবস্থাতেও সমবায় কৃষি সমিতির প্রসার ধাপে ধাপে করা হয়। প্রথমে যেসব জমির মালিক নিজে চাষ করেন না তাঁদের কাছ থেকে জমি নিয়ে অনটনগ্রস্ত চাষীদের মধ্যে ও ভূমিহীন শ্রমিকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়। রাজনৈতিক অপরাধ ছাড়া, মালিক ও চাষীদের অধিকারে প্রায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হয় নি। জমি বিতরণের পর ছোট ছোট চাষীদের নিয়ে তাদের পরস্পরের সাহায্যের জন্য একটি সাহায্যকারী দল গঠন করা হয়। এই ব্যবস্থায় জমি চাষীদের ব্যক্তিগত দখলে থাকে। এরপর, তাঁদের প্রাথমিক প্রকৃতির সমবায় সমিতি গড়তে উৎসাহ দেওয়া হয়। সমস্ত জমি একত্র করা হয় কিন্তু কৃষকদের তাঁদের আপন আপন জমির পরিমাপে ও পারিশ্রমিক হিসাবে লাভের অংশ দেওয়া হয়। জমি বিতরণের পরে প্রায় প্রত্যেক চীনা চাষী নিজের ভাগে মাথাপিছু এক একরের কম জমি পেয়েছিল। তাদের প্রায় কারও ভাল লাঙল ছিল না বা লাঙল টানবার পশু ছিল না। এই অবস্থায় সরকার যখন সমবায় সমিতিতে যোগ দিলে বিশেষ সাহায্য করতে রাজী হন, তখন অনেক চাষাই উৎসাহের সঙ্গে এতে যোগদান করেন।



ছাদের ওপর সবজিবাগান

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

বৌবাজার স্ট্রীটে এক ধনী বন্ধুর প্রকাণ্ড চারতলা বাড়ি। দোতলার বৈঠকখানাঘরে বসে দু'জনে গল্প করছিলাম, এমন সময় ভূত্যা এসে খবর দিলে—‘পুই-মাচা ভেঙে পড়ে গেছে।’ একটু আগে আমরা ওপর থেকে একটা ভারি জিনিস পড়বার শব্দ পেয়েছিলাম বটে। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম—‘পুইমাচা? ছাদে?’

‘হ্যাঁ, বলেন কেন আর! বাজার থেকে এক পয়সার পুইশাক আনলে, খাবার লোক মেলে না, তার জন্যে বিশ-পাঁচিশ টাকা খরচ করে প্রকাণ্ড এক মাচা!—চলুন, ব্যাপারটা একবার দেখে আসা যাক।’ উপরে উঠতে উঠতে বন্ধু বলে যেতে লাগলেন—‘পুইশাকের ওপর মেয়েদের নোলা.....’

বাধা দিয়ে বললাম—‘সব মেয়েদের নয়, বাঙালী মেয়েদের, বলুন’।

‘তাই। কী অদ্ভুত! এই পুইমাচাটার ওপর গিন্নীর মন পোনের আনা তিন পাই পড়ে থাকে!’

হাসতে হাসতে বললাম, ‘তা হলে আর যাবতীয় জিনিস তাঁর মনের ঐ বাকি এক পাইএর মধ্যে পড়ে থাকে? মাগ্ন আপনি পর্যন্ত?’

ওপরে গিয়ে দেখলাম, প্রকাণ্ড ছাদে প্রকাণ্ড পুই-মাচা। একমাচা সুপদ্রুত তেজালো শাকের ভার সহ্য করতে না পেরে মাচাটার একটা দিক ভেঙে পড়েছে। দেখলাম, শুধু পুইশাকের মাচাই নয়, অনেকগুলো বড় বড় টবে কয়েককমের সবজির গাছ রয়েছে। তিন-চারটে লস্কাগাছ, সবগুলোতেই এক-গাছ করে লস্কা হয়েছে। চার-পাঁচটা ঢাউস-গাছ, গোটা তিন-চার বেগুনগাছ, বেগুন বোধহয় তখন গাছে দেখি নি; টক-ঢাউসের গাছও মনে হয় দু'একটা ছিল। একটা বড় টবে বিঙেগাছ লাগিয়ে, ছাদের আলসের সঙ্গে একটা বাঁখারির

দাঁড় করানো ‘জাফ্রি’তে সেটা যত্ন করে দেওয়া হয়েছিল। দুটো টবে দুটো ঝাঁকড়া তুলসীগাছও ছিল। একটা প্রকাণ্ড কাঠের টবে সতেজ ও নধর দুর্বাঘাস জন্মে টবটা ছেয়ে ফেলেছে।

ছাদের ওপর এই শখের সবজিক্ষেত্রে দেখে আমার মনে অনেকদিন আগের একটা কথা জেগে উঠল। কথাটা পঞ্চাশ বছর আগের তো বটেই, বরং আরও কিছু বেশিও হতে পারে। তখন আমার পূর্ণ যুবা-বয়স। তখনকার দিনের শখের থিয়েটারে আমার খুব নাম ও আদর। কলকাতার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শখের থিয়েটার ছিল—‘সঙ্গীত-সমাজ’। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে তার পাকা ইমারত ও বাঁধা স্টেজ ছিল। বিখ্যাত সঙ্গীত-বিশারদ ও ধনী ‘দুর্নিয়ালাল শীল’ ‘সঙ্গীত-সমাজ’এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। কিন্তু কোনও কারণে তিনি তার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে, তাঁর জোড়া-সাঁকোর প্রাসাদোপম বাড়িতে নিজের ব্যয়ে এক থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। তার নাম ‘সুবর্ণবর্ণিক অবসর সমিতি’। জোড়াসাঁকো-চিংপুর্ রোডের ওপর তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ি সম্ভবত সকলেই দেখে থাকবেন। রাস্তার পশ্চিমদিকে মল্লিকবাবুদের ঘাড়ি-ওলা বাড়ি আর পূর্ব দিকে রাণী কাত্যায়নীর অর্থাৎ দুর্নিবাবুর বিরাট বাড়ি। এই বাড়ির বার-মহলের বিস্তীর্ণ চত্বরে দুর্নিবাবু থিয়েটারের জন্যে বাঁধা স্টেজ তৈরি করলেন। আরও অনেক কিছু করলেন। এই থিয়েটারের পেছনে দুর্নিবাবু তখনকার দিনের এক লাখ টাকা খরচ করেন। এই থিয়েটার-সুত্রেই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হয় ও সেই আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

বিখ্যাত ডাক্তার আর জি করের সহোদর আমাদের শিক্ষাদাতা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল রাধামাধব কর।

দুর্নিবাব্দ যে পরিমাণ ধনী ছিলেন, সেই পরিমাণে শৌখিন ও বিলাসী ছিলেন। তখন কলকাতায় বিজলী-বাতি হয় নি; কিন্তু দুর্নিবাব্দ তাঁর প্রকাণ্ড ‘ল্যান্ডে’ গাড়ির এক পাশে ‘ডায়নামো’ বসিয়ে, জম্‌কালো ‘ওয়েলার’ জাড়ির মাথায় ১০০ পাওয়ারের দুটো ‘বাল্ব’ জ্বালিয়ে, যখন লোকাকীর্ণ রাজপথে গাড়ি ছোটাতে, তখন ছেলে-বুড়ো সকলে হ্যাঁ করে সেদিকে চেয়ে থাকত। দুর্নিবাব্দের শখ ও শৌখিনতার পরিচয় দেবার জন্যেই এই সামান্য একটু লিখতে হল।

দুর্নিবাব্দের বাড়ির পাশে তাঁরই একখানা একতলা বাড়ি ছিল। সেই বাড়ির ছাদে তিনি শখের আম-বাগান তৈরি করেছিলেন। বড় বড় রাস্কুসে আকারের কাঠের টবের মধ্যে, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সার-মাটি ভর্তি করে, তাতে নানাজাতের ভাল ভাল আমের কলমের চারা বসানো হয়েছিল। আমও তাতে ফলত। তবে, সংখ্যায় খুব কম। বোধহয়, দুই-একটা কাবলী-কলার গাছও তাঁর ওই ছাদ-বাগানে দেখেছি, এবং কাঁদি-সমেতই দেখেছি।

কিন্তু এসব হ’ল শখের ব্যাপার। এই সূত্রে আমি যা বলতে যাচ্ছি, তা কিন্তু শখের নয়; সেটা নিছক ‘গেরস্থালী’, বিশেষত মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের উপযোগী কথা।

বর্তমানে সব জিনিস-পত্র যেরকম অগ্নিমূল্য, তাতে আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করে জীবনযাপন করা আমাদের মত মধ্যবিত্তের পক্ষে ক্রমেই দুরূহ হয়ে পড়ছে। এ অবস্থায় যতটা পারা যায়, আমাদের নিত্যকার ব্যয় থেকে যদি কোনদিকে কিছু বাঁচাতে পারি তার চেষ্টা করা দরকার। আমি দেখেছি, কোন কোন বাড়িতে একটুখানি উঠান বা খালি জমির ফালি শুদ্ধ শুদ্ধই পড়ে থাকে। তাতে চাড় করে সময়মত যদি কিছু কিছু শাকসবজি লাগাবার ব্যবস্থা করা হয়, তা হ’লে সেই গৃহস্থের যত সামান্যই হোক, তরকারির দিক দিয়ে কিছুটা সাশ্রয় হয়। পয়সার সাশ্রয় অপেক্ষা তাতে মনের

একটা যে আনন্দলাভ হয়, তার দাম কম নয়। উপন্যাস-সম্রাট শরৎচন্দ্র যখন রূপনারায়ণের ধারে ‘সামতাবেড়’এ থাকতেন, তখন একদিন কলকাতা থেকে সকালের ট্রেনেই তাঁর ওখানে গিয়েছি। দু’জনে বাড়ির কাছের একটা পুকুরে স্নান করে এসে একসঙ্গে খেতে বসলাম। ডাল আর দুটো-তিনটে তরকারি হয়েছিল। তার সঙ্গে ছোট দু’ফালি বেগুনভাজা—দু’জনেরই পাত্রে। ওই দু’টুকরো বেগুন ভাজার ওপর গোড়া থেকেই শরৎচন্দ্রের একটা প্রবল প্রীতি এবং ষৌক লক্ষ্য করলাম। আমাকে বললেন—“ডাল মেখে, আগে বেগুনভাজা দিয়ে খাও”—বলেই তিনি তাঁর পাতের বেগুনভাজা দু’খানা পরম তৃপ্তিভরে খেতে লাগলেন। দু’টুকরো ছোট বেগুনভাজা; আমি এক-গালেই তা গলাধঃকরণ করে ফেললাম।

“কেমন লাগল?”

“যেমন লাগে, তেমনি। বেগুনভাজা আবার কী হাতিঘোড়া ভাল লাগবে!”

“আরে দুর্, মিন্‌সে! ও কি বাজারের বেগুন না কি? আমার ঐ উঠানের গাছের বেগুন। সতটা গাছের মধ্যে ছটা ম’রে গেছে, একটাকে অনেক করে বাঁচাতে পেরেছি। সেই গাছের বেগুন। ওই একটাই হয়েছিল। আজ তুমি এসেছ বলে, ‘ওরা’ ঐটে তুলে ভাজা করেছে। কী চমৎকার বেগুন দেখলে!”

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে, আমি বললাম—“তাই তো বলি, এত চমৎকার বেগুন, এ তো বাজারের হবে না! সত্যি, কী মিষ্টি বেগুন!”

এই রকমই হয়। নিজের উঠানের ধারের লঙ্কা-গাছে যে লঙ্কা হয়, তা কী সুন্দর! ঝাল বেশি, কিন্তু মৃদুজ্বালা নেই; গাছের ঢ্যাঁড়স মৃদু অমৃত লাগে; গাছের সাধারণ এক কাঁদি কলা, বাজারে এক আনায় যার পাঁচটা পাওয়া যায়, সেই কলা খেতে খেতে বাড়ির সকলেই বলবে—“এ কলা বাজারে ১০ আনা ভজন, তার কমে কিছুতেই পাওয়া যাবে না।” বাড়ির পুঁইশাক, লাউশাক এত মিষ্টি যে,

তা আর বলবার নয়। উঠানের পেঁপেগাছটার বিস্বাদ পেঁপেও, মনে হয় যেন মিছারির টুকরো।

তাই বলছিলাম যে, পয়সার সাশ্রয় ছাড়া, ঘরের শাকসবজি মনকে যে একটা তৃপ্ত ও আনন্দদান করে, তার দাম অনেক।

আরও একটা লাভের দিক আছে। সকাল-বিকালের ক্ষুদ্র অবসরটুকু আমরা যদি উঠানের এসব গাছপালার দেখা-শোনা, তাম্বির ইত্যাদি নিয়ে থাকি, তাতে আমাদের মন ও দেহ—দু'য়েরই স্বাস্থ্য ভাল থাকে। হোক না কেন দু'হাত উঠান, হোক না কেন দুটোই গাছ; তাই নিয়েই মন আর স্বাস্থ্যের খোরাক সঞ্চয় করতে পারা যায়। কাটাবার ইচ্ছে করলে, সকলেই আমার এই প্রস্তাবটাকে কোনও অছিলায় কাটতে পারেন; কিন্তু সত্যকার ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকলে, এটা এমন-কিছ, অসাধ্য বা অসম্ভব ব্যাপার নয়। স্বীকার করি, কলকাতার অধিকাংশ বাড়িতেই উঠান থাকে না, বিশেষত ফ্ল্যাট-প্যাটার্নের বাড়িতে; কিন্তু তথাপি, এমন-কিছ বাড়িও আছে যাতে—বড় না হলেও, ছোটখাটো একরকম উঠানের মত জমি থাকে। সেই জমিটুকুতেই অন্তত এক ঝাড় কলা, একটা পেঁপে, একটা লঙ্কাচারি, কিছ, শাক, দু'একটা চাঁড়স বা অন্যকিছ দেওয়া যেতে পারে। রান্না-ঘরে ছাদের সন্নিবিধ থাকলে, সেখানে লাউ-পুঁইয়ের লতা উঠিয়ে দিতে পারা যায়। কলাগাছের নিচে, ছায়াতে দুটো আনারসের গেঁড় পুঁতে দেওয়া চলতে পারে। আমার ভাড়া-করা বাড়িতে একটুকরো খালি জমি আছে। আমি তাতে কিছ, কিছ এসব দিয়ে থাকি। দুটো লঙ্কাগাছে এত লঙ্কা হয় যে, নিজেরা ব্যবহার করে, পাড়ায় বিলিয়েও তা ফুরায় না। কাঁচা লঙ্কার চাহিদা আর আদর প্রায় সব গেরস্থ-ঘরেই থাকে। সবচেয়ে উপকার দেয় পেঁপে আর কলা। কাঁচা পেঁপের তরকারি খুবই মন্থরোচক আর উপকারী, বিশেষত লিভার-রোগীর পক্ষে। আর পাকা পেঁপের তো কথাই নেই; আমের পরই আনারস, কলার সঙ্গে পাকা পেঁপেকে স্থান দেওয়া যেতে পারে। কাঁচা পেঁপেও পরম উপকারী।

উঠানের একাংশে দু'তিন বর্গহাত একরকম জমিতে আমি চাঁপানটে বুনো দিয়েছিলাম। তাতে রোজই টাটকা তাজা শাকের ছাঁ খেতে পারা যেত। কাঁচ দিয়ে মাথার কচি-কচি শাকগুলো এক চুবাড়ি কেটে নেওয়া হত; তা থেকে আবার গজাত; আবার সেগুনি কেটে নেওয়া হত। তারপরে গাছ দু'হাত আড়াই হাত বড় হয়ে উঠলে, তখন তার ভাঁটা খাওয়া যেত।

যে বাড়িতে একটুখানি উঠান বা খালি জমির সন্নিবিধা আছে, সে বাড়িতে যদি আমাদের মত নিষ্কর্মা বড়ো কেউ থাকেন, তা হলে এ কাজ তাঁর দ্বারা সম্পাদিত হলে, তাঁর দেহমনের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হবে না। এমন কি, বাড়ির ছোট ছোট ছেলেদের দ্বারাও এ কাজ হতে পারে।

ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকলে, সকল বাধাই সরে যায়; তবে, ষোল আনার জায়গায় সে কাজ না হয় দু' আনা হয়ে থাকে। যতটা হয় ততটাই লাভ। উঠান বা জমি একেবারেই যদি না থাকে, তা হলে বাঁথারির জাফ্রি তৈরি করে, পাঁচিলের গায়ে তা হেলান দিয়ে রেখে, তাতে উচ্ছে, করলা, ঝিঙে, বরবটি, সিম প্রভৃতি দেওয়া যেতে পারে। মাটি না থাকলে, টবেতেই বিঁচি পুঁতে গাছ তৈরি করতে পারা যায়। তারপর সেই গাছ জাফ্রিতে উঠিয়ে দিলেই হয়।

বাড়ির সৌন্দর্য আর চোখের তৃপ্তির জন্যে বারান্দায় বা পৈঠের ওপর টবে করে দু'দশটা ফুলের চারাও লাগাতে পারা যায়। তাতে ব্যয়ও বেশি-কিছ হয় না, অথচ বাড়ির শোভা বৃদ্ধি পায়; সবচেয়ে বেশি লাভ হয়—মনের আনন্দ। শীত আসছে। এ সময় যদি ভাল জাতের দু'চারটে 'ডালিয়া' ও দু'চারটে 'ক্রিসান্থিমাম' চারা টবে দেওয়া যায়, এ শীতে তাদের ফুল সকলেরই চোখ ও মনের আনন্দদায়ক হবে। সৌন্দর্য ও রূপের যেখানে বিকাশ, সেখানে মানবমনেরও শুদ্ধতা ও স্বগীয়ভাবের বিকাশ। পবিত্রতা ও সৌন্দর্যের মধ্যেই মহাসুন্দর তাঁর আসনখানি বিছিয়ে রাখেন।

উন্নত প্রণালীতে ধানের চাষ

আমন ধান

আমন ধান বোনা এবং রোয়া দুই-ই চলে, তবে পশ্চিম বাঙলায় খুব কম ক্ষেত্রেই বোনা হয়। বুনতে হ'লে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ছিটিয়ে বুনতে হয়। রোয়ার জন্য জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজ বীজ-তলায় ফেলতে হয় এবং আষাঢ়ের মাঝামাঝি থেকে ভাদ্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত চারা রোয়া হয়। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, শ্রাবণ মাস আমন ধান রোয়ার সবচাইতে ভাল সময়। অনুর্বর জমিতে আষাঢ় মাসে রোপণ করলে ফলন অপেক্ষাকৃত ভাল হয়, কিন্তু উর্বর জমিতে এই সময় রোপণ করলে খড় খুব বেশি হয় এবং শস্যের ফলন কমে যায়। শ্রাবণের পর চারা রোপণ করতে যত দেরি হয়, ফলন সেই অনুপাতে তত কম হয়। ভাদ্রের মাঝামাঝি রোপণ করলে ফলন শতকরা ২৫ ভাগ এবং ভাদ্রের শেষে রোপণ করলে ফলন শতকরা ৭৫ ভাগ কমে যায়। এতে প্রমাণ হয় যে, ঠিক সময়ে রোপণের ওপর ফলন যথেষ্ট নির্ভর করে।

বৃষ্টির অভাবে প্রায়ই ঠিক সময়ে রোপণ করা সম্ভবপর হয় না। বিশেষত বর্ধমান বিভাগের পশ্চিম অঞ্চলে প্রায়ই এই অসুবিধা হয়ে থাকে। তবে আনন্দের বিষয় এই যে, দামোদর ও ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা রূপায়ণে এই সমস্যা অনেকটা দূর হয়েছে। রাজ্যের সর্বত্র প্রত্যেক কৃষকের চেষ্টা করা উচিত যাতে নিজ নিজ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হ'তে পারে, কেননা সেচ ও জলনিকাশের সমস্যাই কৃষির প্রধান অন্তরায়। কাজেই অধিকতর শস্যোৎপাদন করতে হ'লে এ দুটো সমস্যার সমাধান যে-কোনও পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হওয়া প্রয়োজন। দেশের অর্গণিত কৃষকের কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থা না করতে পারলে দেশের অন্নসমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভবপর নয়। দেশের কৃষিকে সদ্ভুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে অধিক

খাদ্যোৎপাদন করতে যেসকল পরিকল্পনা সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে সেচ ও জলনিকাশী পরিকল্পনাই সর্বাগ্রগণ্য সেই কারণে। বড় বড় পরিকল্পনা কার্যকরী হ'তে সময়ের প্রয়োজন ব'লে শস্য-উৎপাদনের আশু সমাধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ক্ষুদ্র সেচ ও জলনিকাশী পরিকল্পনা ১৯৪৯ সাল থেকে গ্রহণ করেছেন। যেসকল পরিকল্পনা দশ হাজার টাকার অনুদান ব্যয়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে সেইগুলি কৃষিবিভাগের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। সেচ বা জলনিকাশের জন্য খাল-খনন, পুরাতন খালের সংস্কার করা, সাঁকো তৈরি করে জলনিকাশনের ব্যবস্থা করা, বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য বাঁধ নির্মাণ, স্লুইস গেট নির্মাণ করে জলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। যেসকল চাষী কোন সেচ বা জলনিকাশী ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হবেন তাঁরা পরিকল্পনা অনুযায়ী তার ব্যয়ের অর্ধাংশ বহনে সম্মত থাকলেই সরকার পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন। এই অর্ধাংশ খরচ চাষীরা নগদ অর্থ দ্বারা পূরণ করতে পারেন অথবা ঐ খরচের তুল্যপরিমাণ কার্যিক শ্রম দ্বারা পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দান করতে পারেন। সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেও নিজেদের সমবেত শক্তিতে স্থানীয় কৃষকেরা অনেকক্ষেত্রে এই-সব ছোট ছোট পরিকল্পনা রূপায়িত করেছেন দেখা গিয়েছে। ১৯৪৬-৪৭ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, এই রাজ্যের সমগ্র চাষের জমির শতকরা মাত্র ১৩ ভাগ জমিতে সেচ করা হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, আবাদী জমির তুলনায় এ খুবই কম। আত্মনির্ভরশীল হয়ে দেশের চাষীরা এ বিষয়ে যতই অগ্রণী হবেন দেশের কৃষির পক্ষে ততই মঙ্গল।

কৃষি-উন্নয়নকল্পে এবং অধিক শস্যোৎপাদনমানসে জনসাধারণ যে-কোনও স্থানীয় কৃষি-কর্মচারীর নিকট তাঁদের প্রয়োজনীয় ছোট সেচ বা জলনিকাশী

পরিকল্পনা দাখিল করতে পারেন। মহাকুমা কৃষি-কর্মচারী সরেজমিনে তদন্ত করে ও পরিকল্পনার কার্যকারিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে তা সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠান। অনুমোদনলাভের সঙ্গে সঙ্গেই পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থানীয় সমবায় সমিতির মাধ্যমে অথবা কার্যনির্বাহের জন্য বিশেষভাবে স্থানীয় চাষীদের নিয়ে গঠিত সমিতি মারফত, অন্যথায় ঠিকাদার মারফত, কাজ সম্পাদন করা হয়। পরিকল্পনার সুবিধাগ্রহণেচ্ছ কৃষকদের দ্বারা গঠিত সমিতির মাধ্যমে এইসব কাজ সম্পন্ন করতে পারলে ব্যয়সঙ্কোচের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে এবং তাঁদের নিজেদের তত্ত্বাবধানে কাজ হয় বলে পরিকল্পনাটি সচ্ছন্দ এবং কার্যকর রূপ পরিগ্রহ করে। সরকার ও জনসাধারণের সহযোগিতায় এইভাবে সেচ ও জলনিকাশের সমস্যার দ্রুত সমাধান হয়ে আসছে।

গৃহীত কোনও পরিকল্পনার প্রাথমিক কাজ যাতে সরকারী অনুমোদনের অপেক্ষায় ব্যাহত না হয় অথবা এতৎসম্বন্ধীয় কোনও ক্ষতি নিরোধের জরুরি প্রয়োজনে অর্থের অভাব না হয়, সেজন্য এইপ্রকার বিভিন্ন স্বল্পব্যয়-সাপেক্ষ কাজের জন্য প্রত্যেক জেলাশাসকের নিকট অর্থ বরাদ্দ করা আছে। সদরলা সেচ অথবা জলনিকাশী বন্দোবস্তের জন্য এক হাজার টাকার অনুদান অতিপ্রয়োজনীয় খরচ এই অর্থ থেকে ব্যয় করে থাকেন।

এইসব পরিকল্পনায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আশাতীত ফল লাভ করা গিয়েছে। বারিপাতের অনিশ্চয়তার মধ্যে চাষ-আবাদকে অবহেলিত না রেখে বহু অনাবাদী ও পতিত জমিকে এই অল্প সময়ের মধ্যে শস্যশ্যামল করা সম্ভব হয়েছে।

বীজের হার

বোনা আমন ধানের জন্য বিধাপ্রতি ৮-১০ সের বীজ লাগে। এক বিঘা রোপণ করতে ৪-৫ সের বীজ যথেষ্ট এবং তার জন্য দেড় বা দুই কাঠা পরিমাণ বীজতলা প্রয়োজন হয়।

রোয়ার জন্য উন্নত প্রথায় চাষ করলে ৫ সের বীজ থেকে যে চারা হয় তাতে এক একর জমি রোয়া চলে। অথবা বীজের অপব্যয় না করে উন্নত প্রথায় চাষ করাই সমীচীন।

চারার ব্যয়

রোয়ার জন্য ৫-৬ সপ্তাহ বয়সের চারা ভাল, কিন্তু রোয়া দেব্রিতে হলে একটু বেশি বয়সের চারার ফলন ভাল হয়। তবে চারার গাট হয়ে গেলে সে চারা রোপণ না করাই যুক্তিসঙ্গত। একান্ত চারার অভাবে যদি এরূপ চারাই রোপণ করতে হয়, তবে এই চারা একটু বেশি মাটির নিচে বসাতে হয় যাতে গোড়ার গাটগুলি মাটির নিচে পড়ে এবং তাই থেকে বিয়ান (গোড়া থেকে বেরোনো নতুন শাখা) বের হতে পারে।

রোপণের পদ্ধতি

ঠিক সময়ে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে চারা রোপণ করলে ১০ ইঞ্চি অন্তর লাইন করে এবং প্রতি লাইনে ৬-৭ ইঞ্চি ব্যবধানে প্রত্যেক গুচ্ছিতে একটি-দুটি চারা রোপণ করতে হয়। সুতরাং ঠিক সময়ে রোপণ করা গেলে কম চারার প্রয়োজন হয়। কিন্তু যত দেরি হবে সেই অনুপাতে চারার ব্যবধান কমাতে হবে, কারণ চারা দেব্রিতে রোয়া হলে বিয়ান হবার সম্ভাবনা কমে যায়।

পরবর্তী পরিচর্যা

রোয়ার পর প্রায় ১ সপ্তাহের মধ্যে গাছ মাটিতে লেগে যায়, এবং তারপর ৭-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত চারা থেকে বিয়ান বেরোয়। ঐ সময় জমিতে জল কম রাখা দরকার, কারণ জল কম থাকলে বিয়ান বেরোতে সুবিধা হয় এবং বিয়ান যত ভাল হবে ফলনও তত বেশি আশা করা যায়।

আগাছা যাতে বেশি না হয় সেদিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে। আগাছা ছোট থাকলে হাত বা পায়ের সাহায্যে সেগুন্দি মাটির মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া যায়, নচেৎ আগাছাগুলি হাতে টেনে বা

নিড়ানির সাহায্যে তুলে ফেলতে হয়। জাপানী নিড়ানি দিয়ে রোয়ীর ১ মাস পর থেকে ৩-৪ বার জমি ঘেঁটে ও নিড়িয়ে দেওয়া ভাল।

এই সময় লক্ষ্য রাখতে হবে—কোনপ্রকার পোকা বা রোগের আক্রমণ হয় কিনা, কারণ আক্রমণের প্রারম্ভেই ব্যবস্থা অবলম্বন করলে দমন করা সহজ হয়।

ধানের দানা শুষ্ক হয়ে ওঠার পর জমি শুকনো থাকাই বাঞ্ছনীয়।

ফসল কাটা

জলদি বা নাবি ফসল অনুসারে কার্তিক থেকে পৌষ মাসে এই ধান পাকে। ধান ভালরূপে পাকার পর ঝরে যাওয়ার আগে কাটতে হয় এবং তারপর মাড়াই করে ঝেড়ে ও শুকিয়ে পরিষ্কার-ভাবে গোলাজাত করতে হয়। জমির যে অংশের ধান সবচাইতে ভাল হয় এবং রোগের আক্রমণ যে অংশে না থাকে সেখান থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। এই বীজধান পৃথকভাবে কেটে পৃথকভাবে মাড়াই করে ভালরূপে ঝেড়ে ও শুকিয়ে পরিষ্কার কীটমুক্ত পায়ে রেখে মুখ আটকে দিতে হয়।

আউশ ধান

আউশ ধান বোনা এবং রোয়া দুই-ই চলে। বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও হুগলি জেলায় এ ধান সাধারণত রোয়া হয়। রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে সচরাচর বোনা হয়।

বপন বা রোপণের সময় ও বীজের হার

বোনা আউশ ধানের বীজ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বিঘাপ্রতি ১০-১২ সের হারে বুনতে হয়। রোয়া আউশ ধানের জন্য বীজ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ-তলায় ফেলা হয় এবং আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে চারা রোয়া হয়। বীজের হার মোটামুটি রোয়া আমনের অনুরূপ।

পরবর্তী পরিচর্যা

বোনা ধানের চারা ৬-৭ আঙুল লম্বা হলে জমির জো বৃদ্ধি প্রথমে আঁচড়া চালিয়ে পরে মই দিতে হয়। তাতে মাটির ওপরের চাপড়া ভেঙে যায় এবং আগাছাও কিছু পরিমাণে উৎপাটিত হয়। তারপর আগাছার প্রকোপ অনুযায়ী দু'বার কিংবা একবার আগাছা বেছে দিতে হয় এবং চারা ৪-৫ আঙুল ব্যবধানে রেখে অতিরিক্ত, বিশেষত দুর্বল, চারাগুলি তুলে ফেলতে হয়। রোগ এবং পোকার আক্রমণের প্রতিও সতর্ক থাকতে হবে। রোয়া আউশ ধানের পরিচর্যা রোয়া আমন ধানের অনুরূপ।

ফসল কাটা

বোনা আউশ সাধারণত শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে এবং রোয়া আউশ আশ্বিন মাসে পাকে। ধান ঝরে পড়ার আগেই ফসল কাটতে হয়, অবশ্য সে-সময় খড় সাধারণত সবুজ থেকে যায়। তারপর শুকনো দিনে মাড়াই করে ঝেড়ে শুকিয়ে গোলাজাত করতে হয়। বীজধানের জন্য উপরি-উক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

বোরো ধান

রোপণের সময় ও বীজের হার

এ রাজ্যে বোরো ধান সচরাচর রোয়া হয়। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে এর বীজ বীজতলায় ফেলা হয় এবং পৌষ মাসে চারা রোয়া হয়। বীজের হার রোয়া আমনের অনুরূপ।

পরবর্তী পরিচর্যা

কিছুদিন অন্তর অন্তর মাটি শুকিয়ে গেলে জল সেচন করতে হয়। রোগ ও পোকার আক্রমণের বিষয়েও বিশেষ সতর্ক থাকতে হয়।

ফসল কাটা

বোরো ধান সাধারণত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে। তারপর ধান কেটে মাড়াই করে, ঝেড়ে ও শুকিয়ে

গোলাজাত করতে হয়। বীজের ধান পৃথকভাবে সংগ্রহ করতে হয়।

সার প্রয়োগ: পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জমিতেই নাইট্রোজেন ও

ফসফরাসের অভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। কিন্তু ধানের ফলন বেশি পেতে গেলে জমিতে এই দুইটি উপাদানই প্রচুর থাকা প্রয়োজন। অতএব ফলন বাড়ানোর জন্যে এই দুইটি উপাদান যোগাড়ের সার মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। কী জাতীয় সার কী পরিমাণে এবং কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে সে সম্বন্ধে নিচে বলা হল:

গোবর: বাঙলাদেশে ধানের চাষে গোবরসারের প্রয়োগ বিশেষ প্রচলিত। কিন্তু যে পরিমাণে এই সার দেওয়া হয় তা দরকারের চেয়ে খুবই কম। দেখা গিয়েছে যে, শুধু গোবরসার প্রয়োগ করে বেশি বাড়ানো যায় না। এজন্য অন্যান্য সারও প্রয়োগ করা দরকার। গোবরের অভাবে আবর্জনা সার বা স্লাজ (তলানি) সারও বিধাপ্রতি ১ মণ হিসাবে দেওয়া যায়।

অ্যামোনিয়াম সালফেট: জমিতে নাইট্রোজেন সরবরাহের জন্য অ্যামোনিয়াম সালফেট নামক রাসায়নিক সার খরচের দিক থেকে সবচেয়ে সুবিধাজনক। এই সার বিধাপ্রতি ২০-২৫ সের প্রয়োগ করা যেতে পারে। অতিরিক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করলে গাছের বাড় বেশি হয়ে গাছ শুয়ে পড়ার ভয় থাকে। গাছ লাগানোর এক মাস পরে নিড়ানোর সময় এই সার প্রয়োগ করা সমীচীন। উপরি-উক্ত হারে সার প্রয়োগ করে বিধাপ্রতি ২ মণ ফলন বাড়ানো যায়।

খইল: এদেশে একমাত্র সরষের খইল সাররূপে ব্যবহৃত হয়। বাদামের খইলে সরষের খইলের তুলনায় মোটামুটি দেড়গুণ নাইট্রোজেন থাকে। নিম্নের খইলে সরষের খইলের তুলনায় সাধারণতঃ

কিছু বেশি এবং রেড্ডীর খইলে কিছু কম নাইট্রোজেন থাকে। অতএব নাইট্রোজেনের পরিমাণ অনুযায়ী বিভিন্নপ্রকার খইল বিভিন্ন পরিমাণে প্রয়োগ করতে হয়। বিধাপ্রতি ৩ মণ সরষের খইল অথবা ২ মণ ১০ সের বাদামের খইল প্রয়োগ করে ফলন বিধাপ্রতি ২ মণ বাড়ানো যায়। খইল ভাল ভাবে গুঁড়ো করে রোপণের এক মাস বা দেড় মাস পরে প্রয়োগ করা সমীচীন।

সবুজসার: সবুজসার আমন ধানের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট সার, অথচ এতে খরচ খুবই কম এবং জৈব পদার্থ সংযোগের দরুন মাটির প্রকৃত উন্নতি হয়। এজন্য বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম বৃষ্টি হলেই জমি সাধারণভাবে চাষ করে বিধাপ্রতি ৩-৪ সের হারে ধইণ্ডার বীজ ছিটিয়ে দিতে হয়। তারপর আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আমন ধানের চারা রোপণের অন্তত ২ সপ্তাহ আগে ধইণ্ডার গাছগুলি বেশ নরম থাকতে থাকতে প্রথমে মই দিয়ে ভেঙে নিয়ে ভালভাবে চাষে মাটির মধ্যে মিশিয়ে দিতে হয়। এই সার প্রয়োগে বিধাপ্রতি ২-৩ মণ বেশি ফলন পাওয়া যায়।

হাড়ের গুঁড়ো: আগে এদেশে এই সারের প্রায় ব্যবহারই ছিল না। তারপর কৃষিবিভাগের চেষ্টায় কৃষকের নিকট আজকাল এর আদর বেড়েছে। ফসফেট-সরবরাহের জন্য বিধাপ্রতি ১ মণ হারে হাড়ের গুঁড়ো প্রয়োগ করা উচিত। এই সারের মধ্যে নাইট্রোজেনও অল্পপরিমাণে থাকে। এ এক বছর পর পর প্রয়োগ করলেও চলে। কারণ ফসল এই সারের সম্পূর্ণ অংশ এক বছরের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে না। এই সার প্রথম চাষের সময়েই ছিটিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়। সবুজসার করলে ধইণ্ডা চাষের আগেই এ সার দেওয়া উচিত।

হাড়ের গুঁড়োর বদলে সুপার ফসফেটও ব্যবহার করা চলে। বিধাপ্রতি অন্তত আধ মণ ব্যবহার করতে হয়।

অ্যামোনিয়াম সালফেট

অ্যামোনিয়াম সালফেট খুবই জনপ্রিয় ও দরকারী সার। সব রকমের মাটিতেই এবং প্রায় সমস্ত ফসলের জন্য এ সার উপযোগী।

নাইট্রোজেন

সমস্ত গাছপালার জীবনে নাইট্রোজেনের বিশেষ দরকার এবং অ্যামোনিয়াম সালফেটে এই উপাদান শতকরা ২০ থেকে ২১ ভাগ থাকে। তাই এ সার মাটিতে দিলে গাছপালা বৃদ্ধির খুবই সহায়তা হয়।

জলে সহজেই গলে যায় বলে গাছ সহজেই এই সার নিতে পারে। জমিতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গাছপালা বাড়তে শুরু করে এবং ফসলের সব রকমের উন্নতি দেখা যায়।

প্রয়োগের নিয়ম

বীজ লাগানোর মূখে অথবা গাছপালা কিছুটা বড় হলে, অ্যামোনিয়াম সালফেট সার দেওয়া যায়। এই সার ও বীজ কখনো এক সঙ্গে জমিতে দিতে নেই। আবার যেসব জায়গায় জল-বৃষ্টির অভাব সেখানেও এ সার ব্যবহার করা ঠিক নয়। অ্যামোনিয়াম সালফেট দেওয়ায় মাটির অম্লভাগ বেড়ে যেতে পারে, তাই অম্ল হলে মাটিতে আগে চুন দিয়ে অম্লভাগকে দূর করে তবে অ্যামোনিয়াম সালফেট দেওয়া চলে। খামারের সার ও কম্পোস্ট সারের মত জৈবসার অনেক পরিমাণে দিলে অ্যামোনিয়াম সালফেট ব্যবহার করা সবচেয়ে নিরাপদ ও সুবিধাজনক হয়।

পরিমাণ

দেশের এক এক জায়গার মাটি ও আবহাওয়া এক এক রকম বলে অ্যামোনিয়াম সালফেট ব্যবহারের পরিমাণ ঠিক করা বড় কঠিন। তবে কতকগুলি

দরকারী ফসলের জন্য এই সার কী পরিমাণ দেওয়া যেতে পারে তার একটা মোটামুটি হিসাব নিচে দেওয়া গেল। স্থানীয় কৃষিকর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করলে এ বিষয়ে বিস্তৃত জানা যাবে।

ধান্যবর্গীয় ফসলের জন্য

প্রতি একর ধানের জমির জন্য সওয়া এক মণ থেকে আড়াই মণ অ্যামোনিয়াম সালফেট দেওয়া যায়। এর অর্ধেক জমি-কাদানোর সময় ও বাকি অর্ধেক চারা রোপণের এক মাস পরে দিতে হয়। যদি বীজ বপন করা হয় তবে ঐ পরিমাণের দুই-তৃতীয়াংশ বীজ বপনের আগে এবং বাকিটা প্রথমবার জমি নিড়ানর পরেই দিতে হয়।

সেচ-দেওয়া গমের জমিতে একরে সওয়া এক মণ থেকে আড়াই মণ অ্যামোনিয়াম সালফেট দেওয়া যায়। সেচ-না-দেওয়া গমের জমিতে একরে এক মণ থেকে সওয়া এক মণ সার দিলেই চলে।

সেচ-দেওয়া ভুট্টার জমিতে সওয়া এক মণ থেকে আড়াই মণ সার যথেষ্ট হবে। এটা দুইবারে দেওয়া যেতে পারে; বপনের সময় অর্ধেক, বাকিটা প্রায় চার সপ্তাহ পরে।

অর্থকরী ফসলের জন্য

আখের চাষে উত্তর ভারতের সরু-জাতীয় আখের প্রতি একরে সাড়ে পাঁচ মণ এবং দক্ষিণ ভারতের মাঝারি ও সরু-জাতীয় আখের প্রতি একরে আঠার থেকে চাব্বিশ মণ অ্যামোনিয়াম সালফেট দিতে হয়।

বৃষ্টি-পাওয়া তুলোর জমিতে একরে সওয়া এক মণ থেকে দু' মণ এবং সেচ-দেওয়া তুলোর জমিতে প্রতি একরে আড়াই মণ থেকে প্রায় চার মণের কাছাকাছি অ্যামোনিয়াম সালফেট দরকার। সার

দুই দফায় দেওয়া যেতে পারে—প্রথমবার বপনের সময়, দ্বিতীয়বার ছয় থেকে আট সপ্তাহ পরে।

একর-প্রতি আড়াই মণ থেকে তিন মণ অ্যামোনিয়াম সালফেট দিলেই তামাক চাষ বেশ ভাল হতে পারে। চারা লাগানর চার থেকে ছয় সপ্তাহ পরে সার দিলে সবচেয়ে ভাল হয়।

পাট চাষে প্রতি একরে দু' মণ থেকে আড়াই মণ অ্যামোনিয়াম সালফেট দেওয়া যেতে পারে। প্রথম দফায় বীজ বপন অথবা তার ঠিক আগে এবং পরের বারে ঘাস নিড়ান অথবা চারা পাতলা করার সময় দেওয়া ভাল।

ভারতীয় কৃষিগবেষণ পরিষদের পৌজনে

অন্যান্য ফসলের জন্য

গোল আলু ও মিষ্টি আলুর জন্য একরে সওয়া ছয় মণ কিন্তু পেঁয়াজে প্রতি একরে আড়াই মণ থেকে তিন মণ অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োজন হয়।

খরিপ সবজির জন্য প্রতি একরে দু' মণ থেকে আড়াই মণ অ্যামোনিয়াম সালফেট দরকার। এর অর্ধেক বপন ও রোপণের সময় এবং বাকি অর্ধেক এক মাস পরে দেওয়া উচিত। ফুলকপি ও বাঁধাকপি মত শীতকালীন সবজির জন্য প্রতি একরে পাঁচ থেকে সাত মণ অ্যামোনিয়াম সালফেট দেবার সুপারিশ করা যায়।



সহজ ধানের বীজ জন্মানো

আমর ধানের জমিতে সবুজসার হিসাবে ধণ্ডেগাছ শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়। এর সন্নিবিধা এই যে, জলবসা আর শুকনো ডাঙা দু'রকম জমিতেই এ বাড়তে পারে। এই সার ব্যবহার করলে জমির উর্বরতাশক্তি বাড়ে এবং অন্য কোনও সার ব্যবহার করার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া সবচেয়ে বড় সন্নিবিধা এই যে, এতে খরচ খুব কম। কিন্তু পশ্চিম বাঙলায় বীজের অভাবে অনেকেই সবুজসার হিসাবে ধণ্ডের চাষ করতে পারেন না। যাতে আমাদের চাষীরা নিজেদের প্রয়োজনমত ধণ্ডেবীজ জন্মিয়ে সবুজসার জন্মানোর কাজে তা ব্যবহার করতে পারেন তার পদ্ধতি এখানে দেওয়া হচ্ছে। এটা আসলে প্রথা হিসেবে মাদ্রাজ রাজ্যের চাষীদের অনুকরণ। তবুও আমাদের চাষীরা এই প্রণালীতে অনায়াসেই নিজেদের ধণ্ডেবীজের চাহিদা মেটাতে পারেন।

মাদ্রাজ রাজ্যে ধানচাষীরা খুব ব্যাপকভাবে ধণ্ডেবীজ উৎপাদন করে নিজেদের জমির সারের চাহিদা মেটান এবং ধানের ফলন বাড়ান। সেখানে বহু চাষী ধানের জমিতে শুধু সবুজসারই ব্যবহার করেন এবং কোনও আয়কর ফসলের জমি না আটকেই ধণ্ডের বীজ উৎপাদন করেন।

এপ্রিল-মে মাসে প্রথম বৃষ্টির পরই জমিতে লাঙল দিয়ে পাঁচ তোলা পরিমাণ ভাল ধণ্ডেবীজ জমির আলের উপরে বা ধারে ধারে এক থেকে দু' ফুট অন্তর লাগিয়ে দিতে হয়। এই বীজ থেকে ধণ্ডেগাছ জন্মায় ও বাড়তে থাকে। ধান কাটার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এই ধণ্ডেগাছগুলিতে বীজ পাকে

এবং সেগুলোকে সংগ্রহ করা হয়। পরের বছরের সবুজসার করবার জন্য এই বীজ ভাল করে শুকিয়ে তুলে রাখতে হয়। যেখানে বৃষ্টির দরুন বীজ বোনার সন্নিবিধা নেই, সেখানে প্রথমে বীজ-তলায় চারা করে, সেই চারাগুলো তুলে আলের উপরে বা ধারে ধারে এক থেকে দু' ফুট অন্তর রোপণ করলেও এই একই ফল পাওয়া যায়। এইভাবে চাষের জমি নষ্ট না করে ধণ্ডেবীজ উৎপাদন করতে হ'লে এক একর জমির আলের জন্য বীজ লাগে পাঁচ তোলা।

এই পাঁচ তোলা ধণ্ডেবীজের গাছ থেকে যে বীজ হবে, তাতে পরের বছরে তিন বিঘা থেকে ছ' বিঘা পরিমাণ চাষের জমিতে ভালভাবে সবুজসার করা যেতে পারে। এইভাবে বীজ তুললে এর জন্য চাষের জমি আটকে রাখার প্রয়োজন হয় না এবং সামান্য কিছু বাড়তি পরিশ্রম করেই প্রায় বিনা পয়সায় নিজেদের প্রয়োজনমত সবুজসারের বীজ পাওয়া যেতে পারে, তা ছাড়া, প্রত্যেক বছরই সবুজসার করা জমির আলের ধারের গাছগুলো বীজের জন্য রেখে দিলে কখনও ধণ্ডেবীজের অভাব হয় না।

ধণ্ডেবীজ এক বছরের বেশি ভাল থাকে না। কাজেই এক বছরের বেশি পুরানো হ'লে সেই বীজ চাষের জন্য ব্যবহার না করাই ভাল।

এইভাবে ধণ্ডেবীজ জন্মানোর জন্য পাঁচ তোলা পরিমাণ বীজ প্যাকেটে করে বিক্রি করা হচ্ছে এবং তার দাম করা হয়েছে পাঁচ পয়সা বা আট নয়া পয়সা।

পাটচাষ উন্নতি

পশ্চিমবঙ্গে উন্নত ধরনের পাট উৎপাদনের ব্যবস্থা হিসাবে রাজ্যসরকার পাটচাষীদের উন্নত ধরনের পাটবীজ বিতরণ করছেন। এ বছর অনুমান উন্নত ধরনের ১,০০০ মণ বীজ বিলি করা হয়েছে। এক মণ পাটবীজ গড়ে দশ একর জমিতে বোনা যায় ধরে নিলে, উক্ত বীজ দিয়ে ১৬,০০০ একর জমিতে উন্নত জাতের পাট উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সারিতে বীজ বোনার পদ্ধতিও এ রাজ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। চলতি বছরে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ১০,০০০ খণ্ড জমিতে সারিতে পাটচাষ করা হয়।

দেশবিভাগের পর ১৯৪৭-৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে পাটচাষের জমির পরিমাণ ছিল ২৬৬.৪ হাজার একর। তার পর থেকে পাটচাষের পরিমাণ দ্রুত বেড়ে চলেছে এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে পাটচাষের মোট জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭২০ হাজার একর। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের মধ্যে মেশ্তার চাষও বেড়ে চলেছে। ১৯৫২-৫৩ সালে পাটচাষের জমির পরিমাণ ছিল ৮২০ হাজার একর এবং মাত্র ১৭ হাজার একর জমিতে মেশ্তার চাষ করা হয়। মোট আবাদের পরিমাণ ছিল ৮৩৭ হাজার একর। ১৯৫৬-৫৭ সালে ৭২০ হাজার একর জমিতে পাট চাষ করা হয় এবং মেশ্তা চাষের জমির পরিমাণ ছিল ২১৭ হাজার একর। মোট আবাদের পরিমাণ ছিল ১,০১৭ হাজার একর। ১৯৫৫-৫৬ সালের পরিমাণের তুলনায় মেশ্তাচাষের জমির পরিমাণ বেশ বেড়ে গেছে। বর্তমান বছর এর পরিমাণ ছিল ১৯৩ হাজার একর। ১৯৫২-৫৩ সালের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণও বেড়ে গেছে; উক্ত বছরে যেখানে মাত্র ৫০ হাজার গাট মেশ্তা

উৎপন্ন হয়েছে, সেখানে ১৯৫৬-৫৭ সালে উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮০৪ হাজার গাট।

তপসিলী এলাকায় ক্ষুদ্রসেচ পরি- কল্পনার জন্য অনুদান

তফসিলী উপজাতিসমূহের কল্যাণার্থে এ রাজ্যের উপজাতি-এলাকাগুলিতে ক্ষুদ্রসেচ-পরিকল্পনাসমূহের রূপায়ণের উদ্দেশ্যে পশ্চিম-বঙ্গ-সরকার চলতি আর্থিক বর্ষে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অধিকর্তার হস্তে অর্পণের জন্য ৪৪,৩৫২ টাকা মঞ্জুর করেছেন। চলতি আর্থিক বর্ষে ১৯৫৬-৫৭ সালে গৃহীত দুটি ক্ষুদ্রসেচ-পরিকল্পনা, বাঁকুড়া জেলার ইন্দপুর থানা এলাকার আদিবাসী বাঁধ পরিকল্পনা এবং চব্বিশপরগনা জেলার ভাতার থানা এলাকায় পান্থের খাল জল-নিকাশ-পরিকল্পনা সম্পর্কিত পুনর্নির্মাণ সমাধা করার জন্যও পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এ রাজ্যের কৃষি-অধিকর্তার হস্তে অর্পণার্থে ১০,৬৪৮ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

বনপঞ্জীবাসী উপজাতিদের জন্য গৃহনির্মাণ

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের বনবিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত বনপঞ্জীবাসী উপজাতীয়দের জন্য উন্নত বাসগৃহের ব্যবস্থামূলক পরিকল্পনা সম্পর্কে চলতি আর্থিক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের মহাবনপালের ব্যবস্থাপনাধীনে ১,৪০,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। উক্ত টাকা নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করার জন্য ব্যয় হবেঃ

কার্সিয়াঙ বিভাগে বনপঞ্জীবাসীদের ২২টি গৃহের জন্য ২২,০০০ টাকা, কালিম্পাঙ বিভাগে ৫টি গৃহের জন্য ৫,০০০ টাকা, দার্জিলিং বিভাগে ১০টি গৃহের জন্য ১০,০০০ টাকা, বক্সা বিভাগে ৪২টি গৃহের জন্য ৪২,০০০ টাকা, জলপাইগুড়ি

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিভাগে ১৫টি গৃহের জন্য ১৫,০০০ টাকা, কোচ-
বিহার বিভাগে ১৮টি গৃহের জন্য ১৮,০০০ টাকা।
উক্ত গৃহগুলির অধিবাসীদের জন্য জলসরবরাহের
ব্যবস্থা বাবত ২৮,০০০ টাকা ব্যয় হবে।

বিরিচ আম

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার শাখরাইল
থানার অন্তর্গত রোহিণী গ্রামের শ্রীআশুতোষ
সরেঙ্গী তাঁর নিজস্ব বাগানের একটি গাছে বেশ
বড় আকারের আম ফলিয়েছেন। সবচেয়ে বড়

আমটির ওজন হয়েছে ১ সের ১৪ ছটাক। গাছের
প্রত্যেকটি আমই প্রায় একই আকারের ও ওজনের।
উক্ত অঞ্চলের জলবায়ুতে এমন বড় আকারের আমের
ফলন বিস্ময়কর।

শ্রী সরেঙ্গী একজন বিশিষ্ট কৃষিবিদ এবং নিজ
হাতে নিজ তত্ত্বাবধানে নানাবিধ আয়কর ফসল ও
ফলফুলের চাষ করে নিজ অঞ্চলে বিশেষ খ্যাতি
অর্জন করেছেন। তিনি উন্নত প্রণালীর কৃষির
বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী।



সম্পাদক : শ্রীপ্রকাশস্বর্গ মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মন্ত্রণে

অধীক্ষক শ্রীশুভেন্দ্র মধোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত



‘বন্দে মাতরম্’ মন্ত্রের স্বাধি
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



সোবিয়ত কৃষি-প্রতিনিধি
দলের সদস্যরা বসিরহাট
মহকুমার মসলন্দপুরে এক
কৃষি প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত
পাট দেখছেন



ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি শ্রী নো দিন দিয়েন ন্যাংলিন্হির ভারতীয় কৃষিগবেষণ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করছেন : ডক্টর এস এম সিকা তাঁকে

বন্ধুত্ব

১০ম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

কার্তিক, ১৩৬৪

প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে কলিকাতার পার্কসার্কাস ময়দানে যে নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহের উদ্‌যাপন হয়েছে, তার প্রথম দিনে, ২রা নবেম্বর শনিবার, ৩৫তম আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস পালিত হয়। কলিকাতার মেয়র ডক্টর ত্রিগুণা সেন ৩৫টি আলো জ্বালিয়ে এই আন্তর্জাতিক দিবসীয় অনুষ্ঠানের উদ্‌ঘোষন করেন। সভা আরম্ভ হবার আগে রাজ্যের বিভিন্ন ইউনিয়নের সমবায়ীরা সমবায়-পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রা করে এসে সম্মেলনে যোগদান করেন। পশ্চিমবঙ্গ সমবায় বিভাগের সচিব শ্রীঅশোক মিত্র সমবায়ী কৃষি-শিল্প-মেলায় উদ্‌ঘোষন করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন পশ্চিম-বঙ্গের ভূমি-ভূমিরাজস্বমন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। তাঁর ভাষণে তিনি বলেন যে, সমবায় শুধু আর্থনৈতিক বা বৈষয়িক উন্নয়নের কৌশলমাত্র নয়—সমবায় হচ্ছে জীবনযাত্রার এক আদর্শ এবং দর্শন। তিনি বলেন, অবাধ ধনতান্ত্রিক প্রভুত্বের দিন যে শেষ হয়ে আসছে, বড় বড় ধনতান্ত্রিক দেশগুলি তা স্বীকার করেছে। ভারতের মত পিছিয়ে-পড়া দেশের দ্বারিত উন্নয়নের জন্য সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, সমবায়ের ভাবনা আমাদের জাতীয় জীবনে প্রসারিত হলে, তা ভারতে এক নতুন আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে একান্তভাবে সাহায্য করবে।

সমবায়-আন্দোলন ভারতের জাতীয় জীবনে, তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমেই প্রসারিত হয়ে পড়ছে।

তার গতি অতি ধীর হলেও আশাপ্রদ। বর্তমান (১৯৫৭) বছরের জুন মাসে সমবায় বর্ষের ১৯৫৫-৫৬ সাল শেষ হয়েছে। এ বছরেও যে পশ্চিমবঙ্গে সমবায়-আন্দোলনের অগ্রগতি অব্যাহত ছিল, নিচের বিবরণী থেকে তা পরিস্কার বোঝা যাবে।

ঘনবসতিপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গে মোট ৪৩ গ্রাম আছে তার শতকরা ৫৬টির উপর এ পর্যন্ত সমবায় প্রভাব-বিস্তার করেছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে এ রাজ্যে সমবায় সমিতির মোট সংখ্যা ছিল ১৬,৬৮৬; ১৯৫৫-৫৬ সালে তা বেড়ে ১৭,৩২২ হয়েছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে সমবায় সমিতিগুলির মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ১০.৭৩ লক্ষ এবং কার্যকরী মূলধন ছিল ২১ কোটি টাকা; ১৯৫৫-৫৬ সালে সদস্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১.৯২ লক্ষ এবং কার্যকরী মূলধন ২৩.৩৩ কোটি টাকা।

সমবায় ঋণদানের ক্ষেত্রে মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ১৮.৩১ কোটি টাকা; তার মধ্যে ১৫.৯৩ কোটি টাকা বিভিন্ন ব্যক্তিকে দেওয়া হয়; এর মধ্যে অকৃষি-ঋণদান সমিতিগুলি থেকে ঋণ দেওয়া হয়েছে ১৪.৩০ কোটি টাকা। প্রাথমিক কৃষিঋণ সমিতি এবং বিবিধার্থক কৃষি-সমিতিগুলি থেকে যে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেওয়া হয়, তার পরিমাণ ছিল ১.৫১ কোটি টাকা। এ ছাড়া দূর্ধ্বশিল্প-সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক জমি-বন্দকী ব্যাংকগুলি থেকে যে কৃষিঋণ দেওয়া হয়, তার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২.৬৫ লক্ষ এবং ৪.১৮ লক্ষ টাকা।

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

প্রধানত উপজাতীয় অধিবাসীদের জন্য স্থাপিত সমবায় শস্য-গোলায় সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আলোচ্য বছরে ৪২; এগুলির মোট সদস্য ৬,২২৪ জন এবং কার্যকরী মূলধন ২.৬৭ লক্ষ টাকা। আগের বছর এ-রকম শস্য-গোলা ছিল ৩৩টি, সদস্য ৩,৬১৬ জন এবং কার্যকরী মূলধন ১.৪০ লক্ষ টাকা।

সমবায়-প্রতিষ্ঠানগুলির জমা খাতে এ পর্যন্ত ১০.৮৩ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। আগের বছর জমার পরিমাণ ছিল ৯.৮১ কোটি টাকা। উক্ত ১০.৮৩ কোটি টাকার মধ্যে ৯.২৫ কোটি টাকা বিভিন্ন ব্যক্তি, সদস্য, এবং অসদস্যদেরও, কাছ থেকে জমা পাওয়া; বাকি ১.৫৮ কোটি টাকা বিভিন্ন সমিতি এবং অন্যান্য সূত্র থেকে জমা পাওয়া। এ থেকেই বোঝা যায় সমবায়-আন্দোলনের উপর জনসাধারণের আস্থা কতখানি।

খণদানের কাজ করে না এমন কৃষিজ-বিপণন সমবায় সমিতি আর কৃষি-সমবায় সমিতি হয়েছে যথাক্রমে ৭৫টি আর ৭২টি; এগুলির সদস্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৫,২৪৫ এবং ৩,২৬০। বিপণন-সমবায় সমিতিগুলি প্রধানত ধান-চাল প্রভৃতির বিপণন করেছে। আলোচ্য বছরে সদস্যেরা সমবায় সমিতিগুলি থেকে ৭.৩৯ লক্ষ টাকার জিনিস কিনেছে এবং মোট বিক্রি হয়েছে ১১.২৪ লক্ষ টাকার জিনিস। আলোচ্য বছরের শেষে এই সমিতিগুলির মোট কার্যকরী মূলধন ছিল ১০.৩৯ লক্ষ টাকা। কৃষি-সমবায় সমিতিগুলির বেশির ভাগই যৌথ ধরনের। এগুলির কার্যকরী মূলধন আগের বছর ছিল ৯.২১ লক্ষ টাকা, আলোচ্য বছরে হয়েছে ৯.৯৫ লক্ষ টাকা। কয়েকটি কৃষি-সমিতি ট্রাস্টের সাহায্যে কৃষিকাজ শুরুর করেছে। সমবায়-কৃষিকাজে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উৎপাদন বেড়ে গেছে এবং খরচ কমে গেছে।

১৬৯টি দুগ্ধশিল্প-সমবায় সমিতি জনসাধারণকে এবং সরকারী হাসপাতালগুলিতে দুধের যোগান

দিচ্ছে। আলোচ্য বছরে এসব সমিতির মোট সদস্য হয়েছে ১২,৪০৮ জন এবং মোট কার্যকরী মূলধন হয়েছে ২.৮৩ লক্ষ টাকা। এসব সমিতির কাজে খাতে মোট ৪.৫৫ লক্ষ টাকা। এসব সমিতি দুর্গস্থলের দুগ্ধ-উৎপাদনকারীদের সঙ্গে নানা জায়গার দুগ্ধ-ক্রেতাদের সংযোগ রক্ষা করে এবং তাতে উৎপাদকরা যেমন তাঁদের দুধের সর্বোচ্চ বিক্রয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকেন, এদিকে তেমনি ক্রেতারও খাঁটি দুধ পাওয়া সম্বন্ধে আশ্বস্ত থাকেন। দুগ্ধশিল্পের একটি প্রাচীন সমবায়-প্রতিষ্ঠানে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কাজ চলছে; আলোচ্য বছরে এখান থেকে ৬.১৪ লক্ষ টাকার দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বিক্রি হয়েছে।

সমবায় তন্তুবায়-সমিতিগুলিও এ বছর উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। এ বছরে এ রকম সমিতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯১৪, এগুলির মোট সদস্যসংখ্যা হয়েছে ৬৩,২৪৪ এবং মোট কার্যকরী মূলধন উঠেছে ১৭.৯৫ লক্ষ টাকাতে। এসব সমিতির দ্বারা উৎপাদিত তাঁত-জাত কাপড় বিক্রি করে মোট ১৯.৭৩ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে। প্রাথমিক তন্তুবায়-সমিতিগুলি ছাড়াও আলোচ্য বছরে একটি শীর্ষ-সমিতি, ৬০টি উৎপাদন-সংস্থা, ২০টি রজনশালা এবং ১২৫টি বিক্রয়কেন্দ্র কাজ চলেছে। এর সমস্ত প্রতিষ্ঠানই সমবায়ের ভিত্তিতে হস্ত-চালিত তন্তুশিল্পের উন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনার অঙ্গীভূত।

রেলওয়ে এবং বিভিন্ন শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের সমবায় সমিতির ভিতর দিয়ে মালিক ও কর্মীদের মধ্যে প্রীতির সংযোগ রক্ষিত হচ্ছে। আলোচ্য বছরে এ-রকম ৪০৫টি সমবায় সমিতি বাজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আবশ্যিক নানা জিনিস বিক্রি করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিপণি থেকে এ বছর মোট ৪৬.৫৫ লক্ষ টাকার জিনিস বিক্রি হয়েছে।

আলোচ্য বছরে মৎস্যজীবী-সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এ রাজ্যে ৩৪৮; এগুলির মোট সদস্যসংখ্যা ১৯,৫৯৮ এবং কার্যকরী মূলধন ৫.৪২ লক্ষ টাকা। এসব সমিতি থেকে এ বছর ৫.৪১ লক্ষ টাকার মাছ বিক্রি হয়েছে। এসব সমিতি পুষ্করিণী ও বিভিন্ন ধরনের জলায় মাছের চাষ করে ও মাছ ধরে বিক্রি করে। এ-রকম করেই সমিতির কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সমবায় সমিতির মধ্য দিয়ে উদ্ভাস্তদের এবং অন্যান্য লোকের পুনর্বাসন ও গৃহনির্মাণ সমস্যার সমাধানেও যথেষ্ট সাহায্য হয়। আলোচ্য বছরে সমবায় গৃহনির্মাণ সমিতির সংখ্যা হয়েছে ১৫১, এসব সমিতির সদস্য ১৬,৬০৭ জন এবং কার্যকরী মূলধন ৫৮.৬২ লক্ষ টাকা।

সমবায় পরিবহণ সমিতিগুলিও ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আগের বছর এ রাজ্যে এ রকম সমিতি ছিল ১৮টি এবং আলোচ্য বছরে তার সংখ্যা হয়েছে ২৫। এগুলির মোট সদস্যসংখ্যা ১,৭১০ এবং কার্যকরী মূলধন ৬.২৪ লক্ষ টাকা।

আলোচ্য বর্ষে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমবায় সমিতিগুলির উন্নয়নের জন্য চূড়ান্ত কর্মসূচি রচিত হয়েছে। সমবায় সমিতির মধ্য দিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য এ এক সুসংবদ্ধ কর্মসূচি। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি এর অন্তর্ভুক্ত: (১) কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির পুনর্গঠন এবং পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির পরিচালনায়

ও মূলধনে রাজ্যসরকারের অংশগ্রহণ; (২) প্রাথমিক ঋণদান সমিতিগুলির পুনর্গঠন এবং সেইসব সমিতির পরিচালনায় রাজ্যসরকারের অংশগ্রহণ; (৩) একটি কেন্দ্রীয় জমি-বন্ধকী ব্যাংক ও বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক জমি-বন্ধকী ব্যাংক স্থাপন করে দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান-ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং কেন্দ্রীয় জমি-বন্ধকী ব্যাংকের পরিচালনায় ও মূলধনে রাজ্যসরকারের অংশগ্রহণ; (৪) সমবায় কর্মীদের শিক্ষণের জন্য তিনটি আঞ্চলিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন; (৫) রাজ্য-পর্যায়ে একটি কৃষি-সহায়তা ও জমা তহবিল গঠন এবং একটি সমবায় উন্নয়ন তহবিল গঠন; দৃঃসময়ে প্রথমটি সমবায় সমিতিগুলিকে সাহায্য করবে এবং দ্বিতীয়টি বিপণন-প্রস্তুত আদির উদ্দেশ্যে স্থাপিত কৃষি-সমিতিগুলির উন্নয়নের ব্যবস্থা করবে; (৬) ভূমি-সংস্কার-আইনে পরিকল্পিত যৌথ খামারের অনুরূপ ৫০০টি খামার সারা রাজ্যে স্থাপন; এবং (৭) উন্নয়নকার্যকে নিবিড় করার জন্য সমবায় সমিতিগুলিকে পর্যাপ্ত ঋণ, অনুদান ও সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

এই বিবরণী থেকে বোঝা যাবে যে, নানা বাধা সত্ত্বেও সমবায়-আন্দোলন ক্রমেই অগ্রগতির পথে চলছে। এর পুনর্গঠন ও পুনর্বিবাসনের মধ্য দিয়ে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করার কাজে অপরিমেয় শক্তি সঞ্চারিত হবে। এর ফলেই প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রকৃত ভিত্তি।



ডাও-হিল বনবিদ্যালয়

গ্রীহেমচন্দ্র বস্কর

[ডাও-হিল বনবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯০৭ সালে। এ বছর তার বয়স ৫০ বছর পূর্ণ হয়েছে বলে সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল। পশ্চিমবঙ্গের বনবিভাগের মন্ত্রী গ্রীহেমচন্দ্র নস্কর ২৭এ অক্টোবর (১৯৫৭) এই উৎসবের উদ্বেোধন করেন। এ উপলক্ষে তিনি যে ভাষণ দেন, এখানে তা প্রকাশ করা হল।—বসুন্ধরা-সম্পাদক]

ডাও-হিল বনবিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের উদ্বেোধন করতে গিয়ে আমি অপার আনন্দ অনুভব করছি। এই বিদ্যালয়ের বয়স পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল। এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে গত দশ বছর বনবিভাগের ভার আমার উপর আছে বলে আমি গর্ববোধ করছি। বহু অসুবিধার মধ্যেও, উচ্চ-অনুচ্চ নির্বিশেষে আমার বন-কর্মচারীরা পশ্চিমবঙ্গের অরণ্যের উন্নয়ন এবং প্রসারণের জন্য অবিচল দৃঢ়তায় কাজ করে চলেছেন। এ কর্তব্য কঠোর, কারণ, আমাদের দেশের জনগণ বনের গুরুত্ব সম্বন্ধে এখনও সম্পূর্ণ সচেতন নন।

বন আমাদের কাঠ যোগায়, জ্বালানী যোগায়, আরও যোগায় আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় অনেক জিনিস। বন ভূমিক্ষয় রোধ করে, বন্যাদমন করে, নদীর জলধারাকে অবিরাম বয়ে যেতে সাহায্য করে এবং আবহাওয়া স্নিগ্ধ রাখে। কৃষিকাজ ভালভাবে চালাতে হলে, ভাল বন থাকা দরকার। অরণ্য অতি বিচিত্র সব পশুপাখির বাসভূমিও বটে। সুতরাং বনসংক্রান্ত কাজের ভার যাঁদের উপর ন্যস্ত, তাঁদের দায়িত্ব বিরাট এবং বন-কর্মচারীদের শিক্ষণের বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ।

ডাও-হিল বনবিদ্যালয় ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন বনবিজ্ঞানমন্দিরগুলির অন্যতম। গোড়ার দিকে এখানে বিহারের, এবং উড়িষ্যারও, বনকর্মীদের শিক্ষণ দেওয়া হত। পরবর্তী কালেও, বাঙলার এবং বাঙলাদেশের বাইরেরও, দেশীয় রাজ্যগুলির আর বিভিন্ন জমিদারির যেসব ছাত্র বনসংরক্ষণে উৎসাহী, তাঁদের এখানে শিক্ষণদান চলে এসেছে। এসব দেশীয় রাজ্য আর জমিদারি সংখ্যায় ছিল ৩৬টি, তার মধ্যে ছিল মেদিনীপুর জমিদারি, সেরাইকেল্লা, টেনকানল, বোটয়া, ময়ূরভঞ্জ, কলাহাঁড়ি, ধলভূম, কোচবিহার, লুসাই পাহাড়, ত্রিপুরা, মণিপুর, উত্তরপূর্ব সীমান্ত প্রদেশ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, সিকিম এবং ভুটান।

কাজেই এ বিদ্যালয়ে যেসব বনকর্মী শিক্ষণলাভ করেছেন, তাঁরা ছাড়িয়ে পড়েছেন বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। এটা সুস্পষ্ট যে, এখানকার শিক্ষার উচ্চ মান এবং ধারা বজায় রেখে চলা শুধু বাঙলার কল্যাণেই নয়, অন্যান্য যেসব জায়গার ছাত্রেরা এখানে শিক্ষণলাভ করতে আসেন সেসব অঞ্চলের কল্যাণেও একান্ত প্রয়োজন। এ বিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত ৮৩৯ জন বনকর্মী শিক্ষণলাভ করে গেছেন। আনন্দের বিষয়, তার মধ্যে ২৮ জন 'গেজেটেড অফিসার'এর মর্যাদা লাভ করেছেন। তাঁদের কয়েকজন বিভিন্ন প্রতিবেশী রাজ্যে মধ্য বন-আধিকারিক হয়েছেন এবং কয়েকজন হয়েছেন বিভিন্ন বনাঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। এ বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ বহু বনকর্মী বনরক্ষক কর্মচারীর (ফরেস্ট রেঞ্জার) পদে উন্নীত হয়েছেন; তাঁদের কেউ কেউ দেরাদুনে আরও শিক্ষণলাভ করেছেন এবং অন্য সবাই আর কোন শিক্ষণ না নিয়েই কাজে যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। এই

বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ বনকর্মীরা অতি দায়িত্বপূর্ণ পদে উন্নীত হ'তে পারেন—এই বিবেচনায় বিদ্যালয়ের কতৃপক্ষ ভালভাবে বৈষয়িক শিক্ষণ-সুযোগ ছাড়া কঠোর শৃঙ্খলা-শিক্ষণের উপরও জোর দিয়েছেন। বনকর্মীদের অনেক সময় দুর্গম অঞ্চলে থেকে নানা অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়; সেরকম অবস্থায়ও যাতে সদ্‌মুঠভাবে কাজ করতে পারেন সেইভাবে এখানকার শিক্ষার্থীদের

অভ্যাস-গঠন করা হয়। এ কথা বলতে আমি আনন্দবোধ করছি যে, বনবিভাগে আমার মন্ত্রিস্বকালে এই বনবিদ্যালয় সম্বন্ধে শুধুই ভাল ছাড়া আর কোন রকম বিবর্তি আমি কখনও পাই নি।

এই বনবিদ্যালয় আগামী সুদীর্ঘকাল ধরে কঠোরকর্মক্ষম, সদ্‌দক্ষ এবং সদাচারী বনকর্মী গঠন করে চলুক—এই আমার আন্তরিক অভিলাষ এবং কামনা।



ফসল বৃদ্ধিতে সার

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীতে রক্তমাংসের শরীর নিয়ে বেঁচে থাকতে হ'লে আমাদের সংগ্রহ করতেই হবে তিনটে বস্তু—আহার্য, বস্তু এবং আশ্রয়। এর জন্যে আমাদের পায়ের তলায় যে মাটির পৃথিবী রয়েছে তার পরিচর্যা করা প্রথম প্রয়োজন।

আহার্য, বস্তু এবং আশ্রয়—এই তিনের মধ্যে আবার খাদ্যের প্রয়োজন সর্বাপ্রাণে। ঠাকুর বলতেন, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'। খালি পেটে ধর্ম কেন—সাহিত্য, দর্শন কিছুই হয় না। একটা আনন্দময় সুস্থ জীবনযাপনের জন্যে অনেক প্রয়োজন, তাই অপরিহার্য।

মানুষের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, কিন্তু সে অনুপাতে আহার্যের পরিমাণ বাড়ছে কই? আহার্যের পরিমাণ বাড়তে গেলে ভূমিলক্ষ্মীর শূদ্রা করা সর্বাপ্রাণে দরকার—একথা আগেই বলা হয়েছে। ভূমিলক্ষ্মীর কাছ থেকে আমরা তার সমস্ত রস নিংড়ে আহার্য সংগ্রহ করছি, কিন্তু প্রতিদানে আমরা তাকে কিছুই দিচ্ছি নে। একের কাছ থেকে কেবলই গ্রহণ করবো অথচ তাকে কিছুই ফিরিয়ে দেবো না—এর মধ্যে ন্যায়ের বিন্দুবিবিসর্গও নেই। বিন্দুমাত্র বৃদ্ধিরও পরিচয় নেই। খ্যাতনামা ফরেন্সটার বেকার সাহেব তাঁর Green Glory-তে ঠিকই বলেছেন:

The taking of food from the topsoil and failing to return it in compost is suicidal.

ভূমির উপরিভাগ থেকে কেবলই খাদ্য সংগ্রহ করবো অথচ কম্পোস্টসারের মাধ্যমে ভূমিকে তার খাদ্য ফিরিয়ে দেবো না—এই নীতি তো আশ্চর্যাতন।

শহরের লোকেরা প্রতিদিন লাখে লাখে টন কমলা, কলা, আপেল, মাছ, মাংস, গম এবং তৈল

ইত্যাদি খাদ্যহিসাবে ব্যবহার করছে। কিন্তু এত ফলমূলের পর্বতপ্রমাণ খোসা যদি জমির সার হিসাবে ব্যবহৃত হ'তে পারতো! মাছ-মাংস, তেল, গম ইত্যাদি ভুক্ত পদার্থের অসার অংশ যা মলমূত্র হ'য়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যায় তা মাটিকে দিলে মাটি-মা তার পুত্রকন্যাদের কাছ থেকে তার প্রাপ্য অংশের কিছুটা ফিরে পায়। হাওয়ার্ড সাহেব ঠিকই মন্তব্য করেছেন:

If all humus from waste matter from millions of cases of oranges and apples, millions of tons of beef and mutton, wheat and oil, were used, how fertile would the land be.

আমাদের দেশে খাদ্যের যে এমন নিদারুণ অভাব তার মূলে আমাদের মূঢ়তা এবং অপচয়।

জাপানের লোকসংখ্যা ৭ কোটি ২০ লক্ষ। গড়ে এক-একটা ফার্মের আয়তন তিন বিঘার কিছু বেশি। জাপানের প্রায় অর্ধেক লোক কৃষিজীবী। ভূমি সেখানে এতই উর্বরা যে, অধিকাংশ ফার্ম থেকেই বছরে তিনবার ফসল সংগ্রহ করা যায়। জগন্মিখ্যাত ফরেন্সটার তাঁর জাপানের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন:

Fertility is maintained by the thrifty use of night-soil.

ভূমির এই উর্বরতা রক্ষিত হচ্ছে মলমূত্রের সুষ্ঠু ব্যবহারের দ্বারা! প্রতি সন্ধ্যায় শহরগুলির মলমূত্র কাঠের বালতিতে সংগ্রহ করা হয়। অতঃপর মানুষের অতি মূল্যবান ঐ মলমূত্র ঘোড়ায় অথবা বলদে-টানা গাড়িতে করে চাষীরা মাঠে মাঠে নিয়ে যায়। এরই জন্যে জাপানী চাষী এত অল্প জমির মালিক হয়েও এত শস্য উৎপাদন করবার ক্ষমতা রাখে।

চোখ এবং নাক বন্ধ না করে আমাদের দেশের গ্রামে ঢোকা যায় না। মৃত নরনারী নির্বিচারে রাস্তাঘাট নোংরা করে রাখে। নদীর ধারে পর্যন্ত বসবার উপায় নেই। এখানে সেখানে মানুষের মলমূত্র। কবি শিবজেন্দ্রলাল আমাদের এই দেশকে বলেছেন ‘সকল দেশের রাণী’। রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন ‘সার্থক জনম আমার জন্মেছি এদেশে।’ কিন্তু এই সুন্দর দেশের স্বচ্ছসলিলা নদীগুলির তটভূমিকে আমরা মলমূত্রে কী নোংরা করে রেখেছি! মনে হয় বিধাতাপরুষ মৃত্যুর মালা দুলিয়েছেন মকটের গলায়।

রাস্তাঘাটের মলমূত্র যদি মাঠে মাঠে মাটির নিচে যেতো, প্রথমত গ্রামের বাতাস দূষিত হ’তে পারতো না। দ্বিতীয়ত আমাদের দেশের ফসলের পরিমাণ কত বেড়ে যেতো! কিন্তু এই দিগন্তপ্রসারী অজ্ঞতার অন্ধকার কত দিনে অপসারিত হবে!

এই প্রসঙ্গে একটা কাহিনী বলি। আমার গৃহ-সংলগ্ন লোকসেবা-শিবিরে ‘মোবাইল’ হাসপাতাল এবং পদলিসের ছোট ঘাঁটি ছিল। তার লোকজন শোচে যেতো অন্যত্র। আমার জমি বেলে। তাকে দো-আঁসলা মাটিতে রূপান্তরিত করবার প্রয়োজন ছিল বিপুল। সেজন্যে একদিন সকালে ডাক্তার, কম্পাউন্ডার এবং পদলিসদের কাছে গিয়ে ‘সুপ্রভাত’ বলে দাঁড়ালাম, তারপর বললামঃ “আমার একটু উপকার করতে হবে।” শশব্যস্ত হয়ে তাঁরা বললেনঃ “নিশ্চয়, নিশ্চয়; কী করতে হবে বলুন।”

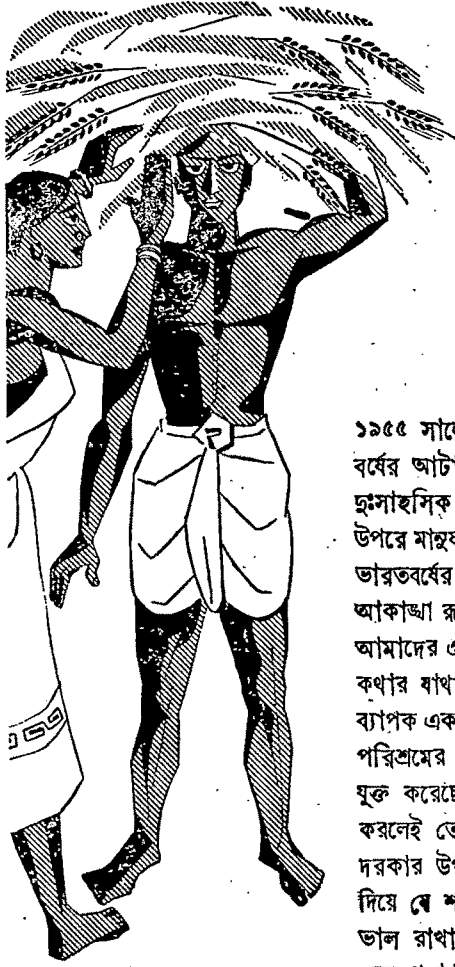
আমি বললামঃ “দয়া করে আমার বাগানে রোজ রোজ যদি গাড়ি নিয়ে আসেন তবে আমার বড়ো উপকার করা হবে।”

কথা শুনে তাঁরা প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গেলেন। এমন অনুরোধ সেদিন পর্যন্ত কেউ তাঁদের করে

নি। আমার মিনতির গুরুত্ব শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করে তাঁরা আমাকে কথা দিলেন—আমার বাগানেই তাঁরা গাড়ি নিয়ে আসবেন। কথা তাঁরা রেখেছিলেন। যে গর্তে তাঁরা মলমূত্র ত্যাগ করতেন, তার উপরে এখন একটা ভালো আমের গাছ বাগানের শোভা বর্ধন করছে।

গোবর এবং চোনারও কী আত্মঘাতী অপচয়! মাঠের এবং গোয়ালের কত গোবর দিনে দিনে ঘুটে হয়ে পড়ে যাচ্ছে। ঐ গোবর যদি সার হিসাবে ব্যবহৃত হ’ত, এ দুর্ভাগ্য দেশে এত অল্পকষ্ট কখনও হ’ত না। কিন্তু জ্বালানির অভাব মিটবে কোন্ রাস্তায়? মিটবে নতুন নতুন বৃক্ষ-রোপণের রাস্তায়। বহুল পরিমাণে বাবলা গাছ লাগালে আমাদের জ্বালানির দৃংখ কত সহজে মিটতে পারে! আর বাবলা কত তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে! জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানেরই অভাব, তাই এত অক্ষম হয়ে আছি। যেখানে জ্ঞান আছে সেখানে উদ্যমের একান্ত অভাব। জ্ঞান গর্ভপুষ্টে চন্দন-কাষ্ঠের বোঝার মতো ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কী দিগন্তপ্রসারী মৃত্যু! কী সর্বনেশে অপচয়!

গ্রামে গ্রামে পর্যটনকালে দেখছি—গোবর গৃহস্থের বাড়ির আনাচে কানাচে স্তূপীকৃত হয়ে আছে। কোন আচ্ছাদন নেই। রৌদ্রতাপে গোবর শুকিয়ে যাচ্ছে, বৃষ্টিতে ধুয়ে নষ্ট হচ্ছে। অপচয়ের এই দৃশ্য দেখে নৈরাশ্যে মন ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়। কিন্তু হাল ছেড়ে দেবার মতো এমন সর্বনেশে নীতি আর নেই। তাই পর্বতপ্রমাণ বাধার বিরুদ্ধে আমাদের শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করে যেতে হবে। ধৈর্য এবং সাহস হারালে চলবে না।



কাজ ও পুষ্টি

১৯৫৫ সালের ২রা অক্টোবর, অর্থাৎ গান্ধী জয়ন্তীর দিনে, ভারত-বর্ষের আটাশটি বিভিন্ন প্রদেশে একই সঙ্গে শুরু হয় এক দুঃসাহসিক অভিযান—পল্লী উন্নয়ন সে অভিযানের লক্ষ্য। ‘সবার উপরে মানুষ সত্য’,—এই আদর্শই সে অভিযানকে জোগায় প্রেরণা, ভারতবর্ষের পাঁচ লক গ্রামের প্রায় ছয় কোটি পরিবারের আশা আকাঙ্ক্ষা রূপ পরিগ্রহ করে এই দৃঢ়সঙ্কল্প অভিযানের মধ্যে দিয়ে। আমাদের প্রধান মন্ত্রী বলেছেন “এ যুগটাই কঠোর পরিশ্রমের।” এ কথার ষাণ্ঠার্থ্য বোঝা যাবে যদি আমরা ভেবে দেখি যে, এরকম ব্যাপক একটি পল্লীউন্নয়ন কার্যক্রমে কি পরিমাণ একক এবং সঙ্গবদ্ধ পরিশ্রমের প্রয়োজন। ধারা এই কার্যক্রমের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছেন তাঁরা বোঝেন কাজ—আরও কাজ। কিন্তু কাজ করলেই তো শুধু চলবেনা, এইসব কঠোর পরিশ্রমী লোকদের দরকার উপযুক্ত, সুপরিকল্পিত পুষ্টির খাবার। কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যে শক্তি তাঁরা ক্ষয় করেন তা পূরণের জন্তে এবং স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্তে তাঁদের দরকার খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিনস) এবং স্নেহ পদার্থ (ফ্যাটস) যুক্ত স্নেহম খাদ্য!

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চের পুষ্টি সম্বন্ধীয় উপদেষ্টা কমিটির মতে পূর্ণবয়স্কদের প্রতিদিন অন্ততঃ দু’ আউন্স (প্রায় এক ছটাক) স্নেহপদার্থ খাওয়া দরকার। স্নেহপদার্থ গম বা চালের তুলনায় আড়াই গুণ বেশি শক্তি দেয় এবং অসুখবিসুখ প্রতিরোধ করারও ক্ষমতা দেয়। ডালডা বনস্পতি তৈরী হয় বিশুদ্ধ ভেষজ তেল থেকে এবং এটি একটি খাঁটি স্নেহপদার্থ। ডালডায় ভিটামিন ‘এ’ এবং ‘ডি’ থাকে। প্রতি আউন্স ডালডায় ৭০০ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট অর্থাৎ ভাল খিয়ের সমপরিমাণ ভিটামিন ‘এ’ যোগ করা হয়। এই ভিটামিনগুলি হাড় ও মাংসপেশী গড়ে তোলে। শুধু তাই নয়, ভিটামিন ‘এ’ চোখ এবং ত্বকে সুস্থ রাখে আর ভিটামিন ‘ডি’ হাড় সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে। ডালডা তৈরীর সময় হাতে ছোঁওয়া হয় না। শীল করা পরিচিত খেজুর গাছ মার্কা টিনে ডালডা সবসময় খাঁটি ও তাজা পাবেন। খাবারে অতিরিক্ত পুষ্টি দেয় বলে পরিশ্রমী লোকদের প্রতিদিনকার খাবার ডালডায় রাঁধাই ভাল।



HYM. 310-18 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই, কর্তৃক প্রস্তুত

ডিম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

আসন্নোজেন্দু গুপ্ত

বর্তমানে আমাদের দেশে যেভাবে বাজারে ডিম বিক্রি হয় তাতে ডিমের স্বরূপ সম্বন্ধে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই ধারণা অনিশ্চিত থাকে। একমাত্র আকৃতিতে বড় দেখেই এবং বিক্রেতার কথায় বিশ্বাস ক'রেই আমরা ডিম কিনে থাকি। কিন্তু দ্রুতের বিষয় বাড়িতে এনে বহু ডিমই খারাপ পড়তে দেখা যায়! কিন্তু তখন আর কোনও উপায় থাকে না। অথচ যদি সামান্য একটু চেষ্টা ক'রে গুণাগুণগুণি যাচাই ক'রে ডিম কিনি তবে আমাদের প্রতারণিত হবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। এ প্রবন্ধে ডিম পরীক্ষা করার সহজ উপায়গুণি আলোচনা করা হচ্ছে।

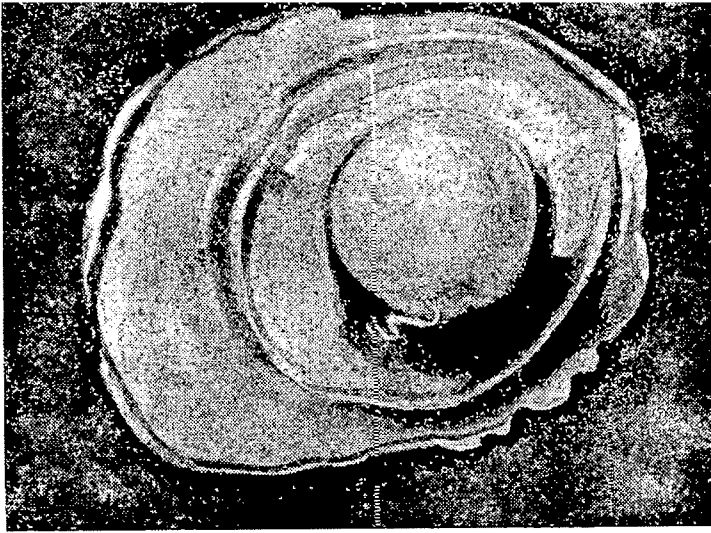
খালি চোখে যেসব দোষ ধরা পড়ে না, আলোর সামনে ডিম পরীক্ষা করলে সেগুণি সহজেই ধরা যায়, ফলে গুণাগুণ নির্ধারণ করার সুবিধা হয়। ডিমের স্বরূপ পরিষ্কারভাবে বঝতে হ'লে ডিমের গঠনরীতি কিছুটা জেনে রাখা ভাল। এখানে সংক্ষেপে তার আলোচনা করা গেল।

ডিমকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়—(ক) কুসুম, (খ) শ্বেতাংশ ও (গ) খোসা। মুরগি যৌবন-বয়স্কা হ'লেই ঐ কুসুম উৎপন্ন হতে শুরু করে—সঙ্গে মোরগ না থাকলেও এর ব্যতিক্রম হয় না। এই কুসুমই শরীর থেকে ডিমের আকার ধারণ ক'রে বের হয়। নানা আকারের এই কুসুমগুণি একটি আঙুরের থোলোর মত একসঙ্গে বোটার দ্বারা 'ওভারি'তে ঝুলতে থাকে। এগুলি একের পর এক ক্রমশ আকারে বড় হয়ে ওঠে এবং পূর্ণাকৃতি হ'লেই বোটা খসে 'ওভিডাক্ট'এ এসে পড়ে। শরীরের অভ্যন্তরীণ চাপে ধীরে ধীরে বেরোবার জন্য এগিয়ে আসার কালে প্রথমে 'ওভিডাক্ট'এ শ্বেতাংশের সৃষ্টি হয় ও কুসুম

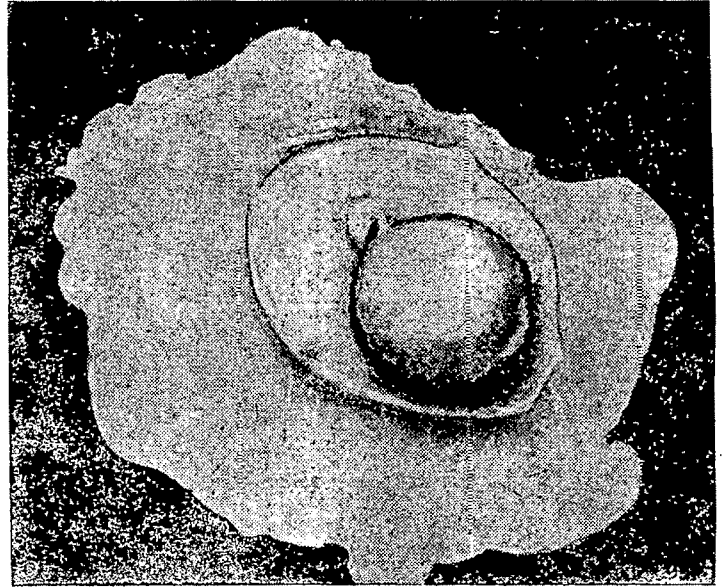
তার সংস্পর্শে আসে। তখন কুসুমের বহির্দেশে শ্বেতাংশ জড়িয়ে যায় ও বৃহদাকার ধারণ করে। দৈবাৎ কখনও কখনও দু'টি কুসুম একত্রে এসে শ্বেতাংশের সংস্পর্শ লাভ ক'রে জোড়া-কুসুমওয়ালা ডিমে পরিণত হয়। বেরিয়ে যাবার পথে আরও এগিয়ে 'ইউটেরাস'—এ উপস্থিত হয়ে ডিম প্রায় ১৮ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে থাকে। এখানেই শ্বেতাংশের স্তরের বহির্দেশে খোসার উৎপত্তি হয়। খোসায় চুনজাতীয় পদার্থই বেশি থাকে বলে শরীরের সঞ্চিত চুন এখান থেকে ডিমের সংস্পর্শে এসে এই শক্ত খোসার সৃষ্টি করে। শারীরিক চাপে অগ্রসর হবার কালে ভিতরকার কুসুম সহ শ্বেতাংশ একটু ক'রে ঘুরে যায়, ফলে শ্বেতাংশের একভাগ কুসুমের বহির্দেশের আবরণ থেকে দু'পাশে স্তরের মত বাঁধনের সৃষ্টি করে—যাকে বলা হয় 'চালজা'। মুরগির শারীরিক তাপমাত্রা প্রায় ১০৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট। এর জন্য বাইরে আসবার পর অপেক্ষাকৃত ঠান্ডায় ডিমের ভিতরকার জলীয় ভাগ সংকুচিত হয় এবং ডিমের খোসার গা দিয়ে বায়ু ভিতরে প্রবেশ ক'রে একটি গোল সিকি-পরিমাণ ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করে—যাকে বলা হয় 'এয়ার সেল'। এটা সাধারণত ডিমের মোটা দিকে থাকে।

ডিমের গঠন

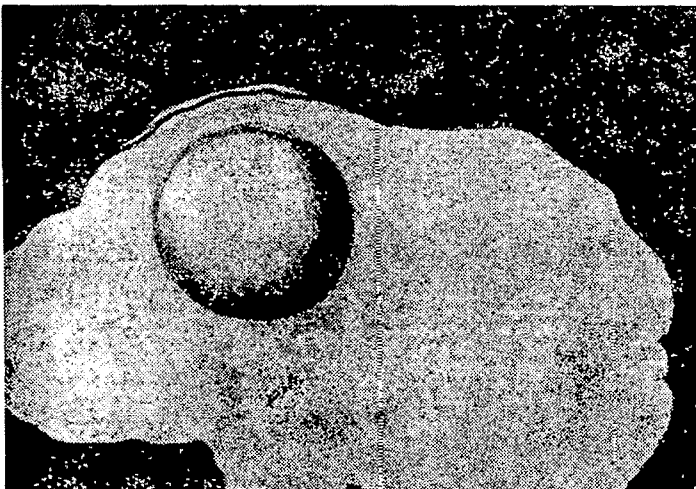
দ্রুত থেকে শাবক উৎপাদনে কুসুমই খাদ্য-ভান্ডারের কাজ করে। নব-উৎপাদিত ডিমের কুসুমের বহির্দেশের আবরণে ক্ষুদ্র সাদা গোলাকৃতি 'জার্ম সেল' বা 'ব্লাস্টোডার্ম' দেখতে পাওয়া যায়। এটাই অব্যাহিত পরিবর্তন ঘটিয়ে ডিমকে খাদ্য-হিসাবে ব্যবহারের অযোগ্য ক'রে ফেলে।



টাটকা ডিম



কিছু পুরানো ডিম



পুরানো ডিম

[বিবরণ শেষ অনুচ্ছেদে স্টব্য]

সদ্যোজাত ডিমের ভিতরের উপাদান শক্তভাবে শ্বেতাংশের ঘনভাগ ও 'চালজার' দ্বারা বেষ্টিত থাকে। নাড়াচাড়া করলে এটা টিলে হয়ে যায়। ডিমের আবরণ পাতলা হওয়া উচিত নয়; কারণ, খোসা অতি ভঙ্গুর এবং তার গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ছিদ্র আছে, যোগদুলোর মধ্য দিয়ে বায়ু চলাচল করে ভিতরের ভ্রূণের শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়ায় সাহায্য করে। আবার এসব ছিদ্রপথেই নানা রকম জীবাণু প্রবেশ করে ডিমের ভিতর পচন ধরায়। খোসা বেশি পাতলা হ'লে পচন দ্রুত হয় ও ডিম তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। নবজাত ডিমের ভিতর সাধারণত ঘূর্নিলে ঘাবার উপায় নেই, তবে ডিম বেশি নাড়াচাড়া করলে ঘূর্নিলে যায়। এই সাধারণ কথাটা আমরা অনেকেই জানি না। এমনকি বাজারে ডিম কেনার সময় ডিমকে যথেষ্টভাবে নাড়িয়ে, এমনকি ঝাঁকিয়েও, দেখি। তার ফলে ভাল ডিমও কিছু সময়ের মধ্যে খারাপ হয়ে পড়ে।

একটি ডিমের ওজনের সাধারণত শতকরা ১০.৩০ ভাগ খোসা; ৫৭.৬০ ভাগ শ্বেতাংশ এবং ৩২.১০ ভাগ কুসুম। শ্বেতাংশের ১/৫ ভাগ বাইরের পাতলা অংশ, ই ভাগ ঘন জেলীর মত আর ৩/১০ ভাগ ভিতরের পাতলা অংশ।

পরীক্ষার পদ্ধতি

বাইরের ও ভিতরের চেহারা দেখেই ডিম পরীক্ষা করা হয়। ভিতরের রূপ খালি চোখে দেখা যায় না, সেজন্য কোনও অন্ধকার ঘরে একটি জোরালো আলোর সামনে ডিমকে রেখে ধীরে ধীরে ঘূঁরিয়ে দেখতে হয়। এভাবে কিছুদিন অভ্যাস করলে সহজেই ভাল ডিম বাছাই করে নিতে পারা যায়।

ডিমের সঠিক আকার হচ্ছে একটু লম্বাটে গোল—তার উপর দিকটা একটু মোটা আর নিচের

দিকটা একটু সরু। এই হ'ল আসল ডিম্বাকৃতি। ডিম বেশি লম্বা বা অন্য ধরনের হওয়া উচিত নয়। ভাল ডিমের খোসা পাতলা হবে না, খোসার কোথাও পুরু আর কোথাও পাতলা থাকবে না। খোসার গায়ে ছিদ্রগুলি বড় হবে না, খোসা ভাঙা বা ফাটা থাকবে না। ভাল ডিমের ভিতর লাল, কালো, ধূসর বা অন্য কোন অবাঞ্ছিত রঙের বিকৃতি থাকবে না। ভিতরটা হবে স্বচ্ছ এবং কেবল সামান্য রক্তাভ। কুসুম একধারে না থাকাই বাঞ্ছনীয়। 'এয়ার সেল' অর্থাৎ মোটাদিকের ফাঁকা জায়গাটুকু একটি গোল সিকির পরিমাণ হবে, তার চেয়ে বেশি বড় হওয়া উচিত নয়। 'এয়ার সেল' যত বড় হবে ডিমও তত পুরানো বৃদ্ধিতে হবে। যে ডিমের ভিতর রক্তবিন্দুর মত বা মাংসের টুকরার মত দেখা যায়, তা গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রীষ্মকালে কোন কোন ডিমের ভিতর বর্ধিতাবস্থায় ভ্রূণও দেখা যায়; সে-ডিম ত্যাগ করতে হবে। ডিম না ভেঙে মোটামুটি পরীক্ষা করার এই হচ্ছে উপায়।

ইউরোপীয় লোকে ডিমের 'পোচ্' বেশি পছন্দ করে। তার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, 'পোচ্'এ ডিমের আসল রূপ সহজেই ধরা পড়ে। তাজা ডিমকে একটি প্লেটে ভেঙে নিলে দেখা যায়, পরিষ্কারভাবে পরপর তিনটি জিনিস রয়েছে। প্রথমে পাতলা শ্বেতাংশ, তার উপর ঘন শ্বেতাংশ এবং সবার উপর জমাট গোলাকার কুসুম। ডিম যতই পুরানো হতে থাকে, ততই এর ব্যতিক্রম ঘটে। ঘন শ্বেতাংশ পাতলা হয়ে যায়, সেজন্য কুসুম আর তত উচ্চে থাকতে পারে না। পাতলা শ্বেতাংশ আরও পাতলা হয়ে জলের আকার ধারণ করে। কুসুমও আগের মত দৃঢ় থাকে না। বেশি পুরানো হ'লে কুসুমও গ'লে যায়। এখানে ডিমের তিন অবস্থার তিনটি ছবি দেওয়া গেল—এ থেকে তফাতটা সহজেই বোঝা যাবে।

মোটীক পদ্ধতি

সম্পূর্ণ এবং স্থান অনুসারে মান-নির্দেশক দশটি প্রতীক দিয়ে সমস্ত সংখ্যা ব্যক্ত করার আধুনিক পদ্ধতি ভারতের আবিষ্কার। পৃথিবী দ্ব' হাজার বছরেরও আগে একজন ভারতীয় গণিতজ্ঞের কাছ থেকে এই অপূর্ব তত্ত্বের কথা জানতে পারে এবং এটাই পৃথিবীর সর্বত্র সকল রকম গাণিতিক হিসাবের ভিত্তি হয়ে গেছে। 'শূন্য' এবং 'দশমিক স্থান' আবিষ্কৃত হবার পর সংখ্যাবিজ্ঞানে যে দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার মূলে রয়েছে গণিতের সরলতা এবং গণিতে এই সরলতা উক্ত তত্ত্বের জন্যই সম্ভব হয়েছে। বস্তুত ভারতীয় এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে।

ভারতের নিজস্ব পদ্ধতি

মানবসভ্যতায় প্রাচীন ভারতের বিরাট অবদানের কথা আমরা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করতে পারি। ভারতের এই অবদানের কথা গার্ড্‌ডু এমারসন সেন তাঁর 'দি পেজন্ট অব ইন্ডিয়াজ হিস্টরি' বইয়ে উল্লেখ করেছেন। এখানে সেই বই থেকে কয়েকটি অনুচ্ছেদের বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হ'ল:

“সম্ভবত দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতীয় বণিকেরা আলেকজান্দ্রিয়াতে ভারতীয় সংখ্যা চালু করেন। এগুলিকে সাধারণত আরবী সংখ্যা ব'লে ভুল করা হয়। পাঁচ শ' বছর আগে অশোক তাঁর ব্রাহ্মী লিপিতে সংখ্যা উৎকীর্ণ করেছিলেন কিন্তু খ্রীস্টীয় যুগ আরম্ভ হবার প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে এক অজ্ঞাত ভারতীয় গণিতজ্ঞ স্থানিক মান পদ্ধতি এবং শূন্য আবিষ্কার করে গণিতের ক্ষেত্রে যে অবদানের অধিকারী হন তা গণিতে সকল অবদানকে ছাড়িয়ে গেছে। এই পদ্ধতি অনুসারে দশমিক প্রণালীতে সাজানো সংখ্যা-গুলি স্থান অনুসারে মান ধারণ করে ১২ বা ২১এতে একই অঙ্ক স্থান অনুসারে ভিন্ন সংখ্যা

প্রকাশ করে। আজ সভ্যজগৎ একথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে এবং এই আশ্চর্য আবিষ্কারের জন্য ভারতের প্রতি কোন ঋণ স্বীকার না করে সেই সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে আধুনিক হিসাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। ভারতীয় পদ্ধতির তুলনায় প্রাচীন গ্রীক বর্ণাশ্রয়ী সংখ্যাপাতন এবং জটিল রোমক প্রতীক অত্যন্ত অসুবিধাজনক।

“নতুন ভারতীয় পদ্ধতির আদিমতম উল্লেখ রয়েছে খ্রীস্টীয় যুগ আরম্ভ হবার কিছু পূর্বে এবং ঠিক পরের সংস্কৃত সাহিত্যে। তবে পঞ্চম শতাব্দীর শেষে দেখা যায় ভারতের সমস্ত গণিতজ্ঞই নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করছেন। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে এ পদ্ধতি পূর্ব এশিয়ায় সুমাত্রা, কাম্বোডিয়া ও আন্নামে চালু হয়, ভারতীয় শকাব্দের তারিখ দিয়ে উৎকীর্ণ লিপিত তার প্রমাণ।

“এক শতাব্দী পরে বাগদাদে ভারতীয় গণিত আরবীতে অনূদিত হয়। তার আগে পর্যন্ত আরবদের নিজস্ব কোন সংখ্যা-লিখনরীতি ছিল না; তাঁরা গ্রীক অথবা কপটিক চিহ্ন ব্যবহার করে অঙ্ক কষতেন। তাঁরা ভারতীয় পদ্ধতি যে উৎকৃষ্ট তা বুঝতে পারেন এবং আগ্রহের সঙ্গে তা গ্রহণ করেন আর এজন্য তাঁরা ভারতের পূর্ণ কৃতিত্ব স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হন নি। তাঁরা আফ্রিকা ও স্পেন বিজয়ের পর সেখানে এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেন এবং স্পেন থেকে এ পদ্ধতি চালু হয় ইউরোপে। ইউরোপ দশম বা একাদশ শতাব্দীতে পরীক্ষামূলকভাবে ভারতীয় সংখ্যা ও সংখ্যাতত্ত্ব ব্যবহার করতে আরম্ভ করে কিন্তু পাশ্চাত্যজগৎ সাধারণভাবে এ পদ্ধতি ব্যবহার করতে থাকে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে।

“আর্ষভট্ট বিভিন্ন অঙ্ক কষবার বিভিন্ন মূল নিয়ম বিশ্লেষণ করেছেন। তার মধ্যে বর্ণমূল ও

ঘনমূলে বের করা এবং শ্বিঘাত সমীকরণ রয়েছে। আর্ষভট্ট তাঁর সমস্ত অঙ্কে দশমিক এবং শূন্য ও স্থানিক মান-পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। এই-জন্য তিনি সকল দেশের গণিতজ্ঞদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন।”

ভারতীয় সংখ্যালিখন-প্রণালীই মেট্রিক পদ্ধতির ভিত্তি। ভারতীয় সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে যে, এ পদ্ধতি ভারতে গৃহীত হওয়া খুব স্বাভাবিক। এক হিসাবে বলা যায় যে, এ পদ্ধতি বিদেশ জয় করে ভারতে ফিরে এসেছে।

সংস্কারের ব্যবস্থা

প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে ভারতীয় ওজন ও মাপ প্রথার সংস্কার করবার সর্বপ্রথম চেষ্টা হয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ-প্রাধান্য ভারতবর্ষে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। দশ বছর পরে ভারতের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া অনুকূল দেখে ইংরেজ-সরকার ওজন ও মাপ প্রথা সংস্কারের সঙ্কল্প করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৬৭ সালে একটি সমিতি গঠিত হয়। কর্নেল স্ট্র্যাচে এই সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন। ভারতের মাপ ও ওজন প্রথার বিশৃঙ্খল অবস্থা বর্ণনা করে তিনি তাঁর স্মারকলিপিতে সমস্ত ভারতে এক রকমের মাপ ও ওজন চালু করবার জন্য তৎকালীন প্রচলিত প্রথাগুলি উঠিয়ে দেবার প্রস্তাব করেন। তিনি আরও প্রস্তাব করেন যে, এদেশে মাপ ও ওজনের ফরাসী (মেট্রিক) প্রথা চালু করা হোক। ভারতের মাপ ও ওজন প্রথা নিয়ন্ত্রিত করার জন্য একটি বিলের খসড়াও তিনি তাঁর স্মারকলিপিতে যোগ করে দেন। এমনকি তিনি প্রস্তাব করেন যে, ১৮৭১ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে এই বিল আইনে পরিণত হওয়া চাই।

কর্নেল স্ট্র্যাচের বিলে বিধিমতে ওজন ও মাপের মেট্রিক প্রথা ভারতে প্রচলিত করার প্রস্তাব ছিল। মাপ ও ওজনের এই নতুন প্রথা দেশে চালু করার

জন্য কী কী ব্যবস্থা করতে হবে বিলে তার প্রস্তাবও ছিল।

এই স্মারকলিপিটি প্রকাশিত হলে পর এর বিরুদ্ধে ঘোরতর সমালোচনা হয়। ১৮৭০ সালে বিলটি আইনে পরিণত হয়, কিন্তু কর্নেল স্ট্র্যাচের সমিতির অন্যান্য সভ্যরা এবং ভারত ও ইংলন্ডের কায়েমী-স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই আইনের বিরুদ্ধাচরণ করেন। তাঁরা ইংলন্ডীয় “ফুট-পাউন্ড” প্রথার পক্ষে মত দেন। কাজেই এই আইন কার্যকরী হয় নি। ফলে কর্নেল স্ট্র্যাচে এই সমিতি থেকে পদত্যাগ করেন এবং এই প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান সংস্কারের প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়।

কালে কর্নেল স্ট্র্যাচের প্রস্তাবে কতখানি সত্য এবং অভিজ্ঞতা নিহিত ছিল তা প্রকাশ পেতে লাগল। মেট্রিক প্রথার সরলতা ও উপযোগিতার জন্য সারা পৃথিবীতে এই প্রথা দেশের পর দেশ গ্রহণ করল। ভারতের প্রগতিশীল লোকেরা বরাবরই এই সংস্কারের পক্ষে ছিলেন; ভারতে ব্রিটিশ-আধিপত্যের অবসান হবার পরেই মেট্রিক প্রথা প্রবর্তন করবার ব্যবস্থা হয়েছে। ভারতীয় পরিকল্পনা সমিতি স্ট্র্যাচে-স্মারকলিপি প্রকাশের নব্বই বছর পরে তাঁর প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন। স্বাধীন ভারতের লোকসভাও মেট্রিক প্রথা গ্রহণ করে ইংরেজ কর্নেলের প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যেই দশমিক মাত্রার প্রবর্তনের মাধ্যমে মেট্রিক পদ্ধতি সম্পর্কে কাজের সূচনা হয়েছে।

মেট্রিক পদ্ধতি কী?

‘মিটার’ (M E T R E) হচ্ছে এই পদ্ধতির প্রাথমিক একক; তার থেকেই এর নাম ‘মেট্রিক’ (METRIC) পদ্ধতি। পরস্পর-সংবন্ধ এই প্রণালীতে দৈর্ঘ্য, তল, আয়তন, ধারণক্ষমতা বা পরিমাণের ক্ষেত্রে যেসব একক ব্যবহার করা হয়, সব সময়ই তার একটার সঙ্গে আর-একটার দশমিক সম্পর্ক থাকবেই। তাই একে দশমিক পদ্ধতিও বলা চলে।

‘মিটার’এর মান নির্ধারিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সম্মতিক্রমে। ‘মিটার’এর একটা আন্তর্জাতিক আদর্শ বা নমুনা তৈরি করা হয়েছে এবং ফরাসী দেশের সেন্সে-এ “ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো অব ওএইট্‌স্ অ্যান্ড মেজাস্” (আন্তর্জাতিক ওজন ও মাপ সংস্থা) নামক প্রতিষ্ঠানে তা রেখে দেওয়া হয়েছে। ‘মিটার’এর এই একেবারে সঠিক মাপটা হচ্ছে প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়াম মিশ্র ধাতুর তৈরি একটা কাঠি—তার গায়ে ‘মিটার’এর দৈর্ঘ্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এইটাই মাপের সর্বজনীন আদর্শ এবং প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়ামের তৈরি ব’লে আবহাওয়ার পরিবর্তনের দ্বারা এটা প্রভাবিত হয় না।

‘মিটার’কে ক্রমিক হিসাবে ১০ দিয়ে গুণ বা ভাগ ক’রেই সম্পূর্ণ মেট্রিক পদ্ধতিটি তৈরি হয়েছে। মেট্রিক পদ্ধতির গুণিতকগুলি গ্রীক ভাষার ‘ডেকা’ (দশ গুণ), ‘হেক্টো’ (একশ’ গুণ) এবং ‘কিলো’ (হাজার গুণ) শব্দের দ্বারা পরিচিত। ভগ্নাংশের এককগুলির জন্য ল্যাটিন শব্দ ‘ডেসি’ (দশ ভাগের এক ভাগ), ‘সেন্টি’ (একশ’ ভাগের এক ভাগ) এবং ‘মিলি’ (হাজার ভাগের এক ভাগ) ব্যবহৃত হয়। মেট্রিক পদ্ধতিতে গুণিতক ও ভগ্নাংশের জন্য এই ছয়টি শব্দ ছাড়া মূল একক হিসাবে ব্যবহৃত হয় ‘মিটার’ (দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে), ‘লিটার’ বা ‘কিউবিক ডেসিমিটার’ (ধারণক্ষমতার ক্ষেত্রে), ‘কিউবিক মিটার’ (পরিমাণের ক্ষেত্রে), ‘গ্রাম্’ (ওজনের ক্ষেত্রে), ‘স্কয়ার মিটার’ (আয়তনের ক্ষেত্রে) এবং ‘হেক্টয়ার’ বা ‘স্কয়ার হেক্টোমিটার’ (জমি জরিপের ক্ষেত্রে)।

এই পদ্ধতির একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, দৈর্ঘ্য, ধারণক্ষমতা এবং ওজনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক এককগুলির মধ্যে সহজ সম্পর্ক। এক মিটারের একশ’ ভাগের এক ভাগ লম্বা, চওড়া ও গভীর একটি পাত্রে যতটুকু বিশুদ্ধ জল ধরে, তার ওজন হচ্ছে এক ‘গ্রাম্’। লেনদেনের ক্ষেত্রে ‘গ্রাম্’ অত্যন্তই তুচ্ছ ওজন, তাই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ‘কিলোগ্রাম্’কেই ওজনের একক হিসাবে ধরা হয়। অপরপক্ষে, এক

‘কিলোগ্রাম্’ বিশুদ্ধ জল যতটা জায়গাতে ধরে, তারই মাপ হচ্ছে ‘লিটার’।

মিটারের ইতিকথা

ফরাসী দেশে মেট্রিক পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে ফরাসী বিপ্লবের অভ্যুত্থানের মধ্যে। বিখ্যাত ফরাসী প্রধান টালীর্যান্ডের আদেশে ওজন এবং মাপের সামন্ততান্ত্রিক আমলের প্রথার পরিবর্তনের জন্য নতুন একটা পদ্ধতির অনুসন্ধান চালানো হয়। নতুন পদ্ধতিকে সর্বজনীন এবং সঠিক ক’রে তোলার জন্য স্থির হয় যে, দৈর্ঘ্যের মান নির্ধারণ করা হবে একেবারে প্রাকৃতিক ভিত্তিতে। পৃথিবীর দ্রাঘিমা য়ে পরিধি, তার এক-চতুর্থাংশের এক কোটি ভাগের এক ভাগকে সেই সময় ওদেশে বলা হত ‘মিটার’। মেট্রিক পদ্ধতিতে সেই ‘মিটার’ই হ’ল দৈর্ঘ্য-মাপের প্রাথমিক একক।

পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু ভেদ ক’রে যে বৃত্ত ধরা হয়, সেই হ’ল দ্রাঘিমা। এই দ্রাঘিমা বরাবর একটা নির্দিষ্ট অংশের জরিপ করার ভার পড়েছিল ফরাসীদেশের ডেলম্বুর্ এবং মেচাইন নামক দুইজন ইঞ্জিনিয়ারের উপর। এই বৃত্তাংশটি ছিল ডানকার্ক থেকে বাসিলোনা পর্যন্ত সমুদ্র-সমতল জুড়ে। এক ‘সি-সি’ পরিমাণ জলের ভিত্তিতে ওজন-মান নির্ধারণের ভার নিয়োজিলেন বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভুয়সিয়র্।

ডানকার্ক এবং বাসিলোনোর মধ্যকার দূরত্ব নির্ধারণ করার কাজটা ছিল নিতান্তই দৃঃসাধ্য ; কিন্তু বিপ্লব তখন চরমে উঠেছে এবং তা থেকেই এ কাজে প্রচুর সাহায্য পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা জরিপের যেসব খুঁটো পুঁতে যেতেন বা পতাকাচিহ্ন লাগাতেন, প্রায়ই বিপ্লব-বিরোধীরা সেগুলো এদিকে ওদিকে সরিয়ে দিত এবং কখনও কখনও তারা ধরাও পড়ত। এইসব বাধাবিঘোর মধ্যে বিজ্ঞানীরা কাজ চালিয়ে যান এবং ১৭৯৮ সালে তাঁদের জরিপের কাজ সম্পূর্ণ হয়।

এই জরিপের ফল কয়েকটি সমিতির দ্বারা পরীক্ষিত হয় এবং ১৭৯৯ সালের ২২এ জুন চূড়ান্তভাবে 'মিটার'এর মাপ-মান স্থির করে, সেই অনুসারে প্ল্যাটিনামের মাপকাঠি তৈরি করা হয়। 'মিটার' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হয় ১৭৯৩ সালে প্রকাশিত "ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি"র একটি বিবরণীতে। 'মিটার' শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'মেট্রন' থেকে এবং ল্যাটিন ক্রিয়াপদ 'মে' (Me) থেকে—যার অর্থ হচ্ছে মাপা। এই হচ্ছে সংক্ষেপে 'মিটার'-জন্মের ইতিকথা।

ওজন এবং পরিমাণের একক

দৈর্ঘ্যের এককের এই মান-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ওজন এবং পরিমাণের এককও নির্ধারণ করা হয়। স্থির হয় যে, ওজন, পরিমাণ এবং দৈর্ঘ্যের এককের মধ্যকার সম্বন্ধ হবে অপরিবর্তনীয় এবং নির্দিষ্ট।

এক 'মিটার'এর এক-দশমাংশ লম্বা, চওড়া আর গভীর ঘনক্ষেত্রের মধ্যে যতটা ধরে, সেইটাই স্থির হ'ল ধারণক্ষমতার একক-মান 'লিটার'। ওই ঘন-ক্ষেত্রের মধ্যে যতটা জল ধরে, তার সঠিক ওজনের নাম হ'ল 'কিলোগ্রাম'—সেইটাই হ'ল ওজনের একক-মান। 'কিলোগ্রাম'এর যে আদর্শ নমুনা তৈরি করা হ'ল, সেটা হচ্ছে প্ল্যাটিনামের একটা নল—যার ব্যাস ৩৯ মিলিমিটার এবং উচ্চতাও ওই ৩৯ মিলিমিটার।

এই মেট্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন হয় ১৭৯৯ সালে বটে, কিন্তু এটা ঠিক বিধিবদ্ধ প্রথা হিসাবে চালু হয় অনেক পরে—১৮৪০ সালে। এই সময়ের মধ্যে অন্য বহু দেশ এর উপযোগিতা মেনে নিল এবং অনেক দেশ মেট্রিক পদ্ধতি গ্রহণই করল, কাজেই আন্তর্জাতিক যোগাযোগের প্রয়োজন দেখা দিল। ১৮৭০ সালে ফরাসী সরকার এক আন্তর্জাতিক সভা আহ্বান করলেন এবং ৩০টি দেশের প্রতিনিধিরা তাতে যোগদান করলেন। ফরাসী-প্রদূসীয় যুদ্ধের দরুন এই সভার কাজে বাধা ঘটল এবং

আবার ১৮৭২ আর ১৮৭৫ সালে এর অধিবেশন হ'ল। সভায় বিশদ আলোচনায় সকলে একমত হ'লে, "মিটার-চুক্তিপত্র" স্বাক্ষরিত হয় এবং তারই ফলে "ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো অব ওএইট্‌স্ অ্যান্ড মেজারস্" (আন্তর্জাতিক ওজন ও মাপ সংস্থা) নামক প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম কাজ হ'ল 'মিটার' এবং 'কিলোগ্রাম'এর আদর্শ প্রস্তুত করা।

কেন এবং কীভাবে

ভারতে ওজন আর মাপের অবস্থা একেবারেই বিশৃঙ্খল। প্রত্যেক লোকের দৈনন্দিন জীবনে ওজন আর মাপের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি, অথচ মাত্র সাম্প্রতিক কালের আগে এদিকে কোন মনোযোগই দেওয়া হয় নি। চারদিকে তাকালেই এদেশের ওজন আর মাপের মান্ব্যতার আমলী দশাটা দেখতে পাওয়া যায়, আর কী গোলমালে তার অবস্থা তাও বুঝতে পারা যায়। প্রায়ই দেখা যায়, পাথর, কাঠের টুকরো, এমনি সব জিনিস ব্যবহার করা হয় ওজনের বাটখারা হিসাবে, আর অতি বেচপ সব মাটির পাত্র ব্যবহার করা হয় ধারণক্ষমতা মাপের জন্য। সবচেয়ে গোলমালে ব্যাপার হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় মাপ আর ওজন বিভিন্ন রকমের তো বটেই, তা ছাড়া এমনসব জায়গাও আছে যেখানে একই বাজারে এক এক রকম জিনিসের জন্য এক এক রকম ওজন বা মাপের ব্যবস্থা। আবার অনেক ক্ষেত্রে একই নামের এককের মান দেখা যায় আলাদা আলাদা।

এ ব্যাপারে ভারি মজার মজার তথ্য প্রকাশ করেছেন "ন্যাশন্যাল স্যাম্পল সাভে"—ষাঁরা সারা দেশে সামাজিক এবং আর্থনীতিক বিষয়ব্যাপারে তদন্ত করে চলেছেন। এসব তদন্তের কালে দেখা গেছে, সারা দেশে ছড়ানো ১,১০০ গ্রামে ১৪৩ রকম ওজনের পদ্ধতি চালু আছে। ওজন মাপের আর জমি-জরিপের ক্ষেত্রে অবস্থা আরও শোচনীয়। যেমন, 'মণ' চালু আছে একশ'রও বেশি রকমের। বিভিন্ন জায়গায় এক মণ ওজন হচ্ছে ২৮০ থেকে

৮,৩০০ তোলায়। 'তোলা' অবশ্য সাধারণ এক টাকার ওজন। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, এ রকম ৮০ তোলায় এক সের হয়; কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ৮ থেকে ১৬০ তোলায় এক সের হ'তে দেখা যায়। এমনি ক'রে একই নামে প্রচলিত এককের ওজনের মধ্যে জায়গায় জায়গায় এত তফাত দেখা যায় যে, তাতে সাধারণ লোক একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে যায় এবং হতাশ হয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

ওজন, ধারণক্ষমতা, দৈর্ঘ্য, আয়তন এবং পরিমাণের ক্ষেত্রে এ রকম অদ্ভুত দৃষ্টান্ত বহু পাওয়া যায়। সকল স্তরের লোকই এর কুফল ভুগছে, তার মধ্যে চাষীরা ভুগছে সবচেয়ে বেশি। সব জায়গায় একই মানের ওজন চালু না থাকায়, চাষীর পক্ষে তার চাষে উৎপাদিত জিনিস বিক্রি ক'রে ন্যায্য মূল্য না পাবার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। সরল চাষী বাজারের দর বদ্বতে পারে না, কারণ দর বদ্বতে হ'লে, যেখানকার জিনিস, সেখানে সেই জিনিস কী মানের ওজনে বিক্রি হয়, তা জানা দরকার। এসব হিসাবের জটিলতা বোঝার ক্ষমতা সাধারণ চাষীদের নেই, তাই দৃষ্ট ফোড়ে আর কারবারীদের কাছে তারা সহজেই ঠকে যায়।

মান নির্ধারণের প্রয়োজন

এইসব থেকে এটা বেশ পরিষ্কারই বোঝা যায় যে, ওজন এবং মাপের পদ্ধতির সংস্কার করা শুধু যে প্রয়োজন তাই নয়, সে-প্রয়োজনের মাত্রাও অনেক বেশি। এটা হচ্ছে উপকথার "অজিনের আস্তাবল" সাফ করার মত। একজন গ্রীক বীর অসম পরিশ্রমে আর প্রচেষ্টায় একটি নদীর স্রোতকে সেই আস্তাবলের মধ্য দিয়ে বইয়ে দেন এবং তার প্রবল ধাক্কায় ধুয়ে আস্তাবলে সঞ্চিত অনেক কালের ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায়। আমাদেরও তেমনি এক প্রবল শক্তি নিহিত রয়েছে মেট্রিক পদ্ধতির মধ্যে। রাশিয়ার অধ্যাপক খেদালসেনের কথায় এ হচ্ছে "এমন এক মৌলিক শক্তি যাকে দমন করা অসম্ভব"। এ শক্তি ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বৃহত্তর অংশ জয়

ক'রে ফেলেছে এবং আমরা যদি তোরণ উন্মুক্ত ক'রে দিই, তা হ'লে সে বসুন্ধর মতই আমাদের কাছে আসবে এবং আমাদের বর্তমান পদ্ধতির সকল বিশৃঙ্খলা আর পঙ্কিলতা ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে দেবে।

কেন, তার কারণ

সারা দেশের জন্য, এবং সমগ্র পৃথিবীরই জন্য, ওজন এবং মাপের একটা সর্বজনীন পদ্ধতির প্রয়োজন এমনই অপরিহার্য যে, এ বিষয়ে জোর দিয়ে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। এ থেকে নানা দিক দিয়ে উপকার পাওয়া যায়। ওজন ও মাপের বিশৃঙ্খলার দিক থেকে দেখতে গেলে, এতে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুবিধা হবে। আমাদের দেশে শিল্পের যে দ্রুত উন্নতি হচ্ছে, এ থেকে তাতেও শক্তিসম্পন্ন হবে। নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করলে, সারা পৃথিবীতে প্রচলিত একমাত্র পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ যে সুবিধা পাবে, তাতে আমাদের বিশেষ উপকার হবে। বাস্তবিক আন্তর্জাতিক সংযোগের ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতির মত আর কোন-কিছুকেই এমন ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে কিনা সন্দেহ। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, যুক্ত-রাজ্য এবং 'কমনওয়েলথ'-ভুক্ত দেশগুলি ছাড়া পৃথিবীর আর প্রায় সর্বত্রই মেট্রিক পদ্ধতি এখন সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধভাবে প্রচলিত। এমনকি, কমন-ওয়েলথ-ভুক্ত দেশগুলিতেও ইংরেজের "ফুট-পাউন্ড" পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও, মেট্রিক পদ্ধতিকেও আইনত মেনে নেওয়া হয়েছে এবং ক্রমেই এর প্রচলন বেড়ে চলেছে।

মেট্রিক পদ্ধতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সুবিধা হচ্ছে বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে হিসাবের আশ্চর্য সরলতা। ইংরেজী প্রথা অথবা আমাদের ভারতীয় "মণ-সের" প্রথা যেমন এলোমেলো ধরনে গড়ে উঠেছে, মেট্রিক পদ্ধতি তেমন নয়। এ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক, সরল, সমগঠিত, পরস্পর-সম্বন্ধ ওজন আর মাপের পদ্ধতি। অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে এর

সরলতা এবং প্রাধান্যের হেতু হচ্ছে, এ পদ্ধতি
সুসমঞ্জস কাঠামোতে সুদৃঢ়রূপে সংস্থিত।

পার্টীগণিতের হিসাবের দু'টো উদাহরণ এখানে
দেওয়া হ'ল। বর্তমান প্রথায় এবং মেট্রিক পদ্ধতিতে
হিসাবের তুলনা করলেই মেট্রিক পদ্ধতির সংক্ষিপ্ততা
ও সরলতার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

(১) এক সের চিনির দাম ১৩ আনা ৬ পাই হ'লে ৪ সের
৭ ছটাকের দাম কত ?

৫/৬ পাই সের দরে ৪ সেরের দাম

$$= ৫/৬ \times ৪$$

$$= ৩১/৬ আনা$$

$$\begin{array}{r} ৬ \times \\ ৪ \\ \hline ১২) ২৪ \\ \hline ২ - ০ \\ ১৩ \times \\ ৪ \\ \hline ৫২ + \\ ২ \\ \hline ১৬) ৫৪ \\ \hline ৩ - ৬ \end{array}$$

৫/৬ পাই সের দরে ৭ ছটাকের দাম

$$= ১৬২ \times ৭/১৬ পাই।$$

$$\begin{array}{r} ১৩ \times \\ ১২ \\ \hline ১৫৬ + \\ ৬ \\ \hline ১৬২ \times \\ ৭ \\ \hline ১৬) ১১৩৪ \\ \hline ১২) ৭১ \\ \hline ৫ - ১১ \end{array}$$

মোট দাম ৩১/৬ আনা

$$+ ১/১১ পাই$$

$$\hline টা ৩১/১১ পাই$$

ওজনীয় মেট্রিক একক এবং দশমিক মুদ্রার সাহায্যে
প্রকাশ করলে এটা দাঁড়ায় :

এক কিলোগ্রাম চিনির দাম ৯০ নয়া পয়সা হ'লে ৪
কিলোগ্রাম, ১ হেক্টোগ্রাম এবং ৪ ডেকাগ্রাম চিনির দাম কত ?

$$\text{মোট দাম} = ৪ \cdot ১৪ \times ৯০ \text{ টাকা}$$

$$= ৩৭৩ \text{ টাকা}$$

(২) ২৫ গজ ২ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা এবং ১৫ গজ ২ ফুট
৬ ইঞ্চি চওড়া একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত ?

$$\begin{array}{r} \text{দৈর্ঘ্য} = \text{গজ} \quad \text{ফুট} \quad \text{ইঞ্চি} \\ ২৫ \quad ২ \quad ২ \\ \hline = ২৩৩ \text{ ইঞ্চি} \\ ২৫ \times \\ ৩ \\ \hline ৭৫ + \\ ২ \\ \hline ৭৭ \times \\ ১২ \\ \hline ২২৪ + \\ ২ \\ \hline ২৩৩ \text{ ইঞ্চি} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{প্রস্থ} = \text{গজ} \quad \text{ফুট} \quad \text{ইঞ্চি} \\ ১৫ \quad ২ \quad ৬ \\ \hline = ৫৭০ \text{ ইঞ্চি} \\ ১৫ \times \\ ৩ \\ \hline ৪৫ + \\ ২ \\ \hline ৪৭ \times \\ ১২ \\ \hline ৫৬৪ + \\ ৬ \\ \hline ৫৭০ \text{ ইঞ্চি} \end{array}$$

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

$$\text{ক্ষেত্রফল} = ২৩৩ \times ৭৭০ \text{ বর্গ ইঞ্চি}$$

$$= ৭৩১৮০ \text{ বর্গ ইঞ্চি}$$

$$= ৭১১৮০ \div ১২২৬ \text{ বর্গ গজ}$$

$$= ৪১০ \text{ বর্গ গজ।}$$

$$২৩৩ \times$$

$$৭৭০$$

$$\hline ৬৫১০$$

$$৪৬৬৫$$

$$\hline ৫৩১৮১০$$

$$১২২৬) ৫৩১৮১০ (৪১০$$

$$৫১৮৪$$

$$\hline ১৩৪১$$

$$১২২৬$$

$$\hline ৪৫০$$

মেট্রিক পদ্ধতিতে এই আয়তক্ষেত্রের মাপ হচ্ছে : ২৩ মিটার ৭ ডেসিমিটার লম্বা এবং ১৪ মিটার ৪ ডেসিমিটার ৮ সেন্টিমিটার চওড়া।

$$\text{দৈর্ঘ্য} = ২৩.৭০ \text{ মিটার}$$

$$\text{প্রস্থ} = ১৪.৪৮ \text{ মিটার}$$

$$\text{ক্ষেত্রফল} = ২৩.৭০ \times ১৪.৪৮ \text{ মিটার}$$

$$= ৩৪৩.১৮ \text{ বর্গ মিটার}$$

$$১৪.৪৮$$

$$২৩.৭০$$

$$\hline ১০১৩৬০$$

$$৪৩৪৪$$

$$২৮২৬$$

$$\hline ৩৪৩.১৭৬০$$

মেট্রিক পদ্ধতির এককসমূহ

মেট্রিক পদ্ধতির পাঁচটি মূল এককের আন্তর্জাতিক নাম হচ্ছেঃ

দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে—মিটার

আয়তনের ক্ষেত্রে—স্কয়ার (বর্গ) মিটার

পরিমাণের ক্ষেত্রে—কিউবিক (ঘন) মিটার

ওজনের ক্ষেত্রে—কিলোগ্রাম

ধারণক্ষমতার ক্ষেত্রে—লিটার

১৯৫৬ সালের ওজন ও মাপের মান আইনের (১৯৫৬ সালের ৮৯ সংখ্যক বিধি) বলে ভারতে

ওজন ও মাপের মেট্রিক পদ্ধতিকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে। সেই আইনে এই মূল এককগুলির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। মূল এককের গুণিতক এবং ভগ্নাংশগুলির আন্তর্জাতিক আখ্যা হচ্ছেঃ

দৈর্ঘ্য—মাইক্রন, মিলিমিটার, সেন্টিমিটার, ডেসিমিটার, ডেকামিটার, হেক্টোমিটার, কিলোমিটার এবং মিরিঅমিটার।

আয়তন—স্কয়ার (বর্গ) মিলিমিটার, স্কয়ার (বর্গ) সেন্টিমিটার, ইত্যাদি।

পরিমাণ—কিউবিক (ঘন) মিলিমিটার, কিউবিক (ঘন) সেন্টিমিটার ইত্যাদি।

ওজন—মাইক্রোগ্রাম, মিলিগ্রাম, সেন্টিগ্রাম, ডেসিগ্রাম, ডেকাগ্রাম, হেক্টোগ্রাম, কিলোগ্রাম, কুইন্টাল এবং মেট্রিক টন।

ধারণক্ষমতা—মাইক্রোলিটার, মিলিলিটার, সেন্টিলিটার, ডেসিলিটার, ডেকালিটার, হেক্টোলিটার এবং কিলোলিটার।

উপরের তালিকা থেকে বোঝা যাবে যে, মূল এককের পূর্বে ‘মিলি’, ‘সেন্টি’, ‘ডেসি’, ‘ডেকা’ বা এমনি একটি যথায়োগ্য উপপদ যোগ করে গুণিতক বা ভগ্নাংশ গঠন করতে হয়। সেই উপপদটি থেকেই মূল একক আর উপ-এককের মধ্যকার সম্পর্ক বোঝা যায়।

প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, মেট্রিক এককগুলির জন্য আমাদের হিন্দী নাম তৈরি করা উচিত, কিন্তু লোকসভার ‘জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি’ সতর্কভাবে প্রস্তাবটির সব খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে সুপারিশ করেছেন যে, ভারতেও সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক নাম-তালিকাই গ্রহণ করতে হবে। লোকসভা সেই সুপারিশ মেনে নিয়েছেন, সুতরাং, আইনে শুধু আন্তর্জাতিক নাম-তালিকাই ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রণালীর রূপান্তর

ভারত-সরকার, এদেশে মেট্রিক প্রণালীর প্রচলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরিকল্পনা কমিশনের

সুপারিশসমূহ কার্যকরী করতে শুরুর করেন। প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবে, ভোগ্যপণ্য শিল্পের মন্ত্রমহোদয়কে চেয়ারম্যান করে একটি স্ট্যান্ডিং মেট্রিক কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিতে সংযোগ, প্রতিরক্ষা, অর্থ, খাদ্য এবং কৃষি, আইন, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্ত্রক এবং পরিকল্পনা কমিশন ও ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউশনের প্রতিনিধি নেওয়া হয়েছে। উক্ত কমিটির উপর মেট্রিক প্রণালীতে রূপান্তর সম্পর্কিত খুঁটিনাটি কাজ এবং দ্রুত ও সুস্থলভাবে এই পরিবর্তন সাধন করার ভার দেওয়া হয়েছে।

ফলিতার্থ

এই রূপান্তর সাধনের ফলে বহু সমস্যার উদ্ভব হবে এবং সবগুলির দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। এজন্য জনসাধারণকে এ সম্পর্কে ওয়াকিফ-হাল করে তোলার উদ্দেশ্যে এর প্রচার এবং তাদের এই প্রণালীর সুযোগসুবিধার কথা জানিয়ে দেওয়া আবশ্যিক। নতুন ওজন ও মাপ পর্যাণ্ত পরিমাণে সরবরাহের দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। আবার আমাদের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপান্তর কর্মসূচির সমন্বয় সাধনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এক ক্ষেত্রে এই সংস্কারকার্যের দ্রুততা ও অন্য ক্ষেত্রে এর মন্থরতার ফলে অন্তহীন জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে।

সংস্কারের জন্য আইন

বৈধ এবং সর্বজনীন প্রণালী হিসেবে আলোচ্য প্রণালীকে বলবৎ করার জন্য আইনের অনুমোদন লাগবে। সমগ্র দেশেই এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে বলে প্রত্যেকটি রাজ্যসরকারেরই এ বিষয়ে সহযোগিতার আবশ্যিক হবে। সেজন্য সংসদে এ সম্পর্কে এক খসড়া বিল আনা হয়। “ওজন ও মাপের ভারতীয় মান বিল” নামক এই আইনটি সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়। ১৯৫৬ সালের ২৮ এ ডিসেম্বর তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করলে

এটি “ওজন ও মাপের মান আইন, ১৯৫৬” (১৯৫৬ সালের ৮৯নং আইন)-এ পরিণত হয়।

এই আইনে সরকারকে মেট্রিক প্রণালী প্রবর্তনের ক্ষমতা দিয়ে বলা হয়েছে যে, “এই আইন গৃহীত হবার দশ বৎসর অতিক্রান্ত হবার আগেই কেন্দ্রীয় সরকার যে তারিখ নির্ধারিত করেন সেই তারিখে বলবৎ করা হবে”। এই আইনে এর বিভিন্ন বিধান বা বিভিন্ন অঙ্গল বা বিভিন্ন কার্য বা বিভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্যের জন্য বিভিন্ন তারিখ নির্ধারণেরও বিধান করা হয়েছে। সীমিতভাবে এই প্রণালীর প্রবর্তনের তারিখ হিসেবে স্ট্যান্ডিং মেট্রিক কমিটি ১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিলকে সুপারিশ করেছেন। ইতিমধ্যে মদ্রা-ব্যবস্থায় পরিপূরক সংস্কার (দশমিক মদ্রা প্রবর্তন) ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে শুরুর হয়েছে।

এই ব্যাপারে যাতে সকল রাজ্যই একটি অখণ্ড কর্মসূচি অনুসরণ করে তা দেখা দরকার। রাজ্য-গুলিতে ওজন ও মাপকে বলবৎ করার সাংবিধানিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নাই। সংবিধানে এই ব্যাপারটিকে রাজ্য-সূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এই সম্পর্কে রাজ্যগুলির একচেটিয়া অধিকার রয়েছে। অধিকাংশ রাজ্যেই এই প্রণালী বলবৎ করার বিধি রচিত হয়েছে।

প্রচার

মেট্রিক প্রণালী আর এর সুযোগসুবিধার বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য সরকারের প্রচার-কার্যের প্রয়োজন। এই সংস্কারের সাফল্যের জন্য জনগণের পরিপূর্ণ ও অবাধ সহযোগিতা চাই। এজন্য সংবাদপত্র, প্রচারপুস্তিকা, রেডিও, ফিল্ম এবং প্রদর্শনীকে কাজে লাগাতে হবে।

ওজন এবং মাপ সরবরাহ

আলোচ্য সংস্কারের ফলে দেশের প্রতিটি লোকের জীবনে কিছু-না-কিছু প্রভাব পড়বে, সমস্যাও উদ্ভূত হবে বিস্তর। সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, ভারতের নিভৃততম পল্লী-অঞ্চলে পর্যাপ্ত

পরিমাণে ওজন ও মাপ সরবরাহ। লক্ষ লক্ষ বাটখারা ও মাপ উৎপাদন করাও সহজ কাজ নয়। তারপর, এই উৎপাদনের কার্যসূচি রূপায়িত করার যে সময় তাও নির্দিষ্ট। কাজেই উপযুক্ত পরিকল্পনা আর সংগঠনের প্রয়োজন খুবই জরুরী। বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক ওজন ও মাপ, যথা—পিতলের বাটখারা, ঢালাই লোহর বাটখারা, ভর্তি করার মগ ও পাত্র, নিষ্টি, পরিমাপ-দণ্ড এবং মাইক্রোমিটার বহুলপরিমাণে উৎপাদনের ভার দিতে হবে বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওপর। অবশ্য অর্ডিন্যান্স কারখানাগুলোর মত সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেখানে অতিরিক্ত সামর্থ্য ও কর্মী রয়েছে, সেইসব জায়গাতেও উক্ত কাজের কিছু অংশের ভার দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বোঁশির ভাগ কাজই বেসরকারী উৎপাদকদের দিয়ে করতে হবে। তবে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে বৈধভাবে ব্যবহৃত হবার আগে ঐসব বাটখারা ও মাপ সরকারকে পরীক্ষা করে প্রামাণ্য করে নিতে হবে। ভারতীয় মান-প্রতিষ্ঠান নকশা আর সর্বিস্তার বিবরণী দেবেন।

ওজন ও দৈর্ঘ্যের মূল আদর্শ

‘মিটার’ আর ‘কিলোগ্রাম’এর আন্তর্জাতিক মূল আদর্শ সেন্সেস-এর (ফ্রান্স) “ইন্টারন্যাশন্যাল ব্যুরো অফ ওএইটস অ্যান্ড মেজাস”-এ গচ্ছিত আছে। যেসব দেশে মেট্রিক প্রণালী প্রচলিত আছে তাদের সকলকে নিজস্ব জাতীয় মূল আদর্শ রাখতে হয়। এইসব জাতীয় নমুনার উপরেই তাদের বাণিজ্যিক ওজন ও মাপ প্রতিষ্ঠিত। ঐসব জাতীয় নমুনা আন্তর্জাতিক নমুনা বা মূল আদর্শ অনুষঙ্গী যতদূর সম্ভব সঠিক এবং “ইন্টারন্যাশন্যাল ব্যুরো অফ ওএইটস অ্যান্ড মেজাস” কর্তৃক পরীক্ষিত এবং প্রমাণীকৃত হওয়া চাই। উক্ত ব্যুরো কেবলমাত্র তার সদস্য-দেশগুলোর পক্ষেই ঐ পরীক্ষাকার্য করে থাকে। সম্প্রতি ভারতও উক্ত ব্যুরোর সদস্য হয়েছে।

উক্ত ব্যুরোর মারফত জাতীয় নমুনাসমূহ পাওয়া যাবে ও সেগুলিকে নয়াদিগ্লির “ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি”তে রক্ষা করা হবে।

রাজ্যসমূহের নিজস্ব নির্দেশমান থাকবে। সেগুলি ভারত-সরকারের টাঁকশালে প্রস্তুত হবে এবং সেগুলি “ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি” কর্তৃক যথার্থ বলে প্রমাণীকৃত হওয়া চাই।

রাজ্যসমূহে বাণিজ্যিক ওজন এবং মাপ পরীক্ষার জন্য পরিদর্শকদের ব্যবহারার্থ বহুলপরিমাণে কার্যকরী মানও প্রস্তুত করা হবে।

বলবৎকরণ

দেশের বৃহত্তর অংশে মেট্রিক প্রণালী বলবৎ করার ব্যবস্থা এখনও হয় নি। বোম্বাইএর মত কয়েকটি রাজ্যে ইতিমধ্যেই এ প্রণালী কার্যকরী করার জন্য সংস্থা গঠিত হয়েছে। ভারতের মত বিরাট দেশে উক্ত ব্যবস্থা কার্যকরী করার সংস্থাগুলিকেও বৃহদায়তন এবং যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে। স্ব স্ব অধিকার ক্ষেত্রে যেসব ওজন ও মাপ ব্যবহৃত হয় সেগুলির যথার্থ্য পরীক্ষা করা হবে তাদের কাজ।

নতুন ওজন ও মাপ

মেট্রিক ওজন ও মাপের নতুন পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের ওজন থাকবে এবং সেগুলি সম্পর্কে ভ্রান্তি নিরসনের জন্য প্রত্যেকেরই সেসব ওজন ও মাপ জানা দরকার। নিচে সেইসব ওজন ও মাপের বিবরণ দেওয়া হল :

(ক) নিরেট ধাতব বাটখারা

কিলোগ্রাম (কে-জি) শ্রেণী

ঢালাই লোহা ও পেটা ইস্পাতের বাটখারা	পিতল ও বোঞ্জের বাটখারা
৫০	২০
২০	১০
১০	৫
৫	২
২	১
১	

গ্রাম (জি) শ্রেণী

ঢালাই লোহা ও পেটা
ইম্পাতের বাটখারা

৫০০
২০০
১০০

পিতল ও ব্রোঞ্জের
বাটখারা

৫০০
২০০
১০০
৫০
২০
১০
৫
২
১

(খ) ধাতব চাদরের বাটখারা

মিলিগ্রাম (এম-জি) শ্রেণী

৫০০ ৫০ ৫
২০০ ২০ ২
১০০ ১০ ১

মাপ

ফাঁদালো মাপ

ডোবাবার উপযুক্ত

১ লিটার

৫০০ মিলিলিটার

২০০ " ৫০০ মিলিলিটার

১০০ " ২০০ " ২ " "

৫০ " ১০০ " ১ " "

২০ " ৫০ " ৫০০ মিলিলিটার

২ লিটার

১ " "

২০০ " ২ " "

১০০ " ১ " "

৫০ " ৫০ " ৫০০ মিলিলিটার

২০ " ২০০ " ১০০ "

কোণাকৃতি মাপ

ঢালার উপযুক্ত

২০ লিটার

১০ " "

৫ " "

২ " "

১ " "

৫০০ মিলিলিটার

২০০ " ১০০ "

[কমিশিয়াল লিনিয়ার মাপ প্রস্তুত হচ্ছে]

পরিবর্তন উপাদান

সহজে বোঝার জন্য নিচে বর্তমান ও মেট্রিক
ইউনিটের পরিবর্তন উপাদান (কনভার্সান
ফ্যাক্টর) দেওয়া হ'ল:

দৈর্ঘ্য

কিলোমিটার=০.৬২ মাইল=১.৬১ কিলো-
মাইল। মিটার।

মিটার=১.০৯ গজ গজ=০.৯১ মিটার

সেন্টিমিটার=০.৩৯ ইঞ্চি

মিলিমিটার=০.০৪ ইঞ্চি=২৫.৪ মিলি-

মিটার (সঠিক)।

ক্ষেত্র

বর্গ কিলোমিটার= বর্গ মাইল=২.৫৯

০.৩৯ বর্গ মাইল। বর্গ কিলোমিটার।

হেক্টর (১০,০০০ বর্গ-
মিটার)=২.৪৭

একর।

বর্গ মিটার=১.২০ বর্গ গজ=০.৮৪ বর্গ-

বর্গ গজ। মিটার।

ঘনফল

কিউবিক মিটার= কিউবিক গজ=

১.৩১ কিউবিক ৫.৭৬ কিউবিক
গজ। মিটার।

ধারণক্ষমতা

লিটার=০.২২ ইম্পি- ইম্পিরিয়াল গ্যালন=
রিয়াল গ্যালন। ৪.৫৫ লিটার।

ওজন

মেট্রিক টনে (Tonne) টন=১.০২ মেট্রিক
=০.৯৮ টন। টনে (Tonnes)

কুইন্টাল=১.৯৭ হাণ্ড্রেডওয়েটস=
হাণ্ড্রেডওয়েটস। ০.৫১ কুইন্টাল।

কুইন্টাল=২.৬৮ মণ মণ=০.৩৭ কুইন্টাল

কিলোগ্রাম=১.০৭ সের=০.৯৩ কিলো-
সের। গ্রাম।

কিলোগ্রাম=২.২০ পাউণ্ড=০.৪৫
পাউণ্ড। কিলোগ্রাম।

গ্রাম=০.০৯ তোলা তোলা=১১.৬৬ গ্রাম

[ভারতীয় মানক সংস্থা প্রকৃত পরিবর্তন
তালিকা প্রকাশ করেছেন। তাতে সঠিক
পরিবর্তন উপাদান দেখা যেতে পারে]

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

পরিশিষ্ট ১

১৯৫৬ সালের ওজন ও মাপের মান আইন

১৯৫৬ সালের ৮৯ সংখ্যক

[২৮এ ডিসেম্বর, ১৯৫৬]

সংক্ষিপ্ত অর্থ্যা, ব্যাপ্তি এবং সূচনা

মোট্রিক পদ্ধতির ভিত্তিতে ওজন ও মাপের মান প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে এই আইন ভারতের গণ-তন্ত্রের সপ্তম বৎসরে লোকসভ কতৃক বিধিবদ্ধ হোক :

১। (১) এই আইন “১৯৫৬ সালের ওজন ও মাপের মান আইন” নামে অভিহিত হতে পারে।

(২) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ছাড়া ভারতের সর্বত্র এর ব্যাপ্তি।

(৩) এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার অনধিক দশ বৎসরের মধ্যে এমন কোন তারিখ থেকে এ আইন

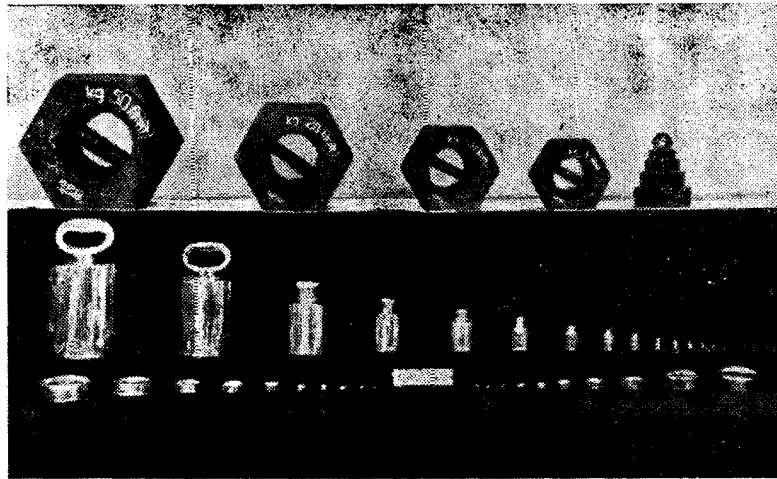
করার জন্য বা বিভিন্ন শ্রেণীর দায়িত্বের ক্ষেত্রে এটা চালু করার জন্য কিংবা বিভিন্ন শ্রেণীর জিনিসের উপর এটা চালু করার জন্য বিভিন্ন তারিখ নির্ধারিত হতে পারে।

সংজ্ঞা

২। এই আইনে, যদি এর সূত্রে অন্য রকম প্রয়োজন না হয়,—

(ক) “ওজন ও মাপের প্রথম সাধারণ সভা” অর্থে ১৮৮৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ওজন ও মাপ সংক্রান্ত সভা (Conference Generale des poids et Mesures) ;

(খ) “ওজন এবং মাপের আন্তর্জাতিক সংস্থা” অর্থে ফরাসী দেশের সেন্সেস-এ অবস্থিত আন্তর্জাতিক ওজন ও মাপ সংস্থা (Bureau Internationale des poids et Mesures) ;



মোট্রিক ওজনের বাটখারা

বলবৎ হবে—যে তারিখটি ভারত-সরকার কতৃক নির্ধারিত হয়ে সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপিত হবে ; এবং এই বিধির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা চালু করার জন্য অথবা বিভিন্ন অঞ্চলে এই বিধি চালু

(গ) “কিলোগ্রাম” অর্থে ওজন ও মাপের প্রথম সাধারণ সভা কতৃক কিলোগ্রামের নমুনা বলে ঘোষিত এবং ওজন ও মাপের আন্তর্জাতিক সংস্থায় রক্ষিত প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়ামের তৈরি নল ;

(ঘ) “মিটার” অর্থে ওজন ও মাপের সাধারণ সভা কর্তৃক মিটারের আন্তর্জাতিক নমুনা বলে ঘোষিত এবং ওজন ও মাপের আন্তর্জাতিক সংস্থায় রক্ষিত প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়ামের তৈরি কাঠির উপর চিহ্নিত মধ্যবর্তী রেখাগুলির দুইটির মধ্যে, শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে এবং আবহাওয়ার স্বাভাবিক চাপে, যে দূরত্ব, তার মাপ ;

(ঙ) “আবহাওয়ার স্বাভাবিক চাপ” অর্থে সেই চাপ যা প্রতি বর্গ মিটারে ১০১৩২৫ নিউটনের দ্বারা পড়ে, এবং নিউটন হচ্ছে সেই শক্তি যা এক কিলোগ্রাম ওজনকে এক সেকেন্ডে এক মিটার গতি দিতে পারে।

দৈর্ঘ্যের প্রাথমিক একক

৩। (১) দৈর্ঘ্যের প্রাথমিক একক হবে এক মিটার।

(২) মিটারের মাপ ঠিক ক’রে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার মিটারের একটা জাতীয় নমুনা তৈরি করিয়ে মিটারের আন্তর্জাতিক নমুনা অনুযায়ী তাকে নির্দেশিত করিয়ে নেবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যোগ্য বিবেচিত স্থানে তা রক্ষিত হবে।

ওজনের প্রাথমিক একক

৪। (১) ওজনের প্রাথমিক একক হবে এক কিলোগ্রাম।

(২) কিলোগ্রামের মাপ ঠিক ক’রে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কিলোগ্রামের একটা জাতীয় নমুনা তৈরি করিয়ে কিলোগ্রামের আন্তর্জাতিক নমুনা অনুযায়ী তাকে নির্দেশিত করিয়ে নেবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যোগ্য বিবেচিত স্থানে তা রক্ষিত হবে।

(৩) এই ৪র্থ ধারার (১)-এর উপধারায় এবং ১২শ ধারায় যা-ই থাকুক না কেন, তা সত্ত্বেও মূল্যবান পাথরের ওজনের একক হবে “ক্যারাট”—যা এক কিলোগ্রামের পাঁচ হাজার ভাগের এক ভাগের সমান।

(৪) যে-কোন জায়গায় ওজনের নির্ধারিত একক হবে সেই জায়গার ওজনের প্রাথমিক একক।

সময়ের একক

৫। (১) সময়ের প্রাথমিক একক হবে এক সেকেন্ড।

(২) এক “সেকেন্ড” অর্থে ১৯০০ সালের সর্বজনীন রাত ১২টায় ১লা জানুয়ারি শুরুর হয়ে পৃথিবীর অয়নান্ত-বৃন্ত-অংশে যে এক বৎসর (Tropical year) হয়েছে সেই ১৯০০ সালের সম্পূর্ণ সময়ের ৩,১৫,৫৬,৯২৫:৯৭৫ ভাগের এক ভাগ।

বৈদ্যুতিক প্রবাহের একক

৬। (১) বৈদ্যুতিক প্রবাহের একক হবে “অ্যাম্পিয়ার”।

(২) ‘অ্যাম্পিয়ার’ অর্থে সেই অবিরাম প্রবাহকে বোঝায় যা অসীম দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট, নগণ্য বৃত্তাকার প্রতিচ্ছেদযুক্ত (cross-section) এবং বায়ুশূন্য স্থানে পরস্পর থেকে এক মিটার ব্যবধানে অবস্থিত দুইটি সমান্তরাল সরল বিজলীদণ্ডের মধ্য দিয়ে বয়ে বিজলীদণ্ড-দুইটির মাঝখানে প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে 2×10^{-9} নিউটন শক্তি উৎপাদন করে।

তাপের মাপ

৭। তাপের মাপ হবে “সেন্টিগ্রেড” মাপ, যাকে অন্য কথায় বলা হয় “সেল্‌সিয়াস্”। এতে স্বাভাবিক আবহাওয়ার চাপে যে তাপে বরফ গলে তাকে ধরা হয় শূন্য ডিগ্রি এবং যে তাপে জল ফোটে তাকে ধরা হয় ১০০ ডিগ্রি।

আলোর ব্যাপ্তি

৮। (১) আলোর ব্যাপ্তির একক হবে “ক্যান্ডেলা”।

(২) যে তাপে প্ল্যাটিনাম কঠিন হয়, তাতে অখন্ড বিকিরকের (কালো) এক সেন্টিমিটার সম-চতুষ্ৰুপ দ্বারা স্বাভাবিকভাবে নিঃসৃত আলোক-ব্যাপ্তির ষোলো ভাগের এক ভাগ হচ্ছে এক ‘ক্যান্ডেলা’।

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

আয়তনের প্রাথমিক একক

৯। আয়তক্ষেত্রের প্রাথমিক একক হবে “বর্গ মিটার”।

পরিমাপের প্রাথমিক একক

১০। পরিমাপের প্রাথমিক একক হবে “ঘন মিটার”।

ধারণক্ষমতার একক

১১। ধারণক্ষমতার একক হবে লিটার। এক কিলোগ্রাম ওজনের বায়ুশূন্য জল তার চরম ঘনত্বের তাপে এবং স্বাভাবিক আবহাওয়ার চাপে যতখানি জায়গাতে ধরে, তারই মাপ হচ্ছে এক লিটার।

ওজন ও মাপের মাধ্যমিক একক

১২। এই আইনের ৩, ৪, ৯, ১০ ও ১১ ধারায় ওজন এবং মাপের একক সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে সংযোগ রেখে কেন্দ্রীয় সরকার ওজন ও মাপের মাধ্যমিক একক হিসাবে তাঁদের বিবেচনায় যথাযোগ্য আয়তন ও নাম সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা ঘোষণা করতে পারবেন—এই শর্তে যে,

এ রকম প্রত্যেক মাধ্যমিক একক হবে, এ রকম যে-কোন এককের অখণ্ড দশম শক্তি (ইতিবাচক বা নেতিবাচক)।

ওজন ও মাপের মান

১৩। (১) এই আইনের ৩, ৪, ৯, ১০ ও ১১ ধারায় ওজন ও মাপের যে যে এককের কথা বলা হয়েছে এবং ১২ ধারায় ওজন ও মাপের যে মাধ্যমিক এককের কথা বলা হয়েছে, সেগুলিই হবে ওজন ও মাপের নির্ধারিত মান।

উক্ত (১)-এর উপধারায় ওজন ও মাপের যে এককের কথা বলা হ’ল, তা ছাড়া ওজন ও মাপের আর কোন একক ওজন ও মাপের নির্ধারিত মান হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না।

পরিবর্তনকালে ওজন ও মাপের কোন কোন রীতি চালু থাকে

১৪। (১) কোন অঞ্চলের বা কোন শ্রেণীর জিনিসের অথবা কোন দায়িত্বের ক্ষেত্রে এই আইন বলবৎ হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ওজন ও মাপের নির্ধারিত মান ছাড়াও ইতঃপূর্বে সেই অঞ্চলে বা সেই শ্রেণীর জিনিসের বা সেই দায়িত্বের ক্ষেত্রে ওজন ও মাপের যে মান চালু ছিল, বিজ্ঞপ্তির দিন থেকে অনধিক তিন বৎসরের জন্য ওজন ও মাপের সেই মান চালু রাখার অনুমতি দিতে পারবেন। তিন বৎসরের কম সময়ের জন্য অনুমতি দেওয়া হ’লে গেজেটে সেই নির্দিষ্ট সময়েরও উল্লেখ থাকবে।

(২) উক্ত (১)-এর উপধারার কোন কিছু থেকেই এমন মনে করা চলবে না যে, এই আইন চালু হওয়ার ঠিক আগে কোন জায়গায় ওজন ও মাপের যে রীতি চালু ছিল তা ছাড়া পরিবর্ত-রীতি হিসাবে আর কোন রীতি চালু করার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের আছে।

ওজন ও মাপের নির্ধারিত মান অনুযায়ী বাটখারা ও মাপকাঠি আদি

১৫। (১) কেন্দ্রীয় সরকার ১৩শ ধারায় বর্ণিত মান অনুযায়ী ওজন ও মাপের বাটখারা আদির যতগুলো প্রস্থ প্রয়োজন মনে হয় ততগুলো প্রস্থ তৈরি করাবেন এবং মান অনুযায়ী গুণিতকসূচক ও ভগ্নাংশসূচক বাটখারা আদি যতগুলো প্রস্থ দরকার মনে হয় ততগুলো প্রস্থ তৈরি করাবেন, এবং প্রতিটি বাটখারা বা মাপক মূল প্রাথমিক একক অনুযায়ী সঠিক প্রামাণ্য করে নেবেন।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক রাজ্যসরকারকে এসব বাটখারা ও মাপক আদির যতগুলো প্রস্থ প্রয়োজন বোধ করেন ততগুলো প্রস্থ সরবরাহ করবেন।

বর্তমান ওজন ও মাপকে নির্ধারিত মানের ওজনে ও মাপে পরিবর্তিত করা

১৬। (১) ১৯৩৯ সালের ওজনের মান আইনের (১৯৩৯ সালের ৯ম আইন) ৩য় ধারার ১ম উপ-ধারায় কোন ওজনের যে মূল্য নির্দেশিত হয়েছে অথবা ইঞ্চি, ফুট, গজ, মাইল বা গ্যালনের হিসাবে যে মাপ নির্দেশিত হয়েছে, এখানে প্রথম তালিকায় ওজন ও মাপের নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী সেসবের পরিবর্তন করতে হবে। (প্রথম তালিকা পরে দেওয়া হয়েছে।)

(২) উক্ত (১)-এর উপধারায় যেসব ওজন ও মাপ দেওয়া হয়েছে, এ ছাড়া আর কোন ওজন ও মাপকে যদি নির্ধারিত মানের ওজন ও মাপে পরিবর্তিত করার দরকার হয়, তবে কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তারও বিশেষ হারের নির্দেশ দিতে পারবেন।

(৩) কোন আইনের অধীন কোন বিধানে, বিজ্ঞপ্তিতে, নিয়মে বা আদেশে অথবা কোন চুক্তিতে, দলিলে বা অন্য কিছুতে নির্ধারিত মানের ওজন বা মাপ ছাড়া অপর কোন রীতির ওজন বা মাপ অনুযায়ী মূল্য ধরার সমস্ত নজির প্রথম তালিকায় অথবা (২)-এর উপধারা-বলে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বিশেষভাবে প্রদর্শিত হার অনুযায়ী পরিবর্তিত নজির রূপে ব্যাখ্যাত হবে।

(৪) কোন লেনদেনে ওজন ও মাপের অপর কোন রীতি অনুযায়ী মূল্য ধরা হলে, তা এই ধারার অধীন ওজন ও মাপের নির্ধারিত মান অনুযায়ী পরিবর্তিত করার প্রয়োজন হবে; এ রকম লেনদেনের উদ্দেশ্যে বিধি-ব্যবস্থিত উপায়ে হিসাব তৈরি করতে হবে।

নিয়ম রচনার ক্ষমতা

১৭। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা নিয়মসমূহ রচনা করতে পারবেন।

(২) বিশেষত, এবং পূর্বোক্ত ক্ষমতার মূল্য অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে, এ রকম নিয়মসমূহের দ্বারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলির বা তার কোন একটার জন্য ব্যবস্থা করা যেতে পারে:—

(ক) ১৫শ ধারার অধীনে ওজন ও মাপের নির্ধারিত মান অনুযায়ী বাটখারা আদি প্রস্তুত করা;

(খ) কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারে সংরক্ষিত ওজন ও মাপের বাটখারা আদির তত্ত্বাবধান করা, মাঝে মাঝে সেগুলি ঠিক আছে কিনা দেখা এবং ঠিক না থাকলে সেগুলির যথা-যথ সংশোধন;

(গ) রাজ্যসরকারগুলিকে ওজন ও মাপের যেসব বাটখারা আদি দেওয়া হবে, সেগুলি ঠিক আছে কিনা তা মাঝে মাঝে দেখা এবং ঠিক না থাকলে সেগুলির যথাযথ সংশোধন;

(ঘ) সাধারণ অথবা বিশেষশ্রেণীর কোন লেনদেনের কাজে ওজন ও মাপের নির্ধারিত মান অনুযায়ী যেসব বাটখারা প্রভৃতি ব্যবহৃত হচ্ছে, অথবা ব্যবহৃত হওয়ার জন্য যেসব বাটখারা আদি প্রস্তুত করা হয়েছে, সেগুলোর সংক্রান্ত কতখানি ভুলচুক উপেক্ষা করা যেতে পারে, তার সীমা;

(ঙ) ওজন ও মাপের নির্ধারিত মান ছাড়া অন্য কোন রীতি অনুযায়ী যেখানে মূল্য ধরা হয়েছে, সেখানে সেই মূল্যকে যে উপায়ে নির্ধারিত মান অনুযায়ী পরিবর্তিত করতে হবে, তা স্থির করা;

(চ) অন্য যে-কোন বিষয় যার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করতে হবে বা করা যেতে পারে।

(৩) এই আইনের অধীনে রচিত সমস্ত নিয়ম, রচিত হওয়ার পরেই যথাসম্ভব সত্তর, অন্যান্য ত্রিশ দিনের জন্য সংসদের উভয় সভার সমক্ষে স্থাপন করতে হবে এই শর্তে যে, তার স্থাপনকালে যে অধিবেশন চলছে, অথবা কোন অধিবেশন চলতে

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

না থাকলে, অব্যবহিত পরেই যে অধিবেশন হবে, তাতে আবশ্যকমত তার রদবদল হবে।

বাতিল

১৮। (১) ১৮৮৯ সালের দৈর্ঘ্যের পরিমাপ আইন (১৮৮৯ সালের ২য় আইন) এবং ১৯৩৯ সালের ওজনের মান আইন (১৯৩৯ সালের ৯ম আইন) এতদ্বারা বাতিল হ'ল।

(২) দ্বিতীয় তালিকায় যে আইনগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে যেসকল ব্যবস্থা বর্তমান আইনের ব্যবস্থার অনুরূপ, সেসকল ব্যবস্থা বাতিল ব'লে গণ্য। (২য় তালিকা ১ম তালিকার পরে দেওয়া হয়েছে।)

(৩) এই আইনের অথবা এর কোন ব্যবস্থার সূচনার অব্যবহিত পূর্বে যদি কোন অঞ্চল বা কোন শ্রেণীর দ্রব্য বা কোন দায়িত্বের সূত্রে এমন কোন ব্যবস্থা বলবৎ থাকে যা সেই অঞ্চলের বা সেই শ্রেণীর দ্রব্যের বা সেই দায়িত্বের সূত্রে বর্তমান আইনের ব্যবস্থার অনুরূপ, এবং যদি (১)-এর উপধারার বা (২)-এর উপধারার দ্বারা তা বাতিল না হয়, তবে তা বাতিল ব'লে গণ্য।

প্রথম তালিকা

[১৬(১) ধারা দ্রষ্টব্য]

ওজনের মান

- ১ গ্রেন=০.০০০০৫৪৭৯৯ কিলোগ্রাম
- ১ আউন্স=০.০২৮৩৪৯৫ কিলোগ্রাম
- ১ পাউন্ড=০.৪৫৩৫৯২৪ কিলোগ্রাম
- ১ হন্দর=৫০.৮০২ কিলোগ্রাম
- ১ টন=১০১৬.০৫ কিলোগ্রাম
- ১ তোলা=০.০১১৬৬৩৮ কিলোগ্রাম
- ১ সের=০.৯৩৩১০ কিলোগ্রাম
- ১ মণ=৩৭.৩২৪২ কিলোগ্রাম

দৈর্ঘ্য এবং ধারণক্ষমতার মান

- ১ ইঞ্চি=০.০২৫৪ মিটার (সঠিক)
- ১ ফুট=০.৩০৪৮ মিটার (সঠিক)

১ গজ=০.৯১৪৪ মিটার (সঠিক)

১ মাইল=১৬০৯.৩৪৪ মিটার (সঠিক)

১ ইম্পিরিয়াল গ্যালন=৪.৫৪৫৯৬ লিটার

দ্বিতীয় তালিকা

[১৮(২) ধারা দ্রষ্টব্য]

- ১। আসাম ওজন-মান গ্রহণ আইন, ১৯৫৫ (১৯৫৫ সালের ৯ম আইন)
- ২। ভূপাল রাজ্য ওজন ও মাপ আইন, ১৯৫৩ (১৯৫৩ সালের ১৫শ আইন)
- ৩। বিহার ওজন আইন, ১৯৪৭ (১৯৪৭ সালের ১৭শ আইন)
- ৪। বোম্বাই ওজন ও মাপ আইন, ১৯৩২ (১৯৩২ সালের ১৫শ আইন)
- ৫। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ওজন ও ধারণক্ষমতার মাপ আইন, ১৯২৮ (১৯২৮ সালের ২য় আইন)
- ৬। কোচিন ওজন ও মাপ আইন, ১৯১২ (স্থানীয়) [১৯১২ (স্থানীয়) সালের ৬৩তম আইন]
- ৭। কুর্গ আইন, ১৯৫৪ (১৯৫৪ সালের ৭ম আইন)
- ৮। হায়দরাবাদ ওজন ও মাপ আইন, ১৩৫৬ ফসলী (১৩৫৬ ফসলী সালের ১৬শ আইন)
- ৯। মধ্যভারত ওজন আইন, ১৯৫৪ (১৯৫৪ সালের ২১শ আইন)
- ১০। মাদ্রাজ ওজন ও মাপ আইন, ১৯৪৮ (১৯৪৮ সালের ২২শ আইন) মাদ্রাজ বা অন্তর্ভুক্ত রাজ্যে যেমন বলবৎ আছে।
- ১১। মহীশূর ওজন ও মাপ আইন, ১৯০২ (১৯০২ সালের ৩য় আইন)
- ১২। উড়িষ্যা ওজন ও মাপ আইন, ১৯৪৩ (১৯৪৩ সালের ৭ম আইন)

১৩। পাজাব ওজন ও মাপ আইন, ১৯৪১
(১৯৪১ সালের ১২শ আইন)

১৫। দ্বিবাঙ্কুর ওজন ও মাপ আইন, ১০৮৫
(স্থানীয়) [১০৮৫ (স্থানীয়) সালের
৬ষ্ঠ আইন]

১৪। রাজস্থান ওজন ও মাপ আইন, ১৯৫৪
(১৯৫৪ সালের ১৯শ আইন)

১৬। যুক্তপ্রদেশ ওজন ও মাপ আইন, ১৯৪৭
(১৯৪৮ সালের ২৩শ আইন)

সহজ পরিবর্তন তালিকা

১। দৈর্ঘ্য

মাইল থেকে কিলোমিটার

মাইল	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কিলোমিটার	১.৬১	৩.২২	৪.৮৩	৬.৪৪	৮.০৫	৯.৬৬	১১.২৭	১২.৮৮	১৪.৪৮	১৬.০৯

গজ থেকে মিটার

গজ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মিটার	০.৯১	১.৮৩	২.৭৪	৩.৬৬	৪.৫৭	৫.৪৯	৬.৪০	৭.৩২	৮.২৩	৯.১৪

ইঞ্চি থেকে মিলিমিটার

ইঞ্চি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মিলিমিটার	২৫.৪০	৫০.৮০	৭৬.২০	১০১.৬০	১২৭.০০	১৫২.৪০	১৭৭.৮০	২০৩.২০	২২৮.৬০	২৫৪.০০
ইঞ্চি							১০	১১	১২	
মিলিমিটার							২৫৪.০০	২৭৯.৪০	৩০৪.৮০	

২। ক্ষেত্র

একর থেকে হেক্টর

একর	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
হেক্টর	০.৪০	০.৮১	১.২১	১.৬২	২.০২	২.৪৩	২.৮৩	৩.২৪	৩.৬৪	৪.০৫

বর্গগজ থেকে বর্গমিটার

বর্গগজ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বর্গমিটার	০.৮৪	১.৬৭	২.৫১	৩.৩৪	৪.১৮	৫.০২	৫.৮৫	৬.৬৯	৭.৫৩	৮.৩৬

৩। ধারণক্ষমতা

গ্যালন (ইম্পিরিয়াল) থেকে লিটার

গ্যালন	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
লিটার	৪.৫৫	৯.১০	১৩.৬৪	১৮.১৮	২২.৭৩	২৭.২৮	৩১.৮২	৩৬.৩৮	৪০.৯১	৪৫.৪৬

৪। ওজন

টন থেকে মেট্রিক টন

টন	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মেট্রিক টন	১.০২	২.০৩	৩.০৫	৪.০৬	৫.০৮	৬.১০	৭.১১	৮.১৩	৯.১৪	১০.১৬

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

পাউণ্ড থেকে কিলোগ্রাম

পাউণ্ড	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কিলোগ্রাম	০.৪৫	০.৯১	১.৩৬	১.৮১	২.২৭	২.৭২	৩.১৮	৩.৬৩	৪.০৮	৪.৫৪

তোলা থেকে গ্রাম

তোলা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
গ্রাম	১১.৬৬	২৩.৩৩	৩৪.৯৯	৪৬.৬৬	৫৮.৩২	৬৯.৯৮	৮১.৬৫	৯৩.৩১	১০৪.৯৭	১১৬.৬৪

সের থেকে কিলোগ্রাম

সের	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কিলোগ্রাম	০.৯৩	১.৮৭	২.৮০	৩.৭৩	৪.৬৭	৫.৬০	৬.৫৩	৭.৪৬	৮.৪০	৯.৩৩

মণ থেকে কুইন্টাল

মণ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কুইন্টাল	০.৩৭	০.৭৫	১.১২	১.৪৯	১.৮৭	২.২৪	২.৬১	২.৯৯	৩.৩৬	৩.৭৩



‘বেয়ার’এর পোকা ও রোগ ধমনের ঔষধগুলির
দ্বারা আপনাদের ফসল রক্ষা করুন

ফলিডল-ই ৬০৫

মেটাসিস্টক্স

সেরেসান

অ্যাগালল

কুপ্রাভিট (ওবি ২১)

এইগুলি পশ্চিম জার্মানীর লিভারকুসেনের

ফারবেনফ্যাবরিকেন বেয়ার

দ্বারা প্রস্তুত আসল ঔষধ।

ভারতে পরিবেশক

চিকা প্রাইভেট লিমিটেড,

৩১, চিত্তরজন এভিনিউ, কলিকাতা-১২



মিঠা কুমড়ার ফলন বাড়ানোর উন্নত পদ্ধতি

মহম্মদ মজহর আলি

আমাদের রাজ্যে বারোমাসই মিঠা কুমড়ার চাষ হইয়া থাকে। তবে খরানি (গ্রীষ্মকালীন) কুমড়া ও বর্ষাতি কুমড়ার চাষ বিশেষ প্রচলিত। বর্ষাতি মিঠা কুমড়ার বীজ চৈত্র ও বৈশাখ মাসে জমিতে পুঁতিতে হয়। ইহা মাটিতে ও মাচায় দুই রকমেই হয়। খরানি মিঠা কুমড়া মাটিতে হয়, ইহার জন্য মাচার দরকার হয় না।

খরানি মিঠা কুমড়ার বীজ আশ্বিন ও কার্তিক মাসে পুঁতিতে হয়। তিন মাসের মধ্যেই ফল ধরিতে আরম্ভ করে। যে দোআঁশ মাটিতে আলদুর ফলন ভাল হয়, সেই জমিতে সাধারণত আলদুর সহিত মিশ্র চাষ হিসাবে ইহার চাষ হইয়া থাকে। চাষীদের অজ্ঞতাবশত তাঁহারা উহার পূর্ণ ফসল পান না। আলদু তুলিবার সময় তাঁহারা কুমড়াগাছের গ্রন্থির শিকড়গুলিকে ছিঁড়িয়া স্তূপাকার করিয়া রাখেন। আলদু তোলা হইলে কুমড়াগাছের পরিচর্যা করেন না। কেহ কেহ মাত্র গোড়ায় গোড়ায় একটু জল দেন। তাঁহাদের ধারণা, শিকড়গুলি গোড়াতেই এক জায়গায় আছে। গাছগুলি অল্প জমির রস পাইয়া কিছদ ফল দান করিয়া রোগামত হইয়া গেলে, আর ফল হইবে না ভাবিয়া গাছগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলেন; ফলে তাঁহারা পূর্ণ ফসলের একটা অংশ মাত্র পান। কী কী পদ্ধতির দ্বারা পূর্ণ ফসল পাইয়া লাভবান হওয়া যায় নিম্নে তাহা বিবৃত হইল।

আলদুর ফলন ভাল করিতে হইলে দরাজ হাতে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারের জৈব ও রাসায়নিক সার দিতে হয়। কাজেই পরবর্তী ফসলে খুব বেশি

পরিমাণে সার দিবার দরকার হয় না। যেদিন আলদু-বীজ বসাইবেন সেই দিনই কুমড়াবীজ সঙ্গে লইয়া যাইবেন। বীজগুলি অবশ্য কুটে রোগে বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত গাছের বীজ যেন না হয়। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৮ হাত অন্তর এক-একটি চিহ্ন দিতে হইবে। চিহ্নিত স্থানের প্রত্যেক দিকে দেড় হাত করিয়া ফাঁক রাখিতে হইবে। সেই জায়গায় যেন আলদুবীজ দেওয়া না হয়। আলদুবীজ ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে চিহ্নিত স্থানে পাঁচ-ছয়টি হিসাবে কুমড়ার বীজ দিয়া মাটি-ঢাকা দিবেন। আলদুগাছ বাহির হইবার পূর্বেই কুমড়াগাছ বাহির হইয়া আসিবে। এই সময় হইতে আলদু উঠানো পর্যন্ত কুমড়াগাছের পৃথকভাবে কেনই পরিচর্যা করিতে হইবে না। কেবল লাল পোকা ও কাটুই পোকাগুলি সকালে-বিকালে মারিয়া ফেলিতে হইবে। লাল পে কার উপদ্রব বেশি হইলে সকাল বেলায় পাতার দুই পিঠে ঘুঁটের ছাই দিতে হইবে, কিংবা রাসায়নিক কোন কীটনাশক ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে।

জমি হইতে আলদু উঠাইবার পূর্বেই কুমড়ার বহু লতাপাতার বিস্তার হয় ও ফুল-ফল ধরিতে আরম্ভ করে; কাজেই আলদু উঠাইবার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। কারণ কুমড়ার লতার প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে শিকড় বাহির হইয়া মাটিতে প্রবেশ করে। উক্ত শিকড়গুলি গাছকে খাদ্যের যোগান দেয় এবং প্রবল বাতাসের হাত হইতে রক্ষা করে। আলদু উঠাইবার সময় যাহাতে ঐ শিকড়গুলি কাটিয়া-ছিঁড়িয়া না যায়, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে সকল স্থানে লতাপাতা বেশি

থাকে, সেই সকল জায়গার আলুগুদুলি পাতলা শাবল দ্বারা বিশেষ সাবধানে উঠাইতে হইবে। আলু উঠানো শেষ হইলেই সেচের জল দিবার নালা ও প্লট ভাগ করিয়া লইতে হইবে। আবার অসময়ে অতি বৃষ্টি হইলে জল যাহাতে শীঘ্রই বাহির হইয়া যাইতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। প্লটগুদুলি ভাগ করা হইলে সঙ্গেসঙ্গেই সেচ দিতে হইবে। সেচের জলে যেন জমির প্রত্যেক অংশ ভিজিয়া যায়। তারপর মাটির জো হইলেই বিঘা-প্রতি দশ গাড়ি (প্রতি গাড়ি ১০ মণ) হিসাবে পচা গোবরসার সমস্ত জমিতে সমানভাবে ছড়াইয়া দিতে হইবে।

গোবরসার মাটিতে মিশাইবার জন্য ও আগাছা পরিষ্কার করিবার জন্য এবং শিকড়কে আলো ও বাতাস পাইতে দিবার জন্য কোদালি দিয়া সমস্ত জমি খুঁড়িয়া দিতে হইবে। খুঁড়িবার সময় যেন গোড়ার শিকড়ের বা গ্রন্থির শিকড়ের কোন ক্ষতি না হয়, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গাছের গোড়ায় খাবার দিবার দরকার নাই, কারণ আলুতে দেওয়া খাবার তখন পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। এই কাজগুদুলি তাড়াতাড়ি আলু উঠাইবার এক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ করিতে হইবে। এক মাসের মধ্যে প্রথম দফার কুমড়া ধরা শেষ হইয়া ফলগুদুলি পাকিতে আরম্ভ করে; তখন ফল ধরা বন্ধ হইয়া গাছগুদুলি রোগামত হইয়া যায়।

বৃষ্টি না হইলে প্রত্যেক দশ দিন অন্তর বরাবর সেচ দিতে হইবে। আগাছা হইলে তাহা পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। কিছু দিনের মধ্যে নতুন নতুন লতার দ্বারা শাক-পাতার বিস্তার হইয়া গাছে সমস্ত জমি ঢাকিয়া পড়িবে এবং ফুল ও ফল ধরিতে আরম্ভ করিবে। এই দ্বিতীয় দফার ফল আকারে পূর্বের ফলের চেয়ে অনেক বড় এবং সংখ্যায় খুব বেশি হয় (এই দফার ফলনটা চাষীরা পান না)। এই ফলগুদুলি পাকিলে আবার গাছ নিস্তেজ হইয়া ফল

ধরা বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় নিড়ানের কাজ বন্ধ করিতে হইবে। কিছু কিছু পাতলা আগাছা যাহা থাকিবে তাহাতে জমি ঠান্ডা থাকিবে এবং প্রচণ্ড ঝড়ে গাছগুদুলি আঁকড়া দিয়া আগাছাগুদুলিকে ধরিয়া থাকিবে।

আবার কিছুদিন পর পুরাতন লতা হইতে নতুন লতাপাতা বাহির হইয়া ফুল ও ফল ধরে। ইহা তৃতীয় দফার ফসল। ইহার ফলন প্রথম দফার মত হয়। আবার কিছুদিন পর জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে চতুর্থ দফায় ছোট ছোট অসংখ্য ফল দান করিয়া গাছগুদুলি মরিয়া যায়।

উপরি-উক্ত চাষের ব্যয়, আয় ও লাভ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণার জন্য বর্তমান বৎসরের আমার এক খণ্ড দুই বিঘা জমির কুমড়াচাষের হিসাব দিলামঃ

আয়			মণ
প্রথম দফার ফলন	..	..	২৫
দ্বিতীয় দফার ফলন	..	..	৭০
তৃতীয় দফার ফলন	..	..	২০
চতুর্থ দফার ফলন	..	..	০

			১১৫

ব্যয়			টাকা
(১) কুমড়া বীজ বসাইবার তারিখ ১লা অগহায়ণ হইতে আলু উঠাইবার তারিখ ৩০এ মাঘ পর্যন্ত (কোনই ধরচ নাই)	..	..	..
(২) জল যাইবার নালা ও পুট ভাগ করার মজুর ২ জন (মজুরি ১৮ হিঃ)	..	..	২৮
(৩) পুট ভাগের পর সেচ ১টি, মজুর ৩ জন (মজুরি ১১০ হিঃ)	..	..	৪১০
(৪) সার ২০ গাড়ি (প্রতি গাড়ি ১ হিঃ)	..	..	৬১
(৫) সার বহার মজুর ২ জন (১১০ হিঃ)	..	..	১৮
(৬) সার ছড়ানোর মজুর ২ জন (১৮ হিঃ)	..	..	২৮
(৭) সমস্ত জমি কোদালি দিয়া খুড়িয়া দেওয়া—৮ জন মজুর (১১০ হিঃ)	..	..	১২৮

	টাকা	
(৮) ১৫ই ফাল্গুন হইতে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত সেচ ১০ দিন অন্তর-- ৯টি (প্রতি সেচে ৪১১০ হিঃ) ..	৪০১১০	
(৯) নিড়ান ২টি—৮ জন মজুর (১১১০ হিঃ)	১২২	

মোট ব্যয় ..	১৩৬২	
(একশত ছত্রিশ টাকা)		
বিজি: প্রতি মণ গড়ে ৬২ হিঃ (ছয় শত নব্বই টাকা মাত্র)		
আয়	৬৯০২	
ব্যয়	১৩৬২	

লাভ ..	৫৫৪০	
(পাঁচ শত চুয়ান্ন টাকা মাত্র)		

১৫ই জ্যৈষ্ঠ এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। চতুর্থ দফার ফলন এখনও পাই নাই। তাই আয় দেখানো হয় নাই। মধ্যে দুই-এক পশলা বৃষ্টি হইলে ব্যয় কম, এবং ফলন বেশি হইত।

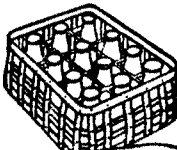
ইহার জন্য মূলধনের বিশেষ দরকার নাই অথচ অর্থকরী ফসল হিসাবে আলুর চেয়ে কুমড়া কোন অংশে কম নহে। তাহা ছাড়া এই সময় জমি সাধারণত খালি পড়িয়া থাকে। আমি আমার চাষী ভাইদিগকে প্রত্যেক আলুর জমিতে মিশ্র চাষ হিসাবে খরানি মিঠা কুমড়ার চাষ দিতে এবং উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে চাষ করিতে অনুরোধ করি। গাছ একবার ফলদানের পর রোগামত হইয়া গেলে তাহা নষ্ট না করিয়া তাহার যত্ন করিলে লাভবান হইবেন। আমি গত আট-দশ বৎসর ধরিয়া এইভাবে চাষ করিয়া লাভবান হইতেছি।

আপনি পশ্চিমবঙ্গ প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত 'বসুন্ধরা' এবং যে-কোন পত্রিকার গ্রাহক হ'তে হ'লে, চাঁদার টাকা পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তার নামে 'রাইটাস' বিল্ডিংস, কলিকাতা-১' ঠিকানায় নগদ পাঠাতে বা জমা দিতে পারেন, অথবা ক্রস্‌ড পোস্টাল অর্ডারেও পাঠাতে পারেন। যে পত্রিকা বা যে পত্রিকার গ্রাহক হ'তে চান তার বা সেগুলোর নাম এবং নিজের নাম-ঠিকানা সুস্পষ্ট বড় অক্ষরে লিখে দেবেন। ক্রস্‌ড পোস্টাল অর্ডারের সঙ্গে অবশ্যই একটি পত্র দিতে হবে; যে-পত্রিকার গ্রাহক হ'তে চান তার নাম এবং নিজের নাম-ঠিকানা সেই পত্রে স্পষ্ট বড় বড় অক্ষরে অবশ্যই লিখে দেবেন।

হরিণঘাটার দুধ

"জীবনে আছি দুটি
জিনিষ শিখেছিঃ
এক, বিবানে কাজ
হয়, দুই, দুধে শরীর
পুষ্ট হয়।"

—বর্গভ বাণীভ
ম্যা ক ক্যা ভে ন
(শরীরবিজ্ঞান বিশারদ)



প্যাস্টরাইজ করা পল্লব দুধ
প্রতি পাউন্ড ৮/-
প্যাস্টরাইজ করা টোল্ড দুধ
প্রতি পাউন্ড ৮/-
মাখন
প্রতি পাউন্ড ৯/-
(২ আউন্স ও ভার বেশি ওজনের প্যাকেটে)

ভরসা দি
প্রতি পাউন্ড ৩/- (১ পাউন্ডের পীল করা বোতলে)
কলকাতা, হাওড়া, বরাসনগর ও বনগরের ১০০ ফুট
বোতলে সকাল ৫-৫৫ থেকে ৭-৫৫ এর মধ্যে পাওয়া
যায়। কতকগুলি দোকান আবার বিক্রেতে ৫-৫০
থেকে ৩টা পর্যন্ত বোলা থাকে।



পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

অধিকতর খাদ্যোৎপাদন

শিল্পের বহুমুখী উন্নয়ন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু খাদ্য-শস্য আমদানি করার জন্য আমাদের যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করতে হয় তা যদি না আমরা সঞ্চয় করতে পারি তা হ'লে ঐ লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। এইভাবে সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রাই কেবল নানা যন্ত্রপাতি কেনা ও ভারী শিল্প পণ্ডনের কাজে লাগানো যেতে পারে এবং তাতে ক'রেই শিল্প প্রসারের লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

আমাদের দেশে খাদ্যের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় বরাবরই কম; আবার চাহিদাও আগের তুলনায় বেশ বেড়ে গেছে। এশিয়ার অন্যান্য দেশ, যেখানে বহু লোককে জীবিকার জন্য জমির ওপর নির্ভর করতে হয় এবং যেখানে বহুকাল ধরে কৃষিব্যবস্থা চালু আছে, সেই সব দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করলে দেখা যায়, অন্যান্য সব দেশেই বড় বড় শিল্প পরিকল্পনা চালু করা হয়েছে। কিন্তু শুধু শিল্প পরিকল্পনাই নয়, সেই সঙ্গে তারা দেশের খাদ্যোৎপাদনও বৃদ্ধি করেছে, জমি যা ছিল তাই আছে কিন্তু তারা ফসল ফলিয়েছে দ্বিগুণ।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপায়ণে দেশের কৃষি-ব্যবস্থাকে যে কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে তা আমরা জানি। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় হাত দেওয়ার আগে প্রাদেশিক সরকারগুলি কৃষির উন্নয়ন, সেচের সুবিধা বৃদ্ধি অথবা কৃষিপদ্ধতিকে আধুনিক ক'রে তোলার জন্য নিয়মিতভাবে কোন চেষ্টা করেন নি। হিসাব ক'রে দেখা গেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের ক'বছরে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি কৃষি আর সমবায় প্রচেষ্টার উন্নয়নের জন্য যা খরচ করেছেন, তা কৃষকদের জন্য মাথাপিছু আট আনা খরচে দাঁড়ায়। এমন কি ১৯৪৭-৪৮ সাল

থেকে ১৯৫১-৫২ সাল পর্যন্ত যে 'অধিক খাদ্য ফলাও' অভিযান চালানো হয় তাও মোট চাষের জমির শতকরা দুই থেকে চার ভাগ ক্ষেত্রেই মাত্র সীমাবদ্ধ ছিল।

গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতি করার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামীণ অর্থনীতির আমূল পরিবর্তনসূচক কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয় এবং গ্রামাঞ্চলে সমষ্টি উন্নয়নের কাজ শুরু করা হয়। কৃষির উন্নয়নের জন্য দেশের সমস্ত অঞ্চলে বহুমুখী এবং বড়, মাঝারি ও ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার কাজ শুরু করা হয়। পশু-পালন, বনসৃষ্টি, জমির ক্ষয় নিবারণ ইত্যাদি সমেত ব্যাপকতম ক্ষেত্রে কৃষি-পদ্ধতির উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়। দেশ বিভাগের সময় ভারতের ভাগে যে-সব বড় বড় সেচের কাজ পড়ে সেগুলির জন্য আনুমানিক খরচ ধরা ছিল ১১০ কোটি টাকা। কিন্তু ১৯৫০ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত সেইসব কাজের জন্য ৪০০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ছোট ছোট সেচের কাজ এবং নলকূপ বসানোর জন্য এই পাঁচ বছরে খরচ হয়েছে ১১০ কোটি টাকা। পরিকল্পনার কাজ শুরু করার সময় আমাদের দেশে ২,৫০০টি নলকূপ ছিল, পরের ক'বছরে আরো ৩,৩৫০টি নলকূপ বসানো হয়েছে। ছোট ছোট সেচের কাজে নলকূপের খরচ বাদ দিয়ে এ-পর্যন্ত যা খরচ হয়েছে, আমরা তার চেয়েও বেশি খরচ করেছি। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় যে-সব বড় ও মাঝারি সেচ পরিকল্পনার কাজ শুরু করা হয় সেগুলি থেকে শেষ পর্যন্ত ২ কোটি ৯০ লক্ষ একর জমিতে সেচ দেওয়ার কথা।

প্রথম পরিকল্পনায় যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেই সূচনাকে সাফল্যের পথে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে

যাওয়া হচ্ছে। তারই প্রস্তুতি-হিসাবে সমগ্র দেশকে জাতীয় সম্প্রসারণ কৃত্যকের অন্তর্ভুক্ত করার কাজ চলেছে এবং শতকরা ৪০ ভাগ জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনায় রূপান্তরিত করা হচ্ছে। বহুমুখী পরিকল্পনা এবং বড় ও মাঝারি সেচ পরিকল্পনার খাতে ৪৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার এবং নলকূপ খননের কার্যসূচী অনুযায়ী ১০ লক্ষ একর জমিতে সেচ দেওয়া ছাড়াও, আগামী পাঁচ বছরে প্রথম পরিকল্পনার অসম্পূর্ণ সেচের কাজ আর দ্বিতীয় পরিকল্পনার নতুন নতুন সেচ পরিকল্পনা কার্যকরী করার ফলে দেশে সেচের জমির পরিমাণ আরো ১ কোটি ২০ লক্ষ একর পরিমাণ বেড়ে যাবে।

কৃষি এবং সমষ্টি উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৫৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গ্রামোন্নয়নের যাবতীয় কাজকর্মের জন্য প্রথম পরিকল্পনায় ৭৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় আর সেই তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ করা হয়েছে ১,০২৬ কোটি টাকা। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় প্রতি বছরে ২০৫ কোটি টাকা খরচ হবে। পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন, সেচ ও বিদ্যুৎ-সরবরাহ খাতে ৬৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

দেশের সুখম উন্নয়নই আমাদের নীতি; সুতরাং এই নীতি অনুযায়ী আমাদের কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনও বাড়ানো দরকার। শিল্প-প্রসারের কোন পরিকল্পনাই সফল হতে পারে না, যদি না তার পরিপূরক ব্যবস্থা হিসাবে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করার কোন কার্যসূচী থাকে। দ্বিতীয় এবং তার পরের পরিকল্পনার সময় শিল্পের ব্যাপক উন্নয়নের ফলে কৃষিজাত জিনিসপত্রের চাহিদাও খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যাবে। উৎপাদন বৃদ্ধি করেই সে চাহিদা মেটাতে

হবে। বৈদেশিক মদ্রা যাতে পাওয়া যায় সেজন্যও কিছু বাড়তি ফসল রাখতে হবে। তা ছাড়া বাজেটে ঘাটতি রেখে খরচ করার ফলে উদ্ভূত মদ্রাস্বাকীতিও একমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধি করেই রোধ করা যেতে পারে।

অবশ্য, গ্রামবাসীদের মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির প্রয়োজনই কৃষিজাত জিনিসপত্রের উৎপাদন তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি করার সবচেয়ে বড় কারণ। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান বাড়লে সঞ্চয় এবং সম্পদও বাড়বে এবং সমাজে নিরাপত্তার ভাব স্থায়ী হবে। অপরপক্ষে গ্রাম ও শহরের মধ্যে আয়ের পার্থক্য যদি বেড়েই যায় তার ফলে দেশবাসীর দুঃখকষ্ট বাড়বে এবং সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ হবে। এখানে এ-কথাও মনে রাখা ভাল যে, শহরের বড় বড় শিল্প পরিকল্পনা এবং উন্নয়নমূলক কাজের ফলে গ্রামাঞ্চলও উপকৃত হয়। আশপাশের গ্রামের সঙ্গে নতুন শিল্পনগরীর জীবনযাত্রার সহযোগ ঘটলে গ্রামের জনগণের আয় বাড়বে।

জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মদ্রার স্বল্পতা ইত্যাদি সাম্প্রতিক আর্থনীতিক পরিস্থিতির কথাও আমাদের বিচার করে দেখা দরকার। এই জাতীয় সমস্যার প্রকৃষ্ট সমাধান হ'ল অবিলম্বে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি। এখন প্রশ্ন হ'ল যে, উৎপাদন কতটা পরিমাণে বৃদ্ধি করতে হবে। খাদ্যোৎপাদন প্রাথমিক পর্যায়ে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫২-৫৩ সালে ৫ কোটি ৮৩ লক্ষ টন, ১৯৫৩-৫৪ সালে ৬ কোটি ৮৭ লক্ষ টন হয়। ১৯৫৪-৫৫ সালে অবশ্য খাদ্যোৎপাদন ৬ কোটি ৫৮ লক্ষ টনে নেমে যায় এবং প্রথম পরিকল্পনার শেষ বছরে আরো কমে ৬ কোটি ৩৫ লক্ষ টনে গিয়ে দাঁড়ায়। খাদ্যসামগ্রীর মূল্য ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে শতকরা ১৮ ভাগ বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ এ-থেকেই স্পষ্ট হয়।

পারিকল্পনা কমিশন ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যসরকারগুলিকে দশ বছরের মধ্যে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন দ্বিগুণ করার জন্য সচেষ্ট হ'তে বলেছিলেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পারিকল্পনার প্রসঙ্গে পারিকল্পনা কমিশন পাঁচ বছরে শতকরা ৪০ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন, কিন্তু রাজ্যসরকারগুলি শতকরা ২৮ ভাগ বৃদ্ধি করতে সম্মত হন। নিচে যে তালিকা দেওয়া হ'ল তাতে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান প্রধান দফার উল্লেখ করা হয়েছে :

সামগ্রী	হিসাবের দ্বিতীয় পরি- মান	দ্বিতীয় পরি- কল্পনার জন্ত উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়	দ্বিতীয় পরি- কল্পনার জন্ত সংশোধিত উৎপাদন লক্ষ্য	উৎপাদন বৃদ্ধির শতকরা হার
	টন	কোটি লক্ষ	কোটি লক্ষ	শতাংশ

খাদ্যশস্য	..	৬	৫০	৮	৪	২৪.৬
তৈল বীজ	..	০	৫৫	১৬	৩১.০	
আখ (গুড়)	..	০	৫৮	১	১৮	৩০.৯
মুতা	..	০	৪২	০	৬৫	১৫.৯
পাট	..	০	৪০	০	৫০	৫৮.১
অল্পাঙ্গ ফসল	..	০	..	০	..	২২.৪

মোটের উপর বৃদ্ধি ২৭.৮ শতাংশ

ভারতে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্বন্ধে ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে বিশ্ব-ব্যাংক মিশন যে বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন তা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল :

“সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সেচ-ব্যবস্থা এবং চাষের জমির প্রসার এবং সেই সঙ্গে অনুমোদিত কৃষি-পদ্ধতি যথাযথভাবে অবলম্বন করতে পারলে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন চার থেকে পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। যে-সময় পাওয়া গেছে তার মধ্যে নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং আরো উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে।

“অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানের জন্য আয়োজিত ফসল প্রতিযোগিতার ফলে স্থানীয় গড় উৎপাদনের চেয়ে ফলন সাতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে যে-সব দেশের ফলন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম ভারত তাদের অন্যতম; সেখানে যত শ্রমিক রয়েছে তাদের সাহায্যে এই ফলন সর্বোচ্চ ক'রে তোলা যায়। সুতরাং সেখানে উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এবং কার্যত তা সোজা হ'লেও দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতার জন্য ব্যাহত হচ্ছে।”

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে এখানে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হ'ল :

- (১) সরকারী ক্ষেত্রে উন্নতধরনের বীজ বর্ধন এবং কৃষকদের মধ্যে বণ্টন;
- (২) কৃষকদের মধ্যে সার বিতরণের ব্যবস্থা;
- (৩) ময়ূরাক্ষী পারিকল্পনা, দামোদর উপত্যকা পারিকল্পনা প্রভৃতি নদী উপত্যকা পারিকল্পনা; নলকূপ খনন, মজা পুষ্করিণী ইত্যাদি পুনরুদ্ধার; ছোট ছোট খাল খনন এবং ছোট ছোট সেচ পারিকল্পনা রূপায়ণ।

আরও কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া দরকার, যেমন :

- (১) উৎপাদন সম্বন্ধে কৃষকদের সচেতন ক'রে তোলা;
- (২) প্রকৃত অভাবগ্রস্ত এলাকায় পাঠাবার জন্যে সরকার কর্তৃক যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য দেশে মজুত রাখা;
- (৩) খাদ্যশস্য গুরুত্বপূর্ণভাবে মজুত রাখা এবং চোরাকারবারের প্রবণতা বন্ধ করা;
- (৪) খাদ্যশস্যের অভাব দীর্ঘস্থায়ী হ'তে না দেওয়া;
- (৫) কৃষকদের মঙ্গলের জন্যই উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

ভারতে ধান্য গবেষণা

শ্রী আর এল এম ঘোষ

কেন্দ্রীয় ধান্যগবেষণা প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা

ভারতে ৭ কোটি ৩০ লক্ষ একর জমিতে ২ কোটি ২০ লক্ষ টন ধান জন্মে। দেশের মোট চাষের জমির শতকরা ৩০ ভাগ জমিতেই হয় ধানের চাষ। পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন দেশে এত জমিতে বোধহয় ধানের চাষ হয় না।

ধান্য উৎপাদক রাজ্য

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অংশে মাটি, জলবায়ু ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু প্রায় সকল অংশেই ধান চাষ হয়। দক্ষিণ ভারত ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সকল রাজ্যেই ধানের অল্পবিস্তর চাষ হয়। এইসকল রাজ্যের মধ্যে আসাম, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই, উড়িষ্যা, হায়দ্রাবাদ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, ও কেরলের জমিতে দেশের শতকরা ৯৫ ভাগ ধান উৎপাদিত হয়।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভারতে ধান চাষ শুরুর হয় মাত্র ৪৫ বছর আগে। ১৯১১ সালে বঙ্গদেশে ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাজে ধান চাষ গবেষণার কাজ শুরুর হয়ে দেখতে দেখতে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে এই গবেষণাকার্য ছড়িয়ে পড়ে।

গবেষণা কেন্দ্র

বর্তমানে ৬৯টি ধান্যগবেষণা কেন্দ্র ভারতের নানা স্থানে গড়ে উঠেছে। এগুলি সবই কিন্তু রাজ্য-সরকারগুলির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। কেবল কটকের কেন্দ্রীয় ধান্যগবেষণা কেন্দ্রটির পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সরকার।

নিম্নে বিভিন্ন রাজ্যের গবেষণা কেন্দ্রগুলির তালিকা দেওয়া হলঃ

আসাম—৩, অন্ধ্র—৫, বিহার—৪, বোম্বাই—১৫, কুর্গ—১, হায়দ্রাবাদ—৪, কাশ্মীর—২, মাদ্রাজ—১১,

মধ্যভারত—১, মধ্যপ্রদেশ—১, মহীশূর—১, উড়িষ্যা—৩, পাঞ্জাব—২, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন—৬, উত্তরপ্রদেশ—৪, পশ্চিমবঙ্গ—৫, কেন্দ্রীয় সরকার—১।

ভারতীয় কৃষিগবেষণা পরিষদ

ভারতীয় কৃষিগবেষণা পরিষদ সর্বপ্রথম ১৯২৯ সালে স্থাপিত হয়। এ পরিষদ এদেশে ধানচাষের গবেষণার প্রেরণা দিয়েছে এবং অনেকগুলি গবেষণা-কেন্দ্রকে সাহায্য করেছে। এই গবেষণাকেন্দ্রগুলি প্রধানত উৎকৃষ্ট ধান্য উৎপাদনের কাজেই ব্যাপৃত আছে।

এদেশে ধান্য উৎপাদনের অবস্থা বহু বিচিত্র ধরনের হওয়ার জন্য হাজার হাজার রকমের ধান ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে জন্মে। এ পর্যন্ত ৪৩০ রকমের উন্নত জাতের বীজধান চাষের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। নিম্নে কোন রাজ্যে কত রকমের ধান পাওয়া যায় তার একটা তালিকা দেওয়া হলঃ

আসাম—৩০; অন্ধ্র—৪৬; বিহার—১৩; বোম্বাই—৪৫; হায়দ্রাবাদ—১৩; মাদ্রাজ—১১০; মধ্যপ্রদেশ—১৮; মহীশূর—২৪; উড়িষ্যা—৩১; পাঞ্জাব—৭; কেরল—১৪; উত্তরপ্রদেশ—২৪; পশ্চিমবঙ্গ—৫৫।

গবেষণার লক্ষ্য

গবেষণাকেন্দ্রগুলির লক্ষ্য হচ্ছে—ধান্যের অধিব ফলন, অবিলম্বে ফলন, শক্ত ডাঁটার খড়, তৈরি ভাত দানা, রোগ প্রতিষেধের শক্তি আছে এমন বীজ উৎপাদন প্রভৃতি।

তা ছাড়া কোন কোন অঞ্চলে ডুবো জমির পক্ষে উপযোগিতা, বন্যার জল ও নোনা জলে আত্মরক্ষার ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়ে পরীক্ষা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে

সার দেওয়া ও চাষের পদ্ধতি সম্বন্ধে তদন্তও কর্ম-সূচির মধ্যে ধরা হয়েছে।

দেশের বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্রে যেসকল পরীক্ষার কাজ চালানো হয়েছে সেগুলির সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

কটকের কেন্দ্রীয় গবেষণাকেন্দ্র

কেন্দ্রীয় ধান্যগবেষণা প্রতিষ্ঠান কটকে ১৯৪৬ সালে স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য ধান সম্পর্কে সকলপ্রকার প্রাথমিক গবেষণা চালানো এবং দেশে এসূত্রে যে সমস্যাগুলির ব্যাপকতা আছে সেগুলির সম্বন্ধে তদন্ত করা এবং ধান্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যের কেন্দ্ররূপে কাজ করা।

২৫০ একর জমি নিয়ে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানটি আর্টটি গবেষণা শাখায় বিভক্ত। উদ্ভিদবিদ্যা, কৃষি অর্থনীতি, উদ্ভিদরোগনিদানতত্ত্ব, কৃষি কীটতত্ত্ব, কৃষি রসায়ন, পরিসংখ্যা তত্ত্ব, উদ্ভিদ দেহবিজ্ঞান এবং কৃষিসম্প্রদায়বিদ্যা।

এ ছাড়া আছে খামার ও পরিশাসন শাখা। এ প্রতিষ্ঠান তালিমের কাজও চালায় এবং নিকটস্থ একটি নিবিড় চাষের কেন্দ্রে সম্প্রসারণ কাজ করে থাকে।

বীজধান ভান্ডার

আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংসদের পরিচালনায় সমগ্র পৃথিবীতে পাঁচটি বীজধানভান্ডার আছে, সেগুলিতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত বীজ সংগ্রহ করা হয়। এটি সেগুলির অন্যতম।

এই বীজভান্ডারের পরীক্ষা চলছে এবং উৎপাদনের জন্য এগুলির ব্যবহার করা হচ্ছে। চীন থেকে সংগৃহীত কোন কোন জাতের ধান তাড়াতাড়ি পরিপুষ্ট হয় এবং প্রচুর ফলে, কতকগুলি বীজ বাত্যা ও পোকাকার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। তাইওয়ান থেকে সংগ্রহ করা কয়েক শ্রেণীর বীজ কাম্বোজের আবহাওয়াতেই ভাল জন্মায়।

খাদ্য ও কৃষি সংসদ ও ভারতীয় কৃষিগবেষণা পরিষদের উদ্যোগে কিছুদিন ধরে এই প্রতিষ্ঠানে জাপানী ও ভারতীয় ধানের মিশ্রণে সঙ্কর ধান্য উৎপাদনের পরীক্ষা চলছে। এর উদ্দেশ্য—দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন ভারতীয় রাজ্যে নতুন জাতের ধান্যোৎপাদনের জন্য বীজ-সরবরাহ।

সঙ্কর বীজ উৎপাদন

এই সঙ্কর বীজের ধান জাপানী ধানের মত অধিক ফলন দেবে এবং জমিতে অধিক মাঠায় সার দিলেও তা আত্মসাৎ করতে পারবে, আবার ভারতীয় ধানের মত কষ্ট সহ্যেও পারবে এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার উপযোগী হবে। এতে জাপানী ধানের অধিক ফলন ও অধিকমাঠায় প্রযুক্ত সারের সুবিধাগ্রহণ এই দুটি গুণের সংগে ভারতীয় ধানের কষ্টসহিষ্ণুতা ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপযোগিতা এই দুটি গুণের সংযোগ ঘটবে। এর ফলেই দেশের সর্বত্র সঙ্কর বীজের বিশেষ চলন হবে।

সমবায় প্রথায় সঙ্কর বীজধান্য উৎপাদন পরিকল্পনা অনুসারে জাপানী জাতের সংগে ১১২টি ভারতীয় ধানের জাতের সংমিশ্রণ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ৭১০টি জাপানী-ভারতীয় সংমিশ্রণ পরীক্ষা চালানো হয়েছে। স্থানীয় জলবায়ুর অবস্থা বিবেচনা করে সঙ্কর বীজ বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়েছে। সংবাদ পাওয়া গিয়েছে যে, এইসকল সঙ্কর বীজে ফসল ভালো হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এখন এই প্রতিষ্ঠান এমন নতুন জাতের বীজ-ধানের উৎপাদনের চেষ্টা করছে যেগুলি রোগের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে, তাড়াতাড়ি পুষ্ট হবে আবার প্রচুর ফলনও দেবে।

জয়পুর পরীক্ষাকেন্দ্র

সম্প্রতি ভারতীয় কৃষিগবেষণা পরিষদের পরিকল্পনা অনুসারে উড়িষ্যার জয়পুর এলাকায় আর

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

একটি পরিমাপ কার্য চলছে। তাতে বহুপ্রকার ধানের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তা ছাড়া সেখানে নানা শ্রেণীর ধান নিয়ে সেগুন্দির জন্মতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

সারপরীক্ষা

সার সম্পর্কেও এই প্রতিষ্ঠানে বিশেষরূপ তদন্ত চলছে। নাইট্রোজেন সারের মাত্রা নির্ণয়, বিভিন্ন প্রকার জৈব ও অজৈব সারের তুলনামূলক গুণ বিচার, বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক সার ব্যবহারের কাল ও পদ্ধতি নির্ধারণ, এবং ভূমির উর্বরাশক্তির উপর রাসায়নিক সার প্রয়োগের সমীচীন ফল প্রভৃতির পরীক্ষা এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।

সংসদের আর একটি পরিকল্পনা অনুসারে গাছপালা নিয়ে সবুজসারের পক্ষে সেগুন্দির মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা চলছে। চাষ-আবাদের পরীক্ষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ধানের পরে শস্য, পর্যায়ক্রমে চীনা-বাদাম, গম, তুলো, ছোলা এবং তৈলবীজ ঐ কয়টির কোন কোনটি চাষের উপযোগী তা নির্ণয় করা। তা ছাড়া, জমিতে দুই ফসল ফলনের এবং ধানের ক্ষেতের আগাছা মারবার ব্যবস্থার জন্যও পরীক্ষা চলছে।

রোগনিদান ও রসায়ন

প্রতিষ্ঠানের রোগনিদান সম্বন্ধীয় তদন্তের মধ্যে পড়ছে প্রাকৃতিক উপদ্রব ও কীটের আক্রমণজনিত রোগ সম্পর্কে গবেষণা, ঐ রোগের উৎপত্তি, বিস্তার, এর দ্বারা ফলনের আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা, ক্ষতির হিসাব ও প্রতিবিধানের উপায় নির্ণয়। মাঠের ধানে ও সপ্তমণ্ডারের চাল ও ধানে কীটের আক্রমণের জন্য যেসব ব্যাধি জন্মে সেইসব ব্যাধির নিদান ও প্রতিকার সম্বন্ধেও এখানে গবেষণা চলছে।

কৃষিরসায়ন শাখায় ধানের দুবো জমির মাটির উপাদান বিশ্লেষণ, তার পুষ্টিদানের শক্তি, ঐ মাটিতে ফসফেট ও জৈব-নাইট্রোজেনের ক্রিয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে তদন্ত চালানো হচ্ছে। চাষের লাভলাভের হিসাব

ও জমিতে নানারূপ পরীক্ষার দিক থেকে জমিতে সম্ভাবিত ফসলের পরিমাণ নির্ণয় ইত্যাদি সম্বন্ধেও তদন্ত চালানো হচ্ছে।

উড়িষ্যা রাজ্যসরকারের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান মধ্যে মধ্যে স্বল্পমেয়াদী তালিমেরও ব্যবস্থা করে থাকে।

বিভিন্ন রাজ্যের গবেষণাকেন্দ্রগুলিতে যেসকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, সেগুন্দির বিবরণী নিচে দেওয়া হ'লঃ

পশ্চিমবঙ্গ

এই রাজ্যে ৯৬ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হয়। তাতে ৩৬ লক্ষ টন ধান প্রতি বছর উৎপাদিত হয়। এ রাজ্যে বর্তমানে পাঁচটি পরীক্ষাকেন্দ্র কাজ চলছে—চুঁচুড়া, বাঁকুড়া, শিউড়ি, গোসাবা এবং কালিম্পঙ। চুঁচুড়া কেন্দ্র ও বাঁকুড়া কেন্দ্র ১৯৩২ সালে কাজ শুরু করে—প্রথমোক্ত কেন্দ্রের অধিকারে আছে রাজ্যের পলিমাটির অঞ্চল আর বাঁকুড়া কেন্দ্রের অধিকারে আছে বেলে পাথুরে মাটির অঞ্চল। এই কেন্দ্রের আর একটি শাখা শিউড়িতে অবস্থিত। গোসাবায় লবণ প্রতিষেধক বীজপালনের জন্য কাজ হচ্ছে। ১৯৪৯ সালে কালিম্পঙ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এটি পাহাড়ী এলাকায় কাজ চালাবে।

এই দুটি কেন্দ্রের পরিচালন ব্যয়ভার ভারতীয় কৃষিগবেষণা পরিষদ বহন করে। এইসকল কেন্দ্র থেকে মোট ৫৫টি উন্নত শ্রেণীর বীজ উৎপাদিত হয়েছে।

আসাম

এই রাজ্যে ১৬ লক্ষ টন ধান জন্মে ; ৩০ লক্ষ একর জমিতে চাষ হয়। রাজ্যে তিনটি গবেষণাকেন্দ্র আছে—(১) করিমগঞ্জ, (২) টিটাং, এবং (৩) রোহা।

করিমগঞ্জ কেন্দ্র তিনপ্রকার ধানের সম্পর্কে গবেষণা চলছে—‘আহু’ বা গ্রীষ্ম ও শরতের ধান্য,

‘বাও’ বা ডুবোজমিতে লাগানো শীতকালীন ধান্য এবং ‘শালী’ বা শীতকালীন রোয়া আবাদী ধান্য।

এই রাজ্যের গবেষণাকেন্দ্রগুলি থেকে ৩০টি উন্নত শ্রেণীর বীজ উৎপাদিত হয়েছে।

উড়িষ্যা

এই রাজ্যে ৯৫ লক্ষ একর জমিতে ২১ লক্ষ টন ধান জন্মে। এই রাজ্যে তিনটি গবেষণাকেন্দ্র আছে—ভুবনেশ্বর, বহরমপুর এবং জয়পুর। কটকে প্রধান ধান্যগবেষণা কেন্দ্রটি ১৯৪৬ সালে কেন্দ্রীয় ধান্যগবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে।

ঐ তিনটি গবেষণাকেন্দ্রের মধ্যে ভুবনেশ্বরের কেন্দ্রটি অল্পদিন হ’ল কাজ শুরুর করেছে।

এ পর্যন্ত ৩১টি উন্নত বীজ পাওয়া গিয়েছে।

অন্ধ্র

অন্ধ্ররাজ্যে পাঁচটি গবেষণাকেন্দ্র আছে:

(১) সম্বলকোট, (২) মারুতের, (৩) বৃচিরেদদী-পলেম, (৪) পদ্মা, এবং (৫) মসলিপটম।

এগুলি সব ক’টি মিলে ৪৬টি উৎকৃষ্টতর বীজ তৈরি করেছে। এগুলির কতকগুলি বন্যা ও নোনা জলে ও প্রাকৃতিক উপদ্রবে আত্মরক্ষা করতে পারে।

মাদ্রাজ

মাদ্রাজ রাজ্যে ৬০ লক্ষ একর জমিতে ধানচাষ হয়। এই জমিগুলি চারটি ভাগে বিভক্ত:

(১) পশ্চিম উপকূল অঞ্চল—এই অঞ্চলে ১০০-১৫০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়।

(২) মধ্য ও পূর্ব উপকূল অঞ্চল—মধ্য অঞ্চলে ৩০ ইঞ্চি এবং পূর্ব উপকূল অঞ্চলে ৪৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়।

(৩) কাবেরী ব-দ্বীপ এলাকা—এখানে প্রায় ৪০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়।

(৪) দক্ষিণ অঞ্চল—এখানে ২৫ থেকে ৩০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়।

কইম্বাটুরে ১৯১৩ সালে প্রথম গবেষণাকেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। এখন এ রাজ্যে মোট ১১টি কেন্দ্র আছে।

কেরল

এই রাজ্যে ১১ লক্ষ একর জমিতে ৩ লক্ষ টন ধান উৎপন্ন হয়। এখানে ছটি গবেষণাকেন্দ্র আছে, এগুলির মধ্যে নাগরকোল-এর কেন্দ্রটি সবচেয়ে পুরানো। এটি ১৯১৪ সালে স্থাপিত।

এ পর্যন্ত ১৪টি উন্নত শ্রেণীর বীজ এই কেন্দ্রগুলি থেকে উৎপাদিত হয়েছে।

মহীশূর

এ রাজ্যে ৮ লক্ষ একর জমিতে ২ লক্ষ টন ধান জন্মে। এখানে নগেনহালিতে একটি পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। ১৯১৭ সালে প্রদর্শন কৃষিক্ষেত্ররূপে এটি কাজ শুরুর করে এবং ১৯২৪ সালে এটিকে চাল গবেষণাকেন্দ্র পরিণত করা হয়।

হায়দ্রাবাদ

এ রাজ্যের শতকরা ৯৫ ভাগ ধানের জমি রাজ্যের পূর্বদিকে অবস্থিত। শতকরা ৪৫ ভাগ ধানের জমিতেই দুবার ফসল ফলানো হয়।

বোম্বাই

বোম্বাই রাজ্যে ২৯ লক্ষ একর জমিতে ১০ লক্ষ টন ধান জন্মে। প্রধানত পশ্চিমঘাট পর্বত ও সাগরের মধ্যবর্তী দীর্ঘ সংকীর্ণ ভূভাগে ধানের চাষ হয়।

এ রাজ্যের ধান্য গবেষণাকেন্দ্রগুলিতে ৪৫ প্রকার বীজ উৎপন্ন করা হয়েছে। তা ছাড়া, কৃষিবিজ্ঞান, জৈবরসায়ন, উদ্ভিদজ দেহবিজ্ঞান, মাঠে ও শস্য-ভান্ডারে কীটের আক্রমণ নিবারণ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশ

এ রাজ্যে একটিমাত্র গবেষণাকেন্দ্র রায়পুরে অবস্থিত। এটি ১৯০৮ সালে স্থাপিত হয় এবং কৃষিবিজ্ঞান, বীজ পরিবর্ধন প্রভৃতি বিষয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে।

বিহার

বিহার রাজ্যে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হয় এবং ৩৩ লক্ষ টন ধান উৎপন্ন হয়। ভারতের মধ্যে এই রাজ্যেই সবচেয়ে বেশি জমিতে ধানের চাষ হয়।

১৯৩২ সালে ভারতীয় কৃষিগবেষণা পরিষদ বীজ উন্নয়নের কাজে অর্থসাহায্য করতে শুরুর করে। এ রাজ্যের প্রধান গবেষণাকেন্দ্র সাবুরে অবস্থিত।

ইদানীং এ রাজ্যকে চারটি কৃষি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে এবং সাবুর ছাড়া পাটনা, রাঁচি এবং পুশাতে আরও তিনটি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপিত

হয়েছে। ১০টি উপকেন্দ্রও স্থাপন করার প্রস্তাব আছে। মোট ১৩ প্রকার উৎকৃষ্ট ধানের বীজ আবিষ্কার করা হয়েছে।

পাঞ্জাব

ভারতের অন্যান্য ধান্যোৎপাদক রাজ্যগুলির মধ্যে পাঞ্জাবের গুরুত্ব খুব কম। এ রাজ্যে একটি গবেষণাকেন্দ্র নাগরতা ভগবানে এবং আর একটি গবেষণাকেন্দ্র গুরুদাসপুরে অবস্থিত।

নাগরতা কেন্দ্র ১৯৩৬ সালে কাজ শুরুর করে। কাঙরা পার্বত্য এলাকায় বুনো ধান একটি গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করেছে। যাতে বুনো ধান থেকে অন্য ধানের পার্থক্য ধরা যায় সেজন্য লাল রঙের ধান্য উৎপাদনের চেষ্টা হচ্ছে।

পাহাড়ী অঞ্চলে তিন প্রকারের চীনা ধান ও তিন জাতের জাপানী ধানের চাষ বেশ ভালো হবে বলে আশা করা যায়।



ভাল জাতের বীজ-আলু

সরকারী বিশেষজ্ঞ কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে উৎপাদিত প্রায় ২০ হাজার মণ রোগমুক্ত ও উন্নত জাতের বীজ-আলু এ বছর সরকারী ঠান্ডা গুদামে (কোল্ড স্টোরেজ) সংরক্ষিত হয়েছে। এই বীজ-আলুর মধ্যে লাল রঙের 'রংবুল-৯' (যা দার্জিলিং লাল গোল আলুর বদলে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে) আছে প্রায় ৫ হাজার মণ এবং 'রয়েল কিড'নি' ও 'আপ টু ডেট' (যা দেখতে রেংগুন আলু-বীজের মত এবং ফলনও দেয় তার মত) আছে প্রায় ১৫ হাজার মণ। 'দু' রকমের বীজ-আলুই ১ ইঞ্চি থেকে ২½ ইঞ্চি মাপের।

বীজ-আলু বিক্রির জন্য দেড়-মণী বস্তায় বোঝাই করা হবে। এরকম দেড়-মণী বস্তা একটা বা তার বেশি নেওয়া যাবে, কিন্তু বস্তা ভেঙে বিক্রি করা হবে না। কাজেই কোন চাষীর কম বীজের দরকার হ'লে তাকে অন্য চাষীর সঙ্গে মিলে পুরো বস্তা খরিদ করতে হবে।

বীজ-আলু কিনবার আগে চাষীরা বা তাদের প্রতিনিধিরা ইচ্ছা করলে খিদিরপুরের ঠান্ডা গুদামে গিয়ে আলুর নমুনা দেখতে পারেন। যারা বীজ-আলু খরিদ করতে ইচ্ছুক, তারা স্থানীয় কৃষি-কর্মচারীর কাছে সম্পূর্ণ টাকা জমা দিলে, তিনি বীজ আনাবার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। কিংবা কলিকাতা থেকেও চাষীরা সরাসরি বীজ-আলু নিতে পারেন। তা যদি নিতে হয় তবে মহাকরণ (রাইটার্স বিল্ডিংস-এর ৩নং ব্লকের চার তলায়) আলু-প্রাধিকারিকের ('স্পেশাল অফিসার পট্যাটোর') কাছে বীজ-আলুর সম্পূর্ণ টাকা জমা দিতে হবে।

উভয় জাতের বীজ-আলুর প্রতি মণের দাম আপনার রেল স্টেশন অবধি পৌঁছাবার যাবতীয়

খরচ সহ ২৮ টাকা পড়বে। পুরো এক লরি বোঝাই বীজ-আলু (কমপক্ষে ৮০ মণ) কিনলে কলিকাতা থেকে ৪০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত পাকা রাস্তার ধারে যে-কোন জায়গায় লরিতে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে; এর জন্য বাড়তি কোন খরচ লাগবে না।

আপনার গ্রামের নাম, আপনার কাছাকাছি রেল-স্টেশনের নাম, আপনার ডাকঘর ও তারঘরের নাম ইত্যাদি বিশদভাবে আপনার চিঠির সঙ্গে স্পষ্টভাবে লিখে দেবেন। সুদূর পল্লীগ্রামে কয়েকজন চাষী মিলে কিংবা ছোট ছোট বেপারীও পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কৃষিবিভাগ থেকে আলু নিতে পারেন, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই বীজ-আলুর সম্পূর্ণ দাম অগ্রিম জমা দিতে হবে।

বীজ-আলু কলিকাতা থেকে রেলগাড়িতে বা লরিতে পাঠাবার ব্যবস্থা কৃষিবিভাগ থেকে করা হবে, কিন্তু পাঠাবার পর পথের মধ্যে বীজ-আলুর ওজনে কমেতি ঘটলে বা অন্য কোন রকমে ক্ষতি হ'লে তার জন্য কৃষিবিভাগ দায়ী হবে না।

কৃষকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সরকারী বীজ-আলু ব্যবহার ক'রে গত কয়েক বছর ধ'রে পশ্চিম বাঙলার অনেক চাষীভাই বেশি ফলন পেয়েছেন। তাই সরকারী বীজ-আলুর চাহিদা বেড়ে গেছে। আপনার বীজ-আলুর দরকার হ'লে, দেরি না ক'রে আলু-প্রাধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-বিভাগ, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১ ঠিকানায় চিঠি লিখে বা আপনার এলাকার কৃষি-কর্মচারীর সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে বীজ-আলু পাবার ব্যবস্থা পাকা ক'রে নিশ্চিন্ত হোন।

টুকিটাকি

কৃষি-গবেষণা সমিতি পুনর্গঠিত

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-বিষয়ক গবেষণা সমিতির পুনর্গঠন করা হয়েছে। এর সভাপতি পশ্চিম-বঙ্গের কৃষি ও পশুপালন বিভাগের মন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ। অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছেনঃ ডাঃ বি সি গুহ, ডি এস-সি, এফ এন আই; অধ্যাপক পি কে সেন; ডাঃ এইচ এন রায়, এম এস-সি, পি-এইচ ডি, এফ এন আই; ডাঃ এ এন বসু, এম এস-সি, পি-এইচ ডি; পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কৃষি, পশুপালন ও বনবিভাগের সচিব; শ্রী জি বি পাল; শ্রী আই বি চট্টোপাধ্যায়; ডাঃ পি এন ভাদুড়ী; ডাঃ এস সি রায়; পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অধিকর্তা; পশ্চিমবঙ্গ কৃষিমহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ; এবং বঙ্গীয় পশুচিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অধিকর্তা এই সমিতির সচিব হিসাবে কাজ করবেন।

এই সমিতির কাজ হবে সরকারকে কৃষি, পশু-পালন ও পশুচিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা-সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে পরামর্শ দান ও সময় সময় কৃষি, পশুপালন ও বনবিভাগের অধীন বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কৃত গবেষণাকার্যের ফলফলের পুনরালোচনা। এই সমিতি সরকারের বিভিন্ন কৃষি-গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেসকল গবেষণার পরিকল্পনা করবে সেগুলো সম্বন্ধেও সরকারকে পরামর্শ দেবে।

কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে শস্যরক্ষা

১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে রাজ্য কৃষিবিভাগ কীট-পতঙ্গ ও ব্যাধির আক্রমণ থেকে শস্যরক্ষার ব্যবস্থা করে আসছেন। এ উদ্দেশ্যে এবং সেই সঙ্গে শস্যরক্ষণের ব্যবস্থাদির গুরুত্ব সম্পর্কে কৃষকদের সচেতন করে তোলবার জন্য রাজ্যসরকার কৃষকদের বিনামূল্যে কীটনাশক ঔষধ এবং তা ছিটাবার

সরঞ্জাম বিতরণ করতেন। ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকে এসব ঔষধ অর্ধমূল্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং ঔষধ ছিটাবার সরঞ্জাম বিনা খরচে ধার হিসাবে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, কৃষিবিভাগের ফসল-সংরক্ষণ শাখা যেসব জায়গায় কীটপতঙ্গ অথবা ব্যাধির মারাত্মক উপদ্রব হয়, সেসব জায়গায় কাজ চালাতে থাকে। বিশেষ প্রয়োজন হলে যাতে সংশ্লিষ্ট জায়গায় কাজ শুরু করা যায় সেজন্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রোগ-কীটনাশক ঔষধ এবং ঔষধ ছিটাবার সরঞ্জামপত্র মজুদ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে জরুরী অবস্থার জন্য প্রায় ১১,০০০ মণ কীটনাশক ঔষধ, ঔষধ ছিটাবার ৮,৫০০টি হাতে-চালানো এবং ১৭৫টি শক্তিশালিত যন্ত্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

চলতি বৎসরে ধানক্ষেতে কীটপতঙ্গের আক্রমণের সংবাদ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া গিয়েছে, তবে দু'-একটি স্থল ছাড়া সর্বত্র এই আক্রমণ বিক্ষিপ্ত-ভাবেই ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এই আক্রমণ কীটপতঙ্গের নয়—'রাংগ' নামক একপ্রকার রোগের। এই রোগ দমনের জন্যও যথাযোগ্য ব্যবস্থাদি করা হয়েছে।

নুতন খাদি এবং গ্রামশিল্প পর্বদ

রাজ্যপাল ১৯৫৭ সালের ১লা অগাস্ট থেকে আরও এক বৎসরের জন্য রাজ্য খাদি এবং গ্রামশিল্প পর্বদের পুনর্গঠনের আদেশ দিয়েছেন। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে নিয়ে এই পর্বদ গঠিত হবেঃ

কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী (পদাধিকারবলে) সভাপতি; কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্প বিভাগের উপমন্ত্রী (পদাধিকারবলে) সহ-সভাপতি; এ ছাড়া সদস্যগণ হচ্ছেন—পশ্চিম-বঙ্গের শিল্প-অধিকর্তা (পদাধিকারবলে); কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্প বিভাগের

সচিব (পদাধিকারবলে); 'অভিন্ন আশ্রম'-এর একজন প্রতিনিধি; বিশ্বভারতীর শ্রী-নিকেতনের একজন প্রতিনিধি; শ্রীযুক্তা অশোকা গুপ্ত, চরকা কেন্দ্র, রাজভবন, কলিকাতা; প্রধান-মন্ত্রীর গ্রাণ তহবিল সমিতির সচিব শ্রীমতী প্রতিমা বসু, ২।২ কেয়াতলা রোড, কলিকাতা; চর্মশিল্পের প্রতিনিধি শ্রীঅমূল্যগোপাল মুস্তাফী; শ্রীপঙ্কজন বসু; হস্তনির্মিত কাগজ শিল্পের প্রতিনিধি ডাঃ দীনেশচন্দ্র তপাদার; নিখিল ভারত খাদি ও গ্রাম-শিল্প পর্ষদের সদস্য শ্রী এ পি চৌধুরী, এম এল সি; পল্লী তৈলশিল্পের প্রতিনিধি শ্রীভক্তচন্দ্র রায়; শ্রীললিত মোহন বর্মণ, শান্তিগড় কলোনি, চিড়িয়া-মোড়, ব্যারাকপুর্; তালগুড় শিল্পের প্রতিনিধি শ্রী বি সি ঘোষ, গ্রাম সফিরাবাদ, পোঃ সায়েস্তানগর, চব্বিশপরগনা; ধানভানা এবং আখগুড় ও খন্দসারী চিনিশিল্পের প্রতিনিধি শ্রী এন সি চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান; এবং গ্রামকুম্ভকার প্রতিনিধি ডাঃ এন সি পাল, ৭৮ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।

পুনর্গঠিত পর্ষদের সুপারিশক্রমে সরকার কর্তৃক সচিব নিযুক্ত হবেন। এরূপ নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত শ্রীপঙ্কজন বসু পর্ষদের সচিবের কাজ করবেন।

পর্ষদের কাজ হবে: (ক) খাদি ও গ্রামশিল্প সংক্রান্ত পরিকল্পনার পরীক্ষা ও এসব বিষয়ে পরামর্শদান, নতুন কোন পরিকল্পনা থাকলে তা সরকারের বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা; (খ) এসব শিল্পের উন্নয়ন-কার্যসূচি সম্পর্কে এবং কর্মীদের শিক্ষণ প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করার জন্য সরকারকে সাহায্য করা; (গ) খাদি ও গ্রামশিল্পজাত জিনিস বাজারে ছাড়ার পরিকল্পনা কার্যকরী করার ও তৎসম্পর্কিত সমস্যা-বলী বিবেচনা ও সেবিষয়ে গবেষণার জন্য সরকারকে সাহায্য করা; (ঘ) বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুসারে কৃত কার্যগুলির অগ্রগতির সাময়িক পর্যালোচনা;

(ঙ) সরকার সময় সময় যেসব বিষয়ের পরামর্শ-দানের জন্য নির্দেশ দেন, সেসব বিষয়ে পরামর্শ-দান, এবং (চ) খাদি এবং তাল সংশ্লিষ্ট গ্রামশিল্প-গুলির সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সরকার পর্ষদকে যেসব নির্বাহিক কার্য ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেন সেসব প্রয়োগ করা।

এই পর্ষদ ভারত-সরকারের স্থাপিত নিখিল ভারত খাদি ও গ্রামশিল্প কমিশনের সঙ্গে সহ-যোগিতা সহকারে কাজ করবে।

আদিবাসী এলাকায় ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার পশ্চিম দিনাজপুরের কুশমন্ডি থানার দেউলবাড়ি বাঁধ পরিকল্পনার কার্য নিব্বাহের জন্য ১৯৫৭-৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অধিকর্তার ব্যবস্থাধীনে ৫,৬৭০ টাকা মঞ্জুর করেছেন। উক্ত পরিকল্পনা ১৯৫৫-৫৬ সালে অনুমোদন করা হলেও সেই বৎসর কার্যকরী করা যায় নি।

আদিবাসী-কল্যাণে সেচের বাঁধ নির্মাণের জন্য সাহায্য

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার তফসিলী আদিবাসীদের কল্যাণ-মূলক পরিকল্পনা সম্পর্কে বাঁকুড়া জেলার খাতা থানাস্থিত নন্দা ও বাঙ্গার জোড়ের উপর একটি বাঁধ নির্মাণের জন্য ১৯৫৭-৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের সেচবিভাগের মুখ্য বাস্তুকারের ব্যবস্থাধীনে ৩০,০৬৪ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

আদিবাসীদের জন্য মৌমাছিপালনের ব্যবস্থা

দার্জিলিং জেলার তফসিলী আদিবাসীদের মধ্যে মৌমাছিপালন প্রবর্তন পরিকল্পনা সম্পর্কে ১৯৫৭-৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার দার্জিলিংয়ের কৃষি-অধীক্ষকের ব্যবস্থাধীনে ১১,৪০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন। এ থেকে ৫,৪০০ টাকা রামকৃষ্ণ মিশনকে

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

দেওয়া হবে এবং ৬,০০০ টাকা মাথাপিছু ৭৫ টাকা হিসাবে ৮০ জন শিক্ষণপ্রাপ্ত আদিবাসীদের সাহায্যের জন্য ব্যয়িত হবে।

ময়ূরাক্ষী-অঞ্চলে সেচের জন্য স্বল্প- বায়ের জল

ময়ূরাক্ষী-অঞ্চলে রবিশস্য আবাদের কাজে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আগামী রবিশস্যের মরসুমে একর-প্রতি ১৫ টাকা স্থলে মাত্র ৭৥ টাকা হারে জলসেচনের সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। আরও স্থির হয়েছে যে, খাল থেকে জল তুলে রবিশস্যে সেচ দেওয়ার জন্য চাষীদের কাছ থেকে একরপ্রতি ৭৥ টাকার অর্ধেক নেওয়া হবে এবং এই সেচের জন্য পদ্ধিকরণী পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে প্রতি ১০,০০০ ঘনফুটে এক টাকা হার ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু এসব সুবিধা যাঁরা গ্রহণ করতে চান সেইসব চাষীকে চুক্তিপত্র লিখে দিতে হবে।

আদিবাসী-এলাকায় সমবায় দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন সমিতি

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার চলতি আর্থিক বৎসরে নিম্ন-লিখিত দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন সমিতিগুলির প্রতিষ্ঠা মঞ্জুর করেছেন:

বাঁকুড়া জেলার পিয়রডোবার পিয়রডোবা আদিবাসী সর্বকল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেড, জলপাইগুড়ি জেলার মাদারিহাট আদিবাসী সমবায় ক্রিমারি সোসাইটি লিঃ এবং কামাখ্যাগুড়ি আদিবাসী সমবায় ক্রিমারি সোসাইটি লিমিটেড।

এ ছাড়া, চলতি আর্থিক বৎসরে পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে আনুমানিক অনাবর্তক ব্যয়স্বরূপ উপরোক্ত সমিতিগুলির প্রত্যেকটির জন্য ৬,৩৬৩ টাকা হিসাবে সহায়ক-অনুদান দেওয়া সরকার মঞ্জুর করেছেন।



সম্পাদক : শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা।
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী
মুদ্রণে অধীক্ষক শ্রীশুভেন্দ্র মুনোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।



বঙ্গবন্ধু : ১০ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা



নতুন গাছের নতুন রস

বন্যুক্ষরা

১০ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪

প্রসঙ্গ

এক সময়ে আমাদের অরণ্যভূমি বহু প্রকারের বহু জাতীয় পশুপাখির নিরাপদ বাসস্থল ছিল। মানুষের সঙ্গে তাদের কোন বিরোধ ছিল না—তাদের উপরে মানুষের কোন বিদ্বেষ ছিল না। শ্বাপদ-সংকুল অরণ্যে মৃনিঋষিরা তপশ্চরণ করতেন, বাসও করতেন ; কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এমন একটি নজিরও বোধহয় নেই—যা থেকে জানা যায় যে, কোন বন্যপ্রাণীর স্বারা কোন মানুষের কিছুমাত্র ক্ষতি হয়েছে।

একালে কিন্তু বনে মানুষের আর বন্যপ্রাণীর একত্র বাসের কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেন না। কেন এমন হল? বনবাসী ফলমূলসহায়ী মৃনিঋষিরা ছিলেন হিংসাম্বেষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, বনের পশুপাখির জন্য তাঁদের মনে করুণার অন্ত ছিল না—তাঁদের আচরণ থেকে বনের প্রাণীরাও তা নিঃসংশয়ে বুঝে নিয়োঁছিল, তাই বনবাসী সেইসব মানুষের সম্বন্ধেও তাদের মনে ছিল না বিদ্বেষ। কিন্তু ক্রমেই পরবর্তিকালের মানুষের বধ্য হয়ে পড়ল বনের প্রাণীরা। কোন কোন প্রাণীকে মানুষ খাদ্য-হিসাবে বধ করতে লাগল আর কোন কোন প্রাণীকে হত্যা করতে লাগল শত্রু হিসাবে, কোন কোন প্রাণীকে পণ্য হিসাবে। হরিণের মাংস সুখাদ্য, তার চামড়া বিক্রি করলে টাকা আসে। কুমিরের মাংসও কোন কোন জায়গার অধিবাসীরা খেয়ে থাকে, আর তার চামড়া বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যায়। বাঘ বধ্য শত্রু হিসাবে, টাকার বাজারে তার চামড়ারও কদর যথেষ্ট। নানা রকমের পাখির পালক বিক্রি করে বেশ টাকা পাওয়া যায়। অনেক পাখির মাংসও খাদ্য হিসাবে সমাদৃত।

এমনি লোভের আর স্বার্থের বশে, শিকারের আর বীরত্বের নামে বন্যপ্রাণী হত্যা করে করে মানুষ এমন শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে, অনেক বিশিষ্ট বিচিত্র বন্যপ্রাণীর বংশ আজ লোপ পেতে বসেছে এবং কোন কোন প্রাণীর বংশ একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতির বাঁধা বিধানে বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, সে বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করলে প্রকৃতির শাস্তি অনিবার্য হয়ে ওঠে। বনের সবল প্রাণী দুর্বলতর প্রাণীকে হত্যা করে তার মাংস খেয়ে জীবনধারণ করে—এটা হচ্ছে প্রকৃতির বিধান। সেই হত্যার ফলে কোন প্রাণী নিবংশ হয়ে যায় না, বরং তার বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং প্রকৃতির সন্তান মানুষেরও তাতে উপকারই হয়। হরিণ, হাতি প্রভৃতি কতকগুলো প্রাণী তৃণভোজী, আবার এদের মাংস খেয়ে বাঘ, সিংহ প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীরা বেঁচে থাকে। মাংসভোজী প্রাণীদের ভয়ে তৃণভোজী প্রাণীরা যথেষ্ট বিচরণ করতে পারে না, কিন্তু তারা নিভয়ে স্বেচ্ছাবিহার করতে পেলো, বনের বাইরে এসে মানুষের কৃষির সর্বনাশ করে ; সুতরাং তাদের আক্রমণ থেকে কৃষিরক্ষা করতে হলে বনের মাংসাশী প্রাণীদেরও আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

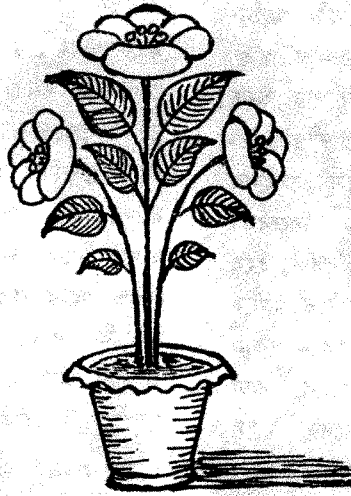
বাঘ কেন তার অরণ্য থেকে লোকালয়ে এসে মানুষের গৃহপালিত গোরুছাগলের ঘাড় ভাঙে, কেন বাঘ তার আয়ত্তে মানুষকে পেলো বধ করে তার মাংস খায়, তার কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, এর জন্যে সাধারণভাবে মানুষই দায়ী। মানুষ যখন বনে গিয়ে হরিণ শত্রুর প্রভৃতি বাঘের খাদ্য-পশু মেরে নিবংশ করে, তখন বনের মধ্যে খাদ্য না

পেয়ে প্রাণধারণের স্বাভাবিক তাগিদে বাঘ লোকালয়ে এসে পড়ে অথবা নানা কাজে মানুষ বনের ভিতর গেলে তারই ঘাড় ভেঙে নিজের ক্ষুধা-নিবারণ করে।

বন্যপ্রাণী যথেষ্ট বিনাশ করে কীভাবে মানুষ নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছে এবং প্রকৃতির বিধান মেনে নিয়ে বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ করলে কীভাবে মানুষের কল্যাণ হতে পারে, সে বিষয়ে এ সংখ্যায় এক বিস্তৃত প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে, সুতরাং এখানে আর তার পুনরুজ্জ্বলনের প্রয়োজন নেই।

নিজের বাঁচার অধিকারের মত বন্যপ্রাণীর বাঁচার অধিকারও মানুষকে অন্তর দিয়ে মেনে নিতে হবে।

মানুষের হাতিয়ার আছে, হত্যার বহু কৌশল তার আয়ত্তে, তাই বিশালকায় হাতি, বিরাটদেহ গন্ডার, বিপুল-শক্তির বাঘ থেকে সমস্ত বন্যপ্রাণী তাদের অস্তিত্ব-রক্ষার জন্য মানুষের সুবিবেচনা, করুণা আর কল্যাণবুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। বন্যপ্রাণীদের সম্বন্ধে আমরা যদি নিজেদের বিবেচনাকে সুপথে চালিত করি, নিজেদের নৃশংসতা দমন করে আমরা যদি করুণাশীল হয়ে উঠি, নিজেদের রসনার আর স্বার্থের লোভকে দমন করে যদি জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি, তাতে বন্যপ্রাণীর কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও অশেষ মঙ্গল সাধিত হবে।



বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

ঐশ্বর্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়,

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও বন বিভাগের উপমন্ত্রী

বন্যপ্রাণী সাধারণত রাজ্যের বিশেষ বিশেষ প্রান্তে বনাঞ্চলে বাস করে ; শহরবাসী বা গ্রামবাসী দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ তাদের খবর খুব কমই রাখেন। তাই বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে জ্ঞান ও উৎসাহ সাধারণত পৃথিব্যগত বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বন্যপ্রাণীর উল্লেখমাত্রই তার হিংস্র রূপটি সর্বপ্রথমে আমাদের চোখের সামনে দেখা দেয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে বন্যপ্রাণীর অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত, শান্ত ও কল্যাণের রূপটি আমাদের কল্পনার বাইরেই থেকে যায়। তাই, স্বাভাবিকভাবেই এই প্রাণিজগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট—আমাদের আগ্রহ অন্যান্য সমস্যার তুলনায় অনেক কম।

অথচ এই বন্যপ্রাণিজগৎ আমাদের এক বিরাট জাতীয় সম্পদ ; কৃষক, শ্রমিক, চাকরিজীবী, শিকারী, বিজ্ঞানী—এক কথায় দেশের প্রত্যেকটি জনসাধারণ এই প্রাণিজগতের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে—কিরূপে? সংক্ষেপে সেই কথাই বলছি।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্য, কাব্য ও ধর্মগ্রন্থ প্রাণ-সম্পদের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব-বিহীন, বন্যপক্ষীর কূজনশব্দ তপোবন বা আশ্রমের বর্ণনার কথা আমরা কল্পনায় আনতে পারি কি? দেশের সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যের সঙ্গে এই প্রাণ-জগতের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষারূপে ভারতীয় কলার একান্ত নিদর্শন তাজমহল বা অজন্তার মতই রাজকীয় সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হস্তী, শক্তি ও সাহসের মূর্ত প্রতীক, ব্যাঘ্র চিতল হরিণ বা বর্ণচ্ছটাদীপ্ত ময়ূরের কথা আমরা ভুলতে পারি কি?

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রাণিজগতের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যস্বীকার্য। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী যখন স্বাভাবিকভাবে প্রাণিজগতের ধ্বংস ও বৃদ্ধি হয় তখন এই সাম্য রক্ষা হয়। মানুষের হস্তক্ষেপ কিন্তু এই প্রথায় বিপর্যয় ঘটায়। নির্বিচারে হরিণ বা শূকর ধ্বংস করে আমরা যখন সেই সাম্যটুকু নষ্ট করি, তখনই ব্যাঘ্র নরখাদকে পরিণত হয়—জঙ্গল ছেড়ে মানুষের বাসস্থানে এসে উৎপাত করে। অন্যদিকে আবার ব্যাঘ্রজগৎকে নির্বিচারে ধ্বংস করলে হরিণ বা শূকরের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে, শস্যক্ষেত্র রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রাণিজগতের সাহায্য ব্যতীত আমাদের কৃষিকার্য একদিনের জন্যও সম্ভব হয় না। প্রতিদিন অসংখ্য কীটপতঙ্গ ধ্বংস করে এরা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কৃষির সহায়তা করে।

ভারতের প্রাণিসম্পদ বিশ্বের বিস্ময়বস্তু। অন্যান্য দেশের চাঁড়িয়াখানা এবং জাতীয় উদ্যানের জন্য বা বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্যে বিশ্বের বাজারে ভারতীয় প্রাণিসম্পদের চাহিদা অত্যন্ত বেশি। বৈজ্ঞানিক প্রথায় বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও সংখ্যাবৃদ্ধি হলে এই বাবত আমাদের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হতে পারে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐতিহাসিক স্মারকচিহ্ন প্রভৃতির মতই দেশের প্রাণিসম্পদ বৈদেশিক ভ্রমণকারীকে স্বভাবতই আকর্ষণ করে এবং আমাদের প্রচুর আয়ের পথ উন্মুক্ত করে।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বনভূমির পরিমাণ দেশের আয়তনের তুলনায় কম, এবং সংখ্যায় সামান্য হলেও আমাদের প্রাণিসম্পদ বৈচিত্র্যবহুল। যখন অকারণে ব্যস্ত ও বিরত করে তোলা হ'ত না, তখন অরণ্যের

এই অধিবাসীদের নিৰ্ভয়ে বিচরণ করতে দেখা যেত, সংখ্যায়ও তারা ছিল প্রচুর। অরণ্যচারী এইসব প্রাণীর মধ্যে এখনও যারা জীবনসংগ্রামে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রাণী এক-শিঙা গন্ডার। এককালে সুন্দরবনের জঙ্গলেও তাদের দেখা যেত; বর্তমানে তারা উত্তরবাঙলার বনাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। এই অঞ্চলে বন্যহস্তী, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, চিতা বাঘ, বাইসন, বন্য-মহিষ, কৃষ্ণভল্লুক, সম্বর ও বিভিন্ন জাতের হরিণ এবং নানা রকমের পাখি বাস করে। দক্ষিণ অঞ্চলে একমাত্র সুন্দরবন ছাড়া অন্যান্য জঙ্গলে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা বর্তমানে নিতান্তই নগণ্য। সুন্দরবনের ডাঙায় বাঘ ও জলে কুমিরের কথা আমাদের সকলেরই জানা আছে। এই বনের সবচেয়ে সুন্দর প্রাণী চিতল হরিণ; কিন্তু এরা হত্যালিপ্সু তথাকথিত শিকারীর হাতে অস্তিত্ববিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বিগত কয়েক শতাব্দীর যথেষ্ট হত্যালীলার ফলে একে একে আমাদের বহু মূল্যবান প্রাণী বিলুপ্তির পথে এগিয়ে গেছে। তাই আজ বিশেষ রক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছে। যে সামান্য সম্পদ এখনও অবশিষ্ট আছে, যথার্থ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার সংরক্ষণ ও সংবর্ধন করতে পারলেই আমরা ভবিষ্যৎযুগের দেশবাসীর কাছে অবহেলার অভিযোগের লজ্জা থেকে মুক্ত হতে পারব।

এই কার্যে অন্তত আংশিক সফলতা অর্জনও অত্যন্ত দূরূহ ও সময়সাপেক্ষ। বনের মূল অধিবাসীদের প্রতি সত্যিকারের দরদ যদিই আমরা সবাই সমানে অনুভব করতে পারব, সেদিনই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। এই উদ্দেশ্যে আন্তরিক

প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও সংবর্ধনের সম্বন্ধে সরকারকে উপদেশ দেবার জন্য বিজ্ঞানী, বিশিষ্ট প্রাণিতত্ত্ববিদ এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এই সংস্থা ইতিমধ্যেই অনেকগুলি বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন এবং তদনুযায়ী কাজ হচ্ছে। এদেরই পরামর্শক্রমে বন্যপ্রাণী-সংরক্ষণের জন্য শীঘ্রই নতুন একটি আইন প্রণয়নের কথা সরকার বিবেচনা করছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় বন্যপ্রাণী-সংরক্ষণের ও জনসাধারণের উৎসাহ সৃষ্টি করার জন্য বিশেষ কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা-কালের মধ্যেই আলিপুরদুয়ার মহকুমায় গন্ডারের বাসভূমি জলদাপাড়ার অভয়া-রণ্যাটিকে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাষ্ট্রীয় উদ্যান বা 'ন্যাশন্যাল পার্ক'এ পরিণত করা হবে। এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য উন্নতিমূলক কাজের মধ্যে এখানে দর্শকদের থাকবার সুবন্দোবস্ত করা হবে এবং যাতে তারা হস্তিপৃষ্ঠে এই উদ্যানের সর্বত্র প্রাকৃতিক পরিবেশে বন্যপ্রাণী দেখতে পান তার ব্যবস্থা করা হবে। বনাঞ্চলে আরও যে ৫টি অভয়ারণ্য আছে সেগুলিরও উন্নতিবিধান করা হবে।

নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বন্যপ্রাণী-সংরক্ষণ-সম্প্রদায় পালনের ব্যবস্থা করেছি আমরা ডিসেম্বর মাসে। আসুন, এ উপলক্ষে আমরা প্রত্যেকে বন্য-প্রাণীর সংরক্ষণের দায়িত্ব আন্তরিকভাবে গ্রহণ করি এবং সন্মিলিত কণ্ঠে শপথ গ্রহণ করি—“দেশের বন ও প্রাণিসম্পদকে নির্বিচার ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করব বলে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হচ্ছি।”*

*কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের সৌজন্যে

পশ্চিমবঙ্গের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও তাহার আবশ্যকতা

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

গত পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের মধ্যে বাঙলার স্থানে স্থানে শিকারযোগ্য বন্যপ্রাণীর সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে ; এমন কি স্থানবিশেষে কোন কোন প্রাণী সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত খুলনা জেলার 'গেজেটিয়ার' হইতে জানা যায় যে, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সুন্দরবনে একশৃঙ্গ গন্ডার ও বন্যমহিষ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্তও এই দুইটি প্রাণী উক্ত জঙ্গলে অল্পবিস্তর দেখা যাইত ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এখন সুন্দরবনে ইহাদের কোন অস্তিত্বই নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত ময়মনসিংহ জেলায় গারো পাহাড়ের সন্নিহিতবর্তী স্থানসমূহে গন্ডার, বন্যমহিষ, নানাজাতীয় হরিণ, ব্যাঘ্র, ময়ূর, তিতির প্রভৃতি শিকারযোগ্য পশুপক্ষী যথেষ্ট ছিল ; কিন্তু অধুনা ঐ অঞ্চলেও গন্ডার ও বন্যমহিষ সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে এবং অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে কদাচিত্ দুই-একটি ব্যাঘ্র, হরিণ, ময়ূর ও তিতির দেখিতে পাওয়া যায়। পঁচিশ-তিরিশ বৎসর পূর্বে মালদহ জেলায় নীলগাই, পশ্চিমবঙ্গে কৃষ্ণসার আর উত্তরবঙ্গে ডুয়াস ও তেরাই অঞ্চলে ডাহর পক্ষী ('ফ্লোরিকান') যথেষ্ট দেখা যাইত ; অধুনা বাঙলাদেশের কোথাও ইহাদের পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

বন্যপ্রাণীর এইরূপ বিরলতা যে প্রাকৃতিক নিয়মে অথবা দৈবদুর্বিপাকে ঘটিয়াছে তাহা নহে, বরং তাহাদের সহিত বৃদ্ধিমান ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে বলীমান মানুষের নিষ্ঠুর এবং যথেষ্ট

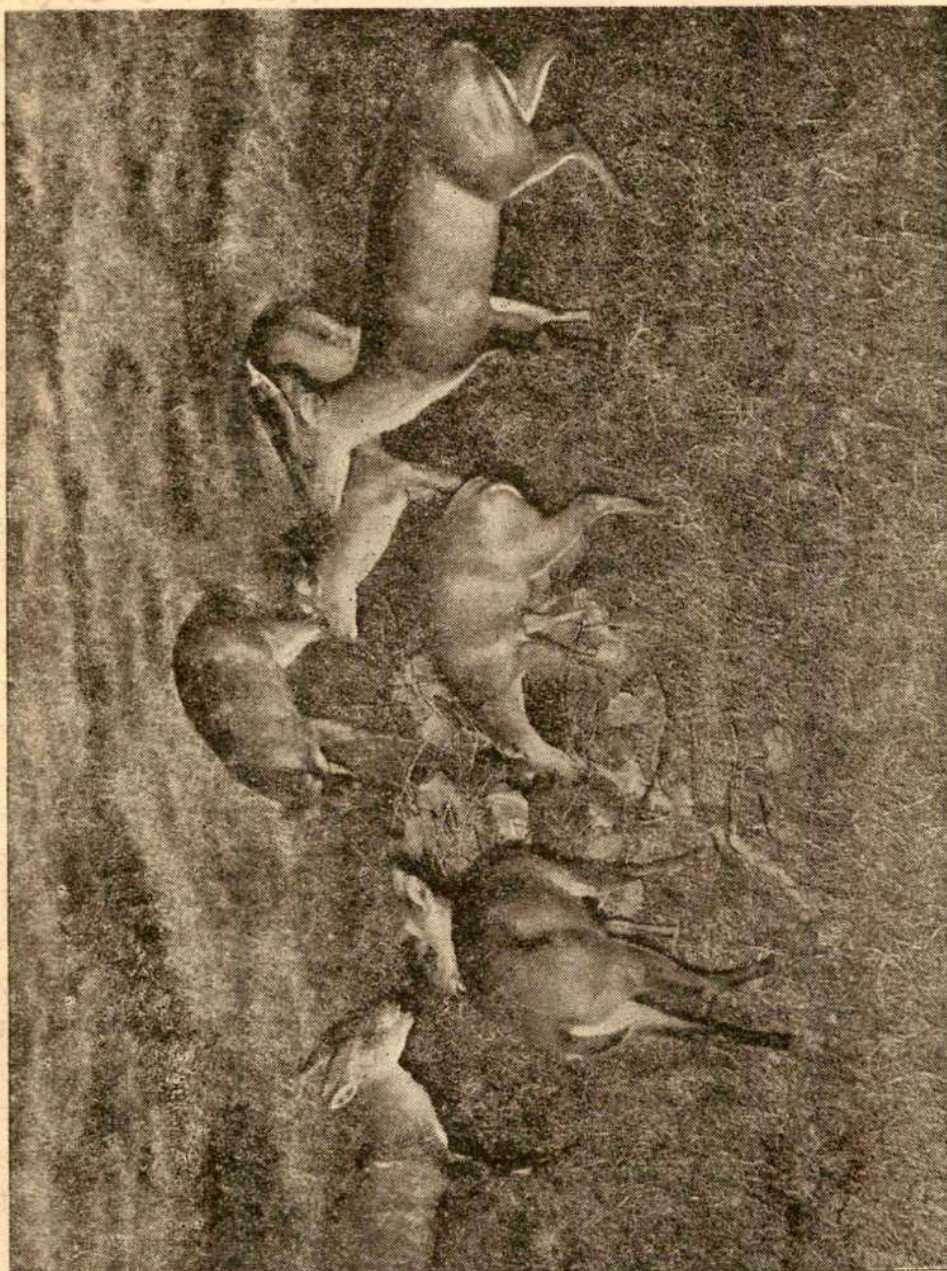
ব্যবহারই ইহার মূখ্য কারণ। একমাত্র গৃহপালিত পশুপক্ষী ব্যতীত অন্যান্য জীবজন্তুর এ-জগতে থাকার কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া সাধারণ লোকে মনে করে না ; কারণ, অনেক জীবজন্তুর ম্বারাই উদ্ভিদ ও মনুষ্যসমাজের যে মহান কল্যাণ সাধিত হয় সে-সম্বন্ধে জনসাধারণের জ্ঞানের একান্ত অভাব। তাহারা সুযোগ পাইলেই বন্য পশুপক্ষীদিগকে বধ করিতে সব সময়ে প্রস্তুত ; কারণ কোনটার মাংস খাইতে সুস্বাদ, কোনটা তাহাদের ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করে, অথবা কোনটা তাহাদের গৃহপালিত পশু হত্যা করে। তাহাদের দৃষ্টিতে বন্যপ্রাণী মাত্রই হয় শত্রুবোধে না হয় খাদ্যহিসাবে বধ্য। ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীরা অপকারী পতঙ্গের মত গণ্য হয় ; উহাদের বিরুদ্ধে সাধারণ জনমত এত হিংস্র যে, উহাদের নির্মূল উচ্ছেদসাধন ব্যতীত আর কিছুই তাহা শান্ত করিতে পারে না। ইহার উপর আধুনিক দ্রুতগামী যানবাহন, শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্র, বৈদ্যুতিক 'টর্চ' প্রভৃতির প্রচলন-বৃদ্ধির ফলে বন্যপ্রাণীর অবাধ হত্যা অনেকটা সহজসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। আবার উত্তরোত্তর প্রজাবৃদ্ধি, তাহার ফলে কৃষির বিস্তার এবং বনজঙ্গলের প্রভূত সংকোচন হওয়াতে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস-প্রাপ্ত হইতেছে এবং স্থানবিশেষে কোন কোন জাতির প্রাণী সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে।

এইরূপে বন্যপ্রাণিসংখ্যা কমিতে থাকিলে ইহার পরিণাম যে কী হইবে তাহা ধীরভাবে চিন্তা

বঙ্গবন্ধু : ১০ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

শিল্পচিত্র চক্ৰাচরবন্দী

চাট্রাত ও ১৯৮৭



অন্যায় করিণীকর প্রতি ও মা'মু'বের নির্মমতার অস্ত্র নাট

করিয়া দেখিবার দিন আসিয়াছে। মানুষের জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই এই সত্য অনুভূত হইতেছে যে, জগতে কিছুই নিরর্থক সৃষ্ট হয় নাই। আপাতদৃষ্টিতে অকল্যাণকর ও আবহুণীয় মনে হইলেও, জগতে প্রত্যেক প্রাণীটির একটা-না-একটা সার্থকতা আছে; এবং প্রাকৃতিক নির্দিষ্ট নিয়মে যে যাহার কর্তব্য যথার্থ সম্পাদন করিয়া প্রকৃতির সাম্যাবস্থা রক্ষা করিতেছে। অনেকে মনে করেন, যেসকল প্রাণী হইতে মানুষের প্রাণহানি হইবার আশঙ্কা আছে, আর যেসকল পশুপক্ষী হইতে ফলের বাগান বা শস্যক্ষেত্রের কোনরূপ অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে, বিনা বিধায় তাহাদের উচ্ছেদসাধন করা চলে। তাহাদের মতে কেবল যেসকল প্রাণী মানুষের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে উপকারী তাহাদের রক্ষা করিলেই যথেষ্ট। এই ধারণা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক, কারণ উপস্থিত প্রাণিকুলের (ফানা') যে-কোন একটি জাতির 'স্পীসিস' আংশিক বা পূর্ণ উচ্ছেদ হইলে তাহার ফল যে কী দাঁড়াইবে তাহা কেহই বলিতে পারে না।

গত মহাযুদ্ধের পূর্বে পশ্চিম আফ্রিকার ট্যাঙ্গানিকা প্রদেশ যখন জার্মানীর অধিকারে ছিল, তখন সেখানে সিংহ বধ করিবার জন্য পুরস্কার দেওয়া হইত। কিন্তু পুরস্কারের লোভে অত্যধিক সিংহ নিহত হওয়ায় সেখানে বন্যবরাহের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় এবং তাহাদের অত্যাচারে কৃষির এত ক্ষতি হইতে থাকে যে, তথাকার ঔপনিবেশিকেরা সিংহ-হত্যাকারীকে পুরস্কার দেওয়ার রীতি বন্ধ করিতে অনুরোধ করিয়া সেখানকার শাসনকর্তাদের নিকট দরখাস্ত করেন। এই দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, হিংস্র পশুদের বিলোপ হইলে বা তাহাদের সংখ্যা অস্বাভাবিক হ্রাস পাইলে, যেসকল জন্তু উহাদের স্বাভাবিক খাদ্য, তাহাদের সংখ্যা অচিরে এত বেশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে যে, তাহাতে মানবসমাজের বিশেষ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। বস্তুত বাঘ ও চিতাবাঘের সংখ্যা কমিলেই হরিণ ও বন্যবরাহের সংখ্যা

বাড়িতে দেখা যায় এবং তাহার ফলে বন, বাগান ও কৃষির ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়া যায়। পক্ষান্তরে হরিণ ও বন্যবরাহের সংখ্যা কমিলেও বাঘের অত্যাচার বাড়ে। ১৯০৯ সালে যে ভীষণ ঝড় ও বন্যা হয় তাহার ফলে সুন্দরবনে বিস্তর হরিণ ও বন্যবরাহ মারা যায়; এইরূপে তথাকার ব্যাঘ্রের স্বাভাবিক খাদ্যের অভাবে ঘটাতে, তৎপরবর্তী কয়েক বৎসর ধরিয়া সুন্দরবনে ব্যাঘ্রের অত্যাচারে অপেক্ষাকৃত বেশি লোক নিহত হইয়াছিল।

নির্বিচারে একটি সামান্য পক্ষীর সংখ্যা অত্যধিক হ্রাস করা যে বিপজ্জনক, তাহার উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কিছুকাল পূর্বে ইউরোপের হাঙ্গেরী প্রদেশে কৃষির অনিষ্ট-কারী মনে করিয়া চড়ুই-পক্ষীর একজাতীয় পক্ষীকে একবার নিমূল করা হইয়াছিল; কিন্তু ইহার ফলে শস্যবিনাশী পতঙ্গের বংশ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং শস্য পূর্বাপেক্ষা এত বেশি নষ্ট হইতে থাকে যে, ঐ ঘটনার পাঁচ বৎসরের মধ্যে ঐ পক্ষীকে উক্ত দেশে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

বস্তুত নানাদেশের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, অবাধ-হত্যা করিয়া কোন প্রাণীর সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধন বা তাহার সংখ্যা অস্বাভাবিক হ্রাস করা বিপজ্জনক ও অশেষ অমঙ্গলকর হইতে পারে। বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর নিজেদের মধ্যে, এবং উহাদের ও উদ্ভিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ অত্যন্ত জটিল এবং এই বিষয়ে আমাদের উপস্থিত জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ। উদ্ভিদের অনিষ্টকারী এমন বহুজাতীয় কীটপতঙ্গ আছে যাহার ইয়ত্তা নাই। উদ্ভিদের কান্ড, শিকড়, ফুল, ফল ইত্যাদি এমন কোন অংশ নাই যাহা কোন-না-কোন প্রকার পতঙ্গের দ্বারা আক্রান্ত হয় না। এইরকম পতঙ্গ এত বেশি প্রকারের, আর ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধির হার এবং খাদ্যের ব্যাপকতা ও পরিমাণ এত অধিক যে, উহারা যদি অবাধে বংশবৃদ্ধি করার সুযোগ পায়, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যে পৃথিবী

উদ্ভিদশূন্য হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। পতঙ্গের বংশবৃদ্ধি বিভিন্ন জাতীয় পক্ষী, গোসাপ, বনরুই ('প্যাংগোলিন'), ভাম প্রভৃতি স্বাভাবিক শত্রুদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ফুলের বিচিত্র বর্ণ, সঙ্গন্ধ অথবা সুমিষ্ট রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নানা-জাতীয় পক্ষী ও পতঙ্গ বৃদ্ধ হইতে বৃক্ষান্তরে বিচরণ করিবার সময় এক ফুলের রেণু ও অন্য ফুলের গর্ভকেশরের সংযোগ ঘটে—তাহাতে উদ্ভিদের বংশরক্ষা-কার্যে সহায়তা হয়। আবার নানা উদ্ভিদের ফল ও তদন্তর্গত বীজ নানা-প্রাণীর উদরস্থ হইয়া অথবা উহাদের লোমাবৃত দেহে সংলগ্ন হইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয় এবং এইভাবে নানাজাতীয় উদ্ভিদের বংশ-বিস্তার হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরতা ও তাহাদের জীবনসমস্যা-সমাধানের এইরূপ অপূর্ব ব্যবস্থা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীদেরও বিস্ময় উৎপাদন করে।

কোটি কোটি যুগ ধরিয়া জঙ্গল ও বন্যপ্রাণীর অভিব্যক্তি ('ইভল্যুশন') একই পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পরিবেশের ('এন্ভায়রন্মেন্টস্') মধ্যে পাশাপাশি হইয়াছে ও হইতেছে এবং যেহেতু উভয়েই একই পরিবেশের অংশ, জঙ্গল ও তথাকার প্রাণী যে পরস্পরের উপর একান্ত নির্ভরশীল হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। একদিকে প্রাণীরা তাহাদের আহার ও আশ্রয়ের জন্য জঙ্গলের কাছে ঋণী, অন্যদিকে জঙ্গলের গাছপালা তাহাদের বংশরক্ষা ও বংশ-বিস্তারের জন্য অনেকাংশে বন্য পশুপক্ষী-পতঙ্গাদির উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক জঙ্গল ও সেই জঙ্গলের ছোটবড় সব প্রাণী মিলিয়া এমন একটি সংঘ গঠিত হয় যে, তাহার বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ এবং তাহার অন্তর্গত প্রত্যেক অংশের নির্দিষ্ট কার্য যথাযথ সাধনের উপর তাহাদের নিজ নিজ চিরস্থায়িত্ব নির্ভর করে, অর্থাৎ বনজঙ্গল ও বন্যপ্রাণী—এই দুই সমাজ এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে

পরস্পরনির্ভরশীল যে, একের উচ্ছেদে অন্যের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী এবং তাহার অনিবার্য পরিণাম মরু-সৃষ্টি।

এই দুই সমাজের সহিত মানুষসমাজও ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং উহাদের উপযুক্ত সংরক্ষণের উপর মানুষের অনেক প্রকার কল্যাণ নির্ভর করে। কিন্তু মানুষই মৃগয়াজনিত আনন্দ বা খাদ্যের লোভে অথবা অমূলক আক্রোশের বশে বন্যপ্রাণীর নির্বিচার সংহার করিয়া এবং শিল্প ও কৃষির প্রসারের উদ্দেশ্যে বনজঙ্গলের অপব্যবহার ও তাহার অস্বাভাবিক সংকোচন করিয়া এই দুই সমাজে ঘোরতর বিপর্যয় ঘটায় ও নিজেদের সর্বনাশের পথ নিজেরাই প্রস্তুত করে। যে কৃষির প্রসারের উদ্দেশ্যে সাধারণত বনজঙ্গলের সংকোচন করা হইতেছে এবং যে কৃষিরক্ষা করিবার অছিলায় জীবজন্তু সমূলে উচ্ছেদ করা হইতেছে, তাহাদের উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে সেই কৃষিরই যে সমৃদ্ধি ক্ষতি হইতেছে তাহা অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না। কিন্তু ইহা অতি সত্য যে, উপযুক্ত পরিমাণ বন্যপ্রাণী না থাকিলে বনজঙ্গল টিকিতে পারে না; আর বনজঙ্গলের অভাবে পাহাড়গাত্র সহজেই ধ্বসিয়া পড়ে, জলের উৎস শুকাইয়া যায়, ভূপৃষ্ঠের মাটি ('সারফেস সয়েল') অতি সহজে ক্ষয় পায় ('ইরোসান'), মাটির অভাবে ক্ষেত্রের উর্বরতা নষ্ট হয়, নদনদী শীঘ্র মজিয়া যায়, বন্যার প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং এইসকলের ফলে কৃষির অপরিমিত ক্ষতি হয়। ইহার দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে যত্নতর, বিশেষত বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায় দেখা যায়।

বন্যপ্রাণীরা যে বনজঙ্গলের চিরস্থায়িত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করে, এই পরম সত্য সাধারণের নিকট সহজবোধ্য না হইতে পারে, কিন্তু বোধহয় সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন যে, প্রাণিকুলের অভাবে বন ও পল্লী-অঞ্চলের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও আকর্ষণ কমিয়া যাইবে এবং দেশের অধিবাসীরা

টাকা

শিকার করা, বন্যপ্রাণীর ফটো তোলা, তাহাদের পর্যবেক্ষণ করা কিংবা তাহাদের স্বভাব ও গতি-বিধি ইত্যাদি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা—এইসকল স্বাস্থ্যকর, উত্তেজনাময় ও কোতাহলোন্দীপক আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইবেন। বন্যপ্রাণী ও তাহাদের আশ্রয়স্থান বনজঙ্গল বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশাল ক্ষেত্র; এই ফলপ্রসূ ক্ষেত্র হইতে বহু তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। তাহা ছাড়া, আর্থনৈতিক দিক দিয়া চিন্তা করিলেও দেখা যাইবে যে, বন্যপ্রাণিসমূহ বাস্তবিকই বিশেষ মূল্যবান জাতীয়-সম্পদ।

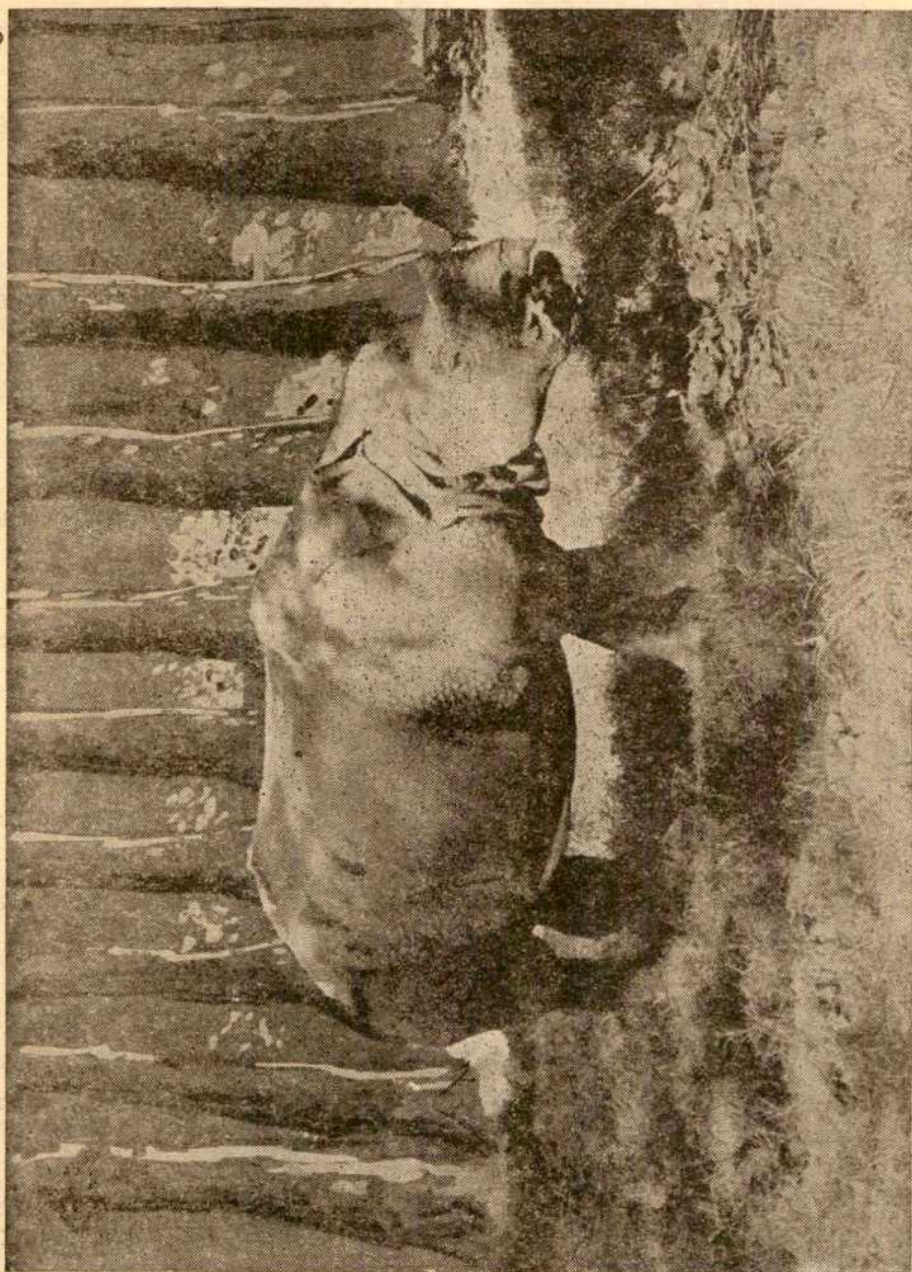
১৯৩১ হইতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত দশ বৎসরের হিসাবে দেখা যায় যে, বাঙলাদেশে বন্যপ্রাণী-সংক্রান্ত বিভিন্ন পন্থা হইতে সরকারের প্রতি বৎসর গড়ে ২,৯২,২৩৪ টাকা আয় হয়। ইহার বিস্তারিত হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল:

	টাকা
১। হস্তী এবং তাহার শাবক ও দলত ...	৫,০৭৬
২। গন্ডারের শিং, ঝক্ ও ক্ষুর ...	২১৪
৩। ব্যাঘ্রের শাবক, ঝক্ ও চর্বি ...	১৬১
৪। গৌর-এর ঝক্ ও মাংস ...	৩
৫। হরিণ এবং তাহার শিং, ঝক্ ও মাংস ...	৬৫
৬। বন্যশূকর ও তাহার মাংস ...	১
৭। কুমীরের ঝক্ ...	১২৫
৮। গোসাপের ঝক্ ...	৮৯২
৯। অজগরের ঝক্ ...	৩০
১০। পায়রা ও অন্যান্য পক্ষী ...	১
১১। ঝিনুক ও শামুক ...	৪,৫০৫
১২। মধু ও মোম ...	১৭,৫১৩

১৩। বন্যপশুপক্ষী শিকার করিবার অনুমতিপত্রের ('পারমিট') জন্য কর ...	৩,০৯০
১৪। মৎস্য ধরিবার অনুমতিপত্রের জন্য কর ...	১১,৪০৬
১৫। শিকার-সম্বন্ধীয় আইনে অপরাধী ব্যক্তিদের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা বাবত আয় ...	৬,০৭৩
১৬। শিকারের জন্য বন্দুক ও গুলি-বারুদ তৈয়ার, মেরামত, বিক্রয় বা গুদামজাত করার জন্য ব্যবসায়ীদের 'লাইসেন্স'-কর বাবত ...	৩,৮৬৪
১৭। শিকারের জন্য বন্দুক ও গুলি-বারুদ রাখিবার ব্যক্তিগত 'লাইসেন্স'-কর বাবত ...	৮৮,২৬৭
১৮। শিকারের জন্য যেসকল বন্দুক ও গুলিবারুদ বঙ্গদেশে আমদানি করা হয় তাহার উপর শুল্ক বাবত ...	১,৫০,৯৪৮
	মোট ২,৯২,২৩৪

এইসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, অনুমতিপত্রের সাহায্যে সরকারী জঙ্গল হইতে প্রতি বৎসর যে প্রভূত পরিমাণ মাংস ও মৎস্য সংগৃহীত হয় তাহার দ্বারা দেশের খাদ্যসমস্যার কতকটা সমাধান হয়।

বন্যপ্রাণীর উপর জনসাধারণের যে স্বাভাবিক একটা আক্রোশ দেখা যায়, তাহার তেমন কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই। কোন কোন বন্য পশু ও পক্ষী যে কৃষির কিছুর ক্ষতি করে ইহা অবশ্য সত্য; কিন্তু এই ক্ষতির পরিমাণ সাধারণত যত



আমাদের বনে গণ্ডারের সংখ্যা আজকাল খুবই কম

বেশি বলিয়া বর্ণনা করা হয়, আদৌ তত নয়। কেবল যেসকল কৃষিক্ষেত্র বনভূমির একেবারে পার্শ্বদেশে অবস্থিত, সেইসকল ক্ষেত্রেই ক্ষতির মাত্রাটা কিছু বেশি হয়, বিশেষত যদি সেখানে হস্তী ও বন্যবরাহ থাকে; কারণ এই দুইটি পশু এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বেশি অপরাধী। মৃগ বা অন্যান্য পশুপক্ষীরা যে ক্ষতি করে তাহা নগণ্য।

একমাত্র হস্তী ব্যতীত অন্য সকল জাতীয় প্রাণীকেই সহজে কৃষিক্ষেত্র হইতে দূরে রাখা বা তাড়ানো যায়, কারণ বন্যজন্তুরা স্বভাবত অত্যন্ত ভীরা। বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিলে কিংবা কেরোসিন তৈলের খালি টিন পিটাইয়া বা অন্য কোন উপায়ে শব্দ করিলে, ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে ধূনী অথবা মশাল জ্বালাইলে, জঙ্গলের সীমানার ধার দিয়া দুই-তিন হাত গভীর নালা কাটিলে কিংবা কোন প্রকার বেড়া বাঁধিয়া দিলে, অথবা ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে ছেঁড়া কাপড়, মাটির হাঁড়ি, ইত্যাদি দিয়া গড়া মূর্তি খাড়া করিয়া দিলে অধিকাংশ প্রাণীই ভয় পাইয়া কৃষিক্ষেত্র হইতে সরিয়া যায়। এমনকি গন্ডা-হস্তী ('রোগ') ব্যতীত অন্য সাধারণ হস্তীকেও বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিয়া বা মশাল জ্বালাইয়া তাড়ানো শক্ত নহে। বিদ্যুৎবাহী তারের বেড়া দিয়া অবশ্য সকল হস্তীকেই ক্ষেত্র হইতে দূরে রাখা সম্ভব, কিন্তু ইহা ব্যয়সাপেক্ষ এবং এইরূপ বেড়া বাঁধা গরিব চাষীদের পক্ষে সম্ভব নহে। যেখানে হস্তীর সংখ্যা অত্যধিক, সেখানে মধ্যে মধ্যে উহাদের কতকগুলিকে 'খেদা' করিয়া ধরিয়া অথবা সুযোগ্য শিকারী দ্বারা মারিয়া উহাদের সংখ্যা কমানো যাইতে পারে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই উহার বা অন্য কোন প্রাণীর পূর্ণ উচ্ছেদসাধন যুক্তিসংগত নহে।

এই সম্বন্ধে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। অনেকেই শস্যরক্ষার জন্য হরিণের ন্যায় নিরীহ প্রাণীদের হত্যা সমর্থন করেন। অথচ

ভাঁহার বাঘের কিংবা বন্যবরাহ মারিতে চাহেন না। মুসলমানেরা বন্যবরাহকে এত ঘৃণা করেন যে, উহাকে গুলি করিয়া মারিতেও প্রস্তুত নহেন; আর বাঘের তো এদেশে সকলেরই অবধ্য। অথচ এই দুই প্রকার পশু এবং মৃষিক, কাঠবিড়াল, খরগোশ প্রভৃতি ছোট ছোট পশু আর গৃহপালিত পশুদের দ্বারা চাষবাসের ও বাগানের যে ক্ষতি হয় তাহার পরিমাণ অন্যান্য বন্যপশুকৃত ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশি।

বন্যপশুদের উপর আক্রোশের আর একটি কারণ—কোন কোন পশুর দ্বারা লোকের প্রাণহানি। কিন্তু এই বিষয়েও লোকের ধারণা অতিরঞ্জিত। কারণ কেবল অল্প কয়েকটি গন্ডা-হস্তী ও নরখাদক ব্যাঘ্র ব্যতীত অন্য সকল বন্যপশুই মানুষকে ভয় করে এবং মানুষ দেখিলেই আপনা হইতে দূরে সরিয়া যায়। তাহা না হইলে বনবিভাগের কর্মচারীদের এবং কাষ্ঠব্যবসায় লিপ্ত অসংখ্য লোকের বনজঙ্গলে কাজ করা সম্ভব হইত না। কোনরকমে কোণঠাসা বা আহত না হইলে সাধারণত কোন বন্যপশুই, এমনকি ব্যাঘ্রও মানুষকে আক্রমণ করে না। আর ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রায়ই যেসকল ব্যাঘ্র বা হস্তী অপটু শিকারীদের দ্বারা কোন সময়ে আহত হয়, তাহারা পরে মনুষ্যভীতি অতিক্রম করিয়া নরহন্তা হইয়া দাঁড়ায়। সে যাহা হউক, ১৯৩১ হইতে ১৯৪০ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, সমগ্র বাঙলাদেশে গড়ে প্রতি বৎসর ব্যাঘ্র-কর্তৃক ৫৩টি আর হস্তী-কর্তৃক ১৩টি মানুষ নিহত হয়। কিন্তু ১৯৪৩ সালে কলিকাতা শহরে একমাত্র মোটর-দুর্ঘটনাতেই ১,৯৮০টি লোক আহত হয় এবং তন্মধ্যে ১৪২ জন প্রাণ হারায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অন্যান্য দুর্ঘটনার তুলনায় বন্য-পশুর দ্বারা যে লোকক্ষয় হয় তাহা অতি সামান্য। বাস্তবিক একটু বিবেচনা করিলেই বুঝা যায় যে, বন ও বন্যপশুদের উপর মনুষ্যসমাজের সাধারণত যে আক্রোশ তাহার বিশেষ কোন ভিত্তি নাই।

মৃগয়া ও খাদ্যের জন্য এবং মানবজীবন ও সম্পত্তিরক্ষার জন্য কতক পরিমাণে বন্যপ্রাণীর হত্যা প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু উহাদের, এমনকি হিংস্র পশুদেরও অবাধ হত্যা এবং তাহার শেষ ফল বংশলোপ কোনমতেই সমর্থন করা যাইতে পারে না। ইহা সর্ববাদিসম্মত যে, অধুনা উত্তর আফ্রিকা, আরব, চীন ও অন্যান্য দেশে যেসকল স্থানে মরুভূমি বর্তমান, এককালে ঐ-সকল স্থানে পর্যাপ্ত বনজঙ্গল ছিল, আর এইরূপ অনুমান করা হয় যে, তত্রস্থ উদ্ভিদ ও প্রাণিসমূহের অবাধ বিনাশের ফলেই ঐসকল স্থান বনজঙ্গলশূন্য হইয়া মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষেও ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আমাদেরই চোখের সামনে উক্তরূপ কারণে পশ্চিম বাঙলা ক্রমে ক্রমে মরুভূমির আকার ধারণ করিতেছে। সুতরাং আমাদের দেশকে আরব, চীন ইত্যাদি মরুপ্রধান দেশের পরিণাম হইতে বাঁচাইতে হইলে এই দেশে উপস্থিত যে জঙ্গল অবশিষ্ট আছে, তাহার যথোচিত সংরক্ষণ ও আবশ্যিকমত প্রসারণ এবং জঙ্গলের রক্ষার জন্য তত্রস্থ জীবজন্তুর উপযুক্ত সংরক্ষণ একান্ত আবশ্যিক। যদি আমাদের দোষে উপস্থিত প্রাণিকুলের কোন একটি জাতিও লুপ্ত হয় তত্ত্বজন্য উত্তরকালে আমাদেরই নিশ্চয়ই নিন্দাহ হইতে হইবে। আমাদের কর্তব্য যে শুধু হরিণ, ময়ূর ইত্যাদির ন্যায় সুন্দর, কোকিল, ময়না, শ্যামা প্রভৃতির ন্যায় সুকণ্ঠ অথবা শকুনির ন্যায় উপকারী প্রাণী রক্ষা করা তাহা নহে। একদিকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও অন্যদিকে তাহার বিরুদ্ধে কৃষিকার্যের এবং গৃহপালিত পশুদের ন্যায় দাবি—এই দুইএর মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিয়া অধুনা বর্তমান প্রাণিকুলের প্রত্যেক জাতির, এমনকি হিংস্র ও আপাত-অনিষ্টকারী প্রাণীদেরও বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপযুক্ত সংরক্ষণ করা আশু ও অবশ্য কর্তব্য।

প্রাচীনকালে সংরক্ষণ

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্পর্কীয় প্রাচীনতম লিপিবদ্ধ বিধানের দাবি ভারতবর্ষই করিতে পারে, কারণ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে স্তম্ভ-খোদিত সম্রাট অশোকের একটি ঘোষণায় এইরূপ একটি বিধানের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত ঘোষণা দ্বারা যেসকল চতুষ্পদ জন্তু আহারযোগ্য নয় অথবা কোন ব্যবহারিক কার্যের অনুপযোগী তাহাদের হত্যা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে সংরক্ষণীয় পশু, পক্ষী, মৎস্য, এমনকি পতঙ্গেরও একটি তালিকা ছিল; গম্ভীর ও পুং-হরিণ হত্যা বিশেষ করিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল। বোধহয় তখন বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফলে এইরূপ অনুশাসন লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত হয়।

কোর্টিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে রাজসরকার হইতে নির্দিষ্ট কয়েক পর্যায়ের পশু, পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি প্রাণীর রক্ষার নিমিত্ত নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা হইত। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপায় ছিল—স্থানে স্থানে নিরাপদ বা অভয় অরণ্যের প্রতিষ্ঠা ও সন্মাক্ষ নামে বিশেষ কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে তাহার সংরক্ষণ। এইসকল অভয়ারণ্যে অনুমতি ব্যতীত কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না, আর নিয়ম ছিল যে, এইসকল বনে আশ্রিত প্রাণীগণকে কেহ ধরিতে বা হত্যা করিতে পারিবে না। এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হইত।

প্রাচীনকালে সাধারণ লোককে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী ও মৃগ শিকার করিতে দেওয়া হইত না। এইসকল প্রাণী রাজকীয় বলিয়া গণ্য হইত।

অধিকাংশ সম্রাট ও অধিরাজেরা প্রধানত নিজেদের শিকার ও আমোদের জন্য আর কেহ কেহ নিজ ধর্মের অনুশাসনে কতক পরিমাণে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করিতেন। ভারত স্বাধীন হইবার পূর্বে পর্যন্ত কোন কোন দেশীয় রাজ্যে কতকটা বনভূমি

তথাকার রাজা ও তাঁহার বন্ধু-বান্ধব ও অতিথিদের শিকারের জন্য স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত হইত।

পুরাকালে ধর্মভাবের জন্য ভারতবর্ষে যেসকল স্থানে শিকার করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে এখনও এমন কতকগুলি স্থান আছে (যথা হরিম্ভার), যেখানে আজ পর্যন্ত কাহাকেও কোন প্রাণী, এমনকি মৎস্যও, হত্যা করিতে দেওয়া হয় না। অন্যান্য স্থানে কঠিন আইন থাকা সত্ত্বেও গোপনে শিকার করা সম্ভব হইলেও, এইসকল পুণ্যস্থানে জনমত এত প্রবল যে, তথায় কেহই কোন প্রাণীহত্যা করিতে সাহস করে না।

আধুনিক কালে সংরক্ষণ

সত্তর-পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে আমেরিকা ও ইউরোপে বন্যপ্রাণী-সংরক্ষণ সম্পর্কীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের পর ইহা প্রবল আকার ধারণ করিয়া একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। সম্ভবত এই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বীভৎসভাবে হতাহত হইতে দেখার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অনেকের মনে জীবের প্রতি দয়ার সঞ্চার হয় এবং তাহার ফলে এই সমস্যার উপর সকল দেশের দৃষ্টি পড়ে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি ও শিল্পের অত্যন্ত দ্রুত প্রসারের ফলে বনজঙ্গল এত বেশি ধ্বংস হইতে থাকে যে, তথাকার প্রাণিসমূহের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেকেই উদ্বেগ হইয়া উঠেন। বন্যপ্রাণীদের এই সমূহ-বিপদ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ঐ দেশে নতুন আইন করিয়া তাহাদের আশ্রয়স্থান স্বরূপ কতকগুলি “ন্যাশনাল পার্ক” স্থাপিত হয়। এই পার্কগুলি চিরস্থায়ী এবং অলঙ্ঘনীয় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহার মধ্যে গাছকাটা বা প্রাণীহত্যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ অর্থাৎ তৎস্থানীয় সকল জাতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী নিরাপদে জীবনযাপন করিতে পারে এবং কোন জাতিরই উচ্ছেদ হইবার আশঙ্কা নাই। এসকল উদ্যানের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম বলিয়া

এবং তথায় প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পর্কীয় নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের সুবিধা থাকতে দেশবিদেশ হইতে বহু লোক দর্শনী দিয়া তথায় প্রবেশ করে। দর্শনী হইতে প্রচুর আয় হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে ঐ আয় হইতে উদ্যান রক্ষা করিবার সকল খরচ চালাইবার পরও অনেক অর্থ উদ্ভূত থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত এইরূপ উদ্যান ২৮টি আছে এবং তাহাদের মোট আয়তন এক কোটি ত্রিশ লক্ষ একরের কম হইবে না।

জাতীয় উদ্যান প্রতিষ্ঠা করার কল্পনা ক্রমে অন্যান্য দেশেও বিস্তারলাভ করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ৮,০০০ বর্গমাইলব্যাপী অরণ্য-অঞ্চল লইয়া ‘ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক’ গঠিত হইয়াছে; ইহাতে যত প্রকার জীবজন্তু আছে পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে বোধহয় তাহা নাই। আফ্রিকার ট্যাঙ্গানিকা প্রদেশে ১৯৪০ সালের মে মাসে ১০,০০০ বর্গমাইলব্যাপী ‘সেরেনগেটি ন্যাশনাল পার্ক’ গঠিত হইয়াছে। পশ্চিম আফ্রিকায় বেলজিয়াম-সাম্রাজ্যভুক্ত কঙ্গো প্রদেশে ১৯২৫ সালে বন্যপ্রাণীর রক্ষাকল্পে একটি বৃহৎ ‘পার্ক’ স্থাপিত হয়, তাহার নাম ‘অ্যালবার্ট ন্যাশনাল পার্ক’; চার বৎসরের মধ্যে ইহার আয়তন দশগুণ বাড়ানো হয়। উপস্থিত ইহার আয়তন প্রায় ৫ লক্ষ বর্গ-একর। শিক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কার্যের জন্য এই উদ্যান পৃথিবীর সকল দেশের ছাত্রদের জন্য অব্যাহত। বৈজ্ঞানিকদের এবং যাহারা প্রাকৃতিক দৃশ্য ও জীবজন্তু ভালবাসেন তাহাদের পক্ষে এই পার্ক অদূরভবিষ্যতে অশেষ কল্যাণকর বলিয়া গণ্য হইবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে সুদৃঢ় আইনের ভিত্তিতে ‘ন্যাশনাল পার্ক’ের পরিবর্তে স্থানীয় সরকারের নির্দেশানুযায়ী বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণের জন্য বিশেষ আশ্রয়স্থান (‘গেম স্যাফারি’) স্থাপিত হইয়াছে। ‘ন্যাশনাল পার্ক’ের ন্যায় সুদৃঢ় ভিত্তিতে গঠিত

না হইলেও, শেষোক্ত আশ্রয়স্থানগুলিও উহাদের মত অশেষ কল্যাণকর। আজকাল এইরূপ পাক বা স্যাংচুয়ারি সকল দেশেই অল্পবিস্তর স্থাপিত হইয়াছে। ভারত তাহার অভয়ারণ্য সম্পর্কীয় প্রাচীন-প্রথা ভুলিয়া বহু যুগ কাটাইবার পর সম্প্রতি এ-সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছে।

১৯৪১ সালে মহাশূর রাজ্যে ৩১০ বর্গমাইল বনভূমিব্যাপীয়া 'বেণুগোপাল বন্যপ্রাণী পাক' ('দি বেণুগোপাল ওয়াইল্ড লাইফ পাক') প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৪৫ সালে উত্তরপ্রদেশের রামনগর ও কলাগড় বনবিভাগে এইরূপ একটি 'পাক' স্থাপিত হইয়াছে; তাহার নাম 'হেলি ন্যাশনাল পাক'। আসামের কাজিরাঙ্গা বন্যপ্রাণীর, বিশেষত গন্ডারের, বিশেষ আশ্রয়স্থানরূপে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশে কানহার্কিসুলি মধ্যভারতে শিবপুরি, কেরালায় পেরিয়ার, মাদ্রাজে মধুমালয় ও বেদন-থঙ্গল, রাজস্থানে কেওলাদেও ঘানা, আর উত্তরপ্রদেশের সিওয়ালিক পর্বতমালার সান্দ্রদেশে রাজাজি নামে আশ্রয়স্থান স্থাপিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৩৮ সালে দার্জিলিং জেলায় ১৫ বর্গমাইলব্যাপী সেন্‌চল ও ৬৥ একরব্যাপী মংপং এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ১৯৩৯ সালে ২,১৭৯ একরব্যাপী চাপ্‌রামারি ও ১৯৪০ সালে ৩৬ বর্গমাইলব্যাপী জলদাপাড়া, আর সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জেলায় গোরুমারা, দার্জিলিং জেলায় সুকনা এবং চাঁব্বশপরণায় লোথিয়ান দ্বীপ নামে নিরাপদ আশ্রয়বন স্থাপিত হইয়াছে।

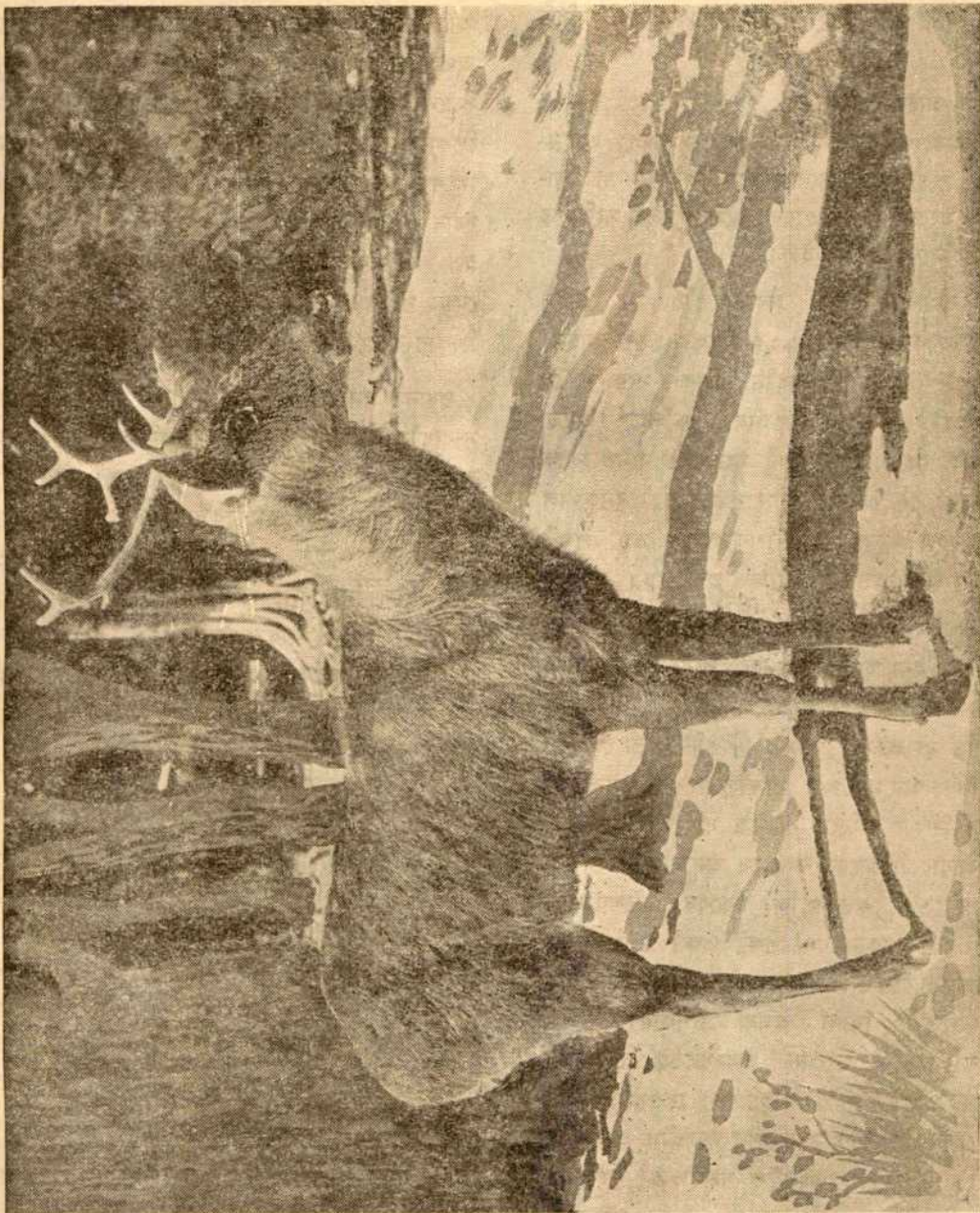
কতকগুলি সম্মেলনের ফলে বিভিন্ন দেশে বন্যপ্রাণী-সংরক্ষণকার্য যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম, ইতালি, স্পেন ও পর্তুগাল—এই সাতটি দেশের প্রতিনিধি লইয়া লন্ডন শহরে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়; তাহার ফলে আফ্রিকার পশু, পক্ষী ও মৎস্যের সংরক্ষণ সম্বন্ধে একটি

চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে বার্নার শহরে আর-একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় এবং তাহাতে সমগ্র পৃথিবীর বন্যপ্রাণী-সংরক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য অনেক কাল পর্যন্ত উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে কোন কার্য করা সম্ভব হয় নাই। পরে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে ব্রুসেলস্ শহরে একটি আন্তর্জাতিক দফতর স্থাপিত হয়।

১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে প্যারিতে একটি আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ঐ কংগ্রেসের সুপারিশ অনুসারে ১৯৩৩ সালে লন্ডনে আবার একটি সভা বসে; তাহাতে দক্ষিণ আফ্রিকা, উত্তর আয়ারল্যান্ড-সমেত গ্রেট ব্রিটেন, বেলজিয়াম, মিশর, স্পেন, অ্যারিসিনিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, পর্তুগাল ও সুদান—এই দশটি দেশের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা আফ্রিকা দেশের সকল উন্মিত ও প্রাণীর রক্ষাকল্পে একটি চুক্তিপত্র গ্রহণ ও স্বাক্ষর করেন।

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে দিল্লি শহরে তৎকালীন রাজপ্রতিনিধির নির্দেশানুসারে একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন হয়। তাহাতে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। ঐ সম্মেলনের প্রস্তাবানুযায়ী বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ সম্বন্ধে সর্বভারতীয় একটি চুক্তিপত্রের খসড়া প্রস্তুত হয়। কিন্তু তদনুসারে কোন কাজ হয় নাই।

১৯৫২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতীয় পক্ষী-সংরক্ষণ সমিতি গঠিত হয় এবং উহার অল্পদিন পরেই ভারতীয় বন্যপ্রাণী পর্ষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই পর্ষদের উপদেশ অনুসারে অধুনা প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া বন্যপ্রাণী পর্ষদ স্থাপিত হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে সর্বভারতীয় পর্ষদ কেবলমাত্র উপদেশ দান করেন এবং রাজ্য-পর্ষদ বন্যপ্রাণী-সংরক্ষণের জন্য প্রত্যক্ষ দায়ী।



অরুণ্য হুলাজ

এই ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৫ সালে বন্যপ্রাণী পর্বদ স্থাপিত হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, ইহার দ্বারা পরে দেশে সুদূরপ্রসারী মঙ্গল সাধিত হইবে।

বর্তমান আইন-কানুন

পশ্চিমবঙ্গে অধুনা বলবৎ যেসকল আইন-কানুন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিকারযোগ্য বন্য-প্রাণীর সংরক্ষণের সহায়ক, সেইগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। বনরক্ষার জন্য সর্বভারতীয় যে আইন [ভারতীয় বন আইন—১৯২৭ সালের ১৬শ আইন] এবং এই আইনের অধীন শিকার-সংক্রান্ত যে নিয়মাবলী পশ্চিম বাঙলায় প্রচলিত আছে, সেইগুলি কেবল সরকারী সংরক্ষিত বনের পক্ষে প্রযোজ্য। এই আইন অনুসারে সরকারী বনজঙ্গল ও তন্মধ্যস্থ সকল প্রকার শিকারযোগ্য পশু, পক্ষী ও মৎস্য উপযুক্তভাবে সংরক্ষিত হইতেছে।

এই আইন অত্যন্ত কঠোর। অসৎ উদ্দেশ্য না থাকিলেও বনমধ্যে অনধিকার প্রবেশ পৰ্যন্ত এই আইনে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। এমন কি অনুমতি না লইয়া গাছের একটি পাতা ছেঁড়াও দণ্ডনীয়। অনুমতিপত্র ব্যতীত কোন সরকারী জঙ্গলে শিকার করিতে বা মাছ ধরিতে দেওয়া হয় না। আবার শিকারের জন্য যে অনুমতিপত্র দেওয়া হয়, তাহাতেও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শর্ত থাকে। কোন কোন বন্য পশু, পক্ষী ও সরীসৃপ বিশেষভাবে রক্ষিত, যথা—হস্তী, গঁড়ার, বন্যমহিষ, কয়েক জাতীয় বিরল অথবা উপকারী পক্ষী, গোসাপ প্রভৃতি; কোন অবস্থাতেই এইসকল সংরক্ষিত প্রাণী শিকার করিতে দেওয়া হয় না। কোন কোন প্রাণীর, যথা—সকলজাতীয় হরিণের স্ত্রীজাতি ও শাবক এইরূপে সংরক্ষিত। যেসকল প্রাণী শিকার করিতে দেওয়া হয়, তাহাদের প্রত্যেকটির জন্য একটি করিয়া শিকারনিষিদ্ধ সময় ('ক্লোজ্' সিজন') নির্দিষ্ট আছে; এই সময় উহাদের প্রজননকাল, সুতরাং এইসকল নির্দিষ্ট

সময়ের মধ্যে তৎসংক্রান্ত পশুপক্ষীর শিকার নিষিদ্ধ। মোটরগাড়ি হইতে অথবা কৃত্রিম আলোকের সাহায্যে বা মাচানের উপর বসিয়া অথবা পশুদের জল বা লবণাক্ত মৃত্তিকা খাইবার স্থানে বসিয়া শিকার করা নিষিদ্ধ। আবার শিকার-সংক্রান্ত নিয়মাবলীতে জঙ্গলের কোন কোন বিশেষ অংশকে বন্যপ্রাণীর জন্য সংরক্ষিত আশ্রয়-স্থান ('গেম্' স্যাংচুয়ারিজ') বলিয়া ঘোষণা করা হয়; এইসকল বিশেষভাবে সংরক্ষিত আশ্রয়স্থানে কোন প্রকার প্রাণীকে কোন সময়ে বা অবস্থাতে শিকার করিতে বা ধরিতে দেওয়া হয় না।

প্রধানত বনবিভাগীয় কর্মচারীদের যত্নেই শিকার-সম্বন্ধীয় এইসকল আইন প্রবর্তিত এবং ক্রমে ক্রমে বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করা উক্ত কর্মচারীদের অন্যতম কর্তব্য বলিয়া গণ্য হয় এবং তাঁহারা তৎসংক্রান্ত আইনগুলি নিজ নিজ এলাকাধীন বনে যথাসাধ্য সতর্কতার সহিত কার্যকরী রাখেন। ইহার ফলে এতৎসম্বন্ধে সরকারী বনসমূহের আভ্যন্তরিক অবস্থা মোটের উপর সন্তোষজনক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

বনরক্ষা-সম্বন্ধীয় মূল আইনটির একটি ধারায় সরকারকে বেসরকারী ব্যক্তিগত জঙ্গলে বা জমিতে প্রাণী-রক্ষাকল্পে নিয়ম প্রবর্তন করার ক্ষমতা দেওয়া আছে। এই ধারার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বেসরকারী জঙ্গল, পতিত জমি বা জলাভূমির মালিকগণ ইচ্ছা করিলে সরকারের নিকট দরখাস্ত করিয়া নিজ নিজ এলাকায় আবশ্যিকমত বন্যপ্রাণীর উপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা অনায়াসে করিতে পারেন ও তাঁহাদের এইরূপ করাও উচিত।

২। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বন্য পশুপক্ষী রক্ষার জন্য একটি আইন [বন্য পক্ষী ও পশুসংরক্ষণ আইন—১৯১২ সালের ৮ম আইন] আছে এবং এই আইনের অধীন বিস্তারিত নিয়মাবলীও বলবৎ আছে। এই নিয়মগুলির দ্বারা এই দেশের

প্রধান প্রধান বন্যপ্রাণীগুলিকে (বিশেষত যেগুলি অত্যন্ত বিরল অথবা উপকারী অথবা শিকারযোগ্য) এই আইনভুক্ত করিয়া প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত শিকারনিষিদ্ধ কাল নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। এই আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট প্রাণীদিগকে শিকার-নিষিদ্ধ কালে ধরা বা হত্যা করা এবং ঐসকল প্রাণীকে বা উহাদের মাংস বা অন্য কোন অংশ স্বাধিকারে রাখা বা ক্রয়-বিক্রয় করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এই আইন সরকারী সংরক্ষিত বনগুলিতে ও তাহার বাহিরে সর্বত্র সমভাবে প্রযোজ্য এবং যথাযথভাবে মানা হইলে, ইহাই বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণের পক্ষে মোটামুটিভাবে যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু দৃষ্টির বিষয় এই যে, সরকারী বনগুলি ও তৎসমীপস্থ স্থান ভিন্ন অন্যান্য স্থানে এই আইনের কার্যত কোন ব্যবহারিক মূল্য নাই বলিলেই চলে। তাহার প্রধান কারণ, এই আইন কার্যকরী করিবার জন্য সরকারী বনভূমির বাহিরে কোন স্থানে কোন বিশেষ সরকারী প্রতিষ্ঠান বা কর্মচারী নাই। সংরক্ষিত বনের বাহিরে বনবিভাগীয় কর্মচারীগণের কোন ক্ষমতা নাই; তাঁহারা সময় ও আগ্রহ অনুসারে নিজ নিজ এলাকার মধ্যে ও তৎসমীকটে এই আইন বলবৎ রাখিতে চেষ্টা করেন। পদলিস ও অন্যান্য বিভাগীয় কর্মচারীরা তাঁহাদের নিজ নিজ সাধারণ কার্যে ব্যস্ত থাকেন; এই আইন সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা যায় না। এতদ্ব্যতীত এই আইনে অপরাধীদিগকে বিনা পরোয়ানায় (ওয়ারেন্ট) ধরিবার ও অপরাধ-সংক্রান্ত যন্ত্রাদি আটক করিবার কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই; আর শিকারলব্ধ মাংস ও চর্মাদি পণ্য নিয়ন্ত্রণের জন্যও কোন ব্যবস্থা নাই। অবশ্য যে-কোন স্থানে যে-কোন ব্যক্তি এই আইন-সংক্রান্ত অপরাধ উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের গোচরে আনিতে পারেন এবং পদলিস ইচ্ছা করিলে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা-বিশেষের বলে অপরাধী ও অপরাধ-সংক্রান্ত যন্ত্র ও পণ্যাদি আটক করিয়া

ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করিতে পারে। কিন্তু বস্তুত এই আইন-সম্পর্কীয় অপরাধ কদাচিৎ দৃষ্ট-একটি (এবং তাহাও কেবলমাত্র সরকারী বনগুলির আশপাশে) ধরা পড়ে। উপযুক্ত জনমত ও ব্যবস্থার অভাবে অন্য সর্বত্র এইরূপ বহু অপরাধ নিতাই উপেক্ষিত হইতেছে। ইহার আশ্রয় প্রাপ্তি-বিধান আবশ্যিক।

৩। গন্ডারের রক্ষাকল্পে একটি বিশেষ আইন [বঙ্গীয় গন্ডার-সংরক্ষণ আইন—১৯৩২ সালের ৮ম আইন] সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বলবৎ আছে। এই আইন অনুসারে গন্ডার ধরা, মারা বা আহত করা প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। বিপদে পড়িয়া, একমাত্র নিজ বা অপর কাহারও জীবন রক্ষার জন্য, গন্ডারকে মারা যাইতে পারে। গন্ডার বা তাহার অংশবিশেষ স্বাধিকারে রাখা বা ক্রয়-বিক্রয় করা এই আইনের দ্বারা নিষিদ্ধিত করা হইয়াছে।

৪। সমুদ্রপথে বাণিজ্যের উপর শুল্ক-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক যে সর্বভারতীয় আইন [শী কাস্টম্‌স্ অ্যাক্ট—১৮৭৮ সালের ৮ম আইন] আছে, তাহার বলে ভারত-সরকার কয়েকটি নিয়ম জারি করিয়াছেন। ইহার দ্বারা গন্ডারের শিং বা অন্য কোন অংশ ডাকযোগে এবং ছাড়পত্র ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে চালান দেওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই নিয়মাবলীর বলে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কয়েকটি বিশিষ্ট কর্মচারীর উপর অনুমতিপত্র-দানের ক্ষমতা দিয়াছেন এবং এই সম্বন্ধে কতকগুলি আবশ্যিক বিধান জারি করিয়াছেন। ইহার ফলে গন্ডারশিকারীদের পক্ষে গন্ডারের শিং ইত্যাদি বিক্রয় করা বা বিদেশে চালান দেওয়া দৃষ্টিগোচর হইয়াছে।

উক্ত আইনের ধারাবিশেষে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে ভারত-সরকার ১৯০২ সালে একটি বিজ্ঞপ্তি (No. 5028 S. R., dated 19th September 1902) দ্বারা গৃহপালিত পক্ষী ব্যতীত অন্যান্য সকল পক্ষীর ছক্ ও পালক স্থলপথে বা

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

জলপথে ভারতবর্ষের বাহিরে চালান দেওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছেন। কেবলমাত্র উটপক্ষীর পালক এবং বৈজ্ঞানিক নমুনা হিসাবে যে-কোন পক্ষীর ষ্ঠক ও পালক বিদেশে চালান দেওয়ার জন্য ছাড়পত্র পাওয়া যাইতে পারে।

৫। হস্তী-রক্ষাকল্পে একটি বিশেষ আইন [হস্তী-সংরক্ষণ (বঙ্গীয় সংশোধন) আইন—১৯৩২ সালের ৫ম আইন] এবং এই আইনের অধীন কতকগুলি নিয়ম দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ি জেলায় প্রচলিত আছে। এই আইনের দ্বারা হস্তী ধরা, মারা বা আহত করা, কয়েকটি বিশেষ অবস্থা ব্যতীত সকল অবস্থাতেই, নিষিদ্ধ। 'গুন্ডা' বলিয়া ঘোষিত হস্তী হত্যা করা, অন্তর্মতাপন্ন লইয়া অথবা বিপদে পড়িয়া নিজ বা অপর কাহারও জীবন বা সম্পত্তি রক্ষার জন্য হস্তী ধরা, মারা বা আহত করা দণ্ডনীয় নহে।

৬। মৎস্য-রক্ষার জন্য সর্বভারতীয় যে আইন [ভারতীয় মৎস্য আইন—১৮৯৭ সালের ৪র্থ আইন] আছে তাহার বলে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ি জেলার জন্য বিশেষ কতকগুলি নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছেন। ইহার ফলে এই দুই জেলাস্থ সকল নদনদীতে বাঁধ বা অন্য কোন প্রকার দৃঢ়নিবন্ধ যন্ত্রের দ্বারা অথবা এক বর্গ-ইঞ্চির কম ফাঁকযুক্ত জাল দিয়া মৎস্য ধরা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেবল নদনদীগুলির যেসকল অংশ সরকারী বনভূমির অন্তর্গত অথবা যেসকল অংশে মৎস্য ধরবার ব্যক্তিগত স্বত্ব বর্তমান, সেইসকল অংশে এই আইন প্রযোজ্য নয়। এই নিয়মাবলীতে বিনা পরোয়ানায় অপরাধীদিগকে ধরবার এবং অপরাধ-সংক্রান্ত যন্ত্র ও মৎস্যাদি আটক করবার ক্ষমতা বনবিভাগের কর্মচারিগণকে দেওয়া হইয়াছে।

৭। জীবজন্তুর প্রতি যন্ত্রণাদায়ক ব্যবহার নিবারণকল্পে যে আইন আছে [বঙ্গীয় প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা আইন—১৯২০ সালের ১ম আইন]

তাহার একটি ধারায় জীবজন্তু যাহাতে অযথা যন্ত্রণা পায় এইরূপভাবে তাহাদিগকে বাঁধা, রাখা বা বহন করা অথবা এইরূপ অবস্থায় কোন জীবন্ত প্রাণীকে, কিংবা নিষ্ঠুরভাবে নিহত কোন প্রাণীকে বিক্রয়ার্থে রাখা, প্রদর্শন করা বা তাহার প্রস্তাব করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

এই আইনটি কলিকাতা শহর ও তদুপকণ্ঠস্থ স্থানসমূহে প্রযোজ্য এবং ইহাতে পশ্চিমবঙ্গের যে-কোন স্থানে ইহা প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা পশ্চিমবঙ্গ-সরকারকে দেওয়া হইয়াছে।

বহু বন্য হাঁস ও অন্যান্য পক্ষীকে ফাঁদে ধরিয়া ও নিষ্ঠুরভাবে বাঁধিয়া কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে বাজারে বিক্রয় করিতে দেখা যায়। এইরূপ নিষ্ঠুর কার্যের প্রতিবিধান এই আইনের সাহায্যে করা যাইতে পারে—কিন্তু কখনও করা হয় বলিয়া মনে হয় না।

৮। একের কৃষিক্ষেত্র, বাগান ইত্যাদিতে অপরের গৃহপালিত পশুর অনধিকার প্রবেশ ও তজ্জনিত ক্ষতি নিবারণকল্পে সর্বভারতীয় যে আইন [পালিত পশুর অনধিকার প্রবেশ আইন—১৮৭১ সালের ১ম আইন] আছে তাহা বনরক্ষা সম্বন্ধীয় আইনের একটি ধারার দ্বারা [১৯২৭ সালের (১৬শ) ভারতীয় বন আইনের ৭০তম ধারা] সমস্ত সরকারী জঙ্গলে বিশেষভাবে প্রযুক্ত করা হইয়াছে। এই আইনের বলে বনবিভাগীয় কর্মচারীরা সরকারী বনজঙ্গলে অনধিকার প্রবেশকারী গবাদি পশুকে ধরিয়া খোঁয়াড়ে দেয় এবং পরে খোঁয়াড়-রক্ষকের নিকট হইতে মালিক-গণের নামধাম জানিয়া তাহাদের নিকট হইতে জঙ্গলের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ জরিমানা আদায় করে। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক নয়, কারণ, অনেক সময়ই অপরাধীরা খোঁয়াড়-রক্ষকের নিকট মিথ্যা নাম ও ঠিকানা দিয়া নিজেদের পশু লইয়া যায় বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে জঙ্গলের ক্ষতিপূরণ আদায় করা সম্ভব হয়

না। আর খোঁয়াড় হইতে উদ্ধার করিতে যে সামান্য জরিমানা দিতে হয় তাহা জঙ্গলে অবৈধ পশুচারণ নিবারণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ইহার প্রতিবিধানের জন্য আলোচ্য আইনটির কিছু সংশোধন করা ও ইহাকে উপযুক্তভাবে কার্যকরী করা আবশ্যিক, কারণ অবৈধ পশুচারণ নানা কারণে জঙ্গলের ও তথাকার জীবজন্তুর পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর।

৯। অস্ত্রশস্ত্র-নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বভারতীয় যে আইন [১৮৭৮ সালের (১১শ) ভারতীয় অস্ত্র আইন] ও তদধীন যে নিয়মাবলী পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত আছে, সেইগুলির যথাযথ প্রয়োগের উপর এই দেশের বন্যপ্রাণীর অদৃষ্ট বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। বন্দুকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে মনে হয় উহার অপব্যবহার নিবারণ করিবার জন্য আইনে যেসকল বিধিব্যবস্থা আছে সেইগুলি বিশেষ কড়াকড়িভাবে জারি না করিলে শিকারযোগ্য প্রাণীরা, বিশেষত সরকারী জঙ্গলের সীমা-বহির্ভূত স্থানের প্রাণীরা, যে আঁচরে লোপ পাইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অনেকেই জানেন যে—

(ক) মর্যাদা বা আত্মরক্ষার অজুহাতে যে বন্দুকের লাইসেন্স লওয়া হয়, তাহা অনেক সময় শিকারের জন্যই ব্যবহার করা হয়;

(খ) কৃষি-রক্ষার্থে যে বন্দুকের লাইসেন্স লওয়া হয়, তাহা লাইসেন্স-ধারীর নিজ কৃষিক্ষেত্রের ভিতরে বা বাহিরে শিকারার্থে প্রায়ই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়;

(গ) মর্যাদা ও আত্মরক্ষার জন্য যেসকল বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া হয় তাহাদের সংখ্যা সম্বন্ধে অথবা এইসকল বন্দুকে ব্যবহারের জন্য লাইসেন্স-ধারীরা কী পরিমাণে গোলাগুলি কিনেন বা কিরূপে ব্যয় করেন তৎসম্বন্ধে কোন বিধি-নিষেধ নাই;

(ঘ) একের বন্দুক অন্য ধার করিয়া প্রায়ই শিকার করেন;

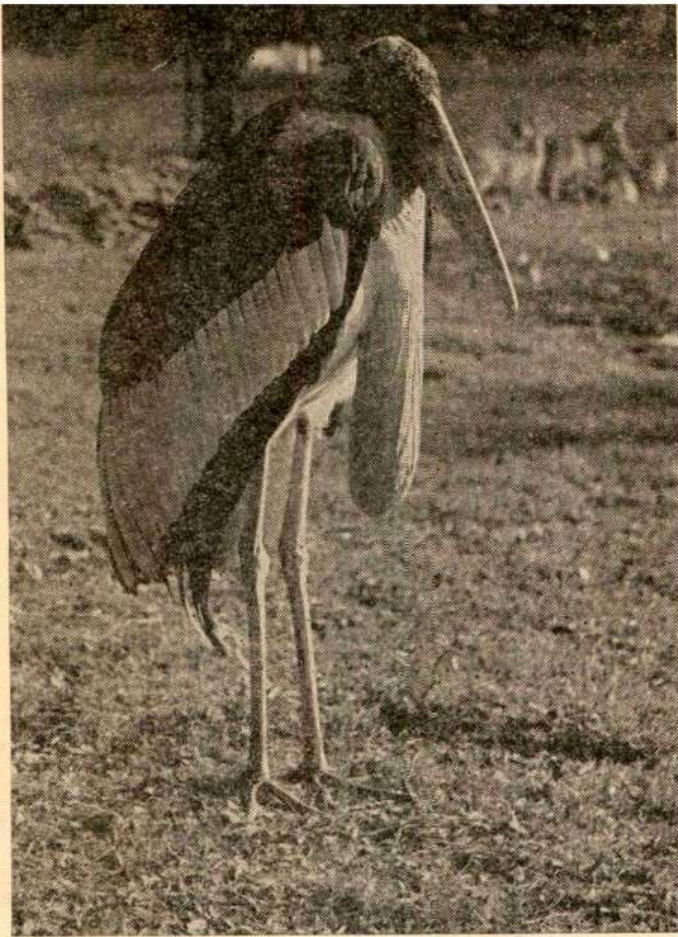
(ঙ) সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বন্দুকের জন্য যে লাইসেন্স দেওয়া হয়, তাহাতে অনেক সময় এক বা ততোধিক অনুচরকে ঐ বন্দুক ধারণ করিবার যে ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহার প্রায়ই অপব্যবহার হয়;

(চ) অনেকস্থানে, বিশেষত জঙ্গলের আশেপাশে, বিনা লাইসেন্সেও অনেক বন্দুকের প্রচলন আছে।

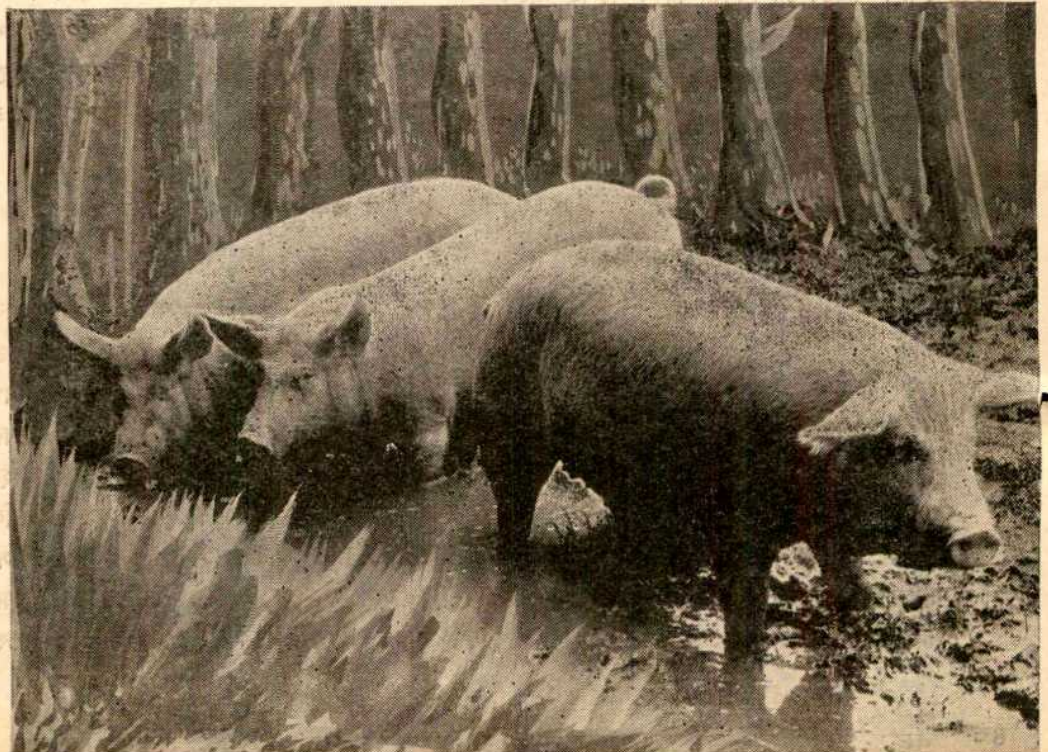
এইরূপ নানাপ্রকারে বন্দুকের অপব্যবহার ও তাহার ফলে বন্য জীবজন্তুর সমূহ ক্ষতি নিত্যই সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং অস্ত্রশস্ত্র-সম্বন্ধীয় আইনকানুন যাহাতে যথাযথ পালিত হয় সে বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া দরকার। শিকার-সম্বন্ধীয় কোন আইন ভঙ্গ করিলে বন্দুকের লাইসেন্স নাকচ করা এবং অপরাধের গুরুত্ব হিসাবে বন্দুক বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা থাকা উচিত। আর যে-কেহ শিকারার্থে বন্দুকের লাইসেন্স চাহিবে, তাহাকে সরকারী বনজঙ্গলের বাহিরে শিকারের জন্য অন্য একটি বিশেষ লাইসেন্স লইতে বাধ্য করারও ব্যবস্থা থাকা আবশ্যিক বলিয়া মনে হয়।

বর্তমান অবস্থা

বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ-সংক্রান্ত বর্তমান আইন-কানুনের অল্পস্বল্প সংশোধন করা অথবা দুই-একটা নূতন আইন প্রবর্তন করার প্রয়োজন থাকিলেও, মোটামুটিভাবে উপরি-উক্ত আইনগুলিকে পর্যাপ্ত বলা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এত সুবিবেচিত ও কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও একমাত্র সরকারী সংরক্ষিত বনগুলি ছাড়া এদেশে অন্য সর্বত্র বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ-সম্বন্ধীয় বর্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সরকারী বনের বাহিরে এতৎসংক্রান্ত



কোন কোন স্বভূতে বিদেশী
পাখিরাও এদেশে বেড়াতে
আসে



বগা বরাহ :
হু'পাশে
এখনও
দাঁত
বেরোধ নি

আইনগুনালিকে প্রকৃতপক্ষে কার্যকরী রাখিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই; ইহার আভাস পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য যেসকল কারণে শিকারযোগ্য প্রাণীর সংখ্যা সম্প্রতি কমিয়াছে এবং উত্তরোত্তর কমিতেছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান:

(১) প্রথম মহাদুর্ভিক্ষের সময় হইতে অনেকগুলি নূতন চর্ম-সংস্কারক কারখানা ('ট্যানারি') স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে সকলপ্রকার চর্মের চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে। হরিণ, ময়াল, গোসাপ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর চামড়ার বাজারদর বাড়িয়া যাওয়ায় ঐসকল প্রাণী অধিকতর সংখ্যায় অবৈধভাবে নিহত হইতেছে। শিকারলব্ধ মাংস, ছক, শৃঙ্গ ইত্যাদি বিক্রয় করা একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসায় এবং প্রধানত এই ব্যবসায়ের জন্যই সর্বাধিক অবৈধ শিকার চলে। অথচ একমাত্র গন্ডার ব্যতীত অন্য কোন শিকারযোগ্য প্রাণী-সংক্রান্ত ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই।

(২) বন্দুকের সংখ্যা ও ধনুসকারী শক্তি এবং মোটরগাড়ি, টর্চ, সার্চলাইট, ইত্যাদির প্রচলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাস্তাঘাটের বহুল পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে। জঙ্গলের ভিতরে বহু নূতন নূতন রাস্তা হইয়াছে। আগে যেসকল রাস্তায় অতি কষ্টে কোনমতে গোরুর গাড়ি চলিতে পারিত, তাহার অনেকগুলিকে মোটরগাড়ি চলিবার উপযোগী করা হইয়াছে। জঙ্গলের বাহিরেও বহু নূতন রাস্তা হইয়াছে এবং বহু পুরাতন রাস্তার উন্নতি হইয়াছে। বাস্তবিক আজকাল উত্তরবঙ্গে সমভূমিস্থ সরকারী জঙ্গলের এমন কোনও অংশ নাই বলিলেই চলে, যেখানে অন্তত শীতকালে মোটরে যাওয়া যায় না। আগে যেসকল শিকারক্ষেত্রে পৌঁছাইতে হইলে ১০-১২ দিন ধরিয়া পথের কষ্ট সহ্য করিতে হইত, আজকাল মোটরযোগে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেইসকল স্থানে অনায়াসে পৌঁছানো যায়।

জলপাইগুড়ি ও অন্যান্য জেলায় যেখানেই কিছু শিকার পাওয়া যায়, সেখানেই পথে চলিবার সময় প্রায় প্রত্যেক মোটরগাড়িতে এক বা ততোধিক বন্দুক দেখা যায় এবং ঐসকল গাড়ির আরোহীরা রাস্তায় শিকারোপযোগী যাহা কিছু দেখেন তাহারই উপর নিজেদের বন্দুক পরীক্ষা করেন। নানা কারণে অধিকাংশ স্থলেই শিকার আহত হইয়া পলায়ন করে—তাঁহাদের ভোগে আসে না। আশ্চর্যের বিষয়, তথাপি তাঁহারা অযথা প্রাণী হিংসা হইতে বিরত হন না! সে যাহা হউক, রাস্তাঘাটের উন্নতি এবং মোটরগাড়ির প্রচলন যে বন্যপ্রাণীদের বংশরক্ষার অন্যতম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দেশের উন্নতির জন্য পাকা রাস্তা ও মোটরগাড়ি আবশ্যিক সন্দেহ নাই; কিন্তু বন্যপ্রাণীর বিরুদ্ধে অপব্যবহার নিবারণ করার জন্য বিশেষ কোন কার্যকরী ব্যবস্থা এ-যাবৎ হয় নাই।

(৩) সরকারী সংরক্ষিত বনের বাহিরে খণ্ড-জঙ্গলসমূহের অত্যধিক সংকোচন ও তাহার ফলে কোন কোন বন্যপ্রাণীর (বিশেষত যাহাদের খাস বা খণ্ড-জঙ্গলে বাস করা স্বভাব) পর্যাপ্ত আশ্রয়-ভূমির অভাব। এই কারণে কুকসার, পারা হরিণ, প্রভৃতি কয়েক জাতীয় প্রাণী প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে।

(৪) ক্রমবর্ধমান নগরগুলির ক্ষুধা মিটাইবার জন্য বৎসর বৎসর জল ও ফাঁদ দিয়া বহুসংখ্যক হংস, বন্যকুক্কট, ইত্যাদি পক্ষী ধরা হয়। এই কারণে বিবিধ জাতির স্থায়ী-বাসিন্দা ও যাযাবর পক্ষীদের সংখ্যা বহুল পরিমাণে কমিয়া যাইতেছে।

(৫) বনজাত দ্রব্যাদি কাজে লাগানো এবং সারবান বৃক্ষের চাষ করিয়া ও অন্যান্য উপায়ে বনের উন্নতি-সংক্রান্ত সরকারী বনবিভাগের কার্য সকল স্থানে, বিশেষত উত্তরবঙ্গের জঙ্গলসমূহে, এত বেশি বাড়িয়াছে যে, আজকাল সরকারী জঙ্গলের কোন অংশ বৎসরের প্রায় কোন সময়েই

শান্তিপূর্ণ থাকিতে পায় না। এইজন্য তথাকার বন্যপ্রাণীরা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উত্যক্ত হয় এবং তাহার ফলে সম্ভবত উহাদের, অন্তত অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন প্রাণীদের, প্রজননক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটিতেছে। আর সারবান বৃক্ষের আবাদের আয়তন বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বনমধ্যস্থ উন্মুক্ত তৃণভূমি ও নলবনগুলি আয়তনে কমিয়া যাইতেছে। এই কারণে গন্ডার ও যেসকল পশু সাধারণত তৃণ বা নলজঙ্গলে বাস করে তাহাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর কমিয়া যাইতেছে।

(৬) সরকারী বনভূমির বিভাগগুলির আয়তনের তুলনায় বিভাগীয় কর্মচারীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম; এত কম যে, তাঁহাদের দ্বারা এইসকল বিস্তৃত বনভূমির উপযুক্ত সংরক্ষণ অসম্ভব বলিলেই চলে। তদুপরি সম্প্রতি কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের অফিস-সংক্রান্ত লেখাপড়ার কাজ অত্যন্ত বাড়িয়াছে। কতকটা এই কারণে ও কতকটা আর্থনৈতিক কারণে সরকারী ব্যয়সংক্ষেপের জন্য, বাধ্য হইয়া তাঁহাদের সফর এত বেশি কমাইতে হইয়াছে যে, তাঁহারা আজকাল অন্যান্য বিবিধপ্রকার কর্তব্যপালনের পর বন্যপ্রাণী-সংরক্ষণের ব্যাপারে উপযুক্ত দৃষ্টি ও সময় দিতে পারেন না। বনের অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী স্থান-সমূহে এবং যেসকল স্থানে বনবিভাগের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে, বেশির ভাগ অবৈধ শিকার সেইসমস্ত স্থানে ও কালেই হয়। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, বনবিভাগের কর্মচারীরা কদাচিত্ এইসমস্ত স্থানে যাইবার সময় পান। আবার বনবিভাগীয় কর্মচারীরা যতই উৎসাহী হউন না কেন, জনসাধারণ ও সরকারী অন্যান্য বিভাগের সাহায্য না পাইলে গুপ্তশিকার বন্ধ করা তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন।

অবৈধ শিকার নিবারণার্থে যেসকল আইন বলবৎ আছে, সেইগুলি প্রধানত উপযুক্ত-সংখ্যক রক্ষক-কর্মচারীর অভাবে তেমন কার্যকরী হয় না।

গুপ্তশিকারী ধরিবার ভার প্রধানত রক্ষা-কার্যে নিযুক্ত অল্পবেতনভোগী প্রহরীদের হস্তে থাকে। যেসকল ভদ্রলোকের হাতে বন্দুক থাকে তাঁহাদিগকে ধনী মনে করিয়া নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা প্রায়ই সম্মানের চক্ষে দেখেন ও তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহস করেন না। আবার পেশাদার গুপ্তশিকারীরা সাধারণত দলবদ্ধ হইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং তাহারা এমন বেপরোয়া হয় যে, সরকারী কর্মচারীদিগকে বনমধ্যে একা পাইলে গুলি করিতেও ইতস্তত করে না। বনরক্ষক প্রহরীরা সচরাচর একা-একাই জঙ্গল পরিভ্রমণ করেন বলিয়া দলবদ্ধ পেশাদার শিকারীদের সম্মুখীন হইতে ভয় পান। বাস্তবিক গুপ্তশিকারীদের ধরা খুবই শক্ত, আর ধরা গেলেও উহাদের উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করানো আরও দুরূহ ব্যাপার। কারণ এই রকম অপরাধ লোকালয় হইতে বহুদূরে এমন সমস্ত দূর্গম স্থানে ঘটে যে, সেখানে অপরাধীকে ধরা অসম্ভব না হইলেও সাক্ষীর অভাবে প্রায়ই অভিযোগের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। আবার প্রমাণ থাকিলেও বিচারকগণ দোষীদের যে শাস্তি বিধান করেন তাহাও প্রায়ই যথেষ্ট না হওয়াতে আইনগুলি প্রকৃত প্রতিবন্ধকরূপে কার্যকরী হয় না।

সুন্দরবন ও ত্রিপুরার জঙ্গলের অবস্থা এই সম্বন্ধে অন্যান্য স্থানের তুলনায় অধিকতর শোচনীয়। এইসকল স্থানের দূর্গমতা ও রক্ষক-কর্মচারীর অপ্ৰাচুর্যই ইহার প্রধান কারণ। ত্রিপুরা অঞ্চলে গুপ্তশিকারীরা শিক্ষিত কুকুর লইয়া শিকার করিয়া থাকে। এইরূপ শিকার সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং জঙ্গলের প্রভূত ক্ষতিজনক।

যদিও নিকট-ভবিষ্যতে বন্যপ্রাণী একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার বিশেষ কোন আশঙ্কা নাই, তথাপি সম্প্রতি কয়েক বৎসরের মধ্যে যে প্রায় সকল জাতীয় শিকারযোগ্য পশুপক্ষীর সংখ্যা বিশেষভাবে কমিয়া গিয়াছে সে বিষয়ে কোন

সন্দেহ নাই। যেসকল কারণে এইরূপ ঘটিয়াছে, কাল বিলম্ব না করিয়া সেইসকল সম্পর্কে সতর্ক হওয়া এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

উন্নতির উপায়

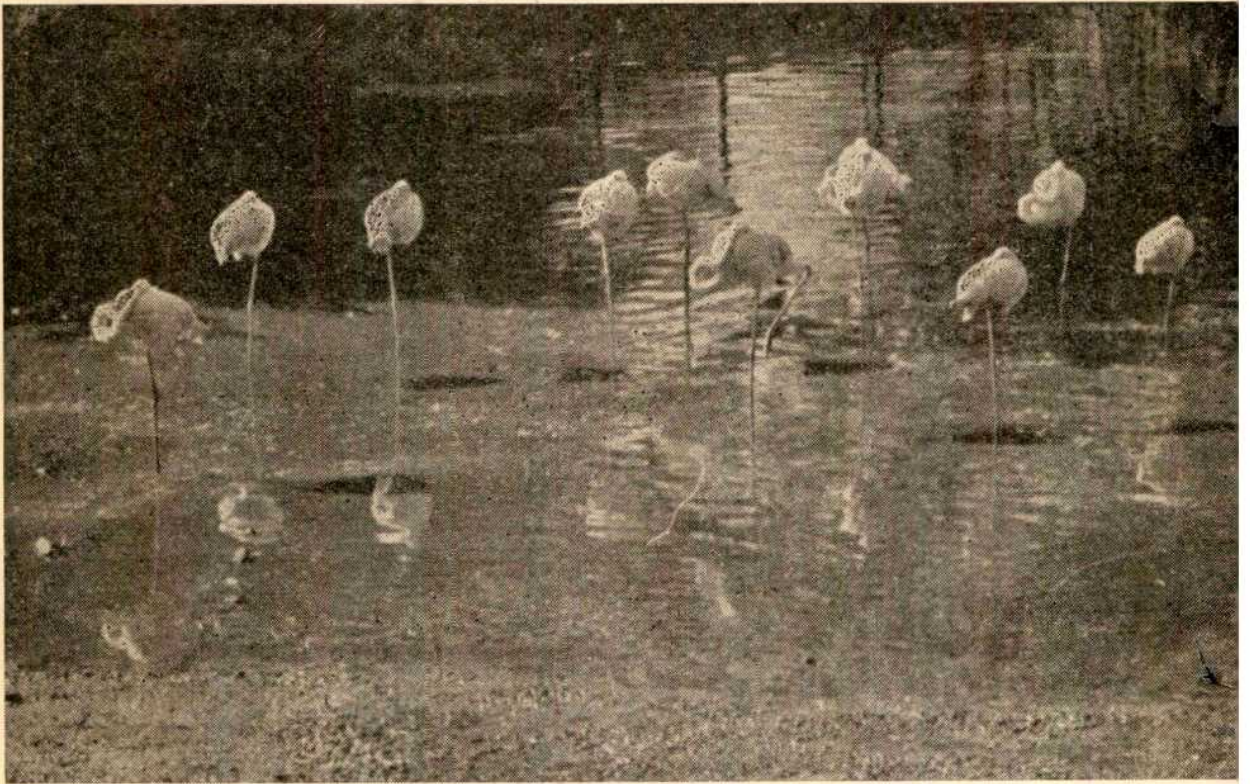
বর্তমান অবস্থা হইতে উন্নতির প্রধান উপায় বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক বাসভূমির উপযুক্ত সংরক্ষণ এবং তন্মধ্যে কতকগুলি বিশেষভাবে সংরক্ষিত আশ্রয়স্থান বা সংক্ষেপে অভয়ারণ্য গঠন। বিজ্ঞান-বলে মনুষ্যজাতি আজ জলে, স্থলে, এমন কি অন্তরীক্ষেও অবাধ বিচরণের অধিকারী এবং সর্বত্রই নিজ প্রাধান্য স্থাপনে সমর্থ। সেইজন্য মনুষ্যোত্তর প্রাণীদের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব আজ কেবলমাত্র মনুষ্যের সম্মতি ও করুণার উপরই নির্ভর করিতেছে। বস্তুত শিকারযোগ্য জীবজন্তুর জীবন আজ চারিদিক হইতেই বিপন্ন এবং যদি তাহাদের জন্য নিরুদ্বেগে বসবাস করিবার উপযুক্ত কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থানের ব্যবস্থা করা না হয়, তবে সর্বত্র ক্রমাগত উত্থাপিত হওয়ার ও সর্বদা শঙ্কিত অবস্থায় থাকার ফলে তাহাদের প্রজননশক্তি উত্তরোত্তর ক্ষয় পাওয়া বশত তাহাদের একেবারে নির্মূল হইয়া যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। বন্যপ্রাণীর জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত আশ্রয়স্থানের পরিকল্পনা এইরূপ আশঙ্কা হইতেই উদ্ভূত এবং ইহার প্রতিকারকল্পে পাশ্চাত্যদেশে এবং ভারতবর্ষে কোন কোন স্থানে চিরস্থায়ী ও অলঙ্ঘনীয় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি জাতীয় উদ্যান গঠিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক চুক্তিতে 'ন্যাশনাল পার্ক' ও সুরক্ষিত প্রাকৃতিক বনের (স্ট্রিক্ট ন্যাচারেল রিজার্ভস) যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তদনুসারে এইরূপ 'পার্ক' বা বনে কোনরূপ বন্যপ্রাণী হত্যা করা অথবা বৃক্ষাদি কাটা বা সংগ্রহ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

এইরূপ সুনিয়ন্ত্রিত 'পার্ক' বা বন বন্যপ্রাণী-সংরক্ষণার্থে যে বিশেষ উপযোগী সে বিষয়ে কোন

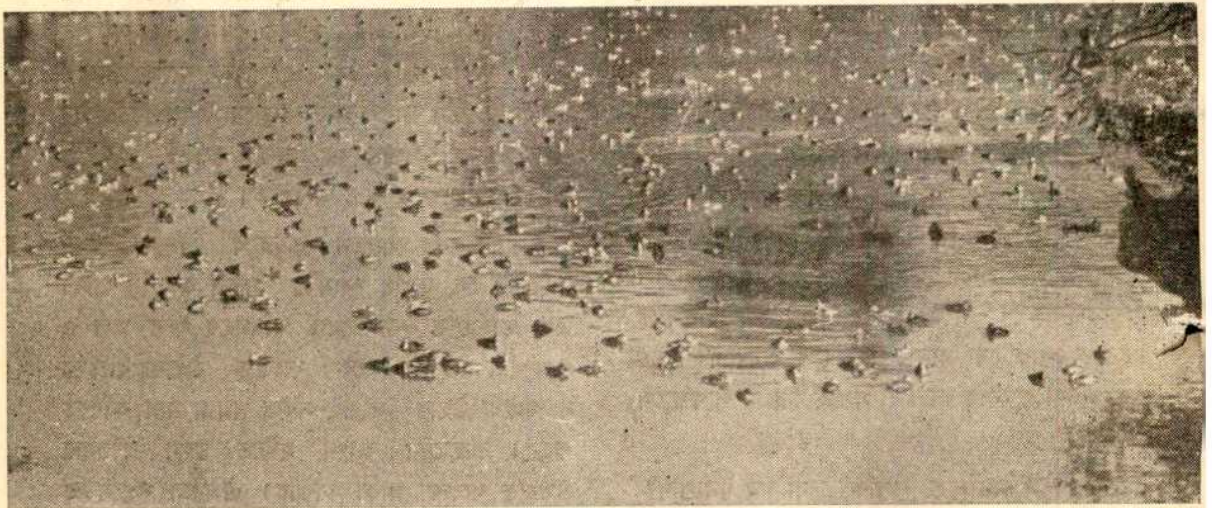
সন্দেহ নাই, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ঠিক এই ধরনের বন অথবা 'ন্যাশনাল পার্ক' স্থাপন করা বোধহয় সম্ভবপর নহে। তাহার কারণ, এই কার্য অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। পাশ্চাত্যদেশে এই ব্যয়ের সমস্ত না হইলেও অধিকাংশ দর্শকদিগের নিকট হইতে দর্শনী হিসাবে আদায় করা হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেরূপ কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ এদেশে বন্য পশুপক্ষী সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহান্বিত ব্যক্তির একান্ত অভাব, তাহার উপর বনগুলি স্বভাবত এত ঘন, দুর্য্যগম্য এবং এত বেশি বেত, জৌক, এঁটুলি প্রভৃতিতে পূর্ণ যে, শিক্ষিত জনসাধারণ বা দর্শকেরা সহজে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয় না। অধিকন্তু এদেশে উপস্থিত সরকারী সংরক্ষিত বনভূমির আয়তন এত সীমাবদ্ধ যে, আর্থনৈতিক কারণে ইহার কোন বৃহৎ অংশবিশেষে কাঠ ও অন্যান্য বনজাত পণ্য সংগ্রহ নিষিদ্ধ করিয়া তৎসংশ্লিষ্ট আয়ের পথ বন্ধ করা চলে না। জনসাধারণের উপকারার্থে বনগুলির প্রায় সর্বত্রই কাজ করা দরকার। এইজন্য বন্যপ্রাণীর রক্ষাকল্পে পশ্চিমবঙ্গে 'ন্যাশনাল পার্ক' পরিবর্তে আজ পর্যন্ত ৮টি 'গেম স্যাংচুয়ারি' বা অভয়ারণ্য স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু একমাত্র জলদাপাড়া 'স্যাংচুয়ারি' ব্যতীত অন্যগুলির আয়তন অতি ক্ষুদ্র, আর এইগুলির রক্ষার ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত নহে। যত শীঘ্র সম্ভব এইগুলির সংখ্যা এবং/অথবা আয়তন আবশ্যিকমত বাড়ানো এবং প্রত্যেকটির উপযুক্তভাবে সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট অর্থ ও কর্মচারীর ব্যবস্থা করা আবশ্যিক।

আশ্রয়স্থানের আয়তন এইরূপ বিস্তৃত হওয়া আবশ্যিক যে, তথায় স্থানীয় সকল জাতীয় প্রাণী এবং তাহাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য, জল ও বাসস্থান বর্তমান থাকে যাহাতে উহারা বাহিরে না যাইয়া উহার মধ্যেই সকল সময়ে বাস করিতে পারে। তাহাদের অগ্নি হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার। ঐসকল স্থানে ও তাহার আশপাশে গৃহপালিত (বিশেষত রোগগ্রস্ত)

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা



কমলকলি নয়—বুনো জলায় এক জাতের বক



বুনো জলায় বালি হাঁসের ঝাঁক

পশুর চারণ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। আর বনবিভাগের কার্য কেবলমাত্র মৃত অথবা অতি-পরিণত বৃক্ষের সংগ্রহে সীমাবদ্ধ রাখিয়া এইরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করা দরকার—যাহাতে সংরক্ষিত প্রাণীরা অতি মাত্রায় উত্তম না হয়।

‘ন্যাশনাল পার্ক’র ন্যায় ‘গেম স্যাংচুয়ারি’গুলিকে আইনের দ্বারা চিরস্থায়ী ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বিশেষভাবে চিহ্নিত করা আবশ্যিক। তন্মধ্যে অনধিকারী ও গদুশিকারীদের প্রবেশ বন্ধ করা, আর সকল প্রবেশকারীদের গমনাগমন নিয়ন্ত্রিত ও পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যিক।

এইরূপ আশ্রয়স্থানে স্থানীয় সকল জাতীয় অথবা নির্দিষ্ট কয়েকজাতীয় পশুপক্ষীর শিকার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া উহাদিগকে রক্ষা করা যাইতে পারে। কারণ নির্বিঘ্নে জীবনযাপন ও সন্তানপালন করিতে পারিলে, অল্পদিনের মধ্যেই উহাদের সংখ্যা সহজে বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত প্রাণীগুলি পার্শ্বস্থ জঙ্গলে ছড়াইয়া পড়ে। ‘স্যাংচুয়ারি’র বাহিরে এই অতিরিক্ত প্রাণীদের আইনসম্মত শিকারের জন্য খোলা রাখিলে মূল প্রাণিসম্পদের কোন ক্ষতি হয় না।

প্রত্যেক সংরক্ষিত আশ্রয়স্থান এক-একটি দায়িত্ব-সম্পন্ন কর্মচারীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে রাখা বিশেষ আবশ্যিক। তাহার অধীনে কেবলমাত্র সংরক্ষণকার্যের জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত ও প্রয়োজনমত পর্যাপ্ত-সংখ্যক কর্মচারী থাকিবে যাহাতে আশ্রয়স্থানগুলিকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পর্যবেক্ষণ করা যায় অর্থাৎ যাহাতে তথাকার বন্যপ্রাণীদের প্রকৃতপক্ষে ও সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করা সম্ভব হয়। তাহা না হইলে, তথাকথিত আশ্রয়-স্থানগুলি নিশ্চয়ই গদুশিকারীদের স্বর্গে পরিণত হইবে। এইসকল স্থানে জনসাধারণের প্রবেশ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু উহা যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত না করিলে চলিবে না। বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, এইরূপ

সংরক্ষিত আশ্রয়স্থানগুলি কালে জনসাধারণের দৃষ্টিতে বিশেষ মূল্যবান জাতীয় সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে।

এইরূপ অটুট আশ্রয়স্থান কেবলমাত্র সরকারী সংরক্ষিত বনভূমিতে স্থাপন করাই যথেষ্ট নহে। রক্ষিত বনের বাহিরে অন্যান্য যেসকল সরকারী ও ব্যক্তিগত বনজঙ্গল এবং বৃহদায়তন জলাভূমি অদ্যাপি বর্তমান, তাহার মধ্যে কতকগুলি উপযুক্ত স্থান নির্বাচিত করিয়া পশুপক্ষীর বিশেষ আশ্রয়-স্থানে পরিণত ও সংরক্ষণ করা উচিত।

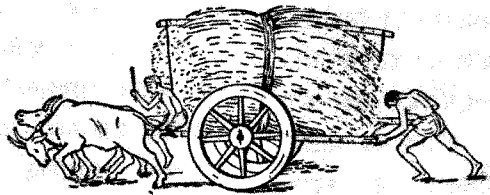
কিন্তু সর্বোপরি আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দেশে যত কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানই গঠিত হউক না কেন, অনুকূল জনমত না থাকিলে কোন শুভ সংকল্পই কোন্‌দিন ফলপ্রসূ হইতে পারে না। দেশের বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষার উদ্যমকে দেশের লোকে যতদিন পর্যন্ত সহানুভূতির চক্ষে না দেখিবেন এবং প্রকৃত শিকারীরা যতদিন না স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রচলিত আইন অঙ্করে অঙ্করে মানিয়া চলিবেন এবং তাহাদের পার্শ্বচরদিগকে আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য করিবেন ততদিন অবাধ প্রাণিহত্যা ও গদুশিকারীদের দৃষ্টিতে কিছুতেই বন্ধ হইবে না। পাশ্চাত্যদেশে লুকাইয়া শিকার করা বা শিকার-সম্বন্ধীয় কোন আইন ভঙ্গ করা শিক্ষিত-জনমতানুসারে অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সেইজন্যই তথায় অপরাধী সহজে অব্যাহতি পায় না। আমাদের দেশে লোকশিক্ষার অভাবে বন ও বন্যপ্রাণী-রক্ষা সম্বন্ধে প্রচলিত আইনগুলি জনসাধারণের নিকট স্বাধীনতার পরিপন্থী ও স্বার্থহানিকর বলিয়াই বিবেচিত হয় এবং অনেক সময় অনেক অন্যান্য গোপনে সংঘটিত হইয়া কেবলমাত্র জনমতের অভাবেই ধরা পড়ে না।

প্রচলিত আইনের সংস্কার অথবা প্রয়োজনমত নূতন আইন প্রবর্তনের আবশ্যিকতা থাকিতে পারে; কিন্তু যেখানে অনুকূল জনমত নাই

সেখানে শুধু নতুন নতুন আইন করিয়া কোন কাজ হয় না। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের মধ্যে হারিস্কার প্রভৃতি এমন কতকগুলি পুণ্যস্থান এখনও আছে যেখানে আজ পর্যন্ত কেহ কোন প্রকার প্রাণী, এমনকি মৎস্য পর্যন্ত হত্যা করিতে সাহস করে না। বহুকাল পূর্বে এই ভাবধারা যে আজ পর্যন্ত কালের শত পরিবর্তনের মধ্য দিয়াও এইসকল স্থানে টিকিয়া আছে, তাহার মূলে রহিয়াছে প্রাণিহত্যার বিরুদ্ধে স্থানীয় জনমত। এইরূপ জনমত অবশ্য তথাকার জনসাধারণের ধর্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইহা অতি সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের দেশে এমন বহু বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোক আছেন যাহারা “অহিংসা পরম ধর্ম” বা “জীবহত্যা মহাপাপ” বলিয়া গণ্য করেন এবং কি খাদ্যের জন্য, কি মৃগয়ার জন্য, কোন কারণেই কখনও প্রাণিবধ করেন না। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেক নিরামিষাহারী দেখা যায়। খ্রীষ্টানদের মধ্যেও অনেকে যীশুখ্রীষ্ট-প্রবর্তিত সুপ্রসিদ্ধ দর্শাবধ অনুশাসনের অন্যতম অনুশাসন “Thou shalt not kill” মানিয়া চলেন।

এইসকল ধর্মভাব অবশ্য অবাধ প্রাণিহত্যা নিবারণের কতকটা সহায়ক। কিন্তু বর্তমানে আমরা এমন এক যুগে বাস করিতেছি যেখানে ধর্মের দোহাই অপেক্ষা বিজ্ঞানের যুক্তি মানুষের মনে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ। সুতরাং দেশে উপযুক্ত পরিমাণ বনজঙ্গল ও উপযুক্ত-সংখ্যক জীবজন্তু না থাকিলে দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি সর্বপ্রকার উন্নতির পথে যে কী দারুণ অন্তরায়ের সৃষ্টি হইতে পারে, এ-বিষয়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তি-সমূহের দ্বারা দেশবাসীকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। রেডিও, গ্রামোফোন প্রভৃতির সাহায্যে, আধুনিক উপায়ে জনসাধারণের মধ্যে এ বিষয়ে প্রচার-কার্যেরও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোক নিরক্ষর হইলেও বুদ্ধিহীন নয়; এবং আপন স্বার্থ অতি নির্বোধেও বুঝিতে পারে। দেশের বনজঙ্গল ও জীবজন্তুর সংরক্ষণের সহিত দেশবাসীর স্বার্থও যে ষোলআনা যুক্ত এ কথা জনসাধারণ যোদিন সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিবে, দেশের বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষার স্বপক্ষে অনুকূল জনমত সেইদিনই গঠিত হইবে এবং তখনই এই সম্বন্ধে প্রকৃত উন্নতির পথ মন্ড হইবে।



পেঁয়াজ

ইন্দুভূষণ বসু, কৃষি-স্নাতক

বর্তমানে পেঁয়াজের চাষে বড় রকমের একটা বার্গিজ্যিক প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু দ্রুতের বিষয় এই যে, পশ্চিমবঙ্গে ইহার চাষ অত্যন্ত কম। বাঙালী চাষীভাইদের মধ্যে প্রায়ই শুনতে পাই যে, পেঁয়াজের চাষে লাভ নাই। তাঁহাদের উক্তি যে সত্য ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহারা যদি আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহার চাষ করেন তবে প্রতি বিঘায় ১৫০ টাকা হইতে ২০০ টাকা পর্যন্ত লাভ করিতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া পেঁয়াজের চাষের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর ১০ হইতে ১৫ লক্ষ মণ পেঁয়াজ বিদেশে রপ্তানি হইতেছে এবং ভারতের বাহিরে ইহার চাহিদাও রহিয়াছে প্রচুর। কাজেই ইহার উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

তিন প্রকারে পেঁয়াজের চাষ করা হয়—

- (১) পেঁয়াজের গেঁড়ো পদ্ধতিয়া,
- (২) জমিতে পেঁয়াজের বীজ ছড়াইয়া,
- (৩) বীজতলায় চারা তুলিয়া এবং জমিতে তাহা রোপণ করিয়া।

প্রথম পদ্ধতিতে প্রতি বিঘায় ১০-১৫ মণের বেশি পেঁয়াজ পাওয়া যায় না। প্রতি বিঘায় খরচ-খরচা বাদে ১০ হইতে ১৫ টাকার বেশি লাভ হয় না।

২য় পদ্ধতিতে কিছু বেশি বীজ পাওয়া গেলেও, এ রাজ্যের সমতল অঞ্চলের পক্ষে ইহা একেবারেই উপযোগী নয়।

৩য় পদ্ধতি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক এবং এই পদ্ধতিতে চাষ করিলে প্রতি বিঘায় ৫০ হইতে ৬০ মণ পেঁয়াজ অল্পায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে।

শেষোক্ত পদ্ধতির মোটামুটি বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হইল। পশ্চিম বাঙলার চাষীভাইরা যদি এই পদ্ধতিতে পেঁয়াজের চাষ করেন তবে আশা করি তাঁহারা এই কথা আর বলিবেন না যে, পেঁয়াজের চাষে লাভ নাই।

বীজতলার জন্য জমি

বীজতলার জন্য অপেক্ষাকৃত উঁচু জমি বাছাই করা উচিত। তাহার মাটি বেলে-দোআঁশ হওয়াই শ্রেয় এবং ঐ জমি হইতে যাহাতে সহজে জল নিকাশ হইতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা থাকা দরকার।

বীজতলা প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমত বীজতলার জমি পছন্দ করা হইলে তাহা কোদালি দিয়া খনন করিয়া বা দড়ি-একটি চাষ দিয়া ১০-১৫ দিন ফেলিয়া রাখিতে হইবে। ইহাতে প্রকৃতি হইতে জমিতে শক্তি সঞ্চারিত হইবে। দ্বিতীয়ত উক্ত সময় অতিবাহিত হইবার পর বীজতলার জমিতে চাষ দিয়া মাটি গুঁড়াইয়া দিতে হইবে। এই সময়ে জমিতে যদি কোন আগাছা বা কীট থাকে তবে তাহা কুড়াইয়া আনিয়া পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। অতঃপর জমিতে প্রতি ১০০ বর্গগজ পিছু আধমণ হইতে এক মণ পর্যন্ত গোবরসার দিয়া আরও ২-১ বার চাষ দিয়া মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশাইয়া দিতে হইবে। তৃতীয়ত বীজ ছিটাইবার ৪-৫ দিন পূর্বে তিন সের ছাই দুই মণ খুব-পচা আবর্জনা-সারের সহিত মিশাইয়া বীজতলায় ফেলিয়া মাটি সমান করিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন বীজতলার উপরিভাগের মাটি বেশ গুঁড়া থাকে।

১০০ বর্গগজ বীজতলায় যে চারা উৎপন্ন হইবে তাহা এক বিঘা জমিতে লাগাইবার পক্ষে যথেষ্ট।

৪ ফুট চওড়া, ১০ ফুট লম্বা এবং মাটি হইতে অন্তত ৩ ইঞ্চি উঁচু করিয়া বীজতলা প্রস্তুত করিতে হইবে। ১ বিঘা জমিতে পেঁয়াজের চাষের জন্য উক্ত মাপের ৮-৯টি বীজতলা তৈয়ারি করা উচিত এবং দুইটি বীজতলার মধ্যে ১ ফুট হইতে ১২ ফুট ব্যবধান রাখিতে হইবে। ইহাতে প্রত্যেক বীজতলায় জল দেওয়ার, আগাছা তুলিবার এবং চারা তুলিবার সুবিধা হয়।

বীজ বুনিবার পদ্ধতি

পশ্চিম বাঙলার আবহাওয়ায় সাধারণত আশ্বিনের শেষে অথবা কার্তিকের প্রথম দিকে বীজতলায় বীজ ছিটানো হইয়া থাকে। এক বিঘা জমির জন্য চারা তুলিবার পক্ষে ভাল জাতের আধ সের হইতে তিন পোয়া নীরোগ পুষ্ট বীজই যথেষ্ট। পেঁয়াজের বীজ খুব ছোট এবং হালকা, তাই বীজতলায় ছিটাইবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে বীজগুলি সমানভাবে ছড়াইয়া পড়ে। এইজন্য বীজ ছিটাইবার পূর্বে বীজের সঙ্গে সম-পরিমাণে মাটি মিশাইয়া লওয়া উচিত। বীজ বোনা হইয়া গেলে হাত বুলাইয়া হালকাভাবে মাটি-ঢাকা দেওয়া উচিত।

বীজ বুনিবার পরেই খুব সাবধানে বীজতলায় জল ছিটাইয়া দেওয়া দরকার। এইরূপে প্রথম তিন সপ্তাহ প্রতিদিন জল ছিটাইতে হইবে। বীজতলায় জল জমিয়া যাহাতে চারার গোড়া পচিয়া না যায় সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইতিমধ্যে বীজতলায় যাহাতে আগাছা জন্মিতে না পারে সেই বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার। আগাছা উঠাইবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন চারার কোন ক্ষতি না হয়।

ছয় সপ্তাহের মধ্যে চারাগুলি প্রায় ৬ ইঞ্চি হইয়া যায়। যদি অতিবৃষ্টি পরিলক্ষিত হয় তবে জমিতে রোপণের পূর্বে চারার উপরের ২-১ ইঞ্চি পরিমাণ অংশ ছিঁড়িয়া ফেলা উচিত। আর যদি চারাগুলি রোগাক্রান্ত হয় তবে ১ সের হইতে ১২

সের পরিমাণ অ্যামোনিয়ম সালফেট চারার গোড়ায় দিয়া, একটি সেচ দিতে হইবে। চারা উঠাইবার সময় শিকড় বাহাতে ছিঁড়িয়া না যায় সেইজন্য আগে বীজতলা জল দিয়া ভাল করিয়া ভিজাইয়া লইতে হইবে। সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি চারা তোলা হইয়া থাকে। সূর্য উঠিবার পূর্বে অথবা অস্ত যাইবার পরে চারা তোলা হইয়া থাকে।

জমিতে চারা রোপণ

যে জমিতে পেঁয়াজের চারা রোপণ করা হইবে তাহাতে ৫-৬টি চাষ দিয়া মাটি ভাল করিয়া গুঁড়াইতে হইবে। প্রতি বিঘায় ৮০ মণ উত্তম আবজর্না-পচা সার দিয়া পুনরায় একটি বা দুইটি চাষ দিতে হইবে। যদি উক্ত সারের সঙ্গে ১ মণ সুপার ফসফেট এবং ১৫ মণ ছাই মিশ্রিত করিয়া জমিতে প্রয়োগ করা যায় তবে পেঁয়াজের গেঁড়ো বড় হইবে এবং ফলন বেশি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মাটির উর্বরশক্তি যদি কম থাকে তবে ১ মণ হইতে ১২ মণ পরিমাণে অ্যামোনিয়ম সালফেট চারা রোপণ করিবার তিন সপ্তাহ পরে প্রয়োগ করিলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।

এইরূপ জমিতে সার দিয়া মাটি উত্তমরূপে তৈয়ারি করা হইলে ‘জাঙ্গাল’ এবং ‘খাদ’ তৈয়ারি করিতে হইবে। এক জাঙ্গাল হইতে আর এক জাঙ্গালের দূরত্ব ১২ ফুট হওয়া দরকার। ইহা ছাড়া, আড়াআড়িভাবে সেচের নালা কাটিতে হইবে। চারা রোপণের পূর্বে উক্ত নালা দিয়া জমিতে সেচ দিয়া নিতে হইবে। জাঙ্গালের উপরিভাগে ৪ ইঞ্চি অন্তর একটি করিয়া চারা এক ইঞ্চি গভীর করিয়া রোপণ করিতে হইবে। রোপণের সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে চারা-গুলি খাড়া থাকে।

আগাছা দমন

সাধারণত পেঁয়াজের চাষে ৩-৪ বার নিড়ানোর প্রয়োজন হয়। প্রতি ১০-১৫ দিন অন্তর একবার

নিড়াইয়া দিলেই যথেষ্ট। দ্বিতীয়বার নিড়াইবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন জাঙ্গাল হইতে মাটি খসিয়া না পড়ে।

সেচ

পেঁয়াজের চাষে ৭-৮টি সেচের প্রয়োজন। প্রতি-বারেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে জাঙ্গালের মাটি খসিয়া না পড়ে এবং ইহার উপরিভাগ উত্তমরূপে ভিজা থাকে। গেঁড়ো হইবার সময় যাহাতে উত্তমরূপে সেচ দেওয়া হয় সে বিষয়ে বিশেষ সচেতন হওয়া উচিত। গেঁড়ো তোলার পূর্বে জমিতে ভালভাবে সেচ দিতে হইবে যাহাতে গেঁড়োর কোন ক্ষতি না হয়।

ফসল তোলা

চারার রোপণের দুই হইতে আড়াই মাস পরে গেঁড়ো তৈয়ার হয়। বড় জাতের পেঁয়াজের গেঁড়ো দৈর্ঘ্যেতে পাওয়া যায়। এই সময় জাঙ্গালে মাটি চাপা দিয়া গেঁড়ো ঢাকিয়া রাখা উচিত নহে। আলো এবং বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া ইহা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। ফুল হইবার পূর্বেই তাহার বোঁটা ছিঁড়িয়া ফেলা উচিত। ইহাতে গেঁড়ো খুব সতেজ হয়। গেঁড়ো পরিণত হইয়াছে কিনা তাহা বুদ্ধিতে পারা যাইবে যখন ইহার পাতার আগা হলদে হইতে থাকিবে এবং শেষ পর্যন্ত পাতা পড়িয়া যাইবে। সাধারণত ফাল্গুন মাসের শেষের দিকে পেঁয়াজের গেঁড়ো তোলা হয়। গেঁড়ো তুলিবার জন্য কোদালি ব্যবহার করা হইয়া থাকে। গাছ সহ গেঁড়ো তোলা হইলে ছুরির সাহায্যে পাতা এবং শিকড় কাটিয়া ফেলিতে হইবে। গেঁড়োগুলি ৩-৪ দিন মাঠে পাতা দিয়া ঢাকিয়া

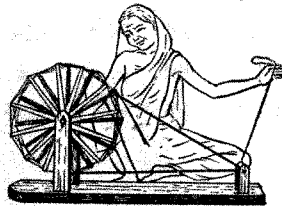
রাখিতে হইবে এবং পরে গুদামজাত করিতে হইবে অথবা বিক্রয়ের জন্য বাজারে পাঠাইতে হইবে।

গুদামজাত করা

ঠিকমত গুদামজাত করা না হইলে আলুর মত পেঁয়াজও অতি অল্পদিনের মধ্যে পচন ধরে। পেঁয়াজ যে ঘরে সংরক্ষণ করা হইবে সেই ঘরে বায়ুর চলাচল একান্ত বাঞ্ছনীয়। ঘরের মেঝে কিছুরেই স্নায়তসেঁতে হওয়া চলিবে না। এইরূপ শুষ্ক ঘরে পেঁয়াজের গেঁড়োগুলি বিছাইয়া দিতে হইবে। যেসকল চাষী পেঁয়াজের চাষ খুব বেশি করেন তাঁহারা যেন বাঁশের বেড়া এবং খড়ের ঢালা করিয়া তাহার মধ্যে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করেন। এইরূপ ঘরের ভিতর প্রচুর বায়ু চলাচল করে এবং এইরূপ ঘর বেশ শুষ্ক থাকে। মাঝে মাঝে পেঁয়াজের গেঁড়োগুলি উলটাইয়া দেওয়া দরকার এবং যেসকল গেঁড়ো পচিয়া গিয়াছে সেইগুলি সরাইয়া ফেলা নিতান্ত আবশ্যিক। ঠান্ডা গুদামে সংরক্ষণ করিতে গেলে ৩০ হইতে ৩৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপে পেঁয়াজ অনেক দিন ভাল থাকে।

পেঁয়াজের পোকা

পেঁয়াজের ক্ষেতে প্রায়ই 'ওনিয়ন থ্রিপ' নামক এক প্রকার পোকা দৈর্ঘ্যেতে পাওয়া যায়। এই পোকাকার আক্রমণের ফলে গাছ শুকাইয়া যায়। যদি এই পোকা ক্ষেতে কম দেখা যায় তবে মাঝে মাঝে সেচ দিয়া এবং নিড়াইয়া অনেক অংশে ইহার দমন করা সম্ভব হইতে পারে। ডি-ডি-টি (শতকরা ০.১ ভাগ) এবং বি-এইচ-সি (শতকরা ০.৫ ভাগ) ব্যবহার করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।



সুসম খাবার খেয়ে



খরচ বাঁচান

আজকালকার এই দুর্শ্বলোর বাজারে খরচপত্র বাঁচিয়ে প্রত্যেকদিন সুসম খাবার দাবার খাওয়া আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে ব্যাপারটি একেবারে অসম্ভব নয়। খাবারের মধ্যে স্নেহপদার্থ একটি অত্যাবশ্যক উপাদান। কিন্তু আমাদের দেশে পূর্ণবয়স্কেরা এবং বাড়ন্ত ছেলেমেয়েরা তাঁদের নূনতম প্রয়োজন অর্থাৎ দু'আউন্স স্নেহপদার্থ প্রতিদিন পান না। তার প্রথম কারণ, আমাদের দেশে চাহিদা অল্পযায়ী দুধের সরবরাহ অত্যন্ত কম। দুধ আর দুধ থেকে তৈরী অন্যান্য খাবারই স্নেহপদার্থের প্রধান উৎস। দ্বিতীয়ত, মাখন, ঘি ইত্যাদি পাওয়া গেলেও তা সাধারণ লোকের কেনার ক্ষমতার বাইরে। এবারে ধরুন খরচপত্রের কথা। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জায়গাতেই জিনিষপত্র দুর্শ্বল হয়ে উঠেছে। সে সব জায়গায় সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকেরা কি

করছে? তারা রান্নাবান্নায় ব্যবহার করছে পুষ্টিকর উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ যেমন, মার্গারিন, শর্টনিং বা ডালডা মার্কা বনস্পতি। এর ফলে তারা যে খাবার দাবার খাচ্ছে তা শুধু পুষ্টিকরই নয়, অত্যন্ত সুস্বাদুও বটে তাছাড়া, এইসব উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ দামেও ঘিয়ের তুলনায় সস্তা। ডালডা বনস্পতি খাঁটি উদ্ভিজ্জ তেল থেকে তৈরী হয়। ডালডার প্রতি আউন্সে ৭০০ অন্তর্জাতিক ইউনিট অর্থাৎ ভাল ঘিয়ের সমপরিমাণ ভিটামিন 'এ' যোগ করা হয়। তাছাড়াও ডালডার প্রতি আউন্সে ৫৬ ইউনিট ভিটামিন 'ডি' যোগ করা হয়। ডালডা সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরী হয় এবং সবসময় শীল করা ডবল চাকনা-ওলা টিনে পাওয়া যায়। এই সব কারনেই প্রত্যেকদিন আরও অধিকসংখ্যক গৃহিনীরা নিশ্চিন্ত মনে ডালডা ব্যবহার করছেন — তাঁরা জানেন, খাবারে অতিরিক্ত পুষ্টির পক্ষে ডালডা অপরিহার্য।



HVM. 315-18 B

ডিম সংরক্ষণের সহজ উপায়

শ্রীসত্যোজেন্দ্র গুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গে দৈনিক বহু ডিম খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু দূর্গন্ধের বিষয় যখন সেগুন্দি ক্রেতার নিকট আসিয়া পৌঁছায় তখন দেখা যায়, বেশির ভাগ ডিমই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থা হয় বিশেষভাবে গ্রীষ্মের সময়। ইহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশে হাঁস-মুরগি প্রায়ই জোড়া হিসাবে রাখা হয়, অর্থাৎ ডিমগুন্দি পূর্ণ ভ্রূণাবস্থায় (fertile) থাকে। আমাদের অধিকাংশ লোকের ধারণা, মোরগ বা হাঁসা সঙ্গে না থাকিলে মুরগি বা হাঁস ডিম পাড়িতে পারে না। এ ধারণা সত্য নহে। ডিমের ভিতর ভ্রূণ থাকায় কিছুদিন মাত্র সাধারণ দিবানিদ্রার তাপে ইহা বর্ধিত হইতে থাকে। ফলে ৮-১০ দিনের ভিতরই তাহা বর্ধিতাবস্থায় পৌঁছায় এবং খাদ্যের অযোগ্য হইয়া পড়ে।

এই অবস্থা বিশেষভাবে দেখা যায় গ্রীষ্মকালে। গ্রীষ্মকালে বাজারের ডিম ভাঙ্গিলে সাধারণত দেখা যায়, বেশির ভাগই পচা। কোন কোন ডিমে বর্ধিতাবস্থায় ভ্রূণ পাওয়া যায়। ইহার ফলে সাধারণ লোকে গ্রীষ্মকালে ডিম খাইতে চাহেন না। যাহারা গ্রীষ্মকালেও ডিম খান তাহারা ভালভাবেই জানেন—কী হারে এই পচা ডিম বাহির হয়। এইরূপ অবস্থা হওয়ায় ডিম-বিক্রেতারা তথা হাঁস-মুরগির পালকেরা প্রতি বৎসর বহু টাকা লোকসান দেন। কিন্তু অতি অল্প পরিশ্রমে এবং অতি কম খরচে সামান্য যত্নে এই ক্ষতির বহুভাগ কমানো যায়।

গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে যে, কয়েক জাতীয় পদার্থ ডিমের গায়ে মাখাইয়া রাখিলে ডিম বেশ কিছুকাল টাটকা থাকে—যেমন ওটেগ, খনিজ তৈল, চূনের জল ইত্যাদি। কিন্তু তৈল বা ওটেগ ব্যবহারে

ডিমের গায়ে যে তৈলাক্তাভাব আসে তাহা অনেকে পছন্দ করেন না। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক প্রকার তৈল ডিমের ভিতর অবশিষ্ট গন্ধের সৃষ্টি করে। ফলে ক্রেতা পরে আর ঐ সকল ডিম ক্রয় করেন না। এইসকল দোষ ঘটে বলিয়া এবং এই দ্রব্যের মূল্যও বেশি বলিয়া ইহা ব্যবহার করা সাধারণ ব্যবসায়ীর পক্ষে সুবিধাজনক হয় না—বিশেষ করিয়া আমাদের দেশের পক্ষে ইহা প্রযোজ্যও নহে।

কম খরচে, কম মেহনতে ডিমকে তাজা রাখার উপায়—নামমাত্র কলিচুন জলে গুলিয়া ঐ জলে ডিম ভিজাইয়া রাখা। ব্যবহারের আগে পর্যন্ত ডিমকে এইভাবে জলে ভিজাইয়া রাখা যায়, তাহাতে কোনওরূপ দূর্গন্ধ বা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। বড় বড় শহরে এইভাবে গদ্যমে ডিম রাখিলে এবং বিক্রয়ের কিছু পূর্বে জল হইতে উঠাইয়া শুকাইয়া লইলে টাটকা ডিমের মতই দেখাইবে, এবং কোনওরূপ বদনাম হইবারও সম্ভাবনা থাকিবে না। তবে এইভাবে সকল ডিম রাখিলেই চলিবে না। সাধারণত ‘বাওয়া’ ডিম (অর্থাৎ ভ্রূণশূন্য বা infertile) ডিমকে এইভাবে রাখা চলে—প্রথম অবস্থা হইতেই। কিন্তু ভ্রূণপূর্ণ (fertile) ডিম এইভাবে প্রথমেই রাখা উচিত হইবে না। ভ্রূণপূর্ণ ডিমের শোধনবিধি নিম্নে দেওয়া হইল। পূর্বে বলা হইয়াছে, আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় ভ্রূণশূন্য ডিম পাওয়া দুষ্কর। সেইজন্য ধারণা করা যাউক যে, সকল ডিমই ভ্রূণপূর্ণ এবং সেইমত সকল ডিমকেই নিম্নোক্ত উপায়ে শোধন করা যাইতে পারে।

সংখ্যা অনুসারে একাটি পাত্র লইতে হইবে—
উহার ৪ ভাগ জলপূর্ণ করিতে হইবে। একাটি

তারের জালের খাঁচায় ডিমগুলি আলাদা রাখিয়া জলের ভিতর ডুবাইতে হইবে। এখন জলকে গরম করা দরকার। ছোট একটি কাঁচের পাত্রে ছোট একটি মোমবাতির টুকরা রাখিয়া ঐ পাত্রটি গরম জলের উপরে রাখিয়া দিতে হইবে। মোমবাতিটি গলিতে শুরুর করিলে আর তাপ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই। এখানে লক্ষ্য রাখা দরকার যেন উপরের ডিমগুলিও জলের তলায় চলিয়া যায়। জলকে মাঝে মাঝে নাড়াইয়া দেওয়া দরকার যাহাতে জলের তাপ সর্বত্র সমান থাকে। ডিম ছাড়ায় জলের তাপ সামান্যমাত্র কমবে। ফলে, মোমবাতি গলা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকিবে। পুনরায় কিছুক্ষণের ভিতর মোমবাতি গলিতে শুরুর করিবে। তাপ যেন আর বাড়িয়া না যায়। বাড়িলে, ডিমের শ্বেতাংশ জমিতে আরম্ভ করিবে। এইভাবে ডিম-গুলি ১৫ মিনিটকাল গরমজলে রাখার পর উঠাইয়া লইতে হইবে এবং শীঘ্র ঠান্ডা করিয়া লইতে হইবে। মোমবাতি রাখার উদ্দেশ্য (যদি থার্মোমিটার না থাকে তাহা হইলেও এই ব্যবস্থা করা যায়) এই যে, যেহেতু ১৩০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপ দেওয়া দরকার। এইভাবে ডিমকে শোধন করার উপায়কে বলা হয় “ব্রুণনাশ-পদ্ধতি” বা (defertilisation)।

এই ব্রুণনাশ-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া নামমাত্র খরচে ডিমের রক্ষণক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব। আমাদের দেশের আবহাওয়ায় গরম-কালেও একমাস পর্যন্ত অনায়াসে এই ডিম ভাল রাখা যাইতে পারে। তবে পূর্বেক্ত প্রথায় চুনের জলে ভিজাইয়া রাখা বাঞ্ছনীয়। শীতকালে ৪-৫ মাস পর্যন্ত ডিম এইভাবে রাখা যাইতে পারে। এইভাবে শোধন করার পর একমাস পরেও ডিম ভাঙ্গিলে ডিমকে টাটকা মনে হয়। ডিমের শ্বেতাংশও জমিয়া যায় না বা ডিমের গুণও নষ্ট হয় না। ভারতীয় পশু-চিকিৎসা-গবেষণা-মন্ডিরে বহুদিনের গবেষণার পর ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

ডিমের রক্ষণক্ষমতা বাড়াইবার সহজসাধ্য উপায় এখানে আলোচনা করা হইল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কোনও খাদ্যদ্রব্য ঠান্ডায় রাখিতে পারিলে আরও বেশিদিন ভাল থাকে। ডিমের ক্ষেত্রেও তাহা প্রযোজ্য। কিন্তু আমাদের দেশে ঠান্ডাঘর (cold storage) বা ঠান্ডা-আলমারি (refrigerator) সকলের পক্ষে রাখার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে। সেজন্য সহজসাধ্য উপায়ে অপেক্ষাকৃত ‘ঠান্ডা তাক’ বা ‘আলমারি’ তৈয়ারি করা যাইতে পারে। আলমারিটির উপরে মাপ অনুযায়ী একটি টিনের ‘ট্রে’ রাখা দরকার এবং উহাতে জল ভর্তি রাখিতে হইবে। চট বা ন্যাকড়া উপরের জলভর্তি ‘ট্রে’ হইতে আলমারির চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া এমনভাবে জড়াইয়া দিতে হইবে যেন আলমারিটি এই ভিজা কাপড় বা চট দিয়া জড়ানো থাকে। জল কমিলে আবার ‘ট্রে’ জলপূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। এই আলমারিটি প্রচুর-বাতাসযুক্ত স্থানে রাখিতে হইবে। এইভাবে রাখিয়া দেখা গিয়াছে, বাহিরের তাপ যখন ১১০ ডিগ্রি ফারেনহাইট তখন আলমারির ভিতরকার তাপ ৭০-৭৫ ডিগ্রি। ফলে, গরমকালেও ডিমকে ভাল রাখা সম্ভব হইয়াছে।

অতএব, দেখা যাইতেছে যে, ব্রুণনাশ করার পর ডিমকে চুনের জলে ভিজাইয়া অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা আলমারিতে রাখিতে পারিলে অনায়াসেই অপেক্ষাকৃত টাটকা রাখা যায়। এই ব্যবস্থা যদি আমাদের গ্রামবাসীগণ এবং ছোটখাট তথা বড় বড় ব্যবসায়ীগণ অবলম্বন করেন তবে তাঁহাদের নিজ নিজ লাভের অঙ্ক বাড়িয়া যাইবে। ইহাতে দেশের সম্পদ হেলায় নষ্ট হইবে না এবং লোকের হাঁস-মুরগি পালনের উৎসাহ বাড়িয়া যাইবে, আমাদের দেশ-বাসীগণও ডিমের মত সুখাদ্যটি বহুল পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

সয়াবিন

শ্রীনীলমণি মিত্র

বি এস-সি (এজি), অ্যাসোস আই এ আর আই

কলাই প্রভৃতি যেসকল শস্যের শব্দটির ভিতর দানা হয় তাকে ইংরেজীতে বলা হয় 'বিন'। সয়াবিন কলাইএর মত শস্য—এর গাছকে বলা হয় 'সয়াসোজা' এবং শব্দটিকে বলা হয় 'সয়াবিন'।

সয়াবিন এশিয়ার পূর্বভাগের শস্য—মাগুরিয়া এর প্রধান উৎপাদন-স্থান। বহু প্রাচীনকাল থেকে এর ময়দা ও তেল চীনবাসীদের আহাৰ্যরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পৃথিবীর ৪ অংশ সয়াবিন মাগুরিয়া ও চীনদেশে জন্মায়। বর্তমানে জাপানে, রাশিয়ার ইউক্রেইন অঞ্চলে ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে এর চাষ হয়।

সয়াবিনের চাষ উঠতে সাধারণত ৪-৫ মাস সময় লাগে। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে থেকে আনা কতকগুলি জাতের বীজ নয়াদিল্লির ভারতীয় কৃষিগবেষণ-প্রতিষ্ঠানে ৬০-৭০ দিনে পেকে যেতে দেখা গেছে।

সয়াবিন সব রকম মাটিতেই জন্মায়। তবে দোআঁশ বা এটেল দোআঁশ জমিই সবচেয়ে ভাল। জল-নিকাশের সুবন্দোবস্ত আছে এমন উঁচু জমিই ভাল। সয়াবিন গ্রীষ্মকালের শস্য—উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এর পক্ষে প্রশস্ত। ঠান্ডা ও শুষ্ক জলবায়ু এবং অত্যধিক উষ্ণতা এই শস্যের বাড়ির পক্ষে হানিকারক।

সয়াবিনের জন্য জমি ভাল করে তৈরি করা দরকার। মাটির অবস্থা বুঝে ৪-৫ বার লাঙল দিয়ে ও প্রত্যেক বার লাঙল দেওয়ার পর মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। জমি তৈরি করার সময় ১০ গাড়ি গোবরসার এবং বীজ-বপনের সময় ২০ পাউন্ড নাইট্রোজেন ও প্রয়োজনমত ফসফেট প্রয়োগ করলে ফলন ভাল পাওয়া যায়। নাইট্রোজেন

ও ফসফেটের জন্য যথাক্রমে অ্যামোনিয়ম সালফেট ও সুপারফসফেট ব্যবহার করা যেতে পারে।

বীজ সাধারণত জুলাইএর শেষে বা অগাস্টের প্রথমে লাগানো হয়। বীজ সারিতে লাগানোই প্রশস্ত এবং এর জন্য দুইসারির মধ্যে ২ পেকে ২ই ফুট ও প্রত্যেক সারিতে দুটি গাছের মধ্যে ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি ব্যবধান রাখা উচিত। প্রতি একর জমির জন্য ৮-১০ সের বীজ দরকার। তবে যদি সবুজসার বা গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য লাগানোর প্রয়োজন হয় তা হলে বীজের হার স্বিগুণ করা উচিত। গাছের বাড়ির সময় মাঝে মাঝে জমিতে নিড়ানি দিয়ে আগাছাগুলি মেরে ফেলে মাটি আলগা করে দেওয়া দরকার।

অক্টোবরের প্রথম দিকে ফসল কাটবার উপযোগী হয়। এ সময়ে শব্দটির রঙ হলদে থেকে কালচে হয়ে যায়। ফসল কাটতে দেরি করলে অনেক সময় শব্দটিগুলি ফেটে গিয়ে দানা ছড়িয়ে পড়ে নষ্ট হয়। প্রতি একরে গড়ে প্রায় ১০ মণ দানা পাওয়া যায়।

ফসল যদি সবুজসার বা গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় তবে সাধারণত ৬ সপ্তাহ পরে বা ফুল ধরার সঙ্গে সঙ্গে কেটে ফেলা দরকার। এ-সময়ে একরপিছ ১৫০-২০০ মণ ফসল পাওয়া যায়।

সয়াবিনের দানায় শতকরা প্রায় ৪৩ ভাগ প্রোটিন ও ১৮-১৯ ভাগ তৈলজাতীয় পদার্থ আছে। সয়াবিন বহু মদ্য-রোগীদের পক্ষে খুব উপকারী। সয়াবিনের দানা গুড়ো করে ময়দা করা হয় এবং এ থেকে তেলও বের করা হয়। এই

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

তেল থেকে সাবান, কৃত্রিম মাখন, ছাপার কালি, বার্নিশ, গ্লিসারিন, প্লাস্টিক প্রভৃতি তৈরি হয়। এই দানা থেকে একরকম 'দুধ'ও তৈরি হয় এবং এর খইল গবাদি পশুর উৎকৃষ্ট খাদ্য ও জমির উৎকৃষ্ট সার।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে এদেশে আনীত কতকগুলি উন্নত জাতের বীজের মধ্যে 'মেনটা',

'ক্রেমসন' ও 'পামেটা' নামক বীজই এদেশের পক্ষে ভাল। উত্তরপ্রদেশে 'টাইপ ১০১' (নারি) ও 'টাইপ ৬৩' (মাঝারি) নামক উন্নত জাতের ফসলের চাষ হয়। নয়াদিল্লির ভারতীয় কৃষিগবেষণ-প্রতিষ্ঠানে আবিষ্কৃত উন্নত জাতের বীজের মধ্যে 'আই সি ১১৮' ও 'আই সি ২১২' অন্যান্যগুলি অপেক্ষা ভাল ফলন দিচ্ছে।



‘বেয়ার’এর পোকা ও রোগ দমনের ঔষধগুলির
দ্বারা আপনাদের ফসল রক্ষা করুন

ফলিডল-ই ৬০৫

মেটাসিস্টক্স

সেরেসান

অ্যাগালল

কুপ্রাভিট (ওবি ২১)

এইগুলি পশ্চিম জার্মানীর লিভারকুসেনের

ফারবেনফ্যাবরিকেন বেয়ার

দ্বারা প্রস্তুত আসল ঔষধ।

ভারতে পরিবেশক

চিকা প্রাইভেট লিমিটেড,

৩১, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২

কলার খাবার

শ্রীমতী কণা দেবী, ভারতী

কদলী অর্থাৎ কলা আমাদের বিশেষ পরিচিত ফল। দেবতার ভোগে কলা লাগার অর্থই হ'ল, লোকে একে খুবই পছন্দ করে। পল্লীগ্রামে খুব কম বাড়িই আছে, যেখানে কলার গাছ নেই। বিশেষ যত্ন না নিলেও কলাগাছে কলা ফলে থাকে; আর যত্ন নিলে, পরিশ্রমের তুলনায় অনেক বেশি পারিশ্রমিক মিলে যায়। খনার বচনে আছে, কলা চাম থেকেই চামীর ভাত-কাপড়ের সংস্থান হ'তে পারে।

নানা জাতের কলা হয় এ দেশে, যেমন—মর্তমান (চাটিম, সবরি, মানভোগ), চাঁপা, চিনি-চাঁপা, কাঁঠালী (চিনিয়া), বীচে, বা দয়াডোমরা, অমৃতসাগর, কাবুলী, কানাইবাঁশী, রামকেলী, অগ্নীশ্বর, দুধ-সাগর, মোহনবাঁশি, বীটজবা, অনুপম, কাঁচকলা ইত্যাদি। কাঁচকলা সাধারণত কাঁচা অবস্থায় তরকারি হিসাবে খাওয়া হয়, তবে একে পাকিয়েও খাওয়া চলে। বীচে কলায় অত্যন্ত বীজ থাকায় পাকা অবস্থায় খাওয়া অসম্ভব; তাই মোচা বেরোলেই গাছ কেটে মোচা ও থোড় খাওয়া হয়। কিন্তু এ থেকে কয়েকটি দামী জিনিস তৈরি হ'তে পারে। সে কথা পরে বলছি।

পশ্চিমবঙ্গে বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাস কলাগাছ বসানোর উত্তম সময়। সাধারণত দোআশি মাটিতে কলা ভাল ফলে। বাদুড়, হনুমান, নানা জাতের পাখি, জোনাকি পোকা, ইঁদুর, মশা প্রভৃতি জীব কলার বড় শত্রু।

কলা এমনি খাওয়া ছাড়া এ থেকে কয়েকটি উপকারী ও দামী খাবারও তৈরি করা যেতে পারে। সেগুলোর কথা বলছি এবার।

কলার আটা (বেনানা ফুড)

সকল জাতের কাঁচা কলা থেকে এই খাদ্য তৈরি করা সম্ভব হ'লেও, বীচেকলা ও কাঁচকলা থেকেই

আটা তৈরি করা ভাল; তাতে পাকা কলায় হাত পড়ে না। সুপুষ্ট কলাকে গাছ থেকে পেড়ে, লোহা ভিন্ন অন্য ধাতু দিয়ে তৈরি ছুরি দিয়ে খোসা ছাড়াতে ও চাকা চাকা করে কাটতে হবে। তারপর ঐ খণ্ড-গুলিকে রোদে শুকিয়ে ঢেঁকি, জাঁতা বা হামান-দিস্তার সাহায্যে গুঁড়িয়ে চেলে নিলেই কলার আটা তৈরি হল। এই জিনিসটি বার্লি বা পালোর মত খাওয়া যায় এবং উদরাময়, আমাশয়, শোথ প্রভৃতি রোগে তা ভাল ঔষধ ও পথ্য। গমের আটার সঙ্গে এই আটা মিশিয়ে রুটি করে খেলে শরীরের পুষ্টি সাধিত হয়।

কলার মধু

বিশেষ করে পাকা বীচেকলা থেকেই মধু করা হয়। কলা পেকে খোসা কালো হ'লে উঠলে, খোসা ছাড়িয়ে কলা চটকাতে হবে; তারপর সেরপিছু সিকি ছটাক পরিমাণ চুন মিশিয়ে, ছানার জল ঝরানোর নিয়মে, পিণ্ডটি ঝুলিয়ে রাখতে হবে পরিষ্কার কাপড়ে বেঁধে। এবার ঐ চটকানো কলা থেকে যে রস ঝরে পড়বে, সেইটাই কলার মধু। মধু ধরার জন্য পরিষ্কার কাঁচের বা পাথরের পাত্র ব্যবহার করা উচিত। এই মধুতে কয়েক ফোঁটা কলার নির্যাস (বেনানা এসেন্স) মিশিয়ে নিলে চমৎকার গন্ধ হয়। এটি বেশ উপকারী খাদ্য।

কলার জেলি

মর্তমানকলা থেকে ভাল জেলি তৈরি হয়। পাকা কলা ছাড়িয়ে ও চাকা চাকা করে কেটে, কলার সমান ওজনের জলে চাকাগুলি ফেলে অল্প-জ্বালে সিদ্ধ করতে হবে। জল শুকিয়ে গেলে বা অতি সামান্য জল থাকা অবস্থায় নামিয়ে ঠান্ডা করে, বেলপানা ছাঁকার নিয়মে ছাঁকতে হবে। ছাঁকা কাই-এ সমপরিমাণ চিনি মিশিয়ে কম আঁচে এক

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

ঘণ্টা জ্বাল দিতে হবে। ইচ্ছা হ'লে, চিনি মিশানোর সময় লেবুর রস বা 'সাইট্রিক অ্যাসিড' একটু জলে গুলে ঐ কাই-এ মিশানো যায়। পরিষ্কার বোতলে ব্যান্ডিনিরোধ করে রাখলে জিনিসটি অনেক দিন অবিকৃত থেকে যাবে।

কলার সত্ত্ব

ভাল পাকা কাঁঠালী বা চাপা কলার খোসা ভাল করে ছাড়িয়ে কোন পাত্রে সাজিয়ে আগুনের অল্প তাপে তার জল বের করে ফেলতে হবে। সব জল

বেরিয়ে গেলে কলা চূপসে যাবে ও হালকা হবে খুব; কিন্তু কলার গুণ ও মিষ্টতা কমবে না। মাঝে মাঝে রোদে দিয়ে ভাল করে রাখতে পারলে এই সত্ত্বা দুই-তিন বৎসরও ঠিক থাকে।

কলার বড়া, কলার পিঠে ইত্যাদি খাবার বাঙলার মহিলাদের জানা জিনিস। সেগুন্ডিলর সম্বন্ধে বলার নেই কিছু। এই জিনিস কাঁটি তৈরি করে ঘরে খাওয়া চলে এবং চেষ্টা করলে বিক্রি করে দু'পয়সা আয় করাও যায়।

আপনি পশ্চিমবঙ্গ প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত 'বসুন্ধরা' এবং যে-কোন পত্রিকার গ্রাহক হ'তে হ'লে, চাঁদার টাকা পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তার নামে 'রাইটার্স' বিল্ডিংস, কলিকাতা-১' ঠিকানায় নগদ পাঠাতে বা জমা দিতে পারেন, অথবা ক্রস্‌ড পোস্টাল অর্ডারেও পাঠাতে পারেন। যে পত্রিকা বা যে যে পত্রিকার গ্রাহক হ'তে চান তার বা সেগুন্ডিলের নাম এবং নিজের নাম-ঠিকানা সুস্পষ্ট বড় অক্ষরে লিখে দেবেন। ক্রস্‌ড পোস্টাল অর্ডারের সঙ্গে অবশ্যই একটি পত্র দিতে হবে; যে-পত্রিকার গ্রাহক হ'তে চান তার নাম এবং নিজের নাম-ঠিকানা সেই পত্রে স্পষ্ট বড় বড় অক্ষরে অবশ্যই লিখে দেবেন।

লাল আলু বা মিষ্টি আলুর চাষ

শ্রীনিতাইচরণ খাঁ

লাল আলু একটি লাভজনক ফসল। ইহা চাষ করিতে বিশেষ কোন খরচ নাই। এই কয়েক বৎসর যাবৎ লাল আলুর চাষ আমি যে প্রণালীতে করিয়া আসিতেছি এবং তাহাতে যে রূপ আশাতীত সাফল্য লাভ করিতেছি তাহা আমি আমার চাষী-ভাইগণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য “বসুন্ধরা”র আশ্রয় লইলাম।

রেংগুন, গোঁহাটি, কাটোয়া, নৈনিতাল প্রভৃতি গোল আলুর চাষ করিতে হইলে যে রূপ দুর্ভিক্ষের ও যথেষ্ট পরিমাণে খইল-সারের প্রয়োজন হয়, তাহা সাধারণ গরিব চাষীগণের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যয়সাপেক্ষ। অনেক সময়ে তাহারা অর্থের অভাবে আলুচাষ করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু লাল আলুর চাষে ঐসবের কোন বালাই নাই। ইহার চাষে দরকার লাল আলু গাছের ডগা বা উপর অংশ। ঐ ডগা লাল আলুর চাষীর নিকট কিনিতে পাওয়া যায়। ঐরূপ ডগা ওজনদরে বিক্রয় হয়। প্রতি মণ ৮ টাকা হইতে ১০ টাকায় পাওয়া যায়। তবে তাহার সমস্তই যে ডগা পাওয়া যাইবে তাহা নহে; বিক্রেতাগণ ঐ ডগার সহিত অনেক মোটা ডাঁটাও মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করে। ডাঁটার গাছে ফলন অপেক্ষাকৃত কম হয়। এক বিঘা জমিতে প্রায় তিন মণ ডগা লাগে।

মিষ্টি বা লাল আলুর আকার লম্বা। ইহার বর্ণ দুই প্রকারের হইয়া থাকে—সাদা ও লাল। সাদা অপেক্ষা লাল রঙের মিষ্টি আলুর ফলন বেশি হয়; ইহা খাইতেও সাদা আলু অপেক্ষা অনেক সুস্বাদু আর ইহা সহজে পোকাকার দ্বারা আক্রান্ত

হয় না। সাদা মিষ্টি আলু সহজেই পোকাকার দ্বারা আক্রান্ত হয়।

কী প্রকারে বীজ বা ডগা সংগ্রহ করিতে হয় তাহা আমি প্রথমেই আলোচনা করিতেছি। ধরুন, আমি এই সর্বপ্রথম মিষ্টি আলুর চাষ করিব; কিন্তু কোথায় ইহার বীজ পাইব! বাহির হইতে বীজ বা ডগা ক্রয় করিবার সামর্থ্য আমার নাই। সেই অবস্থায় উহার ডগা কী প্রকারে সংগ্রহ করিব? চৈত্র মাসে যখন লাল আলুর দর প্রতি সের দুই আনা, তখন হাট কিংবা বাজার হইতে এক সের সাদা কিংবা লাল মিষ্টি আলু কিনিয়া আনিয়া ঘরের এক কোণে কিংবা কোন ছায়াযুক্ত স্থানে বা কোন মাটির পায়ে সামান্য ভিজা বালি চাপা দিয়া রাখিতে হইবে। ঐ বালির উপর সন্তাহে একবার করিয়া সামান্য জল ছিটাইয়া দিলে খুবই উপকার হয়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে দেখা যাইবে প্রতি আলু হইতে ৮-১০টি অঙ্কুর বালি ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তখন সেই অঙ্কুরিত আলুগুলিকে যে-কোন ডাঙা জমির এক কোণে কোদালি দ্বারা মাটি খুঁড়িয়া খুব গুঁড়া করিয়া, তাহাতে কিছু আবর্জনা সার মিশাইয়া একটি হাপর বা বীজতলা প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে রোপণ করিয়া রাখিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, বর্ষার জল যেন সেখানে জমিতে না পারে। জল জমিলে আলুগুলি পচিয়া যাইবার খুব সম্ভাবনা। সুতরাং বর্ষার জল যাহাতে বীজতলা হইতে সম্পূর্ণরূপে নিকাশ হইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা পূর্বেই করিয়া রাখা দরকার। আশ্বিন মাসের মধ্যেই সেই সমস্ত রোপিত আলু হইতে

অসংখ্য লতানে গাছ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া সেই জমির ক্রিয়দংশ ঢাকিয়া ফেলিবে এবং ডগা কাটিয়া রোপণ করিবার উপযোগী হইবে। ইহার পর প্রতি বৎসর নিজের ক্ষেত হইতেই বীজডগা লওয়া যাইবে। আলু সংগ্রহ করিবার পূর্বে সেই পুরানো আলুগাছের ডগা কাটিয়া পূর্বোক্ত প্রণালীতে মাটি তৈয়ার করিয়া তাহাতে সেই কাটা ডগাগুলি রোপণ করিয়া রাখিতে হইবে।

দোআঁশ, বেল, পলিমাটিতে বা নদীর চরে ইহার চাষ ভাল হয় এবং ফলনও প্রচুর হইয়া থাকে। যে ডাঙ্গা জমিতে লাল আলুর চাষ হইবে সেই জমিতে বৈশাখ মাসে প্রথম বর্ষিৎ হইলেই ৩-৪ বার ভাল-রূপে লাঙ্গল দিয়া ঘাস ও আগাছা যতটা পারা যায় পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে। ডগা রোপণের পূর্ব পর্যন্ত জমিতে মাসে অন্তত দুইবার লাঙ্গল দেওয়া দরকার। জমিতে লাঙ্গল দিবার সময় যথেষ্ট পরিমাণে গোয়াল ঝাঁট দেওয়া আবর্জনা, গোবর ও ছাই ফেলিয়া ভালরূপে মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হইবে। মোট কথা, মাটিকে হালকা করিতে পারিলে ফলনও বাড়িয়া যাইবে। তবে আশ্বিন মাসের শেষ হইতে কান্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ডগা রোপণ করা দরকার। তাহা না হইলে ফলন অনেক কম হইবে কিন্তু গাছের ডালপালা খুব বেশি হইতে পারে।

জমি প্রস্তুত হইলে দুই ফুট অন্তর সারিতে ১ ফুট অন্তর খুঁবি বা অল্প গভীর গর্ত কাটিতে হইবে। তারপর প্রত্যেক খুঁবিতে সামান্য পরিমাণ জল দিয়া তাহাতে ঐ আলুগাছের ডগা রোপণ করিতে হইবে। ডগাগুলি যখন বীজতলা হইতে সংগ্রহ করা হইবে তখন প্রতিটি ডগা যেন লম্বায় এক হাত পরিমাণে কাটা হয়। প্রতি ডগার ৬ ইঞ্চি বাহিরে রাখিয়া বাকি অংশ গিড়ার মত পাকাইয়া লইতে হইবে এবং ঐ বিড়ার যত অংশ খুঁবিতে খুঁবিতে রোপণ করিয়া কোদালি দ্বারা সারির দুই পাশ হইতে মাটি টানিয়া খুঁবি চাপা দিতে হইবে। ডগা রোপণ করিবার কিছুদিন পরে

যখন দেখা যাইবে উক্ত ডগাগুলিতে নতুন পাতা গজাইয়াছে তখন খুঁবিতে হইবে যে, উহারা নতুন শিকড় ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই সময় আর-একবার সারির দুই দিকের মাটি কোদালির দ্বারা টানিয়া গাছের গোড়ায় দিতে পারিলে খুবই ভাল হয়। তাহার পর আর উহাতে কোন প্রকার খাটনি নাই বা সেচেরও কোন প্রয়োজন নাই। দুই-তিন মাসের মধ্যে সারা জমিটি আলুর লতায় এমনভাবে ঢাকিয়া যাইবে যে, জমির মাটি পর্যন্ত দেখা যাইবে না। ইহার ফলে জমিতে ঘাস বা আগাছা কিছুই জন্মিতে পারিবে না।

ডগার গোড়ার অংশ বিড়া পাকাইবার উদ্দেশ্যে এই যে, ঐ বিড়াতে যতগুলি গাঁট থাকিবে, প্রত্যেক গাঁট হইতে লাল রঙের শিকড় বাহির হইবে এবং প্রত্যেক শিকড়ে লম্বা ধরনের গুটি ধরিবে।

ডগা রোপণ করিবার পূর্বে সামান্য অর্থব্যয়ে ৩ ভাগ খইলগুড়া ও ১ ভাগ অ্যামোনিয়ম সালফেট মিশ্রিত করিয়া সামান্য পরিমাণে যদি প্রত্যেক খুঁবিতে দিয়া তাহাতে সামান্য জল ঢালিয়া ডগা রোপণ করা যায়, তাহা হইলে অতি অল্পদিনের মধ্যে প্রতি ডগা হইতে নতুন শিকড় বাহির হইয়া গাছগুলিকে সতেজ করিয়া তুলিবে। মাটি যদি ভিজা থাকে তাহা হইলে আর জল ঢালিয়া ডগা রোপণ করিতে হইবে না। যদি পলিমাটি হয় তাহা হইলে আর সার কিংবা অন্য কোন কিছুই প্রয়োজন হয় না।

খইল, গোবরসার বা রাসায়নিক সার ইত্যাদির দ্বারা অতি যত্ন সহকারে মিষ্টি লাল আলুর চাষ করিতে পারিলে বিঘাপ্রতি একশত মণেরও বেশি পর্যন্ত ফলন পাওয়া যাইতে পারে। এক-একটি আলু ওজনে প্রায় এক সের পর্যন্তও হইতে দেখা গিয়াছে। এই আলুর যদিও অন্য আলু অপেক্ষা দর কম তথাপি ফলনের আধিক্য ও খরচের অল্পতা হেতু ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে লাভ হয়।

মাঘ মাসের প্রথম হইতেই আলু সংগ্রহ করা চলে। তবে শীতের হাওয়া থাকিতে আলু তুলিয়া লওয়াই ভাল। কারণ যত গরমের হাওয়া বহিবে এবং মাটি উত্তপ্ত হইবে ততই আলুর পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। জমির মাটি যদি অত্যধিক গরম হইয়া যায় তাহা হইলে মাটির মধ্যেই আলুতে 'চাঁষ' নামক এক প্রকার পোকা ধরিয়া যাইবে। ঐ পোকা-ধরা আলু খাদ্যের অনুপযোগী। উহা হইতে এক প্রকার ধূনার ন্যায় গন্ধ বাহির হয়। পোকা-ধরা লাল আলু তিক্তস্বাদ হয়।

শীতের হাওয়া থাকিতে আলু তোলা শেষ হইলে কোন ঠান্ডা জায়গায় বালির সহিত মিশাইয়া রাখিলে সেই আলু অনেক দিন পর্যন্ত ঠিক থাকে। মিষ্টি লাল আলু সিদ্ধ ভাতের পরিবর্তে খাওয়া চলে, ইহাতে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। আটা-ময়দার সহিত সিদ্ধ-করা লাল আলু মাখিয়া

মন্ড করিয়া রুটি তৈয়ার করিলে রুটি বেশ নরম ও রুচিকর হয়। পল্লীগামের অনেক গৃহস্থ সপ্তাহ সময় লাল আলু কিনিয়া রাখেন এবং চাউলের অতিরিক্ত খরচ কমানোর জন্য ঐ আলু সিদ্ধ করিয়া জলযোগের ব্যবস্থা করেন।

লাল আলু বা মিষ্টি আলু ব্যঞ্জনাদিতেও ব্যবহৃত হয়। চার্টার প্রস্তুত করিতে মিষ্টি লাল আলুর বিশেষ প্রয়োজন।

লাল আলু শরীরের পক্ষেও কম হিতকর নহে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে—

“আলুকী বলকুং স্নিগ্ধা গুরুবা হৃৎকফনাশিনী।

বিষ্টম্ভকারিণী তৈলে ললিতাতিরুচিপ্রদা॥”
অর্থাৎ লাল আলু বলকর, স্নিগ্ধ, গুরু, হৃদয়গত-কফনাশক ও বিষ্টম্ভী। ইহা তৈলে ভাজিলে অত্যন্ত রুচিকর হয়।



সাম্প্রতিক কালের বন্যা-দমন ব্যবস্থা

প্রকৃতি করুণাময়ী। তার দানকে মানবসমাজ অস্বীকার করতে পারে না। মানুষের জীবনযাত্রার জন্য সে করুণার প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রকৃতির রুদ্র রূপের সঙ্গেও মানুষকে পরিচিত হতে হয়; তার অসীম শক্তির সঙ্গেও মানুষকে যুদ্ধ করতে হয়।

নদী দেশকে শ্যামল করে। শস্যের জন্য বৃষ্টির প্রয়োজন—কিন্তু নদী যখন দেশকে প্লাবিত করে, বৃষ্টি যখন নদীজল বৃদ্ধি করে বন্যা আনে, তখন মানুষ অসহায়। কিন্তু এযুগে সে আর প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক মাত্র হয়ে থাকতে চায় না, তার শক্তি সে জাগ্রত করে খেলালী প্রকৃতিকে শাসন করবার জন্য। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের শক্তি-পরিচয়ের একটা দৃষ্টান্ত যেন আমাদের বন্যানিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনাগুলি।

উত্তর বঙ্গ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বনজ সম্পদ, চা-বাগান ইত্যাদির জন্য প্রসিদ্ধ, কিন্তু এ অঞ্চল সমস্ত দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় এখানকার নিজস্ব কয়েকটি সমস্যা রয়েছে। নদীগুলির খেলাল-খুশিমত ভূমিক্ষয় আর বর্ষার সময়ে প্লাবন সরকারের বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রথমত, তিস্তা ও তোরসা নদীকে আয়ত্তে আনতে না পারলে উত্তরবঙ্গের বন্যা-সমস্যার সমাধান হতে পারে না—এ নদী দুটির উৎপত্তি যথাক্রমে সিকিম ও ভুটান রাজ্য থেকে। উত্তর ভারতের এইসব দূরন্ত নদীতে বাঁধ বেঁধে বন্যানিয়ন্ত্রণের কাজ আরম্ভ করা কঠিন হত—তা ছাড়া এ কাজ আরম্ভের সময় নানা বাধাবিঘ্ন দেখা দেয়। এসব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও, বাঁধ-নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে আর বন্যানিয়ন্ত্রণে সরকার সফলও হয়েছেন।

১৯৫৭-৫৮ সালে উত্তরবঙ্গের নদীগুলিতে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কাজ যতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে, এখানে তারই বিবরণ দেওয়া হল।

১। মহানন্দার কবল থেকে ইংলিশবাজার রক্ষা

মালদহ জেলার ইংলিশবাজার শহরের ভিতর রয়েছে মহানন্দা নদীর বন্যার জলের উচ্চতা থেকে নিচে। বহুদিন আগে শহরটি রক্ষার জন্য একটি বাঁধ দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু এটির অবস্থা এখন নিতান্ত শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বাঁধটির ১,২০০ ফুট জায়গা রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এর ফলে বাঁধটি আবার রক্ষা পাবে, নদীর ধারের ঢাল ইট গেথে আর বাঁশ এবং শালের বেড়া দিয়ে দৃঢ় করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যয় হবে ১,১৫,৯০০ টাকা।

২। সুরভনগর ও অরবিন্দনগর রক্ষা

সুরভনগর ও অরবিন্দনগর আলিপুরদুয়ারের কাছে। এ দুটি জায়গা বাঁচানোর কাজটা হ'ল ভূমিক্ষয়-নিবারণের কাজ। এতে চেষ্টা চলছে যাতে গরম ও ডিমা নদী যুক্ত হতে না পারে। নদী দুটি যুক্ত হলে অদূরভবিষ্যতে বন্যা বিশেষ ক্ষতি করবে। গরম ও ডিমা নদীকে খাল কেটে ঘুরিয়ে দেবার কথা হয়েছে। গরম নদীর বাঁ ধার আর ডিমা নদীর ডান ধার রক্ষা করবার জন্য দুটি বাঁধ দেওয়া হবে। কাজ এগিয়ে চলেছে—১৯৫৮ সালে বন্যা নামবার আগে শেষ হয়ে যাবে। এ কাজে ব্যয় হবে ১,০৩,৯০০ টাকা।

৩। অমঘুরি থেকে রামশাহী পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ

জলঢাকা নদীর দক্ষিণ তীরে অমঘুরি থেকে রামশাহী পর্যন্ত বাঁধ তৈরি করার জন্য ব্যয়বরাদ্দ

করা হয়েছে ২,৪০,০০০ টাকা। পরিকল্পনাটি রূপায়িত হ'লে জলপাইগুড়ি জেলার পল্লী-অঞ্চলের ১৫ বর্গমাইল স্থান জলঢাকা নদীর প্লাবন থেকে রক্ষা পাবে। ১৯৫৭-৫৮ সালের শীতকালে কাজটি আরম্ভ করা হবে। ১৯৫৮ সালের বর্ষা আরম্ভ হবার আগেই তা শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

৪। লিস নদীর বাম তীর রক্ষা

গত কয়েক বছর ধরে লিস নদী তার বাম তীরকে দ্রুত ভেঙে চলেছে। নদীটির বাম তীরে অবস্থিত বাগরকোট শহরটি একটি প্রসিদ্ধ শিল্পাঞ্চল। নদীর এই ধ্বংসলীলায় শহরটি লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। সুতরাং ক্ষয়প্রাপ্ত তীরের দিকে জলধারার গতিবেগ রুদ্ধ করে দেবার জন্য চৌকো পাথরের খন্ড নদীর বাম দিকে ফেলা হয়েছে। ১৯৫৭ সালে বর্ষা নামবার আগেই কাজটি সুদৃষ্টভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই পরিকল্পনায় মোট ব্যয় হয়েছে ৩৯,২৫০ টাকা।

৫। দিয়ানা নদীর বাম তীর রক্ষা

কলাবাড়ি ও তথাকার চা-বাগানের কাছে দিয়ানা নদীর জল পাড় ছাপিয়ে উঠত, আর এতে ক্ষতিও হ'ত খুব। ১৯৫২ সালে ঝুমুর নদীর মধ্য দিয়ে দিয়ানা নদীর সঙ্গে রঞ্জিতি নদীর যোগ করে একটি খাল কাটা হয়। ফলে দিয়ানা নদীর নতুন পথ তৈরি হয়েছে। বর্তমানে নদীটির সামান্য জলই আগেকার খাতে প্রবাহিত হয়। কিন্তু নতুন খাতটি ক্ষতি করছে। তাই নদীটি যাতে তার পূর্বগতি ফিরে পায়, তার চেষ্টা করা হচ্ছে। দিয়ানা নদীর বাঁ দিকে তিন মাইল লম্বা বাঁধ দেওয়া হচ্ছে, এটি নতুন খাতের উপর দিয়ে যাবে। কাজটি প্রায় শেষ হয়ে গেছে আর ১৯৫৭ সালে দিয়ানা নদীর জলপ্লাবনকে রক্ষা করতেও সক্ষম হয়েছে। এর ফলে, ধূপগুড়ির প্রায় ৬০ বর্গমাইল স্থান বন্যার ক্ষতি থেকে রক্ষা পেয়েছে। ১৯৫৮ সালে বন্যা নামবার আগেই কাজটি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে

আশা করা যায়। এই পরিকল্পনা রূপায়ণে মোট ব্যয় হবে ১৮,০৩,০০০ টাকা।

৬। দিয়ানার উপছে-ওঠা জলের খাত বন্ধ করা

দিয়ানা নদীর উপছে-ওঠা জল যাতে তার ছোট খাত, সংকীর্ণ তীর, আর রেলপথ দিয়ে বইতে না পারে সেজন্যই এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই খাত বাড়তে দেওয়া হবে না, আর নদীর গতিপথের পরিবর্তনও বন্ধ করতে হবে। নদীর তীর সর্বত্রই নিচু নয়, সুতরাং একটানা বাঁধ নির্মাণ না করেও অসুবিধা দূর করা যাবে। রেলপুল থেকে প্রথম চার মাইল খোলা জায়গা পাথরের খন্ড দিয়ে বেঁধে দেওয়া হবে। নদীর তীর থেকে দূরে প্রায় ৮০০ থেকে ১,৬০০ ফুট উঁচু একটা জায়গা ঘিরে বাঁধ দেবার কথা হচ্ছে। এ পরিকল্পনার রূপায়ণে ব্যয় হবে ১,১২,০০০ টাকা।

বন্যানিয়ন্ত্রণের শেষব কাজ ইতিমধ্যে

শেষ হয়েছে

১। জলপাইগুড়ি শহর রক্ষা

জলপাইগুড়ি শহর তিস্তা নদীর ডান দিকে অবস্থিত। শহরটি যখন গড়ে উঠেছিল, সে সময়ে নদীর গতি শহর থেকে অনেকটা দূরে ছিল; কিন্তু নদীর ভাঙনের ফলে এখন শহরের পাশ দিয়ে নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে, আর শহরের পাশেই নদীর ভাঙন শুরুর হতে চলেছে। বন্যার সময়ে প্রতি বছর তিস্তা নদী ফেঁপে উঠলে শহর জলে ডুবে যেত। বন্যার শহরের লোকের দারুণ দুরবস্থা হ'ত; স্কুল-কলেজ, আদালত, সব বন্ধ রাখতে হ'ত। হাসপাতালেও জল উঠত। তাই দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত।

শহরটি রক্ষা করবার জন্য ১২ মাইল লম্বা একটি বাঁধ তৈরি হয়েছে। বাঁধটির তিন মাইল স্থান পাথরের চাঙ্গড় ইত্যাদি দিয়ে তৈরি আর বাকি ৯ মাইল মাটির তৈরি।

পরিকল্পনাটিকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে; প্রথম ভাগটি সমাপ্তির পথে, দ্বিতীয়টির চূড়ান্ত পরীক্ষা কিছুদিনের মধ্যেই হবে। এই পরিকল্পনার কাজে খরচ হবে ৬৬-৪০ লক্ষ টাকা।

২। শিলিগুড়ি শহর রক্ষা

১৯৫০ সাল থেকে মহানন্দা নদীর তীরে শিলিগুড়ি শহরের কয়েকটি প্রধান স্থানের ক্ষতি হচ্ছিল। এই ক্ষয় বন্ধ না করলে শহরটিই ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়; রাষ্ট্রীয় সড়কের নিচে রাস্তার সেতু আর রেলওয়ে সেতু নষ্ট হয়ে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দিতে পারে। অতএব এখানে রক্ষাকার্য আরম্ভ হয়।

প্রধানত ৩,০০০ ফুট পাড় রক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। ঢালুতে প্রস্তরখণ্ড সাজিয়ে আচ্ছাদন দিয়ে, ১৭টি ছোট কাঁটা বিম্ব করে এবং এমনি নানাভাবে তীর রক্ষার কাজ চলেছিল। কাজটি সুদৃঢ়ভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং শহরটিরও নিরাপত্তা পুনরায় ফিরে এসেছে। এ কাজ আগেই সম্পন্ন হয়েছিল বলে ১৯৫৫ সালের প্রবল বন্যা কোন ক্ষতি করতে পারে নি। এতে খরচ পড়েছে ৯-০৬ লক্ষ টাকা।

৩। কোচবিহার শহর রক্ষা

দশ বর্গমাইল স্থান জুড়ে সুন্দর কোচবিহার শহরটি তোরসা নদীর বাঁ দিকে অবস্থিত। জলপাইগুড়ি শহরের মতই বন্যার সময় এই শহরটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৫৪ সালের বন্যায় অনেক বাড়ি নষ্ট হয়েছিল। শহরটিকে রক্ষার জন্য তোরসা নদীর ধারে ৭ মাইল লম্বা একটি বাঁধ দিয়ে শহরটি ঘিরে দেওয়া হয়েছে, জনবহুল তিন মাইল এলাকা প্রস্তরখণ্ড, আচ্ছাদন ইত্যাদির দ্বারা রক্ষা করা হয়েছে। আনন্দের বিষয়, বাঁধ-নির্মাণের কাজ ভাল হয়েছে, তাই এর পর বন্যা আর শহরের ক্ষতি করতে পারে নি। জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থার জন্য জল যাওয়া-আসা নিয়ন্ত্রণের কবার্টকল তৈরি করা হয়েছে। গত দু'বছর এগুলির কাজও বেশ

ভাল ভাবে চলছে। এ কাজে ব্যয় হয়েছে ৬৩-৭৪ লক্ষ টাকা।

৪। আলিগুড়দুয়ার শহর রক্ষা

এই শহরটির রক্ষাকার্যকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—একটি রেলরাস্তার পুলের উপরের কাজ, আর একটি তার নিচের দিকের কাজ। এ শহর জলমগ্ন হয়ে বড় বড় বাড়ি আর প্রধান প্রধান রাস্তারও ক্ষতি হ'ত। সুতরাং বন্যার হাত থেকে রক্ষা আর ভূমিক্ষয় বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়। সাড়ে তিন মাইল লম্বা বাঁধ তৈরির কাজ শেষ হয়েছে এবং তাতে আশানুরূপ ফলও পাওয়া গেছে। এ কাজে খরচ হয়েছে ১৮-৭৪ লক্ষ টাকা।

৫। তুফানগঞ্জ শহর রক্ষা

কোচবিহার জেলায় তুফানগঞ্জ একটি মহকুমা শহর, এটি রায়ডক নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। নদীটি সহজেই শহরের ক্ষতি করতে পারে। নদীর পাড়টি ঠিকভাবে ঢালু করে কাটা হয়েছে, এবং প্রস্তরখণ্ড আর আচ্ছাদন দিয়ে রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৫০০ ফুট স্থান জুড়ে এই কাজ হয়েছে। এই কাজটির ফলে, দু'টি বন্যা নেমেও শহরের কোন ক্ষতি করতে পারে নি। খরচ পড়েছে এতে ৯-৮৮ লক্ষ টাকা।

৬। শক্তিগড় উন্মাস্তু কলোনী ও রাজ্যসড়ক

শক্তিগড় উন্মাস্তু কলোনীর কাছে মহানন্দা নদীর বাঁ পাশে ক্ষয় আরম্ভ হয়েছে, এর ফলে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির মাঝখানের রাজ্যসড়ক বিপর্যস্ত হতে পারে। উন্নয়ন (রাস্তা) অধিকার গত বছর রক্ষাকার্য আরম্ভ করেছিলেন; কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কাজ তেমন অগ্রসর হয় নি, তাই বর্তমান ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রায় ২,০০০ ফুট স্থান জুড়ে কাজটি চলছে। ঢালু জমিতে প্রস্তরখণ্ড সাজিয়ে বসানো হচ্ছে। কাজটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

৭। মাটিগড়া ও ফাঁসিদেওয়া রক্ষা

ভারত-পাকিস্তানের সীমানায় অবস্থিত মাটিগড়া সরকারী রেশমশিল্প-কেন্দ্র আর ফাঁসিদেওয়া গ্রামের রক্ষাকার্য ব্যবস্থা শক্তিগড় কলোনী রক্ষা-ব্যবস্থার মত। এ কাজটিও শেষ হয়েছে।

৮। জলঢাকা রক্ষা

পূর্ত ও গৃহনির্মাণ বিভাগ জলঢাকা নদীর জলোচ্ছ্বাস রোধ করার জন্য দক্ষিণ দিকে একটি বাঁধ নির্মাণ করেছেন, এটির নাম হয়েছে ধারাইকুড়ি বাঁধ। কিন্তু বার বার বন্যা হবার ফলে বাঁধটির ৩,৮০০ ফুট স্থান ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—সুতরাং নিকটবর্তী অঞ্চল বিপদের সম্মুখীন হয়; এমনকি, প্রাণহানিরও সংবাদ পাওয়া যায়। তাই এই ধারাইকুড়ি বাঁধের বদলে এখন একটি নতুন বাঁধ নদীতীর থেকে আধ মাইল দূরে তৈরি হয়েছে। বাঁধটি মোটামুটিভাবে মাটির তৈরি এবং প্রায় ২,০০০ ফুট স্থান রক্ষা করবে। এই স্থানটিতেই জলের আঘাত বেশি হয়। বাঁধটি ৬ মাইল লম্বা হবে এবং জলঢাকা নদীর জলোচ্ছ্বাস থেকে প্রায় ৪০ বর্গমাইল স্থানকে রক্ষা করবে। এটি ৩১ নং জাতীয় সড়ককেও রক্ষা করতে পারবে। কাজটি শেষ হয়েছে, আর ১৯৫৭ সালের প্রবল বন্যার

সময় এই বাঁধ জলঢাকা নদী থেকে ৪০ বর্গমাইল স্থানকে রক্ষা করেছিল। এ কাজে ব্যয় হয়েছে ৯.৬৪ লক্ষ টাকা।

৯। চেল নদীর তীর

চেল নদীর তীরে আছে নিম্নভূমি। চেল ও গিস নদীর মাঝখানের স্থান সমেত পাথরঝোরা, মানাবাড়ি চা-বাগান এবং ওদলবাড়ি শহর-অঞ্চলকে জলপ্লাবিত করে চেল নদী গিস নদীতে পড়ছে। উত্তরাঞ্চলের সকল স্থান বন্যার সময়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই জলোচ্ছ্বাসিত খাতটি বিচ্ছিন্ন না করে দিলে চেল নদী গিস নদীতে পড়বার সময়ে রেল-পুলের উপর দিয়ে চলে যেতে পারে। সুতরাং এই খাতটি কেটে দেবার পরিকল্পনা হয়েছে। তিন মাইল লম্বা একটি বাঁধ দেওয়া হয়েছে। ১৯৫৬ সালের বর্ষা নামবার আগেই কাজটি শেষ হয়েছে। ১৯৫৭ সালের বর্ষার সময়ে চেল নদী গিস নদীর সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য বাঁধটি ভেঙে দেবার উপক্রম করেছিল—কিন্তু বাঁধ ভাঙে নি। এর ফলে সমস্ত স্থানটি ও চা-বাগানগুলিই শুধু রক্ষা পায় নি, গিস নদীর উপরে রেলসেতুটি এবং ৩১ নং জাতীয় সড়কও রক্ষা পেয়েছে। ব্যয় হয়েছে এ কাজে ৯.৮৭ লক্ষ টাকা।



টুকিটাকি

ইক্ষুচাষের জন্য ময়ূরাক্ষীর জল

ময়ূরাক্ষী-অঞ্চলে ইক্ষুচাষে উৎসাহ সৃষ্ণারের উদ্দেশ্যে আগামী ইক্ষুচাষের মরসুমে একর-প্রতি ৯ টাকা হারে জলসেচনের সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। ১৯৫৮ সালের ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত ময়ূরাক্ষী খাল থেকে জলসরবরাহের এই সুবিধা দেওয়া হবে।

কৃষকরা অবশ্য ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে উক্ত অঞ্চলে খালের জলে যেসব পুকুর ভরা হয়েছে সেগুলি থেকে ১৫ই এপ্রিলের (১৯৫৮) পরেও ইক্ষুচাষের জন্য সেচের জল পেতে পারেন। রবিশস্যের মরসুমের মত যেসব কৃষক এই সুবিধা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাঁদের একটি 'বন্ড' লিখে দিতে হবে।

রাজ্য খাদি ও গ্রামশিল্প পর্ষদ

কুটিরাশিল্প ও ক্ষুদ্রাশিল্প বিভাগের মন্ত্রীকে সভাপতি (পদাধিকারবলে) এবং উক্ত বিভাগের উপ-মন্ত্রীকে সহকারী সভাপতি (পদাধিকারবলে) করে রাজ্য খাদি ও গ্রামশিল্প পর্ষদের পুনর্গঠন করা হয়েছে। এই পর্ষদের অন্যান্য সভাগণ হলেন—পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-অধিকর্তা; কুটিরাশিল্প ও ক্ষুদ্রাশিল্প বিভাগের সচিব; অভয় আশ্রমের একজন প্রতিনিধি; শ্রীনিবেশের একজন প্রতিনিধি; শ্রীযুক্তা অশোকা গুপ্তা; শ্রীমতী প্রতিমা বসু; শ্রী এ জি মুনসীফ; শ্রীপদ্মনান বসু; ডাঃ দীনেশ-চন্দ্র তপাদার; শ্রী এ পি চৌধুরী, এম এল সি; শ্রী বি সি রায়; শ্রী এল এম বর্মণ; শ্রী বি সি বসু; শ্রী এন সি চট্টোপাধ্যায় এবং ডাঃ এন সি পাল।

পর্ষদের কাজ হবে কুটিরাশিল্প ও গ্রামশিল্প সংক্রান্ত পরিকল্পনাদি পরীক্ষা করা ও সে-সম্বন্ধে পরামর্শদান এবং নতুন কোন পরিকল্পনা থাকলে তা সরকারের বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা, এসব শিল্পের উন্নয়নের যৌথ কার্যসূচি সম্পর্কে সরকারকে সাহায্য করা এবং খাদি ও গ্রামশিল্পজাত জিনিস বাজারে বিক্রির জন্য পরিকল্পনা কার্যকরী করার ও সেই-সম্পর্কিত সমস্যাগুলি বিবেচনার জন্য

সরকারকে পরামর্শদান প্রভৃতি। উক্ত পর্ষদ ভারত-সরকার-স্থাপিত নিখিল ভারত খাদি ও গ্রামশিল্প কমিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ ইট-বোর্ড

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার গৃহনির্মাণ ও অন্যান্য পরি-কল্পনায় সরবরাহের উদ্দেশ্যে এবং ইটনির্মাণ এবং গাংখনি-শিল্পে শিক্ষিত বেকার যুবকদের শিক্ষণের সুবিধার জন্য ইট ও টালি তৈয়ারির পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য একটি ইট-বোর্ড গঠন করেছেন।

শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বার-অ্যাট-ল, এই বোর্ডের সভাপতি এবং সদস্যগণ হলেন—উন্নয়ন-মহাধ্যক্ষ শ্রীহরিশম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, আই সি এস, শ্রী কে কে রায়, শ্রী টি মিত্র, আই এস ই (অবসর-প্রাপ্ত), লেঃ-কর্নেল এস কে কাজীলাল এবং শ্রী এস এন চক্রবর্তী।

আদিবাসী-কল্যাণে শস্যগোলা

জন্য অনুদান

তফসিলী আদিবাসীদের কল্যাণের জন্য কেন্দ্র-প্রবর্তিত পরিকল্পনা অনুসারে চলতি আর্থিক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের আদিবাসী-কল্যাণ বিভাগ রায়গঞ্জ সমবায় ধর্মগোলা লিমিটেডের পরিচালনায় পশ্চিম দিনাজপুরে একটি শস্যগোলা স্থাপন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রারের হাতে ১০,২৫০ টাকা প্রদান মঞ্জুর করেছেন।

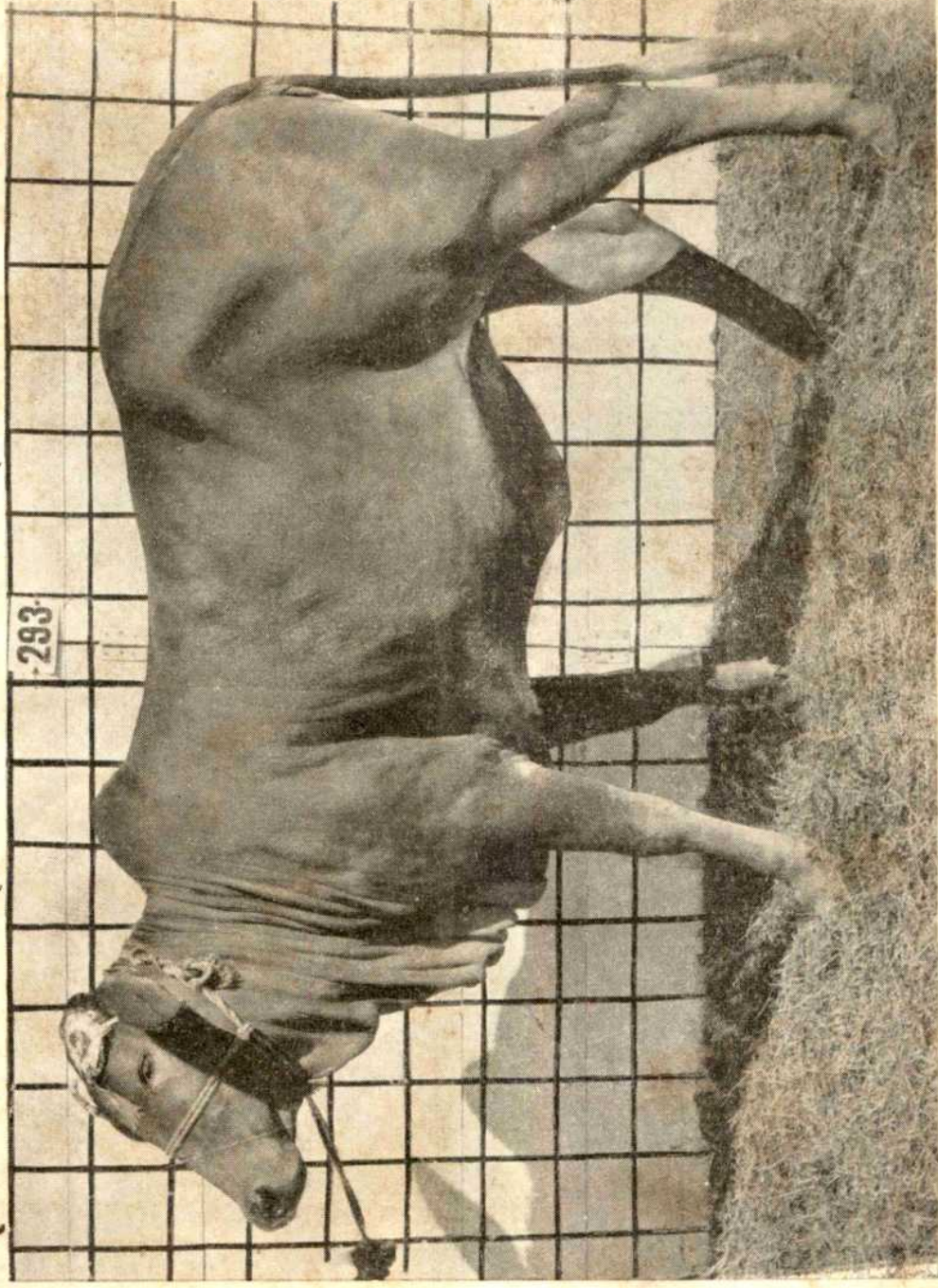
চলতি আর্থিক বৎসরেই মালদহ জেলায় চিরকুটি আদিবাসী সমবায় ধর্মগোলা লিমিটেডের পরি-চালনায় ১০,২৫০ টাকা মোট খরচে একটি শস্য-গোলা স্থাপন এবং মালদহের মোরগ্রাম অনুন্নত উপজাতি সম্প্রদায়ের সমবায় ধর্মগোলায় রক্ষণা-বেক্ষণ-সাহায্য দেওয়ার জন্য ৯১০ টাকা প্রদান মঞ্জুর করেছেন। তফসিলী আদিবাসীদের কল্যাণের এই পরিকল্পনায় মঞ্জুরকৃত অর্থও পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রারের হাতে দেওয়া হয়েছে।

সম্পাদক : শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মাহুদ, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা।

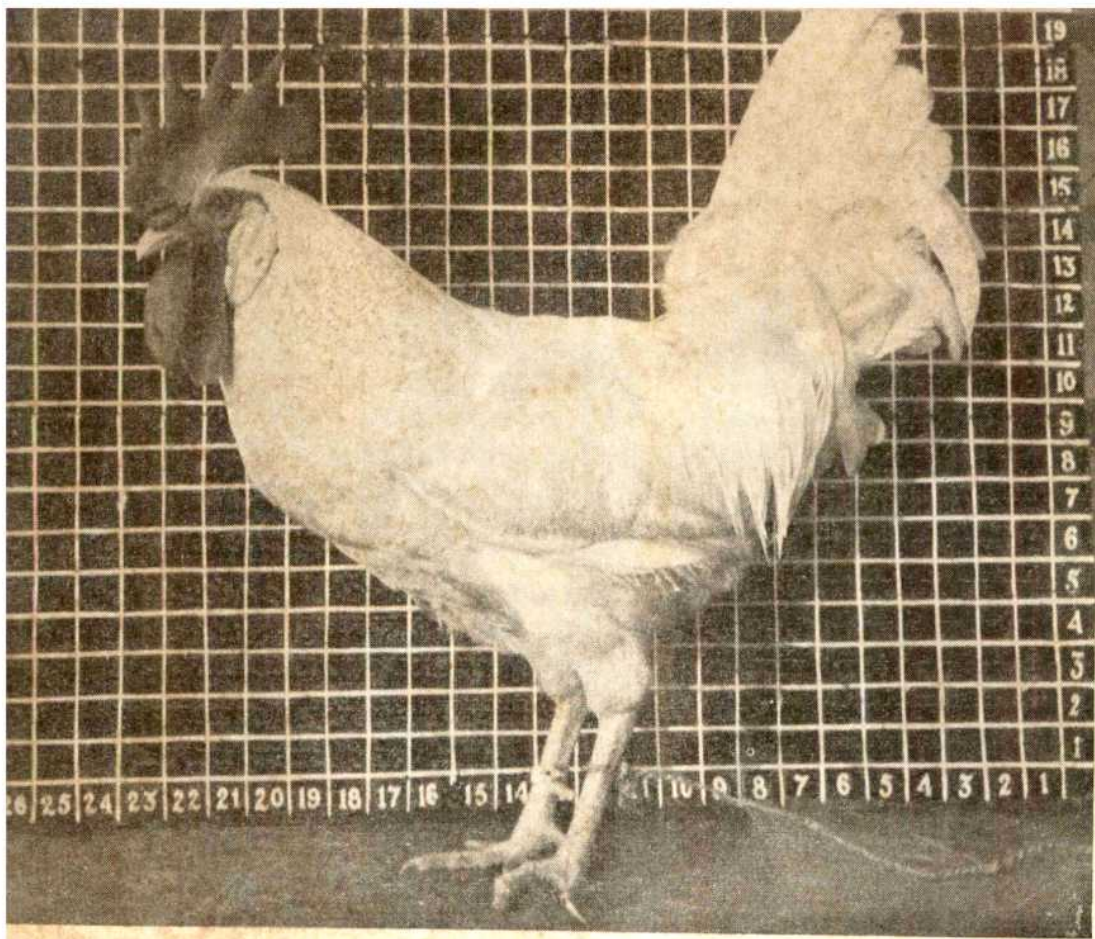
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মন্ত্রণে অধীক্ষক

শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মঞ্জুরিত।

বঙ্গবন্ধা : পৌষ : ১৩৬৪



সাহিত্যিক জাতের হাঁড়ের প্রজননে জাত 'সাবিত্রী' পূর্ববঙ্গীয় পশুপ্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। এর মালিক ভগলি হেনার
শংকরপুর গ্রামের ক্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



হরিণঘাটা কেন্দ্রে আদর্শ
স্থানীয় একটি 'হোয়াইট'
লেগহর্ন' মুরগি

বন্ধুত্ব

১০ম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

পৌষ : ১৩৬৪

প্রসঙ্গ

নিখিল ভারত পশুপ্রদর্শন সমিতির উদ্যোগে কলিকাতার উপকণ্ঠে পাতিপুকুরের প্রেস্টন কলোনিতে ২৪এ থেকে ২৯এ নবেম্বর (১৯৫৭) পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলীয় গবাদি পশুর ও হাঁসমুরগির এক বিরাট প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ত্রিপুরা থেকে গোরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া ও হাঁসমুরগি মিলিয়ে মোট ৭৭২টি পালিত-পশুপাখি এই প্রদর্শনীতে সমবেত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের এবং পালিত-পশুপাখির এত বড় প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান এই প্রথম।

২৪এ নবেম্বর সকালে পাতিয়ালা মহারাজা যাদবেন্দ্র সিং মহেন্দ্র বাহাদুর এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন-ভাষণে তিনি দৃষ্টি করে বলেন যে, আমরা মূখে বলি 'গো-মাতা', কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এ কথার কোন সংগতি খুঁজে পাওয়া যায় না। তা যদি পাওয়া যেত তবে কলিকাতার মত এত বড় শহরে রাস্তায় রাস্তায় কেন গোরু ঘুরে বেড়ায়? তাদের দেখাশোনা করার লোকের অভাবেই যে এটা হয়ে থাকে, তাতে সন্দেহ নেই।

দেশের সমৃদ্ধি যে শেষ পর্যন্ত কৃষকশ্রেণীর দৃষ্টি-ভাঙ্গা ও কর্মশক্তির উপর নির্ভর করে তার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, কৃষকদের যেসব সমস্যা রয়েছে, সেসবের সমাধানের শক্তি তাঁদের নিজেদেরই অর্জন করতে হবে। এসব পশুপাখির লালনপালন তাঁদের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে আধুনিক

যে জ্ঞানকে মানুষ কাজে লাগিয়েছে, এ রকম প্রদর্শনীতে কৃষকেরা তা শিখে নিতে পারেন। প্রতিবেশী কৃষক কীভাবে পশুপালন করে কতখানি সফল পেয়েছেন, তা দেখে অন্য কৃষকদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার ভাব জাগে—উন্নতির জন্য সেই প্রতিযোগিতা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই প্রতিযোগিতার ভাব প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে জেলায় জেলায় এ ধরনের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার জন্য মহারাজা বাহাদুর এর উদ্যোক্তাদের কাছে প্রস্তাব করেন।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও পশুপালন বিভাগের মন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ উক্ত উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দেশের গোসম্পদ-উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে বলেন যে, পালিত-পশুসম্পদের উন্নয়নের জন্য নানা দিক থেকে এ ধরনের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যিক; পশুপক্ষী-পালনের উন্নত পদ্ধতি সম্বন্ধে এ রকম প্রদর্শনীতে অনেক কিছু জানবার ও শিখবার আছে। তিনি বলেন যে, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রাজ্য থেকে এই প্রদর্শনীতে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গিয়েছে এবং এই প্রদর্শনী হয়েছে প্রতিনিধিমূলক।

শেষ দিনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে কৃষি-পশুপালন-মন্ত্রী প্রদর্শনীতে আনীত সর্বোৎকৃষ্ট পশুপক্ষী-গুলির মালিকদের পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রায় ৩০০ জন পুরস্কার পেয়েছেন। 'ট্রফি' ও 'কাপ' ছাড়াও নগদ মোট প্রায় ১৫ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। ঘরোয়া ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা পশুপক্ষী

পালন করেন এরকম মালিকদেরই শূদ্ধ নগদ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

উক্ত প্রদর্শনীতে যে লাল সিন্ধী ঘাড়টি সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছে, সেটি এসেছে উড়িষ্যা রাজ্যের পশুপালন-বিভাগ থেকে; উক্ত বিভাগ এই ঘাড়টির জন্য “রিফ আহমেদ কিদোয়াই স্মারক প্রতিযোগিতা কাপ” পুরস্কার পেয়েছেন। ঘাড়টির যে দেখা-শোনা করে তাকে কারুখচিত একটি পাগড়ি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

একটি খোলা মণ্ডপে পুরস্কার-বিতরণী সভার অনুষ্ঠান হয়। প্রথমপুরস্কার-বিজয়ী সমস্ত পশুকে উপস্থিত জনমণ্ডলীর সামনে দিয়ে সার-বন্দী করে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

সবচেয়ে বেশি পুরস্কার পায় আমাদের হরিণঘাটা-প্রতিষ্ঠান। সেখান থেকে ‘মুরা’, ‘হরিয়ানা’ ও ‘থারপার্কার’ জাতের মোট ৩৫টি পশু এই প্রদর্শনীতে আনা হয়। তার ২০টিই পুরস্কার পেয়েছে। তার মধ্যে ৮টি প্রথম, ৯টি দ্বিতীয় এবং ৩টি তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে। দেখতে সবচেয়ে সুন্দর ছিল হরিণঘাটার একটি ‘মুরা’ জাতের বলিষ্ঠ ঘাড়। তাকে প্রাদেশিক পশুক্রেম-নিবারণী সমিতির একটি প্রতিযোগিতা-কাপ পুরস্কার দেওয়া হয়। এ পুরস্কারের বিজয়ী নির্বাচনে খুব কড়াকড়ি হয়েছিল।

বিহার রাজ্যের পশুপালন-বিভাগ শ্রেষ্ঠ থারপার্কার ঘাড়ের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন। পশু আর পাখি দুই শাখাতেই তারা পুরস্কার পেয়েছেন।

বিশিষ্ট পুরস্কার-বিজয়ীদের মধ্যে দার্জিলিঙের গ্রীনাম্বে ভুটিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। ‘সিরি’ জাতের গোরুগুলির মধ্যে তাঁর একটি গোরু শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয় এবং তিনি মোট ২২৫ টাকা পুরস্কার পান। ‘সিরি’ই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র উন্নত জাতের গোরু।

হরিণঘাটা দূষণপঞ্জীর শ্রীসুদর্জিৎ সিংএর একটি মহিষ সবচেয়ে বেশি দুধ দেওয়ার জন্য ২০০ টাকা

পুরস্কার পেয়েছে। এই মহিষটি দিনে প্রায় ১৮ সের (৩৬ পাউন্ড) দুধ দেয়।

বিভিন্ন জাতের শ্রেষ্ঠ গোরুর জন্য কয়েকজন মালিক ২২৫ টাকা করে পুরস্কার পেয়েছেন। মেহনতী গোরুর প্রতিযোগিতায় মুর্শিদাবাদের গ্রীনিয়ামুদ্দিন সেখের গোরু সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে ২০০ টাকা পুরস্কার পেয়েছে।

‘সাহিওয়াল’ জাতের গোরুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে হুগলি জেলার শংকরপুর গ্রামের শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্ত জাতের একটি ২১ মাস বয়সের বকনা-বাছুর। এর জন্য শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৫ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। এ জাতের গাভী দুধ দেয় বেশি। হরিয়ানা জাতের গোরু কিন্তু দুধও বেশি দেয় আর মেহনতী কাজেও খুব ভাল হয়।

সাহিওয়াল জাতের সর্বোৎকৃষ্ট গাভীর জন্য ৭৫ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন হুগলি জেলার বনাজুঙ্গি গ্রামের শ্রীমুকুন্দ ঘোষ। সর্বোৎকৃষ্ট হরিয়ানা ঘাড়ের জন্য নীলগঞ্জ বাজারের শ্রী পি এস গুপ্ত ১৫০ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন।

হুগলি জেলার শ্রীবিশ্ব কোলের একটি ‘রোড আইল্যান্ড রেড’ জাতের মুরগি প্রদর্শনীর সমস্ত মুরগির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে ৭৫ টাকা পুরস্কার পেয়েছে।

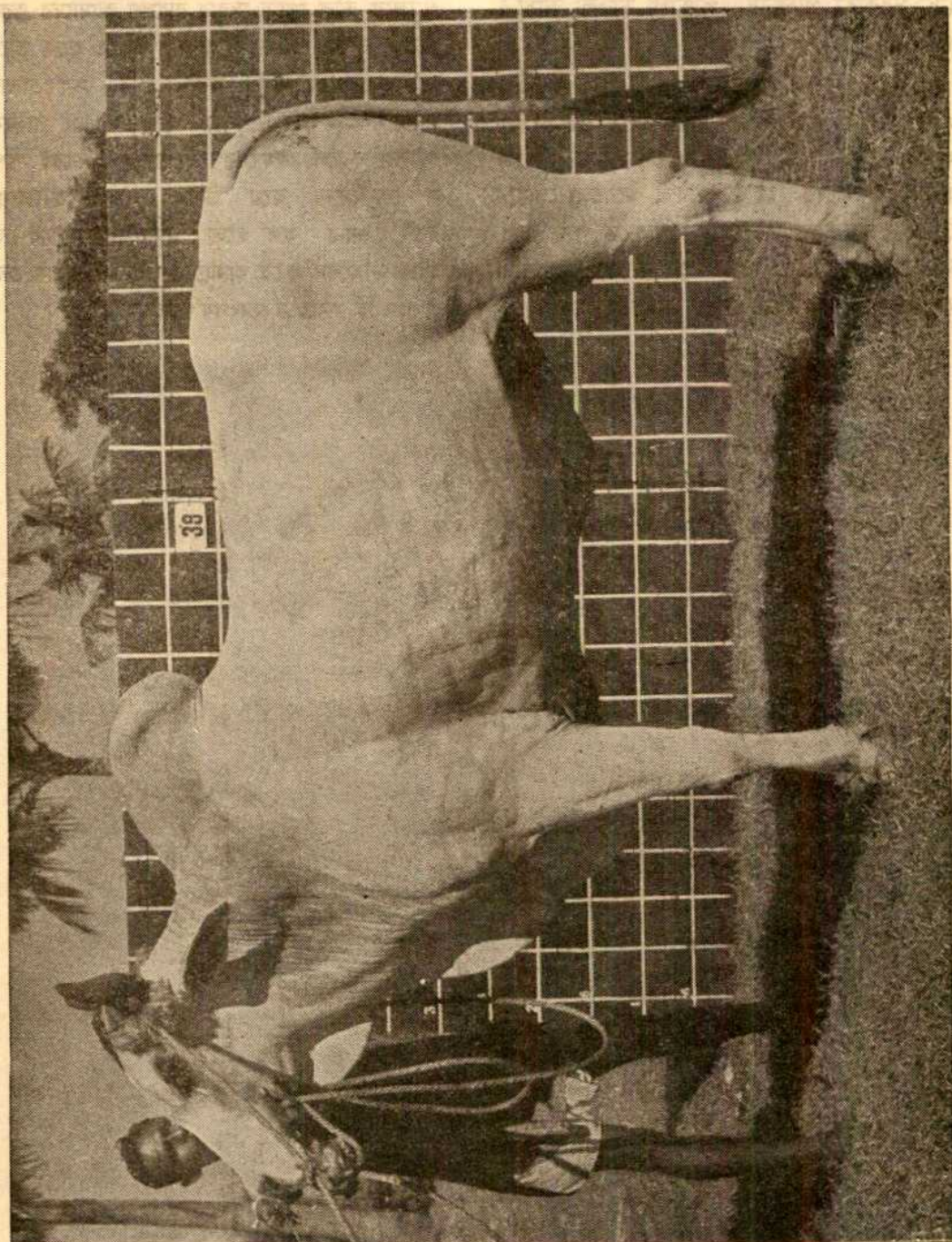
এই যে পশুপ্রদর্শনী এবং তাতে পুরস্কার পাওয়ার সংবাদ, এ শূদ্ধই বিবরণী এবং তালিকা নয়; কেননা, এর মধ্যে রয়েছে আমাদের পশুপালনে উন্নয়নপ্রচেষ্টার উজ্জ্বল একটা পরিচয়। পশুপালনে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। অথচ উন্নত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পশুপালন করলে আমরা যে এ বিষয়ে কত উন্নতি করতে পারি, তারই পরিচয় পাওয়া গেছে এ প্রদর্শনীতে। পশুপালনের উন্নয়নের জন্য আমাদের রাজ্যসরকার কী করেছেন এবং করছেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রবন্ধান্তরে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু

জনসাধারণও সচেতন এবং সচেত হইলে শস্য সরকারী প্রচেষ্টায় পূর্ণাঙ্গ সাফল্য আসতে পারে না।

গো-উন্নয়নের জন্য সবার আগে যা করা দরকার সেটি হচ্ছে দেশী যা-তা ষাঁড় দিয়ে প্রজনন না করানো। এই বিষয়টির উপরে কড়া নজর রাখতে পারলেই আমাদের ছোট দুর্বল অকেজো গোরু-গুলির স্থান উন্নত জাতের গোরুতে পূর্ণ হয়ে উঠবে। তার পরের কথা হচ্ছে গোরুর খাদ্য। আমাদের খাদ্য ফসলের চাষের জমিতেই পর্যায়ক্রমে

পালিতপশুর খাদ্য ফসলেরও চাষ লাগিয়ে, পশু-গুলিকে ভাল খেতে দেবার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। তাদের বাসের সুব্যবস্থা করতে হবে, তাদের রোগদমনের ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বতোভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পশুর প্রজনন এবং পালনের ব্যবস্থা করলে আমাদের এ রাজ্য অচিরেই পশু-সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। গৃহপশুর উন্নয়নে ব্রতী হওয়ার অর্থ হচ্ছে মানুষের কল্যাণে ব্রতী হওয়া—বিশেষ করে আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশে এ কথাটি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ।





ভাগল জেলার কাপ্তাই গ্রামের শ্রীমুকন্দ ঘোষের এই ইরিয়ানা জাতের হাঁড়টি পূর্বাঞ্চলীয় পশুপ্রদর্শনীতে প্রথম পুষ্কার পেয়েছে

পশ্চিমবঙ্গে পালিত পশুপক্ষীর উন্নয়ন

দেশ স্বাধীন হবার পরে 'পশ্চিমবঙ্গ' নামে এই পশ্চিম রাজ্যের উদ্ভব হল প্রায় ২৯,৩৭০ বর্গমাইল ভূমি আর ২.৩৪ কোটি অধিবাসী নিয়ে। পূর্ন-গঠনের পরে এখন এ রাজ্যের আয়তন দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৪,২১০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা অনুমান প্রায় ৩ কোটি। এ ছাড়া রয়েছে প্রায় ১.১০ কোটি গোরু-মোষ আর ৪৩:৩০ লক্ষ ছাগল-ভেড়া। বিহারের যে অংশ পশ্চিমবঙ্গে যুক্ত হয়েছে তা বাদ দিয়ে, এ রাজ্যে ফসলী জমি রয়েছে ১;১৯ লক্ষ একর এবং তাতে ক'রে গড়ে জনপিছু ফসলী জমি দাঁড়াচ্ছে ০:৪ একর। জনসংখ্যার এই চরম চাপে মার্থাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ অত্যন্ত কমে গেছে; কাজেই আমাদের কৃষিজীবীরা জমিতে শুধু খাদ্য-শস্য আর অত্যাবশ্যক কয়েক রকমের অর্থকর ফসল ছাড়া আর কিছুই চাষ করতে পারেন না। তার ফলে, পালিত পশুর যথাযোগ্য পরিচর্যা করা এবং পশুখাদ্যের চাষ করার কথা বাস্তবিক যেন এ রাজ্যের লোকে জানেই না। আমাদের গবাদির প্রধান খাদ্য হচ্ছে ধানের খড়—যা নাকি একটা উপ-পোষক খাদ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ রাজ্যের প্রধান পালিত-পশুপাখি হচ্ছে গোরু-মোষ, হাঁস-মুরগি আর ছাগল-ভেড়া। দার্জিলিং জেলার পাহাড়ী এলাকায় কোথাও কোথাও সিরি জাতের গোরু ছাড়া, দঃখের বিষয়, এ রাজ্যে আর কোন বিশিষ্ট জাতের গোরু দেখা যায় না। এ রাজ্যে যেসব গোরু-মোষ আছে, তার বেশির ভাগই খারাপ ধরনের, আকারে ছোট, দুর্বল আর অক্ষম। গোরু-গুলো দুধ দেয় খুবই কম; গড়ে প্রতিটি গোরু দিনে আধ সের থেকে এক সেরের বেশি দুধ দেয় না। এ রাজ্যে প্রতিদিন গড়ে প্রতিটি লোকে দুধ খেতে পায় মাত্র ২.৭ আউন্স। ভারতে আর কোন রাজ্যে লোকের ভাগ্যে এত কম দুধ জোটে না। আমাদের

মেহনতী পশুগৃহালিও খুব খারাপ ধরনের। এ রাজ্যের চলতি রীতি হচ্ছে, গাই যখন মাঠে চরে, তখন তার কাছাকাছি যে-বাড়ি পায়, তার কাছেই পাল খায়; সেই বাড়ি কী জাতের, কী ধরনের, ভাল কি মন্দ, তার কিছু ঠিক নেই। এভাবে যেমন-তেমন বাড়ির দ্বারা প্রজননের ফলে গোরুর সংখ্যা বাড়তে থাকে, সেই গোরু কতটা দুধ দেবে বা কতটা পরিশ্রম করতে পারবে, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। যথাযথ খাবার না পেয়ে এবং যেমন-তেমন বাড়ি দিয়ে প্রজননের ফলে এ রাজ্যের গোরুর অবস্থা খুব দুর্ভাগ্যবশত খারাপ হয়ে পড়েছে এবং মালিকেরাও এসব গোরুর যত্ন করার ব্যাপারে উদাসীন। বংশ বংশ ধরে এভাবে ভাল খেতে না পাওয়া, যেন-তেন-ভাবে প্রজনন আর মালিকের অনাদরের ফলে গোরু-গুলোর দুর্ভাবস্থা আজ অবর্ণনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ রাজ্যের গোরুর সংখ্যা কিন্তু ভারতের অন্যান্য বেশির ভাগ রাজ্যের গোসংখ্যার তুলনায় কিছুটা কম নয়, কিন্তু ক্ষমতার দিক দিয়ে এরা একেবারেই খারাপ। এ রাজ্যের এ অবস্থা কোনরকমেই সমর্থন-যোগ্য নয়। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি তা অতি জটিল। লোকের স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য যদি যথেষ্ট দুধ আমাদের পেতে হয়, ভালভাবে কৃষিকাজ করার জন্য যদি উপযুক্ত মেহনতী গোরু আমাদের পেতে হয়, তবে এ রাজ্যের কল্যাণকর্মে রতী সকলকেই এ সমস্যার সমাধানে অবিলম্বে মনোযোগ দিতে হবে।

গো-উন্নয়ন

এ রাজ্যের গো-উন্নয়নের কোন কর্মসূচি রচনা করতে হলে, অপরিহার্যভাবেই তার ভিত্তি হবে সুপরিদর্শিত উপায়ে গোরুর সংখ্যা কমিয়ে, তার স্থলে ক্রমশ উন্নত জাতের গোরুর প্রবর্তন করা এবং

যে জমিতে আমাদের খাদ্যশস্যের চাষ হয়, সেখানে পর্যালোচনায় পশুখাদ্য ফসলেরও চাষ করা।

বঙ্গবিভাগের পূর্বে তখনকার সরকার এখানে- সেখানে কয়েকটি উন্নত জাতের প্রজননবৃষ দিয়ে স্থানীয় গোরুর উন্নয়নের একটা বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারকে ১৯৪৭ সালে গো-উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবিক একেবারে নতুন করে কাজ শুরু করতে হয় এবং কৃষকদের প্রায় ৩০০ উন্নত জাতের প্রজননবৃষ দেওয়া হয়। সমগ্র সময়টা নিয়ে একেবারে নতুন করে বিবেচনা করতে হয় এবং এ রাজ্যের গোজাতের উন্নয়নের জন্য সু-পরিকল্পিত উপায়ে চেষ্টা চলতে থাকে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকালে এ বিষয়ে যেসব ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তার মধ্যে এগুলিও ছিলঃ—

- (১) বিভিন্ন গো-বহুল অঞ্চলে উন্নত জাতের প্রজননবৃষ বিতরণ করে তার সাহায্যে গবাদির জাতের উন্নয়ন করা,
- (২) নির্বাচিত এলাকায় কৃষিম প্রজননের ব্যবস্থা করে গবাদির জাতের উন্নয়ন করা, এবং

(৩) রাজ্যে পশুখাদ্য ফসলের চাষ চালু করা।

(১) প্রথমোক্ত পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন জেলায় ৪৭টি অঞ্চল নির্বাচন করে উন্নত জাতের বাঁড় বিতরণের কাজ শুরু হয়। এইসব সরকারী বাঁড়ের তত্ত্বাবধায়কদের প্রতি বাঁড়-পিছু প্রতি মাসে ১৫ টাকা করে দেওয়া স্থির হয়। এ রকম বাঁড়ের প্রজননে সজ্ঞাত উন্নত জাতের এক বছর বয়সের বকনা-বাছুরও কতকগুলো শর্তসাপেক্ষে এসব এলাকায় বিতরণ করা হয়। এসব এলাকার অকেজো বাঁড়গুলোকে সতর্কতার সঙ্গে সরিয়ে তার জায়গায় উন্নত জাতের বাঁড় সরবরাহ করা হয়।

(২) ভারত-সরকারের কেন্দ্রগ্রাম পরিকল্পনায় কৃষিম প্রজননরীতিতে গাভীর গর্ভসঞ্চার করা হয়। এই পরিকল্পনা চালু হবার ফলে আমাদের গো-

উন্নয়নের প্রচেষ্টা আরও ব্যাপকভাবে পরিচালিত করার সুযোগ হয়েছে।

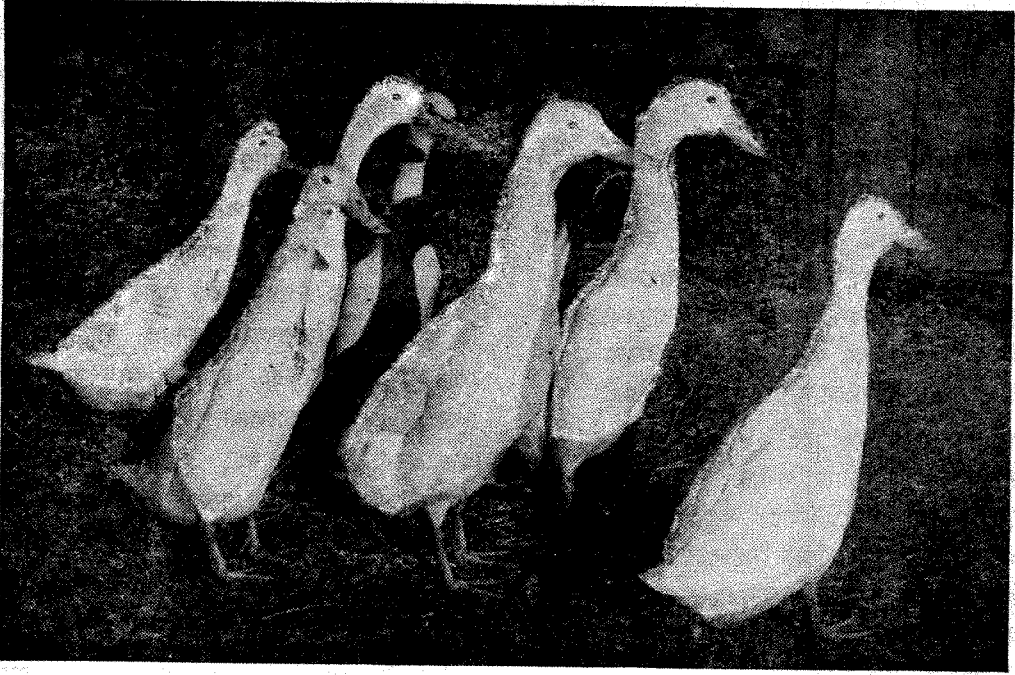
(৩) প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালের শেষ-দিকে পশুখাদ্য ফসলের চাষে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এসব ফসলের বীজ, মূল, কাটিং প্রভৃতি কৃষকদের সরবরাহ করার একটা পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা চালু করা হয়। যেসব এলাকায় গো-উন্নয়নের কাজ চলছে, গোড়ার দিকে শূদ্র সেসব জায়গাতেই এসমস্ত জিনিস সরবরাহ করা হত।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কালে যে প্রচেষ্টা হয়েছে, তাতে করে পল্লী-অঞ্চলে উন্নত জাতের প্রায় ১,২০০ বাঁড় দেওয়া হয়েছে; তার মধ্যে বেশির ভাগই হরিয়না জাতের। উক্ত সময়ের মধ্যে এ রাজ্যের পশুচিকিৎসা-কৃত্যক যে কাজ করেছে, তা ছাড়াও কৃষি-অধিকার পশ্চিমবঙ্গে কৃষিম প্রজননের ১০টি কেন্দ্র ও ৩৫টি উপকেন্দ্র স্থাপন করেছে।

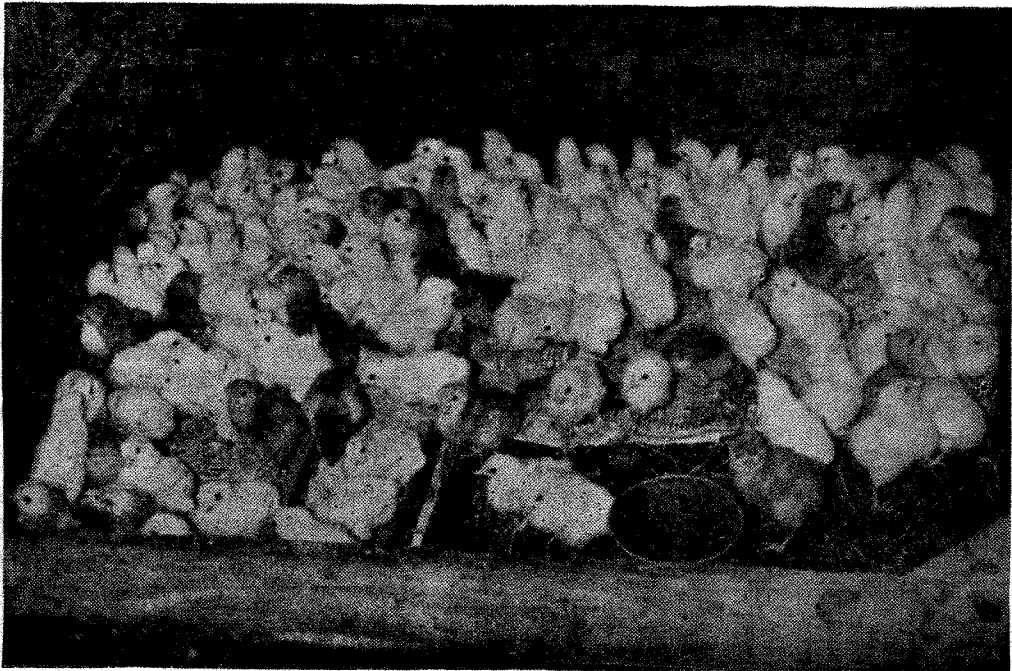
দার্জিলিং জেলার পাহাড়ী এলাকায় দার্জিলিং ও কার্শিয়ং মহকুমায় গো-উন্নয়নের উদ্দেশ্যে 'জাসী' বাঁড়ের দ্বারা সংকর প্রজননের পরিকল্পনা অনুসারে ভারতীয় কৃষিগবেষণ পরিষদের অনুদানের সাহায্যে দার্জিলিং শহরেও কাজ শুরু হয়েছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকালে পশু-খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ দানের পরিকল্পনা অনুসারে এ রাজ্যের কৃষকদের মধ্যে প্রায় ৫,০০০ মণ পশুখাদ্য ফসলের বীজ ও কাটিং প্রভৃতি বিতরণ করা হয়েছে।

আনন্দের বিষয়, এ রাজ্যে নির্বাচিত অঞ্চলগুলোর বেশির ভাগেই গো-উন্নয়নের কাজে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ প্রচেষ্টার ফলে উন্নত জাতের যেসব গাভী পাওয়া যাচ্ছে, তার প্রতিটি প্রতিদিন ৩ সের থেকে ১০ সের পর্যন্ত দুগ্ধ দিচ্ছে। এসব উন্নয়ন অঞ্চলে উন্নত জাতের যেসব বাঁড় জন্মাচ্ছে, মেহনতী গোরু হিসাবে তারা ভারতের অধিকাংশ রাজ্যের উন্নত জাতের মেহনতী গোরুর সমকক্ষ। সুষ্ঠু প্রচারণাকর্মের সহযোগে



পাঁচমবস-সবকাবের মেদিনীপুর পক্ষিপালন কেন্দ্রে 'হোয়াইট ক্যাম্পবেল' জাতীয় কয়েকটি হাঁস



মেদিনীপুর কেন্দ্রে মুরগির ছানা : এদের বয়স এক সপ্তাহ

যথাযোগ্য সরকারী সহায়তা বিনিয়োগে উন্নয়ন-অঞ্চলগুলোতে খাদ্য ফসল চাষের জমিতে পর্যায়ক্রমে পশুখাদ্য ফসলের চাষের প্রচেষ্টাও সার্থক করে তোলা সম্ভব হয়েছে।

রাজ্যসরকার ইতিমধ্যে পালিতপশু-উন্নয়ন আইন বিধিবদ্ধ করেছেন; সেই সংক্রান্ত নিয়মাবলী এখন চূড়ান্ত রূপ লাভ করতে চলেছে। কথা হয়েছে যে, সেই কাজ সম্পূর্ণ হলেই গো-উন্নয়নের অঞ্চল-গুলোতে এবং কেন্দ্রগ্রামের এলাকাগুলোতে এই আইন ক্রমশ বলবৎ করে সেসব জায়গা থেকে অব্যাহত যাঁড়গুলোকে সরিয়ে দেওয়া হবে।

পশুপালন-উন্নয়নকার্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের সমস্ত জেলায় গবাদি পশুর বহু প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করা হয়েছে—যাতে করে গবাদি পশুর মালিকেরা তা থেকে তাঁদের নিজেদের পালিত পশু-গুলির উন্নয়নে উৎসাহ পান। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে প্রতি বছর এ রকম প্রায় ৪০টি করে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হরিণঘাটার কেন্দ্রীয় পালিতপশু গবেষণা তথা প্রজনন প্রতিষ্ঠানে পালিতপশুর গবেষণা সংক্রান্ত

যেসব সার্থক কাজ হয়েছে, সেসবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিকে সুফল-লাভ ছাড়াও, উক্ত প্রতিষ্ঠানে উন্নত জাতের যেসব যাঁড় জন্মাচ্ছে, সেগুলোকে রাজ্যের গো-উন্নয়নের কাজে লাগানো হচ্ছে যথাবিহিতভাবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপায়ণকালে পশুচিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষা এবং গবাদির রোগ-দমনের কাজের উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে। এ রাজ্যে পশুচিকিৎসা বিদ্যার পাঠনকে ডিগ্রি-পাঠক্রমে উন্নীত করা হয়েছে; সেই সঙ্গে স্বল্পকালীন একটা ডিপ্লোমা-পাঠক্রমেরও প্রবর্তন করা হয়েছে—যাতে করে বহু সুযোগ্য পশুচিকিৎসা-তত্ত্ববিদ গড়ে তুলে রাজ্যের এ-বিষয়ক চাহিদা মেটানো যায়। গবাদি পশুর মালিকদের প্রয়োজনমত সাহায্য করার জন্য পল্লী-অঞ্চলে পশুচিকিৎসার কয়েকটি হাসপাতাল ও চিকিৎসালয় খোলা হয়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে এ রাজ্যের গো-উন্নয়ন কাজের উপর আরও জোর দেওয়া হয়েছে—যার মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি রয়েছে:—

পরিকল্পনার নাম	মোট ব্যয় হবার কথা	লক্ষ্য
(১) নতুন কেন্দ্রগ্রাম গঠন এবং বর্তমান কেন্দ্রগুলির প্রসারণ।	৩১.৯১ লক্ষ টাকা	গবাদির উন্নয়ন বা প্রজননের উদ্দেশ্যে ৩,০০০ বর্গ মাইল জুড়ে গবাদিবহুল ৭টি অঞ্চলে ৩৭টি কৃত্রিম প্রজননকেন্দ্র, ২২২টি কেন্দ্রগ্রাম (উপকেন্দ্র) এবং ৫টি শহর-অঞ্চলীয় কৃত্রিম-প্রজননকেন্দ্র স্থাপন। এসব কেন্দ্রে প্রজননকার্যে লাগানোর জন্য মোট ৩ লক্ষ গোরু ও মহিষ রাখা হবে।
(২) সরকারী সাহায্যের দ্বারা উন্নত জাতের বাছুর পালন করা।	১.৯ লক্ষ টাকা..	উন্নত জাতের নির্বাচিত ৮০০ বকনা-বাছুর এবং ২০০ এঁড়ে বাছুরকে লালন করার জন্য সরকারী সাহায্য দান। এইসব বাছুর বড় হ'লে উন্নত জাতের গোরুর সংখ্যাবৃদ্ধির কাজে লাগানো হবে।
(৩) কৃষকদের জমিতে পশুখাদ্য ফসলের চাষ এবং মাটির তলায় পশুখাদ্য সংরক্ষণের আধার নির্মাণ প্রদর্শন।	১.১৯ লক্ষ টাকা..	পল্লী-অঞ্চলে পশুখাদ্য ফসলের চাষ এবং তার সংরক্ষণে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এইসব ফসলের চাষ কীভাবে করতে হয় এবং কীভাবে মাটির নিচে আধার তৈরি করে তা সংরক্ষণ করতে হয়, এসব কাজ করে দেখিয়ে দেওয়া।

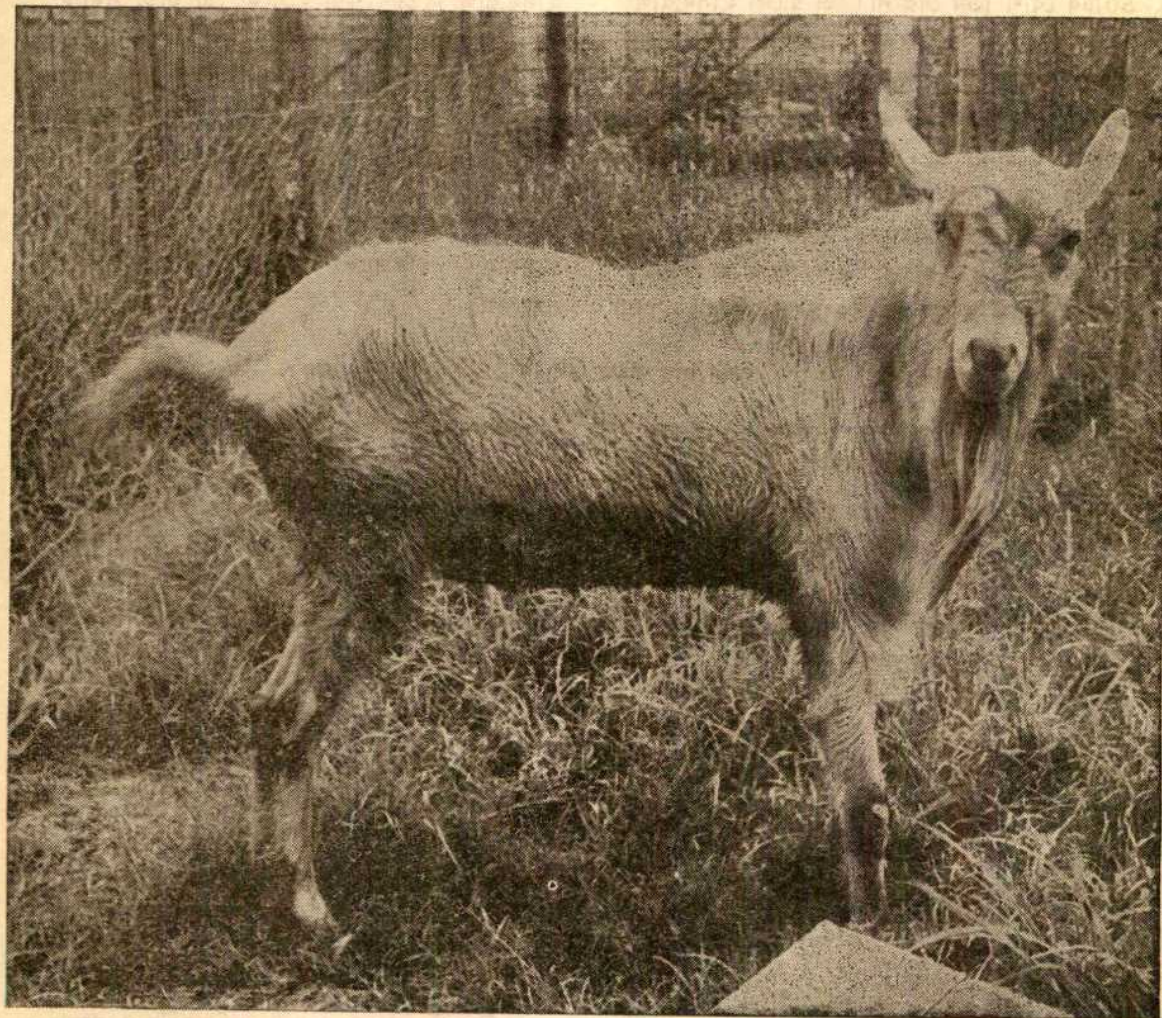
হাঁসমুরগি

এ রাজ্যে যেসব দেশী হাঁসমুরগি দেখা যায়, সেগুলো ছোট ছোট, তারা ডিমও দেয় ছোট ছোট—তাও একটি হাঁস কি মুরগি বছরে বড় জোর ৫০-৬০টির বেশি ডিম দেয় না। এ রাজ্যে হাঁসমুরগি-পালন শিল্পের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে হাঁসমুরগির সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সরকারী প্রচেষ্টায় মেদিনীপুরে একটি ও রানাঘাটে একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে; তা ছাড়া হরিণঘাটাতেও হাঁস-মুরগির একটি শাখা খোলা হয়েছে। এসব জায়গায় সাধারণত 'রোড আইল্যান্ড রেড' আর 'হোয়াইট লেগহর্ন' জাতের মুরগির এবং 'থাকি ক্যাম্পবেল' আর 'ইন্ডিয়ান রানার' জাতের হাঁসের সংখ্যা বৃদ্ধি

করা হয়। এসব উন্নত জাতের পাখির ডিমও বিভিন্ন জেলার নির্বাচিত অঞ্চলগুলোতে বিতরণ করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজের সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার হাঁসমুরগি বিতরণ করা হয়েছে; তা ছাড়া সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনা, জাতীয় সম্প্রসারণ কৃত্যক, আদিবাসী-উন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন উন্নয়ন-পরিকল্পনা-অঞ্চলে ১ লাখ ২০ হাজার ডিমও বিতরণ করা হয়েছে—বাচ্চা ফুটিয়ে নেওয়ার জন্য।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রাজ্যসরকার নিম্নোক্ত কাজগুলো করবেন বলে সংকল্প করেছেনঃ—

পরিকল্পনার নাম	মোট ব্যয় হবার কথা	লক্ষ্য
(৪) পশুখাদ্য ফসলের বীজ বিতরণে সরকারী সাহায্য।	৯.৫ লক্ষ টাকা ..	পশুখাদ্য ফসলের মিশ্র চাষে উৎসাহ দেওয়া।
(৫) দার্জিলিং জেলায় গিরি গোকুর একটি কেন্দ্র স্থাপন।	২.২৮ লক্ষ টাকা ..	কালিম্পঙে সেই অঞ্চলের গিরি জাতের গোকুর উন্নয়নের জন্য একটি ছোট গো-প্রজনন-কেন্দ্র স্থাপন।
(৬) জেলা পর্যায়ে ও রাজ্য-পর্যায়ে গো-প্রদর্শনী।	৪.২৮ লক্ষ টাকা ..	পালিত পশুর মালিকদের উন্নত ধরনের পশু-পালনে উৎসাহ দেওয়া এবং উন্নত পদ্ধতিতে পশুপালন করলে কী উপকার হয় তা দেখিয়ে দেওয়া।
(৭) কৃত্রিম প্রজনন সংক্রান্ত শিক্ষণ।	০.১৯ লক্ষ টাকা ..	কৃত্রিম প্রজননের এবং অপদার্থ ঘাঁড়ের প্রজনন-ক্ষমতা লোপ করার কাজে উপযুক্ত কর্মচারীদের শিক্ষণ দেওয়া।
(৮) কেন্দ্রগ্রামের কাজে তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা।	২.৮৬ লক্ষ টাকা ..	কেন্দ্রগ্রাম পরিকল্পনাতন্ত্র অঞ্চলগুলোতে কৃত্রিম প্রজনন ও অকর্মণ্য ঘাঁড়ের প্রজনন-ক্ষমতা লোপ করার কাজ যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালনার তত্ত্বাবধান করা।
(৯) হরিণঘাটা কেন্দ্রে একটি শিক্ষাথিনিবাস নির্মাণ।	০.৪৮ লক্ষ টাকা ..	হরিণঘাটা কেন্দ্রে পশুপালন-শিক্ষার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করা।
(১০) কর্মচারীদের বিদেশে শিক্ষণ-লাভ।	১.৭১ লক্ষ টাকা ..	পশুপালনকার্যে বিদেশে বিশেষ উচ্চ শিক্ষণ লাভের ব্যবস্থা করা।
(১১) অধিকারের প্রধান দফতরে পশুপালন শাখার শক্তিবর্ধন।	১.৭১ লক্ষ টাকা ..	দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সংকল্পিত কার্যাবলীর পরিকল্পন, সংগঠন ও তত্ত্বাবধানের জন্য পশুপালন শাখার প্রধান কার্যালয়ে আবশ্যিক-মত শক্তিবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।



হরিণঘাটা কেন্দ্রে উন্নত জাতের একটি ভাগল

পরিকল্পনার নাম	মোট ব্যয় হবার কথা	লক্ষ্য
(১) রানাঘাটের ও মেদিনীপুরের কেন্দ্র দু'টির উন্নয়ন।	১.৪২ লক্ষ টাকা ..	হাঁস-মুরগির সংখ্যাবৃদ্ধির কেন্দ্রগুলিতে উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
(২) উত্তরবঙ্গে হাঁসমুরগির সংখ্যা-বৃদ্ধির একটি কেন্দ্র স্থাপন।	২.৮৫ লক্ষ টাকা ..	উত্তরবঙ্গে হাঁসমুরগি জন্মানোর উদ্দেশ্যে উন্নত জাতের পাখি ও ডিম বিতরণের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য জলপাইগুড়ি জেলার মহিমাগড় কৃষিক্ষেত্রে হাঁসমুরগির সংখ্যা-বৃদ্ধির একটি কেন্দ্র স্থাপন।
(৩) বর্ধমানে হাঁসের সংখ্যাবৃদ্ধির একটি কেন্দ্র খোলা।	১.৪২ লক্ষ টাকা ..	উন্নত জাতের হাঁস তথা হাঁসের ডিম উৎপাদনের জন্য বর্ধমান কৃষিক্ষেত্রে একটি কেন্দ্র স্থাপন।
(৪) হাঁসমুরগি বিতরণে সহায়-দান।	৫.৭০ লক্ষ টাকা ..	সাধারণ চাষীরা যাতে উন্নত জাতের হাঁস-মুরগির সংখ্যা তাড়াতাড়ি বাড়াতে পারেন তার ব্যবস্থা করা।
(৫) হাঁসমুরগি পালন শিল্পের প্রসারণ কেন্দ্র (ভারত-সরকার)	১৩.০০ লক্ষ টাকা	হাঁসমুরগি পালনের উন্নত পদ্ধতি দেখিয়ে দেবার জন্য এবং হাঁসমুরগি পালনে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রির সুব্যবস্থার জন্য কতকগুলি প্রদর্শনকেন্দ্র স্থাপন; উন্নত জাতের হাঁস-মুরগি জন্মানোর সুবিধা দেবার জন্য এসব প্রদর্শনকেন্দ্রের এলাকায় কম দরে উন্নত জাতের হাঁসমুরগি এবং ডিম বিক্রি। পরিকল্পনাকালের মধ্যে এরকম ২০টি কেন্দ্র স্থাপন করার কথা হয়েছে।

জীবিকার্জনের সহায়ক উপায় হিসাবে আমাদের কৃষকেরা যদি হাঁসমুরগি পালনে মনোযোগী হন, তাতে বিশেষ উপকৃত হবেন। দৃঢ় প্রচেষ্টার ফলে পল্লী-অঞ্চলে উন্নত জাতের হাঁসমুরগির ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে এবং আরও সন্মোগ-সুবিধা দিতে পারলে উন্নয়নকার্য আরও স্বরাস্ত হতে পারে।

— ছাগল

পশ্চিমবঙ্গে শেষ যে পালিতপশু-গণনা হয়েছে, তাতে দেখা গেছে, এ রাজ্যে ৩৮.৬ লক্ষ ছাগল আছে। এসব ছাগলের আকার ছোট, পা খাটো, কান ছোট এবং বেশির ভাগেরই রঙ কালো। এসব

ছাগল সাধারণত 'কালো বাঙলা ছাগল' নামে অভিহিত। বঙ্গবিভাগের ঠিক আগে ভারতীয় কৃষিগবেষণ পরিষদ ঢাকা কেন্দ্রে বাঙলাদেশের এই ছাগল সম্বন্ধে বিধিবদ্ধভাবে তথ্যসংগ্রহের পরিকল্পনা করেছিলেন। এ বিষয়ে কিছুমাত্র কাজ হবার আগেই আমাদের ভাগ্যে এল বঙ্গবিচ্ছেদ। হরিণঘাটা কেন্দ্রে অনুরূপ কাজে আবার হাত দেওয়া হয়েছে। সেখানে 'বারবরি' ছাগলের সাহায্যে বাঙলা ছাগলের উন্নয়ন করার বিষয়েও পরীক্ষা চলছে। এ পর্বন্ত আমাদের নীতি ছিল দেশী নির্বাচিত ছাগলের সাহায্যেই দেশী ছাগলের উন্নয়ন করা। হরিণঘাটা কেন্দ্রে যে পরীক্ষা চলছে, তার ফলাফল দেখবার অপেক্ষায় ইতিমধ্যে আর কোন উন্নয়নকার্যে হাত দেওয়া হয় নি।

ভেড়া

এ রাজ্যে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত শৃঙ্খল অঞ্চল ছাড়া আর কোথাও সাধারণত ভেড়া পদুষ্টে দেখা যায় না। এসব জায়গায় যে পশু উৎপাদিত হয়, তা মোটা ধরনের এবং কম্বল, আসন প্রভৃতি মোটা জিনিস তৈরি করতেই তা ব্যবহার করা হয়। তবে, দার্জিলিং জেলার পাহাড়ী এলাকায় মেঘপালনের প্রচলন রয়েছে এবং সেখানে সাধারণত 'ঘরপালা' আর 'বনপালা' নামে দুই জাতের ভেড়া দেখা যায়। ভারতীয় কৃষিগবেষণ পরিষদের প্রবর্তনায় এ বছর আমরা এইসব পাহাড়ী ভেড়ার প্রকৃতি নিরীক্ষা করার এবং স্কটল্যান্ড থেকে আমদানি কালোমুখ ভেড়ার সংকর-প্রজননে এসব ভেড়ার উন্নয়ন করার বিষয়ে পরীক্ষা করার একটা পরিকল্পনা করছি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জাতীয় সম্প্রসারণ কৃত্যক ও সমষ্টি-উন্নয়নের অঞ্চলগুলোতে পালিতপশুর উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। এ রাজ্যে আদিবাসীদের কল্যাণের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক যোজনায় এ সংক্রান্ত কতকগুলি পরিকল্পনা স্থান পেয়েছে, যেমন, (১) পালিতপশুর উন্নয়ন, (২) দার্জিলিং জেলায় হাঁসমুরগির সংখ্যাবৃদ্ধির একটি কেন্দ্র স্থাপন, (৩) কম দরে হাঁসমুরগি ও ডিম সরবরাহ করা, (৪) ছাগপালন, (৫) মেঘ-পালন, ও (৬) শূকরপালন।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে এটা পরিষ্কারই বোঝা যাবে যে, এ রাজ্যে পালিত-পশুপক্ষিসম্পদের যথাসম্ভব দ্রুত উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হচ্ছে।

আপনি পশ্চিমবঙ্গ প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু' এবং যে-কোন পত্রিকার গ্রাহক হ'তে হ'লে, চাঁদার টাকা পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তার নামে 'রাইটাস' বিল্ডিংস, কলিকাতা-১' ঠিকানায় নগদ পাঠাতে বা জমা দিতে পারেন, অথবা ক্রস্‌ড পোস্টাল অর্ডারেও পাঠাতে পারেন। যে পত্রিকা বা যে যে পত্রিকার গ্রাহক হ'তে চান তার বা সেগুলোর নাম এবং নিজের নাম-ঠিকানা সুস্পষ্ট বড় অক্ষরে লিখে দেবেন। ক্রস্‌ড পোস্টাল অর্ডারের সঙ্গে অবশ্যই একটি পত্র দিতে হবে; যে-পত্রিকার গ্রাহক হ'তে চান তার নাম এবং নিজের নাম-ঠিকানা সেই পত্রে স্পষ্ট বড় বড় অক্ষরে অবশ্যই লিখে দেবেন।

মাছ কী রকম জল চায়

মাছের চাষীরা দেখতে পাবেন যে, তাঁদের জলায় যে জল আছে তার গুণের উপর মাছের বৃদ্ধি নির্ভর করে। জল কোথা থেকে এল, কীভাবে তার ব্যবহার হয়, কী ধরনে তা সঞ্চিত আছে, জলার মাটি কী ধরনের—এমনি সব বিষয়ে জলের গুণের ইতর-বিশেষ হয়।

জল যদি খারাপ হয় তবে মাছের বৃদ্ধি এবং উৎপাদন খারাপ হবে; আর, জল পুষ্টি-উপাদানে সমৃদ্ধ হ'লে মাছ তাড়াতাড়ি বাড়বে।

মাছ-চাষের পুকুরের ভাল জলে খানিকটা চুনের প্রতিক্রিয়া থাকা চাই। জলের অম্ল বা চুনা প্রতিক্রিয়ার পরিমাপ হয় জলজান-বাস্পকণা জমা হওয়ার হিসাব দিয়ে; একে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয় 'পি-এইচ'। “লিভবন্ড কলার কম্পারেটর” নামক যন্ত্র দিয়ে এটা সহজেই দেখতে পারা যায়। 'পি-এইচ' যদি ৭.৫ থেকে ৮.৫ হয় তবে জল মাছের চাষের পক্ষে ভাল হওয়ার কথা। অম্ল-জল ('পি-এইচ' ৭.০'র নিচে) এবং চুন-বহুল জল ('পি-এইচ' ৯.০'র উপর) সাধারণত মাছের উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ ভাল নয়।

জলের উৎপাদনক্ষমতা

জলে কতটা চুন আছে, তার উপরও তার উৎপাদনক্ষমতা নির্ভর করে। খুব খারাপ জলে সাধারণত প্রতি দশ লক্ষ ভাগ জলে চুন থাকে ৩০ থেকে ৫০ ভাগ। সাধারণভাবে মাছ উৎপাদন করা যেতে পারে এমন জলের প্রতি দশ লক্ষ ভাগে ১০০ ভাগের বেশি চুন থাকে।

কটকে মাছ-চাষের পুকুরে দেখা গেছে, যে-জলের প্রতি দশ লক্ষ ভাগে ৯০ ভাগ চুন আছে, তাতে উৎপাদিত মাছের তিনগুণ মাছ উৎপাদিত হয় সেই জলে যার প্রতি দশ লক্ষ ভাগে চুন আছে ১৬০ ভাগ। তবে, বেশি 'পি-এইচ'এর মত জলে চুনের

ভাগও অতি মাত্রায় থাকলে, তাতে মাছের চাষ ভাল হয় না। জলের প্রতি দশ লক্ষ ভাগে চুন ২০০ ভাগের বেশি থাকলে, তাতে মাছের উৎপাদন ক্রমশ কমে যায়।

পুষ্টিকর উপাদানগুলি জলে গ'লে যাওয়ার একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে মাছের চাষে। মাছের উৎপাদনের উপর যে-দু'টি পুষ্টি-উপাদানের প্রভাব অত্যন্ত বেশি, সে-দু'টি হচ্ছে নাইট্রেট আর ফসফেট। জলে যদি এ-দুটো উপাদান কম থাকে তবে মাছের উৎপাদনও কমে যাবে।

ভাল জল

মাছ-চাষের উপযোগী ভাল জলে গ'লে-যাওয়া পুষ্টি-উপাদান প্রচুর থাকে। এদেশে প্রতি দশ লক্ষ ভাগ জলে ০.২ থেকে ০.৪ ভাগ ফসফেট এবং ০.০৬ থেকে ০.১ ভাগ নাইট্রেট থাকলে, সেই জলে মাছের উৎপাদন ভালই হয়। সাধারণত যে-জলে পুষ্টি-উপাদানগুলি গলিত অবস্থায় সন্তোষজনক মাত্রায় থাকে, সেই জলে মোট চুনের মাত্রাও মোটামুটি বেশি থাকবেই।

খারাপ জল সাধারণত গ্রীষ্মকালেও ঘোলাটে বাদামী রঙের থাকে। এ রকম জলের পুকুরে মাছ বাড়ে না—বেঁটে আর রোগা হয়ে যায়। তবে, বারংবার সার প্রয়োগ করলে এ রকম জল পরিষ্কার তো হয়ই, পুষ্টি-উপাদানেও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

জলের সঙ্গে যে অক্সিজেন থাকে, মাছ তার সাহায্যে নিশ্বাস নেয়। মাছের এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য জলের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় যথেষ্ট অক্সিজেন থাকা দরকার। ভাল পুকুরে প্রতি দশ লক্ষ ভাগ জলের সঙ্গে পাঁচ থেকে সাত ভাগ অক্সিজেন মিশ্রিত থাকলেই সাধারণত ভাল ব'লে বিবেচিত হয়। এর চেয়ে কম অক্সিজেন থাকলেও মাছ বাঁচতে পারে, কিন্তু জলে হঠাৎ অক্সিজেনের মাত্রা বেড়ে গেলে অথবা খুব বেশি মাত্রায় অক্সিজেন

মিশ্রিত হ'লে তাতে মাছের বৃদ্ধির পক্ষে সুফল হয় না।

জলে অক্সিজেনের পরিমাণ খুব কম (যেমন দশ লক্ষ ভাগ জলে দুই ভাগ অক্সিজেন) থাকলে মাছের শ্বাসকণ্ট দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত শ্বাসরোধ হয়ে মাছ মারা যায়।

বেশি অক্সিজেন

জলে বেশি মাত্রায় অক্সিজেন মিশ্রিত থাকলেও তা মাছের পক্ষে ক্ষতিকর হয়। জলে অতিমাত্রায় অক্সিজেন মিশ্রিত থাকলে মাছের উপর তার প্রতিক্রিয়া হবেই এবং মাছ যাকে বলে “গ্যাস-রোগ” তাতে আক্রান্ত হবে। এ অবস্থায় শরীরের মধ্যে গ্যাস-যুক্ত অক্সিজেন সঞ্চিত হয়, পরে দেহ-সঞ্চালনে বৈষম্য দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত মাছ ম'রে যায়। প্রায় সব রকমের সাধারণ জলেই কার্বন-ডাইঅক্সাইডের মাত্রার তারতম্য দেখা যায়। আমাদের দেশে, দেখা গেছে, প্রতি দশ লক্ষ ভাগ জলে ২০ ভাগ পর্যন্ত কার্বন-ডাইঅক্সাইডও মাছ সহ্য করতে পারে। এর চেয়ে বেশি কার্বন-ডাইঅক্সাইড থাকলে মাছের ক্ষতি হয়। হাইড্রোজেন সাল্‌ফাইড, বন্ধ জলার গ্যাস প্রভৃতি জলে-মিশ্রণযোগ্য অন্যান্য গ্যাসও সাধারণ জলে কখনও কখনও থাকে, এগুলোও মাছের ক্ষতিকর।

একটা জমি থেকে ফসলের ভাল ফলন পেতে হ'লে, তাতে নিয়মিতভাবে ভাল ভাল সার দেওয়া দরকার। সার না দিলে ফলন ক'মে যাবে। পুকুরের মাছের বেলাও ঠিক তেমনি। যে জলে অবিরত মাছের চাষ করা হয়, তাতে যদি দরকারমত মাঝে-মাঝেই জৈব বা অজৈব কোন সার দেওয়া না হয় তবে সে-জলের উৎপাদনক্ষমতা ক'মে যাবেই। মাছের উৎপাদন ক'মে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের অবস্থাও খারাপ হয়ে পড়বে।

এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হ'লে এবং জলকে মাছ-চাষের উপযোগী ক'রে তুলতে হ'লে, দরকার বৃক্ষে মধ্যে মধ্যে জলের শোধন-ব্যবস্থা করতে হবে। এবং তা করতে হবে মাছ-চাষের মূলনীতি অনুসারে।

বৃদ্ধিমত্তা সহকারে এ ব্যবস্থা করতে হ'লে পুকুরের জলে মাছের যে খাদ্য থাকে তার উপাদানগুলির গঠনরীতির মৌলিক পর্যায় সম্বন্ধে এবং কীভাবে সেগুলি পরস্পরের উপর নির্ভর করে সে বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার।

মাছের খাবার

পুকুরের জলে দেখা যায়, সবুজ রঙের আণু-বীক্ষণিক আকারের উদ্ভিদরাশি (‘ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন’) ভাসছে এবং বড় আকারের অনেক উদ্ভিদ জলের নিচে ডুবে আছে। শেষোক্ত উদ্ভিদগুলি নাইট্রেট, ফসফেট প্রভৃতি পদার্থ-উপাদানগুলিকে সূর্যালোকের এবং জলে-মিশ্রিত গ্যাসের উপস্থিতিতে যৌগিক আকারে একত্র সঞ্চিত ক'রে রাখে।

জলে যেসব ক্ষুদ্র প্রাণী রয়েছে, বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাদের বলা হয় ‘জুপ্ল্যাঙ্কটন’, তাদের খাদ্য হচ্ছে আণুবীক্ষণিক আকারের ভাসমান উদ্ভিদগুলি। এসব হচ্ছে নানা রকমের কীটানু এবং জোলো পোকা। এসব কীটানু আর জোলো পোকা বাচ্চা-মাছের চমৎকার খাদ্য। কোন কোন মাছ জলজ উদ্ভিদও সরাসরি খায়, কিন্তু বাচ্চা-মাছ তা খেলেও হজম করতে ক'মই পারে।

কোন কোন জাতের মাছ জলের তলার উদ্ভিদ তাজা এবং পচা অবস্থায়ও সরাসরি খায়। এসব উদ্ভিদের মধ্যে নানা রকম প্রাণী এবং শামুক বাস করে, শিকারী মাছেরা তাদের খায়। সাধারণ মাছেও নানা রকম পোকা, শামুক এবং জলের তলার পাঁকের বাসিন্দা নানা রকম কীট খায়। এইভাবে পুকুরের মধ্যে নানা সূত্রে পাওয়া খাদ্য খেয়ে মাছেরা জীবন-ধারণ করে। এতে নানা রকম সাধারণ জিনিস থেকে মাছের যৌগিক খাদ্যের সংগঠন হয়। অপর দিকে একে বিনাশক্রিয়াও বলা চলে, কেননা, বড় প্রাণীদের প্রাণধারণের জন্য ছোট প্রাণীদের বিনাশ ঘটে। এটা প্রাকৃতিক বিধান। এই বিনাশী-সংগঠনী ধারার উপর নির্ভর করছে উৎপাদন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে-পুকুরে মাছের চাষ হয়, সেখানে আসল মাছের

উৎপাদনের জন্য বাছাই-করা খাদ্যপ্রাণী এবং খাদ্য-উপাদান প্রয়োজনমত জন্মাতে আর সঞ্চিত হ'তে দেওয়া হয়।

কম উৎপাদন

যে-জলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছের চাষ করা হয় না, তাতে স্বভাবতই মাছ কম হয়। পরিবেশের দরুন উৎপাদন কমে যায়। যে-পুকুর উপেক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকে, তার জলে অতিরিক্ত আগাছা

জন্মে—যার অত্যন্ত খারাপ প্রভাব দেখা দেয় মাছের উৎপাদনের উপর। পুকুরে যথাপরিমিত সংখ্যায় এমন-সব মাছ ছাড়তে হবে যেগুলি তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে—তা না হ'লে মাছের উৎপাদন কমে যাবে।

বিভিন্ন ধরনের পুকুরে জলের অবস্থা, খাদ্যের সূত্র এবং মাছের উৎপাদন বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে, তা থেকে পুকুরগুলিকে নিম্নোক্ত তালিকা অনুযায়ী ভাগ করা যায়:

মাটির প্রকৃতি	পুকুরের তলার ধরন	জলের অস্বা ও খাদ্য	বছরে যত পাউণ্ড মাছ উৎপন্ন হ'তে পারে
পলিঘটিত এবং কালো ..	কাদা, কালো পচা জৈব পদার্থ	'পি-এইচ' ৮.০০'র বেশি অক্সিজেন প্রচুর, রঙ সবুজ ধরনের, জলজ উদ্ভিদের সমারোহ, ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা আর জোলো মাছ, তলার কাদার পোকা প্রচুর, আগাছা বিরল	১,০০০ থেকে ১,৫০০
লাল কঁকর এবং কঁকুরে	কাদা, কালো বা বাদামী পলি ..	'পি-এইচ' ৭ থেকে ৮.৫, অক্সিজেন প্রচুর, জলজ উদ্ভিদের ঝাড় বেশি ঘন নয়, কাদার পোকা মাঝামাঝি পরিমাণ, আগাছা প্রচুর	৫০০ থেকে ১,০০০
বেলে এবং গর্ত-গর্ত বা পচা কাদা।	বাদামী বা ঘোর রঙের উদ্ভিদ-পচা কাদা।	'পি-এইচ' ৭.০'র কম, অক্সিজেন মন্দ নয়, জলজ উদ্ভিদ খুব কম, জল সাধারণত পরিষ্কার, জলে- ডোবা আগাছা বিরল, ভাস- মান আগাছা কখনও কখনও দেখা যায়	২০০ থেকে ৩০০

বৈষয়িক দিক দিয়ে এই বিভাগ সম্পূর্ণ নির্ভুল নাও হ'তে পারে; কিন্তু, পোনা ছাড়লে, কী ধরনের পুকুরে স্বাভাবিকভাবে কী পরিমাণ মাছ উৎপন্ন হ'তে পারে, সে বিষয়ে এ থেকে মোটামুটি একটা

ধারণা করা যাবে। সার প্রয়োগ ক'রে অথবা বাইরে থেকে খাদ্যের যোগান দিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ ক'রে মাছের উৎপাদন আরও অনেক বাড়ানো যেতে পারে।

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা

প্রচুর উৎপাদন

উড়িষ্যায় মাছ-চাষের উপযোগী কয়েকটি জলা পরিস্কার করে তার একরপিছ বছরে প্রায় ৫০০ পাউন্ড মাছ হতে দেখা গেছে। পাঞ্জাবে যথাযথভাবে চাষ-করা পুকুর থেকে বছরে একরপিছ প্রায় ১,৬০০ পাউন্ড মাছ পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। বাঙলাদেশে স্বাভাবিকভাবে রুই-কাতলা প্রভৃতি বড় মাছ একরপিছ জলায় বছরে প্রায় ৮০০ থেকে

১,০০০ পাউন্ড জন্মায়; কিন্তু বাইরে থেকে খাবার যোগালে ২,০০০ পাউন্ড পর্যন্ত মাছ উৎপন্ন হতে দেখা যায়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন কোন জায়গায় পুকুরে প্রচুর সার দিয়ে এবং বাইরে থেকে নিয়মিতভাবে খাবার যোগিয়ে একরপিছ জলায় বছরে ৩,০০০ থেকে ৪,০০০ পাউন্ড পর্যন্ত মাছ উৎপাদন করা হয়েছে।*

*১৯৫৬ সালের অক্টোবর-সংখ্যা 'ইণ্ডিয়ান ফার্মিং'-এ প্রকাশিত ডি কে এইচ আলিকুহির প্রবন্ধ থেকে



‘বেয়ার’এর পোকা ও রোগ দমনের ঔষধগুলির
দ্বারা আপনাদের ফসল রক্ষা করুন

ফলিডল-ই ৬০৫

মেটাসিস্টক্স

সেরেসান

অ্যাগালল

কুপ্রাভিট (ওবি ২১)

এইগুলি পশ্চিম জার্মানীর লিভারকুসেনের

ফারবেনফ্যাবরিকেন বেয়ার

দ্বারা প্রস্তুত আসল ঔষধ।

ভারতে পরিবেশক

চিকা প্রাইভেট লিমিটেড,

৩১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২



ছোট এলাচ

দীপিকা সরকার

— আমাদের একটা বন্ধমূল ধারণা যে, ছোট এলাচ আমাদের দেশে জন্মে না। এই অতি মূল্যবান জিনিসটি আসে মালাবার, গুজরাট এবং ভারত-মহাসাগরীয় স্বীপপুঞ্জ থেকে। ওসব জায়গায় সিদ্ধ করে এলাচের নির্যাস বের করে রাখা হয়। যে জিনিসটি আংশিক কি সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে আমাদের বাজারে পৌঁছয় তারই দাম ২৮ থেকে ৩০ টাকা সের। সেরা জিনিস বিদেশ থেকে আসে বলেই দাম বেশি, না উপকারী হিসাবে দাম বেশি, সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

“এলা সূক্ষ্মা কফস্বাসকাসার্শোমুদ্রকৃচ্ছ হং।
রসে তু কটুকা শীতা লম্বী বাতহরী মতা॥”

— সংস্কৃত ভাষায় ছোট এলাচকে সূক্ষ্মালা বলে, এবং ছোট এলাচ কফ, শ্বাস, কাশ, অর্শ, মুদ্রকৃচ্ছ ও বায়ু নাশ করে এবং এ লঘু ও কটুরস। এর ব্যবহারে মনের প্রফুল্লতা উৎপন্ন হয়, মুখ ও ঘর্ম সৃগন্ধিযুক্ত হয়, দাঁতের গোড়া শক্ত হয়, হৃৎপিণ্ড সবল হয়, বায়ুজনিত পেটের বেদনা দূর হয়, ভুক্ত-দ্রব্য সহজে পরিপাক হয়।

এলাচ অত্যন্ত বলকারক। বিশ্ববিখ্যাত গামা পালোয়ানের খাদ্যতালিকায় দেখা গিয়েছে, তাঁর অন্যান্য খাদ্য সহ দৈনিক আহাৰ্য ছিল দশ ছটাক ছোট এলাচের আরক। অন্যান্য পালোয়ানেরাও ঐ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আসছেন।

এলাচ আমাদের গরম মসলার অন্যতম,—পোলাও, কালিয়া, মাংস ইত্যাদিতে ব্যবহার্য। পানের খিল এলাচদানা-যুক্ত হ'লে বিশেষ মুখরোচক হয়। মুখশুদ্ধি হিসাবে এর বিশেষ প্রচলন আছে। পুরাকালে সম্মানিত অতিথিকে আপ্যায়িত করতে এই ছোট এলাচ সহ স্বর্ণমুদ্রা কি রৌপ্যমুদ্রা

উপঢৌকন দেওয়া হ'ত। এখনও কোথাও কোথাও এ রীতি প্রচলিত আছে।

এবার এলাচগাছের কথা বলা যাক। এর গাছ দেখতে অনেকটা আদাগাছের মত। পাতাগুলি ওর চেয়ে আর একটু লম্বা এবং পাতার মাঝখানটা আরও একটু চওড়া। পাতা হাতে ঘষলে ঠিক এলাচের গন্ধই পাওয়া যায় আদা কি বাঁশ গাছের মতন এর কাণ্ড থেকে অনেকগুলি গাছ বের হয়ে আসে। উচ্চতায় ৪-৫ ফুটের বেশি হয় না। গমের ঝাড়ের মত এক ঝাড়ে ১৫-২০টা গাছ বেরিয়ে আসে। এটা ঘাসজাতীয় ওষধিবর্গীয়—একবার ফল দিলেই গাছটি শেষ।

ফুল হয় কার্তিক মাসে। পুষ্পগুচ্ছ বেরিয়ে আসে ঠিক যেন একটি খেজুরের কাঁদির ছোট সংস্করণ। কাঁচা অবস্থায় ফলের রঙ থাকে পাতার রঙের মত সবুজ। ফল হয় তেঁশিরা এবং পাকে পৌষের শেষে অথবা মাঘের প্রথমে। শুকোলে ফলের রঙ সাদা হয়ে যায়। একটা গাছে এক ছটাক কি তার কিছু বেশি ফল ধরে। একই ঝাড়ে যদি এক সময় ১৫-২০টা গাছে ফল ধরে তবে হয়তো আপনি এক সের এলাচই পেয়ে যাবেন একটা ঝাড় থেকে। তা হ'লেই লাভের কথাটা একবার ভেবে দেখুন।

গাছ লাগানোর সময় হচ্ছে পুরো বর্ষাকালটা। কাজেই, গাছ লাগিয়ে জল-টানাটানির কোনও প্রশ্নই ওঠে না। গাছ লাগানোও একেবারে কলাগাছ কি বাঁশগাছ লাগানোর মত। ঝাড় থেকে কাণ্ড সহ গাছ তুলে নিয়ে তৈরি-মাটিতে বসিয়ে দিন এবং কাণ্ডের গোড়ার মাটি আস্তে আস্ত চেপে দিন—শিকড়গুলি যেন কুকড়েমুকড়ে না যায়। কাণ্ডটি ৪ ইঞ্চি মাটির নিচে দিলেই যথেষ্ট। গাছ সোজা

ক'রে বসাতে হবে এবং দেড় ফুটের বোঁশ লম্বা হ'লে একটা ঠেকনা দিতে হবে—যাতে বাতাসে ভেঙে না পড়ে। গোড়ার মাটি বেশ একটু উঁচু ক'রে দিতে হবে—যাতে ওখানে জল না জমে।

এলাচপাতার গন্ধ গোরু-ছাগলের অপ্রিয়, কাজেই এদিক দিয়ে রক্ষাব্যবস্থার দরকার নেই। কার্তিক মাসে ফুল ফোটার সময় যদি মাটিতে রস না থাকে তবে গাছের গোড়ায় ২-৪ দিন জল দিলে ফসল ভাল হবে। মাটি চাই দোআঁশলা। সার দিতে হবে বিঘাপ্রতি এক মণ গোবরের সার অথবা পচলা সার। এ গাছের শিকড় বড় নরম। খুব ভাল আলগা মাটি এরা চায়। মাটিটা সার মিশিয়ে ঠিক ক'রে রাখতে হবে বৈশাখে। গাছ লাগানোর সময় মাটিটা আর-একবার কুঁপিয়ে নেওয়া ভাল। যে গর্তে গাছ লাগানো হবে, তার ভিতর আর-এক মুঠো ভাল সার দিয়ে, তাতে গাছটা বসিয়ে দিলে ভাল হয়। গাছ একটু সতেজ হয়ে উঠলেই ওর গোড়া থেকে আরও ফোড় বেরিয়ে আসবে, যেমন—ধান, গম, কলা গাছের আসে, এবং পরিণত হবে একটি ঝাড়ে। গাছগুলি ৪ ফুট অন্তর লাগানো যেতে পারে।

এ গাছ কিন্তু খোলা মাঠে একেবারেই হবে না। চা-এর গাছের মত এলাচগাছও চায় কিছুটা ছায়া। যেমন চায় পানের গাছ। বগা মেড়ুলা কি অড়হর ফাল্গুন মাসে লাগিয়ে রাখলে যে গাছ হবে, তারই নিচে নিচে ৪ ফুট অন্তর এলাচগাছ লাগানো যেতে

পারে বর্ষাকালে। অতি অল্প আয়াসে এ গাছটির চাষ চলতে পারে।

পশ্চিম বাঙলার দু'টি ক্ষেত্রে এলাচগাছ লাগানো বেশ চলতে পারে। প্রথমত, চা-বাগানে চা-গাছের সারির শেষ দিকের জঙ্গলের কাছাকাছি একটি সারিতে যেখানে ছায়ার অভাব নেই। চা-বাগানের মাটি দোআঁশলা আর সারেরও মোটেই অভাব নেই ওখানে। দ্বিতীয়ত, এলাচগাছ লাগানো যেতে পারে পানের বরজে পানগাছের সারির ছায়াতে। ওখানে একটি সারিতে এলাচগাছ থাকলে বরজের বেড়াটায় আর ফাঁক থাকবে না। পানের বরজের মাটি তো অতি উৎকৃষ্ট এবং এলাচগাছের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। পানবরজে সারের অভাবও নেই, আর জলাভাব থাকলে তো পানই হবে না। এর পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত স্থান এই পানবরজটা।

এলাচের চারা অনেক জায়গাতেই পাওয়া যেতে পারে। বাঁকুড়া জেলার শিমলাপাল থানার অনেক গৃহস্থের বাড়িতে এ গাছ আছে। অনেক বরজের ভিতরও আছে। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনেও এ গাছ দেখেছি ব'লে মনে হয়।

আস্তে আস্তে এলাচের চাষটা চালু করতে পারলে অন্য দেশ থেকে এটা আমদানির দরকার হয় না। সহজেই দামী জিনিসটা পাওয়া যেতে পারে, আর পাওয়া যেতে পারে সরস খাঁটি জিনিসটা।



লঙ্কাচাষের জারি গান

মহম্মদ গোলাম আকবর

বিশ্বপতির নাম মুখে, ভাই,

বারংবার বল।

তাহার প্রশংসা গেয়ে

সত্যপথে চল॥

অনন্ত অসীম তিনি

সত্য সনাতন।

তাহার ইঙ্গিতে চলে

এ তিন ভুবন॥

আসরে গাওনা করি

তার নাম নিয়ে।

ঝাল-চাষের জারি সবে

শোন মন দিয়ে॥

(ধরতা)

লঙ্কার ডঙ্কা আমি

বিশ্ব শঙ্কা দূরী'।

আমার নামে পদ্যবতী

স্বর্ণলঙ্কাপদুরী॥

আমি সীতা হয়ে রাবণের

চক্ষে দিলাম ছোঁওয়া।

বংশ তার ধ্বংস হ'ল

নিজে গেল খোয়া॥

মোর আকর্ষণে লঙ্কার

মাটিতে হয় সোনা।

লবণসাগরে ওঠে

মদকুতার ফণা॥

সোনার মোড়া সোনার গড়া

স্বর্ণলঙ্কার থাল।

রবিশশী হেথা ফেলে

সোনারুপোর জাল॥

সবুজ ক্ষেতে লাল ফল

নয়ন-মনোহরা।

ফুটে আছে থরে থরে

নীল আকাশে তারা॥

যতদিন হবে রবি,

রব তত কাল।

বৃন্দকালে রূপবতী

আমি বাপু ঝাল॥

বাজাও ডঙ্কা নাহি শঙ্কা

লঙ্কার চাষীভাই।

অষ্টলঙ্কার হাসি নিয়ে

হাসে বাঙলামায়ী॥

একে একে সর্ব লঙ্কার

নাম বলিয়া যাই।

লঙ্কার গানে দাহ ওঠে

ভোলার সময় নাই॥

'হলদা' লঙ্কার জরদা রঙ

লঙ্কা যে 'পাটনাই'।

'কামরাঙা' লঙ্কা আর

'কুল' লঙ্কা ভাই॥

'সূর্যমণি' লঙ্কা আর

লঙ্কা জেনো 'চুই'।

'কৃষ্ণসূর্যমণি' আর

লঙ্কা জেনো 'ছুই'॥

(ধরতা)

কেমন ধারার গান করিলে

মোহন সুরেতে।

স্বর্গ ট'লে পড়বে মোদের

মর্ত্যপদুরেতে॥

গাও গেয়ে যাও ফুর্তি' বাজাও

দিয়ে লঙ্কা-পোড়া।

গান শুনে ভাই উঠল নেচে

শ্মশানঘাটের মড়া॥

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

কোন লঙ্কার কেমন ধারা
গানে যাব ব'লে।
লঙ্কাচাষের গানগুলো ভাই
ভানুর বদকে জ্বলে।
ধানের মত লঙ্কা, ভায়া,
আউশ, আমন দুই।
আশি বছর আয়ু নিল
চুই আর ছুই।
স্বর্ষমণি কৃষ্ণমণি
বর্ষাকালেই ফলে।
পাটনাই আর হলদা দুটোয়
আমন বলা চলে।
চুই হ'ল ভাই মস্ত লতা,
ডাঁটার থাকে ঝাল।
একটা ডাঁটা রুয়ে দিলে
শান্তি চিরকাল।
কান্তি ফোটে তরকারির
বেটে দিলে চুই।
গাছের গোড়ায় রুলেই হ'ল
মারে নাক' ভুই।
চুই লঙ্কা তুই থাক রে বেঁচে
স্বাধীন বাঙলাদেশে।
ধন্য ধন্য চুই লঙ্কা
যুগের অবশেষে।
ছুই লঙ্কা সরু খাটো
ঝালের অ্যাটম্ বোমা।
একটি কণা ঠেকলে জিভে
চক্ষে দেখে ধুমা।
ধন্য ধন্য ছুই লঙ্কা
আশি বছর আয়ু।
গায়ের ঝাল গায়ে রেখ
ছুয়ো না বাঙলার বারু।

(ধরতা)

বাঙলা গান কেমন মিঠা?
বাঙলা গান কেমন মিঠা, চ্যাটরা পিটা
সুরের মাদলে।

পাঞ্জা নাচন জুড়ে দেছে
রোদ আর বাদলে।
আউশ ঝালের জারি শোন
ওগো চাষীভাই।
মাঘ ফাল্গুন চৈতে ঝালের
জমি চষা চাই।
দেওয়াল-ভাঙা মাটি কিংবা
পচা জলের পাক।
দিয়ে চষা ঝালের জমি
তাতে মিশে যাক।
সস্তা-মাঝে দুইখানা চাষ
দিবে ভাল করে।
রোগা শোকা হয়ে তোমার
গাছ যাবে না মরে।
কত রকম ব্যাধি দেখ
ঝালের গাছে হয়।
চষার গুণে ঝালগাছের
স্বাস্থ্য অটুট রয়।
শস্যের ব্যাধি হয় কেন ভাই,
মাটির থাকে দোষ।
চাষা হয়ে চষে নাকো
আহা রে আফসোস।
মাটির সাথে যেই চাষার
প্রেম কিছুর নাই।
ফসলের বেলাতে তার
মুখে পড়ে ছাই।

(ধরতা)

দাঘিনা তা বাজে রে তাঘিনা তা নাচে রে।
সিনেমার ছবি মোর ঝালক্ষেতে আছে রে।

বাজে দাঘিনা তা!

এক মণ সুপারফসফেট
এক মণ হাড়ের গুঁড়া।
চাষের সাথে ঝালের ক্ষেতে
ছড়া রে, ভাই, ছড়া।

তিনটা মাসের চষা-খোঁড়ায়
সার-মাটি যায় মিশে।
পয়লা বোশেখ আয় রে চাষা
ঝালের চাতর দিশে॥
তিন হস্ত আড়ে আর
দিঘে হস্ত ছয়।
ক্ষেতের চেয়ে চাতর যেন
দ্বিগুণ তেজী হয়॥
বাগ-বাগিচা উঁচু জমি
আউশ ঝালের চাব।
দশ কাঠা জমি রোয়ার
চাতর করলে বাস্॥
চাতরের চতুর্ভিতে
সরু আইল দাও
দুটো-চারটে কোপান দিয়া
সমান ক'রে যাও॥
তার উপরে দাও ছড়িয়ে
ভরিখানেক দানা।
অর্ধ সিকি ইঞ্চি মাটি
দানার উপর জানা॥
পিপড়ে-প্রধান জমি হ'লে
ডি-ডি-টি ছড়াইও।
বেলতে কিংবা পাটকাটি
উপর-ঢাকা দিও।
নিত্য প্রাতে ঝাঝরি দিয়া
চাতর ভিজাইবে।
অষ্টদিন পরে ভাই রে
চারা বাহির হবে॥
বীজ বোনার দোষে চারা
ঘন-পাতলা হ'লে।
মায়া নাই ক'রে ঘন
চারা দিবে তুলে॥
চার হ'লে তিন পাতা
ঢেলে দিবে জল।
একেবারে ডুবাবে না,
ভিজাবে কেবল॥

বোশেখের নিঠুর রোদে
ওপর দিও মাচা।
আউশ ঝালের চাষ কর
ভাল চাষার বাছা॥
আউশ ঝালের স্বভাব কিছু
ভাল ক'রে শুনো।
রোদে ফলে ঝোল আনা
ছায়ায় ফলে দুনো॥
(ধরতা)
ওরে—ফুলপরীদের দল,
তোরা বোরকা প'রে
নাচিস কেন বল?
ভানুর চোখে ঝলছে তোদের
রূপরাশি ঝলঝল॥
পয়লা জন্মের দিন, ভায়া,
ঝাল রোয়ার দিন।
তেজী চারা লও না তুলে
বাদ দিয়ে যাও ক্ষণিগ॥
আড়ে দিঘে দুই হাত
অন্তর রুয়ে যাও।
রোয়ার কালে চারার গোড়া
জোরে এটে দাও॥
পাতা ধ'রে টেনে দেখ
পাতা ছিঁড়ে যায়।
তা হ'লে তো চারা রোয়ার
ভুল থাকে না তায়॥
পাতার টানে যদি ভাই রে
চারাতা উপড়ায়।
তা হ'লে তো চারা রোয়ার
দোষ হয়ে যায়॥
রোদ হ'লে ভাই সকাল-সাঁঝে
গোড়ায় দেবে জল।
সস্তা গেলে চৌকো নালা
কাটো তরুণ দল॥
নালা কেটে ঝালের ক্ষেতের
সমান করো পিট।

বঙ্গদ্রষ্টব্য : ১০ম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

সন বছরে ঝাল বেচে ভাই
কাটতে হবে ইট ॥
বর্ষাকালে জল বসিলে
মাটি যায় গ'লে।
সাথে সাথে গাছগুলো যায়
যমের বাড়ি চ'লে ॥
কাহন-প্রতি তিন পণ চারা
ঘন প'দুতে রাখো।
মাঠে মাঠে ঝালের চাষে
“অ্যাডিশনাল” থাক্ ও ॥
যেটা মরে তার জায়গায়
একটা দেবে ধ'রে।
ভাল চাষার ভয় কী বল
গাছ যদি যায় ম'রে ॥
পেখম ধ'রে ময়ূর নাচে
আষাঢ় মাসের শেষ।
কল মোড়া দে' ঝাল তুলে যাও
ভাই রে আমার বেশ ॥
আউশ ঝাল ক্ষেতে কিন্তু
বারো মাসই ফলে।
তবে, ফলগুলি তেজী হয়
বর্ষার জলে ॥
ছি'ড়ে গুড়ে ঝাল তোলে ভাই
গাছে কণ্ট পায়।
শিকড়েতে টান পড়ে নয়
ডগা ছি'ড়ে যায় ॥
ঝালক্ষেতের কায়দা বেড়ায়
সার্থক মেহনত।
অকারণে প্রবেশ-নিষেধ
যেন আদালত ॥
দশ কাঠা ঝালের ক্ষেতে
হাজার টাকা আয়।
ভাল চাষার অল্প জমি
ব'সে ব'সে খায় ॥
বর্ষা-পরে কতকাল আর
জমি পতিত রয়।

হেমন্ত ঋতুতেও আউশ
ঝালের চাষ হয় ॥
হৈমন্তিক আউশ ঝালে
শীতে দিও সেচা।
বৈশাখের পয়লা তারিখ
আরম্ভ ঝাল বেচা ॥
আউশ ঝালের চাষ ক'রে যাই
অল্পেপতে সমাধা।
আমন ঝালের জারি শোন
ভাল আমার দাদা ॥

(গান)

রূপের হাট বসেছে গগনতলে
মধুর লগনে।
বাঙলামায়ী অঁচিল পেতে
ডাকছে সঘনে ॥
সন্ধ্যাতারার ঝালর কাটা
পূর্ণ চাঁদের চুম্বিক আঁটা
আ মরি কী রূপের ছটা
রামধনুর লাথ গুণে ॥

(ধরতা)

রূপের তৃষা মিটে গেল
রাজার ষড়্‌গল নয়নে।
ভবের রূপগুলো কি ফুটল
বাঙলা বধুর বয়ানে ॥
হলদা ঝালের চাষের জারি
শুন চাষীভাই।
নয় ইণ্ডি লম্বা সে ঝাল
তোমার দোষ নাই ॥
পাটনাই ঝাল তথৈবচ
হলদার চেয়ে সরু।
পেটের জ্বালায় কাজ কোরো না
বাঙ্গাকল্পতরু ॥
বাছাই বীজ বেছে বেছে
করবে আমন ঝাল।

বগা ঝালের চাষ ক'রে ভাই
 ভুগবে কত কাল॥
 ভাদর মাসের পয়লা দিকে
 আদর মাটি জানি।
 আচ্ছা ক'রে কোপাও ভায়া
 ঝালের চাতরখানি॥
 রোদে মাটি শুকাইয়া
 গেলে ভালমতে।
 পুনরায় কোপাও তারে
 নিজের মেহনতে॥
 মাটি-সমান ক'রে তাতে
 দানা ছড়াইও।
 অর্ধ সিকি ইঞ্চি মাটি
 ওপরে রাখিও॥
 যত গুণ তত দোষ
 ওপর ঢাকা দিলে।
 ঢেকে ঢুকে রেখে চাতর
 অতি বর্ষা হ'লে॥
 ভাদরের চাতরে ভাইরে
 চারা হয় অতি।
 ঝাল রোয়া ক্ষেতের কথা
 শুন শ্রুভমতি॥
 অতিরিক্ত চষা জমির
 গাছের রোগ নাই।
 রোগে পোকায় সরকারের
 যোগ রাখা চাই॥
 সার মাটি সুপারফসফেট
 আর হাড়ের গুঁড়া।
 চষার আগে সারা জমি
 ছড়া রে, ভাই, ছড়া॥
 প্রথম আশ্বিন মাস
 শরতের কাল।
 আড়ে দিঘে দেড় হাত
 রোবে আমন ঝাল॥
 চাতরের আধা চারা
 তেজী বেছে নিও।

হীন-তেজা চারাগুদলি
 তুলে ফেলে দিও॥
 “অ্যাডিশনাল” চারা কিছু
 হাপরে রাখিও।
 আমন ঝালের টাকায় ভাই রে
 সদ্য কোঠা দিও॥
 (ধরতা)
 গাঁয়ের মাটির তলায় মোদের
 সোনার জাহাজ চলে।
 গাছগাছালের মুখ দিয়ে ভাই
 তাইতে সোনা ফলে॥
 গ্রাম নহে ভাই, আমাদেরই
 হাতে গড়া ছবি।
 নিত্য প্রাতে হাসি ছড়ায়
 স্বাধীন দেশের রবি॥
 জাগো রে ভাই কৃষকসমাজ
 ধন্য কৃষিকার।
 এই কৃষি যে আঁধার যুগের
 প্রথম আবিষ্কার॥
 এমন একটা যুগ ছিল ভাই
 ছিল না চাষবাস।
 মানুষেরও পশুর মত
 কাটত বারো মাস॥
 জঠরজদালায় কাতর হয়ে
 নর বেড়াত ছুটে।
 পশুপাখির মত সবে
 খেত ছিঁড়ে খুঁটে॥
 আদিম মানবের এই
 প্রথম আবিষ্কার।
 জঠরজদালায় শান্তি হ'ল
 এল কৃষিকার॥
 সেই থেকে মাটি সেবে
 মাটির মানুষ যারা।
 মাটিই যে মানুষের
 মাটি বিশ্বের সারা॥

বলদ্বন্দ্বী : ১০ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা

যে মাটিতে মসজিদ-মন্দির
গীর্জা বানাইলে।
যে মাটিতে যীশু-কৃষ্ণ-
মহম্মদ পাইলে॥
কোরান-পুরাণ-বাইবেল পড়
যে মাটিতে বসে।
যে মাটিতে খোরাক-পোশাক
পাচ্ছ বারো মাসে॥

সেই মাটির সেবাতে ভাই
শান্তি পাবে সবি।
চাঁদ সদরুজে বদকে তোমার
জ্বলবে অমর ছবি॥
মাটির ভাঙে সাগরের জল
মাপিতে না পারি।
গোলাম আকবর বলে সাঙ্গ
ঝাল-চাষের জারি॥



ভারতের লেবু

শ্রমরগতীত কাল থেকে দার্জিলিঙ, আসামের হিমালয়ের নিকট-অঞ্চল, মালয় এবং দক্ষিণ-চীনে কমলা, শরবতি, পাতি, গন্ধ প্রভৃতি নানা রকম লেবুর চাষ হয়ে আসছে। পৃথিবীর উষ্ণ এবং নাতিশীতোষ্ণ বহু অঞ্চলের যথোপযোগী জলবায়ুর জায়গায় লেবুর চাষ ক্রমশ এইসব জায়গা থেকেই ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতের ফলসম্পদে ব্যাপকতার দিক দিয়ে আম আর কলার পরে তৃতীয় স্থান অধিকার করে আছে লেবু। ফলের চাষ এদেশে মোট যত জমি জুড়ে রয়েছে তার শতকরা প্রায় ছয় ভাগই লেবুর অধিকারে।

ঔষ্ধবিজ্ঞানে কমলা শরবতি পাতি গন্ধ প্রভৃতি সব রকম লেবুই এক “রুটাসী”র [Rutaceae] পরিবারভুক্ত।

সবচেয়ে উপাদেয় সুস্বাদু, সুন্দর রসাল আর পুষ্টিকর হচ্ছে কমলালেবু আর শরবতিলেবু। কাজেই খাদ্যজগতে এ দুটোর বিশেষ কৌলীনি। কমলালেবু আর শরবতিলেবুতে ভিটামিন-সি রয়েছে প্রচুর, তা ছাড়া এ আর বি ভিটামিন ভালই আছে। ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ ছাড়াও এসব লেবুর রসে রয়েছে ফলজ চিনি, ফলজ অম্ল, ধাতব পদার্থ (ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও লৌহ) এবং ক্ষার-লবণ—যেসব উপাদান মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ পুষ্টিকর।

ভারতে কমলালেবু আর শরবতিলেবু তাজা ফল হিসাবে তো খাওয়া হয়ই, তা ছাড়া স্বাদু-স্নিগ্ধ পানীয় তৈরি করতে এগুলোর রসও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। প্রাতরাশে নিয়মিত এই দু’রকমের যে-কোন লেবু খেলে স্বাস্থ্য অটুট থাকে। এসব লেবু চুষে চিবিয়েই খাওয়া হোক বা রস করেই খাওয়া হোক—তাতে ক্ষুধাভূক্ষা দুইই দূর হয়। দু’রকম লেবুরই খোসার ভিতর-পিঠের সাদা

অংশটা এবং কোয়ার পাতলা ছাল যদি রসের সঙ্গে খেয়ে নেওয়া যায়, তাতে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয় এবং এগুলোর সারক গুণ আমাদের শরীরের ভিতরটাকে পরিষ্কার রাখে।

পাতিলেবু আর গন্ধলেবু খাদ্যপ্রাণে, খনিজপদার্থে ও ক্ষারলবণে শরবতি আর কমলালেবুর মতই সমৃদ্ধ, কিন্তু পাতি আর গন্ধ লেবুর রসে মিষ্টতা নেই বা অতি সামান্যই আছে। এই দু’রকম লেবুই খুব টক, কাজেই তাজা ফল হিসাবে খাওয়া যায় না। ডাল, তরকারি এবং নানা রকম খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে এগুলোর রস খাওয়া হয়। এগুলোর রসের সুগন্ধে খাদ্য বেশ সুগন্ধও হয়। পাতিলেবু আর গন্ধলেবুর রস চিনির সঙ্গে মিশিয়ে অতি উৎকৃষ্ট পানীয় বা শরবত তৈরি করা যায়। মুখ-রোচক আচার-তৈরিতে ভারতের সর্বত্র পাতিলেবু আর গন্ধলেবু ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে।

লেবুর ভিতরের সাদা পর্দাটার আবরণের মধ্যে যে সরু সরু রসথলে বা রসদাঁড়াগুলো রয়েছে, তার দরুন মোরস্বা আর জেলি তৈরি করার খুব সুবিধা হয়। শুধু লেবু দিয়েই মোরস্বা আর জেলি তৈরি তো হয়ই, যেসব ফলের ভিতরে রসদাঁড়া কম রয়েছে, লেবুর সহযোগে সেগুলোরও মোরস্বা আর জেলি তৈরি করা চলে।

লেবুর খোসা থেকে যে তেল পাওয়া যায়, তা দিয়ে খাদ্য সুগন্ধী করা হয়। পাতিলেবু আর গন্ধলেবু থেকে লেবুর আরক তৈরি করা হয় এবং কারবারী-ভাবে প্রচুর পরিমাণে তার উৎপাদন হয়। পাতিলেবু আর গন্ধলেবুর রস প্রকৃতিজাত প্রসাধনদ্রব্য। পোষক দ্রব্য হিসাবে এটা চুলে এবং গায়ের চামড়ার উপর মাখাবার উৎকৃষ্ট উপাদান। জলের সঙ্গে মিশিয়ে মুখের অভ্যন্তর ধৌত করার পক্ষে লেবুর রস বিশেষ উপকারী জিনিস।

শরবতিলেবু তর কমলালেবু

শরবতিলেবু আসলে কমলালেবুরই জাতভাই। ইংরেজীতে দুটোকেই ‘অরেঞ্জ’ বলা হয়। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে শরবতিলেবুর নাম “সাইট্রাস্ সিনেন্সিস্” এবং কমলালেবুর নাম “সাইট্রাস্ রেটিকুল্যাটা”। বোম্বাই অঞ্চলের ‘মোসাম্বি’, পাঞ্জাবের ‘মাল্টা’, দক্ষিণভারতে ‘সাথ্‌গুড়ি’—এসব হচ্ছে শরবতিলেবু। এর খোসা ফলের গায়ে এঁটে থাকে। কমলালেবুর খোসা থাকে আলগাভাবে—অনায়াসেই তা ফল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া যায়। ভারতের মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কমলালেবুকে বলা হয় ‘সান্তা’। দার্জিলিং ও আসাম নাগপুর প্রভৃতি জায়গার কমলালেবু আমাদের সুপরিচিত।

শরবতিলেবু আর কমলালেবুর গঠনে বেশ খানিকটা পার্থক্য আছে। শরবতিলেবু আকারে সাধারণত গোল বা লম্বাটে গোল এবং ওজনে ভারি। এর খোসা চামড়ার মত ফলের গায়ে এঁটে থাকে। ভিতরে কোয়াগুড়ি একটার সঙ্গে অপরটা শক্তভাবে জুড়ে থাকে। ফলের ভিতরে কেন্দ্রস্থলটা ফাঁপা হয় না।

কমলালেবু আকারে গোল এবং তার দু’দিক—কোন কোন লেবুর এক দিক—চাপা। এর ওজন শরবতিলেবুর অনুপাতে হালকা। উপরের খোসা আলগা এবং সহজেই তা ছাড়িয়ে নেওয়া যায়—সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। ফলের ভিতরে কেন্দ্র-স্থলটা ফাঁপা এবং কোয়াগুড়ির একটা থেকে আর-একটা অতি সহজেই একেবারে আলাদা করে ফেলা যায়।

পাতিলেবু আর গন্ধলেবু

পাতিলেবুর গাছ ঝোপ-ধরনের, বেশি উঁচু হয় না আর তাতে অনেক কাঁটা থাকে। এর পাতা যেন দুইভাগে বিভক্ত; বোঁটার সঙ্গে যেন ছোট একটা গোল পাতা এবং তার উপরে জুড়ে রয়েছে বড় আর একটা পাতা—এই দু’ অংশে মিলে মোট একটি পাতা। এর ফুল ধবধবে সাদা, ফল ছোট, গোল

অথবা একটু লম্বাটে গোল। ফলের ব্যাস সাধারণত এক থেকে দেড় ইঞ্চি। এর খোসা খুব পাতলা, ফলের গায়ে এঁটে থাকে। এতে প্রচুর রস হয়—তার রঙ ফিকে সবুজমত, স্বাদ খুব টক। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে পাতিলেবুর নাম “সাইট্রাস্ আউরান্টি-ফোলিয়া—সুইংগল্”।

গন্ধলেবুর গাছ একটু বড় ধরনের। গাছে কাঁটা থাকে অপেক্ষাকৃত অল্প, পাতা অবিভক্ত আর আকারেও বড়। এর ফুলের রঙ একটু বেগুনি ধরনের। ফল বড়, ভারি, লম্বা আকারের—মাঝখান থেকে দু’দিকটা ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। এর খোসা পুরু এবং রসের রঙ ফিকে হলদেমত। স্বাদে এর রস পাতিলেবুর রসের চেয়ে কিছু কম টক। বাংলাদেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের বিভিন্ন স্থানে সুগন্ধী, কলবো, শেটে, গোঁড়া, জামির, কোরুন প্রভৃতি বহু নামে যে বহু রকমের লেবু দেখা যায়, তার সবই এ জাতের। বাতাবিলেবুর গাছ এবং ফল অনেক বড়, আকারও গোল, চাপা-গোল, চুড়া-গোল—নানা রকমের; তা হলেও গুণসাম্যে তা এই লেবুরই অন্তর্গত। উদ্ভিদবিজ্ঞানে গন্ধলেবুর নাম “সাইট্রাস্ লিমোনিয়া—ওস্বেক্”।

শরবতি ও কমলা লেবুর চাষ

যে রকম জলবায়ুতে শরবতিলেবু জন্মায়, ঠিক সেই ধরনের জলবায়ু কমলালেবুর চাষের পক্ষে উপযোগী নয়। শরবতিলেবুর পক্ষে উপযোগী হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর অঞ্চল—যেখানে হাওয়াটা শুকনো, গ্রীষ্মটা নিভেজাল গ্রীষ্ম এবং শীতটা একান্তভাবেই শীত অর্থাৎ গ্রীষ্মের সঙ্গে শীতের মিশ্রণ নেই, তা ছাড়া বৃষ্টিও হয় কম। কমলালেবুর জন্য বাতাসে একটু জলীয় ভাগ থাকা চাই, গরমটা হওয়া দরকার উষ্ণাঞ্চলীয়, শীতকালে একটু গরমের ভাব থাকলে ভাল হয় এবং বৃষ্টিপাত হওয়া দরকার একটু বেশি। কাজেই দু’ রকম লেবুর চাষের জলবায়ুগত আলোচনা আলাদাভাবে করা যাক।

শরবতিলেবদুর জলবায়ু

পশ্চিম ভারতে উচ্চ শ্রেণীর মোসাম্বিক চাষ হয় দক্ষিণাত্যের শূকনো আবহাওয়ায় সেচ-পাওয়া জমিতে, পূনা আমেদাবাদ ও হায়দরাবাদের কাছাকাছি অঞ্চলে—সমুদ্রসমতল থেকে ১,৮০০ হ'তে ২,০০০ ফুট উঁচুতে। এসব জায়গায় সারা বছরে শূদ্ধ জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ২০ থেকে ৩০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। আবহাওয়ায় আপেক্ষিক আর্দ্রতা শতকরা ৫০ ভাগ। তাপমাত্রা সবচেয়ে উচ্চ ওঠে এপ্রিল-মে মাসে—১০৫ থেকে ১০৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত এবং সবচেয়ে নিচে নামে জানুয়ারি মাসে প্রায় ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত।

তেমনি, দক্ষিণ ভারতে উচ্চশ্রেণীর 'সাথ্‌গুডি' শরবতিলেবদুর চাষ হয় শূকনো অঞ্চলের কুড্ডাপা, কুর্নুল, রয়ালসিমার চিতুর এবং উত্তর সিকারে—সেচ-পাওয়া জমিতে।

উত্তর ভারতে 'মাল্টা' নামক শরবতিলেবদুর চাষ হয় প্রধানত পাজাব, পেপসু, রাজস্থানের উত্তর অঞ্চল এবং উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলে। এসব জায়গায় গ্রীষ্মকালে গরম আর শীতকালে ঠান্ডা পড়ে প্রচণ্ড। পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতের অনেক জায়গায় চেয়ে এসব জায়গা অনেক বেশি শূকনো। শূদ্ধ জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্তই এসব জায়গায় বৃষ্টি হয় এবং সেই বৃষ্টির মাত্রার তারতম্য ঘটে ৮ ইঞ্চি থেকে ৩০ ইঞ্চি পর্যন্ত। গ্রীষ্মকালে এসব জায়গায় জ্বালাকর প্রচণ্ড গরম পড়ে এবং শীতকালে হালকা তুষারপাত হয়। গ্রীষ্মকালে মে মাসে তাপমাত্রা ওঠে ১১৮ ডিগ্রি পর্যন্ত, ওদিকে আবার শীতকালে জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা ষতটা নিচে নামলে জল জমে বরফ হয় তার চেয়েও দু' ডিগ্রি নেমে যায় এবং এ সময়ে দিন-কয়েক তুষারপাত হয় কোন কোন বছর।

যেসব অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি হয় এবং আবহাওয়ায় আর্দ্রতা বেশি থাকে, সেসব জায়গায় শরবতিলেবদুর গাছে ফলন ভাল হয় না। এরকম জায়গা হিসাবে

ককণ, মালাবার, ত্রিবাংকুর-কোচিন, মহীশূর, তামিলনাদ, বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার নাম করা যেতে পারে। এসব অঞ্চলে বছরের বিভিন্ন সময়ে গাছে অনিয়মিতভাবে ফুল হয়, ফল ঠিকমত রঙ ধরে না আর ভাল ক'রে পাকেও না। তাতে ফলের স্বাদও হয় একেবারে জোলো।

কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, ভারতে শরবতি লেবদুর চাষ করা যেতে পারে অপেক্ষাকৃত শূদ্ধ এবং স্বল্প-আর্দ্র অঞ্চলে যেখানে বছরে ৩০ ইঞ্চির বেশি বৃষ্টি হয় না, গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গরম আর শীতকালে অতিমাত্রায় ঠান্ডা পড়ে, এবং দিনের আর রাতের তাপের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য রয়েছে।

পাজাবে মাল্টা লেবু, দেখা যায়, গ্রীষ্মকালে বেশ গরম আর শীতকালে মাঝে মাঝে যে বরফ-জমা ঠান্ডা পড়ে তাও সহ্য করতে পারে। ভাকরা-নাংগাল পরিকল্পনার খাল যেসব এলাকা দিয়ে যাচ্ছে, পাজাব আর রাজস্থানের সেইসব শূকনো এলাকায় এ লেবদুর চাষ ভালই চলতে পারে। পাজাবের সমতল অঞ্চলের আবহাওয়া শরবতি লেবদুর চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। রাজস্থানে জয়পুর, বিকানির, জয়-সালমির এবং কোটা জেলায় শরবতিলেবু জন্মাতে পারে। তেমনি পেপসু, উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল, মধ্যভারতের কতকগুলি অংশ, সৌরাষ্ট্রের উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ—এইসব জায়গায় যেখানেই সেচের জল পাওয়া যায় সেখানেই চলতে পারে শরবতি লেবদুর চাষ।

কমলালেবদুর জলবায়ু

দক্ষিণ ভারতে সম উষ্ণমণ্ডলীয় কুর্গ ও মালাবারের ওয়াইনাদের গরম ও আর্দ্র অঞ্চলে, নীলগিরির নিচের ঢালুতে, এবং ইয়েরকৌদ পাহাড়ে ২,০০০ থেকে ৫,০০০ ফুট পর্যন্ত উঁচুতে বিনা সেচে প্রচুর কমলালেবদুর চাষ হয়। এসব জায়গায় এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সমানভাবে প্রায় ৬০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়।

বঙ্গবন্ধু : ১০ম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

তেমনি আসামেও বৃষ্টির জল পেয়ে খাসিয়া পাহাড়ের খাড়াই ঢালদুতে প্রায় ৩,০০০ ফুট উঁচুতে কমলালেবু জন্মায়। এ অঞ্চলে মার্চ থেকে নবেম্বর মাস পর্যন্ত সমানভাবে প্রায় ১০০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। আসামে এবং দক্ষিণ ভারতের পূর্বোক্ত জায়গাগুলি ছাড়া এদেশের আর সর্বত্রই কমলালেবুর চাষে জল যোগাবার জন্য সেচ দেওয়া অপরিহার্য।

কমলালেবুর, এবং শরবতিলেবুরও, ভাল ফলন আর ভাল ফল হয় বোম্বাই, দক্ষিণাত্য ও হায়দরাবাদের সমস্ত শুষ্ক অঞ্চল জুড়ে, ১,৫০০ থেকে ২,৫০০ ফুট উঁচুতে। এসব জায়গায় জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মাত্র ২০ থেকে ৩০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় এবং এপ্রিল-মে মাসে সর্বোচ্চ তাপ ওঠে ১০৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত আর ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে সর্বনিম্ন তাপ নেমে যায় প্রায় ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে।

ভারতে কমলালেবু জন্মাবার সবচেয়ে বড় আর গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হচ্ছে নাগপুরের চারপাশে এবং মধ্যপ্রদেশের অমরাওতি, আকোলা, ওয়ার্ধা ভাণ্ডারা প্রভৃতি পাশাপাশি জেলাগুলোতে ১,০২৫ ফুট উঁচুতে প্রায় ২৫,০০০ একর জুড়ে। এ অঞ্চল শুষ্ক এবং উষ্ণ। এখানে বছরের মধ্যে বৃষ্টি হয় জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ৪৫ ইঞ্চি, গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা শতকরা ৫৩ ভাগ, সবচেয়ে বেশি গরম পড়ে মে মাসে ১১৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত এবং তাপ সবচেয়ে নেমে যায় জানুয়ারি মাসে প্রায় ৪৩ ডিগ্রি ফারেনহাইটে। পাঞ্জাবের সমতল অঞ্চলে যেখানে শুধু শরবতিলেবুই ভাল হয় আর কমলালেবু হয় ভীষণ টক, সেখানকার আবহাওয়ায় গরম আর শীতের পার্থক্য অনেকখানি। মধ্যপ্রদেশে কিন্তু সে তুলনায় গরম আর শীতের পার্থক্য ঢের কম। মধ্যপ্রদেশে কখনও তুষারপাত হয় না, গরম প্রবল হাওয়া বয় না এবং বৃষ্টিপাতও অনেক বেশি। এই এলাকায় যে চমৎকার কমলালেবু জন্মায়, নাগপুরী কমলালেবু নামে সর্বত্র তার প্রখ্যাতি।

পশ্চিম পাকিস্তানের যেসব শুষ্ক অঞ্চলে খালের জল থেকে সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, সেসব

জায়গাতে চাষ করে দেখা গেছে যে, কমলালেবু স্বল্পস্থায়ী তুষারপাতের আবহাওয়া সহ্য করতে পারে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে, বিশেষ করে দক্ষিণ এলাকায়, ফলের গায়ে রোদপোড়া দাগ হয়। সেচের জল পাওয়ার ফলে সেখানে কমলালেবুর গাছ জন্মায়, সে গাছে ফলও ধরে প্রচুর, কিন্তু অপরিণত অবস্থায় অনেক ফল করে পড়ে এবং ফল বিশ্রী রোদপোড়া হয়ে যায়। পাঞ্জাবের পূর্ব অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা পাহাড়ী এলাকায় কাণ্ডরা জেলার ইন্দপুর, ইন্দোরা ও নূরপুরে ২,০০০ ফুট উঁচুতে কমলালেবু ভালই জন্মায় বলে জানা গেছে; এসব জায়গায় বছরের মধ্যে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ৬০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়।

ভারতে কমলালেবু চাষের প্রধান কেন্দ্রগুলির জলবায়ু সম্বন্ধে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এদেশের উপমহাদেশ-অঞ্চলে, এবং উত্তর ও পূর্ব ভারতের পাহাড়ী এলাকার ২,০০০ থেকে ৩,৫০০ ফুট পর্যন্ত উঁচুতে, বার্ষিক ৩০ থেকে ১০০ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টিপাতে লেবুর চাষ কমবেশি ভালভাবেই করা যায়।

পেপসু এবং উত্তরপ্রদেশের পাহাড়ী এলাকাগুলোর জলবায়ু পাঞ্জাবের কাণ্ডরা জেলার জলবায়ুরই অনুরূপ, কাজেই এসব জায়গাতেও লেবুর চাষ ভালভাবেই চলতে পারে। উড়িষ্যায় গ্রীষ্মকালে গরম বেশি পড়ে, শীতকালেও একটু গরম-ভাব থাকে, বৃষ্টিপাত হয় বছরের মধ্যে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ৫৭ ইঞ্চি—এ রাজ্যেও কমলালেবু-চাষের সুপারিশ করা যায় দৃঢ়ভাবেই।

মধ্যভারত এবং রাজস্থানের শুষ্ক ভূমিতেও কমলালেবুর চাষ ছোটখাট আকারে চালু করা যেতে পারে। তবে ওসব জায়গায় গ্রীষ্মকালে গরম ঝোড়ো হাওয়া বয়, তার আঘাত থেকে কমলালেবুর গাছ বাঁচিয়ে রাখা শক্ত। বাগানের বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে শিশাম গাছ লাগিয়ে উঁচু রক্ষাবলয় তৈরি করে ঝোড়ো হাওয়া ঠেকাবার বন্দোবস্ত করে তবে কমলালেবুর চাষ করা উচিত।

[ক্রমশ]

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান খাদ্যপরিস্থিতি

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-সরবরাহের প্রশ্নটি সকলেরই উৎকণ্ঠার বিষয়। কিছুদিন ধরেই কোনও কোনও মহল থেকে এমন কথা উঠছে যে, সরকার খাদ্য-পরিস্থিতির জটিলতা উপলব্ধি করতে পারেন নি। অনেকে আবার এমন অভিযোগও করছেন যে, সরকার লোককে ধোঁকা দিচ্ছেন এবং খাদ্য-পরিস্থিতি আয়ত্তে আছে এই কথা বারবার বলে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিভ্রান্ত করেছেন। একথা সত্য যে, সরকার তাঁদের অসুবিধাগুলি বলে বেড়ান নি; কারণ, তাঁরা মনে করেন যে, এর ফলে দেশে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। প্রকৃত অসুবিধা ও সংকটের সঙ্গে যদি মানসিক আতঙ্ক দেখা দেয় তা হলে এর প্রতিক্রিয়া আরও খারাপ হয়। একথাও শোনা গেছে যে, যেহেতু সরকার অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি, সেইহেতু তাঁরা সময়মত পর্যাপ্ত খাদ্য ও অন্যান্য আবশ্যিক দ্রব্য খোলা-বাজার থেকে কিনে রাখেন নি। যাঁরা এ ধরনের অভিযোগ করেন তাঁরা বোধ হয় জানেন না যে, কোনও রাজ্যে যখন খাদ্যশস্যের পর্যাপ্ত উৎপাদন হয় না, তখন খাদ্য সংগ্রহ করে রাজ্যের শৃঙ্খল কোনও একটি অঞ্চলের চাহিদাই মেটানো সম্ভব হয়—সেই রাজ্যের সমস্ত জায়গার অভাব মেটানো সম্ভব নয়। পরন্তু রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থা এর ফলে আরও খারাপ হয়। মজুত মাল আটক রাখার প্রশ্নও সময় সময় উঠেছে। এ ব্যাপারে, সম্ভবস্থলে রাজ্যসরকার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে খাদ্যশস্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। এটা ঠিক যে, সমৃদ্ধ খাদ্যশস্যের উপর নিয়ন্ত্রণ ছাড়া ব্যাপক সংগ্রহ চলতে পারে না। দেশের লোক খাদ্যশস্যের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও 'রেশনিং' মোটেই চান না। সুতরাং রাজ্যসরকার এক মধ্যপথ

অবলম্বন করেছেন। সরকার বিগত কয়েক বছর ধরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন-বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। এর উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে বর্ধিত হারে খাদ্যশস্যের সরবরাহ পেয়েছেন এবং এসব উপায়ে বর্তমান পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন।

এ বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে আমন শস্যের শোচনীয় ক্ষতি হয়েছে। অনুমান করা যায়, এ বৎসর ৩০,৫২,৬০০ টন আমন ফসল পাওয়া যাবে। এটা অবশ্য প্রাথমিক পূর্বাভাস। গত বৎসর ৩৯,৪১,৫০০ টন আমন ফসল পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত গত পাঁচ বছর ধরে গড়ে ৩৬,৬৫,৬০০ টন আমন ফসল পাওয়া যায়। অবশ্য ১৯৫৩-৫৪ সালে সবচেয়ে বেশি ফসল ফলে। সেবার ৪৬,৭৯,৮০০ টন আমন ফসল হয়।

গত বৎসর বন্যা হলেও এবারের তুলনায় গত বারে আমন ফসলের উৎপাদন অনেক বেশি হয়। অবশ্য বন্যার চেয়ে অনাবৃষ্টিতেই ফসলের বেশি ক্ষতি হয়। ১৯৫৮ সালে আউশ ও বোরো ধান মিলে মোট ফলন ৩৪,৫২,২০০ টন হবে বলে আশা করা যায়। ১৯৫৭ সালে এর পরিমাণ ছিল ৪৩,৩৬,৭০০ টন। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বিহারের অঞ্চলগুলির উৎপাদন এর মধ্যে ধরা হয় নি। ১৯৫৮ সালে চা'ল ছাড়া অন্যান্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১,০৩,৪০০ টন হবে বলে আশা করা যায়। বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত অঞ্চলের উৎপন্ন ৩,০০,০০০ টন ফসল পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদনের সঙ্গে যোগ দিলে মোট উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ দাঁড়াবে ৩৮,৫৫,৬০০ টন। বাড়তিপড়তি বাদ দিলেও এবার প্রায় ৩৪,৭০,১০০

টন খাদ্যশস্য ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত এলাকার লোক-সংখ্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মোট লোকসংখ্যা হল ২ কোটি ৯৭ লক্ষ। দৈনিক যদি প্রাপ্তবয়স্কদের মাথাপিছু ১৫.৩ আউন্স খাদ্য প্রয়োজন হয় বলে হিসাব ধরা যায়, তা হ'লে শিশু ও রোগীদের বাদ দিয়ে প্রায় ৩ কোটি লোকের বছরে ৩৮ লক্ষ টন খাদ্যশস্য প্রয়োজন হবে। এ হচ্ছে সর্বনিম্ন পরিমাণ। আমরা জানি যে, পল্লী-অঞ্চলে অনেক লোক দৈনিক ১৫.৩ আউন্সের বেশি খাদ্য গ্রহণ করেন। পূর্ণ চাহিদা মেটাতে হ'লে উপরি-উক্ত ৩৮ লক্ষ টনের উপর আরও শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ খাদ্যশস্য প্রয়োজন হবে। এ হিসাবে সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গের জন্য ৪৬.৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন। আর সেই হিসাবে ১২ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি হবে।

এখন সমস্যা হচ্ছে কী ক'রে এই ঘাটতি পূরণ করা যায়। ১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার মোট ৬,২৫,০০০ টন খাদ্যশস্য পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ করেছিলেন। এর মধ্যে ১,২৫,০০০ টন চাল ও ১,৫০,০০০ টন গম সরকারী খাতে এবং ৩,৫০,০০০ টন গম ব্যবসার মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। রাজ্যের শস্য-সরবরাহের ঘাটতি মেটাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১৯৫৮ সালের জন্য ১২ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সরবরাহের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সম্ভবত ঘাটতি মেটাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যে খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে তার মধ্যে চালের পরিমাণ বেশি থাকবে না। এও সম্ভব যে, চালের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার আরও অধিক পরিমাণে গম দেবেন। এ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের অন্নভোজী লোকের পক্ষে আরও অধিক পরিমাণে গম ব্যবহার করা অপরিহার্য।

এই প্রসঙ্গে গত রবিবার, ১৭ই নবেম্বর প্রধান-মন্ত্রী দিল্লিতে যে বিবৃতি দিয়েছেন তার উল্লেখ করা

যেতে পারে। তিনি কয়েকটি রাজ্যে বন্যা এবং অনাবৃষ্টির উল্লেখ ক'রে বলেন যে, চাল উৎপাদনের পরিমাণ এবার অনেক কম হবে। তিনি এই ঘাটতি মেটাবার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থারও নির্দেশ দিয়েছেন। দেশের খাদ্য-ঘাটতি মেটাতে আরও বেশি পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানির কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু এই আমদানিরও একটা সীমা থাকা উচিত। খাদ্য-শস্য বেশি পরিমাণে আমদানির অর্থই হচ্ছে আমাদের বৈদেশিক বিনিময়-সংগতির বেশি পরিমাণে ব্যবহার। তা ছাড়া, সমগ্র পৃথিবীতে যে চাল উৎপন্ন হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, খাদ্যশস্যের অপচয় বন্ধ করতে হবে এবং খাদ্যশস্যের স্বেচ্ছা সংরক্ষণ-ব্যবস্থা করতে হবে। হোটেল, রেস্টোরা বা এই ধরনের সংস্থাগুলিতে খাদ্যদ্রব্যের বিশেষত ভাতের অপচয় বন্ধ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী এই নির্দেশও দিয়েছেন যে, যে-অঞ্চলে সাধারণত লোকে বেশি গম ব্যবহার ক'রে থাকেন সেখানে চালের ব্যবহার একে-বারে কমিয়ে দিতে হবে যাতে সেই অঞ্চলের চাল যে-অঞ্চলে লোকে বেশি ভাত খায় সেখানে সরবরাহ করা যেতে পারে। বিকল্প খাদ্য গ্রহণ ও সুষম খাদ্য ব্যবহার আরও অধিক পরিমাণে করতে হবে। এ ছাড়া অবিলম্বে অল্পদিনের মধ্যেই যেসব শস্য ফলানো যায় সেসব শস্যচাষের কাজ আরম্ভ করতে হবে। কিছু কিছু মোটা শস্য, আলু, কলা প্রভৃতি অধিক পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে। এমনকি, ঘরের পাশের ছোট জমিটাতেও তরকারি ফলাতে হবে। কৃষিকাজের মাধ্যমেই প্রধানত টেস্ট রিলিফের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেছেন যে, খাদ্যশস্য মজুত রাখা মোটেই উচিত হবে না এবং মজুত বন্ধ করবার জন্য সরকারের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কতকগুলি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনার কথা বলেছেন। সেগুলি হ'ল আরও ভাল বীজ ব্যবহার, জাপানী প্রথায় ধানের

চাষ করা, আরও অধিক পরিমাণে সার ব্যবহার, সেচের জন্য আরও নলকূপ বসানো এবং ইঁদারা তৈরি করা।

যদি ধ'রে নেওয়া যায় যে, ১৯৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ২ লক্ষ টনের বেশি চা'ল পাওয়া যাবে না, তা হ'লে এখন দেখতে হবে যে, পশ্চিমবঙ্গে আরও অধিক পরিমাণে গম ব্যবহার করা সম্ভব কিনা। গম-ব্যবহারে লোকের উৎসাহ-বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৫ লক্ষ টন গম ব্যবহৃত হয়। এখন লোকে যদি আরও গম ব্যবহারের পক্ষপাতী হন, তা হ'লে তাঁরা চা'লের পরিবর্তে গম ব্যবহারে নিজেদের অভ্যস্ত ক'রে নিতে পারেন। আরও একটি বিশেষ কারণে লোককে আরও বেশি গম ব্যবহার করতে বলা যায়। গম খুচরা ছ' আনা সের দরে পাওয়া যায়। আর চা'লের দর হচ্ছে নয় আনা সের। আমাদের ঘাটতি অর্থনীতিতে খাদ্যশস্যের প্রতি সেরে তিন আনা কম খরচ হওয়াটা একটা বড় বিবেচনার বিষয়।

এই সম্পর্কে আমাদের এমন একটা সুস্বপ্ন খাদ্যের কথা ভাবতে হবে যা কেবল পর্যাপ্ত ক্যালরি-শক্তিই দেবে না মানুষের দৈনন্দিন কাজের জন্য পরন্তু তার স্বাস্থ্যের রক্ষণাবেক্ষণেও সাহায্য করবে। কয়েক বৎসর পূর্বে কেন্দ্রীয় পরিপোষণ-উপদেষ্টা সমিতি এ সম্বন্ধে (কেন্দ্রীয় পরিপোষণ গবেষণ-প্রয়োগ-শালার অধিকর্তাব্যয় ডাঃ পটুর্বার্ন ও ডাঃ আইক-রয়ডও এর উল্লেখ করেছেন) ইউরোপের প্রচলিত ভিত্তিতে একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের মান নির্ধারণ করেছিলেন। রাজ্যসরকারের পরিপোষণ-বিশেষজ্ঞ "অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব

পাবলিক হেলথ"এর পরিপোষণ-বিভাগের সঙ্গে আলোচনা ক'রে সাধারণ ১২৪ পাউন্ড ওজনের একজন বাঙালীর পক্ষে কতটা খাদ্য প্রয়োজন সে সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। নিম্নে বর্ণিত ১নং তালিকায় এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল। ২নং তালিকায় সুস্বপ্ন খাদ্যের তালিকা দেওয়া হ'ল—এ খাদ্য দেশের অনেকেই সংগ্রহ করতে পারেন। এর মধ্যে কিছু দুধ, ডিম আর মাছেরও ব্যবস্থা আছে। এক নম্বর তালিকার খাদ্য সকলের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। সুতরাং সুস্বপ্ন খাদ্য হিসাবে ২ নম্বর ও ৩ নম্বর তালিকা তৈরি করা হ'ল।

১নং তালিকা

১২৪ পাউন্ড ওজনের একজন বাঙালীর খাদ্যের প্রয়োজন নিম্নে দেওয়া হ'ল:

মোট ক্যালরি	২,৫০০	গ্রাম
প্রোটিন	...	৫৬ "
ফ্যাট	...	৪০ "
কার্বোহাইড্রেট	...	৪৭৫ "
ক্যালসিয়াম	...	৮০০ মিলিগ্রাম
গন্ধক	...	১,৫০০ "
সোড	...	১০ "
ক্যারোটিন	...	৩,৫০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট
ভিটামিন বি ১	...	১,০০০ মাইক্রোগ্রাম
নিকটিনিক অ্যাসিড	...	১৫ মিলিগ্রাম
রিবোফ্লাবিন	...	১,৫০০ মাইক্রোগ্রাম
ভিটামিন সি	...	৭৫ মিলিগ্রাম

২নং তালিকা

১নং আহার্য-তালিকা —প্রতিদিনের প্রয়োজন

খাদ্যদ্রব্য	পরিমাণ (আউন্স)	ক্যালরি	আনুমানিক ব্যয় টা: আ: পা:	খাদ্যের গড় মান
চা'ল ও গম	১৪	১,৩৭২	০ ৩ ০	প্রোটিন ৮২.৯ গ্রাম
ডা'ল	৩	২৯৬	০ ১ ০	ফ্যাট ৪২.২ "
পত্র-সবজি	৪	৭৮	০ ১ ০	কার্বোহাইড্রেট ৪৮৬.৭ "
অল্পাঙ্গ সবজি (আলু সমেত)	৬	১২৩	০ ২ ০	ক্যালসিয়াম ৭৫৩ "
একটি কলা	২	৮৬	০ ০ ৯	গন্ধক ১,৪৬৬ "
গুড়	২	২১৮	০ ০ ৬	লৌহ ৩০.৬ "
সবধের তেল	১	২৫৪	০ ১ ৩	ক্যারোটিন ৫,৪৪১ আন্তর্জাতিক ইউনিট
দুধ	৪	৭২	০ ১ ৬	ভিটামিন বি ১ ১,৬০৩ মাইক্রোগ্রাম
মাছ এবং মাংস	৩	১০৯	০ ৪ ৬	নিকটনিক অ্যাসিড ২২৯ মিলিগ্রাম
একটি ডিম	২	১০২	০ ২ ০	রিবোফ্লাবিন ৪২৯ মাইক্রোগ্রাম
				ভিটামিন সি ১১০ মিলিগ্রাম
মোট	৪১	২,৭১০	১ ১ ০	

দৈনিক খাদ্যে চাউলের পরিমাণ ১৫ আউন্স ধরে নিয়েই এ হিসাব ধরা হয়েছে। যদি এর মধ্যে গম ব্যবহার করা হয়, তা হ'লে খাদ্যের পরিপোষণ-মান বৃদ্ধি পাবে—বিশেষত প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও

লৌহ। এই খাদ্যে খাদ্যশস্যের পরিমাণ ২নং আহার্য-তালিকায় বর্ণিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ থেকে কম ধরা হয়েছে, কারণ দুধ, মাছ, ডিম প্রভৃতি আনুষঙ্গিক খাদ্যও এই তালিকায় ধরা হয়েছে।

৩নং তালিকা

২নং আহার্য-তালিকা —প্রতিদিনের প্রয়োজন

খাদ্যদ্রব্য	পরিমাণ আউন্স	ক্যালরি	আনুমানিক মূল্য আ: পা:	খাদ্যের গড় মান
চা'ল	১৫.৩০	১,৪৯৯	৩ ৩	প্রোটিন ৪৮.১ গ্রাম
ডা'ল	১.৫০	১৪৮	০ ৬	ফ্যাট ১১.৪ "
পত্র-সবজি	৮.০০	১৫৬	২ ০	কার্বোহাইড্রেট ৪৯১.৫ "
				ক্যালসিয়াম ৪৭১.৮ "
				গন্ধক ১,০০২.০ "
অল্পাঙ্গ সবজি (আলু সমেত)	৩.০০	৬২	১ ০	লৌহ ৪৫.০ "
				ক্যারোটিন ৯,২৫৮ আন্তর্জাতিক ইউনিট
				ভিটামিন বি ১ ১,৩৩৮ মাইক্রোগ্রাম
একটি কলা	২.০০	৮৬	০ ৯	নিকটনিক অ্যাসিড ১৯৯ মিলিগ্রাম
গুড়	২.০০	২১৮	০ ৬	রিবোফ্লাবিন ২২৮.০ মাইক্রোগ্রাম
সবধের তেল	০.২৫	৬৩	০ ৪	ভিটামিন সি ১৩৫ মিলিগ্রাম
মোট	৩২.০৫	২,২৩২	৮ ৪	

এক নম্বর আহাৰ্শ-তালিকা—যদি চালের পরিবর্তে কিছু গম ব্যবহার করা যায়, তা হলে খাদ্যের পরিপোষণ-মান বৃদ্ধি পাবে। বিশেষত প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও লৌহ।

দুই নম্বর আহাৰ্শ-তালিকা—এতে ফ্যাটের পরিমাণ কম। ৩ আউন্স সরষের তেলের বদলে এক আউন্স তেল অথবা ২ আউন্স ভাজা বাদাম খেলে প্রয়োজনীয় ফ্যাট পাওয়া যাবে। এতে অবশ্য আরও এক আনা বেশি খরচ পড়বে।

এসমস্ত খাদ্যদ্রব্য দেশে কত পরিমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব সে বিষয়ে পর্যালোচনা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে খাদ্যশস্য বরাদ্দের দাবি করা হয়েছে, তার যদি সমস্তটাই পাওয়া যায়, তবে দৈনিক ১৫.৩ আউন্স করে সকলের পক্ষে খাদ্যশস্য পাওয়া সম্ভব। এক নম্বর আহাৰ্শ-তালিকার হিসাবে হয়তো ৩ আউন্স করে ডাল পাওয়া যাবে না কিন্তু ২নং আহাৰ্শ-তালিকার হিসাবে ১ই আউন্স করে ডাল রাজ্যের উৎপাদন ও অন্যান্য রাজ্য থেকে আমদানি করে সরবরাহ করা যেতে পারে। পত্র-সবজি কতটা পাওয়া যাবে তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না, কিন্তু পল্লী-অঞ্চলে প্রত্যেকের পক্ষেই দৈনিক ৮ আউন্স করে পত্র-সবজি সংগ্রহ করা সম্ভব এবং উচিত। দুই নম্বর আহাৰ্শ-তালিকার হিসাবমত আলু এবং গুড় সরবরাহ সম্ভব। অবশ্য কিছুটা গুড় আমদানি করতে হতে পারে। অন্যান্য রাজ্য থেকে সাধারণত যে আমদানি হয়ে থাকে, তা নিয়ে ৩ আউন্স সরষের তেল সরবরাহ করা সম্ভব। সুতরাং এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১ নম্বর আহাৰ্শ-তালিকা অনুযায়ী খাদ্য সংগ্রহ করা সকলের পক্ষে সম্ভব না হলেও দুই নম্বর আহাৰ্শ-তালিকা অনুযায়ী খাদ্য সকলেরই পক্ষে স্বল্পমূল্যে সংগ্রহ করা সম্ভব।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ১৯৫৮ সালে আমন উৎপাদনের পরিমাণ হবে ৩০.৫ লক্ষ টন। এই

উৎপাদনের পরিমাণ থেকে যদি কোচবিহারের উৎপাদনের পরিমাণ বাদ দেওয়া যায় তা হলে দেখা যাবে, দেশবিভাগের পূর্বের ভিত্তিতে ১৯৫৮ সালে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ২০ লক্ষ টন। কোচবিহার দেশবিভাগের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

এখন দেখা যাক, অধিক শস্য ফলাবার বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে কোচবিহারের উৎপাদন বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা। আলোচনা করে দেখা যায়, খুব খারাপ আমনের বৎসরেও পশ্চিমবঙ্গে ২০ লক্ষ টন শস্য উৎপন্ন হয়েছে। ১৯৪০-৪১ সালের আমন-উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৮.৭৬ লক্ষ টন এবং ১৯৪২-৪৩ সালে এই উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৮.৩৭ লক্ষ টন। আর ১৯৫৮ সালে ২৯ লক্ষ টন শস্য উৎপন্ন হবে বলে হিসাব করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৫২-৫৩ সালের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ১০ লক্ষ টন বেশি শস্য উৎপন্ন হয়েছে। এই সাফল্যে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিবিভাগের কৃতিত্ব অনেকখানি।

গত তিনটি পাঁচসালী উৎপাদনের হিসাবও আমরা নিয়েছি। ১৯৪৬-৪৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসর, ১৯৫১-৫২ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসর এবং ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত উৎপাদনের হিসাব আমরা নিয়েছি। এর প্রত্যেকটি হিসাবেই কোচবিহারের উৎপাদনের পরিমাণ বাদ দেওয়া হয়েছে। হিসাবে দেখা যায়, ১৯৪৬-৪৭ সালের পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩২.২৭ লক্ষ টন। ১৯৫১-৫২ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ ৩৪.৭৩ লক্ষ টন এবং ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ হ'ল ৪১.৩৫ লক্ষ টন। এ থেকে দেখা যাবে যে, স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে চালের উৎপাদন নয় লক্ষ টন করে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উৎপাদন-বৃদ্ধি কম নয়—যদিও আমরা দৈনন্দিন জীবনে এর সার্থকতা বুঝতে পারি

না। এর কারণ হল, যদিও উৎপাদন শতকরা ২৮ ভাগ বেড়েছে, জনসংখ্যাও তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৭ সালে রাজ্যের লোকসংখ্যা ছিল ২ কোটি ২০ লক্ষ আর ১৯৫৭ সালে লোকসংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৭০ লক্ষ। এতে দেখা যায় একদিকে উৎপাদন যেমন বেড়েছে শতকরা ২৮ ভাগ, অপরদিকে জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ২২ ভাগ।

এ হিসাবের মধ্যে অবশ্য কোচবিহার আর পশ্চিম-বঙ্গে বিহার থেকে আগত এলাকার লোকসংখ্যার হিসাব ধরা হয় নি। যদি উৎপাদনের ভাগ শতকরা ২৮ ভাগ না বেড়ে যেত, তা হ'লে এই শতকরা ২২ ভাগ জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে দেশে খাদ্য-পরিস্থিতি আরও জটিল হ'ত। এই অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়েছে সার প্রয়োগ, ভাল বীজ লাগানো, জমির উন্নয়ন, আধুনিক ধরনে চাষাবাস এবং বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থার ফলে। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, কৃষির উন্নতির জন্য এ ধরনের সাহায্যের পরিমাণ আমাদের আরও বাড়াতে হবে। স্বাধীনতার পূর্বে দেশে শতকরা ১৭ ভাগ জমিতে সেচের জল পাওয়া যেত। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে শতকরা ৩১ ভাগ জমিতে সেচের জল পাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

খাদ্যশস্য সরবরাহ ছাড়া, খাদ্যশস্যের মূল্য সম্বন্ধেও জনসাধারণ উৎকণ্ঠিত। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে গিয়েছে। আমাদের ভেবে দেখতে হবে কেন আমরা জীবনযাত্রার ব্যয় কমাতে পারি নি। দেশ বর্তমানে ব্যাপক শিল্পায়নের ভিতর দিয়ে চলেছে। শিল্পোন্নয়নে অনগ্রসর এই দেশে দিনের পর দিন শিল্পের প্রসার হচ্ছে। এ অবস্থার সম্মুখীন সমস্ত দেশকেই একদিন মূল্যবৃদ্ধি-জনিত অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়াতেও এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এ ধরনের মন্তব্যে হয়তো জীবন-যাত্রার ব্যয় কমবে না কিন্তু এ থেকে মানসিক সান্ত্বনা

পাওয়া যাবে। ক্রমবর্ধমান শিল্পোন্নতির সময় আমরা কিছুটা অসুবিধা ভোগ করছি বটে কিন্তু শিল্পের প্রসারলাভের পর আমরা সুদিনের মুখ দেখব বলে আশা রাখি।

গত বৎসর আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ছয় লক্ষ টন খাদ্যশস্য সাহায্য হিসাবে পেয়েছি। এই অধিকতর কেন্দ্রীয় সাহায্যের ফলে দেশে অনাবৃষ্টি-জনিত খাদ্য-ঘাটতির বাজারে মদ্রাস্থিতি কতকটা আয়ত্তে রাখা গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী এ বৎসর আসাম, উড়িষ্যা এবং অন্ধ্র নিজেদের রাজ্য থেকে চালের রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে।

সময়ে সময়ে ১৯৫৫ সালের অত্যাবশ্যক দ্রব্য আইনটির সাহায্যে স্থানীয় চাল-কলগুলি থেকে চাল সংগ্রহ করা হয়েছে। অবশ্য এ চাল পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু এর ফলে এবং ১৯৫৭ সালের পশ্চিম-বঙ্গ চাল ও ধান নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নের ফলে অন্যদিকে সফল ফলেছে। এইসমস্ত ব্যবস্থার ফলে পশ্চিমবঙ্গে মোটা চালের দাম সেপ্টেম্বর (১৯৫৭) মাসে মণপ্রতি ২৪ টাকা ৬৫ নয়া পয়সা থেকে অক্টোবর (১৯৫৭) মাসে ২৪ টাকা ৩২ নয়া পয়সায় নেমে এসেছে। এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অনুযায়ী মজুত মালের লাইসেন্স নেওয়া, পাস্কিক বিবরণী দাখিল করা এবং চাল-কল ও ধান-ঝাড়াই কলগুলির কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে। এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হল ব্যবসায়ীদের হাতে মজুত মালের উপর নজর রাখা এবং দরকার হ'লে জনস্বার্থে তা সংগ্রহ করা।

এ ছাড়া এই আইনের ফলে পাকিস্তানে ধান-চালের চোরা চালান বন্ধ হবে। এর ফলে যেসমস্ত জেলায় অতিরিক্ত শস্য আছে সেইসব জেলার সঙ্গে ঘাটতি-জেলাগুলিকে 'কড'ন করা হয়েছে। এতে অধিক শস্যের এলাকা থেকে ঘাটতি এলাকায় শস্য-সরবরাহের সুবিধা হবে। সাধারণত ব্যবসার মাধ্যমেই এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। কিন্তু

বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকার মনে করেন যে, ব্যবসায়ীদের হাতেই সমস্তটা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। দেশে একটা মূদ্রাস্ফীতির অবস্থা বর্তমান। তার উপর, আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, আমন ফসলও ভাল হবে না। এ অবস্থায় অবাধ ব্যবসার ফলে শস্য মজুদ করবার ইচ্ছা বেড়ে যাবে এবং তার ফলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে। সে বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ভারত-সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন।

(১) উপরের তথ্যাদি থেকে দেখা যাবে যে, জন-প্রতি ১৫.৩ আউন্স চাল ও অন্যান্য শস্য সরবরাহ করতে হলে ১২ লক্ষ টন শস্যের ঘাটতি হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে, পশ্চিম-বঙ্গকে এই শস্য সরবরাহ করার জন্য।

(২) এই ১২ লক্ষ টন শস্যের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বেশি চাল সরবরাহ করা সম্ভব নাও হতে পারে।

(৩) বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য কেবল-মাত্র রাজ্যসরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করলে চলবে না। সকলকেই দৈনিক পুষ্টি রক্ষার জন্য সচেতন হতে হবে। আর নিচের তিনটি উপায়ে তা করা সম্ভবঃ

(ক) সহজে উপলব্ধ হয় এইরূপ শাক-সবজি ও ফলের (যেমন কলা ও অন্যান্য আনাজ) উৎপাদন জনসাধারণকে বাড়াতে হবে। খাদ্যশস্যের চাহিদা মেটাবার জন্য এ অত্যন্ত প্রয়োজন। সামান্য এক ফালি জমিতেও কলা উৎপাদন করা যায়। এই ব্যাপারে সরকার যতটা সম্ভব সাহায্য করতে প্রস্তুত।

(খ) যাঁরা গম অপেক্ষা চালের উপর বেশি নির্ভর-শীল, তাঁদের উচিত অভ্যাসের পরিবর্তন করে

অপেক্ষাকৃত বেশি গম খাওয়ার অভ্যাস করা। যদিও পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী প্রধানত ভাত খেয়ে থাকেন, তবু আহাৰ্য হিসাবে তাঁরা ১৯৫৭ সালের পাঁচ লক্ষ টন গম গ্রহণ করেছেন। গম খাওয়ার পরিমাণ আরও একটু না বাড়াতে পারার কোন কারণ নেই।

(গ) এ রাজ্যের অধিবাসীদের লক্ষ্য রাখা উচিত যেন খাদ্যের অপচয় না হয়। সাধারণত এ ধরনের অপচয় হোটেল-রেস্টুরেন্টে অথবা কোন উৎসব উপলক্ষে বেশি হয়ে থাকে। দেখা উচিত সেসব ক্ষেত্রেও যেন তা আর না হয়। স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে যতটা অপরিহার্য, আহাৰ্য-হিসাবে ঠিক ততটা চালই যেন তাঁরা ব্যবহার করেন। এই উদ্দেশ্যে আমরা দু'ধরনের আহাৰ্য-তালিকা দিয়েছি। যাঁদের আর্থিক অবস্থা একটু ভাল তাঁদের তাতে খরচ পড়বে প্রত্যহ ১.৬ টাকা এবং যাঁরা স্বল্প-সংগতি-সম্পন্ন, তাঁদের খরচ পড়বে প্রত্যহ ৫০ নয়া পয়সা। ১নং আহাৰ্য-তালিকায় ২নং আহাৰ্য-তালিকার চেয়ে বেশি রকমের খাদ্য আছে। যখন আমরা সকলেই সমস্যার সম্মুখীন, তখন বাছাই করা সব সময়ে সম্ভবপর হয় না। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বর্তমান খাদ্য-পরিস্থিতির উপর আমরা অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি। কারণ এই পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ। যদি বেঁচে থাকতে হয় তবে আমাদের অবশ্যই সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য আরও গবেষণা ও সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্য নিয়ে সর্বদলীয় খাদ্য-উপদেষ্টা পর্ষদ গঠনের কথা হয়েছে। এই পর্ষদ মাঝে মাঝে খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে পর্ষালোচনা করবেন এবং প্রয়োজনবোধে নব-উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের উপায়-নির্ধারণের ব্যবস্থা করবেন।*

৩৩। ডিসেম্বর (১৯৫৭) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রদত্ত সরকারী বিবৃতি।

সুসম খাবার খেয়ে



খরচ বাঁচান

আজকালকার এই দুর্শ্বলোর বাজারে খরচপত্র বাঁচিয়ে প্রত্যেকদিন সুসম খাবার দাবার খাওয়া আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে ব্যাপারটি একেবারে অসম্ভব নয়। খাবারের মধ্যে স্নেহপদার্থ একটি অত্যাবশ্যক উপাদান। কিন্তু আমাদের দেশে পূর্ণবয়স্কেরা এবং বাড়ন্ত ছেলেমেয়েরা তাঁদের ন্যূনতম প্রয়োজন অর্থাৎ দু'আউন্স স্নেহপদার্থ প্রতিদিন পান না। তার প্রথম কারণ, আমাদের দেশে চাহিদা অনুযায়ী দুধের সরবরাহ অত্যন্ত কম। দুধ আর দুধ থেকে তৈরী অন্যান্য খাবারই স্নেহপদার্থের প্রধান উৎস। দ্বিতীয়ত, মাখন, ঘি ইত্যাদি পাওয়া গেলেও তা সাধারণ লোকের কেনার ক্ষমতার বাইরে। এবারে ধরুন খরচপত্রের কথা। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জায়গাতেই জিনিষপত্র দুর্শ্বল্য হয়ে উঠেছে। সে সব জায়গায় সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকেরা কি

করছে? তারা রান্নাবান্নায় ব্যবহার করছে পুষ্টিকর উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ যেমন, মার্গারিন, শর্টনিং বা ডালডা মার্কা বনস্পতি। এর ফলে তারা যে খাবার দাবার খাচ্ছে তা শুধু পুষ্টিকরই নয়, অত্যন্ত সুস্বাদুও বটে তাছাড়া, এইসব উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ দামেও ঘিয়ের তুলনায় সস্তা। ডালডা বনস্পতি খাঁটি উদ্ভিজ্জ তেল থেকে তৈরী হয়। ডালডার প্রতি আউন্সে ৭০০ অন্তর্জাতিক ইউনিট অর্থাৎ ভাল ঘিয়ের সমপরিমাণ ভিটামিন 'এ' যোগ করা হয়। তাছাড়াও ডালডার প্রতি আউন্সে ৫৬ ইউনিট ভিটামিন 'ডি' যোগ করা হয়। ডালডা সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরী হয় এবং সবসময় শীল করা ডবল ঢাকনা-গুলা টিনে পাওয়া যায়। এই সব কারনেই প্রত্যেকদিন আরও অধিকসংখ্যক গৃহিনীরা নিশ্চিত মনে ডালডা ব্যবহার করছেন — তাঁরা জানেন, খাবারে অতিরিক্ত পুষ্টির পক্ষে ডালডা অপরিহার্য।



HVM 315-18 BG

রাসায়নিক সারে আলুর ফলন ভাল হয়

একশ' বছরের ওপর আমরা আলুর চাষ ক'রে আসছি। কারণ অল্প সময়ের মধ্যেই আলুর ফসল উঠে আসে এবং এ থেকে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য-উপাদান পাওয়া যায়। এর চাষ বেড়ে চলেছে তাড়াতাড়ি—১৯৪৮-৪৯ সালে আলুর চাষ হয়েছে মোট ৫,০৬,০০০ একরে আর ১৯৫৩-৫৪ সালে হয়েছে ৬,৪৮,০০০ একরে।

চাষ-আবাদ যে ভাল ক'রে হয় না এ অবস্থায়ও গড়ে একরপিছ দু'জমি থেকে আলুর ফলন পাওয়া যাচ্ছে প্রায় ১১০ মণ। আরও অনেক বেশি ফলন পাওয়া যেতে পারে এর। শস্য-উৎপাদনের প্রতি-যোগিতায় দেখা গেছে, চাষীরা একরপিছ দু'জমিতে ৭০০ মণেরও বেশি আলু ফলাতে সক্ষম হয়েছেন। এ ফলন হয়েছে সমতল অঞ্চলের জমিতে ; তা থেকে দেখা যায় যে, আলুর চাষ প্রায় সব রকমের জমিতেই করা চলে। কাজেই, এ দেশে যেসব এলাকায় সাধারণত আলুর চাষ হয়ে থাকে, তার সব জায়গাতেই এর উৎপাদন বাড়িয়ে তোলার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

চাষের ক্ষেত্রে ফসলকে উর্বর-খাদ্য যোগানোর বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাসায়নিক সার দিলে ফলন বেড়ে যায় দেখবার মত, কিন্তু বাস্তব ফলটি পাওয়া যায় যদি প্রধান পুষ্টি-উৎপাদনগুলি সুস্থ হারে যোগানো যায়। পুষ্টি-উপাদানের এমন একটা বাঁধাধরা তালিকা দেওয়া একেবারেই সম্ভব নয় যা সব রকম মাটির এবং আবহাওয়ার পক্ষেই উপযোগী হতে পারে। এর জন্য আলাদা আলাদা ভাবে গবেষণা চালাতে হবে।

আমাদের মাটির নাইট্রোজেনের ক্ষুধা সবচেয়ে বেশি। উর্বরদের এ খাদ্যটি ফসলকে যোগাতে

খরচও বেশি পড়ে। তা ছাড়া, ফসফেট আর পটাশও আলুর ফলন বাড়াতে সাহায্য করে। এসব পুষ্টি-উপাদানের এমন একটি মিশ্রণ প্রয়োগ করা দরকার যা ফলন বাড়বার পক্ষে সবচেয়ে বেশি উপযোগী হবে আর যাতে খরচও কম পড়বে। এর জন্য নয়াদিল্লির ভারতীয় কৃষিগবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ উর্বর বেল-দোআঁশ মাটির একটা জমিতে ১৯৫২-৫৩ সালে একটা পরীক্ষা শুরুর করা হয়। আলুর চাষে প্রতি একর জমির জন্য শুধু নাইট্রো-জেনই ১২০ পাউন্ড দরকার বলে বিবেচিত হয়। একরপিছ ৮০ পাউন্ড, ১২০ পাউন্ড আর ১৬০ পাউন্ড নাইট্রোজেন প্রয়োগ ক'রে তুলনামূলক পরীক্ষা করা হয় ; প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নাইট্রোজেনের সঙ্গে ৮০ পাউন্ড ফসফেট আর ৪০ পাউন্ড পটাশ মেশানো হয়।

জমি তৈরি করার সময় প্রথম বছর পাঁচ গাড়ি আবজর্না-পচা সার এবং পরবর্তী দু' বছর সবুজ-সার প্রয়োগ করা হয়। জমিতে নাইট্রোজেন, ফসফরিক অ্যাসিড এবং পটাশ যোগাবার জন্য যথাক্রমে অ্যামোনিয়াম সালফেট, ট্রিপল সুপার ফসফেট আর পটাশিয়াম সালফেট প্রয়োগ করা হয়।

এই পরীক্ষায় “দার্জিলিং লাল গোল” আলুর বীজ লাগানো হয়। অক্টোবর মাসে এক ফুট নয় ইঞ্চি অন্তর সারিতে নয় ইঞ্চি দূরে দূরে বীজ বসানো হয়। বীজ-আলুগুলো ছিল প্রায় এক ইঞ্চি আকারের। একরপিছ বীজ লেগেছে ১৪ থেকে ১৬ মণ। বীজ লাগানোর পরে চার-পাঁচবার সেচ দেওয়া হয় এবং যাঁড়ে-টানা বিদের সাহায্যে গাছ-গুলোর গোড়ায় দু'বার কি তিনবার মাটি তুলে দেওয়া হয়।

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

আলু তোলা হয়েছে মার্চ মাসে। তিন বছর বিভিন্ন মাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহার করে বেশ

সামঞ্জস্যপূর্ণ ফল পাওয়া গেছে; এই তালিকায় তার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হল:

প্রতি একরে যত মণ আলু হয়েছে

নাইট্রোজেন : ফসফেট : পটাশ	১৯৫২-৫৩	১৯৫৩-৫৪	১৯৫৪-৫৫	গড়ে
(১) ৮০ : ৮০ : ৪০	১৮৭.০০	২৮৮.৫৫	২৭৫.৪৫	২৫০.০৩
(২) ১২০ : ৮০ : ৪০	১৯৪.৯৮	২৮৯.৭৯	২৮৩.৮০	২৫৬.১৯
(৩) ১৬০ : ৮০ : ৪০	১৯৪.৬০	৩০২.০৬	২৯০.২২	২৬২.২৯
(৪) ১২০ : ০ : ০	১৪৮.৪০	২৫২.৯৮	২৫০.৬৮	২১৮.৩৫

তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, শুধু ১২০ পাউন্ড নাইট্রোজেন দিয়ে ফলন পাওয়া গেছে সবচেয়ে কম। তার সঙ্গে ৮০ পাউন্ড ফসফরিক অ্যাসিড আর ৪০ পাউন্ড পটাশ দিয়ে বাড়তি ফলন পাওয়া গেছে ৩৮ মণ। কিন্তু ১২০ : ৮০ : ৪০ এবং ১৬০ : ৮০ : ৪০ পাউন্ড রাসায়নিক সার দিয়ে

যে ফলন পাওয়া গেছে, ৮০ : ৮০ : ৪০ পাউন্ড রাসায়নিক সার দিয়ে ফলন পাওয়া গেছে প্রায় তার সমান।

নিচের তালিকার তুলনামূলক বিবৃতি থেকে ধারণা করা যাবে যে, এতে কী রকম বাড়তি খরচ পড়ে এবং তার দ্বারা কী পরিমাণ লাভ হয়।

রাসায়নিক সারের উৎপাদন-মূল্য ও নিট লাভ

যত মণ ফলন হয়	নাইট্রোজেনের উপর পার্থক্য (মতন)	বাজারের হিসাবে পার্থক্যের দরুন যত টাকা খরচ	নাইট্রোজেনের পার্থক্যের দরুন যত টাকা খরচ	নিট লাভ (+) বা লোকসান (—) (টাকা)
(১) ২৫০.০৩	৩২.০৮	১৬০.৪০	১৮.২৭	(+) ১৪২.১৩
(২) ২৫৬.১৯	৩৭.৮৪	১৮২.২০	৫৫.৭৭	(+) ১৩৩.৪৩
(৩) ২৬২.২৯	৪৩.৯৪	১১২.৭০	৯৩.২৭	(+) ১২৬.৫৩
(৪) ২১৮.৩৫	—	—	—	—

ফসল তোলার গড় হার অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ-না-করা আলুর প্রতি মণের দাম ধরা হয়েছে পাঁচ টাকা।

এসব পরীক্ষার ফল থেকে চমৎকার সব তথ্যাদি পাওয়া যায়। ১৬০ : ৮০ : ৪০ পাউন্ডের মিশ্রণ দিয়ে যে সবচেয়ে বেশি ফলন পাওয়া গেছে, তা থেকে সবচেয়ে বেশি লাভ পাওয়া যায় নি। সবচেয়ে বেশি লাভ পাওয়া গেছে ৮০ : ৮০ : ৪০ পাউন্ডের মিশ্রণ দিয়ে, কেননা তাতে খরচ পড়েছে কম। পল্লী-অঞ্চলে ঋণ পাওয়ার সুযোগ এখনও খুবই কম এবং কৃষকদের আর্থনৈতিক সামর্থ্যও

কম, তাই বেশি টাকা নিয়োগ করার উপায় তাঁদের নেই; সুতরাং ৮০ : ৮০ : ৪০ পাউন্ডের মিশ্রণই তাঁদের পক্ষে উপযোগী এবং সুবিধাজনক।

দিল্লির পরিবেশে নাইট্রোজেনের সঙ্গে ফসফেট আর পটাশ মিশিয়ে প্রয়োগ করা দরকার। সেখানেও একরপিছ ৮০ পাউন্ড নাইট্রোজেন, ৮০ পাউন্ড ফসফরিক অ্যাসিড আর ৪০ পাউন্ড পটাশ প্রয়োগ করেই ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।*

*১৯৫৬'র অক্টোবর-সংখ্যা 'ইণ্ডিয়ান ফার্মিং'এ প্রকাশিত
শ্রী এ আর খানের প্রবন্ধ থেকে

পূর্বাঞ্চলীয় পশুপক্ষী- প্রদর্শনীতে নদিয়া জেলা

নদিয়া জেলার যেসব প্রতিযোগী নিখিল ভারত গবাদি প্রদর্শনী সমিতির উদ্যোগে কলিকাতার উপকণ্ঠবর্তী পাতিপুকুরে অনুষ্ঠিত পূর্বাঞ্চলীয় গবাদি ও হাঁসমুরগির প্রদর্শনীতে যোগদান করে সফল্যলাভ করেছেন, ১০-১২-৫৭ তারিখে বেথুয়াদুয়ারিতে আহূত এক উৎসব-সভায় নদিয়ার জেলাশাসক শ্রী এম এম কুশারী, আই এ এস, তাঁদের নগদ অর্থ পুরস্কার ও প্রশংসাপত্রাদি বিতরণ করেন। এই সভায় স্থানীয় বহু লোকের সমাগম হয়, তার মধ্যে নাকাসিপাড়ার প্রেসিডেন্ট, বেথুয়াদুয়ারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কৃষি, পশুচিকিৎসা ও পশুপালন বিভাগের অধীক্ষকবর্গ, জেলা প্রচার-আধিকারিক, মহকুমা প্রচার আধিকারিক, সার্কেল অফিসার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

নদিয়া জেলা থেকে ২২টি পশু-পাখি আদি উক্ত প্রতিযোগিতায় উপস্থাপিত করা হয়েছিল, তার মধ্যে আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় ৯টি ১ম, ২য়, ৩য় বা ৪র্থ স্থান অধিকার করেছে। অন্যান্যদের ১০ টাকা করে উৎসাহ-পুরস্কার দেওয়া হয়। এসঙ্গে একটি তালিকায় বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হ'ল।

সভাপতির ভাষণে শ্রী কুশারী সফল প্রতিযোগীদের উচ্চ প্রশংসা করেন এবং জনসাধারণকে তাঁদের পালিত পশুপাখির যত্ন নিয়ে দেশের বর্তমান খাদ্য ও অর্থনীতির সমস্যা সমাধানে প্রবৃত্ত হ'তে অনুরোধ জানান।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রায় নামে একজন সফল প্রতিযোগীও সভায় বক্তৃতা করেন। পশুপক্ষীর উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে তিনি জনসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানান— যেন তাঁরা দেশের পালিত পশুপক্ষিসম্পদের উন্নয়নের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করেন। নদিয়া জেলার পশুপালন-আধিকারিক তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় এ ধরনের প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বলেন।

পুরস্কার-তালিকা

প্রদর্শিত পশু পাখি বা দ্রব্য	মালিকের নাম ও ঠিকানা	স্থান	পুরস্কার
(১) হরিয়ানা ঘাঁড় ..	শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস, আশাচিয়া ..	২য়	.. ৭৫ টাকা ও প্রশংসা- পত্র
(২) ঐ ..	শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ঘোষ, পেটুয়াডাঙ্গা ..	৪র্থ	.. ২০ টাকা ও প্রশংসা- পত্র
(৩) উন্নীত হরিয়ানা বকনা বাছুর	শ্রীস্বরেশচন্দ্র সরকার, সোনাতলা ..	১ম	.. ৭৫ টাকা ও প্রশংসা- পত্র

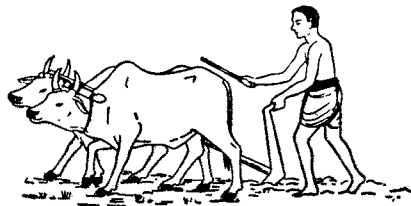
বঙ্গবন্ধু : ১০ম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

প্রণীত পণ্ড পাখি বা দ্রব্য	মালিকের নাম ও ঠিকানা	স্থান	পুরস্কার
(৪) উন্নীত হরিয়ানা এঁড়ে বাছুর	শ্রীনির্মলচন্দ্র রায়, চেক্সা ..	২য় ..	৪০ টাকা ও প্রদর্শন- পত্র
(৫) এ ..	শ্রীলক্ষ্মীকান্ত সরকার, সোনাতিলা	৩য় ..	২৫ টাকা ও প্রশংসা- পত্র
(৬) উন্নীত হরিয়ানা বয়স্ক বকনা	শ্রীকলিমুদ্দিন, বীরপুর ..	৪র্থ ..	২০ টাকা ও প্রশংসা- পত্র
(৭) 'রোড আইল্যান্ড রেড' মুরগি	মহম্মদ মেহের আলি সেখ, কাঁঠাল- বাড়িয়া	১ম ..	২৫ টাকা ও প্রশংসা- পত্র
(৮) এ ..	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রায়, সত্যপুর ..	৩য় ..	১০ টাকা ও প্রশংসা- পত্র
(৯) 'রোড আইল্যান্ড রেড' মুরগির ডিম	এ ..	১ম ..	১৫ টাকা ও প্রশংসা- পত্র
(১০) হরিয়ানা ঘাঁড় ..	শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষ, গোপালপুর ..	উৎসাহ-পুরস্কার	১০ টাকা
(১১) উন্নীত হরিয়ানা কম-বয়সী ঘাঁড়	শ্রীখলিল ফরাজি, বীরপুর ..	এ ..	১০ টাকা
(১২) এ ..	শ্রীএস এম জাকারিয়া, কুমারি ..	এ ..	১০ টাকা
(১৩) এ ..	শ্রীখগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, জগদানন্দপুর	এ ..	১০ টাকা
(১৪) এ ..	শ্রীওমর আলি মল্লিক, বীরপুর ..	এ ..	১০ টাকা
(১৫) উন্নীত হরিয়ানা বকনা-বাছুর	শ্রীদ্বিদ মহম্মদ, বাখিলাগ্রাম ..	এ ..	১০ টাকা
(১৬) এ ..	শ্রীদিনেশচন্দ্র নিয়োগী, দেবগ্রাম ..	এ ..	১০ টাকা
(১৭) এ ..	শ্রীনকুলচন্দ্র সাহা, দেবগ্রাম ..	এ ..	১০ টাকা
(১৮) এ ..	শ্রীপোতাই সেখ, বাখিলাগ্রাম ..	এ ..	১০ টাকা
(১৯) এ ..	শ্রীজাবাদ আলি বিশ্বাস, বীরপুর ..	এ ..	১০ টাকা
(২০) এ ..	শ্রীসৈয়দ সেখ, বাখিলাগ্রাম ..	এ ..	১০ টাকা
(২১) এ ..	শ্রীজলিলউদ্দিন বিশ্বাস, পাটকাবাড়ি	এ ..	১০ টাকা
(২২) এ ..	মহম্মদ মির জাফর বিশ্বাস, চেক্সা ..	এ ..	১০ টাকা
মোট ..			৪৩৫ টাকা

পূর্বাঞ্চলীয় পশুপক্ষী-প্রদর্শনীতে মেদিনীপুর কোল্ডার কৃতিত্ব

কলিকাতার উপকণ্ঠে পাতিপুকুরের প্রেস্টন কলোনিতে ২৪এ থেকে ২৯এ নবেম্বর (১৯৫৭) পর্যন্ত যে পূর্বাঞ্চলীয় পালিত-পশুপক্ষীর প্রদর্শনী হয়ে গেছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের মেদিনীপুর পক্ষিপালন-কেন্দ্র নিম্নোক্ত পুরস্কারগুলি লাভ করেছে। বিচারক ছিলেন বিশেষজ্ঞ ডাঃ হালব্রুক, টি সি এম; ডাঃ তুলসারাম এবং অধ্যাপক ক্রে।

পুরস্কার	পাখি বা ডিম	স্থান	পুরস্কার	পাখি ও ডিম	স্থান
২য় শ্রেণী	রোড আইল্যান্ড রেড মুরগির বড় বাচ্চা	১ম	৮ম শ্রেণী	হোয়াইট লেগহর্ন মুরগির শাবক	২য়
৩য়	,, রোড আইল্যান্ড রেড মুরগি	১ম			৫ম
		২য়			৭ম
৪র্থ	,, রোড আইল্যান্ড রেড মুরগির শাবক	১ম			৮ম
					৯ম
		৪র্থ	৪৩তম	,, ইণ্ডিয়ান রানার হাঁসা	২য়
		৫ম			৩য়
		৬ষ্ঠ			
৫ম	,, হোয়াইট লেগহর্ন মোরগা	১ম	৪৪তম	,, ইণ্ডিয়ান রানার হাঁসী	২য়
		২য়			
৬ষ্ঠ	,, হোয়াইট লেগহর্ন মুরগির বড় বাচ্চা	১ম			৩য়
			৪৫তম	,, খাকি ক্যাম্পবেল হাঁসা	৪র্থ
		২য়			
৭ম	,, হোয়াইট লেগহর্ন মুরগি	১ম	৪৬তম	,, খাকি ক্যাম্পবেল হাঁসী	৩য়
		২য়			৪র্থ
		৩য়			
		৪র্থ	৪৭তম	,, সাদা ডিম	২য়
		৫ম	৫০তম	,, হাঁসের ডিম	১ম



টুকিটাকি

বলাগড় প্রদর্শনী

সম্প্রতি শ্রীপুর-বলাগড় কৃষি, শিল্প এবং স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর সমাপ্তি-অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার সময়ে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও পশুপালন বিভাগের মন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ তাঁর ভাষণে জনগণকে জাতীয় সম্পদবৃদ্ধি করবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে বলেন। কৃষিমন্ত্রী কৃষি-উৎপাদন চালু রাখবার জন্য জলসেচের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন এবং সেচ-নলকূপ বসাবার জন্য জনগণকে সমবায় সমিতি গঠন করতে উপদেশ দেন। তিনি জনগণকে আশ্বাস দেন যে, সরকার তাঁদের বিপদে সব সময়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু জনগণ যেন সরকারের সাহায্য পাবার আশায় অলস হয়ে ব'সে না থাকেন।

কৃতী প্রদর্শকদের মধ্যে মল্লিমহাশয় প্রশংসাপত্র, ট্রফি, পদক, এবং কয়েকটি নগদ টাকার পুরস্কারও বিতরণ করেন। জেলাশাসক শ্রী এ এম কুশারী জনগণকে দেশের আর্থনীতিক উন্নতির জন্য জাতীয় সম্প্রসারণ রকের কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অনুরোধ জানান।

কৃষ্ণনগরে কৃষি-উপমন্ত্রী

কৃষি, পশুপালন ও বনবিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীস্মরণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি কৃষ্ণনগরের সরকারী পাটবীজ-পরিবর্ধনকেন্দ্র, ইউনিয়ন কৃষি-সহকারীদের শিক্ষণকেন্দ্র এবং উদ্যান-গবেষণাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। শিক্ষণকেন্দ্র উপমন্ত্রী মহাশয় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন, তাতে রাজ্যের কৃষি-পদ্ধতির উন্নয়নে শিক্ষার্থীদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণের উপর তিনি বিশেষ জোর দেন।

তার পর তিনি কৃষ্ণনগরের সরকারী পশু-হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। পরের দিন তিনি

রানাঘাটের পশু-হাসপাতালটি পরিদর্শন করেন। উপমন্ত্রী মহাশয় কৃষ্ণগঞ্জ, হাঁসখালি, রানাঘাট এবং চাকদহের জাতীয় সম্প্রসারণ রক এলাকা পরিদর্শন করেন এবং জনসভায় ও ঘরোয়া সম্মেলনে যোগ দেন।

পশ্চিমবঙ্গ ভেষজ উদ্ভিদ পরিকল্পনা

দার্জিলিং জেলার যেসব এলাকায় ভেষজ উদ্ভিদের চাষ হয়ে থাকে, সেসব জায়গায় সফরকালে কয়েকটি ভাষণ প্রসঙ্গে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের শ্রম-উপমন্ত্রী শ্রী এন বি গুরুং রোগো এবং অন্যান্য সন্নিহিত অঞ্চলে ইপিকাক প্রভৃতি ভেষজ উদ্ভিদ চাষের জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পরিকল্পনার গুরুত্ব বৃদ্ধি করে বলেন। গৈরিবাস এবং রোগোর শ্রমজীবীদের সম্ভাষণ-প্রসঙ্গে তিনি ভেষজ উদ্ভিদ পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য তাঁদের যথাসম্মতি প্রচেষ্টা নিয়োগের অবশ্যকতা বৃদ্ধি করে বলেন। সিক্কানা চাষ সম্প্রসারণ বন্ধ হবার ফলে যেসব শ্রমজীবী উদ্ভুক্ত পরিগণিত হয়েছে, এই পরিকল্পনা অনুসারে তাদের নিয়োগের সম্ভাব্যতার কথা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, পার্বত্য অঞ্চলে সরকার শূদ্ধ ভেষজ উদ্ভিদ উৎপাদনেরই প্রস্তাব করেন নি, সেগুনি থেকে ঔষধও প্রস্তুত হবে। আলোচ্য পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলবার জন্য সরকারের সহযোগিতা করতে তিনি শ্রমজীবীদের আহ্বান জানান।

আদিবাসীদের শস্যগোলায় জন্য অনুদান

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার চলতি আর্থিক বৎসরে বীরভূম জেলার বোলপুর থানার কালীতলাস্থিত কালীতলা সমবায় শস্যগোলা লিমিটেডের উদ্যোগে তফসিলী আদিবাসীদের জন্য একটি সমবায় শস্যগোলা স্থাপনের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রারের ব্যবস্থাদীনে ১০,২৫০ টাকা প্রদান মঞ্জুর করেছেন।

কোচবিহারে কৃষিবিদ্যালয়

উত্তর অঞ্চলের জেলাগদুলির ছাত্রদের মধ্যে কৃষি-শিক্ষার সুবিধা বিস্তারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকার গত বৎসর কোচবিহারে একটি কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। প্রতি বৎসর আটজন ছাত্রকে উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, তাকে পশ্চিম-বঙ্গ কৃষি কলেজে উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য মাসিক ৪০ টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে।

কৃষি-অধিকর্তা ডক্টর হর্নেন্দ্রকুমার নন্দীকে সঙ্গে নিয়ে কৃষি ও পশুপালন বিভাগের মন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করেন। তাঁরা উভয়েই বিদ্যালয়ের কার্যাদি দেখে বিশেষ আনন্দিত হন। এখানে কৃষি, দূগ্ধ-উৎপাদন, হাঁসমুরগি-পালন, প্রভৃতি ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

পদ্রুলিয়ায় শস্যগোলায় জন্য অনুদান

তফসিলভুক্ত আদিবাসীদের কল্যাণকল্পে পশ্চিম-বঙ্গ-সরকার বর্তমান আর্থিক বৎসরে ৩১টি (২৬টি সরকারী এবং ৫টি পঞ্চায়েত) শস্যগোলা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পদ্রুলিয়ার ডেপুটি কমিশনারের ব্যবস্থাধীনে ৭,৩০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

খাটালের গো-মহিষ হরিণঘাটায় অপসারণ

বেআইনি খাটাল ও সেখানকার দূগ্ধবতী গবাদি পশুদের সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশন যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, তা দেখে সরকার সন্তোষ লাভ করেছেন। পৃথিমধ্যে এত গবাদি পশুর ঘুরে বেড়ানো, কর্পোরেশনের লাইসেন্স ছাড়া তাদের রাখা ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখা কলিকাতার ন্যায় মহানগরীর পক্ষে বড়ই লজ্জার বিষয়। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কর্পোরেশন কর্তৃক এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এবং এ ব্যবস্থা যথোচিত হয়েছে বলে সরকার মনে করেন।

সরকার জনসাধারণকে জানাতে চান যে, এখন হরিণঘাটা দূগ্ধপঞ্জীতে ২,০০০ মহিষ আর ৩০০ গোরু আছে, এবং দূগ্ধবতী গো-মহিষকে হরিণ-ঘাটায় সরাবার জন্য ৩,০০০ দরখাস্ত বিবেচনাধীন আছে। এতে যে কলিকাতায় শূদ্র দূগ্ধ-সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি হবে তাই নয়, এ ব্যবস্থার ফলে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে অধিকসংখ্যক গো-মহিষ থাকতে পারবে। আর-একদিকে কলিকাতা নগরীর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত অবস্থারও উন্নতি হবে।

জনসাধারণের অসুবিধা দূর করবার জন্য, পশ্চিম-বঙ্গ-সরকারের দূগ্ধ-কমিশনার, যেসকল অঞ্চল থেকে গো-মহিষ অপসারণ করা হয়েছে, সেসব অঞ্চলে দূধের ডিপো খুলেছেন। সেসব ডিপো থেকে জনসাধারণ সহজেই দূধ পেতে পারবেন। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ৪৭টি নতুন ডিপো খোলা হয়েছে।

নগরীর অস্বাস্থ্যকর খাটালগুলি অপসারণের ক্ষমতালাভের জন্য সরকার “পশ্চিমবঙ্গ গবাদিপশু লাইসেন্সিং বিল, ১৯৫৭” বিধিবদ্ধ করার প্রশ্নটি বিবেচনা করছেন। কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাকে সরকার প্রশংসনীয় এবং সর্বতোভাবে জনসাধারণের সমর্থনলাভের যোগ্য বলে মনে করেন।

আদিবাসী অঞ্চলে ক্ষুদ্রসেচ পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমা এবং বাঁকুড়া জেলার সদর মহকুমার আদিবাসী এলাকায় ক্ষুদ্রসেচ পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য ১৯৫৭-৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অধিকর্তার ব্যবস্থাধীনে ১০,৫৬৮ টাকা মঞ্জুর করেছেন। উক্ত পরিকল্পনার ফলে ৩১১ একর জমির উপকার হবে এবং পরিকল্পনা কার্যকরী হবার শেষে ১৩৯ টন অধিক শস্য উৎপাদনের আশা করা যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু : ১০ম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

বন্যা প্রতিরোধ কার্য অনুমোদন

ভারত-সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হবে এই আশায় আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ১২ই ডিসেম্বর নিম্নলিখিত বন্যাপ্রতিরোধ-পরিকল্পনা দুইটি অবিলম্বে ১৯৫৭-৫৮ সালের মধ্যে কার্যকরী করা অনুমোদন করেছেন :

(১) কোচবিহার জেলার রাজারহাট-মাথাভাঙ্গা রাস্তার সংযোগস্থলের উজানে হাঁস-খোয়া নদীর পশ্চিমতীর সংরক্ষণ পরিকল্পনা।

(২) পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বংশীহরি এবং কুশমান্ডি থানার অধীন চুরামনে টাঙ্গন নদীর পূর্বতীরের প্রাক-জমিদারী বাঁধটিকে উন্নীত এবং দৃঢ়-করণের পরিকল্পনা।

এই দুটি পরিকল্পনার কাজে অনুমানিক ব্যয় হবে যথাক্রমে ৪০,০০০ টাকা এবং ১,০৯,৭৯০ টাকা।

কর্ডন এলাকায় ফসল গ্রহণ

বেণ্টনীভুক্ত এলাকায় ধানের জমি আছে অথচ রাজ্যের অপর কোন এলাকায় বসবাস করেন এমন কোন কৃষিজীবী অনুমতি নিয়ে নিম্নলিখিত হারে তাঁর জমির ফসল নিয়ে যেতে পারবেন বলে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কর্তৃক এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে :

(ক) পারিবারিক ব্যবহারের জন্য—জনপ্রতি বৎসরে ১০ মণ ধান বা ৬৥ মণ চাল।

(খ) বীজের জন্য—বিঘাপ্রতি ১২৥ সের ধান।

(গ) কৃষি-প্রমিকদের খোরাকের জন্য—বৎসরে বিঘাপ্রতি ১ মণ ধান।

কৃষিজীবীদের ধানের জমি, পরিবারের লোক-সংখ্যা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিবরণ সহ পশ্চিম-বঙ্গ চাউল এবং ধান্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ১৯৫৭-এর ক(২) ফরমে অনুমতির জন্য দরখাস্ত করতে হবে। যে এলাকায় ধানের জমি অবস্থিত, সেখানকার পারমিট-প্রদানকারী প্রাধিকারীর নিকট উক্ত দরখাস্ত করতে হবে।



সম্পাদক : শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাধুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মন্ত্রণে অধীক্ষক

প্রিন্টেড, মুদ্রণোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

পরিমাণ-৫৭/৮-৮১৭৭এফ-৩,৫০০

ভারতের সংবিধান

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সম্পূর্ণ
প্রভুত্বসম্পন্ন লোকতান্ত্রিক গণরাজ্যরূপে
গড়িয়া তুলিতে, এবং উহার সকল
নাগরিকই যাহাতে—

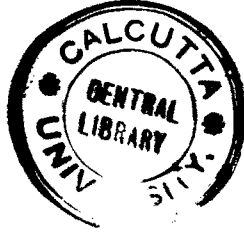
সামাজিক, আর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক
ব্যয়বিচার, চিন্তার, মতপ্রকাশের
(অভিযুক্তির), বিশ্বাসের, ধর্মের ও
উপাসনার

স্বাধীনতা ;

প্রতিষ্ঠা ও সুযোগের সমতা ;

লাভ করেন, এবং তাঁহাদের সকলের মধ্যে
ব্যক্তির গৌরব ও রাষ্ট্রের একতা সুনিশ্চিত-
ভাবে রক্ষার অল্পকূল দ্রাঘতাব

বধিত হয়, তজ্জন্য সত্যনিষ্ঠার সহিত
সংগ্রাম করিয়া আমাদের এই সংবিধান-
সভায় অদ্য, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শ
নভেম্বর তারিখে, এতদ্বারা এই সংবিধান
গ্রহণ করিতেছি, অধিনিয়মবদ্ধ
করিতেছি এবং নিজদের অর্পণ
করিতেছি ।



বন্ধুত্ব

১০ম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

মাঘ, ১৩৬৪

প্রসঙ্গ

ভারতে খাদ্যের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন রাজ্যে যে ব্যবস্থা হয়েছে, সে বিষয়ে আলোচনার জন্য নয়াদিল্লিতে ১২ই জানুয়ারি জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের 'স্ট্যান্ডিং কমিটি'র যে বৈঠক হয়, তাতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু খাদ্যশস্য তদন্ত সমিতির বিবরণীর উল্লেখ করে তাঁর ভাষণে বলেন যে, বছরের পর বছর দীর্ঘকাল ধরে ভারত বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করবে—এ প্রস্তাবকে তিনি অবাস্তব, অসংগত এবং অর্থোত্তিক মনে করেন। তিনি বলেন যে, এ বিষয়ে একাটি বলিষ্ঠ এবং প্রাণবন্ত নীতি আমাদের অবলম্বন করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, সেচের ব্যবস্থা যেসব জায়গায় আছে এবং যেসব জায়গায় বৃষ্টির জল পাবার আশা করা যায়, সেসব এলাকায় নির্দিষ্ট পরিমিত জমিতে বেশি ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করা দরকার। ভারতে এ রকম জমি আছে ১০ কোটি একর এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসব জমিতে শতকরা ৫০-৬০ ভাগ বেশি শস্য উৎপাদিত হওয়া উচিত।

আমরা জানি, প্রধানমন্ত্রীর এ প্রত্যাশা কিছুমাত্র বেশি নয়। বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকাজ করে শস্য-উৎপাদন প্রতিযোগিতায় আমাদের এ রাজ্যের চাষীরাই দেখিয়ে দিয়েছেন যে, একরপিছ জমিতে ৬০-৭০ মণ ধান উৎপাদন করা এমন-কিছ বেশি আয়্যাসের কাজ নয়। বৈজ্ঞানিক চাষের সূক্ষ্ম সম্বন্ধে যেসব চাষী সন্দেহান ছিলেন সাফল্যের এই বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখার পরে তাঁদের মনে আর সংশয় থাকা উচিত নয়।

বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকাজের গোড়ার কথা হচ্ছে, ভাল বীজ ব্যবহার করতে হবে। বীজ যদি পুষ্ট নীরোগ সবল না হয়, তবে সে বীজ যত উর্বর মাটিতেই বোনা হোক না কেন, তা থেকে সুস্থ তেজী গাছ জন্মাতে পারে না এবং সে গাছে ভাল আর বেশি ফলন হওয়া সম্ভব নয়। এ অতি সহজ কথা। দুর্বল বাপ-মায়ের সবল ছেলে হতে পারে না—এ কথা কে না বোঝেন?

ভাল বীজ বলতে, প্রথমে দেখতে হবে তার জাত। কোন কোন জাতের বীজ আছে, যেগুলোর গাছে ফলন স্বভাবতই কম হয়। আবার সব জমিতে সব জাতের বীজের গাছ আর ফলন ভাল হয় না। জমির উপযোগী বীজ চাই। বন্যার জলে যে জমি প্রতি বছরই ডুবে যায়, তাতে এমন জাতের বীজ লাগাতে হবে যার গাছ বন্যাসহ। নানা জমির জন্য বাছাই করতে হবে লবণসহ জাতের বীজ। এমন-সব জাতের ধান আছে, যেগুলোর গাছ ভাল হয়, ফলনও বেশি হয়, কিন্তু গাছ এমন কোমল প্রকৃতির যে, শস্যের ভার ধারণ করতে না পেরে, জমির ওপর লুটিয়ে পড়ে, তাতে শস্য নষ্ট হয়। এমনি নানা দিক বিবেচনা করে, নিজের জমির অবস্থা বুঝে, তার মাটির গুণাগুণ জেনে, চাষীকে এমন জাতের বীজ নির্বাচন করতে হবে যা থেকে ভাল গাছ হবে, গাছে প্রচুর ফলন হবে আর সেই ফলন টিকে থাকবে।

অপুষ্ট বীজ বাদ দিতে হবে; তা থেকে সবল গাছ জন্মাতে পারে না। রোগে-ধরা ক্ষেতের শস্য বীজ হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না, কেননা, সে বীজ থেকে রোগ গাছে ছড়াবে আর সেই গাছে যে

শস্য হবে, তাও হবে রদুন। এতে শস্যহানি হবে। যে বীজ নীরোগে ব'লে জানা আছে, বোনবার আগে সেই বীজও শোধন করে নেওয়া ভাল।

ভাল জাতের সুস্থ পুষ্ট বীজ চাষীরা পাবেন কোথায়?—কিছুকাল আগেও এ একটা সমস্যা ছিল। কিন্তু আমাদের কৃষিবিভাগ ইতিমধ্যে বিভিন্ন জমির উপযোগী উন্নত জাতের নানা রকম শস্যের বীজ সংগ্রহ করে সরকারী বীজপরিবর্ধন-ক্ষেত্রগুলিতে চাষ করে সেসব বীজের পরিমাণ বাড়িয়ে চলেছেন। এই সংখ্যায় অন্যতর পশ্চিমবঙ্গের কৃষিমন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদের যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হল, তাতে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

তবে, সরকারী বীজ-ভান্ডারে বীজের পরিমাণ সীমাবদ্ধ; তা দিয়ে সারা রাজ্যের সমস্ত চাষীর সমৃদ্ধ চাহিদা মিটতে পারে না। তেমন ব্যাপক ব্যবস্থা করা কোন সরকারের পক্ষে কোন দেশে কোন কালে সম্ভব নয়। তাই, সরকারী সাহায্যে চাষীদের আত্মনির্ভর হ'তে হবে।

সাধারণত চাষীরা নিজেদের চাষে উৎপাদিত শস্যেরই একটা অংশ পরবর্তী চাষে বীজ-হিসাবে ব্যবহার করার জন্য সযত্নে তুলে রাখেন। এখন থেকে তাঁরা মোট যত বীজ দরকার তার কিছুটা সরকারী কৃষিবিভাগ থেকে নিয়ে নিজেদেরই ক্ষেতে সযত্নে চাষ করে সেই বীজের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলুন। এতে তাঁদের নিজেদের উপকার করার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের বীজ-পরিবর্ধনের প্রচেষ্টায় সক্রিয় সাহায্য করা হবে। এবং জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া সরকারের কোন প্রচেষ্টাই সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না।

উন্নয়নের যে-কোন ক্ষেত্রেই তেমন জনগণের প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে সরকার সর্বদাই প্রস্তুত। কোন জমির জন্য কোন জাতের বীজ উপযোগী, এমনি বীজ-সংক্রান্ত বা বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ-আবাদ করার বিষয়ে কোন বিষয় জানতে হ'লে, চাষীভাইরা তাঁদের এলাকায় সরকারী কৃষিবিভাগের যে শাখা আছে, সেখানে খোঁজ নিন।



শস্যবীজ উৎপাদন কেন্দ্র

ডাক্তার রুফিউদ্দিন আহমেদ

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও পশুপালন বিভাগের মন্ত্রী

পশ্চিম বাঙলায় মাথা-পিছ, চাষের জমি অত্যন্ত কম। এর মধ্যে প্রতিদিন আবার প্রায় সাত শ' ক'রে নতুন লোক জন্মাচ্ছে। প্রয়োজনের অনুরূপে আমাদের জমি খুবই কম হ'লেও, তাতেই খাদ্য-শস্যের গড় ফলন না বাড়ালে, দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার আর কোন উপায়ই নেই। যতদিন পর্যন্ত না আমরা গড় উৎপাদন বাড়িয়ে এই চাহিদা মেটাতে পারি, ততদিন দেশের প্রকৃত উন্নতি ও শান্তি সম্ভব নয়। পৃথিবীর অন্যান্য যেসব দেশ চাষ-আবাদে এগিয়ে গিয়েছে, তাদের তুলনায় আমাদের দেশের প্রায় যাবতীয় শস্যেরই গড় ফলন অত্যন্ত কম।

জাপান ১৯৫২-৫৩ সালেও প্রায় ৭৫ লক্ষ একর ধানের জমি থেকে ৯৬ লক্ষ টন চাল উৎপাদন করেছে, অর্থাৎ জাপানী চাষীরা একর-প্রতি গড়ে প্রায় ৩৫ মণ চাল উৎপাদন করেছে। পশ্চিম বাঙলায় আমাদের প্রায় এক কোটি একরে প্রতি বছর ধানচাষ হয়ে থাকে। এর থেকে বছরে আমরা প্রায় ৪৩ লক্ষ টন চাল পাই। অর্থাৎ জাপানের মোট ধানের জমির চাইতে আরও ২৫ লক্ষ একর বেশি ধানের জমিতে চাষ ক'রেও আমরা জাপানের উৎপাদিত চালের অর্ধেকেরও কম পরিমাণ উৎপাদন করছি। বর্তমান যুগে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কৃষির বিভিন্ন বিষয়ে বিরাট পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হচ্ছে।

আর আমাদের দেশে খাদ্যের গড় ফলন কি বাড়ানো সম্ভব নয়?

আমি নিজে বিশ্বাস করি এবং আমাদের দেশের সব বিজ্ঞানীই বিশ্বাস করেন যে, কৃষি-উন্নয়নের জন্য এ পর্যন্ত আমাদের দেশে যেসব বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছে তার সামান্যতম প্রয়োগেই আমাদের

ফলন শতকরা ৫০ ভাগ অনায়াসে বাড়ানো চলে। গত চার বছর ধরে এই পশ্চিম বাঙলাতেই শস্য-উৎপাদন প্রতিযোগিতা হয়ে আসছে। এই প্রতিযোগিতার ফলে দেখা যায় যে, আমাদেরই দেশে চাষীরা অতি অল্প আয়াসে একরপিছ ৬০-৭০ মণ ধান ফলাতে পারেন। এ অবস্থায় এটা বোঝা খুবই সহজ যে, দেশের চাষীরা একটু সচেতন হয়ে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চাষ-আবাদ ক'রে সহজেই আমাদের গড় ফলন অনেক বাড়িয়ে তুলতে পারেন। এতে যে শুল্ক দেশের অন্নাভাবের একটা সমাধান হয় তাই নয়, আমাদের চাষীদেরও প্রকৃত আয় আনুপাতিক হারে বেড়ে যেতে পারে। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির এটাই প্রধান কথা।

ফসলের গড় ফলন বাড়ানোর নানা উপায় আছে। তার মধ্যে প্রধান ও প্রথম কথাই হ'ল ভাল বীজ। বীজ ভাল না হ'লে চাষে যত খরচই করা হোক না কেন, এবং পরে ফসলের যত যত্নই নেওয়া হোক না কেন, ফলন তেমন আশানুরূপ হবে না। বীজ যদি ভাল হয় এবং তাতে যদি বেশি ফলন দেবার গুণ বর্তমান থাকে তবে পরে সামান্য পরিচর্যা করলেই ফসল অনেক ভাল আর বেশি হয়। শুল্ক তাই নয়, বীজ ভাল হ'লে ফসল নানারকম রোগ ও ব্যাধির হাত থেকেও নিষ্কৃতি পায় এবং অনেক অযথা খরচ বাঁচে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, একমাত্র ভাল জাতের বীজ ব্যবহার ক'রেই ফসলের গড় ফলন শতকরা ১৫ ভাগ অনায়াসে বাড়ানো যায়। ফলন বাড়ানোর অন্যান্য উপায় যেমন খরচ-সাপেক্ষ, উন্নত বীজ ব্যবহারে কিন্তু খরচের তেমন কোন ভয় নাই। সমস্ত দিক বিবেচনা ক'রে এটাই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, চাষ-আবাদ ক'রে লাভ করতে হ'লে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করাই সবচাইতে ভাল।

দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশের ধানচাষীরা চাষের জন্য এখনও উন্নত জাতের বীজ খুব কমই ব্যবহার করে থাকেন। আমাদের দেশে গড় ফলন অতি অল্প হওয়ার এটাই একটা প্রধান কারণ। পশ্চিম বাঙলায় সমস্ত ধানের জমিতে যদি চাষের জন্য উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করা যায় তা হ'লে অতি সহজেই এবং অত্যন্ত কম খরচে আমরা বছরে অত্যন্ত সাড়ে ছয় লক্ষ টন বেশি চাল পেতে পারি। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিবিভাগ এ রাজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের উপযোগী নানা ধরনের উন্নত বীজ উদ্ভাবন করেছেন। সেইসব বীজ দিয়ে চাষ করে আমাদের চাষীরা তাঁদের নিজেদের জমি থেকে অনেক বেশি ফলন পেতে পারেন। দেশের ধানবীজের মোট চাহিদা কোন সময়ই পুরোপুরিভাবে সরকারী প্রতিষ্ঠানের মারফত সরবরাহ করা সম্ভব নয়। কোন দেশে কোন সময়ই সেটা করা হয় না এবং করা যায়ও না।

তবে মোট প্রয়োজনের একটা মোটা অংশ সরকার থেকে দিতে পারলে দেশের চাষীরা তা দিয়ে যদি একক প্রচেষ্টায় বা সংঘবদ্ধভাবে সেই বীজ বিশেষ তত্ত্বাবধানে পরিবর্তিত করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন, তবেই এই সমস্যা সহজে মোটা সম্ভব। উন্নত জাতের মূল বীজগুলো যাতে পুরোপুরিভাবে বিশুদ্ধ থাকে তার জন্য বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে এই বীজ উৎপাদন করে চাষীদের দিতে পারলে, আমার বিশ্বাস, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের তাঁরা এইগুলিকে পরিবর্তিত করে নিজেদের কাজে লাগাতে পারেন।

এসব সরকার থেকে খুব বেশি উন্নত জাতের বীজ চাষীদের মধ্যে সরবরাহ করা সম্ভব হয় নি। বিভিন্ন সরকারী কৃষিক্ষেত্রে যেসব উন্নত জাতের বীজ উৎপাদিত হ'ত সেগুলি প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। তা ছাড়া, আনা-নেওয়ার নানা বাধাবিঘ্ন থাকায় মফস্বলে সময়মত এই বীজ নেওয়া খুবই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ফলন বাড়ানোর কাজে উন্নত বীজের গুরুত্ব বৃদ্ধি পশ্চিমবঙ্গ-সরকার দ্বিতীয়

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৯৫৮-৫৯ সালের মধ্যে ১০০টি থানা বীজ-উৎপাদনক্ষেত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশের ১০০টি বিভিন্ন থানায় ২৫ একরের এক-একটি ক্ষেত্র গঠিত হবে। এইসব ক্ষেত্রে মদ্যুত উন্নত ধানের বীজ উৎপাদিত হ'লেও, অন্যান্য ফসলের বীজ উৎপাদনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় জমি ও আবহাওয়ার উপযোগী উন্নত জাতের বীজ এইসব কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিত হবে এবং চাষীরা তাঁদের প্রয়োজনমত উন্নত বীজ সরাসরি এইসব কৃষিক্ষেত্র থেকে সহজেই পেতে পারবেন। উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ-আবাদ করে যাতে আমাদের স্বল্প জমি থেকে খুব বেশি ফলন পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর ফলে স্থানীয় চাষীরা এইসব কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উন্নত ধরনের চাষের রীতি দেখে শিখতে পারবেন এবং নিজেদের সাধ্যানুযায়ী সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ফলন বাড়ানোর উপায় করতে পারবেন। এই পরিকল্পনায় আরও স্থির হয়েছে যে, এইসব কৃষিক্ষেত্রের গুদামে আমাদের দেশের চাষীদের উপযোগী বিভিন্ন চাষবাসের যন্ত্রপাতি থাকবে। চাষীরা বীজ-উৎপাদনক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির ব্যবহার স্বচক্ষে দেখে নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে উৎসাহিত হবেন। থানা বীজক্ষেত্র থেকে বীজ আনা-নেওয়ার জন্য অযথা সময় নষ্ট হবে না এবং চাষের মরসুমের আগেই চাষীরা বীজ পেতে পারবেন। এই ১০০টি থানা কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে বর্তমান বছরে ৯০টি খোলা হবে। এর মধ্যে ৪২টি কৃষিক্ষেত্রের জায়গা স্থির করা হয়ে গেছে এবং বাকি ৪৮টির জমি আর ২-১ মাসের মধ্যেই নির্বাচিত হয়ে যাবে বলে আশা করি।

আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আমাদের ২৫টি কৃষিক্ষেত্রে চাষের কাজ এরই মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আগামী খারিফ খন্ডের মধ্যেই ১০০টি কৃষিক্ষেত্রের কাজ পুরোপুরি চালু হয়ে যাবে। আগামী বছরের শেষার্শ্বে যখন এই

১০০টি ক্ষেত্রের কাজ পুরোদমে চলতে থাকবে, তখন আমরা প্রতি বছর প্রায় ৪০ হাজার মণ উন্নত জাতের ধানের বীজ চাষীদের ব্যবহারের জন্য পেতে পারব।

এর জন্য সরকার আগামী বছরের মধ্যে প্রায় ৭২ লক্ষ টাকা খরচ করবেন বলে স্থির করেছেন। এই কৃষিক্ষেত্রগুলি চালু হলে এর আয় থেকেই তার আনুষঙ্গিক যাবতীয় বাৎসরিক খরচ চলতে পারবে।

ধান ছাড়া উন্নত জাতের আখ, গম, ডাল ইত্যাদি নানা ফসলের বীজও এইসব ক্ষেত্র থেকে পাওয়া যেতে পারবে। বর্তমানে পশ্চিম বাঙলায় যে-কিছু বীজ পরিবর্ধনকেন্দ্র ও সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে, তা থেকেও আমরা বছরে প্রায় ১৫ হাজার মণ উন্নত ধানের বীজ চাষীদের দেবার জন্য পাচ্ছি। কাজেই দেখা যায় যে, আগামী বছরের শেষে থানা কৃষিক্ষেত্র থেকে ৪০ হাজার মণ ও চলতি বীজ-পরিবর্ধনকেন্দ্র ও অন্যান্য সরকারী কৃষিক্ষেত্র থেকে ১৫ হাজার মণ একুনে মোট প্রায় ৫৫ হাজার মণ উন্নত ধানের বীজ প্রতি বছর চাষীদের মধ্যে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

আমাদের চাষীরা যদি না এই বীজকে বাড়িয়ে নিজেদের প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করবার জন্য সচেষ্ট হন, তা হলে এই বীজেও আমাদের মোট চাহিদা মিটেবে না। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের চাষীরা অন্য যে-কোন প্রগতিশীল চাষীদের সমকক্ষ। ব্যাপক প্রচেষ্টায় দেশের যে কৃষি-উন্নয়ন সরকার থেকে শুরু করা হয়েছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, উন্নতিকামী প্রত্যেক চাষী সেই সুযোগ গ্রহণ করে, যাতে আমাদের প্রত্যেক ধানক্ষেতে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করা যায় তার জন্য সচেষ্ট হবেন।

অন্যান্য বীজের মধ্যেও পাট, আখ, আলু ইত্যাদির উন্নত বীজ বিতরণের ব্যবস্থা কৃষিবিভাগ থেকে করা হয়েছে। বর্তমানে পাটের বীজের ব্যাপারে আমাদের এ রাজ্যে তেমন কোন অসুবিধা নেই। আগামী

বছরেও কৃষিবিভাগ থেকে ৩ হাজার ৮ শত মণ উন্নত পাটবীজ চাষীদের দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৮০ হাজার মণ উন্নত জাতের আখের বিছনও চাষীদের মধ্যে আগামী বছর সরবরাহ করার ব্যবস্থা হয়েছে। আলুবীজ সম্বন্ধেও বর্তমানে আমাদের তেমন কোন অভাব হচ্ছে না। সরকারের উন্নত আলুবীজ চাষীদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি করেছে এবং এই বছরও কৃষিবিভাগ থেকে ২০ হাজার মণ বীজ-আলু চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। তা ছাড়া দেশে ২-১টি হিমগদাম হওয়ার ফলে অনেক আলু-চাষীই নিজেদের ভাল বীজ চাষের জন্য রাখতে সক্ষম হচ্ছেন।

অন্যান্য শাকসবজির বীজও কৃষ্ণনগর ও কালিম্পং সরকারী ক্ষেত্রে উৎপাদন করে চাষের জন্য দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই বীজক্ষেত্র আরও বাড়ানো হলে, সবজিবীজের চাহিদা আরও বেশি করে মেটানো সম্ভব হবে বলে আমি আশা রাখি।

আমাদের দেশে চাষীরাই দেশের উন্নতি বিধানের প্রধান সম্বল ও সহায়ক। নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে তাঁদের চাষবাস করতে হয়, এই কথা আমি জানি। এই বাধাবিঘ্ন যতদূর সম্ভব দূর করবার প্রচেষ্টাই আমার লক্ষ্য। আজ উন্নত বীজ সরবরাহের যে ব্যাপক ব্যবস্থা সরকার থেকে করা সম্ভব হয়েছে, আমি আশা করি যে, আমার চাষী-ভাইরা তার পূর্ণ সম্ভাব্যতার করে নিজেদের ব্যক্তিগত ও দেশের সমষ্টিগত কৃষি-উন্নয়নে সহায়তা করবেন। খেয়ে-পরে মানুষের মত বাঁচতে হলে পারস্পরিক গভীর সহযোগিতা ছাড়া অন্য উপায় নেই। এই কথা বদলবার আমাদের সময় হয়েছে। তাই আমার আশা যে, কৃষি-কর্মচারী ও চাষীদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় উন্নত বীজের ব্যাপক প্রচলন সম্ভব হবে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাল শেষ হবার আগেই দেশের প্রতি ক্ষেত্রে উন্নত বীজের চাষ আমরা দেখতে পাব।

পশ্চিমবঙ্গে পশু-উন্নয়ন

শ্রীম্ম্বরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও পশুপালন বিভাগের উপমন্ত্রী

প্রাচীন ভারত গো-জাতিকে এমন উচ্চ সম্মান দিয়েছিল যে, তাকে বলা হ'ত 'গো-মাতা'। আর আজ এদেশে গো-জাতির এমনই অনাদর যে, 'গো-মাতা' শব্দটি পরিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পদ্বিষ্টকারিতায় দুধের তুলনা আর কোন খাদ্য বা পানীয়ে মেলে না, অথচ এদেশের ক'জন লোক আজকাল দুধ খেতে পায়? ক'টি শিশু আছে যার প্রয়োজনমত একটু দুধের পদ্বিষ্ট লাভ করতে পারে? আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। কৃষকের কৃষিকাজের একমাত্র অবলম্বন গোরু। কিন্তু এদেশে মেহনতী গোরুর অবস্থা এমন শোচনীয় যে, তাদের বাহিত লাঙল ভালভাবে জমি চষতে পারে না।

এদেশে গৃহপালিত পশুর মধ্যে গোরুই প্রধান, তারপরে মহিষের স্থান, তারপরে ছাগল-ভেড়া প্রভৃতির। দুগ্ধবস্থা সকলেরই সমান। ভারতে এসব পালিত পশুর সংখ্যা কিন্তু পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির পালিত পশুর সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি; কিন্তু অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে বৈজ্ঞানিক প্রথায় পশুপালন করা হয় বলে, সেসব দেশে কম-সংখ্যক গবাদি পশুই আমাদের দেশের অঙ্গপ্র গবাদি পশুর চেয়ে ঢের বেশি দুধ দেয়, ঢের বেশি কাজ দেয়।

ভারতের মধ্যে আবার আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পালিত পশুর অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। অস্ট্রেলিয়া, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশে যেখানে এক-একটি গাভী দৈনিক গড়ে আধ মণ পৰ্বন্ত দুধ দেয়, সেখানে আমাদের রাজ্যের গাভী প্রতিদিন গড়ে দুধ দেয় আধ সের থেকে বড় জোর এক সের। ভারতের অন্য কোন রাজ্যের গোরু এত কম দুধ দেয় না।

এ রাজ্যে গবাদির এই দুগ্ধবস্থার প্রধান একটি কারণ হচ্ছে, পশুগুণ্ডলি ঠিকমত খেতে পায় না।

এদের ঠিকমত যত্নও হয় না। নবগঠিত পশ্চিম-বঙ্গের লোকসংখ্যা এখন প্রায় তিন কোটি; আর, এ রাজ্যে গোরু-মহিষ রয়েছে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ এবং ছাগল-ভেড়া প্রায় ৪০ লক্ষ ৩০ হাজার। অতি-মাত্রায় জনবহুল এ রাজ্যে খাদ্যশস্য চাষের যে জমি রয়েছে, তাতে গড়ে মাথাপিছু পড়ে মাত্র ০.৪ একর। তাই এসব জমিতে খাদ্যশস্যের এবং অতিপ্রয়োজনীয় কিছু অর্থকর ফসলের চাষ করার ওপর পশুখাদ্য ফসলের চাষ করার কথা আমাদের চাষীরা ভাবতেও পারেন না। তা হ'লে এ সমস্যার সমাধানের উপায় কী? জমি তো টেনে বাড়ানো চলবে না। কাজেই যে জমিতে খাদ্যশস্যের আর অর্থকর ফসলের চাষ করা হয়, সেই জমিতেই পর্যায়ক্রমে আমাদের পশু-খাদ্য ফসলেরও চাষ করতে হবে।

এ রাজ্যের গোরুগুণ্ডলি ছোট ছোট, দুর্বল, তারা দুধও দেয় খুব কম, মেহনতী হিসাবেও অকেজো। আধ সের দুধ দেয় এমন কুড়িটি গোরুর চেয়ে দশ সের দুধ দেয় এমন একটি গোরু পোষা কি ভাল নয়? চাষের কাজের জন্য ছোট আকারের দশটি দেশী দুর্বল ষাঁড় না পুষে উন্নত জাতের একজোড়া ষাঁড় পুষলে কাজ পাওয়া যাবে অনেক বেশি। এইভাবে উন্নত জাতের গোরু দিয়ে আমাদের অকেজো গোরুর সংখ্যা অনেক কমে ফেলা যায় এবং সেইটাই করতে হবে।

নিকৃষ্ট ধরনের যা-তা ষাঁড় দিয়ে প্রজনন করালে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তাই পশ্চিমবঙ্গের পল্লী-অঞ্চলে এ রাজ্যের সরকার থেকে প্রজননের উদ্দেশ্যে 'হিরিয়ানা', 'সাহিয়াল' প্রভৃতি উন্নত জাতের ষাঁড় বিতরণ করা হচ্ছে এবং অকেজো ষাঁড়গুলোকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন পল্লী-এলাকায় কেন্দ্র নির্বাচন করে, সেখানে উন্নত জাতের সরকারী ষাঁড়

রেখে কৃত্রিম প্রজননেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পশু-খাদ্য ফসলের চাষে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সরকার থেকে এসব ফসলের বীজ, মূল, 'কাটিং' প্রভৃতি কৃষকদের দেওয়া হচ্ছে। আনন্দের বিষয়, সরকারের এসব কাজের সফলও প্রত্যক্ষই দেখা যাচ্ছে। গো-উন্নয়নের এসব প্রচেষ্টার ফলে উন্নত জাতের যেসব গাভী জন্মাচ্ছে, তারা রোজ ৩ সের থেকে ১০ সের পর্যন্ত দুধ দিচ্ছে; আর, উন্নত জাতের যেসব ষাঁড় জন্মাচ্ছে, মেহনতী গোরু হিসাবে তারা আশাতীত রকমের ভাল কাজ করছে। সম্প্রতি পাতিপুকুরে অন্তর্ভুক্ত গবাদি পশু ও পক্ষী প্রদর্শনী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সরকারের সঙ্গে রাজ্যের পালিত-পশুর মালিকেরা যত বেশি করে সহযোগিতা করবেন, রাজ্যের পালিত পশুর উন্নয়নে সাফল্যও ততই উঠবে স্বরান্বিত হয়ে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতায় এবং তার উপকণ্ঠের পৌরাণ্ডলগুলিতে অগণিত গোরু-মহিষ যে নারকীয় দুরবস্থার মধ্যে দিনপাত করে, তা ভাবলেও সভ্যজাতি হিসাবে লজ্জায় আমাদের মাথা নুয়ে পড়ে। সর্বক্ষণ গোবর-চোনার কর্দমে ভরা ন্যাকরজনক পুঁতিগন্ধময় এসব পশুনিবাসের নাম 'খাটাল'। এসব খাটাল ছড়িয়ে আছে কলিকাতার মত আধুনিক শহরের নানা বন্ধ স্থানে আর হাওড়া গার্ডেনরিচ, টালিগঞ্জ, বেহালা প্রভৃতি এলাকার নানা জায়গায়। প্রায় চল্লিশ হাজার গোরু-মহিষ অষ্টপ্রহর বাঁধা থাকে এসব অস্বাস্থ্যকর খাটালে। তার মধ্যে শতকরা গোরু প্রায় ৭০টি আর মহিষ প্রায় ৩০টি। এসব গো-মহিষের দুধেই কলিকাতার ও তার আশপাশের লোকের শতকরা ৮০ ভাগ দুধের প্রয়োজন মেটে।

পূর্বে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের যেসব অঞ্চলে উন্নত জাতের গো-মহিষ পাওয়া যায়, সেইসব জায়গা থেকে উন্নত জাতের প্রচুর-দুধ-দেওয়া গোরু আর মহিষ আনা হয় এসব খাটালে। যত বেশি পরিমাণ সম্ভব দুধ এদের কাছ থেকে আদায় করা হয়, কাজেই বাছুরগুলির বেশির ভাগই অনাহারে

মারা যায়। তখন মরা বাছুরের চামড়া আর খড় দিয়ে কুশপদন্তলী তৈরি করে, তাদের মায়েদের ভুলিয়ে দুধ আদায় করা হয়। এভাবে যার কাছ থেকে দুধ আদায় করা যায় না, সেই গোরু বা মহিষকে 'ফুকা' দেওয়া হয়। 'ফুকা' এক নিষ্ঠুর যন্ত্রণাদায়ক বর্বর প্রথা, যা প্রয়োগ করলে পশু আর দুধ ধরে রাখতে পারে না। 'ফুকা' দেওয়ার ফলে বেশির ভাগ পশুরই সন্তানধারণের ক্ষমতা লোপ পেয়ে যায়। সুস্থ, পুষ্ট যেসব পশু আরুণ্ড অনেক বিয়ান দুধ দিতে পারত, তাদের কাছ থেকে দুধ পাওয়ার আর কোন উপায় থাকে না।

যে পশুর কাছ থেকে স্বাভাবিকভাবেই দুধ পাওয়া যায়, দুধ দেওয়া বন্ধ হ'লে মালিক তাকে খাটালে রেখে পরের বিয়ান পর্যন্ত লোকসান সহিতে রাজী নয়। এসব শৃঙ্খা গোরুর বেশির ভাগকেই কসাই-খানায় বিক্রি করে, খাটালের শূন্য স্থান নতুন গোরু এনে পূর্ণ করা হয়। যারা নেহাতই দয়ালু, তারা শৃঙ্খা গোরুকে রাস্তায় ছেড়ে দেয় এবং শহরের পথে এসব গোরু লোকের ক্ষতি করে আর যানবাহন ও লোকচলাচলে বাধা ঘটিয়ে বেড়ায়।

মূল্যবান গো-সম্পদের এই অপচয় বন্ধ করার জন্য, তাদের স্বাস্থ্যকর পরিবেশে ভালভাবে বাঁচতে দেবার জন্য, শহরের বুক থেকে এসব কদর্য নরক তুলে দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকার দুগ্ধ-পল্লীর (মিল্ক কলোনি) পরিকল্পনা করেছেন। হরিণ-ঘাটায় রাজ্যসরকারের বিরাট কেন্দ্রীয় পশু গবেষণা ও প্রজনন কেন্দ্রে বড় বড় দুগ্ধ-পল্লী গড়ে তোলা হচ্ছে আধুনিক ধরনে। ব্যবস্থা হয়েছে, খাটাল তুলে দিয়ে, গোপেরা তাদের গোরু-মহিষ নিয়ে এসব পল্লীতে বৈজ্ঞানিক বিধিসংগতভাবে বাস করবে, সরকার থেকে সরবরাহ করা সুস্বাদু পশুখাদ্য দিয়ে তাদের পশুগুলিকে পালন করবে এবং সেইসব পশু থেকে যে দুধ পাওয়া যাবে, সেই দুধ তারা ন্যায্য মূল্যে সরকারের কাছেই বিক্রি করবে। জনসাধারণকে দুধের যোগান দেওয়ার ভার সরকারের ওপর। বর্তমানে হরিণঘাটার সরকারী দুগ্ধকেন্দ্রে

যে দুধ উৎপন্ন আর সংগৃহীত হয়, প্রতিদিনই সেই দুধ কলিকাতা অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে সরবরাহ করা হচ্ছে। কাজেই এসব খাটাল তুলে দিয়ে গোপেরা যদি গোরু-মহিষ নিয়ে হরিণঘাটার দুগ্ধ-পল্লীতে বাস করে, তাতে কলিকাতা অঞ্চলে দুধের সরবরাহ অক্ষুণ্ণই থাকবে।

মুশকিল হচ্ছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই খাটালের মালিক কিন্তু গোরু-মহিষের মালিক নয়। খাটালের পেছনে আছে কায়েমী স্বার্থবান ‘লালাবাবু’ আর ‘বড়মিয়া’দের হাত। তারাই বাইরে থেকে খাটালে ভাল ভাল জাতের গো-মহিষ যোগায়। বিচিত্র সূত্রে তাদের স্বার্থের সঙ্গে গোপেদের স্বার্থ বাঁধা। এসব ‘লালাবাবু’ আর ‘বড়মিয়া’রা চায় না যে, শহর থেকে খাটাল উঠে যাক। তাদেরই বাধাসৃষ্টির ফলে সরকারের দুগ্ধ-পল্লী পরিকল্পনার শূভ প্রচেষ্টার সাফল্য বিলম্বিত হচ্ছে।

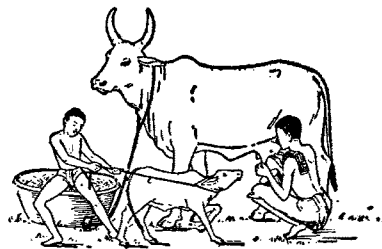
আনন্দের বিষয়, ইতিমধ্যেই অনেক গো-মহিষের মালিক তাদের গো-মহিষ নিয়ে দুগ্ধ-পল্লীতে বাস করতে শুরু করেছে। কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানও কলিকাতা থেকে খাটাল তুলে দেবার জন্য বন্ধ-পরিচয় করেছে। তাঁরা সরকারের এ পরিকল্পনা রূপায়ণে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন।

হরিণঘাটায় রাজ্যসরকারের পশু-গবেষণা ও উন্নয়নকেন্দ্রের কথা আজ সকলেই জানেন। এখানেই উন্নত জাতের গো-মহিষ উৎপাদন করে পল্লী-

অঞ্চলে সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কালে উন্নত জাতের প্রায় ১,২০০ যাঁড় পল্লী-অঞ্চলে সরবরাহ করা হয়েছে। কতকগুলি শর্তে উন্নত জাতের ১ বছর বয়সের বকনা বাছুরও এখান থেকে বিতরণ করা হচ্ছে। এখানে বৈজ্ঞানিক প্রথায় রক্ষিত গো-মহিষের দুধ নিয়মিতভাবে কলিকাতার কেন্দ্রে কেন্দ্রে বিক্রি হচ্ছে। এখানে এবং বাইরেও হাঁস-মুরগির উন্নয়নের জন্য কয়েকটি পৃথক কেন্দ্র রয়েছে। পালিত পশুপক্ষীর উন্নয়নের জন্য এখানে যে গবেষণাশালা স্থাপিত হয়েছে, সেখানে নিয়মিতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। বাইরের উন্নত জাতের ছাগের প্রজননে বাঙলার কালো ছাগলের উন্নয়নেরও চেষ্টা চলছে হরিণঘাটায়।

সরকার থেকে পশুচিকিৎসা বিদ্যার এবং পশু-রোগ দমনের কাজের উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পশুচিকিৎসা বিদ্যার পাঠকে ডিগ্রি পাঠক্রমে উন্নীত করা হয়েছে; সেইসঙ্গে স্বল্প-কালীন ডিপ্লোমা পাঠক্রমেরও প্রবর্তন করা হয়েছে। গবাদি পশুর মালিকদের প্রয়োজনমত সাহায্য করার জন্য পল্লী-অঞ্চলে পশুচিকিৎসার কয়েকটি হাস-পাতাল এবং ডাক্তারখানাও খোলা হয়েছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমরা পশু-উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট এগিয়ে গিয়েছি। আশা করি, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আমরা আরও অনেক বেশি এগিয়ে যাব এবং সেই অগ্রগতিতে সহায় হবে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা।



ভূমি খাদ্য ও পুনর্বাসন

অধ্যাপক প্রবোধকুমার ভৌমিক, এম এস-সি

সে হাজার হাজার বছর আগের কথা। মানুষ তখন কৃষিজীবী ছিল না। পৃথিবীর চেহারা ছিল অন্য রকম। তখনকার মানুষের দিন কেটেছে অরণ্যে—কখনও বা ফলমূল আহরণে আর কখনও বা পশু-পক্ষী-মৎস্য সংগ্রহে। পৃথিবীতে জনসংখ্যা তখন অতি কম ছিল।

তারপরে দীর্ঘদিন কেটেছে। আজকের দিনের পৃথিবীর সঙ্গে সেদিনের পৃথিবীর অনেক তফাত। লোকসংখ্যাও অনেকগুণ বেড়েছে। মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যের মান ঠিক রাখতে গিয়ে আবিষ্কারে আবিষ্কারে পাশ্চাত্যে তাই অভাব-অভিযোগ অনটন-অশান্তি সাধারণ মানুষের নিত্যসহচর।

ভারতবর্ষেও তার ব্যতিক্রম নেই। বরং দেশ-বিভাগের পর আরও নিতানতুন সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশের আমলে আমাদের দেশের সর্বাঙ্গীণ বা সমষ্টিগত উন্নয়নের পরিকল্পনা ছিল না। তাই নানা বিভেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা, জাতি-উপজাতি-খণ্ডজাতির অসমতা ও অসহযোগ দেশকে দুর্বল করে রেখেছিল। এখন সে পটভূমিকার পরিবর্তন হয়েছে; দেশের অন্যান্য অধিবাসীদের থেকে সে-দিনের বিচ্ছিন্ন, অবহেলিত তফাসলী জাতি-উপজাতিরা আর পৃথক নয়। তাদের দারিদ্র, অশিক্ষা অপসারিত করে নতুন সমন্বয়ের আদর্শে আমাদের দেশের সামগ্রিক উন্নতির পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। তাই আদিবাসী-পুনর্বাসন বর্তমান সরকারের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এক অপরিহার্য কর্মসূচি।

পুনর্বাসন-সমস্যা বিশেষ করে ছিন্নমূল উদ্ভাস্তু ও ভূমিহীন জীবিকাবিহীন, দারিদ্রক্লিষ্ট আদিবাসীদের সমস্যা। সাধারণ সাহায্য থেকে এর কর্মসূচি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পুনর্বাসনের মধ্যে কোন মানুষ,

সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে উপযুক্তভাবে বেঁচে থাকার পরিবেশ দিতে হয় আর সাহায্যের মাধ্যমে সাময়িক দুঃখ-কষ্টকে নানাদিক থেকে লাঘব করার চেষ্টা করা হয়। তাই যখনই কোন পুনর্বাসনের কথা ওঠে তখনই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কতকগুলি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমস্যার নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে হয়। যে আবেগতন্ত্রী বা কর্মসূচি যাদের জন্য তৈরি হচ্ছে তারা যেন এর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাঁচার অধিকার পায়—এইটাই হবে প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য। তাই যাদের পুনর্বাসিত করা হবে, তাদের—

(১) খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার অর্থাৎ যাতে প্রত্যেক লোক উপযুক্ত ভিটামিনযুক্ত সুষম খাদ্য পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। মাথাপিছু অন্তত ২,৮৪০ ক্যালরী হওয়া চাই।

(২) জনপ্রতি বছরে ২৫ গজ কাপড়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় বা রোগ-নিরোধক জ্ঞানের রীতিনীতিতে অভ্যস্ত করাতে হবে। ঘর-দোর সেই দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূলে তৈরি হবে।

(৪) উপযুক্ত শিক্ষা বা নিরক্ষরতা অপসারণের বন্দোবস্ত, চিকিৎসাবিনোদন ও মিলেমিশে কাজ করার প্রেরণা তাদের মধ্যে আনতে হবে।

(৫) ছোটখাট কুটিরশিল্পের আয়োজন করতে হবে—যার মাধ্যমে লোকে তাদের বাড়তি সময় কাজে লাগাতে পারে।

(৬) কো-অপারেটিভ বা সমবায় প্রথার মাধ্যমে শ্রম, বিপণন ইত্যাদিতে লোকজনকে আকৃষ্ট করতে হবে।

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

আবার যাদের নিয়ে এই পরিকল্পনা রচিত হবে সেই গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, জীবন-যাত্রার পদ্ধতি, রীতিনীতি ইত্যাদিতে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। নচেৎ সেই সম্প্রদায়কে উপযুক্ত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত করাতে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হবে। কেননা উপযুক্ত পরিবেশ না হ'লে পরিবর্তন বা পরিবর্তিত রূপকে স্থায়ী করা যায় না।

একটি উদাহরণ দিয়ে প্রবন্ধের অন্যান্য দিক আলোচনা করা যাক। পশ্চিম বাঙলায় লোধারা স্বভাবদুর্ভুক্ত জাতি ব'লে পরিচিত। তাদের সঙ্গে খাড়িয়া সম্প্রদায়ও আছে। এদের বেশির ভাগের বাস মেদিনীপুর জেলায়। সরকারের পক্ষ থেকে তাদের মধ্যে পুনর্বাসনের কাজ শুরুর হয়েছে। এদের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যাবে যে, অরণ্যেই ছিল এদের বাস। ধীরে ধীরে সে অরণ্য জমিদারের আওতায় গেল—অরণ্যজীবী

লোধারা জীবিকা হারাল, লোকসংখ্যাও বেশ বেড়ে যেতে লাগল—শ্রমজীবী সাঁওতাল বা মন্ডা সম্প্রদায়ের লোকেরা জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে ক্ষেত তৈরি করল। ফলে তাদের জীবনে এল দুঃখকষ্ট যার স্বাভাবিক পরিণতি হ'ল অপরাধের পথ—চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি। স্বাধীন বন্য জাতি আপন অধিকার হারিয়ে নিজ ভূমিতে হ'ল পরাধীন। তাই এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। এই পটভূমিকায় রচিত হবে এদের পুনর্বাসন পরিকল্পনা।

মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় থানায় প্রায় ২,৫০০ লোধার বাস। তারা মোটামুটি ২৫-২৬টি গ্রামে ছড়িয়ে আছে। আজ কয়েক বৎসর ধ'রে সমাজ-সেবক সংঘ বেসরকারীভাবে তাদের মধ্যে নানা কাজ ক'রে চলেছে, সরকারও তাদের নানা দিক দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। ঐ থানার একটি গ্রামকে ইউনিট হিসাবে ধরলে দেখা যাবে—

ছক ১

গ্রাম ডহরপুর, পোঃ ফুলগেড়িয়া,

থানা নারায়ণগড় (নারায়ণগড় রেল-স্টেশনের এক মাইল দূরে)।

পরিবার সংখ্যা	লোকসংখ্যা						মোট জমি, নিজেদের (একর)	মোট জমির উৎপন্ন ফসল (চাউল)*	মোট বর্গা- চাষের জমি	উৎপন্ন ফসল, চাউল (পাউণ্ড)	বাষিক আয় মোট				
					মোট										
	পুরুষ		স্ত্রী												
	বৎসর ০-১৫	বৎসর ১৬-উর্ধ্ব	বৎসর ০-১৫	বৎসর ১৬-উর্ধ্ব											
২৮	..	৩৫	৪১	৫৬	২০	১২৮	১১	৬,৫০০ পাউণ্ড	২২	৬,০০০	৬২৫ টাকা				

*১। মণ ধান=১ মণ চাউল=মোটামুটি ৮১পাঃ

এই আটশাট পরিবারের মধ্যে ১৭টি ভূমিহীন। নিজেদের জায়গায় বসতবাটী পর্যন্ত নাই। গ্রামে মোট ১১ একর জমি নিজেদের দখলে আছে আর ২২ একর জমি অন্য লোকের; এরা বর্গাচাষ অর্থাৎ

অর্ধেক ফসলের ভাগে চাষ করে। চাষের খরচ এদের। গ্রামে বিভিন্ন দিক দিয়ে গোটা বছরে প্রায় ৬২৫ টাকা আয় হয়। পাঁচটি পরিবারের বলদ আছে। কয়েকটি পরিবারে ছাগল ও মুরগি আছে।

যদি এই গ্রামটির উন্নয়ন করা যায় তবে এর কী কী প্রয়োজন আছে সেটা দেখা দরকার। প্রথমেই খাদ্যের কথা ভাবতে হবে। অতএব সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করলে কী প্রয়োজন হয় দেখা যাক।

সুষম খাদ্য হিসাবে ভারতের প্রতিটি লোকের প্রতিদিন বিভিন্ন খাদ্য কী পরিমাণ দরকার, নিচে তা দেওয়া হল:

ছক ২

বস্তু	জে সি কুমারাপ্পার মতে		“ন্যাশনাল আডভাইসরি কমিটি”র মতে পরিমাণ (আউন্স)
	পরিমাণ (আউন্স)	ক্যালরী	
চা'ল/আটা ..	১৬	১,৬০০	১৪
ডা'ল ..	২	২০০	৩
শাকসবজি ..	৮	৪৮	৪
অন্য সবজি ..	..	..	৩
মূল ও কন্দ			
জাতীয় (আলু)	৪	১০০	৩
ফল ..	৪	৬৯	৩
দুধ ..	১২	২৪০	১০
শর্করা, গুড় ইঃ	২	২০০	২
তেল, ঘি, স্নোহ-জাতীয় ..	১	২৫৫	২
বাদাম ইত্যাদি	১	১৪৫	..
মাছ বা মাংস ..	..	..	৩
ডিম ..	..	..	১

জে সি কুমারাপ্পা একজন বিশিষ্ট গান্ধীবাদী অর্থনীতিবিদ। তাঁর মতে ছয় আউন্স দুধের বদলে ১টি ডিম ও ৪ আউন্স মাছ বা মাংস খাওয়া যেতে পারে।

যদি এই হিসাবে উক্ত লোখাদের খাদ্যব্যবস্থা করতে হয় তবে এক বৎসরে কী পরিমাণ লাগে দেখা যাক। মোট ৬১ জন পূর্ণবয়স্ক লোক আছে, আর ৯১ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক। সেই ৯১ জনকে ৩৯ জন পূর্ণবয়স্ক হিসাবে ধরা যেতে পারে। অতএব গ্রামে মোট ১০০ ইউনিট বা পূর্ণবয়স্কের খাদ্যের প্রয়োজন।

ছক ৩

বস্তু	মাথাপিছু (পাউণ্ড)	১০০ ইউনিটের জন্য (পাউণ্ড)	মোট উৎপন্ন হয়
চা'ল/আটা ..	৩২০	৩২,০০০	১২,৫০০
ডা'ল ..	৬৯	৬,৯০০	(পাউণ্ড)
শাকসবজি ..	৯১	৯,১০০	
অন্য সবজি ..	৬৯	৬,৯০০	
মূল, কন্দ (আলু)	৬৯	৬,৯০০	
ফল ..	৬৯	৬,৯০০	
দুধ ..	২২৮	২২,৮০০	
শর্করা, গুড় ..	৪৬	৪,৬০০	
তেল, ঘি ..	৪৬	৪,৬০০	
মাছ/মাংস ..	৬৯	৬,৯০০	
ডিম ..	৩৬৫	৩৬,৫০০	

লোখাদের মোট উৎপন্ন চা'লের পরিমাণ বছরে ১২,৫০০ পাউন্ড। বাকিটার কিছু সংগৃহীত হয়। অনটনের দিনে তারা না খেয়ে বা আধপেটা খেয়ে দিন কাটায়। ডা'ল খুব কমই কেনে। শাকসবজি কিছুটা বাজার থেকে যোগাড় হয়। মাছ-মাংস খুব কম হয়। মুরগি বা ডিম যা হয়, নগদ টাকার জন্য তা বাইরে বিক্রি করতে হয়। সুষম খাদ্য দিতে গেলে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার অনুপাতে মাথাপিছু যে জমি পড়ে ততটা জমি সংগ্রহ করে তাদের কৃষিতে অভ্যস্ত করতে হবে। কৃষির এমন ধরন হবে যে, জমিতে দু'তিন বার ফসল পাওয়া যাবে ও প্রয়োজনীয় খাদ্য যাতে হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নগদ টাকায় বিক্রি করার মত ফসল তৈরির চেষ্টা না করাই ভাল।

ভূমির প্রয়োজন ও বন্টন

মোট গ্রামের লোকের ১১ একর জমি আছে, আর ২২ একর জমি তারা ভাগে চাষ করে। সর্বসাকুল্যে ২২ একরের মত জমির ফসল তারা পায়। ভারতের জনসংখ্যার অনুপাতে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ মাথাপিছু ০.৭ একর। আর ঐ গ্রামের লোখাদের ভাগে দাঁড়াচ্ছে ০.০৭২ একর। ০.৭ একরের বেশি পরিমাণ জমির আশা করা উচিত নয় ভেবে ঐ পরিমাণকে ঠিক রেখে এদের কর্মতি হ'ল মাথাপিছু ০.৬২৮ একর। মোট কর্মতি হয় ৯৫.৪৫৬

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

একর। কিন্তু বর্গাচাষের ১১ একর জমি পাওয়া গেলে ৮৪·৪৫৬ একর জমি এদের যে-কোন প্রকারে সংগ্রহ করে দিতে হবে। অবশ্য এর জন্য রাষ্ট্রই অগ্রণী হবে। তা না হ'লে কৃষকদের হাতে জমি আসবে না। চেষ্টা করলে ঐ পরিমাণ জমি কেনাও যেতে পারে। এখন ঐ পরিমাণ জমির উপর কী কী ব্যবস্থা করা যায় তার একটা হিসাব দেওয়া গেল:

(১) ৩টি পুকুর খনন। ৯ বিঘার মত জমির উপর ১ বিঘার মত জল হবে। ২ বিঘা উঁচু জমি—তাতে মোট ছ' বিঘা জমিতে সবজি হবে।

(২) তিনটি পুকুরে মাছচাষ ও হাঁস-পোষা।

(৩) পুকুরের পাড়ে জলের নিকট মাদুরকাঠি, আম, কাঁঠাল, কলা ইত্যাদি গাছ লাগানোর ব্যবস্থা। আবার পুকুরের পাশাপাশি নিচু জমিতে বোরো ধানের চাষ করা যাবে। তাতে বর্ষার আগে বোরো

ধান উঠবে। কৌশিয়াড়ী থানার কৃষি-অফিসার এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পুকুরের জলে ঐ জমি চাষ হবে, আবার বর্ষার জলে আর-একবার চাষ হবে। জমিকে কৃষি-উপযোগী করার জন্য তাদের কিছু টাকা বা সেই পরিমাণ টাকার ধান গ্রামের সমবায় সমিতিকে দিতে হবে। কেননা তারা যখন ক্ষেতে কাজ করবে তখন সমিতি থেকে ধান-চাল নিয়ে সংসার চালাবে। উপযুক্ত সারের ব্যবহার, ঠিকভাবে বীজ বোনা ও চাষের কাজে তাদের অভ্যস্ত করাই হবে প্রধান কাজ। কৃষিবিদেরা গিয়ে মাটি পরীক্ষা করে তা কী কী গাছের উপযোগী তা বলতে পারবেন।

উন্নত প্রথায় চাষ করলে ফসল ভাল হবে সন্দেহ নেই। নিচে একটি ছক দেওয়া হ'ল। প্রতি একর জমিতে চাষের জন্য একজন লোকের কী পরিমাণ খরচ হয় আর উপযুক্ত বর্ষা হ'লে সে কী পরিমাণ ফসল পায় তা এতে জানা যাবে:

ছক ৪

	দিন-মজুরি বাবত	বলদ	বীজ	যন্ত্রপাতি যেরামত ও কেনা	খাজনা	সার
লাঙ্গল চাষ	৮ দিন ১১/০ হিঃ ৪১১০	৮ দিন ২টি বলদ ৪১১০	২০ সের বীজ ধান ৫৯	৮৯	৪৯	৪০ খুড়ি গোময় ইত্যাদি ৬১১০
চারা গাছ লাগানো	৮ দিন ১১/০ হিঃ ৫৯	..	..	..	..	..
আগাছা তোলা	২ দিন ১১০ হিঃ ১৯	..	..	..	..	..
ধান কাটা, ...	৬ দিন ৩৬০	..	..	..	..	..
খামারে জমা	৪ দিন ২১১০	..	..	..	..	..
বিচালী সাফ	২ দিন ১১০	..	..	..	..	..
অন্যান্য	১৮৯	৪১১০	৫৯	৮৯	৪৯	৬১১০ =৪৬৯

সাধারণত ফসল উঠে--

- (১) ১১ মণ ধান, আনুমানিক
(২) বিচালী, খড় ইঃ

মোট

১২০৯

বৈজ্ঞানিক প্রথায় ভালভাবে চাষ-আবাদ করলে একর-পিছু আরও বেশি ফলন আশা করা যায়।

এবারে ছোটখাট শিল্প প্রসারের কথা আলোচনা করা যাক—

(১) ধানভানা—প্রত্যেক বাড়িতে উন্নত ধরনের ঢেঁকি রাখতে ও তার ব্যবহার শেখাতে হবে। গ্রাম্য সমবায়ের মাধ্যমে কিছু টাকা দিলে তারা ধান সংগ্রহ করবে ও যে যে পরিবার কাজ করতে চায় তাদের ভানানি দিয়ে চাউল জমা করবে ও বাজারে সুবিধামত বিক্রি করবে। এই ধরনে পশ্চিম বাঙলায় দু'টি বিশেষ পরীক্ষা হচ্ছে—একটি নন্দীগ্রাম থানার অখদাবাদ গ্রামে আর-একটি কেশিয়াড়ী থানার কুকাই গ্রামে। এতে সময়ের সঙ্গে মজুদুরির গড়-পড়তা সমতা কত হওয়া উচিত তা জানা যাবে।

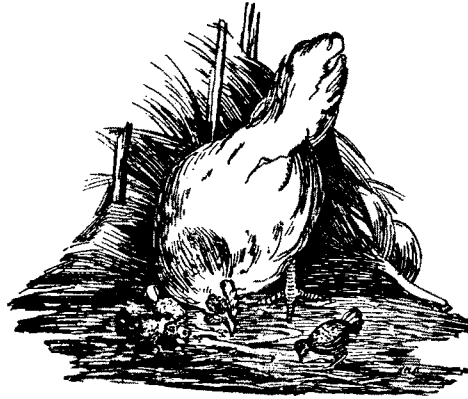
(২) দড়ি তৈরি, তাঁত, চরকা—যদিও সব সময় লাভজনক নয় তবু অন্য কোন শিল্পে অভ্যস্ত করানো ও বাজার খুঁজে পাওয়ার ঝামেলা অনেক; তার চাইতে এসব আবশ্যিক কুটিরশিল্পে লোকে কাজ পাবে।

(৩) তসর-চাষ, মুরগি ও ছাগল পালন; কোথাও বা সাবান বা তেল তৈরির কাজ চলতে পারে। এ

সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আগেই করা হয়েছে। (বসুন্ধরা ১৩৬৩, মাঘ—“উপজাতি-সমস্যায় পশ্চিম বাঙলার অরণ্যসম্পদ”।)

কাজের দায়িত্ব

প্রচারে বা অর্থসাহায্য করলে কাজ হবে না অথবা আশ্রম বা ধর্মমূলক প্রতিষ্ঠানকে দিলে সব সময় উপকার হবে না। এর জন্য উপযুক্ত কর্মী তৈরি করা আবশ্যিক। উপজাতি-কল্যাণ বিভাগ (পশ্চিম-বঙ্গ-সরকার) এদিকে মন দিচ্ছেন। তা ছাড়া প্রত্যেক উন্নয়নমূলক কাজের বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের নিজেদের লোক থাকা ভাল। আবার এমন পরিবেশে স্থান নির্ধারিত করতে হবে যাতে অন্যান্য সম্প্রদায় খারাপ বা ঈর্ষার চোখে না দেখেন। একটা পারস্পরিক সহায়তায় যেন গঠনের কাজ চলতে পারে, সেদিকে জেলার বিভিন্ন দফতরের কর্তাদেরও সহযোগী হ'তে হবে। বিশেষ করে পল্লিস, কৃষি, বন, মৎস্য, উপজাতি-কল্যাণ বিভাগসমূহ ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির যদি এক হয়ে কোন কাজে এগোতে পারেন তাতে জয়যুক্ত হবেন সন্দেহ নাই।



সজনে বারো মাস

তুলসীদাস সিংহ

“নটে খটে আড়াইয়া—সজনে বারো মাস”। অর্থাৎ কিনা, নটে শাক, পুই শাক, পালং শাক ইত্যাদি হ’ল সাময়িক শাক—এদের হ’তেও যতক্ষণ, যেতেও ততক্ষণ ; কিন্তু সজনে চলে সারা বছর। সজনের ডাঁটা, পাতা, ফুল—সবই গিন্নীদের খোলায় উঠবার হিম্মত রাখে। ডাঁটা, ফুল আর পাতার মারফত সজনে বারো মাস ধরে আমাদের তরকারির অভাব মিটিয়ে চলে। আর এর কোনটাই বা খেতে খারাপ? সজনেপাতার শাক, সজনেফুলের চচ্চড়ি যার মুখে উঠেছে তিনিই জানেন এর তার কেমন। সজনে-ডাঁটার তো কথাই আলাদা। কচি কচি ডাঁটার সঙ্গে কচি কচি এঁচড় যদি মিলে যায় তা হ’লে সেও এক যুগলমিলন। তা ছাড়া, আলু বলদন, কুমড়া বলদন, কারু সঙ্গেই বা তার অমিল?

এমন যে সজনে, তার গাছ করতে কিন্তু খুব বেশি মেহনতের দরকার হয় না। গাছ থেকে কেটে-ফেলা একটা ডাল যে বাড়ি থেকে হোক নিয়ে আসুন, এনে কাটা অংশগুলো গোবর দিয়ে ঢেকে দিন, তারপর সে ডালটাকে এমন কোন জায়গায় ঠেসিয়ে রাখুন যাতে ছাগল-গোরু বা মানুষে নেড়ে ন’ দেয়। কিছুদিন থাকলেই দেখবেন গোবরঢাকা জায়গাগুলোর আশপাশ ফুড়ে কচি কচি কুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে। বাস, এবার একটা গর্ত খুঁড়ে ডালটাকে তার মধ্যে বসিয়ে গোড়ায় মাটি চাপা দিয়ে দিন। চারপাশে অবশ্য ঘেরা বা বেড়া দিয়ে দিতে হবে যাতে ছাগল গোরু না মদুখ দিতে পারে। এরপর দেখবেন ঐ ডালের অষ্টাঙ্গ থেকে সরু সরু শাখ বেরিয়ে পড়েছে, আর ওগুলো দিন দিন বেড়ে উঠছে। শেষে একদিন দেখবেন ঐ ডালই হয়ে উঠেছে গাছ। আর ডাল যদি একবার গাছ হয়ে উঠতে পেরেছে, তা হ’লে ভাবনা কী—বছরের পর

বছর ধরে এ আপনার বাড়ির নিত্যকার একটা তরকারি যুগিয়ে যাবে।

প্রথমেই কিন্তু গায়ে হাত তুলতে যাবেন না। কচি কচি পাতা লকলকিয়ে উঠলে জিভে জল আসারই কথা ; কিন্তু ‘সবুরে মেওয়া ফলে’। পাতার দিকে না তাকিয়ে আপনি এখন গোড়ার দিকে তাকান—গোড়ার মাটি মাঝে মাঝে খুঁড়ে দিন, গোড়ায় মাটি দিন, জল ঢালুন। তারপর একদিন দেখবেন, গাছ ভর্তি কচি পাতাগুলোর রঙটা হয়ে গেছে গাঢ় সবুজ।

পৌষের হাওয়া গায়ে লাগতে-না-লাগতেই সারা গাছে দেখা দিল ফুল। তখন শুধু আপনি ন’ন—ওই যে এইটুকুটুকু রঙচঙে শিমঠিরকী পাখিগুলো—ওরাও ঝোপঝাড় ছেড়ে ছুটে আসবে সজনেগাছে, আসবে রামধনু-রঙা প্রজাপতি, আসবে ঘুনে মৌ, আর আসবে পাড়ার ছেলেমেয়েরা। প্রজাপতি আর মৌ-এর নজর ফুলের মধুর উপর—ছেট ছেলে-মেয়েদের নজর ফুলের উপর। সজনেফুল তো পাড়তে হয় না—আপনা থেকেই ঝরে। রোজ ফোটে—রোজ ঝরে। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখুন, তলা ছেয়ে সজনেফুল পুড়ে আছে। যা পারেন আপনি কুড়িয়ে নিয়ে আসুন। পাড়ার ছেলেমেয়েরা এসেছে—ওরা এবার যে যা পারে নিয়ে যাক কুড়িয়ে। পৌষের সকাল বেলাকার মিষ্টি রোদটির সঙ্গে ছেলেমেয়েদের মিষ্টি হাসি মিশে ভরে উঠুক আপনার আঙ্গিনাটা। কাজের তাড়া যদি আপনার না থাকে, তা হ’লে আড়াল থেকে দেখুন না খানিকক্ষণ ছেলেমেয়েদের কান্ডটা। উপরের দিকে মদুখ করে দাঁড়িয়ে আছে সব, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলছে, “একটি ফুল পড়—হেই ভগবান, একটি ফুল ফেল”। তারপর একসময় যখন টপ করে ফুল



সজনেফুলের হাসি

[আলোকচিত্রী—লেখক]

পড়ল তখন লেগে গেল কাড়াকাড়ি। কাড়াকাড়ির শেষে আবার ঘাড় তুলল সব উপরের দিকে। গাছে কাঠবিড়ালী কি পাখি দেখা দিলে তাদের কী মজা। হ্যাঁ, পাখিরা এসে ফুল খাক কি মধু খাক ক্ষতি নেই, কিন্তু দেখবেন কাঠবেরালি যেন গাছে না ওঠে। ওরা ভারি পাজি। ফুলের গোড়াগুলো কেটে কেটে ফেলে দেয় কেবল। তাতে অনেক কুণ্ডি ফুল হয়ে ওঠবার আগেই নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই কাঠবেরালি গাছে উঠলেই তাকে তাড়িয়ে দিন। তবে, উপরওয়ালার উপরে হাত চলে না কারও। বৃষ্টি-বাদলে যদি সজনেফুল বেশি ঝরে যায় তখন আর আপনি কী করবেন।

সজনেফুলকে নিয়ে চমৎকার একটি ধাঁধা আছে কিন্তু—

“ভক্ত তরে ভক্তির জোরে পিণ্ডিত রইল বসে,
গাছের ফলটি গাছেই রইল বোঁটাটি গেল খসে।”

ফুল না হ'লে ফল হয় না—এ সবাই জানে এবং ফুলটি ঝরে পড়লেও বোঁটা ঠিকই থাকে এও সবাই জানে কিন্তু সজনের ফুলগুলো বোঁটাসমেত সব ঝরে যায়। বোঁটাসমেত ফুল ঝরে যাওয়ার পরেও আসে গাছভর্তি ডাঁটা। সজনেফুলকে তাই তুলনা করা হয়েছে ভক্তের সঙ্গে। ভক্তির জেঁরে সজনেফুল বোঁটাকে নিয়ে মৃদুস্তিলাভ করল, কিন্তু পিণ্ডিত ডাঁটার বোঁটা না থাকলেও বোঁটা তৈরি করে আটকে পড়ল—কেটে না ফেলা পর্যন্ত মৃদুস্তি নেই।

ডাঁটা কেটে ফেলার প্রশ্ন ওঠে সেই চৈত্রের প্রথম সপ্তাহে। পৌষ গেল—এল মাঘ, তখন দেখা গেল গাছে কুণ্ডি বলতে আর একটাও নেই সব কুণ্ডিই ফুল হয়ে গেছে—ফোটা সজনেফুলের হাসিতে ভরে আছে গোঁটা গাছটা। তারপর মাঘ গিয়ে যেই এল ফাল্গুন তখন দেখা গেল ফুল আর নেই—গাছভর্তি ডাঁটার কেবল দোল খাচ্ছে। শেষে ফাল্গুনের পর যখন এল চৈত্র, তখন দেখুন ডাঁটাগুলো সব কেমন শক্ত হয়ে গেছে। এদের দিয়ে ঝোল করা চলে না—ছোলা কিংবা মটরের বেসন দিয়ে ভাজা করা চলতে

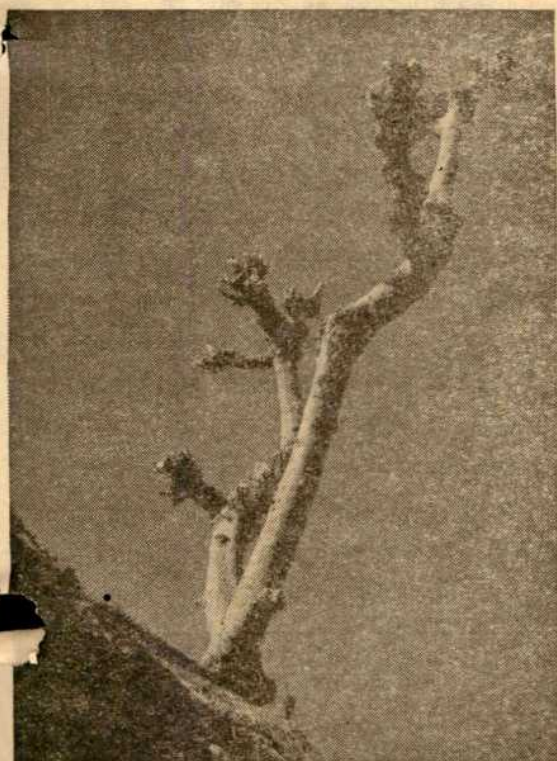
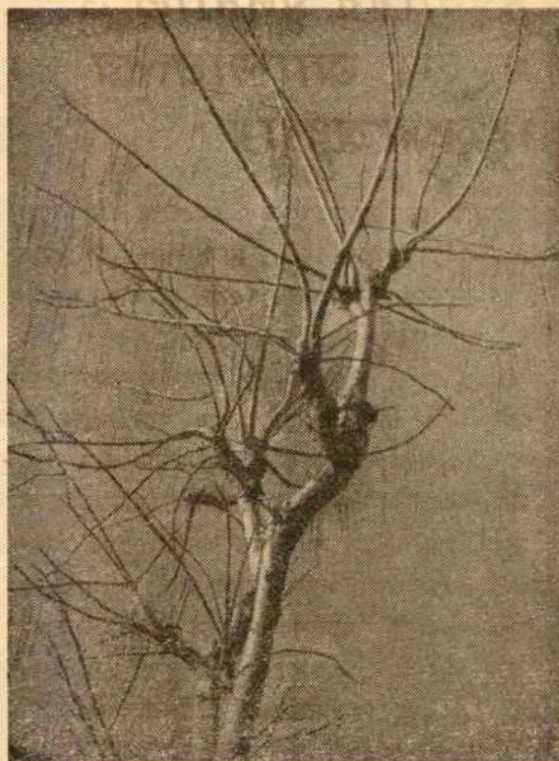
পারে কোনরকমে। প্রথম সপ্তাহটা না হয় থামুন, কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহ যেই পড়বে অমনি ডাঁটাগুলো ডালসমেত কেটে ফেলুন। না, একটা ডালও রাখবেন না, সব কেটে ফেলুন—গুঁড়িটা মাত্র দাঁড়িয়ে থাকুক ন্যাড়ামুড়ো হয়ে। বছরে একবার ক'রে এমনিধারা ডালগুলো ছেঁটে দিলে গাছটা দ্বিগুণ বেড়ে ওঠে, আগের চাইতে বেশি পাতা গজায়, বেশি ক'রে ডাল মেলে।

ডালগুলো কেটে ফেলে এখন আপনি ভাবছেন ডালের এই বড়ো ডাঁটাগুলোকে নিয়ে কী করা যাবে? ভাববার কিছুই নেই, যতগুলো সম্ভব রেখে দিন বাড়ির জন্য। ভিজে ন্যাকড়া জড়িয়ে রাখলে ৭-৮ দিন থাকবে এগুলো। বাকিগুলো সব আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়িতে বাড়িতে পাঠিয়ে দিন; তারা সব ভাবুক, কী আপনার লোক গো—চাই নি, তবু বাড়িতে বসে দিয়ে গেল!

আর ওই যে ডালগুলো, ওগুলো গাঁয়ের আর ভিনগাঁয়ের লোক এসে তুলে নিয়ে যাবে—যাদের বাড়িতে সজনেগাছ নেই, তারা সেসব লাগাবে। ঠিক আপনি যেমন কেটে-ফেলা ডাল বয়ে এনে সব্বলে গাছ তৈরি করেছেন, ওরাও তেমনি করুক। যে গাছ বারো মাস আমাদের তরকারি যোগায়, সে গাছে ভ'রে যাক পল্লীর সব বাড়ি। তরকারির কষ্ট তাদের ঘুচুক।

সজনের ডাঁটার মধ্যে দেখবেন বীজ আছে। সেই বীজ থেকেও অবশ্য গাছ হয়। কিন্তু বীজ থেকে জন্মানো গাছের নাকি বেশিরভাগই বারোমাসে হয়ে যায়। অর্থাৎ বারো মাসই তাতে ফুল ফোটে—ফল ধরে। আর এ রকম গাছের ফুল ফল দুই-ই হয় অপদ্রুত। ফুলগুলো হয় এইটুকুটুকু—ডাঁটাগুলো হয় সরু সরু পাক দেওয়া দাঁড়ির মত। খেতে ভাল লাগে না তেমন। আর তা তো হবেই। সময়ের ফুলটি-ডাঁটাটি খেতে যেমন লাগে, অসময়ের ফুলটি-ডাঁটাটি খেতে কী আর তেমন লাগে? তাই ডাল দিয়ে তৈরি করা গাছই হ'ল ভাল গাছ।

গাছে সজনেউটা ঝুলছে



সব ডাল ছেঁটে ফেলার পরে ছাড়া সজনেগাছ

[আলোকচিত্রী—লেখক]

সমবায়ের মূলনীতি ও সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন অধ্যায়

“সমবায়” কথাটির সহজ অর্থ একযোগে কাজ করা। প্রখ্যাত সমাজ-মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল দেখিয়েছেন যে, মানুষের মনে দলবদ্ধ হওয়ার যে সাধারণ সহ-জাত মনোবৃত্তি রয়েছে তার দু’টি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে; একটি হচ্ছে (ক) আবেদন—যার অর্থ, মানুষ একা একা অসহায় বোধ করে বলে সে অন্যদের সঙ্গে কামনা করে; দ্বিতীয়টি হচ্ছে (খ) সামাজিকতা বা দলবদ্ধতা—যার অর্থ, মানুষ কেবল সংগই চায় না, সে সমষ্টিগত কার্যকলাপেও অংশগ্রহণ করতে চায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকারী যে ক’টি মূলগত আকাঙ্ক্ষা আছে, একসাথে কাজ করা তার মধ্যে অন্যতম। প্রত্যেক ব্যক্তির এই মৌলিক আকাঙ্ক্ষাকে পূরণানুপূরণরূপে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-আর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের কাজে তা লাগানো হয়েছে। সামাজিক-আর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সমবায়ের একটি বিশেষ অর্থের উদ্ভব হয়েছে।

সমবায় কী

সমবায় প্রথার শিক্ষাদাতাদের মধ্যে সমবায়ের এত রকম সংজ্ঞা প্রচলিত রয়েছে যে, সেগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করার চেয়ে তাদের মূল বক্তব্যটির উল্লেখ করাই ভাল। সমবায় হচ্ছে সামাজিক বিষয়বস্তু সহ একটি আর্থনৈতিক ব্যবস্থা। আর্থনৈতিক ও সামাজিক, এই দুই দিককেই প্রভাবিত করেছে এর আদর্শবাদ। এর আর্থনৈতিক আদর্শগুলির প্রতিক্রিয়া হয়েছে ব্যবসায় এবং তার প্রণালী ও পরিচালনার ওপর। সামাজিক আদর্শগুলি প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার

করেছে সমবায় আন্দোলনে সমবেত ব্যক্তিদের উপর, বিশেষত তাঁদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের উপর। সকলের সাধারণ স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে বা স্বনির্ভরতা ও পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে সকল সাধারণ লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যবসায়ী মনোভাব প্রবর্তনের এ হল একটি বিশেষ উপায়। যোগদানকারী সদস্যদের মধ্যে সহযোগিতার ওপরই এই সংঘের কাঠামো প্রতিষ্ঠিত। যোগদানকারী সদস্যদের স্বারা নিয়ন্ত্রিত এই সংঘ কাজ করে সদস্যদেরই মঙ্গলার্থে।

অন্য সব সংঘ থেকে এর পার্থক্য

ট্রাস্ট, কার্টেল প্রভৃতি অন্য সব সংঘ থেকে সমবায় সমিতির পার্থক্য মূলত এই যে, সদস্যদের সাধারণ স্বার্থসাধন এর মৌলিক লক্ষ্য হলেও সমাজের অন্য সব ব্যক্তির ক্ষতি করে তা করা হয় না। এর ব্যবসা গতানুগতিক লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে চলে না, চলে কার্যকরী পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে। সমবায় প্রথার গভীরতর অর্থ বিভিন্ন ব্যক্তির সমস্যাবলী সমাধানের প্রকৃত পন্থা এবং একদিকে আয়ের উৎস বৃদ্ধি ও অপরদিকে অযথা ব্যয় নিবারণ করে উক্ত ব্যক্তিদের আর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা। ১

আরও প্রশস্ত পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সমবায় হল শিক্ষিত ও প্রগতিশীল নাগরিক সৃষ্টি করার এক সুনির্দিষ্ট ও প্রত্যক্ষ উপায়। একই স্বার্থসাধনের জন্য বহু মানুষের যে একযোগে কাজ করা—এই জিনিসটিই একে দিয়েছে শৃঙ্খমাত্র ব্যক্তিগত লাভের আর্থনৈতিক বিচারের উদ্দেশ্যে এক নৈতিক

(১) শ্রীমণিলাল দি, নানাবতী রচিত “রিঅর্গানাইজেশন অব দি কো-অপারেটিভ মুভমেন্ট”

মূল্য। সমবায়কে নৈতিক আন্দোলন হিসাবেও অভিনন্দন জানানো হয়েছে, কারণ, প্রকৃত সমবায়ীর লক্ষ্য স্বনির্ভরতা, মিতব্যয়িতা, বিশ্বস্ততা, সততা, পারস্পরিক সহায়তা ও আনুগত্যের অভ্যাস এবং জীবন উন্নত করে তোলার জন্য আর যা যা মানবিক গুণ দরকার তা অর্জন।

ব্যবসায়িক ও নৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই সমবায় বয়স্ক শিক্ষার এক কার্যকরী পরিকল্পনা। সমবায়ীর মনে সমবায় প্রথা স্বনির্ভরতা ও যৌথ প্রচেষ্টার ছাপ রেখে দেয় এবং তাঁকে শ্রেয়তর নাগরিকরূপে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

একজন নেতৃস্থানীয় সমবায়ী শ্রী আর জি সারাইয়া সমবায় ব্যবস্থার উপর এইভাবে আলোকপাত করেছেন—“একটি প্রণালী ও একপ্রকার মনোভাব, এই উভয়ে মিলেই হ’ল সমবায়; এটি একটি কার্যধারা ও নৈতিক শক্তিও বটে। এ ছাড়াও, সমবায় হচ্ছে আইনানু-মোদিত এক ধরনের সংগঠন এবং সাধারণ মঙ্গলের জন্য ছোট ছোট ইউনিটগুলিকে তাদের নিজস্ব সম্পদ একত্র করতে সাহায্য করতে পারে, এরূপ একটি আর্থনীতিক কার্যধারা।” তাই সমবায়ের আদর্শ হ’ল—“প্রত্যেকেই সকলের জন্য এবং সকলেই প্রত্যেকের জন্য”। ২

সমবায়ের মোটামুটি উদ্দেশ্য

“সমগ্র মানবোচিত্রকে দেখা গিয়েছে যে, মানুষের মধ্যে সমবায়ী মনোভাব কেবল স্বাভাবিকই নয়, কোন রকম স্বার্থপ্রবণতার অপেক্ষা এ মনোভাব অনেক দৃঢ়মূল”। ৩

শিল্পবিপ্লবের অনিবার্য পরিণাম হিসাবে ব্যক্তিগত আর্থনীতিক ও সামাজিক ভারসাম্য ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। শিল্পক্ষেত্রে লাভের উদ্বেগের অসঙ্গত বণ্টন উৎপাদনের উপায়গুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার মারাত্মক দৃষ্টিগুলি

উদ্ঘাটিত করেছে। আর্থনীতিক উন্নয়নের পরি-বর্তিত অধ্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে মানবিক সম্পর্কে প্রয়োজনমত অদলবদলের জন্যই সমবায় প্রথার উদ্ভব হয়।

যন্ত্রপাতি ও মানবিক শ্রমের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের উপায়-রূপে মূলধনের অপরিহার্য ভূমিকাই প্রাধান্য অর্জন করেছে। যাঁরা একাধারে উৎপাদনকারী ও ব্যবহার-কারী, সেই সমিতিভুক্ত সদস্যদের মধ্যে উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা বণ্টন করে দিলে শিল্পের পুনর্জন্মের জাজ্বল্যমান দৃষ্টিগুলি দূর হবে। পুনর্জি-বাদ ও সমাজবাদ—এই দুটি চরম বাদের মধ্যে ‘মধ্যপন্থা’ হ’ল সমবায় এবং এভাবে একে বিভিন্ন আর্থনীতিক ব্যবস্থার সমন্বয় হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। উপরন্তু, সমবায়ই হ’ল আর্থনীতিক গণতন্ত্র।

সামবায়িক সমাজের জন্য ওয়েনের আন্দোলন প্রধানত প্রচলিত গোঁড়া ব্যক্তিগতবাদের, ব্যক্তিগত উদ্যম এবং পুঁজিসী রাষ্ট্রের মতবাদের জন্যই প্রসারিত হ’তে পারে নি, কিন্তু এর মধ্যের মূল-নীতিগুলি সমবায়ের দিকে জনসাধারণের মনকে চালিত করে এবং পরবর্তীকালে সমবায়ের একটি বিশেষ দিক, যথা, ক্রেতা-আন্দোলনের উদ্ভব এর থেকেই হয়। ঋণের মাধ্যমে কৃষি-অর্থনীতিতে সহায়তা দানের জন্য যে রাইফাইসেন পরিকল্পনা রয়েছে, তা উচ্চ আদর্শবাদ সহকারে প্রবর্তন করা হ’লেও জার্মানীর অর্থনীতিতে বিভ্রান্তকারী পরিবর্তনের ফলে খর্বিত ও বিকৃত হয়ে পড়েছিল। এ সত্ত্বেও সমবায়ের মূলনীতিগুলি প্রয়োগ করে প্রচুর সফল পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু কোন দেশের সামাজিক ও আর্থনীতিক কাঠামো গড়ে তোলার কাজে সামবায়িক পদ্ধতি প্রয়োগের সম্ভাবনা এখনও উপলব্ধি করা হয় নি। বেশির ভাগ দেশেই সমবায়

(২) শ্রী আর জি সারাইয়া রচিত “কো-অপারেটিভ অ্যাণ্ড দি স্টেট”

(৩) রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা কর্তৃক ১৯৫০ সালের জুলাই-এ প্রকাশিত “স্টেটমেন্ট অন রেস”

আন্দোলনকে রাষ্ট্রের নির্ধারিত ব্যবস্থাবলী রূপায়ণকারী সংগঠনে পরিণত করা হয়েছে। তবে বহু নেতৃস্থানীয় সমবায়ী সমবায় আন্দোলনের বিপুল সম্ভাবনা উপলব্ধি করেছেন। উন্নততর কৃষিব্যবস্থা, উন্নততর ব্যবসা ও উন্নততর জীবন-যাত্রার যে লক্ষ্য হোরেস প্লাঙ্কেট নির্দেশ করেছেন, তা আর্থনীতিক দিক দিয়ে গণতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজের দিকেই নিয়ে যাবে।

সমবায়ের আদর্শ ও মূলনীতি

সমবায়ের মূলনীতি ও কর্মসূচি প্রণয়নের আগে রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নোক্ত বিষয়টিও আমাদের বিবেচনা করতে হবে: “সমবায় সংস্থাগুলি কীভাবে গঠিত ও পরিচালিত করা হবে, সে সম্বন্ধে খাদ্য ও কৃষি সংস্থার কোন নিজস্ব সূত্র নেই, শুধু এইমাত্র বলা যেতে পারে যে, এগুলিকে জনস্বার্থের অনুকূল হ’তে হবে ও স্থানীয় প্রয়োজন ও সংস্কৃতির সঙ্গে এগুলিকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এগুলি স্থানান্তরের একেবারে বিপরীত এবং শুধু আর্থনীতিক কার্য-সাধনেরই নয়, শিক্ষা বিস্তারের ও জীবনধারণের উচ্চতর মান অর্জনেরও কার্যকরী সংস্থা। সমবায়ের যা আদর্শ, অর্থাৎ মানুষকে আত্মনির্ভর-শীল হ’তে সহায়তা করা—তা যে মানুষের মর্যাদাই বাড়িয়ে দিচ্ছে, সে কথা বিশ্ববাসীকে উপলব্ধি করতে হবে।” ৪

সমবায়ের মৌলিক নীতি ও পদ্ধতিগুলি নিম্নোক্ত বিভিন্ন দিক দিয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে:

স্বর্জনীয়তা: সমবায়ীদের মধ্যে জাতি, আদর্শ, বর্ণ বা লিঙ্গ-সম্পর্কে কোন মতবিরোধ থাকা উচিত নয়। যেহেতু পণ্যের ব্যবহারই সব কিছুর মধ্যে রয়েছে, সেজন্য ব্যবহারকারীদের সমবায় সমিতির মধ্যেই এই নীতির সর্বাধিক প্রয়োগ হওয়া উচিত।

উৎপাদনকারীদের সমবায় সমিতিগুলিতেও সমবায়ীদের মধ্যে লিঙ্গ, জাতি বা আদর্শের ভেদাভেদ ঢোকানো উচিত নয়।

গণতন্ত্র: সর্বাধিক পরিমাণ বিকেন্দ্রীকরণ এবং ব্যবসাগত নিয়ন্ত্রণের মানবীয়করণই গণতান্ত্রিক আদর্শবাদের লক্ষ্য। সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তিগত সহযোগিতার উপরেই নির্ভর করে। পরিচালনার উপর নিয়ন্ত্রণ যথাসম্ভব গণতান্ত্রিক হওয়া উচিত। অংশীদারী মূলধনের পরিমাণ যাই হোক না কেন, সমিতির কার্যপরিচালনা কালে কোন সদস্যেরই একটির বেশি ভোট থাকবে না। প্রাক্তর দ্বারা ভোটদানও অনুমোদন করা হবে না। কার্যকরী নীতি রূপায়ণের বিষয়ে ভোটের ফলাফল অনুযায়ী সংখ্যাগুরু অংশের মতামতই গৃহীত হবে; অবশ্য, বিরোধী সংখ্যালঘু সদস্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সংযোগ স্থাপন করে গৃহীত নীতির মূল্যায়নে তাঁদের সাহায্য করতে হবে। কর্মদক্ষতার জন্য কেন্দ্রীভূত প্রশাসন ব্যবস্থা প্রয়োজন হলেও, গণতন্ত্রের খাতিরে বিকেন্দ্রীকরণকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

সমস্বার্থ-সম্পন্ন সকল ব্যক্তির জন্য সদস্যপদ এবং সকল সদস্যেরই সমান অধিকার, দায়িত্ব ও সুবিধা, এগুলিই কোন সমবায় সমিতি গঠনকার্যে ঐক্য-বিধায়ক মালমসলা হওয়া উচিত।

স্বাবলম্বন

“কোন ব্যক্তি একা যে কাজ করতে পারেন না, যৌথ ব্যবস্থাবলম্বনের যন্ত্রসাহায্যে সমবায় সমিতি যখন সে কাজ করতে তাঁকে সাহায্য করে, তখনই সমবায়ের উপকারিতা সর্বাপেক্ষা বেশি উপলব্ধি করা যায়।” বিশেষ করে উৎপাদনের উপায়-সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাগুলিকে সমবায়ের আওতায় উৎসাহিত করা উচিত। সরবরাহ ও চাহিদার জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিই সমবায় ব্যবস্থার মধ্যে সর্বাধিক উপযুক্ত অংশরূপে

(৪) ফোর্ড ফাউন্ডেশন কমিশনের বিবরণী—মার্চ ১৯৫৪

প্রমাণিত হয়েছে। সংক্ষেপে, ব্যক্তিই অন্যদের সহায়তায় তাঁর নিজ সামর্থ্য সংহত করতে সক্ষম হন। সুতরাং, সমবায় সংগঠনের আদর্শ হওয়া উচিত সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত সংগঠিত প্রচেষ্টার দ্বারা প্রবর্তিত স্বাবলম্বন।

স্বেচ্ছামূলক সমিতি: সমবায়কে বলা হয়েছে “স্বাবলম্বনের বৃহত্তর সংস্করণ”, অর্থাৎ নিজের এবং অন্যদের অবস্থার উন্নতির জন্য কোন সমিতির সদস্যদের সমবেত প্রচেষ্টা। সমবায়ীরা সকলেই “সংগঠিত স্বেচ্ছামূলক কাজের অসীম কার্যকরী মূল্য” স্বীকার করেছেন ও তার উপর জোর দিয়েছেন। সামবায়িক কমনওলথ-পন্থী দলের মতানুযায়ী সমিতির পরিপূর্ণ স্বেচ্ছামূলক প্রকৃতিটিই মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে; কোন কোন চরমপন্থী রাষ্ট্রের মত কোন সংস্থার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণের নিন্দা করেছেন, কারণ জনসাধারণের কল্যাণের জন্য শাসনকার্য চালাবার দাবি করে থাকেন, এমন কোন সরকারের পক্ষে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে প্রণয় দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু সমবায় আন্দোলনকে যারা জাতির আর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা সমাধানের এক দ্রুত পন্থাহিসাবে গণ্য করে থাকেন তাঁদের প্রতি হার্বার্ট স্পেন্সারের নিম্নোক্ত কথাগুলি প্রযোজ্য: “স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা যে পরিমাণে বর্জন করা হবে, ঠিক সেই পরিমাণেই বাধ্যতামূলক সহযোগিতার প্রবর্তন করতে হবে।”

সদস্যদের মধ্যে কার্যকলাপ: রকডেল সমিতি তাদের বিক্রয়ের কাজ সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখলেও তাঁদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হিসাবে “সদস্যদের নিকট বিক্রয়”-এর উল্লেখ করা হয়েছে। সদস্যদের মধ্যেই সামবায়িক কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখার ফলে সমিতির গুণগত ও

পরিমাণগত উন্নতি যে অব্যাহত আছে, এই বিষয়টিকে কয়েকজন সমবায়ী সমিতির মধ্যে অব্যাহত বা অনতিআগ্রহী ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। পরিচিত সদস্যসমষ্টি সমন্বিত সমিতির কোন সুনিশ্চিত বাজার নেই এবং অ-সদস্যদের মধ্যে কার্যকলাপ প্রসারিত করলে ক্রয়ক্ষমতা সুসংগঠিত করার একটি উপায় পাওয়া যাবে, এই যুক্তিতে ডাঃ সি আর ফে সদস্য এবং অ-সদস্য উভয়ের মধ্যেই সমিতির কার্যকলাপ প্রসারিত করা সমর্থন করেছেন। এ ছাড়াও তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন যে, সম্পূর্ণ সহযোগিতা আবাস্তব ও ব্যর্থ; বরং সমবায় সমিতির মাধ্যমে আংশিক সহযোগিতাই সংগঠনটিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে।

ক্রেতাদের সমবায় সমিতিগুলির ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত মন্তব্যটি খুবই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু উৎপাদনকারীদের সমিতিগুলির ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে উৎপাদনের কাজের সঙ্গে সঙ্গে অ-সদস্যদের মধ্যে বিপণনকার্যের সম্প্রসারণ খুবই প্রয়োজন।

সততাকে মূলধন হিসাবে ব্যবহার: ব্যবসাক্ষেত্রে কোন বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সামবায়িক উদ্যমের রক্ষাকবচ হ'ল লুইগি লুজাথের নীতিবাক্য—“সততাকে মূলধন হিসাবে ব্যবহার”। সামবায়িক উদ্যমের প্রাণ হচ্ছে উদ্দেশ্যের সততা। ব্যবসায়িক লেনদেনের সময়েও স্পষ্টবাদিতা ও সারল্য বজায় রাখা উচিত। এই আন্দোলন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী জোরের সঙ্গে বলেছেন যে “সমবায় আন্দোলন যে পরিমাণে ধর্মীয় প্রেরণাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত একটি নৈতিক আন্দোলনে পরিণত হবে, সেই পরিমাণে এটি ভারতের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ হবে।

মূলধন ও দায়িত্ব: শ্রমিক নিয়োগ ও কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন। আবার, গৃহাদি

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

ক্রয় ও নির্মাণের জন্য ক্রয়ক্ষমতাও অত্যাৱশ্যক। মালিকানা বন্টন, উৎপাদনের উপায়গুলির উপর নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন শুরুর এবং সমিতির সদস্যদের মধ্যে মাল বিপণন দ্বারা সমবায়ের গণতান্ত্রিক অর্থনীতি সুনিশ্চিত করা যেতে পারে। একে কার্যকরী করার মোটামুটি পন্থা হ'ল উৎপাদন ও ব্যবহারের উপর একটি সুসমঞ্জস নিয়ন্ত্রণ আরোপ। আনুকূল্যের প্রতিদানের নীতি প্রয়োগ দ্বারা সম্পদের সমান বন্টনই সামবায়িক কমনওয়েলথের লক্ষ্য (অখিল ভারত কংগ্রেস দল কর্তৃক গৃহীত)। এই লক্ষ্য সম্মুখে রেখে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করতে হবে:

(১) সামবায়িক সংস্থার অংশীদারী মূলধন সংগ্রহ করার জন্য সদস্যদের কাছ থেকে তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ সংগ্রহ।

(২) কার্যকরী মূলধনের জন্য অন্যান্য সংস্থা থেকে মূলধনের জন্য আরও ঋণ গ্রহণ করা যেতে পারে; তবে, ঋণদানকারী সংস্থাটির পক্ষে এটি মৃত্যু-চুম্বনে না পরিণত হয়, সেদিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

(৩) সেবার মনোভাব দিয়ে মুনোফা-প্রবৃত্তিকে সংশোধন করতে হবে। সমিতির সদস্যদের ব্যক্তিগত আনুকূল্যের অনুপাত অনুসারে সামবায়িক সংস্থার বন্টনযোগ্য উম্বৃত্ত এবং মুনোফা সদস্যদের লগ্নী করা মূলধনের অনুপাত অনুসারে বন্টন করা উচিত নয়।

মোট উম্বৃত্তের একাংশ দুর্দিনে ব্যবহারের জন্য সঞ্চয় হিসাবে রেখে দিতে হবে। আন্দোলনের প্রসারের জন্যও উম্বৃত্তের একাংশ অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে এবং তা করতে হবে ক্রেতাদের সমবায় প্রতিষ্ঠানের যারা সদস্য ন'ন তাঁদের বোনাস দিয়ে এবং এভাবে সমিতির অংশের জন্য একটি তহবিল সৃষ্টির কাজে তাঁদের সাহায্য করে।

(৪) লগ্নীকৃত মূলধনের জন্য কোন সুদ দিতে গেলে তা খুব অল্পহারেই দিতে হবে। এই

(৬) ফোর্ড ফাউন্ডেশন কমিশনের বিবরণী, ১৯৫৪।

নীতিটিকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় বিষয় হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে।

(৫) সদস্যদের সীমাহীন দায়িত্ব বা সীমাবদ্ধ দায়িত্ব বা দায়িত্বের পরিমাণ খুবই বিতর্কের বিষয় এবং বিভিন্ন দেশে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের দায়িত্বের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সীমাহীন দায়িত্ব সদস্যদের আনুগত্য নিশ্চিত করলেও আধুনিককালের চিন্তাবিদদেরা অংশ বা তার গুণিতকের মূল্য বা সমিতির মাধ্যমে চালানো লেনদেনের পরিমাণ অনুযায়ী দায়িত্ব সীমাবদ্ধ করার পক্ষপাতী।

সমবায় সমিতির সমগ্র ব্যবসায়িক কার্যকলাপ নিম্নোক্ত নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া উচিত:—“সমবায় সমিতিগুলির এমনভাবে কাজ করা উচিত যাতে সদস্যদের আত্মসম্মানজ্ঞান বাড়ে। এর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক সদস্যের আর্থিক বান্ধুকি সম্বন্ধেও তদন্ত করতে হবে।” ৬

ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য: সমবায় আন্দোলন যে সামাজিক ও আর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ও অত্যাচারিতদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, এই বিষয়টি থেকেই প্রমাণ হয় যে, সমস্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তির যদি নিজেরাই নিজেদের মুক্তির উপায় বার করতে চান, তাহলে তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তা ও ঐক্য প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করতে হবে:

(১) সমবায়ের কাঠামো থেকে একটি আর্থনৈতিক প্রয়োজন হিসাবে প্রতিযোগিতার উচ্ছেদ।

(২) শিক্ষা দ্বারা সামাজিক ও জাতিগত সংস্কারের উচ্ছেদ। কোন বিষয়ে বিশেষ সুবিধা ও মর্যাদা প্রদান সমবায়ের মূলনীতির পরিপন্থী।

(৩) ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নিরপেক্ষতার উপর বিশেষভাবে জোর দিতে হবে। ধর্মীয় ও দলগত মনোভাবাপন্ন সদস্যদের মধ্যের বাদবিসংবাদ থেকে সমবায়ের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজন সকলেই স্বীকার

করেছেন। সমবায় দ্বারা জাতীয় অর্থনীতির উন্নতি করতে গেলে রাজনীতিক নিরপেক্ষতা খুবই বিতর্কের বিষয়। কিন্তু রাজনীতিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমবায় আন্দোলন কেবল এই আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশই ব্যাহত করে না, এই আন্দোলনের মূল সূত্রেরও অবমাননা করে। রাজনীতিক ক্ষেত্রে সমবায়ীদের প্রবেশ করার জন্য যে আহ্বান অধ্যাপক লাস্কী জানিয়েছেন, তা সমর্থন করা শক্ত, কারণ, কেবল আইনগত ও রাজনীতিক ব্যবস্থা দ্বারাই স্থায়ী ও সমৃদ্ধি অর্জন করা যেতে পারে একথা রাজনীতিকরা বললেও সুদূরপ্রসারী সামবায়িক কর্মসূচির রূপায়ণ ইউনিটরূপী সদস্যদের উদ্যমের উপর নির্ভরশীল।

সামবায়িক মূলনীতি ও পারস্পরিক ব্যবসায় সম্পর্কে শিক্ষাদান

পারস্পরিক ব্যবসায়ের প্রথাটি প্রতিযোগিতা-মূলক ব্যবসায়ের গুরুত্বপূর্ণকারী অ্যাডাম স্মিথের আর্থনীতিক মতবাদের আক্রমণে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কঠোর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদই সর্বত্র প্রাধান্যলাভ করে। কাজেই, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন একটি মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, অর্থাৎ, মানব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শূভ প্রবণতাগুলিকে উদ্দীপিত করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উগ্রতাকে নমনীয় করার সমস্যা। ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অভাবই জীবনের সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেছে। শিক্ষার লক্ষ্য নিম্নোক্তদিকে চালিত করতে হবে:

(১) প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে একজন ভাবী সমবায়ী সেই বৈজ্ঞানিক তথ্যটি শিক্ষা দান; সমবায় আন্দোলন সংগঠনের জন্য ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলির মধ্যে এক সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করা এবং সাধারণ লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যটিকে ব্যবহার করা; সমাজের যে-কোন স্তরের ব্যক্তিকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে উন্নততর জীবনের সন্ধান দেওয়া; সমবায় পদ্ধতির আর্থ-নীতিক উৎকর্ষ প্রমাণ করা।

(২) সদস্যরা যাতে আরও উন্নত ধরনের সদস্য হতে পারেন এবং অ-সদস্যদের কাছ থেকে যাতে প্রত্যক্ষ ও অ-প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পাওয়া যায়, সেজন্য সমবায়-সংক্রান্ত শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। সমবায়-সংক্রান্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য উন্নততর উৎপাদনকারী ও ক্রেতা, বিচক্ষণ নাগরিক এবং মানবজাতির জন্য শান্তি অর্জনের কাজে উৎসাহী সহযোগী সৃষ্টি।

(৩) ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে আরও দক্ষতা অর্জনের এবং সমবায়ের ভিত্তিতে ব্যবসা সংগঠন ও পরিচালনের কৌশল আয়ত্ত্ব করায় সমবায়ীদের সাহায্যদানের জন্য তাঁদের বিশেষ শিক্ষণ দিতে হবে।

(৪) আন্দোলনের পথনির্দেশের জন্য অধ্যয়ন ও গবেষণা বিভাগের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সর্বশেষে, “সমবায়ই একপ্রকারের শিক্ষা”—এই মর্মে যে উক্তি ডেনমার্কের ডাঃ পিটার ম্যানিচে করেছেন, তা আমাদের স্মরণ করতে হবে।

সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন পরিচ্ছেদ

আর্থনীতিক দিক দিয়ে অত্যাচারিত মানব-গোষ্ঠীর প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত সমবায় আন্দোলন আর্থনীতিক ও সামাজিক কাঠামোর সম্ভবপর সর্বাধিক পরিমাণ অংশের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়েছে। উপরন্তু, স্থিতিস্থাপক ও নমনীয় সমবায়ের সূত্রগুলি সামাজিক ও আর্থনীতিক শক্তির দ্বারা আবদ্ধ মানবজাতির যে-কোন অংশের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। এর খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতার জন্য স্থানীয় অবস্থার উপযোগী রূপ এই আন্দোলন পরিগ্রহ করেছে; সাধারণ শ্রেণীবিভাগ দ্বারা এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনা উপলব্ধি করা যাবে না। সুতরাং, যেসব দেশের অর্থনীতিতে এই আন্দোলনের প্রাণস্পন্দন অনুভূত হচ্ছে, সে সকল দেশের উল্লেখ করে সমবায় আন্দোলনের প্রসার দেশ-ওয়ারী ভিত্তিতে দেখাতে আমি মনস্তুষ্ট করছি।

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

গ্রেট ব্রিটেন: শিল্প-বিস্তারের অব্যবহিত পরবর্তী কুফলগুলি, যথা—স্বদেশে ধনসম্পদের অসম বণ্টন এবং বৈদেশিক বাজারগুলিতে দরের ওঠানামা কল্যাণমূলক সমিতি আইনকে শ্রমজীবী জনসাধারণের সাহায্যার্থে কার্যকর করার পথ পরিস্কার করে দিয়েছে। সমবায় আন্দোলনের জনক রবার্ট আওয়েনই (১৭৭১—১৮৫৮) প্রথম ব্যক্তি, যিনি সমিতির আদর্শ সৃষ্টি করেন এবং “সমবায়” শব্দটি ব্যবহার করেন; অবশ্য এই শব্দটি ব্যবহার করা হয় প্রতিযোগিতার বিকল্প হিসাবে। সামবায়িক নীতির ভিত্তিতে কোন স্থানে বসবাসে ইচ্ছুক সমবায়ীদের জন্য এক সাধারণ জীবনযাত্রার, অর্থাৎ একটি সাধারণ রন্ধনশালা, মেস ইত্যাদির ব্যবস্থা করাই ছিল আওয়েনের আদর্শ। ডাঃ উইলিয়াম কিং-এর পৃষ্ঠপোষকতায় অনেকগুলি বাণিজ্যিক সমিতি স্থাপিত হ’ল বটে, কিন্তু সেগুলি শীঘ্রই অসাফল্যের সম্মুখীন হ’ল। “ক্ষমার্ত চতুর্থ দশকে” রচডেলের ২৮ জন সাহসী তন্তুবায় তাঁদের স্বাবলম্বনের কার্যকরী পরিকল্পনাটি উদ্ভাবন করলেন এবং ১৮৪৪ সালের ডিসেম্বরে ১৪ পাউন্ড কার্যকরী মূলধন এবং পাঁচটি পণ্যদ্রব্যের মজুত নিয়ে টোড লেনে একটি ছোট দোকান স্থাপন করলেন।

সমবায়ের মূলনীতিগুলির উদ্ভাবন

রচডেল সমিতির এই সমানাধিকারবাদী পথিকৃতরা আটটি মৌলিক মূলনীতি প্রবর্তন করেন এবং এগুলি আধুনিক প্রণালীবদ্ধ সামবায়িক আন্দোলনের মূলসূত্র হিসাবে এখনও পৃথিবীর সর্বত্র স্বীকৃত হয়ে থাকে। এগুলি হচ্ছে সর্বজনীন সদস্যপদ, গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, সদস্যদের লেনদেনের পরিমাণ অনুসারে তাঁদের মধ্যে উদ্ভূত অর্থ বণ্টন, মূলধনের উপর সমীকৃত সুদ, নগদ কারবার, রাজনীতিক ও ধর্মীয় নিরপেক্ষতা এবং

শিক্ষা-বিস্তার। আন্তর্জাতিক সমবায়ী সংঘের সদস্যপদলাভের শর্ত হিসাবে এগুলির প্রথম চারটি সংঘের ১৯৩৭ সালের মহাসম্মেলনে গৃহীত হয়। ১৮৪৮-১৮৫৪ সাল থেকে কর্মীদের সাথে একযোগে খ্রিস্টান সমাজতন্ত্রীদের আন্দোলন সামবায়িক গবেষণা ও শিক্ষায় অনেক সাহায্য করে।

এখানে সমগ্র আন্দোলনটিই প্রধানত ক্রেতাদের আন্দোলন এবং খুচরা বণ্টনকারী সমিতিগুলিই সকলের উপরে। এগুলি ১৮৯৩ সালের শিল্প ও ভবিষ্যৎ সংস্থানকারী আইন মেনে চলে। খুচরা সমিতিগুলি উৎপাদনমূলক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে এবং সদস্যদেরও সেবা করে। “জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত” প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস এই সমিতিগুলিই সরবরাহ করে। ১৮৬৩ সালে পাইকারী সমবায়ের আদর্শ পাইকারী সমিতির রূপগ্রহণ করে। কো-অপারেটিভ হোলসেল সোসাইটি লিমিটেড (সি ডব্লিউ এস) পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি। এই সোসাইটির ব্যাংকিং ও বীমা বিভাগ সমগ্র আন্দোলনেরই অর্থভান্ডার হিসাবে কাজ করে। এর থেকে স্থাপত্য, আইনগত পরামর্শ, পরিসংখ্যান প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকে সাহায্য পাওয়া যায়। গ্রেট ব্রিটেনের শিল্প-উৎপাদন সমিতিগুলি কেবল যার উপর এগুলি একান্ত নির্ভরশীল, সেই ক্রেতা-আন্দোলনেরই অনুষ্ণু হিসাবে রয়েছে। ১৮৬৭ সালে আরম্ভ কৃষি-সমবায় আন্দোলন দেশের যথেষ্ট সেবা করেছে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইংল্যান্ড তার স্বাভাবিক জীবন দ্রুত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সমবায় পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। হোরেস প্লাস্কেট ফাউন্ডেশন কো-অপারেটিভ গিল্ড এবং আন্তর্জাতিক সমবায় সংঘের মত নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সমবায় পদ্ধতিতে সদস্যদের শিক্ষাদান ও সমবায়ের অনুকূলে তাঁদের মত সংগ্রহের কাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

সমবায় ঋণদান আন্দোলন

জার্মানী: সংগঠিত পদ্ধতিরূপে সমবায় ব্যাংক-এর উৎপত্তি হয় জার্মানীতে। ১৮৫০ সালে শুলৎস-ডেলিশ বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র, উচ্চমূল্যের অংশ, মোটা লভ্যাংশ, স্বল্পমেরাদী ঋণ এবং ভাল বেতনভোগী পরিচালক প্রভৃতির ব্যবস্থা করে সীমাবদ্ধ দায়িত্বের ভিত্তিতে প্রথম ঋণদান সমিতি স্থাপিত করেন। শহরাঞ্চলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যেই এর কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়। ১৮৪৯ সালে রাইফাইসেন ঋণ-মূলধন সম্বল করে তাঁর ঋণদান সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। শুলৎস-ডেলিশ নীতির বিপরীত হিসাবে এটির কর্মক্ষেত্র ছিল ছোট, দায়িত্ব ছিল অসীম, এবং অল্পমূল্যের অংশ ও নিম্নহারে লভ্যাংশ প্রদান, কিস্তিতে পরিশোধ্য, দীর্ঘমেরাদী ঋণদান, এবং অবৈতনিক পরিচালকবর্গই ছিল এর বৈশিষ্ট্য। এ-ছাড়া, যাতে এই ব্যাংকটির কারবার গুটানোর সঙ্গে সঙ্গেই এর এলাকায় আরেকটি নতুন ব্যাংক স্থাপন করা যেতে পারে, সেজন্য এর একটি অবিভাজ্য রিজার্ভ তহবিলও ছিল। রাইফাইসেন ব্যাংকগুলির উদ্দেশ্য ছিল নৈতিক উন্নতির প্রসার। কৃষি-সংক্রান্ত অন্যান্য সামবায়িক ব্যবসাও তারা চালাত।

প্রথম মহাদুস্ক্রের পরবর্তী ব্যাপক মূদ্রাস্ফীতির ফলে এই আন্দোলনগুলি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে, রাষ্ট্রীয় সাহায্য নিয়ে ১৯৩০ সাল নাগাত এগুলি তাদের পূর্বের নির্ভরযোগ্যতা ফিরে পায়। কিন্তু নাৎসী রাজত্বে এগুলিকে সরকারী নীতির অন্তর্গামী হতে হয়। ১৯৪৫ সালে নাৎসী রাজত্বের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দেশবিভাগের ফলে সমবায় আন্দোলন পুনরায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জার্মানীর সোভিয়েট এলাকাতে সোভিয়েট রাশিয়ার যৌথকরণ-নীতিই প্রয়োগ করা হচ্ছে। পশ্চিম জার্মানীতে সব-রকমের সমবায় সমিতি-গুলিকেই ইউনিয়নের মধ্যে সংঘবদ্ধ করা হয়েছে

এবং এই ইউনিয়নগুলি একাধারে সমিতিগুলির হিসাব পরীক্ষক ও তাদের সাধারণ স্বার্থরক্ষকরূপে কাজ করে। ছোট ছোট সমবায়ী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের অভ্যুত্থানের সময় সমবায় ব্যাংক ও ক্রেতাদের সমবায় সমিতিগুলির দ্বারা সাহায্য-প্রাপ্ত (১৮৮৯ সাল থেকে) কৃষি সমবায় সমিতিগুলিকে নাৎসী সরকার সহায়তা দিয়েছিলেন। দু'ধরনের শিল্প-সমিতি (কাঁচামাল সরবরাহ ও পণ্য বিপণন সমিতি) এবং গৃহ-নির্মাণ সমিতিগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ভূমি-আর্থনীতির উপর অশুভত বোঝ এই আন্দোলনের গতি ব্যাহত করে, কিন্তু এর কম গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সুস্পষ্ট করে তোলে। ডঃ উইলিয়াম হোরাসের আন্দোলন কিছুটা অশান্তির সঞ্চার করেছিল, কিন্তু নাৎসী রাজত্বের সময়ে এটি রাইফাইসেন ফেডারেশনের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যায়।

উৎপাদনকারী সমিতি ও তাদের বৈশিষ্ট্য

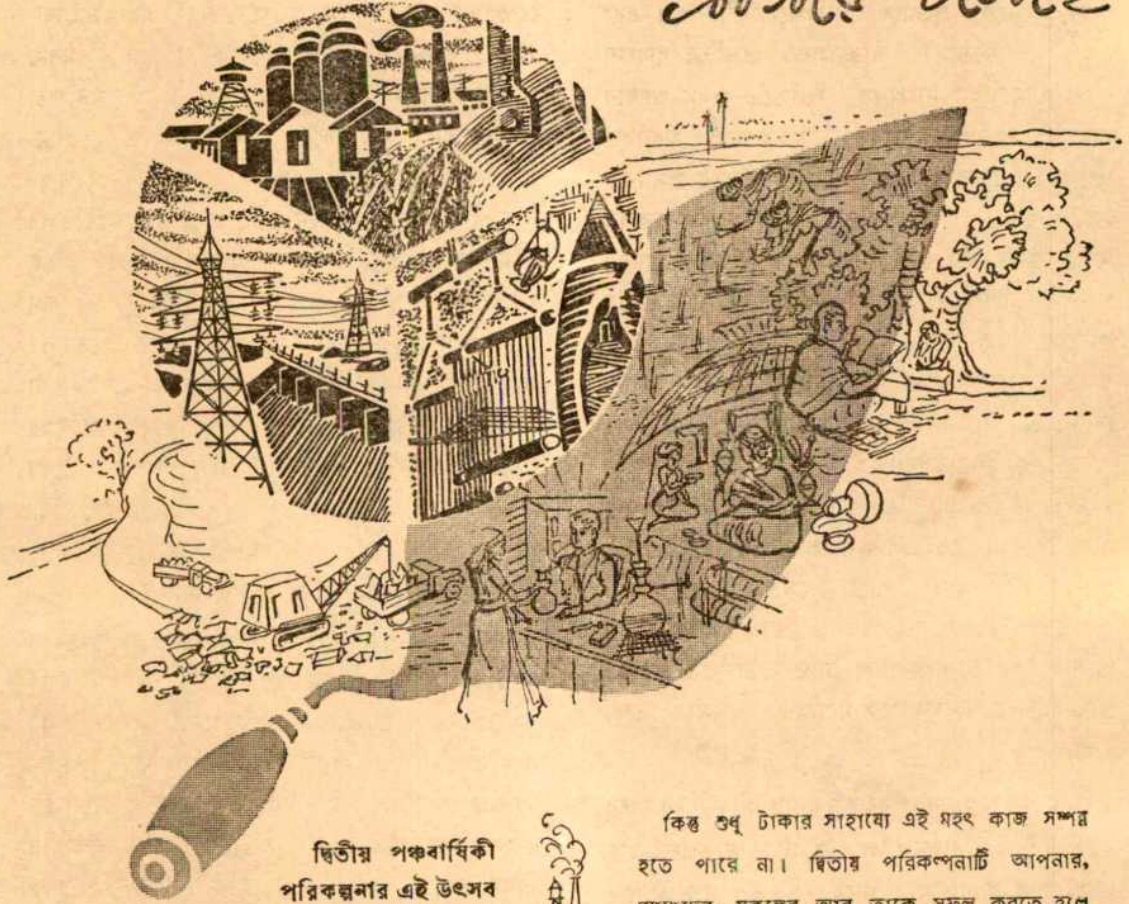
ফ্রান্স: ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের ফলে কৃষকেরা রাষ্ট্রীয় সহায়তায় অগ্রসর হতে সমর্থ হয়। ১৮৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিকদের উৎপাদনকারী সমিতিগুলি এই ধরনের প্রথম সমিতি। এগুলি বিভিন্ন প্রকারের উৎপাদনমূলক ও সেবামূলক কাজে নিয়োজিত ছিল। একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কাজ যাই হোক না কেন, প্রত্যেক দক্ষ শ্রমিককেই একই প্রকার মজুরী দেওয়া হ'ত। রাষ্ট্র নানাভাবে তাঁদের সাহায্য করত।

সাম্প্রতিককালের একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হ'ল, হস্তশিল্পীদের জন্য সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা। শ্রমিকদের উৎপাদনকারী সমিতি ও বণ্টনকারী সমিতিগুলি নিজেদের সাহায্যের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সমবায় ঋণদান তহবিল স্থাপন করেছে।

[ক্রমঃ]

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ

একটি চমকে



দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী
পরিকল্পনার এই উৎসব

উপলক্ষে স্মরণ রাখা ভালো।

যে প্রথম পরিকল্পনাতে ব্যয় হয়েছিল
মাত্র ৭১ কোটি টাকা;—দ্বিতীয়টিতে
হবে তার দ্বিগুণেরও বেশি—১৫৭৭ কোটি টাকা। এই
টাকার প্রতিটি নয়া পরস্য নিয়োজিত হবে—শিক্ষা ও
শ্রমশিক্ষার সম্প্রসারণে, জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে, সেচ ও
কৃষি-উৎপাদনের বৃদ্ধিতে এবং অবরূত সম্প্রদায়ের
অক্ষমতামোচনে—এককথায় বলা যেতে পারে
জনসাধারণের কল্যাণ ও উন্নতির প্রয়াসে।



কিন্তু শুধু টাকার সাহায্যে এই মহৎ কাজ সম্পন্ন
হতে পারে না। দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি আপনার,
আমাদের, সকলের আর তাকে সফল করতে হলে
দেশের প্রত্যেককে সমবেতভাবে কঠিন পরিশ্রম করতে
হবে। আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে—এই ব্রত
উদ্‌যাপনের জন্য। এ পথে যখন আমরা একবার
অগ্রসর হয়েছি তখন আর পিছনে ফিরে যাবার কল্পনা
উঠতেই পারে না।

আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবো

পরিকল্পিত প্রগতির পথে

বন্যা প্রতিরোধ উদ্ভিদের সার্থকতা

শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ

নতুন মাটিতে যে উদ্ভিদ প্রথম জন্ম নেয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয়ে থাকে তৃণ-জাতীয়। এই তৃণ বা ঘাসের আস্তরণ আবরণহীন ভূখণ্ডকে প্রথম সাজিয়ে তোলে। তারপর সেখানে আরসব লতাগুল্ম, আসে—বাতাস, জল আর পাখির ঠোঁটে ভর করে, সবশেষে আসে বৃক্ষাদি এবং তারপর সৃষ্টি হয় বনভূমির। অবশ্য এ কথা বলা ভাল যে, এইসব উদ্ভিদের বীজই প্রথম আসে এবং তা থেকে বর্ষার আবির্ভাবে বীজের অঙ্কুরোদ্গম করে চারা হয় এবং তারপর সে বেড়ে ওঠে, ফুলে-ফলে সমৃদ্ধি লাভ করে।

বিশাল সমুদ্রে যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ নতুন জন্মলাভ করে, সেখানে আমরা প্রকৃতির এই নিয়ম দেখেছি, আরও দেখেছি বিশাল যেসব নদী তাদের খেয়ালে এক পাড় ভেঙে আর-এক পাড়ে নতুন ভূখণ্ড সৃষ্টি করে, সেখানেও প্রকৃতির এই একই নিয়ম।

নতুন তৈরি মাটি প্রথমেই সরস এবং সরল থাকে না কিন্তু তৃণাদির প্রধান গুণই এই যে, তারা শিকড়ের প্রসারের দ্বারা মাটির উন্নতিসাধন করে এবং তাদের পরিত্যক্ত শাখা ও মূল দিয়ে মাটির জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, যার ফলে সেই ভূখণ্ডে অন্যান্য উদ্ভিদের বিস্তার সম্ভব হয়ে ওঠে এবং নাইট্রোজেন-সংগ্রহকারী জীবানুদের প্রসার এবং তাদের সক্রিয় করার সহায়ক হয়। ঘাসের সঙ্গে শিম-জাতীয় উদ্ভিদের নিকট-সম্বন্ধ আছে। তৃণভূমিতে তাদের সব সময়ই একত্র দেখতে পাওয়া যায় এবং পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে, এই যোগসূত্র অভিন্ন। বিজ্ঞানীরা এরই সুযোগ নিয়ে থাকেন।

ঘাসের ব্যাপক প্রসারের জন্য অন্যান্য খাদ্যের মধ্যে তার নাইট্রোজেনের প্রয়োজন খুবই বেশি কিন্তু ঘাস

বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করতে পারে না। অথচ নানা প্রকার শিম বাতাস থেকে জীবানুদের সাহায্যে মাটিতে এই নাইট্রোজেনের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করাতে পারে এবং করে থাকে। ঘাস এবং শিমের এই যোগাযোগের ফলে শব্দ যে তারাই সমৃদ্ধি লাভ করে তাই নয়, তারা যে ভূখণ্ডে বিস্তার লাভ করে তারও সমৃদ্ধিলাভে সহায়ক হয় এবং সেই ভূখণ্ডের উৎপাদন-ক্ষমতা খুব বেড়ে যায়।

এই তৃণভূমি যদি মানুষের আয়ত্তের মধ্যে হয় তবে তার এই সরসতাই তার ধ্বংসের কারণ হয়। মানুষ এই তৃণাদি তার পশুর আহারের জন্য সংগ্রহ করে এবং ক্রমাগত সংগ্রহের ফলে প্রান্তরটি তৃণহীন হয়। এই অবস্থায় ধীরে ধীরে বাতাসের এবং জলের প্রকোপে অনেক দিনে গড়ে ওঠা মাটির উপরকার উৎপাদক আস্তরণ ক্ষয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে নিঃস্ব হয়ে যায়। কিন্তু যদি এই তৃণাদি পশুখাদ্য-সংগ্রহ নিয়ন্ত্রিত হয়, অর্থাৎ সংগ্রহের কাজ যদি ব্যাপক না হয়, তবে তৃণভূমিকে ধ্বংস না করেও কিছু পশু-খাদ্যের ব্যবস্থা হয়ে যায়। যেখানে তৃণভূমি বনভূমির রূপ নিয়েছিল সেখানে প্রথমে ঘরবাড়ি তৈরি হয়, তারপর জলাভূমির প্রয়োজনে গাছপালা ধ্বংস হয় এবং তারপর তৃণভূমিও অচিরে তার পূর্বতন অবস্থায় চলে যায়।

বৃদ্ধিমান মানুষ প্রকৃতির এই নিয়ম দেখে শিক্ষা লাভ করছে। কিন্তু সেই শিক্ষার ব্যাপক প্রসার আমাদের মধ্যে এখনও হয় নি। তার প্রমাণ আমরা খুঁজে পাই ক্রমাগত বন্যার ধ্বংসলীলার মধ্যে।

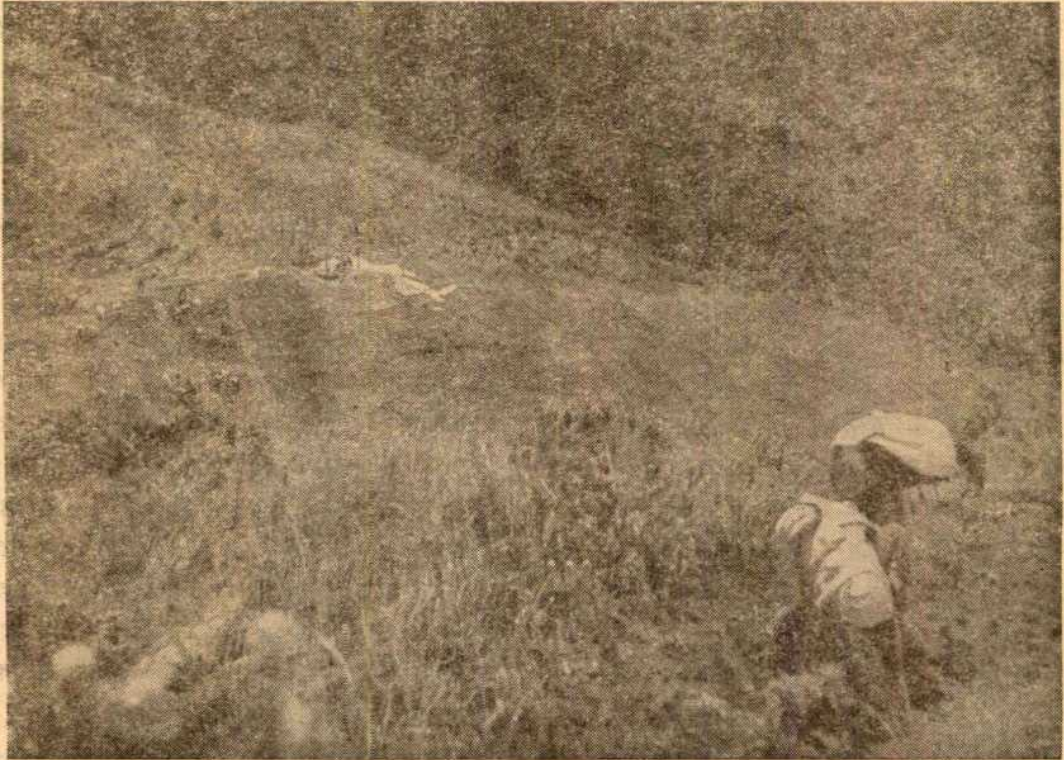
নদীনালায় উৎপত্তি ছোট বা বড় পাহাড়ে। সেখানে যে বর্ষণ হয়, সারা বছর তাকে ধরে রেখে

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

ধীরে ধীরে তার চলার পথে চলতে দেওয়াই প্রকৃতির নিয়ম। এটা কী করে সম্ভব? প্রথমত পাহাড়ে-নদীর উৎপত্তিস্থল তৃণ এবং বৃক্ষলতাদির দ্বারা সুরক্ষিত। বৃষ্টির ধারা তাদের ডাল-পাতায় পড়ে,

আসে। নদীর বৃকে নেমে আসা পাহাড়ের দূর পাশের এই ঢালু অংশকে জলাশঙ্কভূমি বলা হয়।

এই জলাশঙ্কভূমিকে যদি উদ্ভিদহীন হ'তে দেওয়া হয় তবে কী হবে? বৃষ্টির ধারা পড়বে সোজা



সামনের পাহাড়গুলির ঢালে বন-উজ্জ্বেদেব পর চাষ-আবাদ শুরু হয় প্রয়োজনের তাগিদে। প্রবল বর্ষণে এগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ মস্তিকার মূল্যবান উপর-স্তর ধুয়ে ধাসের আকারে নেমে যায় ঝোঁরায় এবং নদীতে। দূরের পাহাড়গুলি এখনও বনে ঢাকা। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা হয় নি ব'লে প্রবল বর্ষণেও ওদব পাহাড় অক্ষত থাকছে এবং থাকবেও। [দার্জিলিং, হিমালয়] : আলেকচন্দ্রী—লেখক

তারপর মাটির বৃকে নেমে আসে। সেখানে তাদের বিস্তৃত শিকড় সেই জল যথাসম্ভব গ্রহণ করে। উদ্ভিদের আস্তরণ দেওয়া মাটির যে অতিরিক্ত জল-ধারণ ক্ষমতা আছে তা দিয়েও কিছুটা সে ধীরে রাখে এবং জলের যে উদ্ভূত অংশ থাকে তা ধীরে ধীরে মাটির মধ্য দিয়ে যেখানে যেখানে পথ পায় সেইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষ্করের মধ্য দিয়ে নদীর বৃকে নেমে

মাটির বৃকে এবং মাটি-পাথর ধূয়ে গড়িয়ে নামবে ধবসের আকারে নদীর বৃকে। নদীর ধাম্মাপথ মাটিতে পাথরে বৃজে গিয়ে সামান্য জলধারণ-ক্ষমতাও তার আর থাকবে না এবং তার ফলে ভবিষ্যতে অল্প বর্ষণেই বন্যা হবে।

তাই আমাদের এই জলাশঙ্কভূমিকে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে রক্ষা করতে হবে। তৃণাদির বৃক্ষকে

অব্যাহত রাখতে হবে যাতে সেখানে অদূরভবিষ্যতে বনভূমি জন্মলাভ করে। কারণ, বৃক্ষরোপণ করে বনভূমির গঠন করা ব্যয়সাধ্য, অথচ এখানে তৃণ-ভূমিকে রক্ষা করলেই বনভূমি আপনা থেকে গঠিত হবে।

যে জলাশয়ভূমির তৃণের আচ্ছাদনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে (যেমন দামোদর, ময়ূরাক্ষী), সেখানে গোচারণ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে এবং প্রয়োজন ও সম্ভব হ'লে বর্ষার প্রারম্ভে তৃণাদি এবং তারই উপযুক্ত শিমের বীজ বপন করতে হবে যাতে সেই জলাশয়ভূমি তার জলধারণ ক্ষমতা আবার ফিরে

পায়। নইলে ভবিষ্যতে বহুমূল্য বাঁধগুলি মাটি-পাথরে বৃজে গিয়ে তাদের কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে।

যেসব নদী হিমালয়ে জন্মলাভ করেছে, তাদের জলাশয়ভূমির রক্ষার জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে চেতনাবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে যাতে তারা বৃক্ষাদি এবং তৃণাদিনির্বাচনে ধ্বংস না করে। সম্ভব হ'লে সম্প্রসারণ-কর্মীদের সাহায্যে নতুন করে বৃক্ষাদি রোপণের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। যেভাবেই হোক জলাশয়ভূমি আমাদের রক্ষা করতেই হবে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, নইলে আমরা নিশ্চিতভাবে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাব।



‘বেয়ার’এর পোকা ও রোগ দমনের ঔষধগুলির
দ্বারা আপনাদের ফসল রক্ষা করুন

ফলিডল-ই ৬০৫

মেটাসিস্টক্স

সেরেসান

অ্যাগালল

কুপ্রাভিট (ওবি ২১)

এইগুলি পশ্চিম জার্মানীর লিভারকুসেনের
ফারবেনফ্যাবরিকেন বেয়ার
দ্বারা প্রস্তুত আসল ঔষধ।

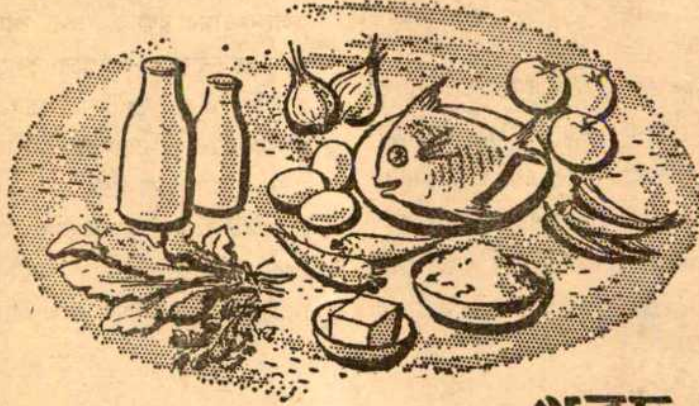
ভারতে পরিবেশক

চিকা প্রাইভেট লিমিটেড,

৩১, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২



মুসম খাবার খেয়ে



খরচ বাঁচান

আজকালকার এই দুর্শ্বলোর বাজারে খরচপত্র বাঁচিয়ে প্রত্যেকদিন মুসম খাবার দাবার খাওয়া আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে ব্যাপারটি একেবারে অসম্ভব নয়। খাবারের মধ্যে স্নেহপদার্থ একটি অত্যাবশ্যক উপাদান। কিন্তু আমাদের দেশে পূর্ণবয়স্কেরা এবং বাড়ন্ত ছেলেমেয়েরা তাঁদের নূনতম প্রয়োজন অর্থাৎ দু'আউন্স স্নেহপদার্থ প্রতিদিন পান না। তার প্রথম কারণ, আমাদের দেশে চাহিদা অনুযায়ী দুধের সরবরাহ অত্যন্ত কম। দুধ আর দুধ থেকে তৈরী অন্যান্য খাবারই স্নেহপদার্থের প্রধান উৎস। দ্বিতীয়ত, মাখন, ঘি ইত্যাদি পাওয়া গেলেও তা সাধারণ লোকের কেনার ক্ষমতার বাইরে। এবারে ধরুন খরচপত্রের কথা। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জায়গাতেই জিনিষপত্র দুর্শ্বল্য হয়ে উঠেছে। সে সব জায়গায় সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকেরা কি

করছে? তারা রান্নাবান্নায় ব্যবহার করছে পুষ্টিকর উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ যেমন, মার্গারিন, শর্টনিং বা ডালডা মার্কা বনস্পতি। এর ফলে তারা যে খাবার দাবার খাচ্ছে তা শুধু পুষ্টিকরই নয়, অত্যন্ত সুস্বাদুও বটে তাছাড়া, এইসব উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ দামেও ঘিয়ের তুলনায় সস্তা। ডালডা বনস্পতি খাঁটি উদ্ভিজ্জ তেল থেকে তৈরী হয়। ডালডার প্রতি আউন্সে ৭০০ অন্তর্জাতিক ইউনিট অর্থাৎ ভাল ঘিয়ের সমপরিমাণ ভিটামিন 'এ' যোগ করা হয়। তাছাড়াও ডালডার প্রতি আউন্সে ৫৬ ইউনিট ভিটামিন 'ডি' যোগ করা হয়। ডালডা সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরী হয় এবং সবসময় শীল করা ডবল ঢাকনা-গ্লা টিনে পাওয়া যায়। এই সব কারনেই প্রত্যেকদিন আরও অধিকসংখ্যক গৃহিনীরা নিশ্চিত মনে ডালডা ব্যবহার করছেন — তাঁরা জানেন, খাবারে অতিরিক্ত পুষ্টির পক্ষে ডালডা অপরিহার্য।



HVM. 315-18 BG

পশ্চিমবঙ্গে কলার চাষ

ঔষমবৈজ্ঞানিক পাণ্ডে

কলা বোধহয় মানুষের পরিচিত সবচেয়ে প্রাচীন ফল। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গরম, আর্দ্র, সমস্ত অঞ্চলে এটি পরিচিত ছিল। সম্ভবত কলার আদিভূমি দক্ষিণ ভারত বা মালয়। কলার সংস্কৃত নাম কদলী। পুরাণে জানতে পারা যায়, ভারতের ঋষিরা কলাগাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতেন এবং তার ফল খেতেন।

কলাকে একটি প্রধান শক্তি-উৎপাদক খাদ্য বলে মনে করা হয়। আমাদের দেহ-গঠনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় সব খনিজ লবণ এবং খাদ্যপ্রাণের বা ভিটামিনের একটি ভাল ভান্ডার হচ্ছে কলা। এতে থাকে ভিটামিন এ, বি-১, বি-২ ও সি, আর থাকে শতকরা ২০ ভাগ শর্করা ও প্রচুর পরিমাণে 'সেলুলোজ'। এগুলির প্রত্যেকটিই দেহের পুষ্টির পক্ষে অপরিহার্য। তাজা ফল হিসাবে কলা তখনই খাওয়া উচিত যখন এটি সম্পূর্ণ পেকে ওঠে। কারণ ঠিক সেই সময়েই শর্করাটি নরম, মিষ্টি, সুগন্ধ-যুক্ত, যথেষ্ট স্দৃশ্যবাদ হয় এবং সহজে পরিপাক হয়ে থাকে।

খাদ্যমূল্যের দিক দিয়ে কলা সব ফলের সেরা এবং শক্তি-উৎপাদন ও 'টিস্ট'-তৈরির উপাদান হিসাবে এটি সব শাকসবজি এমন কি আলুকেও ছাড়িয়ে যায়।

কলার ফলন হয় একরপ্রতি ৩০,০০০ থেকে ৭০,০০০ পাউন্ড পর্বন্ত। যে কোনও খাদ্যশস্য বা ফল থেকে এর গড় ফলন অনেক বেশি। বস্তুত, প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের অনেক উষ্ণমণ্ডলের স্বেপে কলা হচ্ছে আদিবাসীদের একমাত্র খাদ্য। তা থেকে প্রমাণিত হয়, শুধু কলা খেয়েই মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। ভারতে কলা

জন্মানোর প্রধান কেন্দ্রগুলি হচ্ছে মাদ্রাজ, পশ্চিম-বঙ্গ, বিহার, আসাম, অন্ধ্র, কেরালা, মহীশূর ও বোম্বাই রাজ্য।

কাঁচা কলাও রান্না করে খাওয়া যায়। এক রকম কলা আছে যা সবজি হিসাবে কাঁচা ব্যবহার করা হয়—এর নাম আনার্জি কলা বা কাঁচকলা। কাঁচা-কলা শুকিয়ে চূর্ণ করে রাখলে প্রয়োজনের সময় যব, গম বা অন্য শস্যের পরিবর্তে ব্যবহার করা চলে।

উদ্ভিদবিজ্ঞান

উদ্ভিদরাজ্যে কলাগাছের গঠন অন্যান্য ফলের গাছের গঠন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সেইজন্য যারা এই ফলের চাষ করতে চান, তাঁদের কলাগাছের গঠন সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

কলাগাছ হচ্ছে জলপ্রিয়, ডালপালাহীন, নরম-কাণ্ডযুক্ত। এ গাছ ৬ ফুট থেকে ১৫ ফুট উঁচু হয় এবং এর কয়েকটি খুব বড় লম্বা আর চওড়া পাতা থাকে।

মাটির তলায় থাকে একটি গোলাকৃতি মোথা (বাল্ব), তা থেকে লম্বা লম্বা স্পঞ্জের মত মূল-গুলি বেরিয়ে আসে। এই মোথাটিতে (উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের নাম 'রাইজোম') থাকে অনেকগুলি কুণ্ডি—যার প্রত্যেকটি থেকে একটি করে নতুন গাছ জন্মাতে পারে। মাটির ওপর কাণ্ডের মত যে জিনিসটি দেখা যায়, যাকে সকলে কলাগাছের কাণ্ড বলে জানে, তা হচ্ছে কিন্তু একটি মিথ্যা কাণ্ড (সিউডোস্টেম)। এটি আসলে পাতাগুলির খোলা দিয়ে তৈরি একটি নলের মত জিনিস। আসল কাণ্ডটি মাটির তলার মোথা থেকে বেরিয়ে এই নলের মধ্য দিয়ে উঠে যায়। খুব নরম এই

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

কান্ডকেই আমরা বলি 'থোড়'। এরই প্রান্তে শ্রোকা থোকা ফল ধরে।

লাগানোর ১৮ মাসের মধ্যে কলাগাছের ফল পাকে এবং একবার ফসল দিয়েই গাছ ম'রে যায়। এই ছোট জীবনের মধ্যেই এর মাটির নিচের মোথা থেকে অনেকগুলি ছোট ছোট গাছ গজায়। এই গাছগুলির ইংরেজী নাম 'সাকার', বাঙলা নাম 'তেউড়'। এই তেউড়গুলি প্রচুর সংখ্যায় জন্মাতে থাকে এবং পর পর একই জায়গায় বছরের পর বছর ধ'রে ফল দিতে থাকে।

এই ছোট তেউড়গুলির যে-কোনও একটিকে আদি গাছ থেকে পৃথক ক'রে নিয়ে অন্য জায়গায় রোপণ করা যেতে পারে। এইভাবে তেউড়ের মারাই কলাগাছের বংশবিস্তার হয়।

অল্প যত্নেই কলার ফলন মোটামুটি ভাল হয়। যত্ন নিলে ফলন আরও বাড়ে। তা ছাড়া এক বছরের মধ্যেই কলা থেকে আয় পাওয়া যায়। তাই এর চাষ আর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই লাভজনক।

সংস্থান

ভারতের মধ্যে কলাচাষের সবচেয়ে আদর্শ আব-হাওয়া হ'ল বাঙলা, মাদ্রাজ আর কেরালা রাজ্যের। অন্য যেসব রাজ্যে এর চাষ হয় তার কোথাও এত অল্প আয়্যাসে এত ভাল ফলন পাওয়া যায় না।

পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি কলার চাষ হয় কলিকাতার উপকণ্ঠে হুগলি, হাওড়া এবং চব্বিশ-পরগনা জেলায়। মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ইত্যাদি জেলাতেও এর চাষ হয়। হুগলি জেলার চন্দননগরে, শেওড়াফুলি অঞ্চলে, চব্বিশ-পরগনার বারাসত, জয়নগর, মজিলপুর ইত্যাদি এবং হাওড়ার মাকড়দা প্রভৃতি জায়গায় এর চাষ হয় প্রচুর।

জমি ও আবহাওয়া

কলা হচ্ছে সম্পূর্ণ উষ্ণমণ্ডলের ফল। ভাল-ভাবে জন্মানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণে উষ্ণতা ও আর্দ্রতা সারা বছর ধ'রে প্রয়োজন।

সরস মাটি এবং খুব জোলা হাওয়ার পরিবেশে উর্বর ও জলনিকাশের সুবিধাযুক্ত মাটিতে কলা সবচেয়ে ভাল জন্মায়। বিল, খাল, পদ্মকরণী, নালা—এই রকম কোনও জলাশয়ের ধারে, জল দাঁড়াতে পারে না এমন এ'টেল বা দোআঁশ মাটিতে কলা খুব ভাল জন্মাতে পারে। মাটির খাদ্যরস কলাগাছ প্রচুর পরিমাণে টেনে নেয়। তাই যে জমিতে কলাচাষ হবে তার উর্বরতা রক্ষার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। খুব বেশি ঠান্ডা যেমন কলাগাছ সহ্য করতে পারে না, তেমনি খুব বেশি গরমও ওদের সহ্য হয় না। সৌভাগ্যক্রমে বাঙলা দেশের আবহাওয়া বেশির ভাগ জেলাতেই এ ধরনের; কেবল জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার প্রচণ্ড ঠান্ডায় এর চাষ হয় না।

বেশির ভাগ কলাগাছই জল দাঁড়ানো সহ্য করতে পারে না। তাই জমিতে যাতে জল না দাঁড়ায় সেদিকে বিশেষ নজর রাখা উচিত। অবশ্য কাঁটালি কলা কিছুটা জল দাঁড়ানো সহ্য করে। তাই সেই ধরনের অতিরিক্ত আর্দ্র জমিতে এই জাতের কলা লাগানো যেতে পারে।

ঝড়, সাইক্লোন ইত্যাদি কলাগাছ সহ্য করতে পারে না। তাই যেসব জায়গায় প্রায়ই ঝড় হয় সেখানে কলার চাষ ভাল হয় না। সেই কারণে আসামের অনেক জায়গায় কলার চাষ হয় না।

বিভিন্ন জাত

পশ্চিমবঙ্গে কলার অনেকগুলি জাত দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে নিম্নলিখিত জাতগুলি সবচেয়ে পরিচিত এবং সকলের প্রিয়ঃ

(১) কাঁচকলা—এই কলা পাকলে খেতে মোটেই সুস্বাদু নয়, কিন্তু কাঁচা অবস্থায় সর্বাঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থের ঘরে তরকারি রান্নার জন্য এটি চলে। এ কলা কাঁচা অবস্থায় শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে খাদ্যশস্যের বদলে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(২) মর্তমান কলা—এটি খেতে বেশ সুস্বাদু এবং আকারে বেশ বড়। খাওয়ার কলা হিসাবে এটি অনুপম কলার সম পর্যায়ের।

(৩) অনুপম কলা—এটি উত্তরবঙ্গের কলা। মর্তমান কলার সমতুল্য।

(৪) চম্পা ও চিনিচম্পা—বাঙলার ভাল জাতের খাবার কলার মধ্যেই এটি শ্বিতীয়। এই দু'টির মধ্যে চম্পা একটু বড় কিন্তু এর গন্ধ কম। চিনি-চম্পা আকারে ছোট কিন্তু বেশ সুগন্ধ। হুগলি জেলায় এই জাতের কলার প্রচুর চাষ হয়—সেখান থেকে ভারতের নানা জায়গায় এ কলা রপ্তানি হয়ে থাকে।

(৫) সিঙাপুরী কলা—পশ্চিমবঙ্গে অল্পদিন হ'ল এই কলার প্রচলন হয়েছে। এই কলার বিশেষত্ব এই যে, পাকলেও এর খোসার রঙ সবুজ থেকে যায়। নানা কারণে এই কলার চাষ খুব ছড়িয়ে পড়ছে। এই কলার গাছ হয় বেশে। তাই এক জায়গায় অনেক বেশি গাছ লাগানো যায় এবং তাতে ফলনও হয় বেশি। ছোট গাছে ঝড় লাগে কম। এই কলার তেউড় অন্য কলার তেউড় থেকে অনেক তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ফলধারণ করতে পারে। এর খোসা মোটা বলে সহজে পচে না, তাই রপ্তানির পক্ষেও এটি সুবিধাজনক। এর আয়তন বড়, তাই এ কলা বাজারে ভাল দামে বিক্রি হয়। এর এক-একটি ঝাড়ে মর্তমান বা অনুপমের চেয়ে কলা ধরে বেশি। কিন্তু স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে সিঙাপুরী কলা মর্তমান কলার নিচে।

(৬) কাঁঠালি কলা—এটি হচ্ছে গরিব লোকদের মধ্যে প্রচলিত মোটা জাতের কলা।

(৭) অমৃতসাগর বা কানাইবাঁশ—এটি বড় এবং বাঁকা আকারের কলা। শীতকালে এটি ভাল ফলন দিয়ে থাকে।

(৮) কালিষট্—এটি অনেকটা কাঁঠালি কলার মত। এর খোসার রঙ কাঁঠালি কলার চেয়ে গাঢ় এবং আয়তনও কিছু বড়। কাঁঠালি কলার চেয়ে এর স্বাদও বেশি মিষ্টি।

(৯) অশ্বিনীশ্বর—এই কলার রঙ লাল।

(১০) দুধসাগর—স্বাদ, গড়ন, আয়তন অশ্বিনীশ্বরের মতোই—তবে এর রঙ লাল নয়।

চাষের কথা

কলার বংশবিস্তার হয়ে থাকে তেউড়ের ('সাকার') সাহায্যে। যেসব তেউড়ের পাতা লম্বা ও সরু সেগুনি চওড়া পাতাযুক্ত তেউড়ের চেয়ে ভাল বলে মনে করা হয়। বসানোর জন্য যে তেউড়গুলি পছন্দ করা হয় সেগুলির উচ্চতা চার থেকে সাড়ে চার ফুট হওয়া উচিত।

অধিকাংশ কলাগাছই একবার লাগালে, তার ঝাড় বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকে। তবে অনুপম বা মর্তমান কলার মত খাওয়ার ভাল জাতের কলা দু' বছর অন্তর ঠাই পালটে নতুন করে লাগানো উচিত।

তেউড় লাগানোর আগে প্রয়োজনমত লাঙল ও মই দিয়ে মাটি খুব ভাল করে গুঁড়ো করে নিতে হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে দু'-একবার বৃষ্টি হয়ে মাটিটা সরস হ'লেই চাষ শুরুর করা উচিত। এর আগে চাষ করতে পারলে আরও ভাল।

যদি কেবলমাত্র দু'-এক বছরের জন্য জমিতে কলার চাষ করে পরে সেখানে অন্য কিছু চাষ করার উদ্দেশ্য থাকে, কিংবা ছোট জাতের কলার চাষ করা হয়, তবে ৭-৮ ফুট অন্তর এক সারিতে চারা বসাতে হয়। সারিগুলির মধ্যে দূরত্ব থাকবে ৮ ফুট। এ ছাড়া অন্য জাতের কলার তেউড় লাগালে দূরত্ব থাকবে ১০ ফুট × ১২ ফুট।

তেউড় বসাবার সময় ঠিক মোথার আয়তনের সমান গর্ত করা হয়। লাগানোর সময় কেবল মোথাটিই থাকবে মাটির নিচে। বসানোর আগে তেউড়ের মাথার পাতাটা রেখে বাকি সবগুলো পাতা ছেঁটে ফেলে দেওয়া উচিত।

বর্ষার শুরুর দিকে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিক থেকে আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ হচ্ছে তেউড় বসানোর সবচেয়ে ভাল সময়।

তেউড় বসানোর ৩-৪ সপ্তাহ পরে শিকড় ছেড়ে নতুন পাতা ছাড়তে আরম্ভ করে। এর আগে যদি জমিতে আর্দ্রতা কম থাকে তবে মাঝে মাঝে সামান্য

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

জলসেচন করা উচিত। জলসেচনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জমিতে জল না দাঁড়ায়। আর যদি তেউড় বসানোর পরেই বৃষ্টিপাত শুরুর হয়, তবে জলসেচনের প্রয়োজন হয় না।

শিকড় গজিয়ে নতুন পাতা ছাড়তে শুরুর করলে জমিটা হালকাভাবে কোদাল দিয়ে কুঁপিয়ে দেওয়া উচিত। বর্ষাকালে প্রয়োজনমত নিড়েন দিয়ে জমিটি আগাছামুক্ত রাখা প্রয়োজন। বর্ষাকালে বেশি বৃষ্টিপাত হয়ে জমিতে জল দাঁড়ালে, জলনিকাশের ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত।

বর্ষা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা জমিটিতে একবার লাঙল দিয়ে তারপর গভীরভাবে কোদাল চালিয়ে দেওয়া উচিত। এতে মাটি আলগা হয়, আগাছাগুলি মরে যায় এবং কলাগাছের ভাল বৃদ্ধির জন্য যে রস একান্তভাবে প্রয়োজন মাটিতে সেই রস সংরক্ষিত হয়।

পরবর্তী বর্ষা শুরুর হবার আগে এইভাবে জমিটা দু'-তিনবার কোদাল দিয়ে নিড়েন দিলে ভাল হয়। যত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে চাষ করা যাবে, কলার ফসল হবে তত ভাল।

কলাচাষের সময় আর একটা জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তা হচ্ছে, তেউড় যেন আসল গাছের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারে। এতে আসল গাছের ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তেউড়ের বৃদ্ধি থুঁব বেশি হলে তা মোথা শূন্য কেটে বাদ দেওয়া উচিত অথবা মাটির সমান করে কেটে ফেলা উচিত। যখনই কোনও তেউড় উঠিয়ে দেওয়া হয়, তখনই তার স্থানের গর্তটি মাটি দিয়ে ভরাট করে দেওয়া উচিত। যদি একাধিক বৎসর ধরে ঝাড় জমিতে রাখা চাষীর উদ্দেশ্য হয়, তবে যাতে সারা বৎসর পর্যায়ক্রমে ফল পাওয়া যায় অর্থাৎ প্রতি ঝাড় থেকে বছরে দু'-তিনটি করে কাঁদি পাওয়া যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অতিরিক্ত তেউড়গুলিকে সময়মত উঠিয়ে দিতে পারলে এটা সম্ভব হয়। এটা করতে হলে কোনও ঝাড়ে কখনও একটি বড় গাছ

এবং দু'টি ভাল তেউড়-মোট এই তিনটির বেশি গাছ থাকতে দেওয়া উচিত নয়। কোন কোন তেউড় ভাল তা বেছে বাকিগুলি উঠিয়ে দিতে হবে।

এই গাছ তিনটির বয়সের দিকেও লক্ষ্য রেখে এ কাজ করতে হবে। প্রথম বড় গাছটিতে যখন ফল ধরবে, তখন দ্বিতীয় গাছটি হবে অর্ধবয়স্ক। আবার সেই গাছটি যখন বড় হবে, তখন তৃতীয় গাছটি বেড়ে অর্ধবয়স্ক হবে। এইভাবে প্রত্যেক ঝাড়কে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে ফসল ভাল ও নিয়মিত হয়। কিন্তু এরূপ করতে হলে চাষীর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

কোনও গাছের ফল তোলা হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গাছটি মোথা সমেত উপড়ে ফেলে দেওয়া উচিত।

কলাচাষে সাফল্যের জন্য যা যা প্রয়োজন, তা হচ্ছেঃ (১) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে চাষ, (২) গাছ ও তেউড় নিয়ন্ত্রণ করা, (৩) ঝাড়গুলির মধ্যে প্রয়োজনমত ফাঁক রাখা, (৪) উত্তম জলনিকাশ-ব্যবস্থা, (৫) সার প্রয়োগ।

সার প্রয়োগ

বাংলাদেশের চাষীরা সর্বত্রই কলার চাষে যে সার প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ করে তা হচ্ছে পুকুরের পাক বা নদীর পলি। বিঘাপ্রতি ১০০ থেকে ২০০ মণ পর্যন্ত পাক বা পলি সাধারণত প্রয়োগ করা হয়।

দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতের কৃষিগবেষণা-কেন্দ্র-গুলোতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, জমিতে লাঙল দেবার সময় মাটির সঙ্গে প্রচুর গোবরসার মিশিয়ে দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায় এবং গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। একরপ্রতি ৮ থেকে ১৫ মণ সরষের খইল বর্ষার শুরুর তে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিলে আরও ভাল হয়। অনেক জায়গায় চাষের সময় জমিতে সবুজসার প্রয়োগ করেও ভাল ফল পাওয়া গেছে।

অনেকে গাছ বসানোর পর কোদাল দিয়ে মাটির সঙ্গে সরষের খইল মিশিয়ে দিয়ে থাকেন।

কৃত্রিম সারের মধ্যে কলাগাছের জন্য যা বেশি ব্যবহৃত হয় তা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম সালফেট। প্রতি ঝাড়ে ৩ থেকে ৪ পাউন্ড অ্যামোনিয়াম সালফেট দু'ভাগে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পশ্চিম বাঙলার কোন কোন জায়গায় কলাগাছ পুড়িয়ে তার ছাই সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এতেও ভাল ফল পাওয়া যায়। এটি সংগ্রহ করবার জন্যও চাষীদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

এ ছাড়া সার হিসাবে কলাগাছে বাদামের খইল, রোড়ির খইল ইত্যাদিও দেওয়া যেতে পারে। তবে বাঙলায় এসব সারের প্রয়োগ তেমন প্রচলিত নয়।

ফলন

বিভিন্ন জাতের কলার ফলন হয় বিভিন্ন রকম। এক-একটি কাঁদিতে ৫০-৬০টি থেকে ২০০-২৫০টি পর্যন্ত ফল ধরতে পারে। বসানোর পর ফল দেওয়ার সময় পর্যন্ত বিভিন্ন জাতের কলার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এখানে ভিন্ন ভিন্ন জাতের কলার ফলনের সময় এবং ফলনের পরিমাণ দেওয়া হ'ল:

কলার জাত	বসানোর পর ফলনের সময় (মাস)	প্রতি কাঁদিতে ফলের সংখ্যা
১। অল্পপর মর্তমান।	৩ ১০—১২	৫০—৬০
২। চিনিচম্পা	.. ১৫—১৪	১৫০—২০০
৩। সিঙাপুরী	.. ৭—৮	১০০—১২০
৪। কাঁঠালি কলা	.. ১২—১৪	৭০—১০০
৫। অমৃত সাগর বা কানাইবাঁশ।	.. ৮—১০	৫০—৬০
৬। কালিবাউ	.. ১২—১৪	৮০—১০০
৭। অগ্নীধর	.. ১১—১৪	৬০—৭০
৮। হৃৎসাগর	.. ১২—১৪	৬০—৭০

ফসল তোলা

কাস্তে দিয়ে কেটে কাঁদিগুঁলি গাছ থেকে পৃথক করে নেওয়া হয়। কাঁদির যেখানে ফল ধরতে শুরু করেছে তার ১ই ফুট থেকে ২ ফুট উপরে কাটা উচিত—এটি হাতলের মত কাঁদিগুঁলি বয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। ফলের খোসা যাতে আঘাত না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত—তা না হ'লে ফল পাকবার সময় জখমী জায়গাগুলি কালো হয়ে যায়।

কলার ফুলের সমষ্টিটিকে বলে মোচা। ওপর থেকে আরম্ভ করে মোচার যে পর্যন্ত ফল ধরে, ফলধরা শেষ হ'লেই তার নিচেই মোচার বাকি অংশ কেটে ফেলা উচিত। মোচার কতিত এই অংশটি সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

রোগব্যাধি ও কীটশত্রু

সৌভাগ্যক্রমে ভারতে কলাগাছে খুব বেশি কীট-শত্রুর আক্রমণ দেখা যায় না। যেসব কীটের আক্রমণ দেখা যায়, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে 'উইভিল' পোকা। ঘৃণ-জাতীয় এই পোকা কলাগাছকে আক্রমণ করার ফলে 'উইভিল' রোগ দেখা দেয়। এই পোকা কলাগাছের মিথ্যা-কাণ্ডের গায়ে ছিদ্র করে খোড় পর্যন্ত পৌঁছে যায়। গাছের মোথাও এই কীটের দ্বারা আক্রান্ত হয়। কীটগুলি গাছের রস শুষে নেয়—ওপরের পাতাগুলি ধীরে ধীরে শুকিয়ে ওঠে। এই রোগ যে গাছে দেখা দেয়, সেই গাছ কেটে সরিয়ে ফেলা উচিত—যাতে অন্য গাছে ওই পোকা সংক্রামিত হ'তে না পারে।

কলার খোসার উপর মাঝে মাঝে এক রকম ছোট কাল্চে বাদামী রঙের দাগ হয়ে কলার চেহারা খারাপ করে দেয় এবং তার বাজারদরও কমিয়ে দেয়। এক জাতের পোকাকার আক্রমণে এটি হয়ে থাকে। কলার শুকনো পাতা জড়িয়ে কাঁদিটি ঢেকে রাখলে এই রোগের উপদ্রব কম হয়।

'এফিড্‌স্' নামে এক ধরনের কীটানু (ভাইরাস) কলাগাছকে আক্রমণ করে। এই পোকা তেউড়ের

ক্ষতি করে বেশি। ডি-ডি-টি বা বোদোঁ-মিশ্রণ ছড়ালে এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এই রোগের বিশেষত্ব হচ্ছে, কলাগাছের মাথার পাতাগুলি একত্র হয়ে গুচ্ছের মত আকৃতি ধারণ করে। বাঙলায় একে বলা যায় ‘গুচ্ছমাথা’ রোগ। এই রোগ শূরু হ’লেই আক্রান্ত গাছগুলিকে কেটে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। বারিক গাছগুলিতে ওষুধ ছড়াতে হবে।

পানামা রোগঃ এক ধরনের ছত্রাকের দ্বারা এই রোগ হয়ে থাকে। এর নাম ‘ফুসেরিয়াম অক্সি-স্পোরাম’। মাটির মধ্য দিয়ে এই রোগ ছড়ায়। এই রোগের লক্ষণ হচ্ছে, পাতাগুলি ধীরে ধীরে কুঁকড়ে এবং শুকিয়ে যাওয়া। প্রথমে কতকগুলি পাতার কিনারা শুকিয়ে হলদে হ’তে শূরু করে। তারপর একে একে সব পাতাই আক্রান্ত হয়। আসল গাছ থেকে তেউড়েও এই রোগ সংক্রামিত

হয়। ফলে বংশপরম্পরা গাছে এই রোগ দেখা দেয় এবং সবগুলি ঝাড় ধীরে ধীরে ম’রে যায়।

এই রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছগুলি তুলে পুড়িয়ে ফেলা কর্তব্য। যদি সবক’টি গাছ আক্রান্ত হয়, তবে গাছগুলি তুলে ফেলে ওই জমিতে অন্য ফসলের চাষ করা উচিত।

কাণ্ডগচা রোগঃ এক ধরনের ‘স্পোর’ থেকে এই রোগ হয়। গাছের মিথ্যা-কাণ্ডটা ঠিকই থাকে, কিন্তু ভিতরের নরম খোঁড়টি আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং ফলগুলি আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে এ রোগ ততটা ছড়ায় না, এই সুবিধা। এতে অবশ্য ফলন অনেক কমিয়ে দেয়। অনেক সময় ফল ঝরে পড়তে থাকে। গবেষণার ফলে দেখা গেছে গাছে উপযুক্ত পরিমাণ রোদ লাগলে এবং গোড়ায় জল না দাঁড়ালে এ রোগ হয় না। এই দু’টি বিষয়ে যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

আপনি পশ্চিমবঙ্গ প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত ‘বসুন্ধরা’ এবং যে-কোন পত্রিকার গ্রাহক হ’তে হ’লে, চাঁদার টাকা পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তার নামে ‘রাইটস’ বিল্ডিংস, কলিকাতা-১’ ঠিকানায় নগদ পাঠাতে বা জমা দিতে পারেন, অথবা ক্রস্‌ড্ পোস্টাল অর্ডারেও পাঠাতে পারেন। যে পত্রিকা বা যে যে পত্রিকার গ্রাহক হ’তে চান তার বা সেগুলোর নাম এবং নিজের নাম-ঠিকানা সুস্পষ্ট বড় অক্ষরে লিখে দেবেন। ক্রস্‌ড্ পোস্টাল অর্ডারের সঙ্গে অবশ্যই একটি পত্র দিতে হবে; যে-পত্রিকার গ্রাহক হ’তে চান তার নাম এবং নিজের নাম-ঠিকানা সেই পত্রে স্পষ্ট বড় বড় অক্ষরে অবশ্যই লিখে দেবেন।

ভারতের লেবু

[পূর্বামুদ্রণ]

মাটি

ভারতে গাঙ্গেয় অঞ্চলের পলি-দোআঁশ মাটি, মধ্যপ্রদেশের মোটা শুকনো ঝুরো কালো মাটি এবং দাক্ষিণাত্যের 'মরুম' নামক অনুরূপ কালো মাটি শরবতি আর কমলালেবু উভয়ের পক্ষেই সবচেয়ে ভাল বলে বিবেচিত।

মধ্যপ্রদেশে নাগপুরী কমলালেবুর সবচেয়ে ভাল বাগানগুলোর বেশির ভাগেরই মাটি হচ্ছে মোটা, কালো আর দোআঁশ। এসব জমির জল-নিকাশ হয়ে যায় সহজে আর এসব মাটিতে চাষের কাজ করা যায় অনায়াসে। এসব জমির উপর-স্তরের মাটি প্রায় ৬ ফুট গভীর এবং তার নিচে রয়েছে নরম 'মরুম' মাটি অথবা বালি ও চুনের গুটি মেশানো মোটা মাটি।

উত্তর ভারতের এবং দাক্ষিণাত্যের শুকনো এলাকার বেলে মাটি অথবা কাঁকুরে মাটি লেবু-চাষের উপযোগী নয়, কারণ এসব জমিতে খরার সময় উপর-স্তরের মাটির মধ্যে গাছের যেসব শিকড় থাকে সেগুলো শুকিয়ে যায়। তবে বৃষ্টিপাত বেশি হলে এসব মাটিতে কমলালেবু খুব ভাল হয়। দার্জিলিংয়ের আর আসামে খাসিয়া পাহাড়ের মাটি এ ধরনের। এসব জমিতে বাড়তি জল ধরা থাকে না—নিকাশ হয়ে যায়। কুর্গে জলনিকাশের ভাল ব্যবস্থা আছে এমন লাল, দোআঁশ, গভীর মাটিতে কমলালেবু ভাল হয়।

কমলালেবু-গাছের শিকড় মাটি ভেদ করে পাঁচ ফুট পর্যন্ত নিচে নেমে যায়, কিন্তু খাদ্য-আহরক শিকড়গুলোর বেশির ভাগই থাকে উপরের দু' ফুটের মধ্যে। কাজেই উপর-স্তরে অল্পত দু' ফুট পুরু মাটি না থাকলে সে জমিতে গাছ ভাল বাড়বে

না। দাক্ষিণাত্যের অনেক জায়গায় যেমন উপর-স্তরে দু' ফুটের কম পুরু মাটি দেখা যায়, তেমন মাটি কমলালেবু-চাষের অনুপযোগী, কারণ মাটির ভিতরে জায়গা সীমাবদ্ধ বলে শিকড় গজাতে পারে না আর স্বাভাবিকভাবে বাড়তেও পারে না; কাজেই এরকম জমিতে গাছের বাড় বন্ধ হয়ে যায় এবং যথাযথ পুষ্টির অভাবে গাছ অকালে মরে যায়।

যে জমিতে উপর-স্তরের মাটির নিচেই দুর্ভেদ্য এন্টেল মাটি বা শক্ত পাথর থাকে, সেখানে কমলালেবুর গাছ লাগানো চলবে না। খালের লাগোয়া কোন নিচু জমির তলায় জলের স্তর যদি গাছের শিকড়ের তিন ফুটের মধ্যে থাকে তবে সে জমি কখনও লেবুগাছ লাগাবার জন্য নির্বাচন করা উচিত নয়; কেননা, সেখানে শিকড়ের এলাকা ছেড়ে জল নিচে নেমে যেতে পারে, তার ফলে শিকড় বাতাস না পেয়ে পচতে শুরু করে। এ অবস্থায় গাছ বাড়তে পারে না, ডালগুলির বাড় বন্ধ হয়ে যায়, পাতাগুলি তাদের স্বাভাবিক সবুজ রঙ হারিয়ে হলদে হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত গাছ অকালে মারা যায়।

শক্ত, ঘন, কালো, মিহি, তুলো-চাষের মাটি (যা নর্মদা এবং তাপ্তি নদীর নিকটে পুরোনো পলি-এলাকায় দেখা যায়) গ্রীষ্মকালে বা বিস্তীর্ণভাবে ফেটে ফেটে যায়, সে মাটিও কমলালেবুর উপযোগী নয়; কারণ, বর্ষাকালে তাতে যে জল সঞ্চিত হয়, সেই জলকে সে-মাটি অনাবশ্যক দীর্ঘকাল ধরে রাখে, তার ফলে বাতাসের অভাবে অকালে মরে যায়।

মধ্যপ্রদেশের কমলালেবু-চাষের মাটিতে গুটি গুটি আকারে চুন মিশে থাকে এবং এভাবে মাটিতে চুন থাকা বিশেষ বাঞ্ছনীয়ও বটে, কেননা এতে মাটি ঝুরো আর উর্বর থাকে; কিন্তু তাই বলে

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

অতিরিক্ত মাত্রায় চুন থাকা একেবারেই ভাল নয়। দক্ষিণাত্যের ঢালুতে আর সমতল এলাকার ঢেউ-খেলানো জমিতে মাটির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ চুন মিশে থাকে ; এ মাটি নিঃসংশয়ে বিষাক্ত এবং কমলালেবু গাছের ক্ষতিকারক। এ রকম চুনা-মাটিতে উদ্ভিদের পুষ্টি-উপাদান খুব কম থাকে এবং তাতে কমলালেবুর গাছ লাগালে, সে-গাছ অচিরেই পুষ্টির অভাব-জনিত নানা রোগে আক্রান্ত হয়।

যে মাটিতে যথেষ্ট লবণ সঞ্চিত থাকে তার লেবুগাছ বেশ তেজী হয়। তবে মাটিতে আর সেচের জলে অতিরিক্ত মাত্রায় লবণ থাকাও ভাল নয়। উত্তর ভারতের অনেক নীরস আর অনুর্বর জমির মাটিতে অতিমাত্রায় লবণ থাকতে দেখা যায়। এ রকম মাটিতে অতিরিক্ত পরিমাণ 'সোডিয়াম' (কালো চুনা মাটি), 'ক্লোরাইড', 'সালফেট অব ক্যালসিয়াম' এবং 'ম্যাগনেসিয়াম' (সাদা চুনা মাটি) থাকে। মাটিতে এসব লবণ অতিমাত্রায় থাকলে গাছের উপর বিষক্রিয়া ঘটে, সে মাটিতে গাছ লাগালে, পুষ্টিহীনতায় ভুগে শীঘ্রই মারা যায়। সেচের জলের গুণাগুণের গুরুত্বও তেমনি। সেচের ভাল ব্যবস্থা করতে হলে, দেখতে হবে যেন তার জলে ক্ষতিকর ওইসব লবণ না থাকে। সাধারণত, যে জলের স্বাদ নোনতা তাতে সাধারণ লবণ আর সোডিয়াম-লবণগুলি বেশি পরিমাণে আছে।

রকমাকর

শরবতিলেবু

ভারতে কারবারী আকারে যেসব শরবতিলেবুর চাষ করা হয়, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পাজাবের সাধারণ 'মাল্টা' আর রক্ত-লাল 'মাল্টা', বোম্বাইএর 'মোসাম্বি' এবং দক্ষিণ ভারতের 'সাথ-গুড়ি'। এখানে এগুলোর বিশেষত্বের বিবরণ দেওয়া হল।

মাল্টা (সাধারণ): কমলা-রঙের ফল, তার দেহ মসৃণ—তাতে মিহি ফুটো-ফুটোমত ; আকার লম্বাটে-গোল থেকে গোল পর্যন্ত ; আয়তন মাঝারি থেকে বড় পর্যন্ত ; ওজন এক পোয়া কি তার বেশি, মুখ (যেখানে বোঁটা লেগে থাকে) আর তলা প্রশস্ত ও গোল ; তলার কেন্দ্রবিন্দু অস্পষ্ট এবং খুব ছোট গোলাকার অগভীর গর্তের মধ্যে ; খোসা মাঝারি পুরু, চামড়া-মত, ট থেকে ট ইঞ্চি ; কোয়া ১০টি, বেশ স্পষ্ট, তার ছাল পুরু ; রস হালকা কমলা-রঙের, মিহি দানাদার, রসের থলেগুলি লম্বা আর মোটা, রস প্রচুর ; গন্ধ ভাল, মিষ্টি আর টক সুমিশ্রিত ; কেন্দ্রলম্ব ভরাট ; বীজ ২৫ থেকে ৩০টি।

সাধারণ মাল্টা পশ্চিম পাকিস্তানের খাল-এলাকায় ব্যাপকভাবে জন্মায়।

মাল্টা (রক্ত-লাল): এর আর সবই সাধারণ মাল্টার মত, কেবল হালকা কমলারঙের রসটা লাল রঙে বিচিহ্নিত। কোয়াগুলোতে মাঝে মাঝে এক-একটা রস-থলের মধ্যে থাকে লাল রঙ। লাল রঙে ভর্তি এক-একটা থলে যেখানে যেখানে আছে তার লাগোয়া থলেগুলোর কোন-কোনটার মধ্যে সামান্য লাল রঙ থাকতেও পারে—না-ও থাকতে পারে। একই গাছের বিভিন্ন ফলের রসে লাল রঙের ঘনতার তারতম্য দেখা যায়। এ জাতের শরবতিলেবু বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের গুজরানওয়ালাতে এবং পাজাবের পাহাড়ী এলাকায় জন্মায়। সুগন্ধের জন্য এবং সুদর্শন রসের জন্য এর বিশেষ সমাদর।

পাজাবে এবং ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে নানা জাতের রক্ত-লাল লেবু জন্মায়। পশ্চিম পাকিস্তানের 'রক্ত-চুনি' জাতের লেবুর রস নাকি ভারি সুন্দর দেখতে।

মোসাম্বি: হালকা হলদেটে কমলা রঙের ফল ; ওপরটা অমসৃণ, লম্বা লম্বা খাদালো রেখা, আকার লম্বাটে গোল থেকে গোল ; আয়তন মাঝারি থেকে বড় ; ওজন এক পোয়া কি তার বেশি ; তলা গোল

এবং বোঁটা একটু গর্তমত জায়গায় বসানো, মুখ প্রসারিত, সমান ও চওড়া, সুস্পষ্ট প্রায় আধ ইঞ্চি ব্যাসের অগভীর গর্তমত গোলকের দ্বারা বেষ্টিত ; খোসা পুরু, $\frac{2}{3}$ থেকে $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি ; কোয়া ৯ থেকে ১২টি, স্পষ্ট ভাগ করা, সবক'টি এক সমান ; কোয়ার ছাল খুব পুরু, রস খোড়ো হলদে, মিহি দানাদার ; রসথলে লম্বা সরু আর নরম ; রস প্রচুর, গন্ধ কম, টক আর মিষ্ট সুমিশ্রিত নয় ; কেন্দ্রলম্ব নিরেট ; বীজ ২০ থেকে ২৫টা।

বোম্বাইতে মোসাম্বি বেশ ভাল হয় ; সেখানে প্রায় ২০,০০০ একর জমিতে ব্যাপকভাবে এর চাষ হয়। দক্ষিণ ভারতে অধিকতর আর্দ্র অঞ্চলে এর চাষ করলে, ফলের রস একেবারেই নিগন্ধ হয়।

সাথগুড়ি : হালকা কমলা রঙের ফল ; দেহ মসৃণ, মিহি গর্ত-গর্ত মত ; আকার একেবারে গোল ; আয়তন মাঝারি থেকে বড়, ওজন এক পোয়া কি তার বেশি ; মুখ আর তলা সমান গোল ; নিচের কেন্দ্রবিন্দু অস্পষ্ট ; খোসা মাঝারি পুরু, চামড়ার ধরনের, $\frac{2}{3}$ থেকে $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি মোটা ; কোয়া ১০ থেকে ১২টি, স্পষ্ট-বিন্যস্ত ; কোয়ার ছাল পুরু ; রস কমলা রঙের, প্রচুর, গন্ধ ভালই ; কেন্দ্রলম্ব আধা-ফাঁপা ; বীজ প্রায় ২০টি।

দক্ষিণ ভারতে রয়ালাসীমার কুড্ডাপা, চিতুর ও কুরনুল জেলায় ৫,০০০ একরেরও বেশি জমিতে ব্যাপকভাবে সাথগুড়ির চাষ হয়।

ওয়ালিংটন ন্যাভেল হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার অতি চমৎকার জাতের শরবতিলেবু। এ লেবু আয়তনে বড়, আকারে গোল আর বীজবিহীন। খোসা পুরু। কোয়ার ছাল পাতলা। এর রস মধুর এবং খুব তরল। এ লেবু 'ন্যাভেল' নামক এক বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত। এ শ্রেণীর লেবুর মাথাটা নাভির ('ন্যাভেল') মত দেখতে, তাই এ নাম।

এ লেবুর গাছ ভারতের মাটিতে সাধারণত বাঁচতে চায় না। তবে, অস্ট্রেলিয়া থেকে সরাসরি চারা এনে

বাংলালোরে লাগিয়ে দেখা গেছে, সেখানকার আব-হাওয়ায় এর গাছ ভালই হয়। সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের কোদুরে 'বাকি ন্যাভেল' নামক শরবতিলেবুর গাছ লাগিয়ে ফলন নাকি বেশ ভালই পাওয়া যাচ্ছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার 'ওয়ালিংটন ন্যাভেল' এর মতই আর-এক রকম শরবতিলেবু হয় যার নাম হচ্ছে 'ভ্যালেন্সিয়া'। এ লেবুতে বীজ হয় মাত্র ৫-৬টি, কাজেই একেও প্রায় বীজবিহীনই বলা চলে। এ লেবু বিভিন্ন ধরনের আবহাওয়াতেই কম বেশি জন্মায়। এর এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পাকে দেরিতে। বাজার থেকে আর সব রকম শরবতিলেবু যখন উঠে যায়, তখন এ লেবু বাজারে আসে। পরীক্ষা-মূলকভাবে চাষ করে দেখা গেছে, এদেশে পাঞ্জাবের সর্বত্রই এ লেবুর গাছ আর ফলন দুইই ভাল হয়। পাঞ্জাবে এ লেবু পাকে মার্চ মাস নাগাত। দক্ষিণ ভারতে লাগিয়ে দেখা গেছে, সেখানে এ লেবু স্থানীয় সাথগুড়িয়ার পাকবার সময়েই পেকে যায়। ফল যদি তখন না পেড়ে গাছে রেখে দেওয়া হয় তবে তার রসের পরিমাণ আর সুস্বাদ দুটোই কমে যায়।

পাঞ্জাবে ইদানীং কালে আর যেসব শরবতিলেবুর চাষ চালু করার চেষ্টা চলছে, সেগুলো হচ্ছে 'পাইন্যাপল্' (আনারসী), 'হ্যাম্লিন' আর 'জাফা'। 'পাইন্যাপল্' হচ্ছে ফ্লোরিডার বিখ্যাত লেবু। 'জাফা' হচ্ছে প্যালেস্টাইনের প্রসিদ্ধ সুমিষ্ট শরবতিলেবু। পাঞ্জাবে এ দুটো লেবুরই গাছ আর ফলন ভালই হচ্ছে দেখা যায়। পৃথিবীব্যাপ্য বীজ-বিহীন 'শামুটি' শরবতিলেবুও প্যালেস্টাইনের ফল। গুণে, গন্ধে, রসে, সকল দিক দিয়ে এ লেবু 'ওয়ালিংটন ন্যাভেল' আর 'ভ্যালেন্সিয়া'র সমকক্ষ। ভারতের মাটিতে এ লেবু নিয়েও চাষের পরীক্ষা করার চেষ্টা চলছে।

কমলালেবু

ভারতে সবচেয়ে ব্যাপক কারবারী আকারে চাষ হয় নাগপুরুী কমলালেবুর। এর ফল গাঢ় কমলা

রঙের, দেহ মসৃণ কিন্তু একটু উঁচুনিচু ; আকার একটু লম্বাটেমত গোল ; আয়তন বড়, ৩৫×৪ ইঞ্চি, ওজন আধ পোয়া থেকে তিন ছটাক। মূখ অর্থাৎ বোঁটা যেখানে লেগে থাকে তার চারদিকটা একটু উঁচু আর গড়ি-গড়ি মত ; তলায় কেন্দ্রাবিন্দু বেশ গর্তে, কেন্দ্রাবিন্দু থেকে চারদিকে গর্ত-রেখা ছড়িয়ে পড়েছে যেন তারার আলো ছড়িয়ে পড়ার মত ; খোসা পাতলা, তাতে অনেক গ্রন্থি-মত, খোসাটা ভিতরের রস-গোলকের সঙ্গে আলগাভাবে যুক্ত রয়েছে মোটা কতকগুলো আঁশের সাহায্যে ; তৈলগ্রন্থি স্পষ্ট এবং অসমান ; রস-গোলকের কেন্দ্রলম্ব অনেকখানি ফাঁপা, সেই ফাঁপা জায়গাটা কতকগুলো নাদা আঁশে ভর্তি ; কোয়া ১০টি, সহজেই ছাড়ানো যায় ; কোয়ার ছাল পাতলা, নরম ; রস উজ্জ্বল কমলারঙের ; রসথলিগুলো লম্বা মোটা, পরস্পর হালকাভাবে লেগে আছে ; রস প্রচুর, মিষ্টি, টক আর মিষ্টিতে সুমিশ্রিত, সুগন্ধ ; বীজ কম, গোটা-সাতেক, ছোট আর কাটলে ভিতরের রঙ সবুজ।

আসাম, সিকিম, কুর্গ প্রভৃতি জায়গার কমলালেবু নাগপুরী লেবুরই ধরনের, শুধু স্থানীয় আব-হাওয়ার বৈশিষ্ট্যের দরুন বিভিন্ন জায়গার লেবুর স্বাদ বিভিন্ন রকমের। উত্তরপ্রদেশে আর দাক্ষিণাত্যে 'লাডু' নামক যে কমলালেবু জন্মায় তা আলাদা ধরনের। এ লেবুর চাষ কম। নাগপুরী লেবুর চেয়ে 'লাডু' লেবু আয়তনে ছোট-চ্যাপটা বেলুনের মত দেখতে। এর গাছ বেশ তেজী, তার ডালপালা ঘন, গাছের মাথা গোল। দাক্ষিণাত্যে ফলন বেশি হয়। এ লেবু প্রায় বীজবিহীন আর এর রস বেশ মিষ্টি।

বাইরের যেসব ভাল ভাল জাতের লেবুর চাষ নিয়ে এদেশে পরীক্ষা চালানো হয়েছে, তার মধ্যে 'ড্যান্স' কমলালেবু উল্লেখযোগ্য। ভারতে এ লেবু ভালই জন্মাচ্ছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এ লেবুর উচ্চ সমাদর। এর সবচেয়ে বেশি চাষ হয় ফ্লোরিডায় ; ক্যালিফোর্নিয়াতেও কম নয়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে 'ড্যান্স' লেবু জন্মায়, তার রঙ কমলা-লাল ; ফল ছোট, ২৫×২ ইঞ্চি ; খোসা পাতলা ; ১০ থেকে ১৪টি কোয়া ; গাঢ় কমলারঙের পাতলা রস পুষ্টিকর ; সুগন্ধ কম, বীজ ৬টা থেকে ২০টা পর্যন্ত হয়। ফলের আয়তনের অনুপাতে বীজ বেশি।

বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত মিরপুরখাসে ১৯১৯ সালে সরকারী বাগানে 'ড্যান্স' কমলালেবুর গাছ লাগিয়ে পরীক্ষা করা হয়। ওখানকার শ্রুকনো মরুর আবহাওয়ায় এর গাছ বেশ তেজী হয়েছে, ফলনও দিয়েছে খুব, আট বছর বয়সের গাছে কমলালেবু ধরেছে ৫০০'র কম নয়। সে লেবুতে কোয়া হয়েছে ৯-১০টি, বীজ প্রায় হয় নি বললেই চলে। কোন কোন লেবুতে গোটা-তিনেক মাত্র বীজ হয়েছে—তাও অপূর্ণ। সে লেবুর রসে মোটা দানা হয়েছে ; পাকা লেবুর রস একেবারে দানা বেঁধে যেতে চায়। তার আধপাকা ফলে রস হয়েছে প্রচুর, কিন্তু পুরো-পাকা ফলের রসথলি-গুলো অনেক ক্ষেত্রে একেবারে শুকিয়ে গেছে। ফলে পুরো রস রাখার একমাত্র উপায় ছিল ফল আধপাকা হলেই গাছ থেকে পেড়ে আনা এবং পুরো পেকে ওঠা পর্যন্ত গাছে না রাখা।

'এম্পারার' নামক কমলালেবু নিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষা করে দেখা উচিত। এ লেবু বেশ বড়। অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়াতে আর নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্-এ এ কমলালেবুর চাষ হয় ব্যাপক-ভাবে। উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরে আজকাল এর চাষ কিছু কিছু হচ্ছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার রিভারসাইড-এ যে লেবুচাষের পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে, সেখানে 'কিমো' নামে এক রকম সংকর জাতের কমলালেবু উদ্ভাবিত হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে এ লেবু বেশ ভাল হয়েছে। আমাদের দেশে পাঞ্জাবে এবং উত্তর ভারতের অনুরূপ অঞ্চলগুলোতে এর চাষ নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা যেতে পারে। [ক্রমশঃ]

বাঁধগোড়া বাঁশ ও চর্ম শিল্প সমিতি

পশ্চিম বাঙলায় বাঁশের কাজ করে অনেক পরিবার অন্নসংস্থান করে। খাদ্য, দ্রাণ, সরবরাহ ও উদ্ভাস্তু-পুনর্বাসন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বীরভূম জেলার বোলপুর পৌরসভার বাঁধগোড়া গ্রামের আঠারোটি শিল্পী-পরিবারের দুর্গতির কথা শুনে সমবায় সমিতির মাধ্যমে বাঁশের ও চর্মের শিল্পীদের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করবার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশমত একটি কারখানা-গৃহের, একটি কারখানায়ের ও দুর্গটি দুর্গত বাঁশ-শিল্পী পরিবারের বসবাসের ব্যবস্থা নিয়ে সমিতির পত্তন হয়। এখন সেখানে প্রতি মাসে প্রায় দেড়শতটি বাঁশের মোড়া তৈরি করে চামড়া দিয়ে বাঁধবার ব্যবস্থা হয়েছে। তাতে বাঁশ-শিল্পীরা প্রতিদিন গড়ে দুই টাকা পর্যন্ত উপার্জন করছে। চর্মশিল্পীরা এর বিন্দুগুণ টাকা পারিশ্রমিক পাচ্ছে। ব্যবসায়ীর মতই এই সমবায় সমিতি এখন প্রতি মোড়ায় কম করে চার আনা লাভ করছে। উক্ত সমিতি মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা ঋণ করে এবং চার হাজার টাকা সাহায্য লাভ করে বোলপুর পৌরসভা এলাকায় এই নতুন ধরনের পল্লী-শিল্পটির উন্নয়নে সক্ষম হয়েছে।

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু এই কাজে সর্বপ্রথম পথ-নির্দেশ করেছিলেন। কুড়ি বৎসর পূর্বে এজন্য শ্রীনিকেতন শিল্পভবনে কয়েকজন বংশশিল্পী মোড়া তৈরি করত। এখন বাঁধগোড়ার মত ইলামবাজার ও জয়দেব-কেন্দুলা এবং বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম থানায় পারদু গ্রামে প্রায় একশত জন শিল্পী মোড়া তৈরি করছে। বাঁশের ঝুড়ি, কুলো, টোকা, ডালা প্রভৃতি তৈরিতেও এইসব শিল্পী নিপুণ হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জাপানী বাঁশের কাজের মত যদি এই সমিতির মাধ্যমে আরও নানা-প্রকারের জিনিস তৈরি করা যায়, তা হলে দেশের মধ্যে অনেক রঙিন ও শৌখিন জিনিস গড়ে উঠবে।

বাঁশের কাজের উপর গালা লাগানো ভাল ভাল মনোহর জিনিস আজকাল বাজারে দেখা যাচ্ছে।

বাঁধগোড়ার এইসব শিল্পীর তৈরি মোড়া এবং তালের টুপি দেখে সেদিন খাদ্য, দ্রাণ, সরবরাহ ও উদ্ভাস্তু-পুনর্বাসন বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় নানারূপ প্রশ্ন করেছিলেন। এই সমিতিতে বীরভূম জেলার সমবায় বিভাগের রেজিস্ট্রার মহাশয় একজন অডিটরকে সদাসর্বদা হিসাব-নিকাশের জন্য নিয়োজিত করেছেন। তিনি এই পল্লীর দুর্গতদের জন্য প্রায় কুড়ি হাজার টাকা ব্যাংকে চলতি হিসাবে মজুত রাখবার ব্যবস্থা করেছেন। শ্রীনিশাপতি মাঝি, এম এল এ, শ্রীবাণেশ্বর ভকত এবং শ্রীভৈরব-নাথ গড়াই সমিতি পরিচালনার কার্যে সহায়তা করেছেন।

এখন বোলপুর স্টেশনের স্টলে ও বাজারের নানা দোকানে বাঁশের মোড়া ও চামড়াবাঁধাই মোড়া প্রচুর পাওয়া যাবে। এমনকি যদি বাইরে থেকে কোনও অর্ডার পাওয়া যায় তারও সরবরাহের ব্যবস্থা করা যাবে। বছরে অন্তত ছয় মাস কাল নানা স্থানে মোড়া সরবরাহ করবার জন্য সমবায় সমিতি যত্নবান হয়েছে। বৎসরে কম করে প্রায় দুই হাজার মোড়া এই সমিতি সরবরাহ করতে পারবে। বোলপুর থেকে বাঁধগোড়া বেশি দূরে নয়। স্টেশন থেকে শ্রীনিকেতন যাবার পথের পাশেই বাঁধগোড়ার এই সমবায় সমিতি।

তিস্তার চরগুলির পুনরুদ্ধার

তিস্তা নদীতে প্রায় ২,০০০ একর চর-ভূমি পুনরুদ্ধারের এক পথদেশক পরিকল্পনা পশ্চিম-বঙ্গ-সরকার গ্রহণ করেছেন। পরিকল্পনার কাজে আনুমানিক ব্যয় হবে ২ লক্ষ টাকা। তিস্তা নদীতে নলখাগড়া ও অন্যান্য ধরনের লম্বা ঘাসের (এলি-ফ্যান্ট গ্রাস) বন আছে প্রায় ১৪,০০০ একর চর-জমিতে। সম্প্রতি কৃষি ও পশুপালন বিভাগের

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

মন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ এই এলাকা পরিদর্শন করেন এবং বিশেষজ্ঞদের দ্বারা জমিগুণি পরীক্ষা করান। এতে দেখা যায় যে, ওইসব জমিতে ধান, গম, সরষে, আলু, তামাক, পাট ইত্যাদির চাষ করা সম্ভব। মন্ত্রী মহাশয়ের নির্দেশ অনুযায়ী জলপাইগুড়ি জেলাস্থিত দক্ষিণ চ্যাংমারী মৌজার অন্তর্গত প্রায় ২,০০০ একর চর-ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে।

'নল খাগড়া' এবং লম্বা ঘাসের প্রাচুর্য রয়েছে বলে এসব চর-ভূমিতে বাঘ এবং বুনো শূণ্ডর বাস করে। সেইজন্য সরকার বন্যজন্তুর এলাকা উদ্ধারের উদ্দেশ্যে দার্জিলিংয়ের শিকার-সমিতির সহযোগিতা আহ্বান করেছেন। চলতি হারে ট্র্যাক্টর ভাড়া এবং চা-বাগানের মজদুরদের কাজ করতে দিয়ে "ইন্ডিয়ান টী-প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন"ও সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। ১৯৫৮ সালের জানুয়ারি মাসের গোড়া থেকেই পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু করার জন্য রাজ্যসরকারের কৃষিবিভাগ বন্দোবস্ত করছেন। সরকার কর্তৃক অবলম্বিত পথ-দেশক পরিকল্পনার ফলে বন্যজন্তুর আশঙ্কা দূর হবার পরেই কৃষিজীবীরাও ব্যক্তিগতভাবে এসব চর-ভূমিতে কৃষিকার্য আরম্ভ করতে প্রেরণা লাভ করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

১৯৫০ সালের মহাপ্লাবনের পরে এসব চর-ভূমি জেগে ওঠে। সেচন-বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ১৯৫৪ এবং ১৯৫৬ সালে এসব চর-ভূমি আংশিক-ভাবে প্লাবিত হয়ে যায়। কিন্তু বন্যার ফলে যাতে শস্যের ক্ষতি না হয় সেজন্য এসব জায়গায় বর্তমানে কেবল রবিশস্য চাষের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। বর্ষাকালে যদি এই এলাকা প্লাবিত হয়ে না যায় তবেই খারিফ শস্যের চাষ করা হবে।

সমবায় কৃষিজ-বিপণন কমিটির সম্মেলন

বর্তমান জেলায় মেমারি থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে পাহাড়হাটি নামক স্থানে সম্প্রতি সমবায়

কৃষিবিপণন-কর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাহাড়হাটি একটি প্রসিদ্ধ ধান্য ও আলু উৎপাদনের এলাকা। সম্মেলনে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রমমন্ত্রী শ্রী আবদুস সাত্তার। ভারতের কৃষি-আলোচনাচক্রের সচিব শ্রী কে ডি শর্মা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

শ্রমমন্ত্রী তাঁহার ভাষণে খাদ্যশস্যের বিষয়ে দেশকে স্বাবলম্বী করবার জন্য ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভাপতির ভাষণে শ্রী শর্মা কৃষিকার্যে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনের জন্য কৃষকদের সংঘবদ্ধ হতে আহ্বান জানান।

সম্মেলন দুইদিন ব্যাপী হয়েছিল। এ উপলক্ষে একটি কৃষি-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়; তাতে বহু লোকের সমাগম হয়।

মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতি

কাঁথির পাঁচ মাইল দূরে জুনপুটে। এই স্থানে মহাত্মা গান্ধীর চিতাভস্ম সাগরের জলে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে বালুতটে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের বনবিভাগ বনগঠনে যত্নবান হয়েছেন; মৎস্যচাষ বিভাগ হাঙ্গরের যত্ন সংগ্রহ করে স্বাস্থ্য-কেন্দ্রগুলিতে 'শার্ক-লিভার অয়েল' সরবরাহ করছেন। জুনপুটে ও জালদায় প্রায় নব্বইটি নৌকা নিয়ে অন্তত নয়শত জন মৎস্যজীবী কার্তিক থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত মৎস্য শিকার করে থাকে। এজন্য জুনপুটে এবং জালদায় মৎস্যজীবীদের অন্তত ছয় হাজার জন এই দুটি স্থানে শিবির-বাসের মত জীবনযাপন করে। মৎস্যচাষ বিভাগের পরিষদ-সচিব শ্রীনিশাপতি মাঝি সম্প্রতি এই দুই স্থানে গিয়ে মৎস্যচাষ বিভাগের কারখানা ও কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

জুনপুটে-জালদা-কাঁথি অঞ্চল মৎস্য শিকারের প্রধান কেন্দ্র। এই ক্ষেত্রটিকে যোগ্যতর করে তোলার জন্য মৎস্যচাষ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়

বহুদিন ধরে সচেতন আছেন। বর্তমানে এই ক্ষেত্রে মাছের সার, শূটকী মাছ এবং হাঙ্গরের যত্ন সংগ্রহ করে নানাস্থানে সরবরাহ করা হচ্ছে।

মৎস্যজীবীদের এক সভায় শ্রী মাঝি সমবয়সী সমিতি স্থাপনের কথা বলেন। তিনি খেজুরির বহুমুখী উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দ্বাদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসবে যোগদান করেছিলেন। কাঁথি বিদ্যাপীঠে শ্রীনিবাসবিহারী মাইতি, এম পি, মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি কর্মসভা আহূত হয়। তথায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। শ্রী মাঝি তথায় গিয়ে জুনপুন্ডের পরিচালনার সাফল্যের কথা বর্ণনা করেন। শ্রী ভিখারী মন্ডল, এম এল এ, পরিষদ-সচিবের সঙ্গে থেকে বনবিভাগ ও মৎস্যচাষ বিভাগের কার্যে সহায়তা করেন।

“নিজ গৃহ নিজে নির্মাণ” পরিকল্পনার অগ্রগতি

পশ্চিমবঙ্গের বন্যাপীড়িত অঞ্চলসমূহের গৃহাদি পুনর্নির্মাণের জন্য “নিজ গৃহ নিজে নির্মাণ” পরিকল্পনাটির কাজ শুরু করা হয়েছিল। গ্রামীণ জনসাধারণের একাংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও পরিকল্পনাটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং ক্রমশই অধিকসংখ্যক গ্রামবাসী মেরামতির জন্য নগদ অর্থ গ্রহণের পরিবর্তে এই পরিকল্পনায় যোগদান করতে থাকেন। ১৯৫৬-৫৭ সালে সাতটি জেলায় এই পরিকল্পনায় অংশগ্রহণকারীদের মোট সংখ্যা ছিল ১৮,৩৬৩। বর্তমান বৎসরেও পরিকল্পনায় অংশগ্রহণেচ্ছু গ্রামবাসীদের নিকট থেকে খুব সাড়া পাওয়া গেছে এবং বর্তমানে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮,০৭৬। এই ঋতুর কাজ সমাপ্ত হলে গ্রামে প্রায় ৩৫,০০০ পাকা ঘরের নির্মাণ সম্পূর্ণ হবে। যেসব গ্রামে পরিকল্পনার কাজ চলছে সেগুলোর সংখ্যা ২,০০০এর অধিক।

পরিকল্পনা অনুসারে গৃহনির্মাণের জন্য গ্রামবাসীরা প্রায় ১২ কোটি ইট তৈরি করেছেন।

সমাপ্তপ্রায় গৃহের সংখ্যা ৮,০০০ এবং অবশিষ্ট ১০,০০০ গৃহ নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। গ্রামবাসীরা তাঁদের অবসরসময়ে নিজ নিজ গৃহ নির্মাণ করছেন। আশা করা যায় যে, পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে তাঁদের গৃহনির্মাণ শেষ হবে।

যেসব গ্রাম বন্যার ফলে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে এবং নিম্নভূমিতে অবস্থিত হওয়ার দরুন যেসব গ্রামে পাকা গৃহনির্মাণ অসম্ভব, সেইসব গ্রামের অধিবাসীদের জন্য নতুন নতুন গ্রামের পত্তন করা হয়েছে। এরকম ৩০টি ক্ষেত্রে ২,৫০০টি পরিবারের জন্য সমন্বিত আদর্শ গ্রাম স্থাপন করা হইয়াছে। ১১টি গ্রামের জন্য জমি গ্রামবাসীরা নিজেরাই আলাপ-আলোচনা ও বিনিময় দ্বারা সংগ্রহ করেছেন। অবশিষ্ট ১১টি ক্ষেত্রে জমি দখলের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে দখল নেওয়া হয়েছে। এগুলির প্রত্যেকটির জন্যই যথাযথ পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং সেই অনুসারেই গৃহ নির্মিত হবে। বর্তমানে নতুন গ্রামসমূহের উন্নয়ন প্রধান রাজপথের সহিত সংযোগকারী রাস্তা ও নালা তৈয়ারি এবং নলকূপ বসানো ও পুষ্করিণী খননের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। নিয়মিত উন্নয়ন-কর্মসূচি অনুযায়ী বিদ্যালয়, সমাজকেন্দ্র প্রভৃতি নির্মাণ করা হবে।

স্বাবলম্বনের এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার ইট পোড়ানোর জন্য কয়লা, ছাদের জন্য কাঠ ও ঢেউ-টিন, কুয়ার বহির্ভাগের জন্য সিমেন্ট এবং জানলা-দরজার জন্য কাঠ সরবরাহ করেন। ইট-পোড়ান, রাজমিস্ত্রীর কাজ, ছাদ-তৈরি, প্রভৃতি করেন গ্রামবাসীরা। সরকার ইট-তৈরি ও গৃহনির্মাণের কাজে জনসাধারণকে সাহায্য করার জন্য শিক্ষণ-দানেরও ব্যবস্থা করেছেন। মৃদুখামন্ত্রীর হাণ্ড-তহবিল থেকে ইটের ছাঁচ ও রাজমিস্ত্রীর যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে।

এই পরিকল্পনায় গ্রামবাসীদের গৃহনির্মাণে বিনাব্যয়ে সাহায্য দেওয়া ছাড়াও, গ্রামীণ শ্রমিকদের

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ১০ম সংখ্যা

এমন একটি বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যার ফলে কর্মহীনতার সময়ে তাঁরা কর্মের সংস্থান করতে পারবেন। জেলার ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা

১। হুগলি—৩,৩৯৯;	২। হাওড়া—৯১৭;
৩। বর্ধমান—৪,৩১১;	৪। বীরভূম—১,১১২;
৫। নদিয়া—৬,৫৯৪;	৬। মুর্শিদাবাদ—১,৭৫৬;
৭। চব্বিশপরগনা—২৭৪।	

আদিবাসীদের জন্য শস্যগোলা

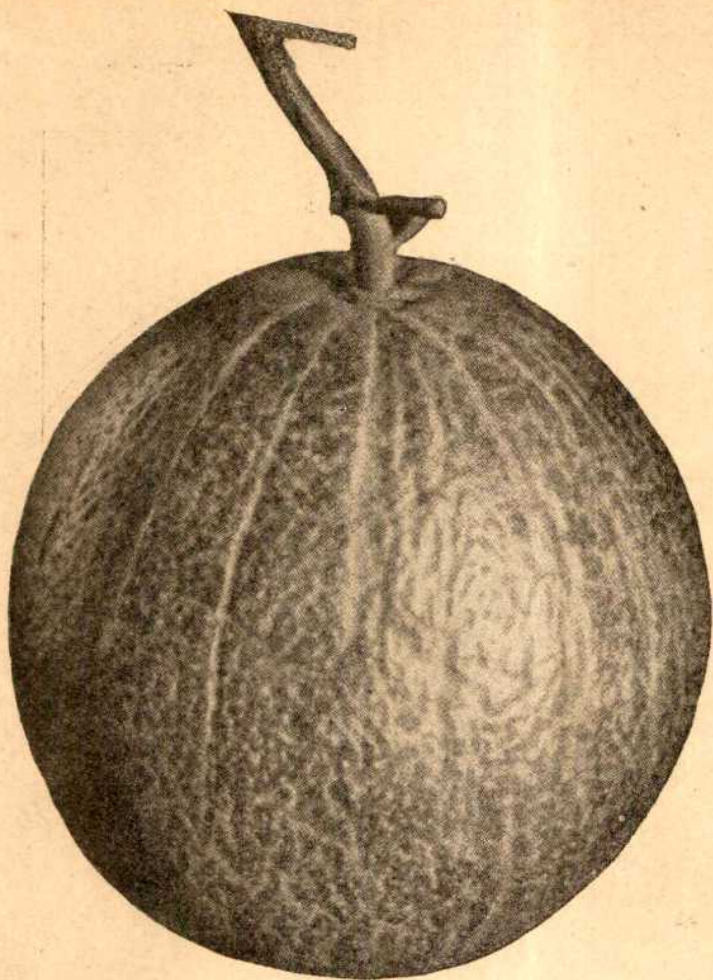
পশ্চিমবঙ্গ-সরকার বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানায় পিয়ারডোবায় অবস্থিত পিয়ারডোবা আদিবাসী সর্বকল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেডের উদ্যোগে একটি সমবায় শস্যগোলা স্থাপন অনুমোদন করেছেন এবং চলতি আর্থিক বৎসরে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতির নিয়ামকের হাতে ১০,১৭০ টাকা প্রদান মঞ্জুর করেছেন।



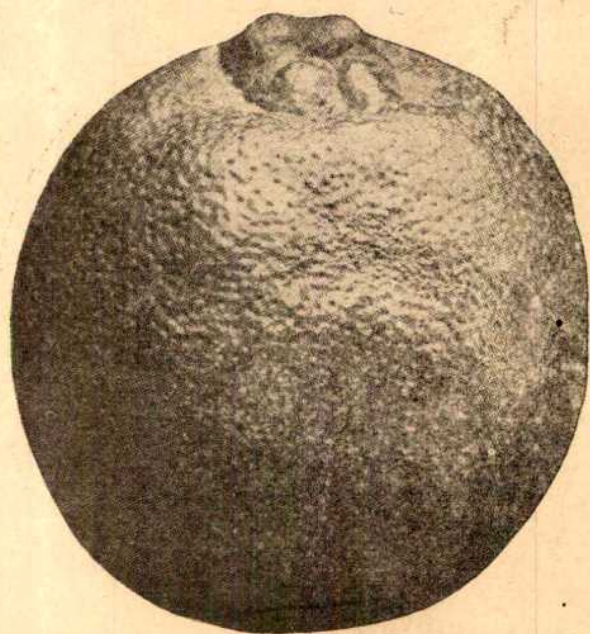
সম্পাদক : শ্রীপ্রকাশস্বর্ন মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা।
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী
মুদ্রণে অধীক্ষক শ্রীশুভেন্দ্র মৃথোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।



কৃষ্ণনগর সরকারী উদ্যানে আমের চাষাবাগান



মোসাধি—
শরবতী লেবু



নাগপুরী
কমলালেবু

বহুধরা

১০ম বর্ষ : ১১শ সংখ্যা

ফাল্গুন : ১৩৬৪

(১৮৭৯ শকাব্দ)

প্রসঙ্গ

সর্বাত্মকভাবে দেহ-পোষণের উপযোগী সকল প্রকার খাদ্য-উপাদানে সমৃদ্ধ ব'লে দুধ তরল পদার্থ হিসাবে পানীয় হ'লেও খাদ্যের মধ্যেই গণ্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য। সকল মানুষেরই প্রতিদিনের আহাৰ্য-তালিকায় দুধের একটা স্থান থাকা আবশ্যিক। বয়স্ক লোকে নানা প্রকারের খাদ্য থেকে বিভিন্ন পুষ্টি-উপাদান গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু শিশু তা পারে না। তাই বিশেষ করে শিশু-দেহের পুষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্য দুধ অপরিহার্য। অথচ, দুধের বিষয়, এদেশের বেশির ভাগ শিশুই নিয়মিতভাবে এক ফোঁটা দুধ চোখেও দেখতে পায় না।

সারা ভারতেই দুধের অভাব ব্যাপক, তার মধ্যে আমাদের এই পশ্চিম বাঙলায় এ অভাবটা সবচেয়ে বেশি ব'লে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ গোরুর সংখ্যা যে এ রাজ্যে কম তা নয়। পল্লী-অঞ্চলে প্রায় ঘরে-ঘরেই গোরু রয়েছে। থাকলে কী হবে? সেসব গোরু আকারে ক্ষুদ্র, স্বাস্থ্যে জীর্ণ-শীর্ণ অস্থিচর্মসার, তারা রোজ দুধ দেয় আধ সের থেকে বড় জোর এক সের।

উন্নত জাতের গোরু পালন করে এই সমস্যার সমাধান করার কথা আমাদের পট্টিকায়ও বহুবার আলোচনা করা হয়েছে। আসল সমস্যা হচ্ছে গোরুর খাদ্যের। ঠিকমত খাবার যোগাতে পারলে এবং পরিচর্যা করলে ছোট আকারের বাঙলা গোরুরও হাড়ের উপর মাংসের ঢাকা পড়ে এবং আধসের-দুধ-দেওয়া এসব গোরুই তিন সের থেকে পাঁচ সের পর্যন্ত দুধ দেয়—এটা পরীক্ষিত সত্য।

নানা কারণে আজকাল আমাদের পারিবারিক আয়তনও ক্ষুদ্র হয়ে পড়েছে। বেশির ভাগ পরিবারেরই প্রতিদিন তিন থেকে পাঁচ সের দুধ যথেষ্ট। সরকার এবং জনসাধারণের মিলিত প্রচেষ্টায় যতদিন পর্যন্ত না প্রতিটি বাঙলা গোরুর স্থান একটি করে উন্নত জাতের গোরুর দ্বারা পূর্ণ হচ্ছে, ততদিন আমাদের ছোটখাট গোরুগুলোকেই যথেষ্ট খাদ্য দিয়ে, যথাযোগ্য পরিচর্যা করে, রোগের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে, দরদ দিয়ে লালন করলে তাতে আমাদের পল্লী-অঞ্চলের দুধ-সমস্যা অনেকটা মিটবে।

বহু-আলোচিত হ'লেও একথার পুনরুল্লেখ অবান্তর হবে না যে, এ রাজ্যের মানুষের সংখ্যার অনুপাতে চাষের জমি অনেক কম, তাই মানুষের খাদ্য ফসল উৎপাদনের সমস্যা প্রবল। কিন্তু গোপালনও মানুষের খাদ্যসমস্যার সমাধানেরই জন্য। তাই আমাদের খাদ্য ফসল চাষের জমিতেই পর্যায়ক্রমে গো-খাদ্য ফসলেরও চাষ করতে হবে।

পল্লী-অঞ্চলই কৃষিভূমি। সেখানেই যখন গো-খাদ্যের অভাব, তখন শহর-অঞ্চলের কথা তো সহজেই অনুমেয়। শহরের সাধারণ অধিবাসীরা গোপালনের কথা কল্পনায়ও আনতে পারেন না। শহরের উপকণ্ঠে অর্ধ-গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষেও সমস্যাটা প্রায় একই রকমের। এসব জায়গাতেও শহরেরই মত প্রবাদ—“গোরু পুষতে হাতি-পোষার খরচ লাগে”। পরিবারগতভাবে গোপালন করা সম্ভব নয় ব'লে শহর-অঞ্চলে দুধের

যোগান দেওয়ার ভার নিয়েছে খাটাল। খাটালের কদর্য পরিবেশ চোখে দেখলে সেখানকার গোরুর দুধ মখে তুলতে ইচ্ছে হয় না। তবু মানুষ নিরুপায় হয়ে সেই দুধ খায়, শিশুদের খাওয়ায়। সেই দুধও খাঁটি পাওয়া যায় না। খাটালের তথা গোয়ালার দুধে জল মেশানো থাকবেই—এটা একটা সর্বজনস্বীকৃত স্বয়ংসিদ্ধ সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে রসিকিতা করে একে ‘জল-মেশানো দুধ’ না বলে, বলেন, ‘দুধ-মেশানো জল’।

খাঁটি দুধ পাওয়া সম্বন্ধে সংশয়টা শহরবাসীর মনে এমনই করুণভাবে বসুন্ধর হয়ে গেছে যে, হরিণঘাটার সরকারী দুধকেন্দ্র থেকে কলিকাতা শহরে প্রতিদিন গোরুর ও মহিষের যে খাঁটি দুধ বিক্রি করা হয় তার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধেও কারও কারও মনে কখনও কখনও সন্দেহ জাগতে দেখা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই মহানগরীর সু-বিখ্যাত একটি দৈনিক পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভেই কিছুদিন আগে এমন মন্তব্য করা হয়েছে যা থেকে মনে হ’তে পারে যে, হরিণঘাটা কেন্দ্র থেকে সরবরাহ-করা গোরুর ও মহিষের দুধ খাঁটি নয়। জল-মেশানোর অভিযোগ অবশ্য তোলা হয় নি। বলা হয়েছে যে, উক্ত কেন্দ্র থেকে কলিকাতায় বিক্রি জন্য ‘খাঁটি’ বলে কথিত যে দুধ আসে, আসলে ওখানকার দুধশালায় তার প্রথম গরমের সরটা তুলে নেওয়া হয় মাখন আর ঘৃত তৈরি করার জন্য! সুতরাং সেই দুধ একেবারে খাঁটি নয়। সরকার থেকে অবশ্য উক্ত দৈনিকপত্রেই এক প্রতিবাদলিপি প্রকাশ করিয়ে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, হরিণঘাটার খাঁটি দুধ একান্তই খাঁটি এবং ওখানকার দুধকেন্দ্রে কোন কারণেই এবং কোন সময়েই তা থেকে কোন পদার্থ-উপাদান তিল-পরিমাণেও সরিয়ে নেওয়া হয় না।

হরিণঘাটা দুধশালায় কর্মপদ্ধতির যাঁরা খবর রাখেন, ওরকম সংশয় জাগার হেতুটা তাঁরা সহজেই অনুমান করতে পারেন। সাধারণ ক্রেতারা দেখতে

পান, গয়লা থেকে কেনা দুধ জ্বাল দিলে তার উপর যতটা ঘন হয়ে সর পড়ে, হরিণঘাটার দুধ জ্বাল দিলে তত ঘন সর পড়ে না। এর প্রকৃত কারণটি তাঁরা জানেন না। হরিণঘাটায় যে দুধ হয়, সেখানকার দুধশালায় তাকে পাস্তুরী প্রণালীতে জীবাণুমুক্ত করে তার পরে বোতলে ভর্তি করে বিক্রি জন্য পাঠানো হয়। যন্ত্রসাহায্যে এই জীবাণুমোচনের কাজটি করার সময়ে যন্ত্রের মধ্যে দুধ এমন প্রবল বেগে বয়ে চলে যে, তার ফলে দুধের মধ্যকার স্নেহগুটিকাগুলির বেশির ভাগই ভেঙে যায়, আর সেইজন্যই সেই দুধ জ্বাল দিলে তার উপর ঘন সর পড়ে না। এতে কিন্তু দুধের উৎকর্ষ-গুণ কিছুমাত্র কমে না।

হরিণঘাটার এই গোশালাই হচ্ছে এ রাজ্যের গো-উন্নয়ন-প্রচেষ্টার প্রাণকেন্দ্র। এখানকার দুধশালা কলিকাতা এবং তার উপকণ্ঠ-অঞ্চলে দুধ যোগান দেওয়ার ভার নিয়েছে। ক্রমশই এখান থেকে কলিকাতা-অঞ্চলে দুধের যোগান বেড়ে চলেছে। এই দুধের দাম ধরা হচ্ছে না-লাভ আর না-লোকসানের ভিত্তিতে—ঠিক পড়তা খরচ অনুযায়ী। কেননা, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান এটা নয়, এ হচ্ছে জনসাধারণের অর্থে প্রতিষ্ঠিত জনকল্যাণ-প্রতিষ্ঠান। কলিকাতার ও তার উপকণ্ঠের খাটালগুলি অপসারিত করে, সেগুলোর মালিকদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, পরিচ্ছন্ন পরিবেশে গো-পালনের সুবিধা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে হরিণঘাটায় গড়ে তোলা হচ্ছে বিরাট দুধপল্লী।

একা সরকারী প্রচেষ্টায় যদি রাজ্যের সমস্ত মফস্বল শহর-অঞ্চলেরও দুধ-সমস্যার সমাধান করতে হয়, তাতে সময় লেগে যাবে অনেক। তার অপেক্ষায় না থেকে, মফস্বল শহর-অঞ্চলগুলোর অধিবাসীরা যদি সমবেত প্রচেষ্টায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধরনে সমবায় গোশালা ও দুধশালা স্থাপন করেন, তাতে সমস্যার সমাধান দ্রুত হতে হবে।

পল্লী-অঞ্চলেও যেভাবে গো-পালন করা হয়, তা একেবারেই অব্যাহিত। গোরু, যাঁরা পোষেন এবং গো-পালনে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা কখনও নদীয়া জেলার হরিণঘাটার কাছে কোথাও এলে, এখানকার গোশালা এবং দুগ্ধকেন্দ্র দেখলে বুঝতে পারবেন, সাধারণ লোক গো-পালনে কত পিছিয়ে আছেন। শুধু হরিণঘাটার গোশালা দেখবার জন্যই যদি হরিণঘাটার আসা হয়, তাতেও পথ-খরচাটা সার্থক হবে।

স্বাস্থ্যসম্মত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গো-পালন করা পল্লীবাসী দরিদ্র চাষীদের বেশির ভাগেরই একক সামর্থ্য সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রেও তাঁরা যদি সমবেত প্রচেষ্টায় সমবায় গোশালা ও দুগ্ধশালা স্থাপন করেন, তাতে পল্লী-অঞ্চলের দুগ্ধ-সমস্যার সমাধান অচিরেই হয়ে যাবে। সমবেত ভূদানে বিভিন্ন স্থানে গো-খাদ্য ফসল চাষের জন্য পৃথক জমির বা গো-চারণ-ভূমির ব্যবস্থা করাও হয়তো সম্ভব হয়ে উঠবে।



আমাদের পরিকল্পনা

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়

[২০এ জানুয়ারি থেকে ২৬এ জানুয়ারি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে পরিকল্পনা সপ্তাহ পালন উপলক্ষে এ রাজ্যের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় যে বৈতর-ভাষণ দেন এখানে তা প্রকাশ করা হল।]

এখন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দ্বিতীয় বছর চলছে। ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা যে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে এ বিষয়ে সকলেই একমত। বিদেশীমাঠেই—যাঁরা এদেশে বেড়াতে আসেন তাঁরা সকলেই আমাদের দেশের দ্রুত উন্নয়নের কাজ দেখে প্রশংসা করেন। তাঁরা আমাদের বিরাট বহুমুখী পরিকল্পনাগুলি—দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, হীরাকুন্ড, ভাকরা-নাংগাল পরিদর্শন করেন, পরিদর্শন করেন চিত্তরঞ্জন এবং পেরাম্বুরের কোচ ফ্যাক্টরি, সিন্ধি এবং বিশাখাপত্তনম্, পরিদর্শন করেন নির্মলমাণ ইন্দ্রপাত উপনগরী, সমষ্টি উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্র-সারণ পরিকল্পনার নানা কেন্দ্র এবং এইসব দেখে স্বভাবতই তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আমরা ঠিক পথে এবং ঠিকভাবেই অগ্রসর হচ্ছি। অবশ্য আমরা এ সম্বন্ধেও সচেতন যে, প্রচুর কাজ হওয়া সত্ত্বেও এখনও অনেক করণীয় রয়েছে।

আমাদের এই বিশাল দেশের জনসংখ্যা বিপুল এবং বহু শতাব্দী ধরে এই দেশ বিদেশীদের দ্বারা শোষিত হয়েছে। সেই সময়ে আমরা জাতি-গতভাবে সমৃদ্ধিলাভের কথা চিন্তা বা কল্পনা করতেও ভুলে গিয়েছিলাম। আমরা অদৃষ্টবাদী হয়ে উঠেছিলাম এবং যা ঘটত তাই মেনে নিতাম। জাতিগতভাবে আমাদের অস্তিত্ব দুর্বিষহ হ'লেও আমরা তা অখণ্ডনীয় অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্ট বলে মনে করতাম। এমন কি ভারত পৃথিবীর মধ্যে দরিদ্রতম দেশ বলে সুখ্যাতি পর্যন্ত লাভ করেছিল

—যা শুনে কারওই ঈর্ষা হতে পারে না। কিন্তু সুখের বিষয় যে, স্বাধীনতালাভের ফলে তা চিরতরে লোপ পেয়েছে। এর ফলেই আমরা হঠাৎ সমৃদ্ধির উপর নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলাম।

বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে, আমাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা জরুরী প্রয়োজনের তাগিদে দ্রুত রচনা করতে হয়েছিল বলে তার মধ্যে কিছুটা শিথিলতা থেকে গিয়েছিল। তবু সে পরিকল্পনায় জনগণের জরুরী প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সমাজ-জীবনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই এই পরিকল্পনা স্পর্শ করেছে। অবশ্য বাড়তি খাদ্য উৎপাদন, সামাজিক উন্নতি এবং সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার উপরেই সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য আরও বড় হ'লেও, এটা একটা গণতান্ত্রিক পরি-কল্পনা। সব ক্ষেত্রেই কোন-না-কোনভাবে জন-গণের পরামর্শ নেওয়া হয়। প্রথমে পরিকল্পনাটি জেলা পর্যায়ে তৈরি করা হয় এবং তারপর গণভোটে নির্বাচিত রাজ্যসরকারগুলি সে সম্বন্ধে পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার করেন। তারপর পরিকল্পনা কমিশন আমাদের প্রয়োজন ও আমাদের বর্তমান সম্পদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করা যায় কিনা দেখবার জন্য রাজ্যসরকারসমূহ এবং নানা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরামর্শক্রমে পরিকল্পনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেন। পরিকল্পনাটি যখন চূড়ান্ত রূপ পায় তখন দেখা যায়, তার মধ্য দিয়ে প্রধানত জনমতের সার্ব-ভৌমত্বই ব্যক্ত হয়েছে এবং তাঁদের সর্বাত্মক ও পূর্ণ সহযোগিতার উপরই এর সাফল্য নির্ভর করছে।

“সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ-ব্যবস্থার” কথা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। এই কথাটির মধ্যেই

আমাদের দ্বিতীয় পরিকল্পনার সার কথা রয়েছে। অন্যান্য করের সঙ্গে মৃত্যুকর, সম্পদকর, ব্যয়কর ইত্যাদির মধ্য দিয়ে করনীতির সূচক পরিকল্পনা করে এবং কয়েকটি আর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই সর্বাঙ্গিক কল্যাণকর সমাজব্যবস্থার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

রাজ্য-পর্যায়ে আইনের ক্ষেত্রে জমিদার-বিলোপ এবং সম্পত্তি-দখলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু শুল্ক এর দ্বারাই বেশি কিছু হতে পারে না, কারণ, নতুন সম্পদ সৃষ্টির ব্যাপারে এগুনি সঠিক ব্যবস্থানয়। নতুন সম্পদ গড়ে তুলতে না পারলে জাগতিক সমৃদ্ধি বাড়বার সম্ভাবনা নেই। সেইজন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পায়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে একটি ইস্পাত-কারখানা ও কোক-চুল্লি কারখানা পত্তন করা হচ্ছে এবং যদি কোন বাধা না পড়ে তা হলে অদূর-ভবিষ্যতে এই রাজ্যে আরও কয়েকটি বড় শিল্প গড়ে তোলা হবে।

বড় শিল্প ছাড়াও কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পের উপরেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে শ্রমিকপ্রধান কুটিরশিল্পের মধ্য দিয়েই বেকার-সমস্যা ও সমৃদ্ধিলাভের সমস্যার অনেকখানি সমাধান করা যেতে পারে। গ্রামের শিল্পীদের স্বল্প ঋণ দেওয়া ছাড়াও যুবক-যুবতীদের শিক্ষা দেবার জন্য উৎপাদন-তথ্য-শিক্ষণকেন্দ্রও স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। বহু শিল্পায়নের জন্যও আমাদের দেশে প্রচুর দক্ষ কারিগর দরকার। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ন্যায্যভাবেই কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় এবং পরবর্তী পরিকল্পনায় দক্ষ কারিগরের অভাবে যাতে কোন স্তরেই কাজ ব্যাহত না হয় তার জন্য বহু টেকনিক্যাল স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ল্যাবরেটরি এবং শিক্ষণকেন্দ্র গড়া হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে, জনগণের কল্যাণের জন্য যা-কিছু করা সম্ভব তা করতে পারি বলে আমরা

আনন্দবোধ করছি। আমি এখানে আপনাদের বিস্তারিত পরিসংখ্যান শোনাতে চাই না। এই রাজ্যের দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রথম পরিকল্পনার প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৫৭.৭ কোটি টাকা খরচ করা হবে বলে স্থির হয়েছে। সমগ্র পরিকল্পনাটির উদ্দেশ্যই হ'ল, আরও অনেক প্রাথমিক, বুনিন্দাদী এবং বহুমুখী শিক্ষালয়, আরও অনেক কলেজ ও কারিগরি শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করে, কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচের সুযোগসুবিধা আরও বাড়িয়ে, কৃষক এবং ছোটখাট ব্যবসায়ীদের কারিগরি শিক্ষা দেবার জন্য নতুন শিক্ষাকেন্দ্র খুলে এবং উৎপাদন-কেন্দ্র ও বাজারের মধ্যে যোগাযোগের সুবিধা বাড়ানোর জন্য রাস্তা বাড়িয়ে আমাদের গ্রামগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা। রাজ্যের স্বাস্থ্য উন্নয়ন পরিকল্পনার ফলে ম্যালেরিয়া নিরোধ করা সম্ভব হয়েছে এবং যক্ষ্মা প্রতিরোধের জন্য বি-সি-জি টিকা দেওয়ার কাজ ভালভাবেই এগিয়ে চলেছে। সংক্রামক রোগ, পোলিও ইত্যাদির চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় ইতিমধ্যে বিশেষ ধরনের হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে, এ ছাড়া গ্রামাঞ্চলে আরও স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন এবং জেলায় জেলায় হাসপাতাল সম্প্রসারণের কাজ চলেছে। ছোট-বড় শহরগুলিকে কোনও সুখসুবিধা থেকে বঞ্চিত করা নয়, বরং যাবতীয় সুযোগসুবিধা যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে দেওয়াই হ'ল আমাদের উদ্দেশ্য—যাতে করে তার মধ্য দিয়ে পরিকল্পনায় সুচিত বিজ্ঞানের সুবিধা এবং আশার বাণী গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

আপনারা জানেন যে, তা করার একটা প্রধান উপায় হ'ল সমিতি উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার প্রসার। প্রথম পরিকল্পনার সময় রাজ্যের প্রায় এক-চতুর্থাংশ গ্রামবাসীকে এইসব পরিকল্পনার আওতায় আনা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বাকি অংশ অর্থাৎ রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের সকল অধিবাসীকেই এইসব পরিকল্পনার আওতায় আনা হবে। এবং এইভাবে কৃষি, সমবায়, পশু-পক্ষী-পালন, শিক্ষা, গৃহনির্মাণ, স্বাস্থ্য এবং

যোগাযোগ ইত্যাদি গ্রামীণ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই একটা বিরাট উৎসাহের সঞ্চার করা হবে। আপনারা অবশ্যই জানেন যে, বর্তমানে বৈদেশিক মদ্রা কম পড়ে যাওয়া সম্পর্কে খুবই আশঙ্কা রয়েছে। আমরা যাতে পরিকল্পনার কাজ চালিয়ে যেতে পারি তার জন্য আমাদের উচিত হবে আভ্যন্তরীণ সম্পদ কাজে লাগানোর ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করা। এখানেও আবার সেই জনগণের সহযোগিতার কথাই ওঠে। পরিকল্পনা রচনার সময় আপনারা যেমন সহযোগিতা করেছেন, এর রূপায়ণের ব্যাপারেও তেমনই আপনাদের সকলেরই সহযোগিতা করা উচিত।

এই কাজে পুঁজিপতির চেয়ে সাধারণ মানুষের উপরেই আমার বেশি ভরসা। পুঁজিপতিরা অনেক কর দিচ্ছেন এবং ব্যবসা ও শিল্পপ্রসারের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করছেন। তা ছাড়া মনস্তত্ত্বের দিক থেকে সাধারণ মানুষের সহযোগিতার মূল্য আরও অনেক বেশি। এক দরিদ্র ব্যক্তি যখন এক আনা দিয়ে

সাহায্য করেন তখন তিনি শুধু তাঁর মহামূল্যবান আনিটিই দেন না, সেইসঙ্গে তাঁর হৃদয়ের খানিকটাও মিশিয়ে দেন। তাঁর সামান্য দান পরিকল্পনার সাফল্যের উপর তাঁর বিশ্বাসেরই প্রামাণ্য। তাই আমি আপনাদের সকলকেই ব্যক্তিগত স্বল্প-সম্ভব আন্দোলনকে জোরদার করে তোলবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনারা যদি তা করেন, করবেন ব'লেই আমার বিশ্বাস, তা হ'লে অর্থের জন্য আমাদের পরিকল্পনার কাজ ব্যাহত হবে না। আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, প্রথম পরিকল্পনায় আমরা আনুমানিক খরচ ধরেছিলাম ৬৯ কোটি টাকা, কিন্তু জনগণের স্বতস্ফূর্ত সহযোগিতার ফলে রাজ্যসরকার সেই জায়গায় ৭১ কোটি টাকা খরচ করতে সমর্থ হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে একবার যদি এ কাজ সম্ভব হয়ে থাকে, আমার বিশ্বাস, আবার তা করা যাবে। পশ্চিমবঙ্গবাসীর সমৃদ্ধির পরিকল্পনা সার্থক হোক, আমি এই কামনাই করি।



কৃষ্ণনগর উদ্যানতত্ত্ব গবেষণাকেন্দ্র

বির্মল দত্ত, বি এ, পুরাণরত্ন

কৃষ্ণনগর উদ্যানতত্ত্ব গবেষণাকেন্দ্র। ইংরেজী নাম কৃষ্ণনগর হাটিকালচারাল রিসার্চ স্টেশন। পশ্চিম-বঙ্গ-সরকারের কৃষিবিভাগের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে এই কেন্দ্র। ১৯৩৪ সালে স্থাপিত হয়েছিল, তারপর ক্রমে ক্রমে এর পরিধি বেড়ে যায়। ১৯৪৬ সাল থেকে কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগে উন্নয়নকার্য শুরু হয়। স্বাধীনতালাভের পর হাল আমলে এই সরকারী প্রতিষ্ঠানটি বিরাট আকার ধারণ করেছে। উদ্যানরচনা ও কৃষি-বিষয়ে এই কেন্দ্রের দান অপারিসীম। আর সবচাইতে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এইটিই হচ্ছে একমাত্র উদ্যানতত্ত্ব গবেষণাকেন্দ্র।

কৃষ্ণনগর শহর থেকে প্রায় দু' মাইল দূরে এই কেন্দ্রটি। 'কৃষ্ণনগর সিটি' স্টেশন থেকে নবম্বীপ রেলপথে 'কৃষ্ণনগর রোড' স্টেশনের প্রায় পাশ থেকে শুরু করে দে-পাড়ার দিকে চলে গিয়েছে এর সীমানা। প্রায় ৩০০ একর জমি নিয়ে এর এলাকা। সমগ্র কেন্দ্রটি একজন উদ্যানতত্ত্ববিদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। আর তাঁর কাজে সহযোগিতা করছেন সহকারিগণ, শ্রমিকেরা ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। সমগ্র কেন্দ্রকে তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে:

- (১) উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা বিভাগ,
- (২) পাটবীজ-উন্নয়ন বিভাগ, এবং
- (৩) ইউনিয়ন কৃষি-সহকারী শিক্ষণ বিভাগ।

পৃথক পৃথকভাবে এই তিনটি বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা বিভাগ

এই বিভাগের অধীনে পাঁচটি শাখা আছে: (ক) ফলমূল গবেষণা শাখা, (খ) সবজি-উন্নয়ন পরিকল্পনা (ভারতীয় কৃষিগবেষণা পরিষদ ও রাজ্য-সরকার কর্তৃক অর্থ সাহায্যপ্রাপ্ত এবং ১৯৫০ সালে

স্থাপিত) শাখা, (গ) ফলের চারা (কলম-সহ) এবং সবজির বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ শাখা, (ঘ) সুপারির চারাবাগান পরিকল্পনা (ভারত-সরকারের সুপারি-নিয়ন্ত্রণ সমিতি কর্তৃক অর্থপ্রদত্ত ও ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত) শাখা, (ঙ) উদ্ভাস্ত-পুনর্বাসন পরিকল্পনা শাখা, খুন্দুলিয়া (দু' বিঘা জমিতে উদ্যান-রচনা, কৃষি, হাঁসমুরগি-পালন পরিকল্পনা)।

(ক) ফলমূল গবেষণা শাখা

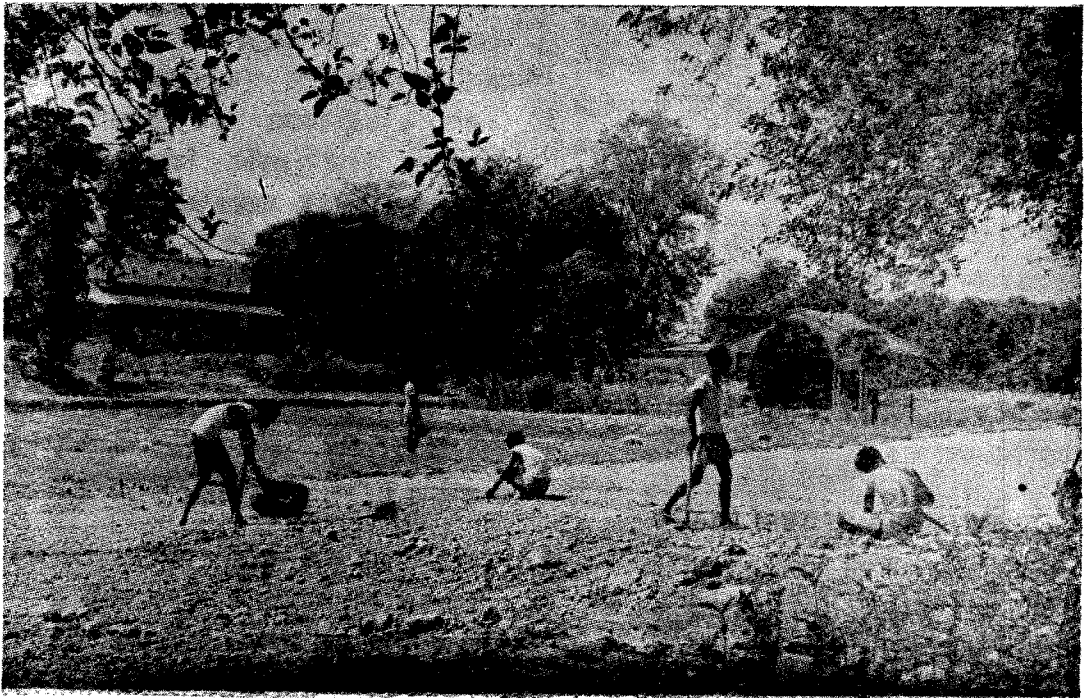
এই শাখা বিভিন্ন শ্রেণীর আম, লিচু ও অন্যান্য ফলের গবেষণাকার্যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। এ রাজ্যের বাইরের ও বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন শ্রেণীর ফলমূল এখানে রয়েছে।

আম: প্রায় ৭০ প্রকারের আমের গাছ রয়েছে এখানে। এর মধ্যে ৪৫ রকমের গাছ মর্শিদাবাদ জেলা থেকে সংগৃহীত (মর্শিদাবাদ আমের জন্য বিখ্যাত) ও ১৫ রকমের গাছ বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্য থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। আমের এই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বোম্বাই, হিমসাগর, ল্যাংড়া, ফজলি, কহিতুর, রানীপছন্দ, আলফ্যানসো, ব্যাংগালোর, বির্মল, দাশহরি, সাদোলা, বন্দাবনী প্রভৃতি প্রধান। ১৯৫৪ সাল থেকে এই ৭০ রকম আমের গাছ ও তাদের ফল নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন দুই জাতের গাছ থেকে সংকর জাতের আম উৎপাদনের পরীক্ষাও করা হচ্ছে।

লিচু: লিচুর গাছ রয়েছে ৮ রকমের। এ রাজ্য ছাড়া বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ থেকেও কয়েক জাতের লিচুগাছ সংগ্রহ করা হয়েছে। তার মধ্যে চীনা লিচু বেশ উত্তম শ্রেণীর বলে পরিগণিত।



ককনগৰ সয়কাৰী উজানে উন্নত জাতৰ আমগাহেৰ সাৰি



উক্ত উজানে কৰ্মীৰা স্বাগানেৰ কাৰে নিৰত

কলা: কলারও বিশেষ স্থান রয়েছে এখানে। প্রায় ১১৯ রকমের কলাগাছ এখানে আছে। এসব জাত ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত। এখানে শুধু কলাচাষ উন্নয়নের গবেষণাই করা হচ্ছে না, কলা ও কলাগাছ বিক্রিও করা হয়ে থাকে জনসাধারণের কাছে। এখানে প্রধানত কাবুলি বা সিঙ্গাপুরী, চাঁপা, মর্তমান ও কাঁচাকলার চাষই বেশি হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কলাচাষের পরীক্ষাকালে দেখা গিয়েছে যে, চাঁপা ও মর্তমান কলার গাছ ১২ ফুট × ১২ ফুটের স্থলে ৯ ফুট × ৯ ফুট এবং সিঙ্গাপুরী কলাগাছ ৮ ফুট × ৮ ফুটের স্থলে ৬ ফুট × ৬ ফুট অন্তর লাগানো যেতে পারে।

অন্যান্য ফল: আম, লিচু ও কলা ছাড়া আরও যেসব ফল রয়েছে, তার মধ্যে কাঁঠাল ১৮ রকমের ও পেয়ারা প্রায় ৭ রকমের আছে। আর আছে—আনারস, আতা, জাম, জামরুল, কাশীর কুল, সফেদা, পেঁপে প্রভৃতি। লেবুগাছও আছে কয়েক রকমের। লেবুর মধ্যে শরবতি লেবু, বীজশূন্য লেবু, আসাম ও মাল্টা লেবুর গাছ বেশ ভাল ফল দিচ্ছে। মাল্টা লেবুর কলম লাগানোর দু' বছরের মধ্যেই সেই গাছে ফল ধরছে।

(খ) সবজি উন্নয়ন পরিকল্পনা

এ শাখায় তরিতরকারির উন্নয়ন-পরিকল্পনা ১৯৫৩ সালে গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যসরকার ও ভারতীয় কৃষি পরিষদের গবেষণা সমিতির যুক্ত অর্থসাহায্যের দ্বারা এই পরিকল্পনা পরিপূর্ণ। কৃষ্ণনগরে এই কেন্দ্রে ছাড়া কালিম্পঙের পাহাড়ী অঞ্চলেও সবজিচাষ-উন্নয়নের ব্যবস্থা রয়েছে। যেসব তরিতরকারি চাষ হয় সেগুলো হচ্ছে: ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, ওলকপি, মূলা, টমাটো, ঝিঙা, ঢাড়াডুস, পালম, বিট, লেটুস, শিম, বিন, পটোল, কাটোয়া-ভাঁটা প্রভৃতি। এইসব তরিতরকারি উৎপাদনের উন্নয়নের জন্য গবেষণাও করা হয়। গবেষণার দ্বারা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তরিতরকারি থেকে

বীজ উৎপাদন করে তা জনসাধারণের কাছে ন্যায্য মূল্যে বিক্রিও করা হয়ে থাকে এবং তরিতরকারি বিক্রির জন্য অনেক সময় শহরেও আনা হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, টমাটোগাছ ৩ ফুট × ৩ ফুট অন্তর লাগানোই ভাল। বিশেষ জাতের কয়েক প্রকার শাক-সবজির বীজ রাশিয়া ও আমেরিকা থেকে এনে, এখানকার জমিতে সেগুলোর চাষ করে উৎকৃষ্টতর ফল পাওয়া গিয়েছে।

(গ) ফলের চারা এবং সবজিবীজ উৎপাদন ও সরবরাহ কেন্দ্র

প্রত্যেক বছরই এখানকার বিভিন্ন আম, কাঁঠাল, লিচু, আতা, লেবু, জামরুল প্রভৃতির কলম ও চারা তৈরি করা হয় এবং সেগুলো জনসাধারণের কাছে বিক্রি করা হয়। প্রত্যেক বছরই প্রায় ১৮ হাজার বিভিন্ন ফলের চারা বা কলম বিক্রি হয়। এখানকার ফলের চারা বিশ্বস্ত এবং দামেও সস্তা বলে খ্যাতি আছে; এইজন্য সেগুলোর চাহিদাও খুব। চাহিদা-মত সব সময় সরবরাহ করাও সম্ভব হয় না। প্রতি বছর প্রায় ১৫ হাজার কলার 'বোগ' বা চারাও বিক্রি হয় এখান থেকে।

(ঘ) সুপারির চারাবাগান পরিকল্পনা

এই কেন্দ্র থেকে জনসাধারণের কাছে সুপারির চারা বিক্রি করা হয়। দু' বছরের চারার দু' আনা ও এক বছরের চারার এক আনা দর। সুপারি-উৎপাদন জমির প্রায় সবই পূর্ব পাকিস্তানে পড়ায়, পশ্চিমবঙ্গে সুপারির চাষ বাড়বার জন্য এই পরিকল্পনার ওপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। এ বছর প্রায় ২০ হাজার সুপারির চারা এই কেন্দ্রে উৎপাদন করা হয়েছে।

(ঙ) উদ্ভাস্তু-পুনর্বাসন পরিকল্পনা কেন্দ্র, ধুবুলিয়া

নদিয়া জেলায় ধুবুলিয়া উদ্ভাস্তু-শিবিরের কথা অনেকেরই জানা আছে। কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী এই ধুবুলিয়ায় উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে কাজ চলছে। এই পরিকল্পনার দু' বিষয় জমিতে বাসগৃহ নির্মাণ

ক'রেও উদ্যান রচনা, চাষ-আবাদ ও হাঁসমুরগি পালন প্রভৃতির দ্বারা কীভাবে একটি পরিবারের ভরণ-পোষণ চলতে পারে, তারই পরীক্ষা করা হচ্ছে। ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়েছে। অনেকেই এই পরিকল্পনার কথা জেনে থাকবেন। যদি যথাযথভাবে কাজ করা যায়, তা হ'লে দু' বিঘা জমির এই পরিকল্পনা থেকে মাসে ৯৬ টাকা আয় হ'তে পারে। পরিকল্পনাটি বিশদভাবে নিচে দেওয়া হ'ল:

২ বিঘা জমি:

বাগুঁহ নির্মাণ	...	৩ কাঠা
কলাগাছ রোপণ	...	২½ "
শাকসবজির চাষ	...	২৪ "
হাঁসমুরগি পালন	...	১০ "
(এই ১০ কাঠায় ১০০টি পেঁপে গাছও লাগান চলেবে)		
রাস্তা ও নালা প্রভৃতি নির্মাণ	...	১½ "
মোট	...	২ বিঘা

২৪ কাঠা জমিতে যে শাকসবজি ও তরিতরকারি লাগানো হবে তা হচ্ছে:

নভেম্বর থেকে মার্চ—

আলু—১ বিঘা (মাঝে মাঝে কুমড়া গাছ লাগাতে হবে)

কপি—৪ কাঠা

মার্চ থেকে মে—

কুমড়া ও পেঁয়াজ

মে থেকে অক্টোবর—

কচু—১ বিঘা

ট্যাঁড়স, পুঁইশাক ও কুমড়া—৪ কাঠা

ধুবদলিয়ায় উক্ত পরিকল্পনার নিদর্শনকেন্দ্রও স্থাপন করা হয়েছে। এই দু' বিঘা জমির পরিকল্পনা জীবিকার ক্ষেত্রে আকর্ষণীয়ও কম হয় নি।

পাটবীজ উন্নয়ন বিভাগ

১৯৫১ সাল থেকে শুরুর হয় পাটবীজ উন্নয়ন বিভাগের কাজ। পূর্বে এ জায়গাটি ছিল সম্পূর্ণ জঙ্গল ও কাঁটাবনে পরিপূর্ণ। তারপর একে চাষ করার ফলে নতুন রূপ ধারণ করেছে। ২০৭ একর জমি নিয়ে সুগঠিত এই ক্ষেত্র। এখানে পাট, ইক্ষু, গম, ধান প্রভৃতি লাগানো হয় ও সেসবের গবেষণা-কার্য করা হয়। উন্নত ধরনের বীজ এখানে উৎপাদন করা হয় এবং তা চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বৈজ্ঞানিক প্রথায় এখানে চাষ-আবাদ করা হয়। সারিতে পাট, ধান ইত্যাদির চাষ করা এখানকার বৈশিষ্ট্য। উন্নত শ্রেণীর পাটচাষের গবেষণা এখানে চলেছে। গত পাঁচ বছরে এখান থেকে যে পাটবীজ পাওয়া গিয়েছে তা হচ্ছে: ১৯৫২-৫৩ সালে ১,৫৮৮ মণ, ১৯৫৩-৫৪ সালে ১,৮৩৭ মণ, ১৯৫৪-৫৫ সালে ২,৭৭৪ মণ, ১৯৫৫-৫৬ সালে ৩,৫১৮ মণ, ১৯৫৬-৫৭ সালে ৩,৫৯৭ মণ। এখান থেকে ১,৫০০ মণ পাটবীজ বিলি করে প্রায় ৩০,০০০ হাজার একর জমিতে পাটচাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের চাষীদের মধ্যে ৩,০০০ হাজার মণ পাটবীজ, ১০০ মণ গমের বীজ ও ২,৫০০ হাজার মণ অন্যান্য ফসলের বীজ দেওয়া হয়েছে। এখানকার উৎপাদিত পাটগাছে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত আঁশ বা পাট পাওয়া যায়। পাটের উন্নয়ন করাই হচ্ছে এখানকার প্রধান বিশেষত্ব।

এই তো গেল একদিক। অন্যদিকে বিভিন্ন ফসলের চাষেও যে গবেষণা করা হচ্ছে, তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নলকুপের জলসেচ দ্বারা এখানে একই জমিতে ত্রিবিধ ফসল উৎপাদনেরও পরীক্ষা-কার্য চলেছে। একই জমিতে আউশ ধান, কলাই ও আলু এক সঙ্গে লাগিয়ে প্রতি একরে ৬০০ টাকা পাওয়া যেতে পারে (চাষের সকল খরচ সহ)। কিন্তু পরে পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, পাট, কলাই ও আলু লাগালে সেই জমিতেই প্রতি একরে ৮০০ টাকা পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব। আবার কলাইএর

স্থলে মৃগও লাগানো যেতে পারে। কিন্তু মৃগ লাগালে তার সঙ্গে গম (আলুর বদলে) লাগাতে হবে। এতে আর অবশ্য কিছু কম হয়। কিন্তু তা হ'লেও চাষের কাজ, বীজ খরিদ প্রভৃতিতেও খরচ কম পড়ে। আর এই জেলার (নদিয়ার) জমিতে মৃগ ভাল জন্মায়। বীজ লাগানোর ৬৫ দিনের মধ্যেই এর ফসল পাওয়া যায় এবং প্রতি একরে ৬ মণ পর্যন্ত মৃগ ফলে থাকে।

এখানে ইক্ষুচাষের গবেষণাও চলেছে। দেখা যাচ্ছে, প্রয়োজনীয় জলসেচের ব্যবস্থা থাকলে এখানকার জমিতে ইক্ষুচাষও বেশ লাভজনক কৃষি। এই কেন্দ্রে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গমও উৎপন্ন হচ্ছে। গম অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে লাগানোই শ্রেয় ব'লে এখানকার অভিমত। এই সময় গম লাগালে তা উৎকৃষ্টতর ও লাভজনক হয়। এই কেন্দ্রে উত্তম শ্রেণীর বলদ আর গাভীও রাখা হয়েছে। অনেক সময় এইসব গোরুর বাছুর জনসাধারণের কাছে বিক্রিও করে দেওয়া হয়। এই বিভাগ থেকে এই বছর অনুমান ৭৫,০০০ টাকা লাভ পাওয়া যেতে পারে।

ইউনিয়ন কৃষি-সহকারী শিক্ষণ বিভাগ

পাটবীজ-উন্নয়ন বিভাগের এলাকার মধ্যেই ইউনিয়ন কৃষি সহকারীদের শিক্ষণকেন্দ্র স্থাপিত। গত ১৯৫৩ সালের ১৯এ এপ্রিল এই কেন্দ্রটির উন্মোচন হয় এবং উন্মোচন করেন পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন ও বর্তমান কৃষিমন্ত্রী ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদ। এই কেন্দ্রে কৃষি-সহকারীদের ৬ মাসব্যাপী বর্নিয়াদী প্রথায় হাতে-কলমে কৃষি শিক্ষা দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কৃষিবিভাগে মোট ২,৭০০ জন ইউনিয়ন কৃষি-সহকারী রয়েছেন। প্রত্যেক দলে ৫০ জন করে কৃষি-সহকারী এই কেন্দ্র

থেকে শিক্ষা নিয়ে থাকেন। কৃষি-সহকারীদের গ্রামে চাষী ও পল্লীবাসীদের একান্ত সাহচর্যে আসতে হয়। এইজন্য তাঁদের কৃষিকাজ ছাড়াও বয়স্কদের শিক্ষাদান, কৃষিবিষয়ে সহযোগিতা, স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থা, মৎস্য-চাষ প্রভৃতি বিষয়েও জ্ঞান অর্জন করতে হয়। গ্রামের উন্নয়নকাজে কৃষি-সহকারীদের সহযোগিতা বিশেষ কার্যকরী। এই কেন্দ্রে শিক্ষা-কালীন সময়ের জন্য কৃষি-সহকারীদের নিজ নিজ বেতন ছাড়াও মাসে ৪০ টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হয় প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে। তা ছাড়া, বিনা ব্যয়ে থাকবারও ব্যবস্থা আছে তাঁদের এখানে। এঁদের প্রতিদিন শিক্ষাকালীন সময় হচ্ছেঃ সকালে ৪ ঘণ্টা ব্যবহারিক শিক্ষাদান এবং বৈকালে ৪ ঘণ্টা বাচনিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য এখানে একটি কৃষি-যন্ত্রপাতি বিভাগ, একটি গো-পালন বিভাগ ও একটি গৃহপালিত পশুপক্ষী বিভাগ রয়েছে। এ পর্যন্ত এখানে ২০০ জনের শিক্ষা-দানের কাজ করা হয়েছে।

সমগ্র উদ্যানতত্ত্ব গবেষণাকেন্দ্রটি অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, আজকের দিনে এই কেন্দ্রটির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাই এর পরিসর ও কার্যবৃদ্ধিরও দরকার রয়েছে। কারণ, চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট চারাগাছ, বীজ ও ফলাদি সরবরাহ করতে পারলে এই কেন্দ্রটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে যে, দুষ্টপ্রকৃতির লোকেরা গোপনে এই কেন্দ্রের ফসলাদি খাইয়ে দিয়ে থাকে। শুধু এই কেন্দ্রেই নয়, এই জেলার অনেকের কাছেই এই অভিযোগ পাওয়া যায়। কাজেই ফসলের অনিষ্টকারী লোকদের কঠোর হাতে দমনের ব্যবস্থা থাকাও একান্ত প্রয়োজন।

ভারতের লেবু

পূর্বানুসৃত্তি

গাছ জন্মানো

কোন ভাল জাতের লেবুর বীজ থেকে গাছ করলে সেই গাছেও তেমন ভাল জাতের লেবুই জন্মাবে— তার কোন স্থিরতা নেই। তাই, ঠিক সেই জাতেরই লেবু পেতে হ'লে তার গাছ থেকে কলম তৈরি ক'রে গাছ করতে হবে। লেবুর 'চোখ'-কলম করাই ভাল। এতে নির্বাচিত গাছের একটি কুণ্ডি বা 'চোখ' অন্য কোন জাতের লেবুর চারার কাণ্ডের সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়। সাধারণ কোন লেবুর বীজ থেকে চারা-বাগানে এর জন্য চারা তৈরি করতে হয়। চারা যখন এক বছরের হয় এবং এক হাত বা দেড় ফুট উঁচু হয় তখনই তা চোখ-কলম বাঁধার উপযোগী হয়।

সব জাতের বা ধরনের লেবুই কিন্তু চারা করার পক্ষে ভাল হয় না। অবশ্য যে-কোন লেবুর চারার সঙ্গে যে-কোন লেবুর চোখ জুড়েই চোখ-কলম করা যায়, কিন্তু দেখতে হবে যে, ব্যবসায়ের দিক থেকে সেই গাছ লাভজনক হবে কিনা। কাজেই যে লেবুর বীজ থেকে চারা করা হবে এবং যে লেবুর গাছ থেকে চোখ নেওয়া হবে তার দুটোই যেন এমন জাতের হয় যার গাছ দীর্ঘকাল বাঁচে এবং বেশি ফলন দেয়।

পৃথিবীর কমলালেবু জন্মানোর জন্য বিখ্যাত দেশগুলিতে অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, সব রকমের লেবুর চারা সব জায়গার জলবায়ু এবং মাটি সহিতে পারে না, সব রকমের লেবুগাছের চোখের সঙ্গে জোড় খেতেও পছন্দ করে না। কাজেই চারা এবং চোখ—দুটোরই জাত আর ধরনের মধ্যে মাটি, জলবায়ু প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়ে যেন অন্তত মোটামুটি একটা মিল থাকে; তা নইলে কলম ভাল হবে না।

ভারতে শরবতিলেবু আর কমলালেবুর চোখ-কলম করার জন্য চারা তোলার উদ্দেশ্যে সাধারণত

জাম্বুরি এবং 'খান্না' বা 'খান্না খাটা' লেবুর বীজ ব্যবহার করা হয়। বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য, হায়দরাবাদ এবং মধ্যপ্রদেশে 'মোসাম্বি' আর নাগপুরী লেবুর কলম করার জন্য সকলেই 'জাম্বুরি'র চারা তৈরি করে। তেমনি পাজাবে এবং উত্তরপ্রদেশে সাধারণ 'মালটা' আর কমলালেবুর কলমের জন্য চারা করতে ব্যবহার করা হয় 'খান্না খাটা'র বীজ।

পশ্চিম, উত্তর এবং মধ্য ভারতে কলম বাসিয়েই কমলালেবুর আর শরবতিলেবুর গাছ করা হয়, কিন্তু দক্ষিণ আর পূর্ব ভারতের গাছ জন্মানো হয় বীজ থেকে। তার ফলে বাগানে একই জাতের কমলালেবুর এক গাছের ফলের সঙ্গে অপর গাছের ফলের পার্থক্য দেখা যায় গুণ, স্বাদ, আকার, আয়তন প্রভৃতি সব দিক দিয়েই।

মাত্র ১৯৩৫ সাল থেকে দক্ষিণ ভারতে উন্নত প্রণালী হিসাবে চোখ-কলম লাগিয়ে গাছ জন্মানোর প্রচলন হয়েছে। অসামেও বীজ থেকে কমলালেবুর গাছ করার রীতি। মাত্র ১৯৪২ সালে তথাকার বার্নিহাটে চোখ-কলম করার পরীক্ষা চালু হয়। তাতে দেখা গেছে যে, 'সো মিন্ডু' লেবুর চারার সঙ্গে 'খাসী' কমলালেবুর চোখ ভাল জোড় খায়। দার্জিলিংয়ের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা কমলালেবুর গাছ জন্মানোর জন্য বীজের উপরই নির্ভরশীল এবং কোন রকম নতুন পদ্ধতি সম্বন্ধে তারা উদাসীন এবং সন্দিহান। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার সেখানে কলম লাগিয়ে গাছ তোলা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন।

কোন কমলালেবুর বা শরবতিলেবুর চোখ-কলম করার পক্ষে কোন লেবুর চারা সবচেয়ে ভাল, তা স্থির করা অত্যন্ত কঠিন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সরকারী বাগানে কয়েক রকম লেবুর চারা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এসব পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল

যখন নির্ধারিত হবে তখন, আশা করা যায়, কমলা-লেবু-চাষীদের অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কমলালেবুর চাষীরা যদি বিভিন্ন জাতের কমলালেবুর চোখ-কলম বাঁধার জন্য চারাগাছ তোলার সঠিক উপযোগী জাতের লেবু নির্ধারণে নিজেদের অভিজ্ঞতা নিয়োগ করেন, তা হ'লে এক্ষেত্রে হয়তো আমরা অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারব।

বীজতলায় চারা তোলা

চারা তোলার জন্য বীজ নিতে হবে পূর্ণপদুষ্ট, নীরোগ, গাছপাকা ফল থেকে। সযত্নে তার বীজ বের করে কাঠের ছাইএর মধ্যে রেখে দিতে হবে। সেই বীজ তাড়াতাড়ি বপন করতে হবে, কেননা, ফল থেকে বের করার দু' সপ্তাহ পরেই বীজের অঙ্কুরোদগম-ক্ষমতা কমে যেতে থাকে। কাজেই বীজ বপনের সময়টা নির্ভর করছে গাছপাকা ফল পাওয়ার সময়ের উপর। পাজ্রাবে আর উত্তর-প্রদেশে 'খান' লেবুর বীজ বোনার সময় সেপ্টেম্বরে অথবা ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে। মধ্যপ্রদেশে, দাক্ষিণাত্যে এবং দক্ষিণ ভারতে 'জাম্বুদারি' লেবুর বীজ বপন করা হয় মে-জুন অথবা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে। এসব সময়েই এসব লেবু গাছপাকা অবস্থায় পাওয়া যায়।

বীজতলায় তিন ইঞ্চি অন্তর সারিতে এক ইঞ্চি অন্তর একটি করে বীজ বসাতে হয়। বীজতলায় জল নিকাশ হওয়ার ভাল ব্যবস্থা থাকা চাই। বীজ-তলায় যথেষ্ট পরিমাণ পাতাপচা সারা অথবা গোবরসার ফেলে, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে, মাটি বেশ করে গুঁড়িয়ে নিতে হবে। বীজ বসাবার পরে তিন সপ্তাহের মধ্যে অঙ্কুর বেরোয়। চারা ষতদিন পর্যন্ত না তিন ইঞ্চি আন্দাজ উঁচু হচ্ছে ততদিন হালকাভাবে মাটির উপর-উপর জল ছড়াতে হবে। তারপর শূন্যে আবহাওয়ায় বীজতলা ভাসিয়ে জল দিতে হবে। এক বছর পরে, যে চারাগুলি এক ফুট আন্দাজ উঁচু হয়েছে, সেগুলোকে তুলে নিয়ে চারা-বাগানে নিয়মিত সারিতে রোপণ করতে হবে।

চারা রোপণ

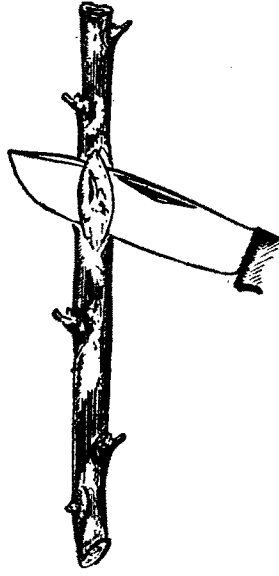
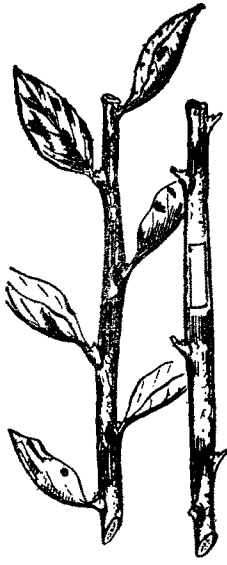
চারাবাগানে এর জন্য প্রায় দশ ফুট লম্বা আর তিন ফুট চওড়া জমি তৈরি করাই ভাল। ভাল করে সার দিয়ে এর মাটি তৈরি করে সমান করে নিতে হবে। তাতে দুই থেকে তিন ফুট অন্তর সারি করতে হবে। একটা মেঘলা দিনে, আবহাওয়া যখন আর্দ্র থাকবে, বীজতলা থেকে চারাগুলি তুলে এনে এক ফুট দূরে দূরে রোপণ করতে হবে। জমিটা আগাছা-মুক্ত রাখতে হবে এবং গরমের সময়ে কয়েক দিন পরে পরে নিয়মিত জল দিতে হবে।

শাখ ছেঁটে দেওয়া

চারা যদি বেশ লম্বা হয়ে ওঠে তা হ'লে তার মাথা ঝোপড়া হ'তে দেওয়া চলে। কিন্তু চারার গোড়ার দিকে যদি শাখ বেরোয়, তা ছেঁটে দিতে হবে। এইভাবে জমি থেকে প্রায় নয় ইঞ্চি উঁচু পর্যন্ত চারার কাণ্ডটি মসৃণ আর সরল রাখতে হবে। শাখ সাবধানে ধারালো ছুরি বা কাঁচ দিয়ে ছাঁটা দরকার—যেন কাণ্ডের গায়ে কোন আঘাত না লাগে। হাতে টেনে শাখ ছিঁড়ে ফেললে তার সঙ্গে গাছের ছালের একটা ফালিও ছিঁড়ে বোরিয়ে আসতে পারে। চারার কাণ্ডের গোড়ার দিকের অংশটাতেই 'চোখ' জুড়তে হয়; কাজেই এই অংশটা যাতে জখমী বা দাগী কি খুঁতো না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

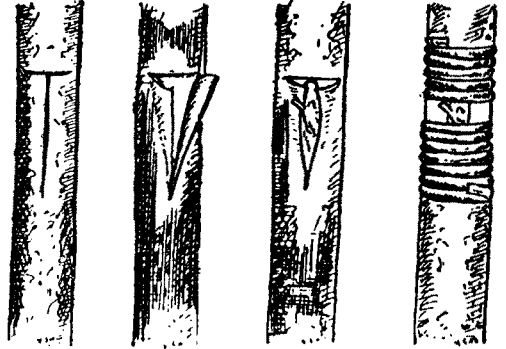
কলম বাঁধার সময়

চারাবাগানে বছরখানেক থাকার পরে চারার কাণ্ড যখন প্রায় আধ ইঞ্চি পুরু হয়, সেই সময় তার সঙ্গে নির্বাচিত গাছের 'চোখ' জুড়ে বাঁধতে হয়। চারার যখন নতুন বাড়ি চলছে এবং আবহাওয়া যখন স্নিগ্ধ ও শুষ্ক, সেই সময়ে কলম বাঁধলে সবচেয়ে ভাল হয়। গুজরাট, দাক্ষিণাত্য এবং মধ্যপ্রদেশে অক্টোবর নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে কলম বাঁধলে সবচেয়ে ভাল হয়। উত্তর প্রদেশে আর পাজ্রাবে কলম বাঁধার সবচেয়ে ভাল সময় হচ্ছে ফেব্রুয়ারি-মার্চ এবং আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস।



‘চোখ-ছাল’ তোলা

কলম বঁধা



দূরে চালান দিতে হ'লে কলমের
ডগা এভাবে ছিঁড়ে দিতে হয়

কলম বাঁধার সময়ে খুব বৃষ্টি হওয়া ভাল নয়, কেননা তাতে জোড়ের জায়গায় জল ঢুকবে 'চোখ'টাকে পচিয়ে ফেলতে পারে। দক্ষিণ ভারতের যেসব অঞ্চলে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব দুই মৌসুমী বায়ু থেকেই বৃষ্টি হয়, সেসব জায়গায় আবহাওয়া পরিষ্কার থাকে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এবং সেই সময়েই কলম বাঁধা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে চোখ-কলম বাঁধার সময় হচ্ছে শরৎ এবং বসন্ত কালের প্রথম ভাগ। এ সময়ে গাছের ছাল নিচের কাঠ থেকে অনায়াসে ছাড়িয়ে নেওয়া যায়। বাগানের কাজে যারা অভিজ্ঞ তাঁরা চারার ছালে নখ বসিয়েই এ অবস্থাটা বদ্বতে পারেন। ছাল যদি সহজে ছেড়ে না আসে—কাঠের সঙ্গে এঁটে থাকতে চায়, তবে কলম-বাঁধা চলবে না। তখন আরও সার দিয়ে, সেচ দিয়ে, পরিচর্যা করে গাছগুলোকে আরও সজীব করে তুলতে হবে।

চোখ

চারাগুল্লির অবস্থা যদি উপযোগী হয়, তবে কলম বাঁধা চলতে পারে। 'চোখ' নেওয়ার জন্য যে গাছ নির্বাচন করা হয়েছে অর্থাৎ যে-গাছের বংশবিস্তার করা হবে, তা থেকে বাছাই করে সজীব, ছোট একটি শাখা কেটে আনতে হবে যাতে অনেক নতুন পাতার কুঁড়ি সবে জেগে উঠেছে। এটাকে বলা যায় কুঁড়ি-শাখা।

ডাল থেকে চলতি বছরে যেসব শাখা বেরিয়েছে, তার একটি অর্ধ-পুষ্ট শাখা নির্বাচন করতে হবে—ডালের গোড়ার দিকে। শাখাটি হবে পেন্সিলের মত গোল আর তার রঙ থাকবে সবুজ; তাতে সুপুষ্ট পাতাগুল্লির বোটার সন্ধিস্থলে কুঁড়ি জেগে উঠেছে। গাছ থেকে শাখাটি কেটে এনে, তার পাতাগুল্লি এমনভাবে ছোট্ট ফেলতে হবে যেন পাতার আধখানা বোটা শাখার গায়ে লেগে থাকে। এই শাখা ছয় থেকে নয় ইঞ্চির বেশি লম্বা না হওয়াই ভাল। বেশি কলম বাঁধতে হ'লে, বলা

বাহুলা, এরকম কয়েকটি শাখা নিতে হবে। শাখা-গুলি একসঙ্গে আঁট বেঁধে তার গোড়ার দিকটা জলার ধারের ভিজে মাটিতে ঠেসে রাখতে হবে। ভিজে করাত-গুঁড়ো অথবা পাতা-পচা কাদার মধ্যেও রাখা যেতে পারে। এভাবে রাখলে শাখাগুলি সপ্তাহ-দুই তাজা থাকে। ভিজে করাত-গুঁড়ো বা পাতা-পচা কাদার মধ্যে গোড়া ঠেসে এসব শাখা ডাকে বা রেলের ভারতের যে-কোন জায়গায় পাঠানো চলে।

কলম বাঁধা

চারার কান্ডে মাটি হ'তে ছয় থেকে নয় ইঞ্চি উঁচুতে চোখ বসাবার জায়গা করতে হয়। চারার ছাল সেখানটাতে দু'রকমে কেটে চোখ বসানো যায়ঃ (১) ছুরির ডগা আড়াআড়ি টেনে একটু কেটে, ছালটা নিচের দিকে টেনে একটু ছাড়িয়ে, সেই ফাঁকের মধ্যে চোখটি বসিয়ে দিতে হয়, আর (২) আড়াআড়ি একটি এবং তার মাঝখান থেকে নিচের দিকে লম্বালম্বি একটি দাগ দিয়ে ইংরেজী 'টি' (T) অক্ষরের মত করে কেটে, তার মধ্যে চোখ বসাতে হয়।

প্রথমে চারার গা কেটে নিতে হয়, তার পরে কুঁড়ি-শাখা থেকে 'চোখ' তুলে নিতে হয়। চারার গায়ে ছুরির টান যেন গভীর হয়ে না লাগে। উদ্দেশ্য হ'ল শুধু ছালটা কাটা। তার নিচে কাঠে যেন ছুরির ঘা না লাগে সে-বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে।

এর পরে কুঁড়ি-শাখাটি হাতে নিতে হবে। কলমের কাজে কলম-কাটা ছুরি ব্যবহার করা উচিত। কুঁড়ি-শাখা থেকে খানিকটা ছাল সমেত কুঁড়িটি বা 'চোখ'টি কেটে তুলতে হবে। দু'ভাবে এটা কাটা যায়। 'চোখ'এর আধ ইঞ্চি উপরে এবং আধ ইঞ্চি নিচে আড়াআড়ি দু'টো দাগ কাটতে হবে, তারপর উপরের কাটার দুই প্রান্ত থেকে নিচের কাটার দুই প্রান্ত পর্যন্ত লম্বালম্বি কেটে নামাতে হবে। শুধু ছালটাই যেন কেটে যায়—কাঠ নয়। এভাবে কুঁড়িটি মাঝখানে রেখে যে চোকো ছাল কাটা

হয়ে গেল, তার ডান ধারের উপর-তোণটার নিচে আস্তে আস্তে ছুরির ডগার পেছনটা ঢুকিয়ে দিয়ে একটু চাড় দিলেই সেটা উঠে আসবে শাখা থেকে। এই যে পাতার বোঁটার কোলে কুঁড়ি সমেত চোকো ছালের টুকরোটি, একে বলা যায় 'চোখ-ছাল'।

অপর যে-উপায়ে 'চোখ-ছাল' তোলা যায়, সেটাও ভারতের বাগান-চাষীদের মধ্যে বহুল প্রচলিত। 'চোখ'এর আধ ইঞ্চিটাক উপরে শাখার গায়ে ছুরি বসিয়ে, আধ ইঞ্চিটাক নিচে পর্যন্ত কেটে বের করতে হয়—খানিকটা কাঠ সমেত; তার পরে ছুরির ডগা দিয়ে বা হাতের আঙুলের নখ দিয়ে সাবধানে কাঠটুকু ছাড়িয়ে ফেলতে হয়। এভাবে কাটলে 'চোখ-ছাল'টা চোকো না হয়ে লম্বাটে গোল হয়।

'চোখ-ছাল'কে খোলা বাতাসে রাখা উচিত নয়; তাতে ওর মধ্যকার নিরাময়ক তন্তু শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। পেশাদার কলমকার শাখা থেকে 'চোখ-ছাল' তুলে, চারার গায়ের ছাল কাটতে যতক্ষণ লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত, নিজের জিভের ডগায় রেখে দেয়; তাতে 'চোখ-ছাল' বেশ ভিজ়ে থাকে। চারার গায়ের ছাল কেটে অবিলম্বে 'চোখ-ছাল'টা তার ফাঁকের মধ্যে চেপে বসিয়ে দেওয়া হয়। চারার ছালের কাটার ফাঁক দিয়ে কুঁড়িটা বাইরে জেগে থাকে। এরপর ওটাকে বাঁধতে হয়।

কলাপাতার মাঝভাঁটার ছাল দিয়ে সাধারণত কলম বাঁধা হয়। ডাঁটা সমেত শুকনো কলাপাতা কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে নরম হ'লে তার ডাঁটার ছাল তুলে নিতে হয়। চারার কাটার কিছুটা নিচে থেকে এই ফিতে দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে জড়িয়ে বেঁধে বেঁধে বাঁধন উপর দিকে তুলতে হয়; কুঁড়ির নিচে পর্যন্ত এসে, কুঁড়িটাকে ছেড়ে পেছন দিয়ে বাঁধনটা তার উপরে তুলতে হয় এবং শক্ত করে জড়িয়ে তুলে তুলে বাঁধন শেষ করতে হয়।

'চোখ' জোড় খাওয়া

কলম বাঁধা হয়ে যাবার পরে লক্ষ্য রাখতে হবে 'চোখ'এর সঙ্গে যে পাতার বোঁটার গোড়াটা রয়েছে,

তার দিকে। তিন সপ্তাহ পর্যন্ত যদি কুঁড়িটা সবুজ থাকে আর ইতিমধ্যে পাতার বোঁটার গোড়াটা ঝ'রে প'ড়ে যায় তা হ'লে বদ্বতে হবে যে, 'চোখ' বেঁচে গেছে এবং চারার সঙ্গে জোড় খেয়েছে।

চতুর্থ সপ্তাহে কুঁড়িটি বড় হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যে পাতা ছড়াবার লক্ষণ দেখা যায়। এ সময়ে চারার বাড বন্ধ করে দিতে হয়—যাতে শুধু 'চোখ'টিই বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়। এর জন্য, কুঁড়ির ছব থেকে আট ইঞ্চি উপরে চারার মাথাটা কেটে ফেলে দিতে হয়। কুঁড়িটা যখন পাতা ছাড়িয়ে ইঞ্চি তিনেক বেড়ে ওঠে, তখন কুঁড়ির উপরে এক থেকে বড় জোর দু'ইঞ্চি রেখে, চারার মাথার বাকি অংশটাও কেটে ফেলতে হয়।

'চোখ' বেড়ে যে ডাল হচ্ছে, ইতিমধ্যে সেই 'চোখ-ডাল'এর নিচে চারটির গা ফুঁড়ে অনেক কুঁড়িশাখ গজাবে। গজাবার সঙ্গে সঙ্গে এগুলোকে হাতে ঘষে মেরে ফেলতে হয়ে, তা না হ'লে তারা কিন্তু বেড়ে উঠে 'চোখ-ডাল'টাকে মেরে ফেলবে।

কলমের পরিচর্যা

চারার সঙ্গে 'চোখ' জুড়ে এই যে নতুন গাছ তৈরি হ'ল, একে বলা হয় 'চোখ-কলম'। কিছুদিনের মধ্যেই এ থেকে কাঁচ কাঁচ ডালপালা বেরিয়ে, নতুন নতুন পাতা মেলে বেড়ে উঠতে থাকবে। চারার—এখন বল যায় কলমের—গোড়ায় দরকার বুঝে মাঝে-মাঝে জল দিতে হবে আর গোড়ার মাটি মাঝে-মাঝে খুঁচিয়ে আলগা করে দিতে হবে। আগছা জন্মালে তুলে ফেলতে হবে। কলম বাঁধার পরে বছরখানেকের মধ্যে কলমের মাথা বেশ ঝাড়ালো হয়ে উঠবে আর গাঢ় সবুজ রঙের পাতায় ছেয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে মাটির উপরভাগ জুড়ে চারার গোড়া থেকে সরু সরু অজস্র শিকড় বেরোবে। কলম যখন দু' থেকে আড়াই ফুট উঁচু হয়ে উঠবে আর 'চোখ'এর জোড়ের মদুখটা আধ ইঞ্চি পুরু হয়ে উঠবে, তখনই কলম তুলে দিয়ে বাগানে স্থায়ী জায়গায় রোপণ করার উপযুক্ত হবে।

কলম তুলে নেওয়া

মাটি থেকে কলম তুলে নেওয়ার সময় স্বভাবতই তার কিছু শিকড় ছিঁড়ে যায়; বাকি যেগুলো থাকে তাদের পক্ষে গাছটি যে তেজে বেড়ে উঠছিল তা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। রস কমে যাওয়ার ফলে পাতাগুলি একটু নীতিয়ে পড়ে—বিশেষ করে উগার কর্চপাতাগুলি ঝরে পড়ে যতে চায় এতে কলমের ক্ষতি হয়।

কলমের সজীবতা যথাসম্ভব বজায় রাখবার জন্য প্রথমত মাটি থেকে কলম তুলে নেওয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বেশি শিকড় নষ্ট না হয়। আর, কলম তুলে নেওয়ার আগে তার শাখাগুলির উগার খুব কর্চ পাতার অংশটা ছেঁটে ফেলা ভাল।

বর্ষাকালে কলম লাগাতে হ'লে, যখন ভালভাবে বৃষ্টি হচ্ছে আর আবহাওয়া বেশ আর্দ্র সেই সময়ে কলম তুলে নিতে হবে। উত্তর ভারতের শুষ্ক অঞ্চলে, বর্ষাকালে না লাগিয়ে, বসন্তকালের ঠিক আগে কলম লাগানো হয়। গোড়ার চারদিককার বেশ খানিকটা মাটি সমেত কলম তুলে নেওয়া হয়। এতে কলমের গোড়ার প্রায় সব শিকড়ই সুরক্ষিত থাকে। এরকম কলম যদি রেলের দূরে কোথাও পাঠাতে হয়, তবে ওই মাটি সমেত গোড়াটা চটে

জড়িয়ে বাঁধা হয় এবং সেই বাঁধা অবস্থায় গোড়ার মাটি জলে একটু ভিজিয়ে, বাঁশের ঝুড়িতে বা কাঠের বাস্কে একসঙ্গে চারটে-ছ'টা কলম প্যাক করা হয়।

দাক্ষিণাত্যের বোম্বাই অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত মৃদু জলবায়ুতে গোড়ার প্রচুর মাটি সমেত কলম তোলার দরকার হয় না। গোড়ার খানিকটা ভিজ়ে মাটি লেগে থাকা অবস্থায় স্বচ্ছন্দে কলম তুলে নেওয়া হয়। শিকড়গুলি চারদিকে খোল অবস্থায় থাকে। এরকম ৫০ থেকে ১০০টা পর্যন্ত কলমের গোড়া একসঙ্গে চটে দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে রেল চালান দেওয়া হয়। চটে দিয়ে জড়াবার আগে, একসঙ্গে আঁটি-বাঁধা কলমগুলোর শিকড় হালকা ঝুরো মাটি দিয়ে আলগাভাবে ঢেকে দেওয়া হয়। চালান দেওয়ার ঠিক আগে, চটে জড়ানো মাটি ঢাকা অংশটা জলে একটু ভিজিয়ে দেওয়া হয়।

গন্তব্য স্থানে পৌঁছোবার পরে সেই বাঁধা অবস্থায়ই কলমগুলোতে প্রচুর জল দেওয়া দরকার; তারপর যতক্ষণ না সেগুলো বাগানে রোপণ করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ছায়াঢাকা একটা ভিজ়ে জায়গায় রেখে দেওয়া প্রয়োজন।

[ক্রমশ]



সুসম খাবার খেয়ে



খরচ বাঁচান

আজকালকার এই দুর্শ্বলোর বাজারে খরচপত্র বাঁচিয়ে প্রত্যেকদিন সুসম খাবার দাবার খাওয়া আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে ব্যাপারটি একেবারে অসম্ভব নয়। খাবারের মধ্যে স্নেহপদার্থ একটি অত্যাবশ্যক উপাদান। কিন্তু আমাদের দেশে পূর্ণবয়স্কেরা এবং বাড়ন্ত ছেলেমেয়েরা তাঁদের ন্যূনতম প্রয়োজন অর্থাৎ দু'আউন্স স্নেহপদার্থ প্রতিদিন পান না। তার প্রথম কারণ, আমাদের দেশে চাহিদা অনুযায়ী দুধের সরবরাহ অত্যন্ত কম। দুধ আর দুধ থেকে তৈরী অন্যান্য খাবারই স্নেহপদার্থের প্রধান উৎস। দ্বিতীয়ত, মাখন, ঘি ইত্যাদি পাওয়া গেলেও তা সাধারণ লোকের কেনার ক্ষমতার বাইরে। এবারে ধরুন খরচপত্রের কথা। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জায়গাতেই জিনিষপত্র দুর্শ্বল্য হয়ে উঠেছে। সে সব জায়গায় সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকেরা কি

করছে? তারা রান্নাবান্নায় ব্যবহার করছে পুষ্টিকর উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ যেমন, মার্গারিন, শর্টনিং বা ডালডা মার্কা বনস্পতি। এর ফলে তারা যে খাবারদাবার খাচ্ছে তা শুধু পুষ্টিকরই নয়, অত্যন্ত সুস্বাদুও বটে তাছাড়া, এইসব উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ দামেও ঘিয়ের তুলনায় সস্তা। ডালডা বনস্পতি খাঁটি উদ্ভিজ্জ তেল থেকে তৈরী হয়। ডালডার প্রতি আউন্সে ৭০০ অম্লজাতিক ইউনিট অর্থাৎ ডাল ঘিয়ের সমপরিমাণ ভিটামিন 'এ' যোগ করা হয়। তাছাড়াও ডালডার প্রতি আউন্সে ৫৬ ইউনিট ভিটামিন 'ডি' যোগ করা হয়। ডালডা সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরী হয় এবং সবসময় শীল করা ডবল ঢাকনা-ওলা টিনে পাওয়া যায়। এই সব কারনেই প্রত্যেকদিন আরও অধিকসংখ্যক গৃহিনীরা নিশ্চিত মনে ডালডা ব্যবহার করছেন — তাঁরা জানেন, খাবারে অতিরিক্ত পুষ্টির পক্ষে ডালডা অপরিহার্য।



গম উৎপাদনে কায়কটি প্রয়োজনীয় কথা

সেখ মফিজউদ্দিন আহমদ
বি এস-সি (কৃষি)

গমের জন্য সমতল জমি নির্বাচন করতে হবে। জমি বেশ উর্বর হবে এবং তাতে জলনিকাশের সুব্যবস্থা থাকবে। জলসেচনের ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়। গমের জন্য মধ্যম দোআঁশ মাটিই ভাল। জমিতে সার দেবার ব্যবস্থা না থাকলে এমন জমি নির্বাচন করা উচিত নয় যাতে গত বৎসর ভুট্টা, জোয়ার বা অতিরিক্ত-সার-গ্রহণকারী ফসল ছিল।

জমি তৈরি করা

গমের জমি বেশ যত্ন সহকারে তৈরি করা উচিত। জমি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন তার মধ্যে কোন আগাছা না থাকে। মাটি বেশ ধুলোধুলো করে ফেলতে হবে। তাতে যেন যথেষ্ট পরিমাণে রস থাকে।

জমিতে অন্ততপক্ষে একবার লোহার লাঙল (সয়েল টার্নিং প্লাউ) ও আট দশ বার দেশী লাঙল দেওয়া উচিত। প্রত্যেক বার লাঙল দেবার পরেই মই দিতে হবে। এভাবে হাল দেবার পরে মই দিলে জমি বেশ ধুলোধুলো হবে—যা গমের জন্য খুব প্রয়োজন।

যথেষ্ট পরিমাণ রস

বীজ বপন করার আগে জমিতে যদি প্রচুর পরিমাণে রস না থাকে তবে একটা হালকা সেচ দিতে হবে। তা না হলে বীজ থেকে ভালভাবে অঙ্কুর গজাবে না, ফলে ফসলও ভাল হবে না।

বীজ নির্বাচন

উন্নত জাতের বীজ নির্বাচন করতে হবে। এর জন্য স্থানীয় কৃষি-বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন এবং

আপনার এলাকার উপযোগী বীজ সরকারী কৃষি-বিভাগের স্থানীয় কেন্দ্র থেকে নিন। এটা পরীক্ষিত যে, কেবলমাত্র উন্নত জাতের বীজ ব্যবহারে উৎপাদন শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ বেশি পাওয়া যায়।

একরপিছ জমিতে সার

গমের চাষে একরপিছ জমিতে ৫০ পাউন্ড নাইট্রোজেন দেওয়া উচিত। অর্ধেক জৈব এবং অর্ধেক অজৈব বা রাসায়নিক সাররূপে দেওয়া ভাল। জৈব সার হিসাবে পচা গোবর, পচা সার বা খইল ব্যবহার করা উচিত, আর রাসায়নিক সার হিসাবে অ্যামোনিয়ম সালফেট, অ্যামোনিয়ম ফসফেট বা ইউরিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে। (অ্যামোনিয়ম সালফেটে শতকরা ২১.৬ ভাগ, অ্যামো-ফসফেটে শতকরা ১২-১৬ ভাগ এবং ইউরিয়াতে শতকরা ৪৪ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে।)

এ ছাড়া একরপিছ ৪০ পাউন্ড ফসফেট দেওয়া ভাল। গমের ক্ষেতে ফসফেট দিলে রোগের আক্রমণ কম হয়, ফলে উৎপাদন বেশি হয়। এর জন্য হাড়ের গুঁড়ো ও সুপারফসফেট ব্যবহার করা যেতে পারে। (হাড়ের গুঁড়োতে প্রায় শতকরা ২০ ভাগ ফসফেট এবং শতকরা ৪ ভাগ নাইট্রোজেন বর্তমান; সুপারফসফেটে (সিংগল) শতকরা ১৬ ভাগ ফসফেট থাকে।)

বেশি সার ব্যবহার করলে কেবলমাত্র অর্থেরই অপব্যয় হয় না, উৎপাদনও কমে যায়। কারণ নাইট্রোজেনী সার ব্যবহার করলে গাছ বেশি বাড়ে এবং ঢলে পড়ে। আর গম পাকতে সময় বেশি লাগে।

বীজ বপন করার আগে জৈব সার জমিতে দিতে হয়—যা হাল দেবার সময় মাটিতে বেশ ভালভাবে মিশে যায়। কাঁচা গোবর কখনও ব্যবহার করা উচিত নয়। কাঁচা গোবর ব্যবহার করলে জমি গরম হয়ে ওঠে এবং উইপোকা লাগার সম্ভাবনা থাকে। যে জমিতে শন বা ধণের সবুজসার দেওয়া হয়েছে তাতে আর সার দেবার প্রয়োজন হয় না।

যথা-পরিমাণ বীজ

বেশি মাত্রায় বীজ ব্যবহার করা ভাল নয়। সাধারণত এক একর জমির জন্য এক মণ বীজের প্রয়োজন হয়। বীজের হার বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যথা—বপনের সময়, বীজের অঙ্কুরিত হবার শক্তি, মাটির আদ্রতা, বপনের প্রথা ইত্যাদি। জমিতে রসের পরিমাণ যত কম হবে, বীজের হার তত বাড়তে হবে।

বীজ বপন

বীজ সারিতে বোনা উচিত। ছিটিয়ে বোনা বীজে ফসল ভাল হয় না। ৯ ইঞ্চি—১২ ইঞ্চি অন্তর সারিতে যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বপন করলে ভাল হয়। বীজবোনা যন্ত্রের অভাবে দেশী লাঙলের সাহায্যেও বীজ বোনা চলে। এভাবে বীজ বুনলে সকল গাছ সমানভাবে ওঠে এবং বীজও অনেক কম লাগে। সারিতে বীজ বপন করলে বিদে ও নিড়েন দেবার সুবিধা হয়।

সময়মত বীজ বপন

সময়মত বীজ বপন করতে না পারলে গমের উৎপাদন অনেক কমে যায়। আমাদের বাঙলাদেশে অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে নবেম্বর মাস পর্যন্ত বীজ বপন করা যেতে পারে। তবে, ২৫এ অক্টোবর থেকে ১০ই নবেম্বর পর্যন্ত বীজ বপনের উৎকৃষ্ট সময়। নবেম্বর মাসের পরে বীজ বপন করলে গমের উৎপাদন বিশেষরূপে কমে যায়। এ ছাড়া 'মরচে' রোগের আক্রমণ বেড়ে যায়।

জলসেচ

এটা নিশ্চিত যে, যে-ক্ষেতে জল দেওয়া হয় না, তার চেয়ে যে-ক্ষেতে সেচ দেওয়া হয়, তাতে উৎপাদন বেশি হবেই। ৪০ দিনের আগে গমের ক্ষেতে জল-সেচ করা ভাল নয়। গাছ যখন চার থেকে ছয় ইঞ্চি উঁচু হয়, তখন ২ ইঞ্চি সেচ দেওয়া উচিত। আবার যখন গাছ থেকে শীষ বের হ'তে আরম্ভ করে, তখন আর একবার ২ই ইঞ্চি সেচ দিলে ফসল ভাল হয়। যদি শীতকালে মোটেই বৃষ্টি না হয় তবে বেশি জলসেচের দরকার হতে পারে।

নিড়েন দেওয়া

ঠিক সময়ে জমিতে নিড়েন দেওয়া দরকার। গমের গাছগুলি ছোট থাকতে জমি থেকে সমস্ত আগাছা তুলে ফেলতে হবে। এটা প্রথম সেচ দেওয়ার পরেই করা উচিত। গাছগুলি বড় হ'লে আগাছাগুলি আর কিছদ করতে পারবে না। ছোট অবস্থায় গমের ক্ষেতে বিদে দেওয়া যেতে পারে। দেখা গেছে, বিদে দেওয়া জমিতে কম আগাছা জন্মায়।

ভাল বীজে উৎপাদন বাড়ু

উন্নত জাতের পুষ্ট নীরোগ বীজ ব্যবহার করলে উৎপাদন অনেক বেশি হয়। উন্নত জাতের ভাল বীজ কিনে একবার গম জন্মালে, তা থেকে আপনি পর বছরের জন্য বীজ রাখতে পারবেন। ভাল বীজের দামও ভাল পাওয়া যায়।

রোগ ও পোকাকার উৎপাত

ফসলকে রোগ এবং পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারলে আমরা বেশি উৎপাদন কখনও আশা করতে পারি না। "মরচে" রোগ হচ্ছে গমের প্রধান রোগ। এর হাত থেকে ফসল রক্ষা করার প্রধান উপায় হচ্ছে জলদি ও মরচে রোধকারী জাতের গম লাগানো। এর জন্য কৃষি-অধিকারের স্থানীয় শাখার পরামর্শ নেওয়াই ভাল।

সম্পূর্ণ পাকবার পর কাটতে হবে

গমের সমস্ত শীষ এবং গাছগুদুলি পেকে যাবার পর ফসল কাটতে হবে। শীষকে বাঁকা করলেই যদি ভেঙে যায় তবে বৃষ্টিতে হবে যে, কাটার সময় হয়েছে। গম সাধারণতই খুব জোরে কাটতে হয়; কারণ এ সময় গাছ ও শীষ শিশিরে ভিজে থাকে বলে শীষগুদুলি ভেঙে পড়ে যায় না।

যথাসম্মত মাড়াই করা

গম তাড়াতাড়ি মাড়াই করলে আগুন ও ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এ ছাড়া চুরি যাবারও ভয় থাকে না। কাটানো গম যদি বৃষ্টির জলে ভিজে যায়, তবে তার গুণ খারাপ হয়ে

যায়। গমের কুটো বা ডাঁটাগুদুলি বেশ যত্ন করে রাখা উচিত। সংরক্ষণশালে রাখার সময় কুটার প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া এটা গো-মহিষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সম্পূর্ণ শুকোলে ঘরে তুলতে হবে

গম মাড়াই করার পরে দানাগুদুলিকে রোদে দেওয়া দরকার। ভালভাবে শুকোবার পর বস্তাবন্দী করে রাখা ভাল। বস্তাগুদুলিকে ভুবার মধ্যে রাখলে গম অনেকদিন পর্যন্ত খারাপ হয় না। গম ভিজে অবস্থায় রাখা একেবারেই ঠিক নয়। শুকনো গমে শতকরা ১০ ভাগের বেশি আর্দ্রতা থাকা উচিত নয়। প্রথমে রোদের দিনে বস্তাবন্দী করতে পারলে ভাল হয়।

আপনি পশ্চিমবঙ্গ প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত 'বসুন্ধরা' এবং যে-কোন পত্রিকার গ্রাহক হ'তে হ'লে, চাঁদার টাকা পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তার নামে 'রাইটাস' বিল্ডিংস, কলিকাতা-১' ঠিকানায় নগদ পাঠাতে বা জমা দিতে পারেন, অথবা ক্রস্‌ড্ পোস্টাল অর্ডারেও পাঠাতে পারেন। যে পত্রিকা বা যে যে পত্রিকার গ্রাহক হ'তে চান তার বা সেগুলোর নাম এবং নিজের নাম-ঠিকানা সুস্পষ্ট বড় অক্ষরে লিখে দেবেন। ক্রস্‌ড্ পোস্টাল অর্ডারের সঙ্গে অবশ্যই একটি পত্র দিতে হবে; যে-পত্রিকার গ্রাহক হ'তে চান তার নাম এবং নিজের নাম-ঠিকানা সেই পত্রে স্পষ্ট বড় বড় অক্ষরে অবশ্যই লিখে দেবেন।

সমবায়ের মূলনীতি ও

সমবায় আন্দোলনের

বিভিন্ন অধ্যায়

[পূর্বানুক্রম]

কৃষি সমবায় সমিতিগুলির পারস্পরিক সহযোগিতা

মাত্র ১৮৭০ সালের পরেই ক্রেতাদের সমবায় সমিতিগুলি গড়ে ওঠে; সীমাবদ্ধ দায়িত্বসহ ইংল্যান্ডের আদর্শেই এগুলি গঠিত হয়েছিল। ১৮৮৪ সাল থেকে কৃষি-সিন্ডিকেট সবারকমের কৃষি সমবায় সমিতি প্রবর্তিত করে এবং কৃষি সমবায় সংক্রান্ত ১৯৪৫ সালের পৃথক আইনগুলি দ্বারা এগুলি বিশেষভাবে লালিত হয়। বিভিন্ন কৃষিকার্য সংক্রান্ত সমবায় সংগঠনগুলি পল্লী-ব্যাংক, আঞ্চলিক ব্যাংক, জাতীয় কৃষিক্ষণ ব্যাংক এবং পারস্পরিক বীমা সমিতিগুলির মাধ্যমে কৃষি-ঋণ পাচ্ছে। সমগ্র আন্দোলনটিকে রাজনৈতিক বিসংবাদের বাইরে রাখা হয়েছিল। রাষ্ট্রের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক একে মদ্রাস্ফীতি ও আর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। এই দেশেই কৃষি-বীমা সর্বাধিক উন্নতি লাভ করেছে।

বাণিজ্য বিপর্যয়ে সমবায়ের সহায়তা

ডেনমার্ক: বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সমবায়ের মূল-নীতিগুলিকে সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগানো হয়েছে। যদিও ক্রিস্টিয়ানসেন এখানে ক্রেতাদের বিপণির রূপেই সমবায় আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, তবু বৈদেশিক বাজার হাতছাড়া হওয়ার দরুন ক্রমবর্ধমান আর্থনৈতিক মন্দার আবহাওয়ায় কৃষকেরা সমবায় আন্দোলনকেই বরণ করে নিয়েছিলেন। ১৮৮২ সালেই স্টিলার এন্ডারসন সমবায় ডেয়ারী স্থাপন করেন এবং শত শত সমবায় ডেয়ারী, কারখানা এবং ক্রেতাদের বিপণি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই স্থাপিত হয়।

শহরাঞ্চলের ক্রেতাদের বিপণি ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের ক্রেতাদের বিপণিগুলিও ড্যানিশ সমবায় আন্দোলনের সম্পদস্বরূপ। এদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ এবং কেবল সদস্যদের মধ্যেই এগুলি সক্রিয়। এফ বি ডি অর্থাৎ সামগ্রিক সমবায় সমিতিগুলি একটি শিক্ষণ-শিক্ষালয় স্থাপন করেছেন এবং ১৯৪৭ সাল থেকে একটি সমবায় রংগমণ্ড আন্দোলন শুরু করেছেন।

ড্যানিশ কৃষি-অর্থনীতিতে সমবায় ডেয়ারীগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সমিতির সদস্যদের দায়িত্ব ঋণ বলবৎ থাকার সময়ে সাধারণত ডেলিভারী দেওয়া দৃধের পরিমাণ অনুযায়ী সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। সমিতির সদস্যদের মালিকানাধীন প্রত্যেক গাভী-পিছু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের হার অনুযায়ী সদস্যরা কার্যকরী মূলধনের যোগান দেন। প্রধান দায়িত্ব সদস্যদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। মাখন বিপণনের উদ্দেশ্যে উৎপাদকদের সমিতিগুলি যুক্ত হয়েছে; মাখন রপ্তানী সমিতি বিপণনের ভার গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের সরবরাহের পরিমাণ অনুযায়ী উম্বর্তিটা তাঁরা ডেয়ারীগুলিতে ফেরত দেন। সম্প্রতি সমবায় ডেয়ারীগুলি বিভিন্ন জেলা-সমিতি এবং তিনটি প্রাদেশিক সমিতির মধ্যে সংঘবদ্ধ হয়েছে।

সামবায়িক বেকন কারখানাগুলির অগ্রগতি মন্ডর, তবে সন্নিহিত। ৭৫টি কারখানা একটি ইউনিয়নের অধীনে সংঘবদ্ধ হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে বেকন সংরক্ষণের জন্য আবশ্যকীয় ঠান্ডা-ঘরসমূহ স্থাপিত হয়েছে। ৯,০০৫টি স্থানীয়

শাখা-সমন্বিত সমবায় ডিম রপ্তানী সমিতি ডিম ব্যবসাতে যুগান্তর এনে দিয়েছে। অন্যান্য ধরনের সমিতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল স্বাস্থ্যাবাস সমিতি, ২৮৩টি সমবায় বিদ্যুৎ-সরবরাহ সমিতি, সমবায় লন্ড্রি, সমবায় প্রকাশনী সমিতি ইত্যাদি।

সংযুক্ত আন্দোলন

সুইডেন: সুইডেনে সমবায় সমিতির উল্লেখযোগ্য সাফল্য পৃথিবীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। কৃষি-সমবায় সমিতিগুলির এক্তিয়ারের মধ্যে সবরকমের আর্থনৈতিক কার্যকলাপও রয়েছে। সুতরাং প্রাথমিক থেকে জাতীয় পর্যায়ে সবরকমের সমিতিই বিশেষ বিশেষ ধরনের কাজে পারদর্শিতা অর্জন করেছে এবং এগুলির ওপরে সমন্বয়সাধক সংস্থা হিসাবে আছে ফেডারেশন অব সুইডিশ ফার্মার্স এসোসিয়েশন।

ক্রেতাদের সমবায় আন্দোলন বেশ সুসংগঠিত। “কে এফ” এই আদ্যক্ষরে সুপরিচিত পাইকারী সমবায় সমিতিটি বিস্তারিত উৎপাদনমূলক কার্যকলাপে রত আছে। এই সমিতি ময়দার কল, বৃহত্তম তেলকল, বৈদ্যুতিক বাল্বের কারখানা, কাগজের কল, পোর্সিলেন কারখানা প্রভৃতি পরিচালনা করে। “কে এফ”-এর আর্থিক সাহায্যেই “ভ্যানগার্ড” নামক সমবায় শিক্ষণ কলেজ শিক্ষাদান ও গবেষণার কাজ চালায়।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য পারস্পরিক গ্যারান্টির ভিত্তিতে হাতে ব্যাঙ্ক থেকে দান পাওয়া যায়, সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও সমবায়-সমিতি গঠন করেছেন। আর-একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল সমবায় সংগঠনের ৩০০টি দোকানের মধ্যে বেতার-বার্তা আদানপ্রদানের সুবিধা প্রদান।

ফিনল্যান্ড: ব্যাপক সমবায় আন্দোলনের ফলে সব চাষাই কোল-না-কোন সমবায় সমিতির সদস্য। সমগ্র ডেয়ারী শিল্পটিই সমবায় ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। ফিনল্যান্ডের ক্রেতাদের সমবায় সমিতি এবং

উৎপাদকদের সমবায় সমিতিগুলি তাদের মধ্যের ব্যবধান লোপ করে দিয়েছে। এগুলিকে এখন সাধারণ উদ্দেশ্যসাধক সমিতিরূপে অভিহিত করা চলে। এখানে সমগ্র সমবায় আন্দোলনই “ওয়াই ও এল” এবং “কে কে”—এই দু'টি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত।

সুইজারল্যান্ড: সমবায় এদেশের বিশেষত্ব। সমগ্র সমবায় আন্দোলনটিই আত্মনির্ভরশীল জনগণের গণতান্ত্রিক কীর্তি। সমবায় ডেয়ারী এবং ডিম-বিক্রয়কারী সমিতিগুলি ডেনমার্কের আদর্শানুসারী। ক্রেতাদের সমবায়-সমিতিগুলি রকডেল নীতিগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত। উৎপাদনকারীদের মধ্যে সমন্বয় এবং ক্রেতাদের সমবায় হ'ল এই দেশের আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: কৃষি ব্যবস্থায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে অতি-উৎপাদন ও তার পরিণামে মূল্যের স্বল্পতা। শুল্কের এবং ব্যাঙ্কারদের বা কৃষি-বন্ধকী ঋণের সুদের উচ্চহার এবং ফড়িয়াদের উচ্চহারে লাভ, চাষীদের অসুবিধা বাড়িয়ে তোলে। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বৈদেশিক চিন্তাধারার প্রভাব কৃষি সমবায় আন্দোলনের প্রবর্তন করে।

সমবায় বিপণন সমিতি

সমবায় বিপণন সমিতিগুলি সমন্বার্থসম্পন্ন উৎপাদনকারীদের—অর্থাৎ, যেসব উৎপাদনকারীর উৎপাদন ও বিপণন সম্পর্কীয় সমস্যা একই প্রকারের, তাঁদের নিয়ে গঠিত। সুতরাং, এখানে ডেয়ারী, পশুপক্ষী, তুলা ইত্যাদির জন্য পৃথক বিপণন সমিতিসমূহ গড়ে উঠেছে। দুধ এবং ডেয়ারী থেকে উৎপন্নব্যবহার বিপণনের ক্ষেত্রে সমবায় সর্বাপেক্ষা বেশি প্রচলিত হয়েছে। সমবায়ের প্রাথমিক ইউনিটগুলি চার প্রকারের। ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ফেডারেশন হচ্ছে সমবায় ডেয়ারীগুলির জাতীয় সংগঠন।

শস্য বিপণনের জন্য প্রাথমিক ইউনিট হচ্ছে স্থানীয় সমবায় এলিভেটর এবং চাষীরাই এগুন্টির সদস্য। স্থানীয় সংগঠনের প্রধান কাজ হচ্ছে পণ্য গুদামজাত করা এবং প্রান্তীয় সমিতির কাছে সেগুন্টি পাঠানো। প্রান্তীয় সমিতিগুন্টি আবার ন্যাশনাল ফেডারেশন অব গ্রেন কো-অপারেটিভস-এর অধীনে একবন্ধ রয়েছে।

তুলা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন চাষী-সদস্য তিনটি উপায় অবলম্বন করতে পারেন। (১) তিনি তাঁর উৎপন্ন দ্রব্যগুন্টিকে সমবায় সমিতির হাতে অর্পণ করে সঙ্গে সঙ্গে নগদ মূল্য পেতে পারেন, অথবা (২) সমিতিতে তাঁর গুদাম হিসাবে ব্যবহার করে নিজের ইচ্ছামত পণ্য বিক্রয় করতে পারেন, অথবা (৩) অন্যান্য উৎপাদনকারীদের তুলার সঙ্গে তাঁর উৎপন্ন তুলা একত্রিত করে একত্রিত মূল্য গ্রহণ করতে পারেন। স্থানীয় সমবায় সমিতিগুন্টি আমেরিকান কটন কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশনের অধীনে সংঘবদ্ধ রয়েছে।

আনুমানিক মাত্র ৩৫ বৎসর আগে সমবায় সমিতিগুন্টি হাঁস-মুরগি পালন ও বিপণনের কাজ হাতে নিয়েছিল। ফলমূল ও তরিতরকারি বিপণনকারী সমবায় সমিতিগুন্টিই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক। এই সমবায় সমিতিগুন্টি একই ধরনের পণ্য বা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত পণ্যের বিপণনের উপরই জোর দিয়ে থাকে।

ক্রেতাদের এই সমিতিগুন্টির মধ্যে অনেকগুন্টিই কো-অপারেটিভ লীগের সদস্য। এই লীগের কাজ হচ্ছে ক্রেতাদের সমবায় আন্দোলনের প্রসারসাধন। যন্ত্রের সাহায্যে চাষের সর্বাধিকার জন্য সমিতিগুন্টি প্রথমে গ্যাসোলিন-জাত দ্রব্য বন্টনের কাজে হাত দেয়। বর্তমানে দু' ধরনের সমিতি দেখা যায়; এক ধরনের সমিতি শস্যবীজ, সার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কৃষি-দ্রব্য সরবরাহ করে এবং অন্য ধরনের সমিতিগুন্টি সরবরাহ করে যন্ত্রচালনার তেল ও গ্যাসোলিন। স্থানীয় সমিতিগুন্টি আঞ্চলিক সমিতিতে যোগ দেয়।

শহরের সমবায় সমিতি: এইদিকে উন্নতি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে কয়েকটি প্রচেষ্টার ফলে ক্রেতাদের সমবায় আন্দোলনের জন্ম নেয়। “চেন” ধরনের খুচরা দোকানের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কয়েকটি সমিতি সাধারণ পণ্যদ্রব্যের ব্যবসা করে এবং কয়েকটি ব্যবসা করে নির্দিষ্ট ধরনের কয়েকটি পণ্যদ্রব্যের। “কমিশন কন্ট্রোল” প্রথা (যাকে বলা হয় আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ) অনুসারে খুচরা দোকান-গুন্টি যেসব জিনিস প্রত্যক্ষভাবে সরবরাহ করতে পারে না, সেগুন্টি সদস্যদের সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠাবান বেসরকারী খুচরা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। বেসরকারী ব্যবসায়ীরা কমিশন হিসাবে লাভের একটি শতকরা তংশ গ্রহণ করে। একটি সর্বোচ্চ আঞ্চলিক সংস্থা বিভিন্ন খুচরা সমবায় সমিতি-গুন্টির কাজের সমন্বয়সাধন করে।

১৯৩০ সালের মন্দার পরে ঋণদান সমিতিগুন্টি খুবই উন্নতি লাভ করে। সমগ্র আন্দোলনটি বেশ-কিছু পরিমাণে কেন্দ্রীভূত হ'লেও, এগুন্টি পরিচালনার জন্য এক ধরনের সমবায় আইন নেই এবং এগুন্টির হিসাবও নিয়মিত পরীক্ষা করা হয় না; সেজন্য এগুন্টি সমবায়ের নীতি অনুসরণ করে না বললেই চলে। শ্রী এস রাজাগোপালন উল্লেখ করেছেন যে, সমবায় সমিতিগুন্টি তাদের ব্যবসায়িক কাজের খুঁটিনাটিগুন্টি গোপনীয় বলে মনে করে এবং এগুন্টিকে সরকারী কর্মচারীদের কাছে তো বটেই, সদস্যদের কাছেও প্রকাশ করতে আপত্তি জানায়।

গ্রাম্য সমবায় সমিতি

কয়েকটি সমবায় সমিতি পল্লীঅঞ্চলের অধিবাসীদের সেচ, পরিবহণ, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, বাঁমা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সার্ভিস দেয়।

সরকারের দ্বারা সংগঠিত ফার্ম ক্রেডিট অ্যাড-মিনিস্ট্রেশন নামক প্রধান প্রতিষ্ঠানটি এখন কৃষকদের

ঋণদান সম্পর্কিত সমবায় সমিতিতে পরিণত হয়েছে। ক্রেতাদের সমিতিগতুলি কর্তৃক সংগঠিত পল্লীব্যাংকগুলি রাইফাইসেন ভিত্তিতে কাজ করে।

আয়ারল্যান্ড : বিখ্যাত সমবায়ী হোরেস গ্লাসকেট ১৮৯৯ সালে ইংলন্ডের আদর্শে একটি সমবায় সমিতি স্থাপন করেন, কিন্তু স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বিরোধিতার দরুন বিশেষ সন্নিবিধা করতে পারেন নি। তিনি তখন দেশে কৃষি-শ্রমিকদের জন্য উন্নততর চাষবাস, উন্নততর ব্যবসায় এবং উন্নততর জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা করার দিকে তাঁর প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেন। এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থসাহায্যপ্রাপ্ত শাখা ক্রিমারী সোসাইটি-গুলি ক্রিম উৎপাদন করে মাখন উৎপাদনের জন্য কেন্দ্রীয় সমিতিগুলির কাছে সরবরাহ করে। বিপণনের উদ্দেশ্যে সমিতিগুলিকে সংযুক্ত করার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। মাখনের ব্যবসাও ভাল-ভাবে চলে নি। তবে ক্রিমারী সোসাইটিগুলি সাধারণ উদ্দেশ্যসাধক সমিতিরূপে কাজ করে।

কৃষি-সমবায়গুলির মিলন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এগ্রিকালচারাল হোলসেল সোসাইটি লিমিটেড সমিতিগুলির মধ্যে বীজ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, ডেয়ারীর যন্ত্রপাতি, পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিতরণ করে।

ইতালি : জার্মানীর শুলৎস-ডেলিশ ব্যাংক-গুলির সাফল্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মন্ট্রী সিলর লুজান্ডি ১৮৬৬ সালে মিলানে প্রথম সমবায় ঋণ-ব্যাংক স্থাপন করেন। আন্দোলনের কাঠামোটি শুলৎস-ডেলিশ মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'লেও বিস্তারিত কর্মসূচিতে কিছু পার্থক্য আছে। ব্যাংকটি “কনসিলিও” নামে একটি পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত হয় ; এই পর্ষদ বেতনভোগী কর্মী নিয়োগ করে এবং “সিন্দাসী” নামক হিসাবপরীক্ষক কমিটি নিয়ন্ত্রণ করে। “শোলতো” নামক উপদেষ্টা পর্ষদটি ঋণদানের বিষয় বিবেচনা করে এবং “রিশি” নামক কমিটি ঋণের ব্যবহারের উপর লক্ষ্য রাখ

ও দ্রুত ঋণশোধের ব্যবস্থা করে। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের পর এদের কাজের পরিবর্তন হয় এবং এদের মধ্যে ব্যবসাদারী প্রবণতা দেখা দেয়। বর্তমানে তারা রোমের জনসাধারণের ব্যাংকগুলির জাতীয় সমিতির মধ্যে সংঘবদ্ধ হয়েছে।

১৮৮৩ সালে ডাঃ উলেনবেরী প্রধানত রাই-ফাইসেন মূলনীতির উপর ভিত্তি করে “কাসে রুরালী” নামক পল্লীঋণ সমিতি স্থাপন করেন। এই দু'টি ঋণদাতা সংগঠন অবশ্য একযোগে কাজ করত। ১৯৪৭ সালের নতুন সমবায় আইন পাসের পূর্বে কোন পৃথক সমবায় সমিতি ছিল না। সমিতিগুলি বর্তমানে শ্রম ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমবায়ের মহা-অধিকর্তার নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

সমবায় আন্দোলনে ইতালীর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অবদান হ'ল এর শ্রম-সমবায়গুলি। এই সমবায়গুলি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং এই পারিশ্রমিক এদের নিয়মানুযায়ী সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। এই স্বেচ্ছা-মূলক প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। পারিশ্রমিক ছাড়াও, কোন লাভ হ'লে তা নিম্নোক্ত উপায়ে বণ্টিত হয় : লাভের অর্ধেক দু'ঘণ্টা তহবিল, পেনসন তহবিল ও বিশেষ তহবিলে জমা হয় ; মুনাকার অবশিষ্ট অংশ সদস্যদের অর্জিত পারিশ্রমিকের অনুপাত অনুসারে বণ্টন করা হয়। এই সমিতিগুলি বহু ফেডারেশনের মধ্যে সংঘবদ্ধ হয়েছে।

নুলো বলদিভির অধীনে সমবায় কৃষিকার্যের স্বতঃস্ফূর্ত সংগঠনের ফলে জাতির আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় করার কাজে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়। ইতালীর কৃষিকার্যের উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছে “কন্সজিয়েনে উনিতা” (যৌথ-কৃষিকার্য), “কন্সজিয়েনে দিভিসা” (ছোট ছোট মালিকানাধীনে জমি বিভাগ এবং সমিতির দ্বারা সকলের প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পাদনা) এবং মিশ্র সমিতি,

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ১১শ সংখ্যা

এই তিন প্রকারের সমবায় সংগঠন। শিল্প সমবায় সমিতিগুলি পরিচালনা ও অর্থের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের সমবায় সমিতিগুলি থেকে আলাদা। ইতালীয়ান সমবায় আন্দোলনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল মৎস্যজীবীদের সমবায়, ক্রেতাদের সমবায়, “সেনসিভিভা (কৃষির যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী সমিতি) প্রভৃতি।

রাজনীতিক বাদবিসংবাদে ফলে সমবায় আন্দোলন একটি অখণ্ড আন্দোলনরূপে গড়ে উঠতে পারে নি। নতুন ইতালীয়ান সাধারণতন্ত্রের অধীনে এই আন্দোলনটি পুনর্গঠিত হচ্ছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন: জারের আমলে বহু-সংখ্যক ঋণদান সমিতি, কৃষি-সমবায় সমিতি, ক্রেতাদের সমবায় ভাণ্ডার, উৎপাদনকারীদের সমবায় সমিতি ছিল বটে, কিন্তু সেগুলি বিশেষ সাফল্য লাভ করে নি। বিপ্লবের পরে সরকারের প্রথম কাজ হ'ল শিল্পটিকে জাতীয়করণ এবং এর উৎপাদনক্ষমতাকে একটি জাতীয় কর্মসূচির অঙ্গীভূত করা। সমবায়গুলি সরবরাহের কেন্দ্রীভূত বণ্টন এবং উৎপাদনবোয় কেন্দ্রীভূত সঞ্চয় ও বিতরণের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হয়। সরকার সমস্ত বিষয়টির উপর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে নেন; তারা সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর উপর বধ্যতামূলক সদস্যপদ আরোপ করেন এবং খুচরা দোকানগুলির পুনর্বিবিন্যাসের আদেশ দেন। ১৯২২ সালে সরকার নতুন আর্থনৈতিক নীতি রূপায়িত করে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকৃত করায় সমবায় সমিতিগুলি তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ফিরে পায়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯২৮-৩২) আন্দোলনের কর্তব্যের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে। শিল্পের সম্প্রসারণ, বৃহদাকারে কৃষিকার্য এবং সমবায় ভিত্তিতে পণ্য-বণ্টন প্রবর্তনের ফলে আন্দোলনে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়। চাষীর মালিকানার পরিবর্তে যৌথ কৃষিব্যবস্থার

প্রবর্তন করা হয় এবং ফলে সমবায় ঋণদান, বিপণন ও সরবরাহ সমিতিগুলি যৌথ ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ক্রেতাদের সমবায় আন্দোলন রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের স্বার্থে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৩৫ সাল থেকে শহরগুলির বাইরের সমস্ত বণ্টনব্যবস্থা ক্রেতাদের সমিতিগুলির হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়, এবং ১৯৪৬ সাল থেকে তাদের শহর ও শ্রমিকদের বসতিগুলিতেও কাজ চালাতে দেওয়া হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে আন্দোলনের বিভিন্ন অধ্যায়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও, এর সামবায়িক রূপটি অক্ষুণ্ণই ছিল।

এদেশে ক্রেতাদের আন্দোলন অন্যান্য দেশের সমবায়ের মতই। ক্রেতাদের অনেক দোকানেরই নিজস্ব উৎপাদন-ব্যবস্থা রয়েছে। ক্রেতাদের দোকান-গুলি জেলা ইউনিয়নের অধীন এবং এগুলি আবার আঞ্চলিক, টেরিটোরিয়াল ও রিপাবলিকান ইউনিয়নের অধীন। ক্রেতাদের সমিতিগুলির কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের নাম হ'ল সেন্ট্রোসয়াস এবং ছয়টি বিশিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে এটি কাজ করে। ১৯৩২ সাল থেকে সরকার হস্তশিল্পের ও ক্ষুদ্রশিল্পের সমবায় সমিতি গঠনে উৎসাহ দিয়ে আসছেন। এগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে: (ক) কাঁচামাল সরবরাহকারী ও উৎপাদনব্য বিক্রয়কারী সমিতি, (খ) সদস্যরা বাড়িতে কাজ করেন, কিন্তু তাঁদের কাজের একটা অংশের জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেন এমন সমিতি; এবং (গ) সাধারণ কারখানা সমন্বিত সমিতি। এগুলি যেসব মাল উৎপাদন করে, সেগুলি রাষ্ট্রের মালিকানাধীন নয়।

যৌথ কৃষিব্যবস্থা: এটি হচ্ছে সমবায় আন্দোলনে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিশেষ অবদান। সোভিয়েট রাশিয়ার পরিকল্পিত আর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে “কিলখোজি” স্থাপন করা হয়।

চীনঃ সমবায় সৌভিৎস ব্যাঙ্ক স্থাপনে অধ্যাপক এস ওয়াই সিয়েশের প্রাথমিক প্রচেষ্টা সফল হয় নি। ক্রমাগত বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে দরিদ্র চাষীদের রক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক দূর্ভিক্ষ-দ্রাণ কমিশন রাইফাইসেন পদ্ধতি অনুযায়ী সমবায় ঋণদান সমিতির প্রবর্তন করেন। সরকারী কর্মচারী ও বেসরকারী ব্যক্তির সমিতিগতুলি সংগঠন করেন, সেগুলিকে পরিদর্শন করেন এবং তাদের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি থেকে ঋণদানের সুপারিশ করেন। ইয়াংসী নদীতে ১৯৩১ সালের বন্যার পরে ঋণদান, সরবরাহ, উৎপাদন, বিপণন ও জনসেবা সংক্রান্ত ৬৪,০০০টি রেজিস্টার্ড সমিতি স্থাপিত হয়। জাতিসংঘের একজন উপ-দেষ্টা কিছুকাল এই আন্দোলনের পথনির্দেশ করেন।

১৯৩৭ সালের চীন-জাপান যুদ্ধের ফলে আন্দোলনের গতি ব্যাঙ্কিং সমিতিগুলির সহায়তায় ক্রেতাদের এবং উৎপাদনকারীদের সমিতি প্রতিষ্ঠার দিকে পরিচালিত হয়। ১৯৪৭ সালে কাউন্সিল অব স্টেট কর্তৃক অনুমোদিত আর্থনীতিক সংস্কার পরিকল্পনায় সমবায়কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেওয়া হয়।

জনসাধারণের একান্ত প্রয়োজনগুলি মেটাবার এবং উন্মাস্তদের বেকার-সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন এবং দেশের শিল্পোৎপাদন (যা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল) বাড়ানোর উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে সংঘ-বদ্ধ করার জন্য সরকারকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। শিল্প সমবায়গুলি ছিল তিন প্রকারেরঃ (ক) সৈন্যদের চাহিদা মেটাবার উপযোগী ছোট ছোট শিল্পের সমবায়ঃ (খ) আক্রমণের আশঙ্কায় অঞ্চলের জন্য মাঝারি শিল্পের সমবায় এবং (গ) উপকূল থেকে দূরবর্তী অঞ্চলের জন্য ভারী শিল্পের সমবায়।

চীনের প্রধান ভূখণ্ডের মুক্তিসাধনের পরে কমিউ-নিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৫১ সালের

ডিসেম্বরে “কৃষিকার্ষ্য পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমবায় সম্বন্ধে খসড়া সিদ্ধান্ত” প্রচারিত করেন। ব্যক্তিকেন্দ্রিক অর্থনীতি থেকে যৌথ-অর্থনীতিতে ক্রমশ অগ্রসর হওয়ার সময়ে ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীরূপে চাষীকে পারস্পরিক সাহায্য ও সমবায়ের পথ অবলম্বন করতে হবে। কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের অন্তর্বর্তীকালের পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে হস্তশিল্প ও বৃহদাকার শিল্পের এক দেশব্যাপী আন্দোলন শুরুর করা হয়। জাতীয় অর্থনীতির রূপান্তরের দিকেই সমগ্র সমবায় আন্দোলনটিকে চালিত করা হয়েছে এবং নিম্নোক্ত কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছেঃ “সাময়িক পারস্পরিক সাহায্যদল বা বর্ষব্যাপী পারস্পরিক সাহায্যদল থেকে কৃষি-উৎপাদন সমবায় সমিতি (যেখানে সদস্যরা শেয়ার হিসাবে জমিগুলি একত্রিত করেন এবং যেখানে একটিই কর্তৃপক্ষ এবং সাধারণ সম্পত্তিরও পরিমাণ বেশি), এবং সেখান থেকে সমাজতান্ত্রিক ধরনের এবং জমি ও উৎপাদনের উপায়গুলির উপর চাষীদের যৌথ মালিকানাধীন আরও উচ্চস্তরের কৃষি সমবায় সমিতি (যৌথ খামার) স্থাপন। ৭

জমি আন্দোলনের সাফল্যের বিশ্লেষণ অবশ্য ভাবীকাল করবে।

জাপানঃ মহাজন ও ব্যবসায়ীদের কবল থেকে চাষীদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সরকার ১৯০০ সাল থেকে ঋণদান সমবায় সমিতি স্থাপন করেন, কিন্তু এই আন্দোলন তেমন জনপ্রিয় হয় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জনসাধারণকে এই আন্দোলন আবার সংগঠিত করার জন্য উৎসাহিত করে। ঋণদান সমিতি, বিপণন সমিতি, ক্রেতাদের সমিতি, প্রয়োজনসাধক সমিতি—এই চারভাগে বিভক্ত সমিতিগুলি বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত। ১৯৪৭ সালের কৃষি সমবায় সমিতি আইন কৃষিকার্ষ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন। অংশীদারী মূলধন সমন্বিত সমিতি

৭। ফরেন ল্যাংগুয়েজ প্রেস থেকে প্রকাশিত “কো-অপারেটিভ ফার্মিং ইন চায়না”, ১৯৫৫।

এবং অংশীদারী মূলধন বর্জিত সমিতি—এই দুই প্রকারের সমিতি অনুমোদন পেয়েছে। প্রথম ধরনের সমিতিগুলি সদস্যদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে এবং চাঁদার হার অনুযায়ী সদস্যদের দায়িত্ব নির্ধারিত হয়। অন্য ধরনের সমিতিগুলির সদস্যদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ।

সবরকমের কৃষি সমিতিই “নোগওকাই”—এর মধ্যে একীকৃত হয়েছিল। এর ফলে আন্দোলনের প্রসার ব্যাহত হয়। মিত্রশক্তির দখলদারীর সময়ে সমিতি ও ফেডারেশনগুলি ভেঙে দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন ধরনের সমিতি গড়ে ওঠে। কৃষি সমবায়-গুলি সার ইত্যাদির প্রায় একমাত্র পরিবেশক এবং খাদ্যশস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারের একমাত্র প্রতিনিধি।

ষুন্ধের সময়ে ক্রেতাদের সমবায়গুলি সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। ১৯৪৮ সাল থেকে মৎস্যজীবীদের সমবায়গুলি গড়ে উঠছে। এই বিপুল অগ্রগতির কারণ হ'ল “সতর্ক পরিকল্পনা, শিল্পের সঙ্গে কৃষির সমন্বয়সাধন এবং বহুপ্রকার ক্ষুদ্র-শিল্পের প্রবর্তন। শিল্প-শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত সমিতিগুলি কাঁচামাল সরবরাহ করে, মাল বাজার-জাত করে, উপপন্থাবোর গুণ ও পরিমাণ সম্পর্কে বিশেষ যত্ন নেয় এবং প্রয়োজনবোধে নতুন কলা-কৌশলও প্রবর্তিত করে।

অ-কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতিগুলি সাধারণত অন্যান্য সমবায় সমিতি ও অ-সদস্যদের সঙ্গে ব্যাঙ্কিংয়ের কারবার করে থাকে, কিন্তু এ ছাড়া এদের অন্য কোন কাজ নেই।

ইস্রায়েল: ইস্রায়েলে সমবায় সমিতিগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে: (১) শ্রম-সমবায় ও (২) সাধারণ সমবায়। প্রথমটি প্রধানত শ্রমিক সমস্যা সংক্রান্ত সমিতি। কৃষি সমবায়গুলির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ভুটজা (KVUTZA) নামক যৌথ সমিতিগুলিতে সম্পত্তি সাধারণভাবে সমিতিরই মালিকানাধীনে থাকে এবং তা সদস্যদের

প্রয়োজনানুযায়ী তাদের মধ্যে বন্টন করা হয়। সব কাজই যৌথভাবে সম্পন্ন করা হয়। মোশাবেই ওভাডিন হ'ল পণ্য বিপণন এবং সমাজের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে স্থাপিত ব্যক্তিগত কৃষিজমি-গুলির সমবায় সমিতি। শিল্প সমবায়, ঋণদান সমবায় এবং পরিবহন সমবায়সমূহও গঠিত হয়েছে।

তুরস্ক: সমবায় আন্দোলনের প্রেরণা এসেছে বাইরে থেকে। এদেশের আন্দোলনের একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, রপ্তানীকেন্দ্রগুলিতে ইউনিয়ন প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের কাঠামো প্রথম আমদানী হয় এবং ইউনিয়নগুলির জন্য ব্যবসা যোগাড় করার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক সমিতিগুলি স্থাপিত হয়। ৮ ঋণদান ও বিপণন সমিতিগুলিও সুসংগঠিত।

পাকিস্তান: এদেশে সমবায় আন্দোলনের ভিত্তি হ'ল ১৯১২ সালের ভারতীয় সমবায় সমিতি আইন। বর্তমানে প্রতি তালুকে একটি করে সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি স্থাপনের একটি কর্ম-সূচি রয়েছে। কৃষি সমবায়গুলিকে সহায়তা দেয় কৃষি-কর্পোরেশন। কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, দেশবিভাগের পর থেকে আন্দোলনে ক্রমশ ব্যবসায়িক ঝোঁক দেখা দিচ্ছে।

সিংহল: আন্দোলনের প্রারম্ভে ঋণদান সমিতি-গুলিই ছিল গুরুত্বসম্পন্ন। ক্রমশ বিভিন্ন ধরনের সমবায় স্থাপনের ফলে দেশের উন্নতির মূলে সমবায়ের মূলনীতির সফল প্রয়োগই প্রমাণিত হয়েছে। কো-অপারেটিভ শোল এস্টাব্লিশমেন্ট নামক স্বয়ংশাসিত সংস্থাটি যানবাহন, জাহাজ চলাচল এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক বাণিজ্যের এজেন্ট এবং এর অধীনে বীমা ও মদ্রণ বিভাগও রয়েছে। সমবায় আইনগুলি ভারতেরই অনুরূপ।

৮। এস রাজাগোপালনের লিখিত ‘কো-অপারেশন ইন ফরেন কান্ট্রিস’।

অস্ট্রেলিয়া: কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী সমিতি তাদের ব্যবসায়িক নামের অংশ হিসাবে “সমবায়” শব্দটি ব্যবহার করলেও সেগুণি সামবায়িক নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয় না। সমবায় ডেয়ারীগুলি খুবই উন্নতিলাভ করেছে এবং এগুলি জাতির ডেয়ারী উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ সরবরাহ করে থাকে।

ভারত: ভারতের ৩৫.৭ কোটি অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ৮৩ শতাংশ বাস করে “গ্রামীণ ভারতে”। এদের জীবনযাত্রাপ্রণালী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এদের শতকরা ৬৯.৮ ভাগের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন হ’ল কৃষি। মাথাপিছু কৰ্ষণযোগ্য ও কৰ্ষিত জমির পরিমাণ হচ্ছে যথাক্রমে .৯৭ একর ও .৮৪ একর। আবার, প্রতি দশজন অ-কৃষক গ্রামবাসীর হিসাব নিলে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে চারজন কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পে নিযুক্ত, তিনজন বিবিধ কর্মে নিযুক্ত এবং অবশিষ্ট তিনজন গ্রাম্য ব্যবসারে এবং বিভিন্ন প্রকার পেশায় নিযুক্ত। ৯ নিরক্ষরতা, জীবনযাত্রার নিম্নমান, জনসাধারণের বিকৃত মনোবল, সামাজিক প্রথার অত্যাচার, গ্রাম্য কর্মীদের অবসর সময়ের অপব্যয়, উৎপাদনের যথাযথ উপায়সমূহ সম্পর্কে অজ্ঞতা, উপপন্থাব্যবহার অপব্যবহার বন্টন, ঋণভার এবং চড়াহারে সূদ আদায়—এগুলিই সবদিকের অগ্রগতি ব্যাহত করেছে।

সমস্যাটির প্রতি যথাযথ মনোভাব

অগ্রগতির পথের বাধাগুলির অপসারণ সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে গেলে রাজস্বানের গ্রাম সম্পর্কে মিঃ কারস্টেয়ার্সের নিম্নোক্ত উক্তিটি বিবেচনা করতে হবে: “আমার পূর্বের মন্তব্য অনুযায়ী, এই বড় গ্রামটির মত একটি পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াশীল সমাজে সামাজিক নেতার, সামাজিক অনুমোদনের এবং জনমতের নতুন সামাজিক অভিযান্ত্রিক উদ্ভব কেবল সংসদীয় আইন দ্বারা (তা যতই সূচনামূলক হোক না কেন) সম্ভব করা যাবে

না। এটি বহুসংখ্যক ঘাত-প্রতিঘাতযুক্ত একটি জৈবিক প্রণালী”। ১০ জনসাধারণকে যা দ্রুত অগ্রগতির পথে অগ্রসর করে দিতে পারে সেই জৈবিক প্রণালীর সন্ধান করার নির্দেশ আমাদের এর দ্বারা দেওয়া হয়েছে। সমবায় পদ্ধতিই হচ্ছে এর সমাধান। এ সম্পর্কে অধিক খাদ্য-উৎপাদন তদন্ত কমিটির (১৯৫২) উক্তি উল্লেখ করা যাচ্ছে: গ্রাম্য জীবনযাত্রা উন্নয়নের কাজে সমবায় আন্দোলন যে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, এবারে তার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। সমবায়ের নীতি-গুণি, তাদের অন্তর্হীন বৈচিত্র্যের জন্য গ্রাম্য-জীবনের সকল সমস্যারই সমাধান করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, কেবল সমবায়ের মূলনীতিগুলি গ্রহণ দ্বারাই এরূপ সমাধান পাওয়া যেতে পারে। ১১ সমবায় এদেশে অপরিচিত নয়

কৌটিল্য, মনু এবং অন্যান্যদের লেখা থেকে প্রমাণ হয় যে, সমবায়ের নীতি এদেশে অপরিচিত ছিল না। পাজ্যাবের “লানা” প্রথা ও মাদ্রাজের “নিধিস” প্রথা গ্রামীণ অর্থনীতিতে সামবায়িক নীতির ধারাবাহিকতার দৃষ্টান্ত প্রদান করছে। সমবায়ের ভিত্তিতে ঐক্য হচ্ছে আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার।

সরকারের দ্বারা আন্দোলনের প্রবর্তন

কৃষির জন্য অর্থ যোগান দেওয়ার কয়েকটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে স্যার ফ্রেডারিক নিকলসন ১৮৯২ সালে সামবায়িক নীতিতে পল্লী-ঋণের সুপারিশ করেন। ১৮৯২ সালেই মাদ্রাজ সরকার এটি পর্যালোচনা করেন। ১৯০০ সালে কলিকাতায় এক কমিটির সভায় রাইফাইসেন পদ্ধতিতে সমবায় ঋণদান প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১০। জি মরিস কার্চেস্টার্স প্রণীত “দি ইকনমিক উইকলি” ২০-এ জাহুয়ারি, ১৯৫২।

১১। পল্লী-ঋণ সমীক্ষার বিবরণীতে (২য় খণ্ড, ১৯৫৪) উল্লেখিত।

আন্দোলনের আইনগত ভিত্তি

মোটামুটি কাঠামোটি স্থির করার জন্য ভারত-সরকার ১৯০৪ সালে সমবায় ঋণদান সমিতি আইন পাস করেন। সমবায় সমিতিগুলি সংগঠন, নিবন্ধন ও তদারক করার উদ্দেশ্যে নিবন্ধক নিয়োগ করা হ'ল। সমিতিগুলি সংগঠিত করতে গিয়ে যে অসুবিধা হ'ল, তা ১৯১২ সালে সমবায় সমিতি আইনের দ্বারা দূর করার ব্যবস্থা হ'ল। স্থানীয় প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে আইনটি সংশোধিত আকারে প্রয়োগ করা হয়েছিল; উদাহরণস্বরূপ, বাঙলাদেশে এই আইন ১৯৪০ সালে সংশোধন করা হয়। আবার, সমবায় পরিকল্পনা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রাদেশিক সমবায় সমিতির নিয়মাবলী সংশোধন করা হয়।

সমবায় ঋণদান আন্দোলন

সদস্যদের ঋণদানের জন্য প্রাথমিক কৃষিক্ষণ সমবায় সমিতিসমূহ গঠন করা হয়; সদস্যদের সীমাবদ্ধ দায়িত্বই ছিল এগুলির ভিত্তি। ১৯৫১-৫২ সালে সমিতিগুলির সংখ্যা ছিল ১০৭,৯২৫ এবং সদস্যদের সংখ্যা ছিল ৪৭,৭৬,৮১৯। কিন্তু এইসব সমিতির মাধ্যমে প্রদত্ত ঋণের মোট পরিমাণ ছিল চাষীদের গৃহীত ঋণের শতকরা মাত্র ৩ ভাগ। এগুলির প্রধান সম্পদ ছিল অ-সদস্য ও অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত ঋণ ও জামানত। পৃথক পৃথকভাবে ঋণ প্রার্থনা না করে সমষ্টিগতভাবে যৌথ গ্যারান্টি দিলে অপেক্ষাকৃত অল্প সূত্রে ঋণ পাওয়া যেত। স্যার ফ্রেডারিক নিকলসন এইসব সমিতির ঋণদান নীতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত হৃদয়-গ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন: “যে উদ্দেশ্যে সমিতিগুলি স্থাপিত হয়েছে, সেই মিতব্যয়িতা, দূরদৃষ্টি ও স্বাবলম্বন প্রভৃতি জাতীয় গুণগুলির বিকাশই এই সমিতিগুলির নীতি”। ম্যাকলাগান কমিটির মহানুযায়ী “আন্দোলনটির ভিত্তি খুবই সুদৃঢ়”, কিন্তু এলাকার সীমাবদ্ধতা, দায়িত্বের সীমাহীনতা,

অবৈতনিক শ্রম, ঋণদান ব্যবস্থার দুর্ভেদ্যতা—এগুলির প্রত্যেকটিই উপযুক্ত গ্রামীণ সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপনের পথে বাধা দিচ্ছে।

শিল্পাঞ্চলের চাকরিজীবীদের মধ্যে কার্যরত শাহরিক ঋণদান সমিতিগুলি সাধারণভাবে শুল্ক-ডেলিভারি আদর্শের অনুসারী। ৫০৯টি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও তাদের শীর্ষে ১৬টি অ্যাপেল বা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক নিয়ে ঋণদান ব্যবস্থার কার্যকরী কাঠামো স্থাপিত হয়েছে।

১৯১২ সাল থেকে সমবায় আন্দোলন উৎপাদন, প্রসেসিং, গুদামজাতকরণ, বণ্টন প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যকলাপের দিকে পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে এই বিভিন্ন ধরনের সমিতিগুলি ছিল দেশের মোট সংখ্যার ২০ শতাংশ। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম শ্রেণী হচ্ছে ৭,১৭১টি উন্নততর জীবনযাত্রা সমিতি (মোট সংখ্যার ৪.৭%) এবং এর পরেই যথাক্রমে আসে ক্রেতাদের সমিতি (২.৫%), আর্থ উৎপাদনকারীদের সমিতি (২.২%), শিল্প সমিতি (১.৯%), বিপণন সমিতি (১.৮%), খণ্ড-জমি একীকরণ সমিতি (১.৬%), সেচ সমিতি (০.৭%), দুগ্ধ সরবরাহ সমিতি (০.৩%), গৃহ-নির্মাণ সমিতি (০.২%) এবং বিবিধ শ্রেণী (৪.১%)”। সাম্প্রতিক কালে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এইদিকে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। মানদণ্ডের কাছে পরিচিত প্রায় সবরকম সমবায় সংগঠনই কোন-না-কোন আকারে ভারতে প্রচলন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ব্যর্থতার কারণ

আন্দোলনের অতীত কীর্তির সম্বন্ধে আর বেশি আলোচনা না করে, যাতে বর্তমান আন্দোলনের গতি নির্দিষ্ট করা যায়, সেজন্য ব্যর্থতার কারণগুলি অনুসন্ধান করা যাক। আন্দোলনের স্বাভাবিক গতি ব্যাহতকারী সামাজিক ও আর্থনীতিক কারণগুলি সম্পর্কে ডাঃ হো বলেছেন: “দারিদ্র্য ও অপদৃষ্টি, বিশাল ঋণভার (যা লাঘব করার জন্য বহু

প্রদেশ স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন), নিরক্ষরতার হতাশাজনক শতকরা হার, ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতার অভাব, অনর্থকরী জমি, প্রাচীন পদ্ধতি, অপরিপক্ক পরিবর্তন, দরের ওঠানামা, নিয়ন্ত্রিত বাজারের অভাব, মহাজন ও মধ্যস্বত্বাধিকারীদের শোষণ—এগুলিই হচ্ছে সমস্যার বিভিন্ন দিক ; এগুলির প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন এবং আরও প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী আর্থনৈতিক ও সামাজিক আইনপ্রণয়ন। ১২

উপরন্তু, শিল্পের দিক দিয়ে অনগ্রসর “গ্রাম ভারতের” পুনর্গঠনে অগ্রসর হওয়ার সময়ে বৈদেশিক সমবায় আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত প্রথম যুগের কর্মীরা যা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, সেই প্রধান কারণটি হ’ল এই যে “আন্দোলনটি বিশেষত প্রাথমিক পর্যায়ে সামগ্রিকভাবে ব্যক্তির জীবন প্রভাবিত করে নি”। ১৩ পল্লী স্বাধীনতা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সামান্যই সফল হয়েছিল, কারণ একে একটি ব্যাপক কৃষিনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য করা হয় নি।

সমাজের একাংশের নেতৃত্বে পরিচালিত এই স্বতঃ-স্ফূর্ত আন্দোলন সমাজের মধ্যে কোন স্বাস্থ্যকর মনোভাবের সৃষ্টি করতে পারে নি। “মিলমালিক, খাজনাভোগী জমিদার এবং ব্যবসায়ীরা সমবায় সংগঠনের নেতা হয়েছেন, কিন্তু তবুও সমবায় সংগঠনে এইসব সহানুভূতিহীন ব্যক্তিদের প্রবেশের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলা হচ্ছে না, এ জিনিস একমাত্র ভারতেই দেখা যায়”। ১৪

আবশ্যিকতা

ভারতের বর্তমান সমবায় আন্দোলন সর্বাধিক উন্নতির লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে থাকলেও, রয়াল

কমিশনের নিম্নোক্ত সুপারিশগুলি আধারে কিছুটা আলোর সম্মান দিয়েছে : “আমরা আশা করি যে, একটি সুদৃঢ় সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে বহু লক্ষ চাষী-মালিককে উন্নততর জীবনের দিকে চালিত করা যাবে ; এটি সম্ভব হলে করণীয় কাজের অনেকখানিই সমাধা হয়ে যাবে। সমবায় আন্দোলন যদি ব্যর্থ হয়, তবে পল্লী-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আশাই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।” ১৫ সুতরাং যা প্রয়োজন, তা হ’ল সর্বদিক থেকে গ্রামীণ ভারতের উন্নতিসাধনের পরিচালক-শক্তি তে রূপান্তরিত করার উপযোগী করে সমবায় আন্দোলনকে পুনর্গঠিত ও পুনরুজ্জীবিত করা।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নির্দিষ্ট সময়ের শেষাংশে দেশের নেতৃবৃন্দ “উন্নততর চাষাবাস”, “উন্নততর ব্যবসা” ও “উন্নততর জীবনযাত্রা” অর্জনের সর্বাধিক উপযুক্ত পদ্ধতি হিসাবে সমবায় নীতির প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। “নিরাশার রাত্রির মধ্যে সমবায়ের দীপশিখা অনিবার্ণ জ্বলছে এবং এর থেকে যথেষ্ট পরিমাণ স্ফুলিঙ্গ উড়ে দাহ্য পদার্থ প্রজ্জ্বলিত করে একথাই প্রমাণ করবে যে, সমবায়ের তত্ত্বে কোন ভুল নেই, বরং ভুল রয়েছে এর প্রয়োগে।” ১৬

রাজ্য ও সমবায়

জাতীয় অর্থনীতির সমগ্র কর্মসূচিটি প্রধানত দুই শ্রেণীর গ্রামীণ উৎপাদনকারীদের, অর্থাৎ প্রধানত চাষীদের এবং প্রসঙ্গত হস্তশিল্পীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জমি, প্রজাস্বত্ব প্রভৃতির সংশোধনরূপে যেসব আইনগত সংস্কার বর্তমানে করা হচ্ছে, সেগুলির ফলে ক্ষুদ্রাকার শিল্পগুলিকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই বিষয়ে, অন্যান্য বিবরণ ছাড়াও,

১২। ডাঃ ই এম হো রচিত “কো-অপারেটিভ মুভমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া”

১৩। অখিল ভারত পল্লীস্বয়ং-সমীক্ষা সমিতির বিবরণীতে উল্লিখিত সমবায় পরিকল্পনা সমিতির মন্তব্য (১৯৪৬)।

১৪। অখিল ভারত পল্লীস্বয়ং সমীক্ষা সমিতির বিবরণী, ২য় খণ্ড

১৫। ঐ

১৬। ক্ষুদ্রশিল্প-সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দলের বিবরণী, ১৯৫৪।

ক্ষুদ্রাকার শিল্প সম্পর্কে ফোর্ড ফাউন্ডেশন কমিশনের এবং ১৯৫৪ সালের অখিল ভারত পল্লী-ঋণ সমীক্ষার রিপোর্ট ও সুপারিশগুলি গুরুত্ব-সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। কমিশনের প্রণীত নিম্নোক্ত মূলনীতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলি হচ্ছে “সমবায়ের জন্য গবেষণা ও সার্ভিস দত্তর”, “সমবায়ের জন্য প্রয়োজনীয় জন-সংযোগ কর্মসূচি” এবং “সমবায়ীদের স্বাবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা”। সামবায়িক উদ্যোগে সরকারী হস্তক্ষেপের বা অংশগ্রহণের পরিমাণ সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী মতামতের মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দলের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি খুবই মূল্য-বানঃ “মূলধন, ঋণ, উপদেষ্টা ও পরিচালনা দ্বারা সামবায়িক উদ্যোগে আংশিক ও প্রারম্ভিক অংশ-গ্রহণ করে সরকার সর্বদাই সমবায়ীদের অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলায় সাহায্য দিতে পারেন। সরকার যেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকর্তা ও মধ্যস্থত্বরূপে থাকেন, সেক্ষেত্রে সমবায়গুলি সমৃদ্ধিলাভ করে”। ১৭

সমবায় আন্দোলনের ব্যয়নির্বাহ

কৃষি বিষয়ে অখিল ভারত পল্লী-ঋণ সমীক্ষার রিপোর্টটি বিবেচনা করতে হবে। “সমবায় সংগঠনের প্রাসঙ্গিক অংশসমূহ পুনর্গঠনের ভিত্তি হওয়া উচিত রাষ্ট্রের অংশীদারী। সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান অনুসারে এইরূপ অংশীদারীর পরিবর্তন হবে। শীর্ষ পর্যায়ে, এইরূপ অংশীদারিত্ব হবে প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ রাজ্যসরকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির অংশীদারী মূলধনের একটা অংশ প্রত্যক্ষভাবে যোগাবেন। জেলা পর্যায়ে রাজ্যের অংশীদারী হবে শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ; এক্ষেত্রে রাজ্যসরকার শীর্ষ প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজ্য পর্যায়ে তাদের অংশীদারী মূলধন যোগাড়ে সহায়তা করার জন্য তাদের অর্থসরবরাহ (অতিরিক্ত অংশীদারী

মূলধনরূপে) করবেন। প্রাথমিক পর্যায়েও রাজ্যের অংশীদারী হবে অপ্রত্যক্ষ ; এটি হবে শীর্ষ প্রতিষ্ঠানগুলিকে জেলা পর্যায়ের সংগঠনগুলিকে অর্থের যোগান দিতে সমর্থ করার জন্য অনুদ্রুপ-ভাবে অর্থসরবরাহের মাধ্যমে ; এবং এই জেলা প্রতিষ্ঠানগুলি আবার প্রাথমিক পর্যায়ে অংশীদারী মূলধনের অংশবিশেষ সরবরাহ করবে। উদাহরণ-স্বরূপ, বিপণন ও প্রেসিং সমবায় সমিতি প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজ্যের অংশীদারী সব পর্যায়েই প্রত্যক্ষ হতে পারে”। ১৮

“কৃষি-উৎপাদনকারীদের সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, সম্ভাব্য ন্যূনতম সময়ের মধ্যে জন-সাধারণের সর্বাধিক অংশকে প্রভাবিত করাই সমবায় ঋণদান সমিতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।” ১৯

“গ্রামীণ হস্তশিল্পীদের জন্য ঋণদানের ব্যবস্থাকে কালক্রমে স্বাভাবিক সমবায় ঋণদান ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া উচিত।” ২০

ভারতের গ্রামগুলি একই সঙ্গে কৃষি ও শিল্প-ভিত্তিক হওয়ায় জাতীয় অর্থনীতির সংগঠন কেবল তিনটি প্রধান ক্ষেত্রেই সফল হতে পারে।

সমবায় কৃষিকার্য

“ভারতে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা একটি গর্বের বিষয় এবং এর ইতিহাস গ্রামীণ জনসাধারণের মনে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। জমির উপর থেকে তাদের মালিকানা লোপ করবে, এমন-কোন পরিকল্পনায় তাঁদের সম্মতিলাভ খুবই কঠিন।” ২১ সুতরাং, যৌথ কৃষিকার্যও নয়, সমষ্টিগত কৃষিকার্যও নয়, সমবায় কৃষিকার্যই এই দেশের উপযোগী। সেচের সুযোগসুবিধা প্রদান, উন্নততর বীজ ও সারের সরবরাহ, উন্নততর প্রয়োগবিদ্যার বিস্তার এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও কার্যকরী যন্ত্র-পাতির সরবরাহ—এগুলিই প্রত্যেক সমবায় কৃষি সমিতির কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

১৭। ক্ষুদ্রশিল্প-সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দলের বিবরণী, ১৯৫৪

১৮, ১৯ ও ২০। অখিল ভারত পল্লীঋণ সমীক্ষার বিবরণী, ২২ খণ্ড

২১। ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ভূমিসংস্কার বিল উপাধীন প্রসঙ্গে শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

তবে, এক্ষেত্রে একক বা সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতিসমূহ থাকতে পারে।

উন্নততর সামবায়িক ব্যবসা

সমবায় আন্দোলনের বর্তমান কর্মসূচিতে উন্নততর ব্যবসার প্রধান দিকগুলি, অর্থাৎ (ক) ঋণদান ব্যবস্থা ও (খ) প্রসেসিং, গুদামজাত করা, বিপণন প্রভৃতি উৎপাদনের পরবর্তী কার্যকলাপ প্রভৃতির উপর জোর দেওয়া উচিত। ব্যক্তিগত জমি-গুলির উৎপাদনবৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা উচিত। গ্যাভিগল কমিশন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে, ঋণদানকে কৃষি-অর্থনীতির অন্য সব দিকের সঙ্গে সংযুক্ত না করলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

সাম্প্রতিককালে সমবায় সংগঠনের কার্যকলাপের এই দিকটির উপর ঝোঁকটি স্থানান্তরিত করার

একটা প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। নিঃসন্দেহে এই প্রবণতাটি খুবই আনন্দজনক। কিন্তু আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি দেখা দিয়েছে। “আংশিকভাবে একে কেবল পলায়নীয় মনোবৃত্তি বলা যেতে পারে। সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতা যে এর আভ্যন্তরীণ দৌর্বল্য অপেক্ষা এর আয়ত্তের বাইরের কারণগুলির উপরই বেশি নির্ভরশীল, এটি সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করে সমবায়ী তাত্ত্বিক ও কর্মীরা ক্রমশই একথা ধরে নিচ্ছেন যে সমবায় সমিতিগুলির কার্যকলাপ যদি কেবল কৃষি ও ব্যবসার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রসারিত করে দেওয়া যায়, তা হলে আন্দোলনের সাফল্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হবে। ২২

পুনর্গঠিত আন্দোলনের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপগুলি ভারতে সমবায়ের মূলনীতিগুলির কার্যকারিতার প্রমাণ দেবে। আমরা কেবল এর শুভকামনাই করতে পারি।

২২। অখিল ভারত পরীক্ষণ সমীক্ষা সাধারণ বিবরণী, ১৯৫৪।



পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি

[পশ্চিমবঙ্গের জনগণনাকার্যের অধীক্ষক শ্রীঅশোক মিত্র, আই সি এস, মহাশয়ের একটি আবেদন আমাদের পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে এখানে প্রকাশ করা হ'ল। এ রাজ্যের উৎসব, পার্বণ ও মেলার বিবরণ সংগ্রহে তিনি সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা চাইছেন। আশা করি আপনারা সোৎসাহে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি পাঠিয়ে পূর্ণাঙ্গ পুস্তক প্রকাশে তাঁকে সাহায্য করবেন।

সাদা ফুলস্ক্যাপ কাগজ খাড়াভাবে মাঝখানে ভাঁজ করে নিয়ে, বাঁদিকে প্রশ্নগুলি লিখে প্রশ্নপত্র তৈরি করে নেবেন। উত্তর অনুগ্রহপূর্বক তাঁর ঠিকানায় পাঠাবেন।—সম্পাদক]

সবিনয় নিবেদন,

বিগত জনগণনার (১৯৫১ সাল) কার্যে সমগ্র দেশবাসীর নিকট হইতে আমাদের দপ্তর যে অকুণ্ঠ সাহায্য লাভ করিয়াছে, কৃতজ্ঞতার সহিত সর্বদাই আমরা তাহা স্মরণ করি। জনগণনার সারণী ও বিবরণীসমূহে আমরা আমাদের দেশের সামাজিক ও আর্থনীতিক রূপটিই তুলিয়া ধরিতে চেষ্টিত হইয়াছিলাম। এ বিষয়ে যতটুকু সাফল্য অর্জিত হইয়াছে তাহা আপনাদের সকলের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রসাদগুণেই সম্ভব হইয়াছে; যতটুকু হয় নাই তাহা আমাদেরই অক্ষমতায়। আমাদের বিভিন্ন কার্যে আমরা সর্বদাই আপনাদের নিকট হইতে উদার ও অকুণ্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা পাইয়া থাকি; ইহা আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য। নিজের দেশকে প্রকৃতভাবে বদ্বিবার ও জ্ঞানিবার জন্য আজ সকলেই যে আগ্রহান্বিত, ইহা তাহারই অভ্রান্ত পরিচয়।

১৯৫১ সালের জনগণনার পরে “পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও পরবের” একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ আসন্ন হওয়ায় সুদৃষ্ট ও বিশ্বজনেরা অনেকেই অভিলাষ প্রকাশ

করিয়াছেন, যেন দ্বিতীয় সংস্করণে পশ্চিমবঙ্গে উপাসিত দেবদেবী এবং তদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসব, মেলা ও পরবের বিশদ বর্ণনা ও বিবরণী এই পুস্তিকাটিতে স্থান পায়। বলা বাহুল্য, ইহা করিতে পারিলে পুস্তিকাখানির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বর্ধিত হইবে, এবং সুদৃষ্ট ও বিশ্বসমাজে এবং সাধারণভাবে দেশবাসীর নিকট ইহা সমাদৃত হইবে। একান্ত প্রয়োজনীয় এই দায়িত্ব পালনে আমরা রতী হইয়াছি। এতৎসংলগ্ন প্রশ্নপত্রটি এই উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত হইয়াছে।

এই দায়িত্ব সুদৃষ্টভাবে পালন করিতে হইলে বিপুল তথ্যরাজি সংগ্রহ আবশ্যিক। বলা বাহুল্য, সরকারের পক্ষ হইতে নিযুক্ত কর্মচারী মারফত তাহা সম্ভব নয়। কারণ, সত্যনিষ্ঠার সহিত এই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার একান্ত প্রয়োজন; ইহা ছাড়া প্রয়োজন স্ব স্ব গ্রাম ও অঞ্চল সম্পর্কে প্রগাঢ় মমতা ও একান্তবোধ এবং তাহার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতনতা। এগুলির অভাবে সংগৃহীত তথ্য কোনক্রমেই সম্পূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না। আমাদের বিচারে, সত্যনিষ্ঠ এই তথ্যসংগ্রহ শুধুমাত্র আপনাদের মতো ব্যক্তিরাই করিতে পারেন। আমরা জানি, নিজের দেশের প্রকৃত রূপ ও বৈশিষ্ট্য সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিবার কাজে নানারকম কষ্ট স্বীকার করিয়াও বিনা পারিশ্রমিকে আপনারা এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বিমুখ নন। আপনাদের কাছে আমরা যে নিষ্ঠা, সততা ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণী আশা করি, তাহা অল্প সময়ের জন্য স্বল্প বেতনে নিযুক্ত কর্মচারীদের নিকট হইতে আশা করা যায় না।

আমাদের বিনীত অনুরোধ আপনি যদি সংলগ্ন প্রশ্নপত্রটি যথাসাধ্য পূরণ করিয়া ফেরত পাঠান, তবে এই কার্যে বিশেষ সহায়তা হইবে। মৃদুপ্রিত প্রশ্নগুলি ছাড়াও আপনি যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অন্যান্য

তথ্য যোগ করেন, তাহার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব।
এক দফায় সম্ভব না হইলে, দুই-তিন দফাতেও
তথ্য প্রেরণ করিতে পারেন।

আপনার সংগৃহীত তথ্য পুস্তিকায় সন্নিহিত
করিবার সময় আমরা আপনার নাম-ঠিকানা প্রকাশ
করিয়া ঋণ স্বীকার করিব। আশা করি আপনার
আপত্তি হইবে না। অনুগ্রহপূর্বক পক্ষকালের মধ্যে
উত্তর পাঠাইলে বাধিত হইব ইতি—

পশ্চিমবঙ্গ সেন্সাস দপ্তরের পক্ষে,

অশোক মিত্র

ঠিকানা—

শ্রীঅশোক মিত্র, আই সি এস,
সুপারিন্টেন্ডেন্ট, সেন্সাস অপারেশনস্,
ওয়েস্ট বেঙ্গল,
১৪৬/এবি, লোয়ার চিংপুর্ রোড,
মোদী বिल्ডিংস্ (স্বিতল),
কলিকাতা—১

প্রশ্নমালার উত্তর প্রসঙ্গে:

১। উত্তর লিখিতে শ্রদ্ধা করিবার আগে প্রশ্ন-
মালাটি আগাগোড়া একবার পড়িয়া নিলে ভালো
হয়।

২। প্রত্যেকটি প্রশ্নের ডান দিকের খালি অংশে
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া কালিতে উত্তর লিখিতে
হইবে। যেসব প্রশ্নে কিংবদন্তী, ইতিহাস, ইত্যাদি
সম্পর্কিত বিস্তৃত উত্তর চাওয়া হইয়াছে স্বভাবতই
ডানদিকের খালি অংশে সেইগুলির উত্তরের স্থান
সংকুলান হইবে না। পৃথক কাগজে প্রশ্নসংখ্যার
উল্লেখপূর্বক এই প্রশ্নগুলির উত্তর লেখাই যুক্তি-
সঙ্গত হইবে।

৩। আমরা আশা করি উত্তরদাতারা সকলেই সমস্ত
প্রশ্নগুলির উত্তর দিবার জন্য চেষ্টিত হইবেন।
উত্তরগুলি যাহাতে সত্যনিষ্ঠ এবং যথাযথ হয় সে-
দিকে বিশেষভাবে সজাগ থাকিবার জন্য অনুরোধ
করা যাইতেছে।

৪। কোনো কারণে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া
সম্ভবপর না হইলে, উত্তরদাতাদের নিকট হইতে
আমরা অন্তত নিম্নলিখিত প্রশ্নসংখ্যাগুলির উত্তর
অবশ্যই আশা করিবঃ ২, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১,
১৪, ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮।

৫। উত্তর-সংগ্রহকাজ সম্পন্ন করিতে স্বভাবতই
কিছু সময় লাগিবে। আমরা আশা করি প্রশ্নমালা
পাইবার পর অনধিক পক্ষকালের মধ্যে উত্তরগুলি
লিখিয়া এটি ফেরত পাঠানো সম্ভব হইবে। মর্দিত
প্রশ্নমালার বাহিরে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তথ্যাদি
থাকিলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। উৎসব, পার্বণ
বা মেলার প্রত্যক্ষ বিবরণীসমূহ এক দফায় সম্ভব না
হইলে দুই-তিন দফায় পাঠানো চলিবে। পরিষ্কার-
পরিচ্ছন্নভাবে উত্তর দিতে অনুরোধ করা যাইতেছে;
কারণ কাগজ ময়লা হইলে বা ছিঁড়িয়া যাইলে এবং
লেখা অস্পষ্ট হইলে উহা হইতে উত্তরের পাঠোন্মাদ
ও সংকলন খুবই দুরূহ হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের উৎসব, পার্বণ ও

মেলা

প্রশ্নমালা

গ্রামের নাম:

মৌজা:

থানা:

জেলা:

ক। গ্রাম বিবরণী:

১। গ্রামের উৎপত্তি সম্পর্কে কোনো ইতিহাস বা
কিংবদন্তী জড়িত থাকিলে তাহার বিবরণী দিন।

২। গ্রামে কোন্ কোন্ জাতির বাস? কতোগুলি
পাড়া আছে? ঘর বা জনসংখ্যা হিসাবে পাড়া-
গুলিকে ক্রমিকভাবে উল্লেখ করুন। প্রধান উপ-
জীবিকা কি কি?

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ১১শ সংখ্যা

৩। গ্রামে যাইবার প্রধান পথ কি? নিকটবর্তী রেল স্টেশন, মোটর ও নৌকা চলাচল ব্যবস্থার উল্লেখ করুন।

খ। পূজাপার্বণ ও উৎসবের বিবরণী:

৪। উৎসবের নাম, উপলক্ষ ও সময়কাল।

৫। কতোকালের প্রাচীন উৎসব? কোনো ইতিহাস বা কিংবদন্তী থাকিলে তাহার বিবরণী দিন। উৎসবটি কি নির্দিষ্ট গ্রাম ও এলাকা বা জাতি ও শ্রেণীর নিজস্ব বিশেষ উৎসব? না, সমগ্র জেলা বা অঞ্চলের সর্বজনীন উৎসব?

৬। দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে হইলে, দেবদেবীর নাম ও মূর্তির বর্ণনা (ধ্যান জানা থাকিলে ধ্যান উদ্ভূত করুন): গ্রামের সাধারণের দেবদেবী, না ব্যক্তিবিশেষের দেবদেবী? মন্দির বা স্থান আছে? থাকিলে তাহার মোটামুটি বর্ণনা। মূর্তি না থাকিলে উপাস্য দেবদেবীর স্বরূপ কি? শক্তি হইলে তাহার ভৈরব কে, এবং কাছোপটে তাহার স্থান কোথায়? শিব হইলে তাহার প্রকাশ কি? গ্রামে কয়টি পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর, শীতলা, মনসা প্রভৃতি আছেন?

৭। উৎসবের উপলক্ষ কি কোনো সাধুসন্ত বা পীরের আবির্ভাব বা তিরোধান? সাধু বা পীরের জীবনী, ধর্মপ্রচার, তাহার সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী বা ইতিহাসের বিবরণী দিন।

৮। পূজা বা উৎসব কবে হইতে শুরু হয়, কতোদিন ধরিয়া চলে? উহার প্রস্তুতি কবে হইতে শুরু হয়—প্রস্তুতির মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য থাকিলে তাহার উল্লেখ করুন। প্রত্যেক দিনের পূজা বা উৎসব পদ্ধতির ধারাবাহিক বিবরণী দিন। সমগ্র পূজা বা উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? সর্বজনীন ভোজ, অন্নসত্ত বা প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির আয়োজন হয় কি?

৯। মানত দেওয়া হইলে সাধারণত কি কি মানত দেওয়া হয়? বলি দেওয়া হইলে কি কি পশুপাখি

বলি দেওয়া হয়? কিভাবে এবং উৎসবের কোন সময়ে বলি দেওয়া হয়?

১০। পূজা বা উৎসবের প্রধান সেবায়ত্ত বা ভক্ত কোন সম্প্রদায় বা জাতির লোক? পূজারীর বর্ণ, গোত্র ও পদবী কি?

১১। হিন্দু দেবদেবীর পূজা হইলে অহিন্দুরা অংশ গ্রহণ করে? অহিন্দু উৎসব হইলে হিন্দুরা অংশ গ্রহণ করে? মোটামুটি সংখ্যা কতো?

১২। পূজা বা উৎসব উপলক্ষে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসীর আগমন হয়? কারণ কি?

গ। মেলা বিবরণী:

১৩। মেলা বসে কোথায়? কয় বিষয় জমিতে বসে? কাহার জমি—জমিদারের না উপাস্য দেবতার? দান, তোল, প্রভৃতি আদায় করা হয়? মেলা সকালে বসে না বিকালে বসে? নির্দিষ্ট এই স্থানটিতে মেলা বসিবার কারণ কি?

১৪। কতোদিনের প্রাচীন মেলা? কতোদিন ধরিয়া চলে? কতো লোক আসে? প্রধানত কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের লোক আসে? আশেপাশের কোন কোন গ্রাম বা ইউনিয়ন হইতে লোক আসে? সর্বাপেক্ষা দূরের যাত্রী কোথা হইতে এবং কতো আসে? পুরুষ ও নারীর মোটামুটি সংখ্যা কতো? যাত্রীরা প্রধানত কি কি যানবাহনে আসে?

১৫। মেলায় জিনিসপত্র বিক্রেতার প্রধানত কোন কোন স্থান হইতে আসে? তাহারা কি প্রতি বছরই আসে? কি কি জিনিস বেশি আসে?

১৬। মেলায় কতোগুলি দোকানপাট বসে? খোলা জায়গায় কতো লোক বসে? ফেরিওয়ালার সংখ্যা কতো?

১৭। সমস্ত দোকানপাট ও ফেরিওয়ালার মধ্যে কতোগুলি:

(ক) খাবারের দোকান—ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবার।

(খ) বাসনকোসনের দোকান—তামা, পিতল, লোহা, কাচ, মাটি, ইত্যাদি।

(গ) মনিহারী দোকান—লন্ঠন, টর্চলাইট, আয়না, চিরুনি, অন্যান্য রকমারী জিনিসপত্র।

(ঘ) ঔষধপত্রের দোকান—কবিরাজি, হাকিমী, টোটকা, প্রভৃতি।

(ঙ) বই, ছবি, পুস্তিকা, প্রভৃতির দোকান—কি ধরনের বই, ছবি ও পুস্তিকার প্রচলন বেশি?

(চ) কাপড়চোপড়ের দোকান—মিল, তাঁত, কাটা-কাপড়, লুঙ্গি, গামছা, শতরঞ্জি, তৈরী পোশাক, ইত্যাদি।

(ছ) কৃষি বা কারিগরি সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান—কি কি যন্ত্রপাতি? গরু, মহিষ, ছাগল, প্রভৃতির ক্রয়-বিক্রয় হয় কি?

(জ) শিল্প সামগ্রী বা কারুশিল্পের দোকান—তাঁতের তৈরী জিনিসপত্র, বেত, চ্যাঙ্গারী, ধামা, কুলো, মাটির পদতুল বা হাঁড়িকুড়ি, খেলনা, পাত্র, বাঁশের জিনিস, অন্যান্য উল্লেখযোগ্য জিনিসপত্র।

এগুনি প্রধানত কোন্ কোন্ অঞ্চলের বা গ্রামের? ইহারা কি প্রতি বছরই আসে?

(ঝ) অন্যান্য দোকান।

১৮। মেলায় আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা কি? খেলাধুলা, নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, জুয়া, লটারী, যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান, জলসা, ইত্যাদির বিবরণী দিন। যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান ও অন্যান্য গান-বাজনার বিষয়বস্তু কি? কাহাদের দল, কোথা হইতে আসে? গ্রামের কোনো নিজস্ব দল আছে? অধিকারীর নাম ও ঠিকানা। পালা বা গান সংগ্রহ করিয়া পাঠানো সম্ভব? প্রতিবার কি একই লোক আসে? কতো লোক দেখে বা শোনে?

১৯। উৎসব উপলক্ষে মাদকদ্রব্য পান কি কোনো প্রয়োজনীয় ধর্মচার?

২০। অন্যান্য মন্তব্য।

উত্তরদাতার নাম.....

ঠিকানা.....

পেশা.....

উত্তর পাঠাইবার তারিখ.....



অ্যামোনিয়া-বায়ু :

সার-শিল্পে প্রগতি

হলধর

গত ৪-৫ বৎসর হইতে শূন্য অ্যামোনিয়া গ্যাস (Anhydrous ammonia) সার হিসাবে আমেরিকার কৃষক ও কৃষি-শিল্পপতিদের চিত্ত বিশেষরূপে আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা লইয়া ইংলন্ডে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আলোচনা এবং সমালোচনাও হইতেছে প্রচুর। আমেরিকায় সর্ববিষয়েই সর্বদা 'এগিয়ে চল, এগিয়ে চল' রব; নিত্য নূতন সার উদ্ভাবন করিয়া কৃষিজগতে অগ্রগতিতেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

জগৎ প্রগতিশীল। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক সকলেই বলেন, ক্রমবিকাশই (Evolution) জগতের ধারা। জ্বালানী কাঠ, পাথরে কয়লা, তৈলশক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি, অতঃপর আগবশক্তি; চকমকি পাথর, পরে দিয়াশলাই এবং 'সিগারেট লাইটার'। এই সমস্তই বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের চিহ্ন। উদ্ভিদ-জগতেও এই ক্রমবিকাশ; ব্যাক্টেরিয়া, অলগা (Alga), ছত্রাক, শেওলা, ফার্ন, তারপর বহু পত্রপুষ্পে সুশোভিত বৃক্ষ—একটির পর একটি যেন সাজানো। সর্বত্রই ক্রমবিকাশের চিহ্ন; কোথাও প্রাকৃতিক, কোথাও বা মানববুদ্ধির অবদান। খাদ্যোৎপাদনক্ষেত্রে হল-কর্ষণ, বীজ-বাছাই, বীজবপন, জলসেচন, সার-প্রয়োগ, পোকামাকড় দমন, অব্যাহত ঘাস বিনাশ, ফসল কাটা, প্রত্যেকটি ক্রিয়াতেই গত এক-শতাব্দীব্যাপী প্রগতির ইতিহাস মানবমনের সুদূর-প্রসারী দৃষ্টির এবং কর্মক্ষমতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে। তন্মধ্যে পাশ্চাত্য দেশে সার-শিল্পের ক্রমোন্নতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং আমেরিকায় অ্যামোনিয়া-বায়ুর সাররূপে ব্যবহার এই শিল্পে প্রগতির চমকপ্রদ নিদর্শন।

জমিতে সার প্রয়োগ করিলে যে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এই সত্য পৃথিবীর সর্বত্র অতীতকাল হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে এবং নাইট্রোজেন-বায়ু আবিষ্কৃত হওয়ার ও উহা যে মানবদেহের ও উদ্ভিদদেহের প্রধান উপাদান তাহা স্থিরীকৃত হওয়ার বহু পূর্বে হইতেই গোময় অত্যুত্তম সার হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে—প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দেশে, সর্বত্রই। আমাদের দেশে কৃষিবৃত্তি ধীরে ধীরে নিরক্ষর ব্যক্তির উপর যাইয়া পড়ায় এবং উহা অগৌরবের বিষয় মনে করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তি-মাত্রই উহা হইতে হাত গুটাইয়া লওয়ার ফলে চাষ-বিষয়ে বিশেষত সার সম্বন্ধে গবেষণা আমাদের দেশে একেবারেই লোপ পাইয়া যায়। প্রাচীনকালে এ সম্বন্ধে কী গবেষণা হইয়াছিল তাহার কোনও লিপিবদ্ধ বিবরণ জানা যায় না; হয়তো অন্যান্য অনেক শাস্ত্রের মত বিদেশীর আক্রমণে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ষোড়শ শতাব্দীর পুঁথিপত্রে সারের উপকারিতা সম্বন্ধে উল্লেখ দেখা যায় এবং ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে উহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেষ্টা এবং ক্রমবিকাশের সন্ধান মেলে। ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানী প্রিস্টলি বায়ু হইতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস বিচ্ছিন্ন করেন এবং ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানী সিরিগ কর্তৃক উদ্ভিদভক্ষ্য বিশ্লেষণক্রিয়া হইতে উদ্ভিদের খাদ্য ও জীবনধারণ-প্রণালী সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হইতে থাকে। ক্রমে ইংলন্ডে এবং অন্যান্য দেশে গবেষণার ফলে নূতন নূতন সার আবিষ্কৃত ও উদ্ভাবিত হয়।

সে যাহা হউক, ইতিমধ্যে গোময় ব্যতীত ও নাইট্রোজেন-সংশ্লিষ্ট অন্য বহুবিধ সারের ব্যবহার

প্রচলিত হয় এবং তাহাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণও জানা যায়। তাহার মধ্যে প্রকৃতিপ্রদত্ত 'গোয়ানো' (পেরু দেশের সমুদ্রচারী পাখির বিষ্ঠা) এবং চিল দেশের নাইট্রেট অব সোডা পাশ্চাত্য দেশসমূহে সমধিক প্রসারলাভ করে। ভারতের মৃত্তিকা হইতে সংগৃহীত স্বভাবজাত পটাশিয়ম নাইট্রেটও (সোরা) আমেরিকার কৃষিক্ষেত্রে যাইয়া চাষীদিগকে লাভবান করিতে থাকে; পরে অ্যামোনিয়ম সালফেটের উপকারিতা ইংলন্ড এবং জার্মানীতে উপলব্ধ হয় এবং নাইট্রেট অব সোডার সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অতঃপর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বায়ুমণ্ডলের অফুরন্ত ভান্ডার হইতে নাইট্রোজেন "আবদ্ধ" করিয়া অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করিবার উপায় আবিষ্কৃত হওয়ায় জমিতে নাইট্রোজেন সরবরাহ করিবার জন্য সালফেট অব অ্যামোনিয়াই বর্তমানে প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে। এই সার আমাদের দেশেও এখন সুপরিচিত এবং এখানে বিভিন্ন কারখানায় উৎপন্ন হইতেছে।

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য অ্যামোনিয়া গ্যাস এবং 'অ্যামোনিয়া লিকার' (অর্থাৎ জলে দ্রবীভূত অ্যামোনিয়া) এই সালফেট অব অ্যামোনিয়া প্রস্তুত-পদ্ধতির মধ্যবর্তী একটি ধাপবিশেষ। প্রকৃতপক্ষে, বিশুদ্ধ অ্যামোনিয়া-বায়ু (Anhydrous ammonia) রাসায়নিক জগতের একটি পুরাতন আবিষ্কার এবং বরফ-প্রস্তুতি প্রভৃতি নানাবিধ শিল্পে ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে। কিন্তু সার হিসাবে সরাসরি বিশুদ্ধ অ্যামোনিয়া বায়ুর ব্যবহার যে সম্ভব এতদিন কেহ সে কথা চিন্তা করেন নাই।

বায়ু সংক্ষেপের তাগিদে কৃষিবিদগণের চেষ্টা চলিতে থাকে—ক্রমশঃ অধিকতর তেজস্কর দ্রব্য কিরূপে ব্যবহার করা যায়। নাইট্রেট অব সোডাতে নাইট্রোজেনের অংশ আছে শতকরা ১৬ ভাগ, সালফেট অব অ্যামোনিয়াতে আছে প্রায় ২১ ভাগ, অ্যামোনিয়ম নাইট্রেটে পাওয়া যায় ৩৫ ভাগ এবং ইউরিয়াকে প্রায় ৪৬ ভাগ নাইট্রোজেন বর্তমান।

ইহাদের প্রত্যেকটিরই সার হিসাবে অল্প-বিস্তর ব্যবহার শুরুর হইয়াছে এবং ব্যবহারিক স্দৃবিধা-অস্দৃবিধা হিসাবে প্রত্যেকটিই প্রসার লাভ করিতেছে। ইতিমধ্যে ক্রমবিকাশের ফলে ফসফেট এবং পটাশ প্রভৃতি উদ্ভিদ-খাদ্যের সঙ্গে নাইট্রোজেনের সংমিশ্রণে নানাবিধ মিশ্রিত এবং যৌগিক (compound) সার উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

ইউরিয়াকে নাইট্রোজেনের ভাগ প্রচুর থাকার দরুন ইহার প্রতি কৃষিবিদগণের বিশেষ দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু ইহার সঙ্গে অন্য পৰ্যায়ের সার মিশ্রণের স্দৃবিধা হইতেছে না; অত্যধিক দ্রবণতার ক্ষমতাবশত এবং আরও কয়েকটি কারণে ইহার একক ব্যবহারেও কতকগুলি অস্দৃবিধা প্রকাশ পাইয়াছে। এই অবস্থায় জড়-বিজ্ঞানে অগ্রণী মার্কিন কৃষিবিদগণের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে এই বিশুদ্ধ অ্যামোনিয়া-বায়ুর উপর, যাহাতে নাইট্রোজেনের ভাগ আছে শতকরা প্রায় ৮২ ভাগ। জলের সংমিশ্রণে ইহা সহজেই অন্যান্য সারের সঙ্গে মিশ্রিত করা চলে।

সালফেট অব অ্যামোনিয়া বা নিশাদলের (অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড) সঙ্গে চুন মিশ্রিত করিলে যে উগ্র ঘ্রাণ অনুভূত হয় উহাই অ্যামোনিয়া-বায়ুর গন্ধ। অপরিষ্কৃত প্রস্রাবখানাতেও এই গ্যাসের তীব্র গন্ধ পাওয়া যায়, কারণ মনুষ্য বা অন্য কোনও প্রাণীর প্রস্রাব পিচিলে তাহা অ্যামোনিয়া-বায়ুতে পরিণত হয়। কাঁচা পাথুরে কয়লা পোড়াইলে তাহা হইতে অ্যামোনিয়া গ্যাস পাওয়া যায়। বর্তমানে বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন নিষ্কাশিত করিয়া জলীয় বাষ্পের সাহায্যে অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করা হয়।

কিন্তু ইহা ব্যবহার করার প্রধানতম অস্দৃবিধা হইতেছে ইহা ভান্ডারে জমা করিয়া রাখা এবং জমিতে ইহার প্রয়োগ করা। সাধারণ উত্তাপে এবং সাধারণ বায়ুর চাপে অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় এই পদার্থ বায়বীয় অবস্থায় (gaseous state) বিদ্যমান থাকে। সুতরাং ইহা পাড়ে ধরিয়া রাখিতে

হইলে প্রচুর স্থানের প্রয়োজন। তবে অত্যধিক চাপে—বায়ুর সাধারণ চাপের ৩৫০ হইতে ৪০০ গুণ চাপে—ইহা তরলীভূত হইয়া যায় এবং তখন অপেক্ষাকৃত অনেক কম স্থানেই সংরক্ষিত হইতে পারে। এইজন্য প্রস্তুত হইলে অ্যামোনিয়া-বায়ুকে বিশুদ্ধ এবং বিশুদ্ধ করিয়া তরলীভূত অবস্থায় রূপান্তরিত করিয়া সুদৃঢ় বন্ধ লৌহাধারে রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। চাপমুক্ত হইলেই উহা পুনরায় বায়বীয় অবস্থায় চলিয়া যায়।

এই কারণে ইহার প্রয়োগ-সমস্যা আরও কঠিন। বিশেষ প্রকার প্রক্ষেপক (Ejector) এবং চোঙ (drill) দ্বারা যন্ত্রসাহায্যে এই তরলীভূত গ্যাস জমিতে মাটির ৫-৬ ইঞ্চি নিচে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে হয় এবং যন্ত্রসাহায্যেই অতিশয় দ্রুত মাটিচাপা দেওয়া হয় যাহাতে তরল অ্যামোনিয়া পুনরায় গ্যাসে পরিণত হইয়া উড়িয়া না যায়। স্মরণ রাখা উচিত যে, এই গ্যাস সাধারণ বায়ু হইতে হালকা।

ইহার গন্ধ অতি তীব্র। চক্ষু এবং নাসিকার পক্ষে ইহা অত্যন্ত পীড়াদায়ক এবং স্বাস্থ্যের হানিকারক। সুতরাং যাহারা ইহার প্রয়োগে সংশ্লিষ্ট থাকেন তাঁহাদিগকে গ্যাস-মুখোস পরিয়া কাজ করিতে হয়। এইসকল যন্ত্রপাতির মূল্য কিছুদিন পূর্বে ওদেশে প্রায় ৪০০ ডলার অর্থাৎ ১,৪০০ টাকা ছিল। এইসকল অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ইহা জনপ্রিয় হইয়াছে; তাহার নিদর্শন হইতেছে এই যে, আমেরিকায় এবং কানাডায় বহু শুল্ক অ্যামোনিয়ার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে—যাহাদের এক-একটির উৎপাদনক্ষমতা হইতেছে ২০,০০০ হইতে ২৫,০০০ টন তরলীভূত শুল্ক অ্যামোনিয়া। নাইট্রোজেনরূপে হিসাব করিলে ইহা প্রায় এক লক্ষ টন সালফেট অব অ্যামোনিয়ার সমান। ইহাদের মধ্যে মিশোরী প্রদেশের কারখানাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইগুলি সমবায় প্রথায় স্থানীয় কৃষকগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত।

আমেরিকায় তরলীভূত শুল্ক অ্যামোনিয়ার মূল্য প্রতি টন ২০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৭০০ টাকা।

আমাদের দেশে সিন্ধি কারখানায় ২১ ভাগ নাইট্রোজেন আছে এমন সালফেট অব অ্যামোনিয়ার দাম ধার্য আছে প্রতি টন ২৮৫ টাকা। নাইট্রোজেনের পরিমাপে সিন্ধির সালফেটের দামের সঙ্গে তুলনা করিলে ৮২ ভাগ নাইট্রোজেনবিশিষ্ট উক্ত শুল্ক অ্যামোনিয়ার দাম হওয়া উচিত প্রায় ১,১০০ টাকা।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউ-জিল্যান্ড প্রভৃতি দেশসমূহে ইহার প্রসার দ্রুতগতিতে হইলেও ইউরোপের দেশগুলিতে ইহার সমালোচনা হইয়াছে যথেষ্ট। আমেরিকার তুলনায় ইংলন্ড রক্ষণশীল দেশ। ইংলন্ড এবং তাহার মত রক্ষণশীল অনেক দেশ এখনও ইহা স্বচ্ছন্দমনে গ্রহণ করে নাই। বিলাতের অ্যাসোসিয়েশন অব ব্রিটিশ অর্গানিক ফার্টিলাইজারস-এর মুখপত্র ‘ফার্টিলাইজার জার্নাল’ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন, “নতুনত্বই সকল সময়ে উন্নতির পরিচায়ক নহে। এত তেজস্কর নাইট্রোজেন-সার ব্যবহারের কুফল হইবে এই যে, লোকে সস্তা বলিয়া ফসফেট, পটাশ প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিবর্তে শুল্ক ইহাই ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক হইবে, যাহার ফলে জমি ক্রমশ দুর্বল এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যশূন্য হইয়া যাইবে”। ইল্যান্ডের গ্রিনিংগন কৃষি-গবেষণাগারের ডক্টর ই জি মোলডার সেখানকার কৃষি-সমিতির এক সভায় কিছুদিন পূর্বে বলিয়াছেন, “নানা কারণে বর্ষাপ্রধান এবং আর্দ্র-জলবায়ুবিশিষ্ট দেশে ইহার ব্যবহার লাভজনক নহে। এন্টেল মাটির পক্ষেও ইহা সালফেট অব অ্যামোনিয়ার মত কার্যকরী নহে।” যাহা হউক, সকল দেশেই এ সম্বন্ধে এখনও গবেষণা চলিতেছে। আমাদের দেশেও সরকারী কৃষিবিভাগ এ বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন। ভারতবর্ষের পরিস্থিতি এবং জলবায়ুর পক্ষে এই সার কার্যকরী ও লাভজনক বলিয়া প্রমাণিত হইলে সিন্ধির মত “আবদ্ধ নাইট্রোজেন”এর (Nitrogen Fixation) কারখানাগুলিতে ইহার প্রস্তুতি কঠিন হইবে না।

কচুর চাষ

জীবিতাইচরণ খাঁ

কন্দ বা মূল-জাতীয় ফসলের মধ্যে কচুর চাষ যে বিশেষ লাভজনক তাহা আমার পরীক্ষিত। কচু চাষের জন্য আর্থিক ব্যয় আলুচাষের ব্যয় অপেক্ষা অনেক কম। কীভাবে কচুর চাষ করিলে অল্প খরচে অধিক ফলন ও লাভ হইতে পারে সে সম্বন্ধে আমার চাষী ভাইগণের অবগতির জন্য আলোচনা করিতেছি।

দোআঁশ মাটিই এই চাষে বিশেষ উপযোগী। কচু সাধারণত দুই প্রকার আমাদের পল্লীগ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ধ'মানে' ও দেশী কচু। কচুর চাষ বৎসরে দুইবার হইয়া থাকে—একবার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে, আর-একবার পৌষ-মাঘ মাসে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে যে কচুর চাষ হয় তাহাকে বর্ধ'মানে' আউশে কচু এবং পৌষ-মাঘ মাসে যাহার চাষ হয় তাহাকে বর্ধ'মানে' সেচ কচু বলা হয়। ঐ সেচ কচুতে ষথেষ্ট সেচের দরকার হয়। কারণ ঐ সময়ে বৃষ্টি আদৌ হয় না বলিলেও চলে।

আলুর জমির মত এ জমিকেও দশ-বারো বার লাঙ্গল দ্বারা চাষিয়া মাটিকে একবারে হালকা ও ঝুঁরা করিতে হইবে। লাঙ্গল দিবার সময় জমিতে গোয়াল ঝাঁট-দেওয়া আবজ'না, ছাই, গোবরসার যত বেশি দেওয়া যায় ততই ভাল। ঐসমস্ত আবজ'না ইত্যাদি লাঙ্গল দ্বারা মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাইতে হইবে। তাহার পর বিঘাপ্রতি ১ মণ সালফেট অব অ্যামোনিয়া, ২ মণ বাদামখইল-গুঁড়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া সমস্ত জমিতে ছিটাইয়া দিয়া পুনরায় লাঙ্গল দ্বারা মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাইতে হইবে। জমি তৈয়ার হইলে দুই ফুট অন্তর সারিতে ১ ফুট অন্তর ও ৪ ইঞ্চি গভীর করিয়া খুঁবি বা গর্ত কোদাল দ্বারা সোজা লাইন করিয়া কাটিতে হইবে। পরে প্রতি খুঁবিতে সামান্য পরিমাণে খইল-গুঁড়া ছিটাইয়া দিয়া পুনরায় উহা

কোদালের দ্বারা খুঁবির মাটির সহিত ভালরূপে মিশাইতে হইবে। উক্ত কার্য শেষ হইলে প্রতি খুঁবিতে সামান্য পরিমাণে জল ঢালিয়া, উহাতে এক-একটি কচুর ডেঁপি বা বীজ-কচু রোপণ করিতে হইবে। পরে সারির দুইদিকের মাটি কোদাল দ্বারা টানিয়া খুঁবিগুঁড়ি ভর্তি করিতে হইবে। কচু রোপণ করিবার এক সপ্তাহ পর হইতে সপ্তাহে দুইবার জল-ঝাপটা দিতে পারিলে তাড়াতাড়ি অঙ্কুর বাহির হইবে। কারণ ঐ সময় বৃষ্টিপাত খুব কমই হয়। মাটিতে যদি রস থাকে তাহা হইলে দশ-বারো দিন অন্তর জল-ঝাপটা দিলেও চলিতে পারে।

এক মাসের মধ্যে ঐসব রোপিত বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়া মাটি ভেদ করিয়া চারা দেখা দিবে। চারাগাছগুলি যখন ৮-১০ ইঞ্চি বড় হইবে, সেই সময় ঐসমস্ত চারাগাছের গোড়া হইতে সাবধানে কোদাল দ্বারা মাটি টানিয়া সারির মধ্যস্থলে রাখিতে হইবে। পরে ঐ চারাগাছগুলির গোড়ায় অল্প পরিমাণে খইল-গুঁড়া ছিটাইয়া দিয়া পুনরায় সারির মধ্যস্থলের মাটি চারাগাছগুলির গোড়ার দিকে এমনভাবে কোদাল দ্বারা টানিয়া দিতে হইবে যাহাতে চারাগাছগুলি মাত্র ২-৩ ইঞ্চি পরিমাণে মাটি হইতে বাহিরে থাকে। গাছের গোড়ার দিকে মাটি টানিয়া দিবার ফলে দুইটি সারির মধ্যস্থলে নালার সৃষ্টি হইবে এবং সেই নালার মাটিও সামান্য পরিমাণে কোদালের দ্বারা তুলিয়া গাছের গোড়ায় দিতে হইবে।

নালাগুলি খুব কমপক্ষে ১৩-১৪ ইঞ্চি গভীর হওয়া দরকার। যে সারিতে কচুগাছ থাকে তাহাকে 'দাঁড়া' বলে। ঐ 'দাঁড়া' প্রস্থে মোটা এবং নালা গভীর হওয়া দরকার। নালা গভীর না হইলে সেচের জল নালায় জমিতে পারিবে না। সেচ-কচুর নালায় ষথেষ্ট পরিমাণে জল না থাকিলে

গাছের পাতাগুলি কৌকড়াইয়া হলদে আভাষুস্ত হইবে এবং ফলনে ব্যাঘাত জন্মিবে। সেই কারণে কচুর 'দাঁড়া' সর্বদা ভিজা থাকা দরকার। এমন কি গ্রীষ্মকালে 'দাঁড়া'য় সেচের জল জমিয়া থাকিলেও ক্ষতি হইবে না।

ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত একদিন অন্তর সেচ দিতে পারিলে ভাল নয়। তবে ঐ সময়ে সপ্তাহে দুইবার সেচ দিতেই হইবে। বর্ষা আরম্ভ হইলে আর সেচের দরকার হয় না। কচুর জমিতে যদি ঘাস বা আগাছা জন্মায়, তাহা অবিলম্বে পরিষ্কার করিতে হইবে। নচেৎ গাছের ক্ষতি হয়। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন কচুর 'ব' (ইহা মোটা শিকড়ের ন্যায় রোপিত বীজের গাত্র হইতে আবেদন ন্যায় বাহির হয়) 'দাঁড়া' ভেদ করিয়া নালায় দিকে বাহির না হয়। কারণ ঐ 'ব' গুলিতেই কচুর গুটি ধরিলে। সুতরাং 'ব' মাটির বাহিরে আসিলে তাহাতে গুটি না ধরিয়া তাহা হইতে দাঁড়ার পাশ দিয়া চায়াগাছ দেখা দিবে। ইহাতে কচুর ফলন একেবারে কমিয়া যাইবে। অতএব 'ব' যাহাতে 'দাঁড়ার' বাহিরে না আসে সেইজন্য 'দাঁড়ার' গায়ে নালায় মাটি টানিয়া দিতে হয়। ইহাতে 'দাঁড়া' আরো মোটা হইবে।

প্রথমে যেসকল কচু-বীজ রোপণ করা হয়, সেইসব বীজই কালে মূলে পরিণত হয় এবং ঐ মূলের গাত্র হইতে 'ব' বাহির হইয়া তাহাতে গুটি ধরে। আষাঢ় মাসের শেষ হইতে কচুগাছগুলির পাতা সামান্য সামান্য শুষ্ক ও হরিদ্রাবর্ণ হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় বৃষ্টিতে হইবে উক্ত ফসল সংগ্রহের সময় আসিতেছে। শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি কচু তোলা হইয়া থাকে।

কচু চাষের সঙ্গে ঐ একই জমিতে আরও কিছু চাষ করা যায়। কচুর 'দাঁড়ার' গায়ে গায়ে পুঁইশাকের চারা লাগাইলে, সেই চারা 'দাঁড়ার' সার পাইয়া সতেজ ও অল্প দিনের মধ্যে তরকারির উপযোগী হয়। কচুক্ষেতের চতুর্দিকে ২ ফুট অন্তর ঢাউসের চারা

লাগাইলে তাহাতেও যথেষ্ট পরিমাণে ফল পাওয়া যায়। ঐ যে শাক-সবজির কথা বলা হইল উহা সেচ-কচুর ক্ষেত্রে লাগাইলে অসময়ে কাঁচা তরকারির অভাব দূর হয় আর হাট-বাজারে বিক্রয় করিলেও অধিক মূল্য পাওয়া যায়। আউশে কচুর ক্ষেত্রেও ঐ শাক-সবজি লাগানো যায় বটে, কিন্তু যখন ঐ-সকল শাক-সবজি খাদ্যের উপযোগী হয় তখন উহা বিক্রয়ে বিশেষ লাভ হয় না।

বর্ষাকালে পল্লীগামে সাধারণত কাঁচা তরকারির অভাব ঘটে। দেখা যায় সেই সময় কোন কোন চাষীভাই হাট-বাজারে বর্ধমানে' সেচ-কচুর আমদানি করেও অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া লাভবান হয়; তাহারা সেচ-কচুর চাষ করিয়া বর্ষাকালে কাঁচা তরকারির অভাব কিছু পরিমাণে লাঘব করে সত্য, কিন্তু বিঘাপ্রতি তাহাতে উৎপাদন হয় খুবই অল্প।

তাহারা সাবিক প্রথায় কচুচাষ করে; সুতরাং ফলনও সেই অনুপাতে পাইয়া থাকে। উত্তমরূপে আলু চাষ করিতে হইলে যে খরচ পড়ে তাহার অর্ধেক খরচে যদি কচু চাষ করা যায়, তাহা হইলে আলুচাষ অপেক্ষা কচুচাষে লাভ বেশি হইবে, সন্দেহ নাই।

পূর্বে বলিয়াছি, বর্ধমানে' কচুর চাষ যখন বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে করা হয় তখন উহাকে বর্ধমানে' আউশে কচু বলা হয়। দেশী কচুর চাষও ঐ সময়ে করিতে হয়। তবে দেশী কচুর ফলন বর্ধমানে' কচু অপেক্ষা অনেক কম আর উহার গুটিও ছোট ছোট। সেইজন্য দেশী কচুর চাষ করিতে কেহই ইচ্ছুক নহে। বর্ধমানে' আউশে কচুর চাষ করিতে সেচের আদৌ দরকার হয় না। কারণ ঐ কচু রোপণ করিবার পর হইতে প্রায় দেড় মাস মধ্যে চারা দেখা দেয় অপর ঐ সময়ের মধ্যে দুই-একবার বৃষ্টি হইলেই উহার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং সেচ-কচুর মত ঘন ঘন সেচ খরচ করিতে হয় না। পূর্বে পঙ্খিত অনুসারে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কচুবীজ রোপণ করিয়া আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে যদি ঐ জমিতে ঘাস কিংবা আগাছা

জন্মায়, তাহা পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। ইহার 'দাঁড়া' বেশি উঁচু না করিলেও চলে; তবে বর্ষার জল যাহাতে নিকাশ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। যদি বর্ষার জল ঐ কচুক্ষেতে আবদ্ধ থাকে তাহা হইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে।

ঐ আউশে কচু কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝির পর হইতে সংগ্রহ করিবার উপযুক্ত হয়। ফলন হয় প্রায় সেচ-কচুর সমান। তবে বিক্রয়মূল্য ঐ সময়ে কিছু কম থাকে। তাহার কারণ, ঐ সময়ে হাট-বাজারে মূলা, পালং, বেগুন ইত্যাদি শাক-সবজি যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে।

কচুর মূল কাঁচা তরকারি হিসাবে বাজারে বিক্রয় হয়। মূল ছাড়া এক বিঘা জমিতে ৬০ হইতে ৮০ মণ পর্যন্ত ডেঁপ-কচু পাওয়া যায়। কাঁচা তরকারি

হিসাবে কচু বিক্রয় না করিয়া যদি বীজ কচু হিসাবে বিক্রয় করিতে পারা যায়, তাহা হইলে উহা প্রতি মণ ২০ টাকা হইতে ৩০ টাকা পর্যন্ত দরে বিক্রয় হয়। গাছ শুকাইয়া গেলে যে কচু তোলা হয় তাহাই বীজ-কচু হিসাবে বিক্রয় হইবে। হিসাব করিয়া দেখিলে বৃদ্ধা যায়, আলু অপেক্ষা কচু চাষে অনেক বেশি লাভ থাকে। আরও একটি কথা এই যে, ভালভাবে বেড়ার আগল না দিলে ছাগল-গোরুতে ফসল প্রায় নষ্ট করিয়া দেয়, কিন্তু কচুচাষে কোন বেড়ার দরকার হয় না। ইহার গাছ ছাগল-গোরুর অভক্ষ্য।

কচু সাধারণত রক্তপরিষ্কারক ও পেটের পীড়ায় হিতকারী। কাঁচা তরকারি হিসাবে কচুর স্থান আলুর পরেই বলিলেও অতুক্তি হয় না।



‘বেয়ার’এর পোকা ও রোগ দমনের ঔষধগুলির
দ্বারা আপনাদের ফসল রক্ষা করুন

ফলিডল-ই ৬০৫

মেটাসিস্টক্স

সেরেসান

অ্যাগালল

কুপ্রাভিট (ওবি ২১)

এইগুলি পশ্চিম জার্মানীর লিভারকুসেনের

ফারবেনফ্যাবরিকেন বেয়ার

দ্বারা প্রস্তুত আসল ঔষধ।

ভারতে পরিবেশক

চিকা প্রাইভেট লিমিটেড,

৩১, চিত্তরঞ্জন এডেনিউ, কলিকাতা-১২



টুকিটাকি

ধান্য উৎপাদনে প্রথম পুরস্কার

১৭ই ফেব্রুয়ারি (১৯৫৮) রাজ্যের শস্য-উৎপাদন প্রতিযোগিতা কর্মিটির অধিবেশন হয়েছে এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে অনুষ্ঠিত ধান্য-উৎপাদন প্রতিযোগিতার ফল পরীক্ষা করে নিম্নোক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

বাঁকুড়া জেলার মাগুরিয়া ডাকঘর এলাকার আগদুন-কুমারী গ্রামের শ্রীসত্যপদ খাঁকে প্রতি একরে ৭২ মণ ২০ সের ধান্য উৎপাদন করার জন্য প্রথম পুরস্কার ১,০০০ টাকা দেওয়া হবে; বীরভূম জেলার বিপ্রটুকুড়ি ডাকঘর এলাকার রানতাড়া গ্রামের শ্রীসত্যনারায়ণ চক্রবর্তীকে প্রতি একরে ৭২ মণ ১৬ সের ধান্য উৎপাদনের জন্য ৭৫০ টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া হবে এবং জলপাইগুড়ি জেলার বাগডোগরা ডাকঘর এলাকার গাসাইপুর গ্রামের শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষকে প্রতি একরে ৭১ মণ ৮ সের ধান্য উৎপাদনের জন্য তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হবে।

পরে রাজ্যপাল এই পুরস্কারগুলি বিতরণ করবেন।

মেকালিগঞ্জের গ্রামে প্রদর্শনী

মেকালিগঞ্জ মহকুমার চাংডাবান্ধায় ২০এ জানুয়ারি (১৯৫৮) কোচবিহারের উপ-মহাধ্যক্ষ একটি কৃষি শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্বেদন করেন। অন্যান্য সরকারী বিভাগের সহযোগিতায় স্থানীয় জাতীয় সম্প্রসারণ কৃত্যক রকের উদ্যোগে এর অনুষ্ঠান হয়। সম্মুখভাগে লোকসংগীতের ব্যবস্থা হয়েছিল। ঠিক করা হয়েছে যে, কৃত্তী কৃষি-প্রদর্শকদের ১০টি এবং কুটিরশিল্প-দ্রব্যের প্রদর্শকদের ৫টি পুরস্কার দেওয়া হবে।

পূর্বদিল্লিয়ায় জল-সরবরাহ ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার চলতি আর্থিক বৎসরে পূর্বদিল্লিয়া জেলার তফসিলী জাতি ও তফসিলী

আদিবাসী জনগণের কল্যাণার্থে জল-সরবরাহ পরিকল্পনা কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে পূর্বদিল্লিয়ার উপ-মহাধ্যক্ষের হাতে প্রদানের জন্য ৫৭,৬০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন। ঐ মোট অর্থের মধ্যে জেলার তফসিলী জনগণের বসত অঞ্চলে ১৭টি কূপ খননের জন্য ৩০,৬০০ টাকা এবং জেলার আদিবাসী এলাকায় ১৫টি কূপ খননের জন্য ২৭,০০০ টাকা ব্যয় করা হবে।

পূর্বদিল্লিয়ায় কৃষি-পরিকল্পনাসমূহের জন্য অনুদান

পূর্বদিল্লিয়া জেলায় তপসিলভুক্ত উপজাতিসমূহের কল্যাণার্থে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার উপজাতীয় পরিবারগুলিকে অপর উপজীবিকা অবলম্বনে উৎসাহ দানের জন্য তাঁদের মধ্যে হাঁস-মুরগি, ছাগল-ভেড়া ও শূকর বিতরণ এবং তাঁদের বাস্তুজমিতে শাক-সবজি তথা ফলমূল উৎপাদনে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে তাঁদের মধ্যে কলম ও চারা প্রভৃতি বিতরণ বাবত চলতি আর্থিক বর্ষে ৫,৫৩৫ টাকার এক অনুদান মঞ্জুর করেছেন।

উপজাতি এলাকায় জল-সরবরাহ

রাজ্যের উপজাতি-এলাকায় কেন্দ্র-পৃষ্ঠপোষিত জল-সরবরাহ পরিকল্পনার কার্যনির্বাহের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা-আধিকারিকদের হাতে দেওয়ার নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গ-সরকার চলতি আর্থিক বৎসরে ১৮,৮২৪ টাকা মঞ্জুর করেছেন। জেলা অনুসারে এই অর্থের বরাদ্দ নিম্নরূপঃ

দার্জিলিং—এই জেলার সদর মহকুমায় একটি পাইপ লাইন নির্মাণের জন্য ১৫,৮২৪ টাকা।

মালদহ—হাবিবপুর, বামনগোলা অথবা গাজোল থানায় একটি “আর সি সি” কূপ খননের জন্য ২,৫০০ টাকা।

নদিয়া—নাকাসিপাড়া থানায় একটি নলকূপ বসানোর জন্য ৫০০ টাকা।

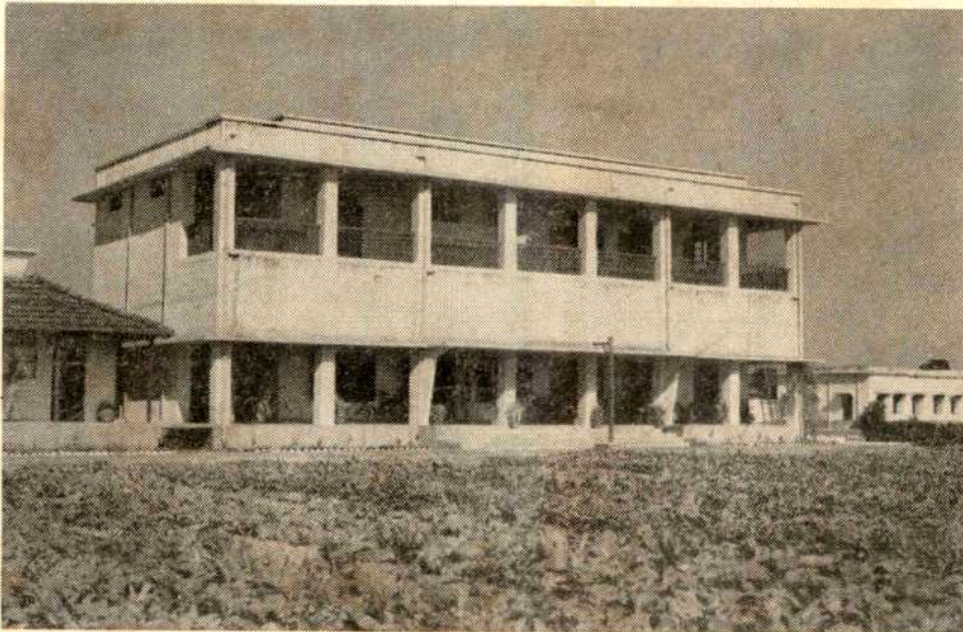
সম্পাদক : শ্রীপ্রকাশম্বরূপ মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা।

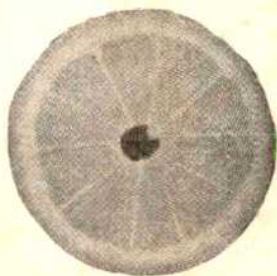
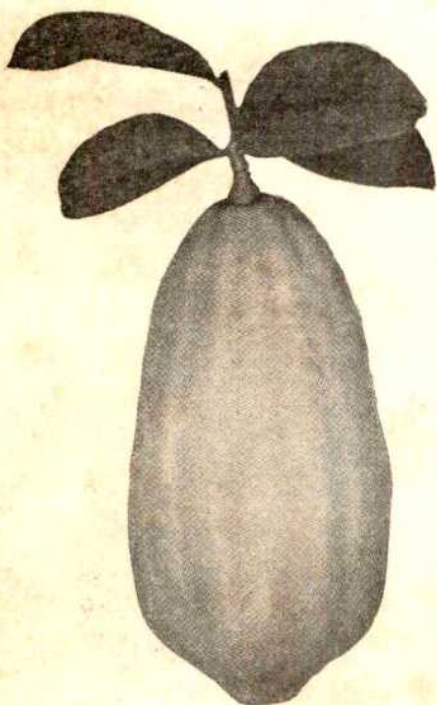
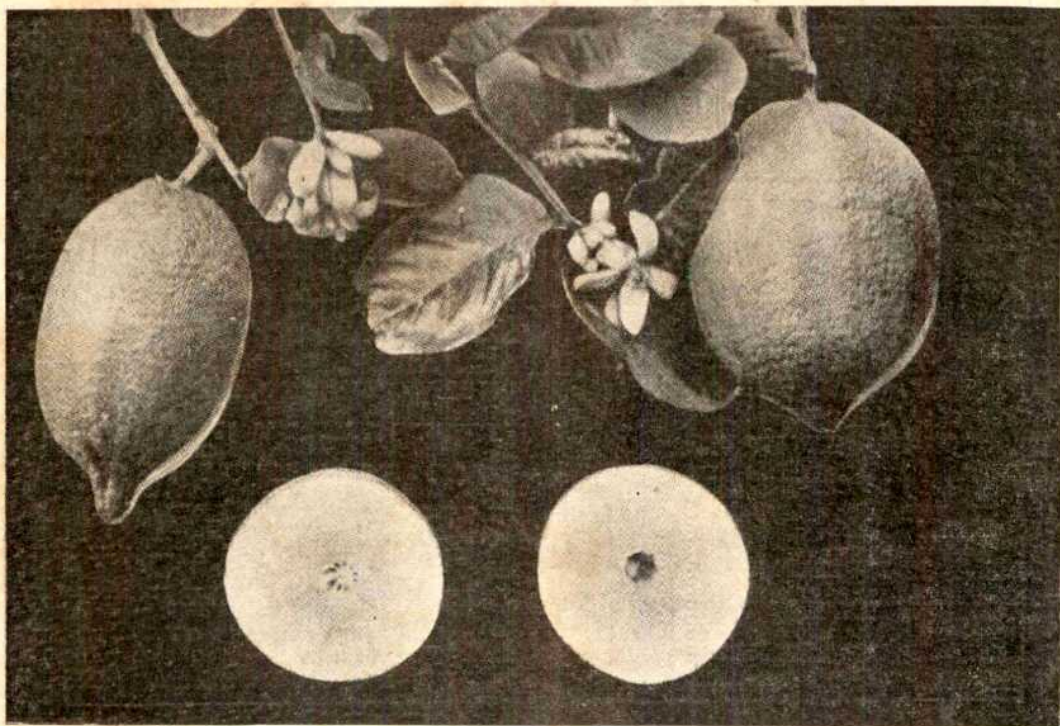
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মন্ত্রণে

অধীক্ষক শ্রীশুভেন্দ্র মৃণোপাধ্যায় কর্তৃক মন্ত্রিত



চুঁড়ার সরকারী কৃষিকেন্দ্র : [উপরে] ধাতু গবেষণা-ভবন,
[নিচে] কৃষিবিভাগীয়





অগন্ধ লেবু



বন্ধুত্ব

১০ম বর্ষ : ১২শ সংখ্যা

চৈত্র, ১৩৬৪

(১৮৭৯-৮০ শকাব্দ)

প্রসঙ্গ

যা আয় তাই যদি ব্যয় হয়ে যায়, তা হ'লে কোন মানুষেরই চলে না। সকলেরই কিছু সঞ্চয় করা প্রয়োজন। বর্তমানটাই সব নয়, ভবিষ্যৎ আছে। বর্তমানটা বরং প্রত্যক্ষ, ভবিষ্যৎটা অন্ধকারের গর্ভে। সঞ্চয়ের প্রয়োজন ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করবার জন্য।

বৃদ্ধিমান লোকে বর্তমানে একটু কষ্ট করে হ'লেও ভবিষ্যতের জন্য যথাসাধ্য কিছু সঞ্চয় করে আসছেন চিরকালই। আগেকার দিনে যখন সঞ্চয়ের কোন সুব্যবস্থা ছিল না, তখন লোকে মাটির তলায় টাকা পুতে রাখত। গয়না করার গোণ উদ্দেশ্য অঙ্গ সজ্জিত করা, মুখ্য উদ্দেশ্য সঞ্চয় করা। লক্ষ্মীর ভাঁড়ে সুবিধামত সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু টাকা-পয়সা রেখে দেওয়া স্বল্প-সঞ্চয়ের একটা উপায়।

গয়না করা, লক্ষ্মীর ভাঁড়ে টাকা-পয়সা রাখা, এসব এখনও চলছে। কিন্তু সঞ্চয়ের এসব উপায় একেবারেই নিরাপদ নয়। গয়না চুরি গিয়ে লোককে সর্বস্বান্ত করতে তো প্রায়ই দেখা যায়। গয়না অনেক সময় বাড়িতে ডাকাত ডাকে। গয়নার মাধ্যমে সঞ্চয় করার আরও একটা করুণ দিকও অনেক সময় দেখা যায়। কোন স্বামী নিজের জীবনের দীর্ঘকাল ধরে, অনেক কষ্ট করে, নিজেকে অনেক দিক দিয়ে বশীভূত করে, সংসার-খরচ থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে, ক্রমে ক্রমে স্ত্রীর অঙ্গে বেশ কয়েক ভরি সোনার গয়না তুলে রেখেছেন—ভবিষ্যতের জন্য; তারপর একদিন বিপদ যখন দেখা দিল, অর্থের প্রয়োজন হ'ল মর্মান্তিকভাবে, তখন দেখা গেল যে, স্ত্রী তাঁর অঙ্গ থেকে একখানিও

গয়না খুলতে রাজি নন—বরং তিনি সেই গয়নার সম্বলে স্বামীকে ছেড়ে যেতেও রাজি। লক্ষ্মীর ভাঁড়ারে সঞ্চিত সামান্য অর্থ অনেক সময় বর্তমানের প্রয়োজন মেটাতেই বেরিয়ে যায় চোখের জলের পিছল পথে, ভবিষ্যতের জন্য থাকে না।

আজকাল 'সেভিংস ব্যাংক' প্রভৃতি প্রথায় অর্থ-সঞ্চয়ের পথ সুগম হয়েছে। সঞ্চিত অর্থ এতে গয়নার গুনাগারি বা চোর-ডাকাতের কবল থেকে নিরাপদ থাকে, তার উপর সেই টাকার একটা সুদও পাওয়া যায়—তা যত সামান্যই হোক। যেমন তেমন প্রয়োজনে যখন তখনই যদি ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নেওয়া না হয়, তবে পরিণামে সুদের দরুন আয়ের অস্কাটা বড় হয়েই দেখা দিতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ লোকের বেলাই দেখা যায়, ওই যখন তখন টাকা তোলাটাই ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং ব্যাংকে অর্থটা স্থিতিলাভ করবার সুযোগ পায় না ব'লে, সুদের কড়িও প্রায় চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। তার পরে, ব্যাংক ফেল পড়ার নিজের কম নয়। সঞ্চয়কারীর পক্ষে সেটা মারাত্মক বিভীষিকা।

তা হ'লে ভবিষ্যতের জন্য নিরাপদভাবে কিছু সঞ্চয় করা যায় কী উপায়ে? সক্রিয়ভাবেই এ সমস্যার সমাধান করেছেন আমাদের দেশের সরকার। জনসাধারণের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ হচ্ছে সঞ্চয়ের অর্থ সরকারের কাছে গচ্ছিত রাখা। আমাদের দেশের সাধারণ লোক দরিদ্র, একসঙ্গে বেশি অর্থ সঞ্চয় করার ক্ষমতা এদেশে খুব কম লোকেরই আছে। মাসে মাসে কিছু কিছু করে তুলে রেখে

বছরের শেষে একটা মোটা অঙ্কের অর্থ জমা করার চেষ্টা করলে, দরিদ্রের সংসারে শেষ পর্যন্ত জমার ঘর শুনাই থেকে যাবে। তাই সরকার এমন ব্যবস্থা করেছেন যে, যখনই সুযোগ হবে তখনই অতি সামান্য পরিমাণ অর্থও জাতীয় সঞ্চয়-ভান্ডারে জমা রাখা চলবে। একে বলা হয় সরকারের “স্বল্প-সঞ্চয়” ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা শূন্য শহর-অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়, ডাকঘরের মারফত দেশের পল্লীতে-পল্লীতেও এ ব্যবস্থার সুযোগ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সুযোগ নিয়ে অর্থ সঞ্চয় করলে সুদও পাওয়া যায় বেশি। জনসাধারণের স্বল্প সঞ্চয়ের জন্য এসব ব্যবস্থা সরকার করেছেন: (১) পোস্ট অফিস—১২ বছরের জাতীয় পরিকল্পনা সঞ্চয় সার্টিফিকেট—সুদ বার্ষিক শতকরা ৪.৪১ টাকা, (২) পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিট—সুদ বার্ষিক শতকরা ২.৫০ টাকা, (৩) ১০ বৎসরের ট্রেজারি সেভিংস ডিপোজিট—সুদ বার্ষিক শতকরা ৪ টাকা, (৪) ১৫ বছরের অ্যানুইটি সার্টিফিকেট—সুদ বার্ষিক শতকরা ৪.২৫ টাকা। সব রকম সঞ্চয়ের জন্যই ভারত-সরকার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেন। সঞ্চিত অর্থের উপর সম্পত্তি-কণ দিতে হয় না এবং সুদের উপর আয়কর দিতে হয় না। ১ম ও ৩য় ব্যবস্থা অনুযায়ী সঞ্চিত অর্থ থেকে দরকারমত ধারণও নেওয়া যেতে পারে। ডাকঘরে এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ জানতে পারা যাবে।

ভারতের এই জাতীয় সঞ্চয় ভান্ডারে যে অর্থ সঞ্চয় করা হয়, সেটা খাটানো হয় আমাদের দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোকে ঠিকভাবে কার্যকরী করার জন্য। দেশ জুড়ে আজ উন্নয়নের কাজ চলছে দেশের জনসাধারণেরই কল্যাণের নিমিত্ত। সুতরাং

এই সঞ্চয়ের দ্বারা জনসাধারণ দু' দিক দিয়ে উপকৃত হন।

বাস্তবিক, দেশের জনসাধারণ যদি নিজেদের কল্যাণবোধে সচেতন হয়ে জাতীয় সঞ্চয় ভান্ডারে সামান্য অর্থও সঞ্চয় করেন তা হলে সেই অর্থই আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয় সংকুলান হয়ে যেতে পারে। কী করে, তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫৭ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। এ রাজ্যের জনসংখ্যা ৩ কোটি। প্রতিটি লোক যদি মাসে একটি করেও টাকা সঞ্চয় করে, তা হলে বছরে জমা হয় ৩৬ কোটি টাকা এবং পাঁচ বছরে ১৮০ কোটি টাকা! প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ রাজ্যের ব্যয় বরাদ্দ হয়েছিল ৬৯ কোটি টাকা, কিন্তু জনসাধারণের সহযোগিতার ফলে তার জায়গায় সরকারের পক্ষে ৭১ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে।

দেশবাসী বলতে অবশ্য শিশু, নারী প্রভৃতি এমন লোকের সংখ্যাই বেশি যারা কিছু আয় করে না, তাই সঞ্চয় করতেও অক্ষম। কিন্তু আমাদের পরিবার ধরা হয় পাঁচ জন লোক নিয়ে। গড়ে প্রতিটি পরিবারের পক্ষে মাসে পাঁচটি টাকা সঞ্চয় করা খুব বড় কথা নয়। কোন পরিবার হয়তো মাসে কিছু বেশি জমা করতে পারে, আবার কোন পরিবার কিছু কম জমা করতে পারে। আজকের দিনে কিছু কষ্ট করেও সাংসারিক খরচ থেকে বাঁচিয়ে যথাসাধ্য ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার দৃঢ় সংকল্প যদি থাকে, তবে গড়পড়তা কিছু-না-কিছু সঞ্চয় সকলেই করতে পারেন। সেই সঞ্চয় ব্যক্তিগত আর জাতিগত দুই দিক দিয়েই কল্যাণকর।

সমবায় পদ্ধতিতে

কৃষির উন্নয়ন

অীরাধারমণ গোস্বামী

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের সমবায় কৃষির সহকারী নিবন্ধক

আজ আমাদের দেশ গুরুতর খাদ্যসংকটের সম্মুখীন। একে তো দেশে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য নেই, তার উপর প্রত্যেক বৎসর দেশে ৪০ লক্ষের মত লোক বেড়ে যাচ্ছে। ম্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নতুন নতুন যেসব কলকারখানা গড়ে উঠছে তার জন্য প্রয়োজন বেশি পরিমাণে কাঁচামাল—আরও ধান, আরও পাট, আরও তুলো।

সঙ্গে রয়েছে আর-এক সমস্যা। অন্তহীন স্রোতের মত দেশের পূর্বসীমান্ত দিয়ে দলে দলে উম্বাস্তু এসে ভিড় করছে—তাদেরও মুখে অন্ন যোগাতে হবে। কাজেই তো সারা দেশ জুড়ে খাদ্যের অনটনের কথাটা এমন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

আমাদের পশ্চিম বাঙলার খাদ্যসমস্যা আরও ব্যাপক, আরও জটিল। দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ধান-পাট-ফলানো জেলাগুলো হাতছাড়া হয়ে গেল, অথচ শূরু হ'ল অবিচ্ছিন্ন ধারায় উম্বাস্তুদের আগমন। এদিকে স্বাভাবিক হারে জনসংখ্যা বাড়ছে; তা ছাড়া কলকারখানার জন্য বাড়তি কাঁচামালের চাহিদা তো আছেই। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, জনসংখ্যা কৃষকপ্রধান। শতকরা ৫৯ জন বাস করে গ্রামে আর জীবিকার জন্য শতকরা প্রায় ৭৫ জন নির্ভর করে রয়েছে কৃষি ও তার আনুষঙ্গিক কাজে।

এ সমস্যার সমাধান কোথায়? চিরকাল তো বাইরে থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। তাতে প্রচুর অর্থের অপব্যয়—যা বাঁচলে আয়ও বেশি করে দরকারী

যন্ত্রপাতি কলকব্জা মালমসলা কিনে এনে দেশে কলকারখানা বসিয়ে আর্থনীরতিক উন্নীতকে ত্বরান্বিত করা যায়। চিরকাল ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ক্ষুধার অম্লের জন্য বিদেশের দুয়ারে দুয়ারে ধনী দিয়ে বেড়ালে জাতীয় মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়, আর তাতে দেশের শক্তির বিকাশ কোন দিনই হয় না, দুর্বলতা কায়মী হয়ে বসে।

তা হ'লে সমাধান? সমাধানের উপায় রয়েছে আমাদেরই মধ্যে। সমস্ত শক্তি কাজে লাগিয়ে বেশি করে ফসল ফলাতে হবে। শূরু ধান-গম-বাজারায়, বেশি পরিমাণে পাট, তুলো, তামাক। শূরু খাদ্যশস্য নয়, অর্থকরী ফসলও—যা কলকারখানার কাঁচামাল যোগাবে, যা রপ্তানি করে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা যাবে। কাজেই আজ একমাত্র সমাধান—কৃষিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করানো। আজও আমাদের চাষ-আবাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় কৃষিকাজে আমরা অনেক পেছনে পড়ে আছি। বিদেশে যখন বিঘাপ্রতি ২৫ মণ গম ফলছে, আমরা তখন ৮-১০ মণ ফলিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে বসে বসে ভাবছি, যথেষ্ট পাওয়া গেল! বিদেশে যখন একটা গোরু থেকে দৈনিক ১৫-২০ সের দুধ পাওয়া যাচ্ছে, আমরা তখন আমাদের একটা গোরু ৪-৫ সের দুধ দিলে আহ্লাদে আটখানা!

এই নিশ্চিন্ত আরাম আর সহজ তৃষ্টি আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। এই শত্রুকে নির্মূল করে চাষ-আবাদের কাজে আরও যত্ন করতে হবে, আরও মনোযোগ দিতে হবে আমাদের। আজ দেশের উন্নতির

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ১২শ সংখ্যা

ভিত্তিই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর চাষ-আবাদ। সোজা কথায়, জমিতে অনেক বেশি পরিমাণ ফসল ফলাতে হবে। ৮-১০ মণে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না, উন্নত দেশগুলোর মত আমাদেরও এক বিঘা জমি থেকে ২৫-৩০ মণ ধান তুলতে হবে। তা নইলে অভাব কোন দিনই ঘুচবে না, দেশের উন্নতিও যাবে পিছিয়ে।

এখন, কী উপায়ে কৃষিকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উপর দাঁড় করানো যায়, আমরা সে-আলোচনা করব। সংক্ষেপে পশ্চিম বাঙলার পটভূমিকার একটু আলোচনা করা যাক। এখানে আবাদী জমির পরিমাণ ১ কোটি ১৭ লক্ষ একর আর আবাদযোগ্য পতিত জমি রয়েছে ১১ লক্ষ একর—সাকুল্যে হ'ল ১ কোটি ২৮ লক্ষ একর। এর বেশির ভাগ জমিতেই হয় ধানের চাষ—৯৮ লক্ষ একরে। ১৮ লক্ষ ৮২ হাজার চাষী-পরিবারের মধ্যে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার পরিবারের প্রতিটির জমির পরিমাণ ৯ বিঘার নিচে—যা থেকে বর্তমান ব্যবস্থার চাষে তাদেরই বছরের খোরাক ওঠে না—দেশের অন্য সব লোককে খাওয়ানো তো দূরের কথা। শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ জমিরই এরকম অসচ্ছল অবস্থা। তার উপর রয়েছে ভূমিহীন চাষী আর ভাগচাষীদের বিরাট সংখ্যা। জমিগুলো টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়ানো, চাষীরা সম্বলহীন, পুঁজিহীন। পুরানো ধারার চাষে ক্ষুধার অন্নই সম্পূর্ণ জোটে না—মূলধন জমবে কোথা থেকে? আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীর চাষ-আবাদের শিক্ষা থেকেও চাষীরা বঞ্চিত। কাজেই আমাদের কৃষির এই দুর্দশা, আমাদের চাষীদের এই দৈন্য। বড় লজ্জার কথা যে, আমাদের জমি থেকে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য আমরা তুলতে পারি না। বছরে ঘাটতি পড়ে প্রায় দুই লক্ষ টন ধানের!

পটভূমির এই আলোচনা থেকে এ কথাটা এখন পরিষ্কার হবে যে, আমাদের পুঁজি ও সম্বল যখন সীমাবদ্ধ, বৈজ্ঞানিক চাষের শিক্ষা যখন চাষীদের

নেই, তখন দেশে উন্নত ধরনের কৃষির প্রবর্তন করতে গেলে, জমি থেকে বেশি ফসল তুলতে হ'লে একমাত্র সহজ পথ হচ্ছে সমবায়-পদ্ধতি। রাশিয়া, চীন, ইস্রায়েল, মেক্সিকো—বাইরের এসব দেশে সমবায়-প্রণালীর চাষে অপরিমেয় উন্নতি হয়েছে। অবশ্য আমেরিকা বা ইউরোপের কোন কোন দেশে একক চাষী-পরিবারের বিরাট বিরাট খামার আছে—এক-একটা খামার আয়তনে ৫০০ থেকে ৫,০০০ বিঘার মত। সেখানে চাষীর আছে পর্যাপ্ত পুঁজি, উপযুক্ত শিক্ষা, কাজেই সেসব খামারে একক চাষেই তারা ফলাচ্ছে প্রয়োজনের অনেক বেশি ফসল। কিন্তু আমাদের দেশে জন-সংখ্যার অনুপাতে অত জমি কোথায়? এখানে প্রতি বর্গমাইলে বাস করে ৮০৬ জন লোক। আর, আগেই বলেছি, বেশির ভাগ চাষী-পরিবারের হাতে যে জমি আছে তার পরিমাণ ৯ বিঘারও কম। এখানে একক চাষ করে চাষের ও চাষীর উন্নতি করা শুধু স্বপ্নবিলাস নয়, বাতুলের কল্পনা।

উন্নত ধরনের চাষের সঙ্গে কতগুলো ব্যাপার অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িত, যেমন—সেচ-ব্যবস্থা, স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী অর্থ-দাদন, উন্নত জাতের বীজ, সার-প্রয়োগ, হাল-গোরু ও যন্ত্রপাতি, ভূমি-সংরক্ষণের ব্যবস্থা, ফসল-বিক্রির ব্যবস্থা, রাস্তা-ঘাট, গুদাম প্রভৃতি। একা আমাদের কোন চাষীর পক্ষে এর কোনটার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা কি সম্ভব? মোটেই নয়। কাজেই, পথ হচ্ছে সমবায় কৃষি-সমিতি গড়ে তুলে, সমস্ত চাষীর একজোট বেঁধে চাষের কাজে নামা। যেখানে একজনের পুঁজি সামান্য, শক্তি সীমাবদ্ধ, সেখানে দশজনের মিলিত পুঁজির দাম অনেক, শক্তি-সম্ভাবনা অনেক বেশি। বোঝাপড়ার ভেতর দিয়ে সমবায় কৃষি-সমিতি গড়ে একজোট হ'লে, টুকরো টুকরো জমি আলাদা আলাদাভাবে চাষ করার ঝামেলা থেকে চাষীরা বাঁচবে। আলাদা করে গোরু-লাঙল রাখার ঝকমারি থাকবে না। সময় ও পরিসর বাঁচবে। উৎপাদনের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকবে। কৃষির উন্নত

বৈজ্ঞানিক প্রথা ও গবেষণার ফলাফল জানবার ও শিক্ষা করার উপায় হবে। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, টুকরো টুকরো জমি চাষ করার চাইতে বিস্তীর্ণ এলাকা একসঙ্গে চাষ করা অনেক লাভজনক।

সমবায় কৃষি-ব্যবস্থায় জমি মালিকদের অধিকারেই থাকতে পারে। তাঁরা নিজেদের জমি একসাথ ক'রে পরস্পরের সাহায্যে চাষ করতে পারেন। যাঁরা চাষের কাজে যোগ দেবেন, উৎপন্ন ফসল তাঁদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট হারে ভাগ ক'রে দেওয়া হবে, সঙ্গে সঙ্গে জমির মালিককে তাঁর মালিকানা বাবত ফসলের একটা অংশ দেওয়া যাবে। এই ব্যবস্থার সুবিধা এই যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফলন হ'লে, সেই বাড়তি ফসল চাষী-সদস্যদের গোলাতেই উঠবে, আর জমির প্রতি তাঁদের টান আরও বাড়বে, জমিকে তাঁরা আরও বেশি যত্ন করতে শিখবেন।

সমবায় কৃষিকার্যের আর-এক রকম রূপ দেখা যায়। এ ধরনের কৃষি-সমিতির প্রচলন রাশিয়া, চীন ও ইস্রায়েলে খুব ব্যাপকভাবে হয়েছে। এ রকম সমিতির যাঁরা সদস্য, সেসব চাষী নিজেদের জমি সব হস্তান্তর ক'রে দেন সমিতির নামে। সমস্ত আইল ভেঙে দিয়ে প্রয়োজন-অনুযায়ী জমি-গুলো জোড়া দিয়ে বা আলাদা ক'রে বড় বড় খামারে পরিণত করা হয়। তার কোনটাতে হয় গম, কোনটাতে তামাক, কোনটাতে পশু-খাদ্য ফসলের চাষ। পরিকল্পনা-অনুযায়ী সমস্ত সদস্য মিলে যৌথভাবে চাষ করেন, দরকার হ'লে বাইরের মানুষ নেওয়া হয়। সমবায় চাষের ফসল উঠলে, সমস্ত খরচা বাদ দিয়ে যা বাঁচে, তা হারাহারি ভাগ ক'রে দেওয়া হয় সদস্যদের মধ্যে। একা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যে-চাষীরা পুঁজিহীন, শক্তিহীন, এই সমবায় কৃষি-সমিতির সদস্য হয়ে তাঁরাই হয়ে ওঠেন শক্তিশালী; ভরসা আসে তাঁদের প্রাণে। কৃষির উন্নতি হয়—সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের অবস্থারও।

এতে যে সদস্যদের কাজের স্বাধীনতা কমে যাবে এমন আশঙ্কা অমূলক। সদস্যেরা নিজেরাই

সমিতির পরিচালনা করবেন তাঁদের কার্যনির্বাহক সমিতির মারফত। দেশের সরকারও তাতে হস্তক্ষেপ করতে আসবেন না, বাইরের কোন স্বার্থান্বেষী দালালেরও হাত থাকবে না কিছ্।

কিন্তু, তা সত্ত্বেও সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া সমবায়-কৃষি আশানুরূপ ফললাভ করতে পারবে না। কৃষির ব্যাপক উন্নতি করতে হ'লে এমন-সব পরিকল্পনা করা দরকার যা কার্যকরী করা কৃষকদের সমবেত শক্তির পক্ষেও অসম্ভব। সরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। শ্রিতীয় মহাযুদ্ধ থেমে যাবার আগে থেকেই সরকার এই সমবায়-কৃষি সম্বন্ধে চিন্তা ক'রে আসছেন। সে সময়ে 'খারেগাট কমিটি' ও উড্‌হেড কমিটির সুপারিশ পাওয়া গিয়েছিল। যুদ্ধের পরে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় হাতেকলমে কাজ আরম্ভ হয়। শ্রিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ-সরকার সমবায়-দফতরের মাধ্যমে সমবায়-কৃষির এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। যে-কোনও সাতজন বা তার বেশি রায়ত মিলে সমবায় কৃষি-সমিতি গড়ে তুলে যৌথ বা সমবেত চাষের ব্যবস্থা করতে পারেন। সমিতি-পরিচালনার খরচ বাবত প্রতি বৎসর নির্ভরযোগ্য সমিতিগুলো সরকারের কাছ থেকে খয়রাত সাহায্য পাবে। তা ছাড়া স্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা আছে। ফসল-বিপণন এবং বিনামূল্যে সরকারী বিশেষজ্ঞের পরামর্শ পাবার ব্যবস্থাও আছে। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কার আইন যখন আমলে আসবে, তখন সমবায় কৃষি-সমিতিগুলো আরও কতকগুলো সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হবে, যেমন—অল্প হারে ভূমি-রাজস্ব বা খাজনা, প্রথম তিন বছর বিনামূল্যে ও তারপরে কম মূল্যে বাঁজ, আর্থিক সুবিধা, আরও বেশি ক'রে ও বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞের উপদেশ ও ফসল-বিক্রির ব্যাপকতর সুবিধা।

তাই এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সারা দেশ জুড়ে সহযোগিতার আবহাওয়া, সমবেত চেষ্টার

মনোভাব। চাষীদের নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ক'রে নিয়ে আন্তরিকতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। আর শুধু সরকারের মুখ চেয়ে নিজেরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। সমবায় কৃষি-ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলনের জন্য সরকারের সশ্রমেও সহযোগিতা করতে হবে কৃষকসমাজকে। এই জাতীয় পরিকল্পনায় কৃষকদের স্বার্থহানির তো কোন আশঙ্কা নেই, কারণ মূল লক্ষ্য নিয়ে তো কোথাও কোন বিরোধ নেই। এর মূল লক্ষ্য হবে অধিক উৎপাদন। জমি থেকে আরও ফসল তোলা—আরও ধান, আরও পাট, আরও তুলো। বাড়তি উৎপাদন ছাড়া আমাদের বাঁচবার আর দ্বিতীয় পথ নেই। জমির পরিমাণ তো আর ইচ্ছামত বাড়ানো যায় না। কাজেই যেটুকু জমি আছে তাকেই বৈজ্ঞানিক প্রণালী চাষে লাগাতে হবে, আর, আমাদের এই দরিদ্র দেশে তা সম্ভব হবে যদি সরকারী সাহায্যে আমাদের কৃষকেরা সমবায় কৃষি-সমিতি গড়ে তুলে কাজে হাত দেন। কোন দেশে জমিকে

হেলাফেলা করার অধিকার কারও নেই—না কৃষকদের, না সরকারের। যে-জমি মূখের অল্প যত্নে বাঁচিয়ে রাখে, তাকে অবহেলা করলে তার প্রতিশোধ আসে মারাত্মক হয়ে। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক জাতির এ রকম মূখতার জন্য প্রচণ্ড মার খেয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার নজির আছে। আমরা যেন তেমন ভুল না করি। জমিকে ঠিকমত কাজে লাগানো, বাড়তি ফসল ফলানো আজ আমাদের নৈতিক দায়িত্ব, গুরুভার দায়িত্ব। সেই পবিত্র দায়িত্বের বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সচেতন হতে হবে।

আমাদের ভয় কী? আমরা চাষীরা সম্বলহীন হতে পারি, একা একা প্রত্যেকে শক্তিহীন হতে পারি, কিন্তু সমবায় কৃষি-সমিতি আমাদের সম্বল যোগাবে, শক্তিহীনকে শক্তিমান করবে। আজ আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে—জমিতে আরও অনেক বেশি উৎপাদন আর চাষীদের চিরন্তন অভাব-মোচন।*

*কলিকাতাকেন্দ্র আকাশবাণীর সৌজন্যে



পশ্চিমবঙ্গ জলবিদ্যুৎ সংগতি

—জলচাকা পরিকল্পনা

ডাঃ মনোব্রজব দত্ত

সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার,

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আমাদের প্রায় সকলেরই কিছু-না-কিছু জ্ঞান আছে। বিদ্যুৎকে চোখে দেখা যায় না, এ একরকম শক্তি। যেখানে কয়লা পাওয়া যায়, সেখানে কয়লা পুড়িয়ে বাষ্প দিয়ে ইঞ্জিন চালিয়ে এই শক্তি উৎপাদন করা হয় ও চারদিকে এই শক্তিকে চালনা করা সম্ভব হয়। আর একটা উপায়েও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা সম্ভব। যেসব জায়গায় কয়লা পাওয়া যায় না অথচ ছোট-বড় নদী বর্তমান, সেখানে নদীর জলের স্রোতের শক্তি দিয়ে ইঞ্জিন চালানো যেতে পারে, আর এই উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করাও সম্ভব হচ্ছে।

ভারতের বৃহৎ অনেক নদী বয়ে যাচ্ছে, তবে এগুলির দ্বারা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ তেমন হয় নি। মোটামুটি দক্ষিণ ভারতেই জলবিদ্যুতের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ১৮৯৭-৯৮ সালে দার্জিলিংয়ে স্থাপিত প্রথম জল-বিদ্যুৎ-কেন্দ্র পথপ্রদর্শক হ'লেও, এতদিনে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সেখানে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কাজ হয় নি। এর কারণ দুইটিঃ প্রথমত, এখানে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপনের ব্যয় অধিক, দ্বিতীয়ত, এখানে কয়লার খনি প্রচুর, তাই অল্প ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। যেসমস্ত জায়গায় কয়লা ও অন্যান্য জ্বালানীর অভাব, সেখানে লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে হ'লে বিদ্যুৎ যে নিতান্ত দরকার সে কথা আজ আমরা বুঝতে পেরেছি এবং সরকারও এদিকে নজর দিয়েছেন।

আপনারা দামোদর উপত্যকা ও ময়ূরাক্ষী পরি-কল্পনার কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন। এবারে উত্তর-বঙ্গের নদীগুলোর প্রপাত থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশেষ চেষ্টা চলছে। প্রকৃতির সম্পদকে আমাদের কাজে লাগাতে হ'লে গোড়ার দিকের যে খরচ তার কথা ছেড়ে দিলেও, পরিচালনার খরচও একটা বড় কথা।

পশ্চিম বাঙলায় জলবিদ্যুতের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, যেসব জায়গায় কয়লা সহজে পাওয়া যায় না, সেইসব জায়গায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা চিন্তা করে পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম বিভাগ—গাঙ্গেয় সমতল বিভাগের নদীগুলি দূরের পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। বঙ্গদেশের ভেতর এরা সম্পূর্ণ সমতল জায়গায় বয়ে যাচ্ছে বলে কোন প্রপাতের সৃষ্টি হয় না, তাই বাঙলার মধ্যে এই নদীগুলি থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করাও যায় না।

দ্বিতীয় বিভাগের নদীগুলির মধ্যে সুবর্ণরেখা, কোশী, দামোদর, অজয় আর ময়ূরাক্ষীর নাম করা যেতে পারে। এরা ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল-পরগনার পাহাড় থেকে বার হয়ে বয়ে যাচ্ছে। বর্ষার সময় এইসব নদীতে হঠাৎ খুব জল বেড়ে ওঠে ও চারদিকে বন্যা দেখা দেয় কিন্তু গ্রীষ্মকালে নদীগুলি প্রায় শুকিয়ে যায়। এই ধরনের নদী-গুলির বিশিষ্ট উদাহরণ দামোদর নদ। কাজেই বঙ্গদেশের এই অঞ্চলে চাষবাসের জন্য কৃষি মসেচের

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ১২শ সংখ্যা

ব্যবস্থা করার দরকার হয়ে পড়ে। তার জন্য এখানে জলাধার (Storage Dam) স্থাপন করা দরকার। কিন্তু এ প্রদেশের জমি সমতল হওয়ায় এখানে জলাধার তৈরি করা যায় নি। ময়ূরাক্ষী ও দামোদরের বড় বড় বাঁধ ও জলাধারগুলি বাঙলার বাইরেই নির্মাণ করা হয়েছে। সেচব্যবস্থা ও বন্য-নিয়ন্ত্রণের কথা ছেড়ে দিলেও এই জলাধারগুলি থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। রাজ্য-সরকার ও দামোদর উপত্যকা সংস্থার মিলিত চেষ্টায় এই পরিকল্পনায় খুব কম খরচে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। জলসেচ-ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে না হলে এই শক্তির উৎপাদন-ব্যয় অত্যধিক হ'ত।

উত্তরবঙ্গের নদীগুলি হিমালয় থেকে বার হয়ে সিকিম ও ভুটানের মধ্য দিয়ে বয়ে এসে বাঙলাদেশে পড়েছে। যেমন তিস্তা, জলঢাকা, রাইডক, ছোট ও বড় রাজত নদী, মহানন্দা, গঙ্গাধর ইত্যাদি। এরা জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। এরাই তৃতীয় বিভাগে পড়ে। এইসব নদীতে বর্ষার সময় প্রচুর জলস্রোত থাকে, কারণ পাহাড়ে বৃষ্টি হলে তার জলে নদীগুলি ফুলে উঠে, আবার গরমের দিনে পাহাড়ের বরফ গলে জল আসে। কাজেই নদীগুলি সবসময় জলে ভরাতি থাকে, কখনও শুষ্কিয়ে যায় না। তাই দামোদরের মত আলাদা জলাধার তৈরি না করলেও অসুবিধা হয় না। আর পাহাড়ী জায়গা বলে জলাধার তৈরি করাও শক্ত। এই পাহাড়ী নদীগুলির প্রপাত থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু নদীগুলির প্রবাহ সারা বছরে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তাই স্থায়ী শক্তিসংগ্রহ নির্ভর করে সবচেয়ে নিচু প্রবাহের উপর। এইজন্য বছরের সব সময় সমান পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি পাওয়াও যায় না। যদি অন্য কোন উপযুক্ত স্বাভাবিক জলাধার তৈরির ব্যবস্থা করা যায় তবে বেশি পরিমাণে শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হয়। দক্ষিণ ভারতের জলবিদ্যুৎশক্তির মত বেশি না হলেও উত্তরবঙ্গের জলবিদ্যুৎশক্তির সম্ভাবনাও নেহাত কম নয়।

এইভাবে দেখা যায় যে, এই অঞ্চলে কয়লার অভাবের দরুন একমাত্র জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করাই সম্ভব। দার্জিলিং ও কাশীয়াঙে কতকগুলি ছোট ছোট নদী থেকে শক্তি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু এখানকার অতিরিক্ত চাহিদা মেটাবার ক্ষমতা এগুলোর খুবই কম। তাই রাজ্য বিদ্যুৎ-পর্ষদ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জলঢাকা নদীর শক্তিকে আরও দূরে নিয়ে এসে ডুয়ার্স, তরাই ও দার্জিলিং, কালিম্পাং, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি উত্তর অঞ্চলে জলবিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করবেন স্থির করেছেন। এই নদীটি ১৪ হাজার ফুট উঁচুতে ভুটান ও সিকিমের পার্বত্য হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে কালিম্পাং ও ভুটান সীমারেখা দিয়ে বয়ে গিয়ে রঙ্গপুত্রে পড়েছে। গ্রীষ্মকালে নদীটি বরফজলে পূর্ণ হয়। এর দুটো উপনদী আছে—নীচু ও বিন্দুখোলা। জলনিয়ন্ত্রণের জন্য এখানে একটা বাঁধ নির্মাণ করা হবে।

শীতের প্রকোপ আর জলালানীর অভাবের জন্য এখানকার লোকের জলবিদ্যুৎ সম্বন্ধে আগ্রহ খুব বেশি। বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে পারিবারিক প্রয়োজন ও শিল্পের জন্য জলবিদ্যুতের চাহিদা ক্রমশ বেড়েই যাবে। জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদকে সব রকমে কাজে লাগানো দরকার। স্থায়ী সম্পদ হিসাবে জলবিদ্যুৎশক্তির দাম অনেক। জলবিদ্যুৎ-শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে এমন প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান, যেমন, সেচ, জলবিদ্যুৎশক্তি, বন্যনিয়ন্ত্রণ, নৌব্যবস্থা ইত্যাদির একযোগে কাজ করা উচিত, যাতে সবচেয়ে কম খরচে এই রাজ্যের জলবিদ্যুৎ-শক্তির পুরোপুরি উন্নতি করা যায়।

এবার জলঢাকা পরিকল্পনার কথা বলছি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জলঢাকার সম্পূর্ণ শক্তিকে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা হয় নি। আংশিক-ভাবে এর উন্নয়ন হচ্ছে। শুধুমাত্র বিন্দুখোলা (২ হাজার ফুট) থেকে বিরুখোলা (১,৩৫০ ফুট) অঞ্চলের জলপ্রপাতকে কাজে লাগানো হবে।

“পারেন” নামে এক জায়গায় শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। বিরুখোলা থেকে নাকসালখোলা জলাধারকে এর পরে কাজে লাগানো হবে। “পারেনে” বর্তমানে ১০ থেকে ১৫ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যাবে। চা-শিল্প এখানকার উন্নত শিল্প। চা-পাতা শুকোবার জন্য ও অন্যান্য নতুন শিল্প গঠনের কাজে এই শক্তিকে ব্যবহার করা হবে। অনুমান করা যায়, তা থেকে চার বৎসরের মধ্যে এই পরিকল্পনা ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সফল করা যাবে। এই কাজে ইঞ্জিনিয়ার, ভূতত্ত্ববিদ, বিজ্ঞানী, শ্রমিক প্রভৃতি নিয়ে মোট ৫০০ থেকে ১,০০০ লোক নিযুক্ত হবে। এই কেন্দ্রের কাছেই আধুনিক সব

রকম সুবিধাস্বত্ব একটা শহর গড়ে উঠবে ও উঠছে। জলঢাকার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যেসব শক্তিকেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে, রাজ্যবিদ্যুৎ পর্ষদ সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন, কারণ উত্তরবঙ্গের উন্নতির জন্য জলবিদ্যুৎ একমাত্র অবলম্বন।

জলঢাকা নদী শিল্পোন্নতির নতুন পথ খুলে দেবে আশা করা যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে চা-শিল্প, কাঠশিল্প, খনিজ-শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের উন্নতির আশা করা যায়। ঐ অঞ্চলে এখন কাজের সাড়া পড়ে গেছে। শহরের সব রকম সুযোগসুবিধা ক্রমশ এখানে পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠছে।



পাট-সংকট ও পাটচাষের উন্নয়নকেন্দ্র

ডক্টর প্রফুল্লকুমার সরকার

এম এ, বি টি, পি-এইচ ডি, ডিপ এড (এডিনবরা
ও ডাবলিন ট্রিনিটি কলেজ)

নবম্বীপাধিপতি মহারাজরাজশ্রী বাজপেয়ী কৃষ্ণচন্দ্র রায় কর্তৃক 'কোম্পানী'কে প্রদত্ত ৩১৪ একর জমির ২৫০ একরের উপর কৃষ্ণনগর পাট-পরিবর্ধনকেন্দ্র (জুট মাল্টিপ্লিকেশন ফার্ম) এবং বাকি ৬৪ একরের উপরে উদ্যানতত্ত্ব-গবেষণাকেন্দ্র। আগে এই জমি 'রেস কোর্স' এর মাঠ হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত, পরে মিউনিসিপ্যালিটিকে দেওয়া হয়। ১৯৫২ সালে বর্তমান পাট-কেন্দ্রের পত্তন হয়। উদ্যানতত্ত্ব-গবেষণাকেন্দ্রের পত্তন হয়েছে কিন্তু ১৯২৭ সালে। গোড়াতে পাট-কেন্দ্রের জমিটার মাঝখানে একটা ডাকাতে পুকুরের চারধারে গভীর জঙ্গলে বাঘ, বুনো শূণ্ডর, সাপ প্রভৃতির আস্তানা ছিল।

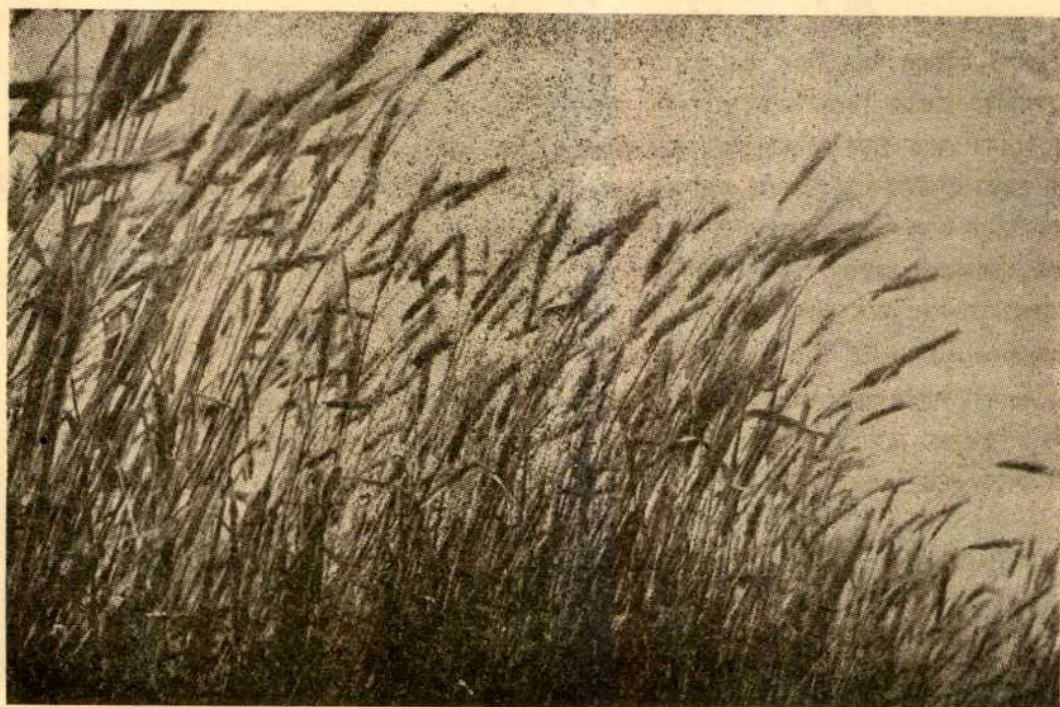
পাটচাষ ছিল বাঙলার একচেটে। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের পাট থেকে ভারত প্রায় বঞ্চিত হ'ল—চালান বন্ধ হয়ে গেল। পশ্চিম বাঙলায় পাটচাষ বাড়িয়ে সেই অভাব পূরণ করা ছাড়া আর উপায় রইল না। পাটের চাষী বাঙলায় ছাড়া মেলা ভার। এক বৃক জলে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে এক মাস ধরে পাট কাচতে শূন্য বাঙলার চাষীই পারে। পৃথিবীর আর কোন জায়গার কৃষক এভাবে কাজে অভ্যস্ত নয়। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত চাষীদের চেষ্টায় এবং উৎসাহেও পশ্চিমবঙ্গে পাটচাষ বেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এর পেছনে এই কৃষ্ণনগর পাটচাষ-কেন্দ্রের মত এ রাজ্যের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ঐকান্তিক, ধারাবাহিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে কৃষি-প্রচেষ্টাও বিশেষ প্রশংসাহঁ।

কৃষ্ণনগরের এই পাটচাষ-ক্ষেত্রের মাটিতে বালির ভাগ খুব বেশি বলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সার-প্রয়োগে একে উর্বর করা হয়েছে। এখানে উন্নত জাতের পাটের চাষ হয় এবং এসব পাটের বীজ পরিবর্ধন করা হয়। একা এই কেন্দ্র থেকে ৩০ হাজার একর জমিতে পাটচাষের জন্য প্রায় দেড় হাজার মণ পাটবীজ সরবরাহ করা হয়েছে। এখানকার উন্নত ধরনের পাটের বীজে একরপ্রতি শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ পাট বেশি পাওয়া যায়, দেখা গেছে।

আমার ছেলেবেলায় শুনছি, লোকে রসিকতার ছলে বলত, "ন'দে জেলার মাটি জায়গায় জায়গায় পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় শুনিয়ে যায়!" এমন বেলে মাটিতেও বছরে একটি কি দু'টি ফসলের স্থলে তিনবার ফসল তোলায় চেষ্টা সফল হয়েছে। এখানকার সরকারী কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিত গমের ও অন্যান্য শস্যের বীজ চাষীদের দেওয়া হয়। এ জমিতে চাষের সাফল্যে রাসায়নিক সার ছাড়াও এখানকার বড় নলকূপের দানও কম নয়। প্রথমে আউশ ধান, কলাই ও আলুতে একরপিছ প্রায় ৬০০ টাকা আয় হয়েছে। তারপরে পাট, কলাই আর আলুতে আয় হয়েছে একরপিছ প্রায় ৮০০ টাকা। খরচ-খরচা বাদ দিয়েই এ হিসাব। পর্যায়ক্রমে কলাই ও মৃগ-জাতীয় ফসলের চাষ দিলে, তা দু'মাসের মধ্যে উঠে এলে জমিতে গম দেওয়ার সুবিধা ও সময় পাওয়া যায়। তবে, এতে মোটের



কুষ্মনগর পাটিচাষ-উল্লম্বনকেন্দ্রে উৎপাদিত পাটিবীজ বস্ত্রাভূতি করা হচ্ছে



উক্ত কেন্দ্রে শর্ষার-চাষে উৎপাদিত গমও বেশ ভালই হয়

উপর আর একটু কম হয়। কলাই-চাষে সাধারণত তিন মাস সময় লাগে। মৃগ, জলসেচ দিয়ে, সারা বছরই পাওয়া যেতে পারে—শুধু খুব শীতের সময়টা ছাড়া। এই পর্যায়ক্রমিক চাষে জমির উর্বরতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যও নিহিত আছে। উদ্ভিদের স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে, কোন বিশেষ একটি ফসলে লাগা কীট শস্য-পর্যায়ের ফলে বিনষ্ট হয়। এখানে শস্য-পর্যায়ের ক্রম হচ্ছে: আউশ ধান—মৃগ—গম, অথবা পাট—মৃগ—গম। এখানে কলাইএর বদলে মৃগ দিয়ে গমের চাষে সুবিধা হয়। আর, গমের বদলে আলু দিয়ে, তার মধ্যে মধ্যে মিষ্টি কুমড়োর বীজ বসালে আলু ওঠার পরে চতুর্থ একটি ফসল পাওয়া যায়। এই আলু ফসলে খরচ কম অথচ ফলন বেশি হয়।

এক বছর অনাবৃষ্টি হ'লে, কৃষ্ণনগর কেন্দ্রের নল-কুপটির সাহায্যে ঘণ্টায় ৫০ হাজার গ্যালন জল সরবরাহ করে গমের ও আলুর চাষ ভালভাবেই করা গিয়েছিল। কিন্তু জেলার অন্যান্য জায়গায় জলের অভাবে চাষ করা সম্ভব হয় নি।

এখানে উন্নত জাতের সরস আখের যে চাষ হচ্ছে, তার অবস্থাও ভাল। এখান থেকে বীজের জন্য সুস্থ পুষ্ট নীরোগ আখ বিক্রি করা হয়। কিছু আখ স্থানীয় চাষীরা কিনে নিয়ে তা থেকে গড়ু তৈরি করেন। আর, প্রচুর পরিমাণ আখ লরি করে নদিয়া জেলারই উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত রাম-নগরের চিনির কলে পাঠানো হয়। এই ইক্ষুকেন্দ্রের আখের আশাব্যঞ্জক অবস্থা দেখে পশ্চিম বাঙলার চিনি-শিল্প সম্বন্ধে মনে আশা জাগে।

পাটচাষ-কেন্দ্রের প্রধান লক্ষ্যই হ'ল পাটচাষের উন্নতিবিধান। পাটের সঙ্গে অন্যান্য ফসলের ব্যবস্থা কেবল পরিপূরক হিসাবে রাখা হয়েছে। ব্রিগাট ট্রাক্টর থেকে শুরুর করে নানা রকমের ছোটখাট

যন্ত্র পর্যন্ত এখানকার চাষের কাজে ব্যবহার করা হয়। তার মধ্যে বীজ-বোনা যন্ত্রটি ছিল ধান ও গম বোনার উপযোগী; পাটের ক্ষুদ্র বীজ তা দিয়ে বোনা চলত না। একে পাটবীজ বোনারও উপযোগী করে দেবার জন্য বিদেশী এক প্রতিষ্ঠানকে লেখা হয়; তাঁরা অল্প সময়ের মধ্যে এ কাজ করতে অক্ষমতা জানান। তখন এখানকার বর্তমান ম্যানেজার শ্রীশ্যামাপদ দাস এবং ওভারসিয়ার শ্রীসত্যকমল দাস তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তিতে যন্ত্রটিতে পাটবীজ বোনার উপযোগী পরিবর্তন সাধন করেন। এর জন্য তাঁরা প্রশংসাভাজন। এই যন্ত্র দিয়ে সারিতে পাটবীজ বোনা যায়। সারিতে বীজ বুনলে ক্ষেতে সার দেবার সুবিধা হয়, গাছের পরিচর্যা করা যায় সহজে; তাতে ফসল ভাল হয়। এখানকার ১৭ ফুট লম্বা আর প্রায় দেড় ইঞ্চি ঘেরের পাটগাছ দেখলে চোখ জুড়ায়।

একটি অংশে উঁচু সিমেন্ট-করা মেঝের উপর 'ড্রিমিটার' প্রণালীতে নির্মিত কুটির শিক্ণাথপী ছাত্রদের বাসস্থান। এ'রা সরকারী বৃত্তি নিয়ে বিভিন্ন ইউনিয়নে পাটবীজ-বিলির কাজে শিক্ষণ গ্রহণ করছেন।

কেন্দ্রের আর এক অংশে শ্রমিকনিবাস। তাঁদের চিত্তবিনোদনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। নৈশ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করারও চেষ্টা চলছে। কেন্দ্রের ফলবাগানে উৎপন্ন পেয়ারা, পেঁপে, লেবু, কলা প্রভৃতি শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। মাছের চাষে পুষ্করিণীগুলির সম্ভাবহারের চেষ্টা চলছে।

কৃষ্ণনগর পাটচাষ-উন্নয়নকেন্দ্রের মত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের অক্লান্ত সাধনা ও চেষ্টার ফলেই দেশ-বিভাগে সমৃদ্ধীপূর্ণ পাট-সংকটের সমাধানে ভারত অনেকখানি সাফল্য অর্জন করেছে—এ কথা অনস্বীকার্য।

স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি

পশ্চিমবঙ্গকে যথার্থভাবেই 'সমস্যাাকীর্ণ' রাজ্য' বলে অভিহিত করা হয়। এমন কি পরিকল্পনা প্রণয়ন করার দিক দিয়েও পশ্চিমবঙ্গে সমস্যা অনেক। দেশ বিভাগের সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গ অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে যেগুলি, এক এক সময় মনে হয়েছে, সমাধান করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে তার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করেছে; কিন্তু স্বাধীনতা-লাভের পর এ রাজ্যকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে তার কোন তুলনা হয় না।

দেশের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে খুবই কঠিন। তবু উপযুক্ত নেতৃত্ব এবং সুচারু প্রয়োগ-ব্যবস্থার জন্য অনেক বাধা আজ অতিক্রান্ত। আজ পশ্চিমবঙ্গ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের পাশাপাশি সমানে এগিয়ে চলেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এমনকি তার আগের উন্নয়ন-কার্যসূচির দরুনও জাতি উৎপাদনের দিক দিয়ে বহুল পরিমাণে উপকৃত হয়েছে এবং এখন সর্বাঙ্গিক উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। বিরাট জাতি-গঠনের কাজেই এইসব কৃতিত্ব যদিও সূচনামাত্র, তবুও তা পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ বা অবিশ্বাস দূর করার পক্ষে যথেষ্ট। প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার বর্তমান কার্যক্রম দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করছে।

পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন-কার্যকলাপের অগ্রগতির বিবরণ এবং স্বাধীনতার পর গত দশ বছরে সমাজ-সেবা সম্প্রসারণের তথ্যাদি থেকে বোঝা যাবে রাজ্য

এতদিন ধরে জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহ-যোগিতায় কী কঠিন সমস্যাবলীর সমাধান ক'রে এসেছে।

খাদ্য

এক সময়ে বাংলাদেশ সারা ভারতের শস্যভান্ডার ছিল অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে সমস্ত ভারতে চাল সরবরাহ করা হ'ত। বাঙলায় ক্রমাগত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন সামাজিক ও আর্থনৈতিক কারণে ক্রমে এই অবস্থার অবনতি হ'তে লাগল। ১৯৪৭ সালে পশ্চিম বাঙলায় এক কোটি একর জমিতে খাদ্যশস্যের চাষ করা হ'ত। মাথাপিছু ০.৪ একর জমিতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হ'ত। পরবর্তী কয়েক বছরে খাদ্যশস্যে বিরাট ঘাটতি পড়ায় একই জমিতে অধিকতর শস্য উৎপাদনের চেষ্টা চলে এবং বাইরে থেকে প্রচুর শস্য আমদানি ক'রে খাদ্যশস্যের ঘাটতি পূরণ করতে হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে পশ্চিম বাঙলায় ৩৫ লক্ষ টন চাল উৎপন্ন হয় এবং এই তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ সালে মোট ৪৩.৩ লক্ষ টন চাল উৎপন্ন হয়।

পশ্চিম বাঙলায় গত দশ বছরে খাদ্যশস্য ও পাটের উৎপাদন কিভাবে বেড়েছে বা কমেছে তা নিম্নলিখিত হিসাব থেকে বোঝা যাবে:

	১৯৪৭-৪৮	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭
	টন	টন	টন
চাল	৩৪,০৬,৪০০	৪১,৪৫,৭০০	৪৩,৩৬,৭০০
গম	১৯,৫০০	৪৫,৭০০	২৫,৪০০
ডাল	২,৮৫,৮০০	২,৪৩,১০০	১,৬৪,২০০
গাঁইট		গাঁইট	গাঁইট
পাট	৭,৪২,৫০০	১২,৫৭,৮০০	১৩,৪৪,৭০০

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ১২শ সংখ্যা

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য

গত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের চিকিৎসা-বিভাগের ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নানাবিধ কল্যাণব্যবস্থা করায় পশ্চিম বাঙলায় মৃত্যুর হার ১৯৪৮ সালে হাজারে ১৮.১ থেকে ১৯৫৬ সালে হাজারে ৮.২তে নেমে এসেছে। ১৯৪৮ সালে পশ্চিম বাঙলার সমস্ত হাসপাতালে রোগীদের জন্য শয্যার সংখ্যা ছিল ১৩,৪৭২; ১৯৫৬ সালে শয্যাসংখ্যা বেড়ে ১৮,৬৪৫ হয়। ১৯৪৮ সালে পশ্চিম বাঙলায় মাত্র তিনটি গ্রাম-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল; ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ৩,৩০০ শয্যাসমেত ২৮২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র গ্রামাঞ্চলে কাজ করে। ফলে কলেরা ও বসন্তে মৃত্যুর হার খুব কমে যায় এবং এ রাজ্যে দাবি করা হয় যে, ম্যালেরিয়া দেশ থেকে একেবারে দূর হয়েছে। ১৯৪৬-৪৭ সালে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের জন্য মাথাপিছু পনেরো আনার কিছুর বেশি খরচ করা হয়; ১৯৫৬-৫৭ সালে এই বাবত তিন টাকা দুই আনা পাঁচ পাই খরচ হয়। গত দশ বছরে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার প্রসার হাসপাতাল স্থাপন, এবং ডাক্তার ও পরিসেবিকাদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

শিল্প

পশ্চিম বাঙলার শিল্পোন্নতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। দেশে বেকার সমস্যার সমাধান করার জন্য বড় শিল্প যাতে ছোট শিল্প ও কুটির-শিল্পের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে পারে তার প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে।

বড় শিল্পের কথা বলতে, দুর্গাপুরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানা এবং কোকচুল্লীর কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। গ্রামের বেকারসমস্যা দূর করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ছোট শিল্প ও কুটিরশিল্পের শ্রীবৃদ্ধিসাধন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। তাঁতিশিল্প, নারকেল-ছোবড়র কাজ ও

কাঁসাপিতলের কাজের উন্নতিকল্পে নানাবিধ পরিকল্পনা করা হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য হাওড়ায় ৭৬২টি ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা একত্র করা হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে গ্রামবাসীদের শিক্ষাকর্মকেন্দ্রে শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার পশ্চিমবাঙলায় শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্তন করার ব্যবস্থা করছেন। যাদের শিক্ষালাভ করা উচিত তাদের সকলকেই শিক্ষাদানের চেষ্টা করা হচ্ছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে পশ্চিম-বাঙলায় ১৪,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল; ১৯৫৬-৫৭ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩,০০০ এবং গত দশ বছরে ছাত্রসংখ্যা ১২ লক্ষ থেকে ২২ লক্ষে পৌঁছায়। পশ্চিমবঙ্গে উচ্চবিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯৪৭-৪৮ সালে ১,৯০৩ ছিল; ১৯৫৬ সালে ৩,১৭০ হয়। উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষাকাল দশ বছরের জায়গায় এগারো বছর করা হয়েছে। কলেজের ইন্টারমিডিয়েটের কোন কোন পাঠ্য বিষয় স্কুলেই পড়ানো হবে। তারপর কলেজে গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা তিন বছরে ডিগ্রী লাভ করতে পারবে। কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয়কে সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে পরিণত করা হচ্ছে যাতে ছাত্রেরা নিজেদের মনোমত শিল্প ও কারিগরি শিখতে পারে। এর দ্বারা তারা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে পছন্দমত জীবিকা অবলম্বন করতে পারবে।

সেচ

ময়ূরাক্ষী জলাধার পরিকল্পনা পশ্চিমবাঙলার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জলসেচ পরিকল্পনা। এটি ১৯৫৫-৫৬ সালে সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এর দ্বারা ৬,০০,০০০ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা সোনারপুড়-আরাপাঁচ ভলানকাশী পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এর দ্বারা ১০৫ বর্গমাইল জলাজমি

চাষের জন্য উদ্ধার করা হবে এবং অনেকখানি জমিতে চাষ চলছে। প্রথম পরিকল্পনায় ১১৭টি ছোট সেচের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং এর দ্বারা ১১ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ চলবে। সোনালপুত্র-আরাপাট পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায় ও বাগজলা-ঘুনি-যাত্রাগাছি কর্মসূচির কাজও দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কাজ শেষ হলে ৪০ হাজার একর জলা পতিত জমি চাষের উপযোগী হয়ে উঠবে। স্বাধীনতা লাভের পর ২০০ ছোট-বড় সেচের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে ১২ লক্ষ একর চাষের জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কৃষি ও পশুপালন

কৃষি ও পশুপালন সম্বন্ধে বহুবিধ উন্নতিসাধন করা হয়েছে। উচ্চাঙ্গের যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক এবং অন্য নানাবিধ উন্নত সার প্রভৃতি কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। উন্নত বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্র স্থাপন, পতিত জমি উদ্ধার প্রভৃতি গঠনমূলক কাজ করে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে। ফসলবৃদ্ধি থেকে চাষের কিরকম শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। প্রথম পরিকল্পনার কার্য-কালে সারা বাঙলায় জাপানী প্রথায় ধানচাষ শেখানো হয়েছে, ৩৮ লক্ষ একর জমি জাপানী প্রথায় চাষ করে দেখানো হয়েছে যে, এই প্রথায় প্রতি একরে কতটা বাড়তি ফসল পাওয়া যায়। জমিদারী উচ্ছেদ করে কৃষককে জমির প্রকৃত মালিক করা হয়েছে—এইটিই সবচেয়ে বড় কাজ। পশুপালন বিষয়েও বহু কাজ করা হয়েছে। গ্রামের গোশূন্যের উন্নতিকল্পে সুপ্রজন্মের জন্য ভাল জাতের ষাঁড় গ্রামে গ্রামে রাখা হয়েছে। নয়াটি কৃত্রিম প্রজননকেন্দ্র খোলা হয়েছে। বৃহত্তর কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ করবার ব্যবস্থার জন্য হরিণঘাটায় প্রতিষ্ঠিত দুগ্ধ-পল্লীটি ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। দৈনিক ৪০০ মণ জীবাণুমুক্ত দুগ্ধ হরিণঘাটা থেকে বিক্রি করা হয়। কলিকাতা থেকে অস্বাস্থ্যকর খাটালসমূহ উচ্ছেদ করে গোরুগুলিকে হরিণঘাটায়

পাঠানো, কল্যাণীতে একটি ৩০০০ একর ঘাসের ক্ষেত তৈরি এবং কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় দুগ্ধ-কারখানা নির্মাণ করে দৈনিক ৪ লক্ষ পাউন্ড দুগ্ধ বোতলে ভর্তি করে বিক্রি করা পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের উদ্দেশ্য।

রাস্তাঘাট ও যাতায়াত ব্যবস্থা

গ্রামগুলিকে নিকটস্থ বড় শহরের সঙ্গে সংযুক্ত করা অর্থাৎ উৎপাদন-কেন্দ্রগুলি বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত করা, নতুন রাস্তা নির্মাণ, পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। প্রথম পরিকল্পনায় রাস্তা নির্মাণের উপর খুব বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। প্রায় ২,০০০ মাইল নতুন রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল বা পুরানো রাস্তা উন্নত করা হয়েছিল। তা ছাড়া পূর্বকার ২৩ হাজার মাইল রাস্তা রক্ষা করবার ভার পশ্চিমবঙ্গ-সরকার গ্রহণ করেন। ন্যাশন্যাল হাইওয়ে সেকশনে ২৯৫ মাইল নতুন রাস্তা এবং মোট ৮,২১৫ ফুট বড় সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারের পূর্ত বিভাগের পরিচালনাধীনে ৩,৬০০ মাইল রাস্তা এবং ১৮৮ মাইল মিউনিসিপ্যাল রাস্তা নির্মাণের সংকল্প আছে।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার যাতায়াতের সমস্ত যানবাহন (রেল, বাস প্রভৃতি) ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করার নীতি গ্রহণ করেছেন এবং এই উদ্দেশ্যে কলিকাতার বহু বাসরুটে বস চালাচ্ছেন। অন্যান্য রাস্তায়ও ক্রমে সরকারী বস চালানো হবে। কোচবিহার এবং কলিকাতায় উপস্থিত ৪০০ বাস পশ্চিমবঙ্গ-সরকার চালাচ্ছেন। ১৯৬০ সালের মধ্যে পশ্চিম-বঙ্গ-সরকারের পরিবহণ বিভাগ মোট ৭০০ বাস চালাবার সংকল্প করেছেন। এই বিভাগে ৬,৫০০ লোক কাজ করেন এবং তাঁদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন উদ্ভাস্তু। ১৫ লক্ষ যাত্রী এইসব বাসে রোজ যাতায়াত করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে এ কাজটি কত বিরাট।

গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা

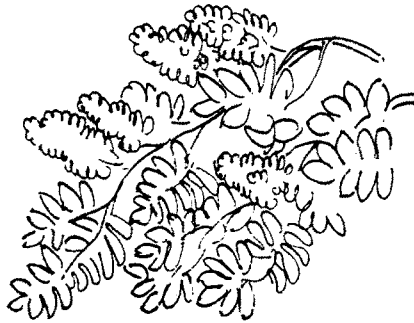
কলিকাতায় এবং গ্রামাঞ্জে গৃহনির্মাণের কাজ শূন্য হয়ে গিয়েছে। শ্রমিকদের জন্য ৩০১টি একতলা এবং ১২৮টি বহুতলা বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট শিল্প-শ্রমিকদের জন্য পাঁচশতের অধিক ঘর নির্মাণ করেছেন। কলোনীতে ৫০০ বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। তৈরি বাড়ি কিংবা জমি একবারে বা কয়েক কিস্তিতেও কেনা যায়। বন্যাবিধ্বস্ত গ্রাম-গুলিতে আদর্শগ্রাম তৈরি করা হচ্ছে। বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্জে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার মালমসলা ও অর্থসাহায্য দিচ্ছেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের নিজ শ্রমে গৃহনির্মাণ করতে উৎসাহ দিচ্ছেন।

উন্মাস্তু পুনর্বাসন

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের সম্মুখে উন্মাস্তুদের আর্থ-নীতিক পুনর্বাসন সবচেয়ে জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশবিভাগের আগে থেকেই হিন্দুরা পাকিস্তান ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে আসা শুরু করেছেন এবং উন্মাস্তুরা এখনও আসছেন। ১৯৫৭ সালের ৩১এ অক্টোবর তারিখ পর্যন্ত প্রায় ৩২ লক্ষ উন্মাস্তু পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন। এই ৩২ লক্ষ উন্মাস্তুদের গৃহ নির্মাণ করা এবং তাঁদের জন্য কাজ

যোগাড় করা, এক কথায় পুনর্বাসন করার সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের আর্থনীতিক অবস্থাকে শোচনীয় করে তুলেছে। তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ-সরকার সাহসের সঙ্গে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং এই হতভাগ্য বাস্তুহারাাদের জন্য যা করা সম্ভব তা করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে লোকসংখ্যার চাপ অত্যন্ত বেশি—প্রতি বর্গমাইলে ৮০৬ জন লোক বাস করেন। এক্ষেত্রে এত বাস্তুহারার এখানে পুনর্বাসন করা সম্ভব নয়। গৃহনির্মাণ এবং ছোট ব্যবসায়ের জন্য ঋণদানের কাগজপত্র থেকে দেখা যায় যে, ২২ লক্ষ উন্মাস্তুকে সহায্য করা হয়েছে এবং তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক লোকের পুনর্বাসন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের মাধ্যমে ১৬,৩৫৮ জন উন্মাস্তু কাজ পেয়েছেন। উন্মাস্তুদের শিক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকার প্রায় ৭ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন এবং তাতে সুফল দেখা দিয়েছে। পুনর্বাসনের ভূমির অভাবে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার বহু উন্মাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। ২৭ হাজার বাস্তুহারাকে বিহারের বেতিয়াতে পুনর্বাসনের জন্য পাঠাবার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে এবং উন্মাস্তু-পুনর্বাসনের জন্য দণ্ডকারণ্যে ৮০,০০০ বর্গমাইল ভূমি সংস্কার করার প্রস্তাব করা হয়েছে।



ভারতের লেবু

[পূর্বানুক্রম]

গাছ লাগানো

বাগান এমন জায়গায় হওয়া দরকার যেখানে ঝোড়ো হাওয়া বা জোর বাতাস লাগতে না পারে। অদূরের পাহাড়, বন বা এই ধরনের কোন স্বাভাবিক রক্ষণব্যবস্থা যদি না থাকে তবে খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে এমন কোন বাতাস-ঠেকানো গাছ লাগিয়ে বাগানের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ঘিরে রক্ষাবলয় তুলতে হবে।

প্রথমে জমির ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। যেসব যেসো গাছ বা আগাছার শিকড় মাটির নিচে অনেক দূর নেমে গেছে, মাটি খুঁড়ে সমস্ত শিকড়-মূল সমেত সেগুলো তুলে ফেলতে হবে। এমন জমি নির্বাচন করতে হবে যার উপর-স্তরের মাটি অন্তত চার ফুট পুরু আর তার নিচে আগেকার মাটির স্তর রয়েছে। জমিটা সমান করে নিতে হবে, ঢাল থাকলে তাও উঁচু করে বাকি জমির সঙ্গে সমতল করে নিতে হবে—যাতে বাগানের প্রত্যেকটি গাছ সহজে সমানভাবে সেচের জল পেতে পারে।

পাহাড়ী বা ওই ধরনের ঢালু জমিতে বাগান করতে হ'লে, ১০ থেকে ১৫ ফুট চওড়া করে সিঁড়ি সিঁড়ি কেটে নেওয়া ভাল। ঢাল ধরে একটার উপরে একটা সিঁড়ি যেন কাটা হয় আর সব সিঁড়ি যেন সমান্তরাল হয়।

মাটি আর জলবায়ু উপযুক্ত হ'লে, শরবতি আর কমলালেবু দু'এরই গাছ ২০ থেকে ২৫ ফুট অন্তর চোকো পদ্ধতিতে লাগানো যেতে পারে। মাটি যদি কম উর্বর হয় আর জলবায়ু গোলমালে হয় তবে গাছ তাড়াতাড়ি বাড়তে পারে না ; সে রকম জায়গায় কমলালেবু বা শরবতি লেবুর গাছ ১৫ থেকে ১৮ ফুট দূরে দূরে লাগানো যেতে পারে।

প্রতিটি গাছের জন্য ২৥ ফুট লম্বা, ২৥ ফুট চওড়া আর ২৥ ফুট গভীর গর্ত খুঁড়ে, ৫০ পাউন্ড আবর্জনা-সার, ২ পাউন্ড হাড়ের গুঁড়ো এবং ৫ পাউন্ড কাঠের ছাই মিশিয়ে মাটি তৈরি করে নিতে হবে। গাছ লাগাবার সাত দিন আগে গর্তে জল দিতে হবে যাতে মাটি ঠিকমত বসে যেতে পারে। গর্তের মাটির জো বুঝে কলম লাগানো ভাল। বর্ষাকালের গোড়ার দিকে বা মাঝামাঝি সময়ে গাছ লাগানো উচিত। খুব বেশি বৃষ্টির এলাকায় শরবতি লেবুর গাছ ঘন বর্ষার সময় লাগানো যেতে পারে। চারাবাগানে কলমের গোড়ার যতটা মাটির মধ্যে ছিল, আসল বাগানে লাগাবার বেলা যেন ততটাই মাটির মধ্যে থাকে, সৈদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। কোনক্রমেই যেন চোখ-জোড়ের জায়গাটা মাটির মধ্যে পোঁতা না হয়। জোড়ের জায়গাটা মাটির চার থেকে ছয় ইঞ্চি উপরে থাকা ভাল।

কলমের শিকড়গুলি ঢেকে যদি মাটির পিণ্ড না থাকে, শিকড়গুলি যদি খোলা থাকে, তবে গর্তের মধ্যে কলম বসিয়ে, শিকড়গুলো ঘিরে মাটি বেশ চেপে দিতে হবে, গোড়ার মাটি কিছুতেই যেন ঢিলে না থাকে। গাছের গোড়া ঘিরে দু' ফুট চওড়া করে খাদালো করে কেটে নিতে হবে, গাছের গোড়াটা যেন উঁচু থাকে : সেই সেচখাত জল দিয়ে ভর্তি করে দিতে হবে।

শরবতী পরিচর্যা

গাছ বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, তার গোড়া-ঘেরা বৃত্তাকার সেচ খাতটার আকারও সেই অনুপাতে বড় করে করে নিতে হবে। বছরের শুরুর সময়ে ছোট গাছের গোড়ায় নিয়মিত জল দেওয়া দরকার।

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ১২শ সংখ্যা

গাছের গোড়ার আগাছা, বিশেষ করে বর্ষাকালে, একেবারে পরিষ্কার করে দিতে হবে।

প্রতিটি গাছ বড় হয়ে ডালপালা ছড়াবার জন্য যতটা জমি ছেড়ে রাখা হয়েছে, ততটা জমি ছেয়ে ফেলতে সাত-আট বছর সময় নেয়। ততদিন পর্যন্ত প্রতিটি গাছের এলাকার বাইরে যে জমি ফাঁকা পড়ে থাকবে, প্রতি বছর বর্ষাকালে তা খুঁড়ে সবুজ-সার লাগাতে হবে। শীতকালে, জল যোগাবার সুবিধা থাকলে, সেসব ফাঁকা জায়গায় শীতের সবজির সঙ্গে ডাল-জাতীয় বা শিম-বগুনীয় ফসলের চাষ করা যেতে পারে।

শরবতি বা কমলালেবু গাছের শিকড় মাটির বেশি নিচে নামে না। প্রায় সব শিকড়ই মাটির উপর-স্তর থেকে খাদ্য আহরণ করে। কাজেই, গাছের গোড়ায় জল দেবার খাত গভীর করা চলবে না; গভীর করতে গেলে গাছের শিকড় কেটে যেতে পারে।

ছোট গাছের গোড়ায় বছরে অন্তত একবার করে সার দেওয়া দরকার। উত্তর-ভারতে শীতকালে, ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে, সার দেওয়া হয়, তার পরে ফল-ধরার খন্দ শেষ হয়ে গেলে, এপ্রিল-মে মাসে, এক মাত্রা করে অ্যামোনিয়াম সালফেট দেওয়া হয়। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সার দেওয়া হয় বর্ষার গোড়াতে। এক বছর বয়সের একটা গাছে ২০ পাউন্ড আবর্জনা-সারের সঙ্গে আধ পাউন্ড রোড়ির খইল মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় বছর থেকে সারের মাত্রা বাড়তে হবে—আবর্জনা-সার ১০ পাউন্ড এবং রোড়ির খইল আধ পাউন্ড হারে, এবং ষষ্ঠ বছর পর্যন্ত এই হারে সারের মাত্রা বাড়িয়ে যেতে হবে। জল দেবার খতে সারটা সমানভাবে ছিড়িয়ে, হাত-কোদালি দিয়ে মাটি খুঁড়ে তার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে।

কোন গাছের কোন শাখায় কোন জায়গায় যদি পরগাছা জন্মায়, তবে তা সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে। পোকা আর রোগের আক্রমণ

থেকে গাছকে মুক্ত রাখার জন্য দরকারমত ওষুধ-জল ছিটাতে বা ওষুধগুঁড়ো ছড়াতে হবে।

গাছ ছেঁটে দেওয়া বা বড় করে তোলা

চোখ-কলমের গাছের কাণ্ডে চোখ জোড়া লাগার জায়গার উপরে এক ফুটের মধ্য থেকে ডাল ছাড়তে দেওয়া উচিত নয়। জোড়ের উপরে এক ফুট থেকে আড়াই ফুটের মধ্যবর্তী অংশ থেকে ডাল ছাড়তে দেওয়া যেতে পারে। আবার কাণ্ড খুব লম্বা হয়ে গাছের মাথা যদি বেশি উঁচু হয়ে যায় তবে জোরালো বাতাসের ধাক্কায় তার অনিষ্ট হবার আশঙ্কা লেগেই থাকে। তা ছাড়া, গাছ খুব লম্বা হলে, সূর্যের তাপে তার গুঁড়ির ক্ষতি হতে পারে।

কোন রকম নাড়াচাড়া না করে গাছকে ছ' মাস থেকে এক বছর অব্যবহৃত বাড়াতে দেওয়া উচিত; তারপরে গাছ সুগঠিত করে তোলার জন্য তার ডাল ছেঁটে দিতে হবে। এ সময়ে দেখা যাবে যে, গাছের মাথায় অনেক ডাল গিজিয়েছে। সমান দূরে তিনটি অথবা পরস্পর বিপরীতমুখে দু'টি সুদৃষ্ট সুগঠিত ডাল রেখে, বাকিগুলি সমস্তে এমনভাবে ছেঁটে দিতে হবে যেন কাণ্ডের সঙ্গে ডালের একটুও অংশ লেগে না থাকে।

প্রথম পাঁচ বছর গাছ বুনো ধরনে বেড়ে ওঠে এবং প্রচুর শাখাপাতা ছাড়ে। তার মধ্যে যেগুলো তির্যকভাবে গিজিয়েছে এবং সরাসরি সূর্যের আলো পাচ্ছে, সেগুলোই ভাল—সেগুলোই গাছে রাখতে হবে এবং বাড়তে দিতে হবে; কিন্তু এসব ডাল থেকেও অনেক অবাস্তব ফেঁকড়ি বেরোয়—সেগুলো ছেঁটে দিতে হবে।

এসব অবাস্তব ফেঁকড়ির মধ্যে এক রকম হচ্ছে “জল-শাখা”। এগুলো সাধারণ শাখা থেকে একটু অন্য ধরনের, সহজেই চেনা যায়। ডাল থেকে শাখার মতই জল-শাখা বেরোয় এবং সোজা উপর-দিকে বেড়ে ওঠে, গোল না হয়ে পলকাটা হয়, অনেক সময় তার গায়ে লম্বা লম্বা কাঁটা হয়, এ

শাখা বেশ মোটাসোটা ধরনের হয় এবং এতে যেসব পাতা জন্মায়, সেগুলো সাধারণ পাতার চাইতে অনেক বড় আর পুরু হয়। জল-শাখা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। এক বছর বাড়তে পেলে তার যা চেহারা দাঁড়ায়, সাধারণ ডালগুলোকে তার কাছে ম্লান দেখায়।

জল-শাখা তার প্রায় সারা গা থেকেই উপশাখা ছাড়তে ছাড়তে যখন একেবারে গাছের মাথা ছাড়িয়ে ওঠে, তখন পরিপূর্ণ সূর্যালোক পাওয়ার দরুন ডগার দিকে কয়েকটি ফল-ধরা উপশাখাও ছাড়ে। গাছের যে-কোন উচ্চ ভাগ বা যে-কোন অংশ থেকে জল-শাখা বেরোতে পারে—তা সে কাণ্ড থেকেই হোক আর ডাল থেকেই হোক। গাছে জল-শাখা বেরোতে দেখলেই একেবারে নিশ্চিতভাবে নষ্ট করে ফেলতে হবে।

এ ছাড়া, গাছের মাঝখান থেকে অনেক সময় সাধারণ শাখা বেরিয়ে বাক্ষিত ভাল শাখাকে আড়াল

করে ফেলে অথবা আড় করে তার বাড় বন্ধ করে দিতে চায়। এসব অবাক্ষিত শাখাও কেটে ফেলতে হবে।

অবাক্ষিত শাখা কাটতে হবে পরিষ্কার করে একেবারে গোড়াতে—কাণ্ডের গা ঘেঁষে, অথবা ডাল থেকে বেরিয়ে থাকলে, ডালের গা ঘেঁষে। কমলা-লেবু বা শরবতিলেবু গাছের সুগঠন বজায় রাখবার জন্য বছরে একবার কি দু'বার এইভাবে ছেঁটে দেওয়া দরকার। দু'-তিন বছর কি এ রকম দীর্ঘ সময় অন্তর ছাঁটলে একসঙ্গে অনেক ডাল-পালা ছাঁটতে হবে, তাতে গাছের ক্ষতি হয়।

তির্থক ধরনের ভাল ডালগুলি ভালভাবে সূর্যালোক পেয়ে সব সময়ই এমন শাখা ছাড়ে যেগুলোতে প্রচুর ফল ধরে; সুতরাং সেসব শাখা কোন কারণেই কোনকালে কেটে-ছেঁটে ফেলার দরকার হয় না। [ক্রমশ]



সুসন্ম খাবার খেয়ে



খরচ বাঁচান

আজ কালকার এই দুর্শ্বলোর বাজারে খরচপত্র বাঁচিয়ে প্রত্যেকদিন সুসন্ম খাবার দাবার খাওয়া আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে ব্যাপারটি একেবারে অসম্ভব নয়। খাবারের মধ্যে স্নেহপদার্থ একটি অত্যাবশ্যক উপাদান। কিন্তু আমাদের দেশে পূর্ণবয়স্কেরা এবং বাড়ন্ত ছেলেমেয়েরা তাঁদের ন্যূনতম প্রয়োজন অর্থাৎ দু'আউন্স স্নেহপদার্থ প্রতিদিন পান না। তার প্রথম কারণ, আমাদের দেশে চাহিদা অনুযায়ী দুধের সরবরাহ অত্যন্ত কম। দুধ আর দুধ থেকে তৈরী অন্যান্য খাবারই স্নেহপদার্থের প্রধান উৎস। দ্বিতীয়ত, মাখন, ঘি ইত্যাদি পাওয়া গেলেও তা সাধারণ লোকের কেনার ক্ষমতার বাইরে। এবারে ধরুন খরচপত্রের কথা। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জায়গাতেই জিনিষপত্র দুর্শ্বল্য হয়ে উঠেছে। সে সব জায়গায় সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকেরা কি

করছে? তারা রান্নাবান্না ব্যবহার করছে পুষ্টিকর উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ যেমন, মার্গারিন, শটনিং বা ভালভা মার্কা বনস্পতি। এর ফলে তারা যে খাবার দাবার খাচ্ছে তা শুধু পুষ্টিকরই নয়, অত্যন্ত সুস্বাদুও বটে তাছাড়া, এইসব উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ দামেও ঘিয়ের তুলনায় সস্তা। ভালভা বনস্পতি খাটি উদ্ভিজ্জ তেল থেকে তৈরী হয়। ভালভার প্রতি আউন্সে ৭০০ অম্লজাতিক ইউনিট অর্থাৎ ভাল ঘিয়ের সমপরিমাণ ভিটামিন 'এ' বোগ করা হয়। তাছাড়াও ভালভার প্রতি আউন্সে ৫৬ ইউনিট ভিটামিন 'ডি' বোগ করা হয়। ভালভা সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরী হয় এক সবসময় শীল করা ডবল ঢাকনা-ওয়া টিনে পাওয়া যায়। এই সব কারনেই প্রত্যেকদিন আরও অধিকসংখ্যক গৃহিনীরা নিশ্চিন্ত মনে ভালভা ব্যবহার করছেন —তারা জানেন, খাবারে অতিরিক্ত পুষ্টির পক্ষে ভালভা অপরিহার্য।



BORDEN'S 11-18 BG

তামাকের চাষ

দেবীকা সরকার

দুনিয়ায় চাষের প্রচলন বেশি না তামাকের প্রচলন বেশি, এটা একটা বড় রকমের জিজ্ঞাসা। তবে, একথা ঠিক যে, যেসব সদৃশ পল্লীতে এখনও গরম চাষের পেয়ালায় কেহ চুমুক দিতে শেখে নি, সেসব গ্রামের অধিবাসীরাও বহু পূর্বে থেকে গুড়ুক-তামাকে অভ্যস্ত হয়েছেন। অতিথি-অভ্যাগতের দিকে একটি গুড়ুকগুড়ির নল কি গনগনে আগুনে সদ্য-সম্ভজিত সুগন্ধ তামাকের হুকো এগিয়ে দেওয়াতে যে কতটা আতিথ্যের ভাব ফুটে ওঠে, যাঁরা ধূমপানে অভ্যস্ত তাঁরাই সেটা অনুমান করতে পারেন।

গত মহাশুদ্ধের সময় থেকে অনেক দেশের মেয়েরাও অবসর-বিনোদনের জন্য ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমাদের দেশেও বড়ীদেবের পোড়া-তামাকের গুড়ো ব্যবহারের অভ্যাসটা ব্যাপক ছিল ; এখনও যে কারও কারও সে অভ্যাস নেই তা নয়। কাজেই তামাকের ব্যবহারটা মেয়ে অথবা পুরুষ কারও একচেটে নয়, এটা এখন সর্বজনীন। ছাত্র থেকে শূরুদ করে সকল শ্রেণীর মস্তিস্কজীবীর মধ্যেই নাসিয়ার বহুল প্রচলন দেখা যায়। সিগারেট, চুরুট, বিড়ি, নাসিয়া, তামাক, খইনি, শূখা, তামাকপাতা পোড়ানো গুড়ো, পানের সঙ্গে সাদা তামাক, দোস্তা গুল্লি, সুতী, জর্দা, কিমাম, পোড়া তামাকের দাঁতের মাজন—এমনি আরও কত রকমে যে তামাকের ব্যবহার রয়েছে কে তার হিসাব রাখে! তামাকের আর একটা ব্যবহারও দেখা যায়। বনবিভাগের কর্মচারীরা বর্ষাকালে যখন কাজে নামেন তখন তামাকের পাতা ছাড়া তাঁদের চলার উপায় নেই। একটি জোঁক, বর্ষাকালে যার অসীম প্রাচুর্য, কোন মতে জুতোর মধ্যে ঢুকলে একেবারে এক বৎসরের সিগিত রক্ত শুষে নেবে। এমনও দেখা যায় যে, দু-তিন দিনেও

রক্ত-নিঃসরণ বন্ধ হয় না। এ বিপদ থেকে রক্ষা-পাওয়ার একমাত্র উপায় মোজার ভিতর তামাকের পাতা পুরে দিয়ে তারপর জুতো পরা। জুতোর ফিতে লাগানোর জায়গাটাই বিশেষ করে সুরক্ষিত করতে হয়। তামাকপাতার উগ্র গন্ধে জোঁক পালাবেই।

তামাকের মধ্যে রয়েছে 'নিকোটিন' বিষ। তামাক-পাতায় চুন দিয়ে কপালে লাগালে মাথা-ধরা ক'মে যায়—এটা গ্রাম্য টোটকা। তামাকপাতা-ভিজানো জল গাঢ় করে গোরুর পায়ে দিলে জোঁক লাগে না। অনেক ফসলের শত্রুকীট ধ্বংস করার জন্য ক্ষেতে তামাকপাতা-ভিজানো জল ব্যবহারের পদ্ধতি আছে।

এমনি নানাভাবে ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বাজারে তামাকের চাহিদারও উঠতি ছাড়া পড়তি নেই। সুতরাং এর চাষ যে লাভজনক তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই তামাকের চাষ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করলে নিরর্থক হবে না।

চাষের প্রথম কথা মাটি। দোআঁশ, বেল-দোআঁশ, নদীচরের পলি এবং বন্যা-সিগিত মাটি তামাক-চাষের পক্ষে উৎকৃষ্ট। পশ্চিম বাঙলায় ধানক্ষেতে তামাক জন্মানো যায় এবং সেই সম্বন্ধে কিছু আভাস এই প্রবন্ধে দেওয়া হল।

কার্ত্তিকের প্রথমে অথবা পূর্বে যেসব ক্ষেতের ধান ঘরে আসে, সেইসব ক্ষেতের জমি নিশ্চয়ই একটু উঁচু। নিচু জমির ধান পোঁষের আগে পাকে না। এই উঁচু জমির কাছে জল আছে কিনা দেখতে হবে। তামাকের চাষে অনেক জল দরকার। জমিতে ৪টা চাষ দিয়ে, মাটি আলগা করে, গুড়ো করে ফেলুন, এক বিঘা জমির কথাই বলছি। অন্তত ৪০ থেকে ৬০ মণ গোবরসার দিন, আরও ২টা চাষ দিন এবং মই দিয়ে মাটির সঙ্গে সার একেবারে মিশিয়ে

ফেলুন। তারপর জল আটকাবার জন্য ৪টি ভাগ করুন এবং মাটির আইল গড়ে তুলুন—যাতে এক ভাগের জল অন্য ভাগে না ঢুকতে পারে।

এখন দাঁড়ি ফেলে সারি করুন—২ হাত দূরে দূরে দাঁড়ির পাশ দিয়ে লাঙ্গল টেনে নিলে লাইনটা ভাল হবে, তাড়াতাড়িও হবে, জল আটকানোর ভাগটা আরও ছোট করাও চলে অর্থাৎ এক বিঘাকে ৮ ভাগ করাও যেতে পারে। আপনার জমি তৈয়ারি এখানেই শেষ হোল।

অপরদিকে চারা তুলতে হবে বীজতলায়। ওটা গোয়ালের কাছে গোবরসারের উপর অথবা পুরানো ঘরের পোতার উপর করাই প্রশস্ত। বীজ বুনতে হবে আশ্বিনের শেষে। চারাগুলি আড়াই ইঞ্চি হলেই রোপণের উপযুক্ত হল। বীজ আপনি নিজেই তৈরি করে রাখতে পারেন অথবা বীজের দোকান কিংবা সরকারী কৃষিবিভাগ থেকে নিতে পারেন। আসল কথা, উন্নত জাতের তামকের নীরোগ সুপুষ্ট বীজ চাই। এক বিঘা জমির জন্য লাগবে মাত্র ৪ তোলা বীজ—দাম ৮ আনা থেকে ১২ আনা।

তারপর চারাগুলি সযত্নে ক্ষেতে এনে, সারিতে দেড় হাত অন্তর বসিয়ে দিন। বসনোর পরই চারাগুলোর উপর ঢাকা দিতে হবে কলাগাছের পেটো অথবা শালপাতার ঠোঙা দিয়ে। রাতে ঢাকা খুলে দিতে হবে। আর, চারার গোড়ায় জল দিতে হবে দিনে দু'বার করে। সাত দিনে গাছ লেগে যাবে। আর, যেগুলি মরে যাবে তাদের স্থান নতুন চারা দিয়ে ভরিয়ে দিতে হবে। এই চারা লাগানোর কাজটা শেষ করতে হবে কার্তিকের ১৫ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে। পৌষের শেষ পর্যন্ত রোপণ করা চলে, কিন্তু তাতে একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে; সে কথা পরে বলছি।

এই যে তামাকের চাষের কথা বলছি, এটা বেগুন-পাতি তামাক। অপর তামাক মতিহারী। পশ্চিম বাঙলায় ওটার চাষ আরম্ভ হয় ভাদ্রের শেষে। ওর

চাষ খুব বেশি হয় না। তাই বেগুনপাতির চাষের কথাই বলছি। এর ফলনও বেশি, চলনও বেশি।

তারপর আপনার কাজ থাকলো জল দেওয়া। জলের নালগুলি ভর্তি করে দিতে হবে সপ্তাহে দু'বার এবং গাছগুলি একটু বড় অর্থাৎ এক হাত-খানেক হ'লে সপ্তাহে একবার। গাছ এক হাতের একটু বড় হ'লে তার কাঁচ ডগাটা ভেঙে দিতে হবে, আর ভেঙে দিতে হবে ওর যে পাতাগুলি মাটিতে শুয়ে পড়েছে। এরকম পাতা একটা গাছে দু'-তিনটা হ'তে পারে—এগুলি একেবারেই অকেজো।

ডগা ভাঙার পরে সপ্তাহের মধ্যে দেখবেন প্রত্যেক পাতার গোড়া দিয়ে নতুন শাখা বেরিয়ে আসছে। ওগুলিও ভেঙে দিতে হবে। তামাকের গাছ অতি দ্রুত বাড়ে। যদি অগ্রহায়ণের শেষে ২-১ পশলা বৃষ্টি পায় তবে তো কথাই নেই। পৌষের মাঝামাঝি আপনার প্রথম তামাক কাটার সময় এসে গেছে।

তামাক কাটার সময় সম্বন্ধে চাষীর খুব সতর্ক থাকতে হবে। যদি উপযুক্ত সময়ের পূর্বে অথবা পরে তামাক কাটা হয়, তবে আপনার চাষ বরবাদ হ'ল, আর তামাকে তেজ থাকবে না। ক্রেতা সহজেই ধরে ফেলবে যে, আপনার তামাক বাজে। তামাকের পূর্ণতা লাভের অর্থাৎ কাটার উপযুক্ত হবার কয়েকটি লক্ষণ বলছি:

- (১) তামাকপাতায় শূন্যোপোকায় গায়ের শূন্যের মত অতি সূক্ষ্ম শূন্যো দেখা দেবে ;
- (২) পাতার উপরিভাগটা চক্চকে হয়ে ওঠবে,
- (৩) চাপ দিলে পাতাগুলি ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে, অর্থাৎ মোটেই নমনীয় থাকবে না,
- (৪) গাছ কেটে ফেললে কান্ডের ভিতর হাঁলদে রঙ দেখা যাবে,
- (৫) গাছে ফুল ফুটেবে।

এসব লক্ষণ দেখেই গাছগুলি কেটে ফেলুন। একটু ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটবেন। তারপর আবার

জল দিন। প্রত্যেক গাছের গোড়া থেকে আবার তিন-চারটি ক'রে গাছ বেরিয়ে আসবে। আবার কাটুন মাঘ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে। আরও একবার কাটতে পারেন ফাল্গুনের প্রথমে। একই গাছের তামাক এইভাবে তিনবার কাটা চলে।

অতিরিক্ত সার, নিড়েন ও তামাক কাটার পরের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এখানে বলা আবশ্যিক। আলগা মাটিতে জল দিলে মাটির উপরটা জমাট বেঁধে যায়, জল গাড়িয়েই চলে নিচের দিকে। তাই তামাক ক্ষেতের মাটি অন্তত মাসে দু'বার কুপিয়ে দিতে হবে। তামাকের চারা ৮-১০ ইঞ্চি হ'লে গোড়ায় সালফেট সার দিলে (পাতায় যেন না লাগে) এবং প্রত্যেকবার কাটার পর আর একবার সার দিলে পাতাগুলি খুব বড় ও সতেজ হবে। তবে এ সার দিলে জল আরও বেশি দিতে হবে—সপ্তাহে দু'বার ; অন্যথা এ সারে ভাল কাজ হবে না। তিনবারে আপনার তিনমণ সার লাগবে।

গাছগুলি কাটার পর তিনদিন ক্ষেতেই ফেলে রাখতে হবে। তারপর ৮-১০টা ক'রে পাতা একসঙ্গে বেঁধে পরপর সাজিয়ে 'জাগ' দিতে হবে অর্থাৎ গোছার পর গোছা সাজিয়ে চাপে রাখতে হবে। পাতাগুলি দুমড়ে মূচড়ে যাতে না যায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। ৬-৭ দিন জাগে রাখার পর ওগুলিকে ছায়ায় আস্তে আস্তে শুকিয়ে নিলে তামাক উপযুক্ত হ'ল। জাগে থাকার অবস্থায় বৃষ্টি লাগলে তামাক নষ্ট হ'য়ে যাবে ; সে বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

এক বিঘার চাষে তামাক উৎপন্ন হবে নিম্নরূপ—
(শুকনো তামাকের হিসাব):

(১) প্রথম কাটা—২ই থেকে ৩ই মণ।

(২) দ্বিতীয় কাটা—৩০ সের থেকে ১ মণ।

(৩) তৃতীয় কাটা—১৫ সের থেকে ২৫ সের।

বিঘাপ্রতি মাত্র সাড়ে তিন মণ তামাক ধরলে আপনার হাতে আসবে ৪ মাসের চাষে কমপক্ষে সাড়ে তিনশত টাকা। তামাকের বাজারদর মণপ্রতি ১০০ টাকার নিচে কখনও নামে না। এ চাষে আপনার খরচ পড়বে ১০০ টাকা। আপনার ধানের ক্ষেত থেকেই দ্বিতীয় ফসলটা উঠিয়ে নিতে পারলেন এবং এ ক্ষেতে তামাক চাষের পর যে সারটা থেকে গেল এবং মাটিতে যে চাষ করা থাকল, তাতে আপনার পরবর্তী ধানের ফলন হবে দ্বিগুণ।

তামাকের চাষটা কার্তিকে করলে সুবিধা এই যে, এ চাষ ফাল্গুনের প্রথমে শেষ হয়। পৌষের শেষে করলে শেষ হয় চৈত্রে। সে সময় শিলাবৃষ্টি হ'তে পারে। তামাকপাতার একমাত্র শত্রু শিলা। গোরু-মহিষ অথবা ছাগলে এ গাছ স্পর্শও করবে না ; তবে ক্ষেতে ঢুকলে গাছগুলি ভেঙে ফেলতে পারে, সেজন্য কিছুটা সতর্ক থাকা দরকার। এ গাছের কোন শত্রু-কীটও দেখা যায় না।

সিগরেটের জন্য সুবিখ্যাত ভার্জিনিয়া তামাক। এর চাষ বোম্বাইতে আরম্ভ করা হয়েছে—ঠিক এই উপায়ে। পশ্চিম বাঙলায়ও ভার্জিনিয়া তামাকের চাষ করা যেতে পারে এবং তা যে আরও লাভজনক, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বীরভূমের খেড়ো

মহম্মদ মজহর আলি

বীরভূমের খেড়ো বিখ্যাত। ইহা একাধারে খাদ্য, পানীয় ও সর্বাঙ্গ এবং ইহার গাছ, পাতা ও ডাঁটা উৎকৃষ্ট সবুজসার। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, ইহার চাষ বীরভূম জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পশ্চিম বাঙলার বহু জেলার লোকে খাওয়া দুরূহের কথা ইহার নামও জানেন না। বীরভূম জেলার রক্ষ মাটিতে যখন যথেষ্ট জন্মায়, তখন অন্যান্য জেলার উর্বর মাটিতে যে ইহার আরও অধিক ফলন হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সাধারণ চাষীরা গতানুগতিকভাবে এই ফসলের চাষ করেন; নতুন কিছু করিতে তাঁহারা ভয় পান—পাছে লোকসান হয়। তাহা ছাড়া, চাষ করিবার পদ্ধতি না জানা খেড়ো-চাষের প্রধান অন্তরায় বলিয়া মনে হয়। এই অন্তরায় দূর করিবার জন্য এখানে খেড়ো-চাষের বিবরণ দেওয়া হইল।

খেড়ো মেঠো কৃষি। উর্বর, অনুর্বর, সেচ-পাওয়া, সেচ-না-পাওয়া—সব রকম জমিতে ইহার চাষ চলে। সেচ-না-পাওয়া জমিতেও ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। সেচ-পাওয়া জমিতে মূলা ও আলুর সহিত মিশ্রচাষ করিতে হয়। রুবি খন্দে ভাদ্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্র মাস পর্যন্ত ইহা রোপণ করা চলে। তবে যত আগেভাগে ফসল বাজারে তোলা যায়, আয়ও তত বেশি হয়। খেড়োর গাছ ও তরমুজের গাছ দেখিতে একই প্রকার,—চেনা যায় না। খেড়োর ফল লম্বাটে, তরমুজ গোল। উভয় ফলের গায়ের রঙ একই প্রকারের হয়। খেড়োর বীজ কালো, কিন্তু তরমুজের বীজ লালচে রঙের হয়।

যেখানে সেচের সুবিধা নাই, সেই জমিতে বর্ষার পর তিন-চারিবার লাঙল দিয়া আট হাত অন্তর মাদা তৈয়ার করিতে হয়। সেই মাদায় কিছু কিছু পচা গোবরসার দেওয়া ভাল। ভাদ্র মাস হইতে

কার্তিক মাসের মধ্যে বীজ রোপণ করিতে হইলে রোপণের পূর্বে বীজগুলিকে ৪৮ ঘণ্টা কাল কোন মাটির পাত্রে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তারপর উক্ত প্রত্যেক মাদায় ৪-৫টি করিয়া বীজ দিয়া মাটি ঢাকা দিতে হয়। ৭-৮ দিনের মধ্যে গাছ বাহির হয়।

শীতের সময় চাষ দেওয়া হইলে মাটি ঠান্ডা থাকার জন্য বীজগুলিকে ৪৮ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া তৎপরে পুরাতন গোবর ও কিছু পুরাতন খড় এক সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া, রগড়াইয়া একটু রস দিয়া, বীজগুলিকে উহার মধ্যে দিয়া, ভেটের (বড়-পাতাযুক্ত গুল্ম-বিশেষ) পাতা দিয়া জড়াইয়া, এক খণ্ড ন্যাকড়ার দ্বারা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া, খড়ের গাদা কিংবা সারের গাদার ভিতর রাখিয়া দিতে হইবে। চার-পাঁচ দিন পর বাহির করিয়া দেখিতে হইবে। যদি শিকড় বাহির হইতে আরম্ভ করে, তবে জমিতে রোপণ করিতে হইবে। শিকড় বাহির না হইলে, একটু রস দিয়া আবার ঐ অবস্থায় রাখিলে দুই-তিন দিনের মধ্যেই জমিতে রোপণ করিবার উপযুক্ত হইবে।

গাছ বাহির হইয়া লতা ছাড়িতে আরম্ভ করিলে সমস্ত জমি কোদালি দিয়া একটু গভীর করিয়া খুঁড়িয়া মাটি আলগা করিয়া ও আগাছা পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। মূলা ও আলুর জমিতে মিশ্রচাষ করিলে মিঠা কুমড়ার চাষের প্রণালীতে করিতে হইবে। তারপর আগাছা পরিষ্কার করা ছাড়া বিশেষ কোন পরিচর্যার দরকার হয় না। কিছু দিনের মধ্যে লতা শাখ-পাতার দ্বারা জুমি ঢাকিয়া ফেঁসিলে। তিন মাসের মধ্যে ফল ধরিতে আরম্ভ করে। দফায় দফায় নিচু জমিতে বর্ষার পূর্বে পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। ইহা জল দাঁড়ানো হয় করিতে পারে না। যেখানে জল দাঁড়ায় না তেমন উঁচু জমিতে বর্ষাকালেও ফল পাওয়া যায়।

প্রথম দফার ফল বড় ও দ্বিতীয়-তৃতীয় দফার ফল ছোট হয়। এক-একটি গাছে ৫০ থেকে ৬০টি ফল হয়। এক-একটির ওজন আধ সের হইতে আধ মণ পর্যন্ত হয়। এক-একটির মূল্য এক আনা হইতে আরম্ভ করিয়া দুই টাকা পর্যন্ত হয়। একবিঘা জমিতে ২৫০ টাকা পর্যন্ত লাভ হয়। অথচ চাষের খরচ খুব কম।

নিচু জমির গাছ বর্ষার জল পাইলেই নষ্ট হইতে আরম্ভ করে। তখন জমিতে লাঙল দিয়া গাছ-পাতাগুলিকে মাটির সহিত মিশাইয়া দিলে, তিন-চার দিনের মধ্যে পচিয়া উৎকৃষ্ট সবুজসার হয়। পরবর্তী সময়ে ধান্য বা অন্য যে-কোন ফসলের চাষ দেওয়া হউক না কেন, তাহার ফলন খুব ভাল হয়। ইহা আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। এদিক হইতে ইহার মূল্য এত বেশি যে, খেঁড়ো চাষের সমস্ত খরচ ইহার দ্বারা পোষাইয়া যাইবে।

খেঁড়ো নানাভাবে খাওয়া যায়। কাঁচ অবস্থায় সবজিরূপে ঝোল, ঝাল, চিংড়ি মাছের সহিত তরকারি উপাদেয়। দারুণ গ্রীষ্মকালে খেঁড়ার ঝোল স্নিগ্ধ ও লোভনীয়। পরিণত অবস্থা হইতে সুপক্ক অবস্থা পর্যন্ত খেঁড়ো শিশু-যুবক-বৃদ্ধ সকলের লোভনীয় খাদ্য ও পানীয়। গ্রীষ্মকালে একটি বড় সুপক্ক খেঁড়ো আট-দশজন লোকের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর করে। পাকা খেঁড়ো এতই লোভনীয় যে, উহা পাকিবার পূর্বে জমিতে পুতিয়া না রাখিলে বীজ রক্ষা করা কষ্টকর হয়।

এহেন খেঁড়ার চাষের প্রসার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমি এর চাষের বিষয়ে আমাদের কৃষি-বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং এই রাজ্যের প্রত্যেক জেলার চাষীভাইকে ইহার চাষ করিতে অনুরোধ করি।



ধানের গাছ লুটিয়ে পড়া

ধানের চাষে গাছ মাটিতে লুটিয়ে পড়ার দরুন ফসলের যে ক্ষতি হয় তার পরিমাণ এবং এই শূন্য-পড়ার উপর গাছের গোড়ার মাটি তুলে আল দেওয়ার প্রভাব নির্ণয়ের জন্য তিনটি প্রাথমিক পরীক্ষা করা হয়েছে।

প্রথম পরীক্ষণ

১৪২ থেকে ১৬৫ দিনে কাটবার উপযোগী উড়িষ্যা চার রকম উন্নত জাতের ধানবীজ নিয়ে, প্রত্যেকটি ২০ শতক জায়গাতে লাগানো হয় এবং তাতে ৮০ পাউন্ড নাইট্রোজেন ও ৩৬ পাউন্ড

ফসফরিক অ্যাসিড সার দেওয়া হয়। ফুল ধরার কয়েকদিন আগে প্রত্যেক ক্ষেতের অধিক অংশের গাছ, সারির মাঝ দিয়ে দাঁড়ি বেঁধে খাড়া করে রাখা হয়। ক্ষেতের দু'দিকের আলে ও ক্ষেতের মাঝে বাথারি পুঁতে এই দাঁড়ি বাঁধা হয়েছিল। ক্ষেতের অপর অধিক অংশে এরকম কোন প্রতিকার করা হয় নি। স্বাভাবিক অবস্থায় টাইপ ১১৪৫ জাতের গাছ ফুল ধরার সময় শূন্যে পড়ে; কিন্তু অন্য তিনটি জাতের গাছ সাধারণত ফুল ধরার ১৫ দিন পরে লুটিয়ে পড়ে। লুটিয়ে-পড়া ও সোজা হয়ে থাকা শস্যের ফলন নিচের তালিকায় দেওয়া হ'ল।

তালিকা ১

প্রতি একরে ধানের ফলন (পাউন্ড)

বীজের নাম	অবলম্বী	বিনা-অবলম্বী (নিম্নগণ)	নিম্নগণ-শস্যের ফলন অপেক্ষা অবলম্বী শস্যের অধিক ফলন (শতকরা)	মন্তব্য
টাইপ ১১৪৫	২,৫৯০	১,৭৫০*	৪৮.০	*ফুল ধরার সময় গাছ শুয়ে পড়েছিল।
,, ১৪১	৩,৪২৩	৩,১৪৪†	৮.৮	
,, ৯০	২,৭৬২	২,৪১৮†	১৪.২	ফুল ধরার ১৫ দিন পরে গাছ শুয়ে পড়েছিল।
,, ১২৪২	৩,১৭২	৩,০১১†	৫.৩	

এ থেকে দেখা যায় যে, যে ফসল ফুল ধরার সময় শূন্যে পড়ে তাতে, ফুল ধরার ১৫ দিন বাদে লুটিয়ে-পড়া ফসলের চেয়ে, বেশি ক্ষতি হয়। ফসল অবশ্য খুবই সাবধানে কাটা হয়েছিল যাতে শস্য ঝরে না পড়ে।

দ্বিতীয় পরীক্ষণ

এই পরীক্ষাটি সমান করে লাগানো বড় ক্ষেত থেকে যদৃচ্ছাক্রমে ৩ ফুট×৩ ফুট আকারের ছয়টি

জায়গা নির্বাচন করে, তাদের দাঁড়ির সাহায্যে লুটিয়ে পড়া থেকে রক্ষা করা হয়েছিল। এই ছয়টি নমুন অপর ছয়টি একইরূপ অরক্ষিত নমুনার সঙ্গে তুলন করা হয়েছে। মোট চার রকমের উন্নত ধানের বীজ ব্যবহার করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ফুল ধরার ১৫ দিন বাদে স্বাভাবিকভাবে গাছ মাটিতে পড়ে যেতে দেখা গিয়েছিল। এইসব নমুনার ফলনের পরিমাণ ও তৎসংক্রান্ত গুণাবলী ২য় তালিকাতে দেওয়া হ'ল।

তালিকা ২

বীজের নাম	উপচার	প্রতি নমুনায় (৩' × ৩') গাছের গড় সংখ্যা	প্রতি নমুনায় প্রাপ্ত ধানের শীঘের সংখ্যা	প্রতি গাছে শীঘের সংখ্যা	গাছপ্রতি ধানের ফলন (গ্রাম)	গাছপ্রতি তুষের ওজন (গ্রাম)	ফসলের ওজন (শতকরায় প্রকাশিত)	তুষের ওজন (শতকরায় প্রকাশিত)
বি এ এস	৯	বিনা-অবলম্বী	২০.৩৩	১৫৯.৩০	৭.৮৩	১৭.৫৬	০.৬০	১০০.০
		অবলম্বী	২১.৮৩	১৭০.৯০	৭.৮৩	১৮.৭১	০.৫২	১০৬.৫
টাইপ	১২৪২	বিনা-অবলম্বী	২৪.৫৮	১২৫.৪০	৫.১০	১২.২০	০.৫৫	১০০.০
		অবলম্বী	২৮.৬৬	১৪০.০০	৪.৯০	১৩.০৮	০.৪১	১০৭.২
টাইপ	১৪১	বিনা-অবলম্বী	১৪.৮৩	১২৯.৬০	৮.৭৪	১৯.৪৮	১.০০	১০০.০
		অবলম্বী	১৫.৬৬	১২৯.৬০	৮.২৯	১৯.৭৯	০.৯৪	১০১.৫
টাইপ	৯০	বিনা-অবলম্বী	১৫.৬৬	১৬২.৩৩	১০.৩৬	২০.০০	০.৯০	১০০.০
		অবলম্বী	১৬.১৬	১৭৪.৬৬	১০.৮০	২১.৫৩	০.৮২	১০৭.৭

এই পরীক্ষার ফল থেকে দেখা যায় যে, লুটটিয়ে-পড়া শস্যে ফলনের ক্ষতি প্রধানত তুষের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার জন্যই হয়ে থাকে। ফসলের ক্ষতি ১-৭ শতাংশ দেখা গিয়েছিল।

তৃতীয় পরীক্ষণ

এই পরীক্ষাটিতে জে ১৭৫ নামক উন্নত ধানের বীজ ব্যবহার করা হয়েছিল। রোপণের সাত সপ্তাহ পরে গাছের সারিতে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে আল বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। প্রতি নমুনায় অর্ধেক-সংখ্যক গাছের গোড়ায় আল দেওয়া হয়েছিল ও বাকি অংশ অরক্ষিত ছিল। ইতস্তত এরূপ ছয়টি নমুনা নির্বাচন করা হয়েছিল। দেখা গেল যে, এভাবে অরক্ষিত শস্য ফুল ধরার ১০ দিন পরে সম্পূর্ণরূপে মাটিতে লুটটিয়ে পড়েছিল কিন্তু আল-দেওয়া শস্য মোটেই হেলে পড়ে নি। এই পরীক্ষা

থেকে পাওয়া ফলনের পরিমাণ ওয় তালিকায় দেওয়া হল।

তালিকা ৩

আল-দেওয়া ও বিনা আলের ক্ষেতে শস্যের পরিমাণ

	আল-বাঁধা	আল-না-বাঁধা
একর-প্রতি ফলন (পাউণ্ড)	৩,৫১৯	৩,২৫৮
শতকরায় প্রকাশিত	১০৮.০	১০০.০

এ থেকে দেখা যায় যে শস্যে আল-দেওয়া চাষের প্রথা গাছকে শূন্যে পড়া থেকে রক্ষা করে।

অবশ্য এই পরীক্ষাগুলি অত্যন্ত সাধাসিধা ধরনের। শস্যের বাড়ির বিভিন্ন সময়ে গাছ শূন্যে পড়ায় যে ক্ষতি হয় সে সম্বন্ধে বিস্তৃত অনুসন্ধান চলছে।*

*১৯৫৫ সালের ৩য় খণ্ড ১ম সংখ্যা 'রাইস নিউজ টেলার'-এ প্রকাশিত শ্রী এম এস পিল্লাই-এর প্রবন্ধে বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক শ্রীমল্লধি মিত্র, বি এল-সি (এ জি), অ্যাসোসিাই এ আর আই।

চুঁচুড়া কৃষি-গবেষণাকেন্দ্র

বহু বাধাবিঘ্ন সামনে রেখেও সমস্যাকটকিত পশ্চিম বাঙলা, তার অগ্রগতির পথে যাত্রা করেছে। কিন্তু বিভক্ত বাঙলার খাদ্যসমস্যা উঠেছে প্রবল হয়ে।

অবিভক্ত বাঙলা কৃষিসম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। বঙ্গ বিভক্ত হওয়ায় তার কৃষিভূমির অধিকাংশ স্থানই পূর্বাঞ্চলের মধ্যে পড়েছে, আর পশ্চিমে রয়েছে প্রধান শিল্পকেন্দ্রগুলি। তাই 'সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা' বঙ্গভূমির রূপ পালটে যাচ্ছে।

ভত বাঙালীর প্রধান খাদ্য। আর খণ্ডিত বাঙলায় ধানের উৎপাদন-বৃদ্ধির দিকে আজ বিশেষভাবে নজর দেবার সময় এসেছে। কৃষিকাজের উন্নয়ন এবং শস্যের উৎপাদন—বৃদ্ধির জন্য আধুনিক ধরনের যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। কৃষিব্যবস্থার উন্নতি না করলে শস্য-উৎপাদনের কাজ দ্রুত হ'তে পারে না। প্রত্যেক রাজ্যেরই খাদ্যব্যবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া দরকার, আর সকল সমস্যাতেই স্বাধীন দেশের দায়িত্ব বেশি।

ব্রিটিশ-রাজত্বের আমলে আধুনিক ব্যবস্থায় উৎপাদন-বৃদ্ধির চেষ্টায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যায় নি। তা ছাড়া অবিভক্ত বাঙলাদেশে কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে যেসব সুবিধা পেত, এখন তা পাওয়া সম্ভব নয়। যা হোক, সে সময় কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্য যে ক'টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল চুঁচুড়া কৃষি-গবেষণা-কেন্দ্র তাদের মধ্যে প্রথম বলে দাবি করতে পারে।

প্রথম যুগের ইতিহাস

১৯০৮ সালে বাঙলাদেশে পৃথক কৃষিবিভাগ গঠিত হয়, তার সদর কার্যালয় তখন স্থাপন করা হয়েছিল ঢাকায়, আর উক্ত বিভাগটি ভূমি ও রাজস্ব বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। কয়েক বছরের মধ্যে ঢাকায় একটি গবেষণাগারও স্থাপন করা হয়। পরবর্তী ২২ বছর এই গবেষণাগারের কাজ বেশ ভালভাবে এগিয়ে চলেছিল। তারপর ১৯৩২ সালে দু'টি গবেষণা-পরিচালনা স্থির হয়, এবং এ ব্যাপারে অর্থ

দিয়েছিলেন 'এ সি এ আর'। তার ফলে চুঁচুড়া ও বাঁকুড়ায় দু'টি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়।

উদ্দেশ্য

উৎপাদিত ধানের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্যই প্রথম গবেষণাকার্য আরম্ভ হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের 'পাটনাই' ধান নিয়ে পরীক্ষাকার্য চলে। এ ছাড়াও নাগেশ্বর, ঝাংগাশাল ইত্যাদি ধানের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য গবেষণা করা হয়।

তবে ব্রিটিশ রাজত্বের আমলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশবাসীর প্রয়োজন মেটানোর চেয়ে বাণিজ্যের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখেই বেশির ভাগ সময়ে কাজ করা হ'ত। কিন্তু আজ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে, স্বাধীন দেশে সরকার ও জনসাধারণের স্বার্থের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

১৯৪৪ সাল পর্যন্ত গবেষণাকেন্দ্রটি 'এ সি এ আর'এর আনুকূল্যে গবেষণাকার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তারপর গবেষণাকেন্দ্র তদানীন্তন বঙ্গ-সরকারের অধীনে এসে পড়ে।

বর্তমানে পশ্চিম বাঙলায়, আউশ, আমন ও বোরো এই তিন জাতের ধান দেখতে পাওয়া যায়। এই তিন রকমের ধান থেকে আরও বিভিন্ন ধরনের ধান জন্মানো এবং উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য গবেষণাকার্য চালান হচ্ছে।

গবেষণা-সূচি

গবেষণাকেন্দ্রের বিভিন্ন শাখা ধান-উৎপাদনের এক-একটি দিক নিয়ে কাজ ক'রে যাচ্ছে, আর বিশেষজ্ঞদের পরিচালনায় পরীক্ষাকার্য অগ্রসর হচ্ছে। গবেষণাকেন্দ্রের এই শাখাগুলির কার্যাবলী নিয়ে এবার আলোচনা করা যেতে পারে।

(ক) অর্থকর উদ্ভিদ-তত্ত্ব শাখা। উৎপাদিত ধানের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য এ শাখায় কাজ চলেছে।

(খ) কীটবিদ্যা শাখা। ভাল ধান উৎপাদন করতে হ'লে বিরুদ্ধ পরিবেশ থেকে শস্যকে রক্ষা করতে হবে। কীটপতঙ্গ কেবল ধানের উৎকর্ষ নষ্ট করে না, উৎপাদন-বৃদ্ধিও বন্ধ ক'রে দেয়। কীটবিদ্যা শাখা বিপজ্জনক কীটপতঙ্গ থেকে ধানক্ষেতকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করছে। এখানে দু'টি বিষয় নিয়ে গবেষণা চলেছে:

(১) গাছের ডাটার ভিতর গর্ত অনুসন্ধান কর।

(২) পোকামাকড় দ্বারা ক্ষতি হবার আশংকা ঘটলে কীটনাশক ওষুধ ছড়ানো।

(গ) ছত্রাকবিজ্ঞান শাখা। 'হেলমিন্থস পোরিস' নামে এক রকম রোগে প্রায়ই ধানগাছ আক্রান্ত হয়। এ শাখার কাজ হ'ল এই রোগের কারণ অনুসন্ধান ও রোগদমনের উপায় নির্ণয় করা।

(ঘ) কৃষি-রসায়ন শাখা। জমির উর্বরতা বৃদ্ধি না করতে পারলে ভাল শস্য উৎপাদন সম্ভব হয় না। জমিতে সার দিলে জমির উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধি পায়। কৃষি-রসায়ন শাখা দুই ধরনের সার নিয়ে পরীক্ষা করছে—(১) অ্যামোনিয়া ও (২) কয়েক রকম সবুজসার।

উন্নতি

চু'চুড়া গবেষণাকেন্দ্রটির কাজ অগ্রগতির পথে। বিভিন্ন শাখায় দায়িত্বশীল বিশেষজ্ঞগণের তত্ত্বাবধানে এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্ম স্বেচ্ছাভাবে পরিচালিত হচ্ছে। অন্নবস্ত্রের সংস্থান না হ'লে মানুষ বাঁচতে পারে না। খাদ্যসমস্যা আজ আমাদের উৎকণ্ঠিত করে তুলেছে। এ সময় গবেষণাকেন্দ্রটির খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ সফল উদ্যম প্রশংসনীয়।

উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ধরনের ধান উৎপাদনের জন্য মিশ্রবীজ থেকে উৎপাদিত ধান উৎপাদনের কাজ চলেছে। এর ফলে পাওয়া গেছে:

জাপানিকা×ইন্ডিকা (মিশ্র)

ভাস মানি×সাতিকা (মিশ্র)

পাটনাই (২৩)×আচরা ১০৮ (মিশ্র)

সমগ্র ভারতে এ ধরনের যে ক'টি কেন্দ্র আছে তার মধ্যে উড়িষ্যার গবেষণাকেন্দ্রটির পরেই চু'চুড়া কৃষি-গবেষণা কেন্দ্রটির নাম করা যেতে পারে। ভারতের মধ্যে এটি অন্যতম প্রধান কৃষিগবেষণা কেন্দ্র। আধুনিক ধরনের সাজসরঞ্জামযুক্ত গবেষণাগার, একটি 'মিউজিয়াম' ও পাঠাগার গবেষণাকেন্দ্রটির সম্পদ বৃদ্ধি করেছে। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের উৎসাহ ও সহায়তার ফলে কাজ করা সহজ হচ্ছে। গবেষণাকেন্দ্রের পর্যবেক্ষণাগারটি একেবারে আধুনিকভাবে নির্মিত হয়েছে। শস্যের উপর সূর্যালোক, উত্তাপ ইত্যাদির প্রভাব সম্পর্কে পরীক্ষা করা হ'ল পর্যবেক্ষণাগারটির কাজ।

বর্তমানে ধান ছাড়া অন্য কয়েকটি ফসল নিয়েও পরীক্ষা চলেছে—এ পর্যন্ত একশতেরও অধিক ধরনের কদলী সংগ্রহ করা হয়েছে। উদ্যান-কৃষির অধীক্ষকের অধীনে এই গবেষণা-শাখার কাজ চলছে।

এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের অর্থকর উদ্ভিদ-তত্ত্ব শাখা—ওট, নানা ধরনের তুণ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন।

কৃষিবিদ্যালয়

১৯২১ সালে অবিভক্ত বাঙলার সরকার চু'চুড়ায় একটি কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯২৪ সালে বিদ্যালয়টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হয়ে যায়, আবার ১৯৪০ সাল থেকে সরকারের অধীনে এসে পড়ে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে বিদ্যালয়টির পুনর্গঠন করা হয়।

বিদ্যালয়টিতে কৃষি শিক্ষা দানের যথোচিত সুব্যবস্থা আছে। আর উপযুক্ত পাঠ্যতালিকা অনুসারে শিক্ষা দেওয়ার ফলে ছাত্রেরা কৃষিকাজে যোগ্যতা অর্জন করছেন।

পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির নাম নিচে দেওয়া গেল:

১। কৃষি

২। উদ্যান-কৃষি ও ফসল উৎপাদন

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ১২শ সংখ্যা

- ৩। পশুবিজ্ঞান
- ৪। কৃষি বাস্তুবিদ্যা
- ৫। প্রাণিবিদ্যা-উদ্ভিদবিদ্যা
- ৬। ছত্রাকবিজ্ঞান ও কীটবিজ্ঞান।

বিদ্যালয়টিতে মোমাছি পলন শিক্ষা দেবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

অন্যান্য ব্যবস্থা

বিদ্যালয়ের কাছেই ২০ একর জমি জুড়ে একটি কৃষিক্ষেত্র আছে। ছাত্ররা সেখানে মাঠে গিয়ে কাজ করবার সুযোগ পায়।

আর হাতেকলমে কাজ করবার সুশিক্ষা দেবার জন্য একটি গবেষণাগারও রয়েছে।

পাঠাগারটিতে অনেক বই আছে, নান পত্রপত্রিকাও এখানে রাখা হয়েছে। সম্প্রতি বিদ্যালয়ে একটি কৃষি-সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পশুবিজ্ঞান সম্পর্কে হাতেকলমে শিক্ষা দেবার সাহায্য করছে দুগ্ধাগার ও পক্ষিসংস্থান কেন্দ্রটি।

ছাত্রসংখ্যা

বিদ্যালয়টিতে প্রতি বছরে ৮০ জন ছাত্রকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে।

বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার গুণাবলী—প্রবেশিকা বা স্কুলফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হ'লে কোন ছাত্রকে কৃষিবিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় না। প্রতি ছাত্রকে মাসে ২৫ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্রকে বিদ্যালয়ে সংলগ্ন ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশুনা করতে হয়।

শিক্ষকমণ্ডলী

প্রধান শিক্ষক

দু'জন সহকারী শিক্ষক

একজন বাস্তুকার-উপদর্শক

একজন কৃষি-উপদর্শক (ইনি কৃষিক্ষেত্রে ছাত্রদের শিক্ষা দেন)

উদ্ভিদবিদ্যা ও ছত্রাকবিজ্ঞান, শিক্ষা দেবার জন্য আংশিক সময়ের একজন শিক্ষক। কীটবিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য একজন নির্দেশক।

শিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রদের চাকরি

কৃষিবিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ছাত্রদের সরকার গ্রহণ করেন। অবশ্য তাঁদের মধ্যে অনেকে নিজেদের জমিতে গিয়ে ভালভাবে কৃষিকর্ম চালাবার ব্যবস্থাও করে থাকেন।

ফোর্ড ফাউন্ডেশন ট্রেনিং সেন্টার

বিদ্যালয়ের কাছে একটি 'ফোর্ড ফাউন্ডেশন ট্রেনিং সেন্টার' আছে। যেসব ছাত্র কৃষিবিদ্যালয় থেকে কৃতকার্য হয়ে বেরিয়ে আসেন, তাঁদেরই এখানে নেওয়া হয়।

১৯৫৪ সালে কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামসেবক-দের শিক্ষা দেওয়াই এর উদ্দেশ্য।

খামারবাড়ি

৭০.৩ একর জমি নিয়ে সম্পূর্ণ খামারটি তৈরি হয়েছে। খামারবাড়ি স্থাপনের উদ্দেশ্য হ'ল উন্নত ধরনের বিভিন্ন শস্য উৎপাদন এবং সার ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করা।

ছোট প্লটটিতে আছে খামার আর কর্মচারীদের আবাস। আর বড় প্লটটি এ বি সি ও ডি এই চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। চারটি ব্লকে দু'টি প্রধান রাস্তা দিয়ে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

সি প্লটের নলকূপ সমস্ত স্থানটির জল সরবরাহ করে। এখান থেকে ঘণ্টায় ৩৫,০০০ গ্যালন জল তোলা যায়। এই জল খামারের সেচ দেওয়ার জন্যও ব্যবহার করা হয়।

মহৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে গবেষণাকেন্দ্রটির কাজ আরম্ভ হয়েছিল। (১) ভাল জাতের শস্য উৎপাদন, (২) ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণে ভাল সার প্রয়োগ, (৩) বাছাই করা বীজ উৎপাদন—এগুলিই হ'ল গবেষণাকেন্দ্রের প্রথম গৃহীত কার্যাবলী।

অবশ্য ধান্য-উৎপাদনের দিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। আর কৃষিক্ষেত্রটির ভূমি ধান্য-উৎপাদনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ক্ষেত্রের অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে উচ্চ ভূমির উপযুক্ত শস্যের চাষ করা হয়।

চু'চুড়া শহর থেকে গবেষণাকেন্দ্রটি প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। কলিকাতা থেকে সুন্দর পাক রাস্তা দিয়ে বরাবর গিয়ে চু'চুড়া গবেষণাকেন্দ্রে পৌঁছানো যায়।

বিভিন্ন শাখার কার্য চলছে বিভাগীয় প্রধানদের অধীনে, এবং এ'রা সকলেই নিজ নিজ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

কৃষিকার্যের সকল ক্ষেত্রে সাফল্য আনাই হ'ল গবেষণাকেন্দ্রটির প্রধান উদ্দেশ্য। অবশ্য আদর্শের যথার্থ রূপ গ্রহণের মধ্যেই উদ্দেশ্যের সার্থকতা প্রকাশ পায়। তাই উদ্দেশ্যকে সফল করবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। গবেষণাকার্যের ফলে যেসব সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে সেগুলি যথাযথ কার্যে রূপায়িত করা হচ্ছে।

হাওড়া ও হুগলি জেলার কৃষি-অধ্যক্ষকে স্থানীয় খামারগুলিতে পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফল প্রয়োগ করবার ভার দেওয়া হয়েছে। এইভাবে উন্নত পদ্ধতিতে কৃষিকার্য চালাতে পারলে কৃষিসম্পদের গ্রীবীর্ষ অবশ্যম্ভাবী।



‘বেয়ার’এর পোকা ও রোগ দমনের ঔষধগুলির
দ্বারা আপনাদের ফসল রক্ষা করুন

ফলিডল-ই ৬০৫

মেটাসিস্টক্স

সেরেসান

অ্যাগালিল

কুপ্রাভিট (ওবি ২১)

এইগুলি পশ্চিম জার্মানীর লিভারকুসেনের
ফারবেনফ্যাবরিকেন বেয়ার
দ্বারা প্রস্তুত আসল ঔষধ।

ভারতে পরিবেশক

চিকা প্রাইভেট লিমিটেড,

৩১, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২



উদ্ভিজ্জ সার

অরুণ মুখোপাধ্যায়

শস্যের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য জমির উর্বরতার ক্ষয় পূরণ করা একান্ত প্রয়োজন— আজকের প্রত্যেকটি কৃষকেরই এটা জানা দরকার। জমির ক্ষয় পূরণের একমাত্র উপায় হল উপযুক্ত সার প্রয়োগ। চাষ-আবাদের কাজে সার এই কারণেই অমূল্য সম্পদ। প্রত্যেকটি কৃষকের এই সার প্রস্তুত করা ও তার ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন থাকা একান্ত প্রয়োজন। কেননা জনসংখ্যার অভূতপূর্ব বৃদ্ধির ফলে যেখানে খাদ্যের চাহিদা বিপুল পরিমাণে বেড়েছে, সেখানে জমির উৎপাদন-শক্তি বাড়ানো কতটা প্রয়োজন, তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এজন্য সারের চাহিদাও বিরাট—তাতে কোন সন্দেহই নেই। এই সারের মধ্যে অন্যতম হল উদ্ভিজ্জ সার। বর্তমান প্রবন্ধে এই উদ্ভিজ্জ সার তৈরির প্রণালী ও তার ব্যবহার নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

সার দুই শ্রেণীরঃ রাসায়নিক এবং জৈব বা অরাসায়নিক। জৈব সারের মধ্যে গোবরসার সর্বোৎকৃষ্ট। এই গোবরের যথেষ্ট অপব্যবহার হয় : আবার কোন কোন অঞ্চলে জমির তুলনায় যথেষ্ট গোবর মেলেও না। সেইসমস্ত অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রয়োজন উদ্ভিজ্জ সারের প্রচলন হওয়া। কেননা এই সার শুধু যে সহজে প্রচুরপরিমাণে তৈরি করা যায় তাই নয়, উৎকর্ষের দিক দিয়েও এ সার কোন অংশে অন্য সারের চেয়ে কম নয়। বিশেষ করে এইসব সারে যে মূল্যবান জৈব পদার্থ (হিউমাস) থাকে, রাসায়নিক সারে তা বিশেষ মেলে না। অথচ জৈব পদার্থ গাছের সুস্থ বিকাশের জন্য একান্ত আবশ্যিক।

ক্ষেত থেকে ফসল নেওয়ার পরে পড়ে থাকা আগাছা, খামারের আবর্জনা, আখের ছিবড়ে ও

পাতা, গোরুর খাদ্যের পরিত্যক্ত অংশ, জংলা গাছ-পাতা, কচুরিপানা ইত্যাদি যতকিছু একেজো জিনিসকে মূল্যবান উদ্ভিজ্জ সারে রূপান্তরিত করা যায়। এই উদ্ভিজ্জ সার যে-কোন গাছের পক্ষেই উপযোগী। অথচ কোন অঞ্চলেই এইসব আবর্জনার অভাব নেই। বরং এসবের প্রাচুর্য কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের সুস্থ জীবনধারণে ব্যাঘাত ঘটায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে পশ্চিম-বাঙলার পুষ্করিণী বা জলার কচুরিপানার উপদ্রব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর বৃদ্ধি বন্ধ করা যেমন দুঃসাধ্য, বৃদ্ধি হতে দেওয়াও তেমনি বিপজ্জনক। অথচ এই কচুরিপানাকে উপযুক্ত উপায়ে পচিয়ে প্রচুর সার তৈরি করা চলে। ফলে যে ছিল শত্রু, সে হয়ে ওঠে পরম বন্ধু। কচুরিপানায় প্রচুর রস থাকার দরুন এর পচন যেমন এক রকম আপনা হাতেই হয়, তেমনি তাতে সময়ও লাগে অনেক কম।

উদ্ভিজ্জ সার তৈরির ব্যাপারেও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে। পশ্চিম-বাঙলার জলবায়ু ও উপাদানের প্রকৃতি অনুযায়ী সবচেয়ে উপযোগী প্রণালীটি নিচে বর্ণিত হ'ল।

স্থান নির্বাচন

সব-আগে জায়গা নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত জায়গা বেছে নেওয়া দরকার। এ জন্য এমন একটা জায়গা দেখতে হবে যেটা—

(১) বর্ষার জল কিংবা নদীর বানের জলে ডুবে বা ধুয়ে যায় না,

(২) সমতল হয়,

(৩) বড় বড় গাছের ছায়ায় আচ্ছাদিত হয়, কেননা তা নইলে আবর্জনা পচবার সুযোগ না পেলে অনেক সময় রোদে শুকিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

আবজর্না পচাবার জন্য সবচেয়ে উপযোগী হ'ল গোয়ালের ধোয়ানি বা নালার জল। সুতরাং অথবা সরার খাটুনি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মা কিংবা গোয়ালের পেছনে বা কাছাকাছি সরার স্থান নির্বাচন করা চলতে পারে।

১) সাজানোর পদ্ধতি

সার তৈরির জন্য যদি শুকনো আবজর্না জড় করা যায় থাকে তবে গাদা দেওয়ার তিন-চার দিন আগে গুলোকে গোয়ালের মেঝেয় যদি বিছিয়ে রাখা হয়, তা হ'লে গোমূত্র টেনে নিয়ে সেগুলো বেশ জে ওঠে। ফলে সেগুলো পচেও অনেক দ্রুত ভাঙাড়া। এরপর আবজর্নাগুলো তুলে নিয়ে দৃষ্ট জমির উপরে সমানভাবে বিছিয়ে তিন হাত আন্দাজ পুরু স্তর করতে হবে। এই স্তর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে

- (১) যেন স্তর যথাসম্ভব আলগাভাবে চাপানো হয়।
- (২) গাদার উপর কোন কারণেই যেন চাপ না পড়ে, কিংবা তা পেটানো না হয়।
- (৩) তিন পোয়া হাত উঁচু একটির উপর একটি করে স্তর সাজাতে হবে। আবজর্নার এক-একটা গাদা যেন চার হাতের বেশি ১০ ডা এবং পোনে তিন হাতের বেশি উঁচু না হয়। অবশ্য তার দৈর্ঘ্য সারের অনুপাত অনুযায়ী যত খুশি লম্বা করা চলতে পারে।

- (৪) যদি জন্তু-জানোয়ারের হাড়ের গুঁড়ো সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, তা হ'লে নিঃসন্দেহে সারের মান খুবই উৎকৃষ্ট হয়। প্রতি একশ' বর্গফুট জমি জোড়া স্তরের উপর দুই থেকে তিন সের হিসাবে হাড়ের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিতে হয়। যদি হাড়ের গুঁড়ো না মেলে, তা হ'লে তার পরিবর্তে প্রথমে দু' আঙুল পুরু করে টাটকা গোবর এবং তার উপরে দু' আঙুল পুরু একস্তর মাটি

ছড়িয়ে দিলে পচা সারের গুণ অনেক বেড়ে যায়।

এইভাবে আবজর্নার স্তর সাজানোর পরে গোয়াল-ধোয়া জল কিংবা নালার জল নিয়ে স্তরটার উপরে সমান করে ছড়িয়ে সমস্ত স্তরটিকে বেশ ভালো করে ভিজিয়ে দিতে হবে। জল দেওয়ার সময় মনে রাখতে হবে স্তরটার মধ্যে আলগা জল যেন কোথাও জমে না থাকে। গোয়াল-ধোয়া জল বা নদমার জল দেওয়া ঠিকমত সম্ভব না হ'লে গোবর চোনা কিংবা টাটকা গোবর দশ থেকে পনেরো গুণ জলে গুলে দিলেও বেশ ভাল কাজ হয়।

এইভাবে প্রথম স্তরের কাজ হয়ে গেলে আবার তার উপরে ঠিক আগের উপায়েই তিন পোয়া হাত উঁচু দ্বিতীয় স্তর তৈরি করে ভিজিয়ে দিতে হবে। এমন উপায়ে চারটি স্তর করে বেশ কিছুদিনের মত তাদের ছেড়ে দিতে হবে। যদি কচুরিপানা দিয়ে সার তৈরি করা হয়, তা হ'লে তাতে প্রচুর জলীয় পদার্থ থাকার দরুন তাকে ভেজানো প্রায় দরকারই হয় না। কিন্তু যে-কোন শুকনো জিনিসের পচন শুরু করতে একটা পচনোদ্দীপক পদার্থের বিশেষ দরকার হয়। সুতরাং শুকনো কচুরিপানা ব্যবহার না করে তার এক-তৃতীয়াংশ অন্য কোন শুকনো বা আধা-শুকনো আবজর্না মিশিয়ে নিয়ে জল দিয়ে ভেজানো সবচেয়ে ভাল।

পচানোর কাজে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি

গাদার আবজর্না পচানোর ব্যাপারে প্রধানত দু'টি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন:

- (১) যাতে করে গাদার মধ্যে যথাসম্ভব অবধি বায়ু প্রবেশের সুযোগ পায়। এর জন্য, আগেই বলছি, স্তরের উপর যেন বিশেষ চাপ না পড়ে—যতটা আলগা করে সম্ভব আবজর্নার উপর আবজর্না চাপানো উচিত। এমনকি প্রয়োজনবোধ করলে একটার বেশি স্তর না করাই বিধেয়।

(২) যাতে ক'রে জঞ্জলের মধ্যে যথেষ্ট রসের সঞ্চার হয়, তার ব্যবস্থা করা। এর জন্য আর কিছু নয়, সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে স্তূপের কোন অংশ যেন শুকিয়ে না যায়। তা ব'লে জলীয় অংশের আধিক হওয়াও সার তৈরির পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর। অবশ্য সম্পূর্ণ পচবার জন্য কতবার কতটা জল দেওয়া দরকার তার ধরাবাঁধা কোন নিয়ম নেই; সেটা প্রধানত নির্ভর করে আবর্জনার প্রকৃতি, স্থানীয় অবস্থা, আবহাওয়া এবং মরসুমের উপর। তাই বর্ষাকালে জল দেওয়ার একরকম দরকারই হয় না। কিন্তু অন্য ঋতুতে স্তূপ শুকিয়ে এলেই তা ভিজিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

সমানভাবে সমস্ত আবর্জনা পচাব জন্য স্তূপটিকে অন্তত বার দুই উলটে দেওয়া দরকার। আবর্জনাগুলো আধপচা হলে প্রথমত একবার উলটে দিতে হয়। সাধারণত শুকনো আবর্জনা আধপচা অবস্থায় আসতে সময় লাগে প্রায় দেড় মাস; কিন্তু কাঁচা কিংবা সরস জিনিস হ'লে এর চেয়ে কম সময় লাগে। আবার আখের পাতা বা ছিবড়ে এর স্বেগুণ সময় নেয়। স্তূপটি উলটোনের সহজ প্রণালী হ'ল, সারের গাদাটি ভাঙতে ভাঙতে ঠিক তার পাশেই আবার একটা গাদা তৈরি ক'বে ফেলা এবং সেই সঙ্গে পুরানো গাদার অ-পচা ও আংশিক-পচা জিনিসগুলো নতুন গাদার ভিতর-অংশে রাখতে হবে। অর্থাৎ পুরানো স্তূপের সবচেয়ে উপরের জিনিস নতুন স্তূপের সবচেয়ে নিচে আসবে। পুরানো স্তূপ ভাঙবার সময় গাছের ডাল, শরের ডাঁটা প্রভৃতি কঠিন জিনিসগুলোকে বেছে বার ক'রে নেওয়া দরকার—কেননা তা হ'লে সমস্ত স্তূপটা সমানভাবে পচে এবং সার ভাল হয়। পুরানো গাদায় রস প্রায়ই কম থাকে, সেজন্য বেশির ভাগ সময়ই নতুন গাদা সম্পূর্ণ করবার সময় আবর্জনা-গুলোকে প্রয়োজনমত ভিজিয়ে দিতে হয়।

এইভাবে প্রথমবার উল্টোনের প্রায় মাসখানেক পর ঠিক ঐভাবে দ্বিতীয়বার উলটে দিতে হয়; তৃতীয়দিন না সম্পূর্ণভাবে প'চে যায়, ততদিন তার সরস রাখতে হয়। দ্বিতীয়বার স্তূপ করার সময় তার চুড়োটাকে খোড়োঘরের চালার মত দু'পাচাল ক'রে দেওয়া উচিত এবং তার উপর প'চ ক'রে মাটি লেপে দেওয়া দরকার; তা হ'লে বৃষ্টি জল আর তার মধ্যে ঢুকে আবর্জনার সারাংশ ধুয়ে ফেলতে পারবে না।

এইভাবে ঠিকমত সরস অবস্থায় থাকলে আবর্জনা সম্পূর্ণ প'চে সারে পরিণত হ'তে প্রায় সাড়ে তিন মাস সময় লাগে। গ্রীষ্মের শুরুরদে অথবা শুকনো আবর্জনা দিয়ে গাদা করলে সময় আরও বেড়ে লাগারই কথা। আবার তেরমনি বর্ষায় কিংবা ক'জিনিসের আবর্জনায় সার তৈরি হ'তে সময় ল'বে অনেক কম।

সারগাদা ভাঙবার জন্য চাষীরা বিভিন্ন ব্যবহার ক'রে থাকেন। তবে গাদা ভাঙা বা ন'তুন গাদা করার কাজে চাষীরা 'কাঁড়ালী' বা 'উকনঠো' নামে বাঁশের তৈরি যে ধরনের আঁকড়া ব্যবহার করেন, তা এই কাজের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক।

উদ্ভিজ্জ আবর্জনা থেকে সার তৈরির প্রণালী সম্পর্কে যা বলা হ'ল, তা থেকে প্রত্যেক কৃষক উপলব্ধি করতে পারবেন যে, একটু পরিশ্রম বিনিময়ে গোবরসারের অভাব পূরণ করার প'থ আবর্জনা পচানো এই সারের ক'ী বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। আজকের দিনে বোধহয় প্রত্যেক কৃষক উপলব্ধি করতে পারেন, শস্যের উৎপাদন-শক্তি ম'লে রয়েছে জমির উর্বরশক্তি। আর ভারত বিশেষ ক'রে পশ্চিমবাঙলার কৃষিক্ষেত্রের ও'র দুটি হচ্ছে জমির উর্বরশক্তির শোচনীয় অবস্থা বছরের পর বছর একই জমিতে চাষ হয়ে চলে একই ধারায়। নতুন বীজ আসে, হয়তো লাভ দেওয়া হয় ভালভাবে, অথচ জমির অপরিহার্য হিসাবে উপযুক্ত সারের যোগান এখনও ত

এই উপেক্ষিত থাকে। ঘোড়াকে চাবুক মারলে ছুটতে শুরুর করে সন্দেহ নেই; কিন্তু তাকে অভুক্ত রেখে কেবল ছোটানোর ব্যবস্থা করা তা হ'লে ফল মোটেই সন্তোষজনক হয় না; ঘোড়াটির অপমৃত্যুরই সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা। কৃষির ক্ষেত্রেও তাই সব-কিছুর মত রও খাদ্যের অভাবে জীবনশীর্ণ নিঃশেষ হয়ে অনেক সময়ে। ফসল যতটা আশা করা হয়, চেয়ে অনেক কম ঘরে ওঠে। প্রকৃতি এবং তার উপর দোষ পড়ে তখন। অথচ বৈজ্ঞানিক ভঙ্গি দিয়ে দেখলে তাদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পড়বে উপোসী জমিই অল্প উৎপাদনের মূল প্রধান কারণ। এই দুরবস্থা থেকে চাষীদের মুক্তি পেতেই হবে। আর এই কারণেই কৃষি-সারের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

রত-সরকারের প্রচেষ্টায় কয়েক বছর আগে তে বিরাট সার তৈরির কারখানা গড়ে

উঠেছে। হাজার হাজার টন রাসায়নিক সার তৈরিও হচ্ছে সেখানে। আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে রাসায়নিক সারের চাহিদা প্রচুর সন্দেহ নেই। এর প্রচলন এবং ব্যবহার বাড়ানোরও বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তা ব'লে জৈব সারের ব্যবহারের বিষয় কিংবা তার উৎকর্ষ বিচার করে তার প্রয়োজনীয়তার কথা ভুলে যাওয়া কোন কৃষকের পক্ষেই উচিত নয়। তা ছাড়া এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এখন পর্যন্ত সাধারণ কৃষকের মোটেই তেমন আর্থিক সচ্ছলতা আসে নি—যাতে করে তাঁরা প্রয়োজনমত রাসায়নিক সার বাজার থেকে কিনে জমিতে ঢালতে পারেন। গ্রামের মরা জন্তু-জানোয়ারের হাড় সংগ্রহ করে কিংবা গোবর বা আগাছা-জঞ্জালকে সারে পরিণত করায় কোন আর্থিক প্রয়োজনের প্রশ্ন বিশেষ ওঠে না; বরং এসব জিনিসকে কাজে না লাগানোই আর্থিক অপচয়।



টুকিটাকি

কাশীরাম দাসের জন্মভূমিতে শ্রমমন্ত্রী

শ্রমমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার গত রবিবার কাটোয়া থেকে বারো মাইল দূরবর্তী কাঁচ কাশীরাম দাসের জন্মভূমি সিঙ্গি গ্রামটি পরিদর্শন করেন। গ্রামবাসীগণ এই উপলক্ষে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। স্থানীয় লোক্যাল বোর্ডের সভাপতি শ্রীকমলাপতি চৌধুরী এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রমমন্ত্রী বলেন যে বড় বড় শিল্পের সহিত আমাদের কুটিরশিল্প এবং কৃষিকেও উন্নত করা প্রয়োজন। সম্প্রতি কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁত-শিল্পের কিছুটা উন্নতি হয়েছে এবং এর ফলে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। কৃষিরও উন্নতি হয়েছে, কিন্তু আরও উন্নতির জন্য অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। কর্মসংস্থানের দিক থেকে কৃষির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

কৃষি-শ্রমিকদের সমস্যার উল্লেখ প্রসঙ্গে শ্রমমন্ত্রী বলেন যে, রাজ্যসরকারসমূহকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে কৃষি-শ্রমিকদের নিম্নতম বেতন নির্ধারণ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ইতিমধ্যে কৃষি-শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থার ভিত্তিতে তথ্যাদি সংকলনের কাজ আরম্ভ করেছেন। কৃষি-শ্রমিকদের ভোগেন্নয়নের প্রশ্নটি কৃষির উন্নতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং কৃষির উন্নতিও আবার ভূমিসংস্কারের সহিত সংশ্লিষ্ট। কৃষকগণকে তিনি কৃষির আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলেন।

এর পর খড়ি নদীর উপরের বোরো বাঁধটি পরিদর্শনকালে মন্ত্রিমহাশয় ১০,০০০ বিঘারও বেশি জমিতে বোরো ধানের ফলন লক্ষ্য করেন। স্থানীয় কৃষকগণের সহিতও তিনি কথাবার্তা বলেন।

শ্রীতারাপদ চৌধুরী, এম এল এ, শ্রীরামরঞ্জন সিংহ এবং কাটোয়ার মহকুমা-শাসক মন্ত্রিমহাশয়ের অনুগমন করেন।

সমবায় শিক্ষণ উপদেষ্টা সমিতি

রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গে সমবায় শিক্ষণের উপদেষ্টা সমিতি নামে নিম্নলিখিত সদস্য নিয়ে একটি সংস্থা গঠন করেছেন—(১) শ্রী চন্দ্র সিংহ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন সভাপতি—সভাপতি (পদাধিকারবলে), (২) পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের উন্নয়ন কমিশনার (পদাধিকারবলে), (৩) পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের সচিব, সমবায় (পদাধিকারবলে), (৪) সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রার—সম্পাদক (পদাধিকারবলে), (৫) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সচিব (পদাধিকারবলে), (৬) ব্লক লেবেল সমবায় অফিসারদের কেন্দ্রের (কল্যাণীস্থিত) অধ্যক্ষ (পদাধিকারবলে), (৭) উত্তরপাড়ার পশ্চিমবঙ্গ সমবায় শিক্ষণ স্টানের অধ্যক্ষ (পদাধিকারবলে), (৮) বালুগঞ্জ (শান্তিগড়) বর্ধমানের আঞ্চলিক সমবায় প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ (পদাধিকারবলে), (৯) বালুগ্রামের (মেদিনীপুর) আঞ্চলিক সমবায় প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ (পদাধিকারবলে)।

১৯৫৮ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি থেকে এক বৎসর জন্য সদস্যগণ নিযুক্ত হয়েছেন এবং প্রয়োজন হইলে সমিতি আরও সদস্য গ্রহণ করতে পারবেন।

সমিতির কার্য হবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন সমবায় শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষণ সম্পর্কে রাজ্যসরকার এবং সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্য মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। প্রত্যেক তিন মাসে একবার সমিতির অধিবেশন হবে।

তফসিলী বনপল্লীবাসীদের জন্য কুটিরনির্মাণ জল-সরবরাহ অনুদান

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার চলতি আর্থিক তফসিলী আদিবাসী বনপল্লীবাসীদের কুটিরনির্মাণের পরিকল্পনা এবং এসকল

সরবরাহের ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য সমবায়ের মহাবনপালের হস্তে প্রদানের জন্য ১,০০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন। জেলা হিসাবে অর্থের বরাদ্দ নিম্নোক্তরূপ—দার্জিলিং—৩৭টি নির্মাণের জন্য ৩৭,০০০ টাকা এবং জল-মহাের জন্য ১৫,৫০০ টাকা; জলপাইগুড়ি—১টি কুটিরনির্মাণের জন্য ৫৭,০০০ টাকা এবং সরবরাহের জন্য ১১,১০০ টাকা, এবং কোচ-বিহার—১৮টি কুটিরনির্মাণের জন্য ১৮,০০০ টাকা জল-সরবরাহের জন্য ১,৪০০ টাকা।

তফসিলী ছাত্রাবাসের সম্প্রসারণ

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার প্রধানত তফসিলী সম্প্রদায়-বাসীদের কল্যাণার্থে কোচবিহার জেলার চৌধুরী-বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের সহিত সংযুক্ত একটি আনুমানিক ৯,৯৯৬ টাকা ব্যয়ে নির্মাণের প্রশাসনিক অনুমোদন দিয়াছেন।

আর্থিক বর্ষে ছাত্রাবাস-গৃহটি নির্মাণের সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে সহায়ক প্রদানের উদ্দেশ্যে কোচবিহারের ডেপুটি কমিশনারের হস্তে অর্পণের জন্যও সরকার ৯,৯৯৬ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

পূর্নুলিয়ায় শস্যগোলায় জন্য অনুদান

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার তফসিলী উপজাতিসমূহের কল্যাণার্থে পূর্নুলিয়া জেলার শস্যগোলাসমূহের বিপণনের ব্যয়নির্বাহের উদ্দেশ্যে পূর্নুলিয়ার একটি কমিশনারের হস্তে অর্পণের জন্য চলতি আর্থিক বর্ষে ৬,৩৩৫ টাকা মঞ্জুর করেছেন। পূর্নুলিয়া জেলা বোর্ডের মাধ্যমে পূর্নুলিয়া জেলার বারুইখালী থানা এলাকার জয়পুর শস্যগোলা ভবনের বিকল্পার্থে ব্যয় নির্বাহার্থেও পূর্নুলিয়ার একটি কমিশনারের হস্তে অর্পণের জন্য চলতি আর্থিক বর্ষে ৪,০৩৫ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

শস্যগোলা রক্ষণার্থে সাহায্য

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কালে “অনগ্রসর উন্নতি” কর্মসূচি অনুসারে খোলা হয়েছে

এমন ১৩টি শস্যগোলা রক্ষণার্থে সাহায্য প্রদান সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার নিম্নলিখিত শস্যগোলা-সমূহের প্রত্যেকটিতে ৬০০ টাকা হারে সাহায্য-প্রদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতিসমূহের রেজিস্ট্রারের ব্যবস্থাদীনে ৭,৮৬০ টাকা মঞ্জুর করেছেনঃ—বাঁকুড়া জেলার ঝান্টিপাহাড়ী কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ এবং ফুলকুসুমা সর্বকল্যাণ সমবায় সমিতি লিঃ; মালদহ জেলার হবিবপুর থানাবাসী অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমবায় ধর্মগোলা; মেদিনীপুর জেলার কেন্দুয়া-সুদীল কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ; জলপাইগুড়ি জেলার নারার্থীল ইউনিয়ন গ্রাম্য সমবায় শস্যভান্ডার; কোচবিহার জেলার কুটিয়ালের বাস উপজাতি সমবায় শস্যভান্ডার; বর্ধমান জেলার বরবানি থানা গ্রাম্য সমবায় শস্যভান্ডার; চব্বিশ-পরগনা জেলার বামুনঘাটা কো-অপারেটিভ মালটি-পারপাস সোসাইটি লিঃ; হুগলি জেলার পুঁইনান গোম্বামী মালিপাড়া গ্রাম্য সমবায় শস্যভান্ডার; হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া পাঁচঘড়া তোরেগ্রাম ইউনিয়ন সমবায় শস্য ভান্ডার; পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর আদিবাসী সমবায় ধান্যগোলা; এবং মুর্শিদাবাদ জেলার সাহাপুর গ্রাম্য সমবায় শস্য-ভান্ডার ও ইতোড় গ্রাম্য সমবায় শস্যভান্ডার।

তফসিলী সম্প্রদায়ের জন্য কেন্দ্র-পৃষ্ঠপোষিত শস্যগোলা

তফসিলী সম্প্রদায়সমূহের কল্যাণার্থে শস্যগোলা স্থাপনের কেন্দ্র—পৃষ্ঠপোষিত পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এতৎসম্পর্কিত প্রয়োজনীয় ব্যয়নির্বাহের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতি-সমূহের নিবন্ধকের হস্তে অর্পণের জন্য চলতি আর্থিক বর্ষে ৬১,৯১,৫৩৩ টাকা মঞ্জুর করেছেন। বরাদ্দ অর্থ জেলাহিসাবে নিম্নোক্তরূপে খরচ করা হবেঃ বীরভূম—রামপুরহাট থানার এলাকাধীন তুন্দুর্নীস্থিত তুন্দুর্নী অনুন্নত সম্প্রদায়ের গ্রাম্য সমবায় শস্যভান্ডারের পরিচালনায় একটি শস্য-গোলা স্থাপনের জন্য ১০,০০০ টাকা এবং উক্ত

বসুন্ধরা : ১০ম বর্ষ : ১২শ সংখ্যা

থানার এলাকাধীন শালবানরা উপজাতি গ্রাম্য সমবায় শস্যভাণ্ডারের জন্য অর্থসাহায্য বাবদ ৩৫০ টাকা; দার্জিলিং—শিলিগুড়ি থানার অন্তর্গত নিউ চুমটা ডাকঘরের এলাকাস্থিত খোপরাইল গ্রাম্য সমবায় (ধর্মগোলা) শস্যভাণ্ডারের পরিচালনায় একটি শস্যগোলা স্থাপনের জন্য ১০,০০০ টাকা; মেদিনীপুর—গোপীবল্লভপুর থানার এলাকাধীন ছাতিনাসোল গ্রামে একটি শস্যগোলা স্থাপনের জন্য ১০,০০০ টাকা এবং গিদনী আদিবাসী সমবায় ধর্মগোলাকে পরিপোষণমূলক অর্থসাহায্য প্রদান বাবদ ৪২৫.৩৩ টাকা; চব্বিশপরগনা—সন্দেশখালি গ্রাম্য সমবায় শস্যভাণ্ডারকে পরিপোষণমূলক অর্থসাহায্য প্রদান বাবদ ৮৪০ টাকা; জলপাইগুড়ি—কুমারগ্রাম থানার এলাকাধীন ভালুকাইল আদিবাসী সমবায় ধর্মগোলাকে পরিপোষণমূলক অর্থসাহায্য প্রদান বাবদ ৮৪০ টাকা; জলপাইগুড়ি—কুমারগ্রাম থানার এলাকাধীন ভালুকাইল আদিবাসী সমবায় শস্যভাণ্ডারের পরিচালনায় একটি শস্যভাণ্ডার স্থাপন বাবদ ১০,০০০ টাকা; বাঁকুড়া—রাণীবাঁধ থানার এলাকাধীন নাচনাস্থিত নাচনা আদিবাসী গ্রাম্য সমবায় শস্যভাণ্ডারের পরিচালনায় একটি শস্যগোলা স্থাপন বাবদ ১০,০০০ টাকা; মুর্শিদাবাদ—নবগ্রাম থানার এলাকাধীন চানক গ্রাম্য শস্যভাণ্ডারের পরিচালনায় একটি শস্যগোলা স্থাপন বাবদ ১০,০০০ টাকা।

সমবায় শস্যগোলায় জন্য অনুদান

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার চলতি আর্থিক বৎসরে (গোলা-পিছ) আনুমানিক ১০,০০০ টাকা ব্যয়ে চব্বিশপরগনা জেলার মথুরাপুর থানার রায়দিঘিতে রায়দিঘি আদিবাসী গ্রাম্য সমবায় শস্যভাণ্ডারের উদ্যোগে একটি এবং চব্বিশপরগনার সন্দেশখালি থানার বয়েরমারি ইউনিয়ন আদিবাসী সর্বার্থস্বার্থক সমবায় সমিতির উদ্যোগে একটি সমবায় শস্যগোলা সংস্থাপনের পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতিসমূহের রেজিস্ট্রার কর্তৃক কার্যকরী করা অনুমোদন করেছেন। এতৎসম্পর্কে আবশ্যিক ব্যয়নির্বাহের জন্য সরকার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতিসমূহের রেজিস্ট্রারের

ব্যবস্থাধীনে ২০,০০০ টাকা বরাদ্দ মঞ্জুর হয়েছে।

হুগলি জেলার ধনিয়াখালি থানার বেল ধনিয়াখালি ইউনিয়ন সমবায় ধর্মগোলাকে অনুদান হিসাবে প্রদানের জন্য চলতি বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতি রেজিস্ট্রারের ব্যবস্থাধীনে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ১০,০০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকার নিম্নলিখিত সমবায় গোলাসমূহের প্রত্যেককে ৬০০ টাকা হারে আর্থসাহায্য দানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতিসমূহের রেজিস্ট্রারের ব্যবস্থাধীনে চলতি বৎসরে ৬,০০০ টাকা মঞ্জুর করেছেনঃ—দিনাজপুরের বালুরঘাট আদিবাসী সমবায় গোলা, মহাদেববাটি আদিবাসী সমবায় ধান্যগোলা, মহাদেববাটি আদিবাসী সমবায় ধান্যগোলা, রায়গঞ্জ (বর্তমানে ইটাহার) সমবায় ধান্যগোলা, কুমারগঞ্জ আদিবাসী সমবায় ধান্যগোলা; মালবামনগোলা আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমবায় গোলা এবং গাজোল অনুন্নত সম্প্রদায়ের সমবায় ধান্যগোলা; বীরভূমের মহম্মদবাজার থানা সাঁওতাল গ্রাম্য সমবায় শস্যভাণ্ডার; জলপাইগুড়ির রায়গঞ্জ বাজনা গ্রাম্য সমবায় শস্যভাণ্ডার; বাঁকুড়ার রাণীথানা সর্বকল্যাণ সমবায় সমিতি এবং বর্ধমান উচ্চগ্রাম সাঁওতাল সমবায় শস্যভাণ্ডার ও ঋণদান সমিতি।

তফসিলী আদিবাসীদের কল্যাণার্থে শস্যগোলা স্থাপনের কেন্দ্র-পৃষ্ঠপোষিত পরিকল্পনা অনুমোদন পশ্চিমবঙ্গ-সরকার মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুর থানার এলাকাধীন ছাতিনাসোল গ্রামে, এবং মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানার এলাকাধীন চানক কানফলা গ্রাম্য সমবায় শস্যভাণ্ডারের পরিচালনায় প্রায় ১০,০০০ টাকা আনুমানিক ব্যয়ে একটি শস্যগোলা স্থাপনের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধক

পণের জন্য চলতি আর্থিক বর্ষে ২০,০০০ টাকা
দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার
অন্তর্গত জোড়াদিঘি আদিবাসী সমবায় ধর্মগোলা
লিমিটেডকে ৬০০ টাকা, মালদহ জেলার অন্তর্গত
রপপুর অনুল্লত উপজাতি গ্রাম্য সমবায় শস্য-
গোলাকে ১০০ টাকা এবং উক্ত জেলার অন্তর্গত
৩৬ নং ইউনিয়ন অনুল্লত উপজাতি সম্প্রদায়ের
শস্যভান্ডার লিমিটেডকে ১২০.৮৭ টাকা

অর্থসাহায্য দানের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের সমবায়
সমিতিসমূহের নিবন্ধকের নিকট ৮২০.৮৭ টাকা
দেওয়া হয়েছে। চলতি আর্থিক বর্ষে পদ্রুলিয়া
জেলা বোর্ডের মাধ্যমে পদ্রুলিয়া জেলার অন্তর্গত
হুড়া শস্যগোলা ভবনের সংস্কারকার্যের ব্যয়-
নির্বাহার্থে পদ্রুলিয়ার ডেপুটি কমিশনারের হস্তে
৩১৭ টাকার এক বরাদ্দ অর্পণেও সরকারী অনু-
মোদন দেওয়া হয়েছে।



সম্পাদক : শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর, পশ্চিমবঙ্গের প্রচার-অধিকর্তা।
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ থেকে প্রকাশিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী
মুদ্রণে অধীক্ষক শ্রীশুভেন্দ্র মদ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।



বাঁচি
কুইনিন

এক সিনকোনা
থেকে তৈরি

অগ্ন্যাণ্ড ওষুধগুলি

কেনবার সময় দেখে নেবেন সেগুলি কেন
পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের

কুইনিন কারখানার

তৈরি হয়

কুইনিন, কুইনিডিন, ইউকুইনিন, টোটাকুইনা,
সিনকোনা, ফেরীকিউজ ইত্যাদি পাউডারে এবং ট্যাবলেট

নব বড় বড় ঔষুধাগারে এবং সরকারী কুইনিন
সেল ভিপো, ওল্ড হিন্দুস্থান বিজি.সি.
কলিকাতা-১৩ হইতে পাওয়া যায়।

